৭০৫ পৃষ্ঠা ১ম ও ২য় প্যারা—

একথার উত্তর সমালোচক দিয়া গিয়াছেন। ইহারই নাম 'ধান ভানিতে শিবের গীত;' কবিও গাহিয়াছেন বটে, প্রতিবাদকও গাহিয়াছেন বটে। প্রতিবাদক চর্ব্বিত বস্তু উদ্গার করিয়া যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতেই একথার উত্তর আছে। রাজপুত্রের মত্ততা বা চঞ্চলতা যদি দোষের না হয়, তবে সুরাসেবীর মত্ততা, বেশ্যাসেবীর বেশ্যাপ্রীতিহেতু চঞ্চলতাই বা নিন্দার্হ কেন? রাজপুত্র ধীরগম্ভীর-হইলে আপত্তি ছিল কি? রাজপুত্র কি ভাবে স্বহস্তে ঘোড়া ধরিয়াছেন, তাহা সমালোচক দেখাইয়াছেন, সে ভাবে ঘোড়া ধরা রাজপুত্রের উচিত কিনা, তাহা পাঠকেরা বিচার করিবেন, প্রতিবাদকের তত্তটা দেখিবার সামর্থ্য নাই দেখিতেছি। জ্ঞানকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয় চান্দ্রায়ণেও হয় না।

৭০৫ পৃষ্ঠা ৩য় প্যারা—

এস্থলে প্রতিবাদক সমালোচনাটি পাঠ করেন নাই বলিয়া বোধ হইল। সমালোচনার ৪০৪ পৃষ্ঠায় কাশীদাসের ও গিরিশ বাবুর প্রবীর-চিত্রের তুলনাটি যে সকল যুক্তির উপর করা হইয়াছে, প্রতিবাদক তাহা অন্যথা করিবার কোন যুক্তি দেন নাই। এরূপে স্ত্রীর প্রসাদাকাঙ্ক্ষা নীতিধর্ম্ম বিগর্হিতই বটে। অন্যায় উপহার দিয়া স্ত্রীর প্রেমলাভ, নিজের অন্যায় বাসনার পরিপূরণ ইত্যাদি বিবেচক রাজপুত্রের কর্ত্তব্যনীতির অন্তর্গত নহে, রাজধর্ম্মের অন্তর্গত নহে, হিন্দুস্বামীর ধর্ম্মও নহে। প্রবীর যদি অগ্রে অশ্বের ভালপট্ট পড়িতেন, তারপর ঘোড়া ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা তাঁহার হইত, তাহা হইলে কোন কথা বলিবার ছিল না।

৭০৬ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ—

এ সকল কথার উত্তর সমালোচক যথেষ্ট দিয়াছেন। প্রবীর-চিত্রের অসামঞ্জস্য বিচারস্থলে সমালোচক যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, প্রতিবাদক তাহার একটিরও অন্যথা করেন নাই, অথচ এই সকল মতামত দিতেছেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। "ক্ষত্রিয়ের আহ্বানে ক্ষত্রিয়ের দম্ভে" যদি প্রবীর ঘোড়া ধরিত তাহা হইলে অন্যায় হইত না, কিন্তু প্রবীর ঘোড়া ধরিয়াছে স্ত্রীর তৃপ্তি হেতু।

প্রবীর বলিয়াছে বটে—

> "অহঙ্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া
> প্রাণ ভয়ে দিব ছেড়ে।"
> এবং নিজকর্ম্ম করিলে সাধন
> রুষ্ট যদি হন নারায়ণ" ইত্যাদি।

কিন্তু সে কখন? স্ত্রীর নিকট নিজের বড়াই করিবার সময়, ভীতা চকিতা পত্নীকে সাহস দিবার সময়! প্রবীরের এই উক্তি যদি প্রাণের যথার্থ কথা হইত, তাহা হইলে প্রবীর এই ছলে স্ত্রীর নিকট প্রেম উপহার দিয়া ভালবাসা জানাইতে চেষ্টা করিত না। মদনমুঞ্জরীর প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তরেই নিজ উদ্দেশ্য বলিয়া ফেলিত। রণকামনার কথাও ঐরূপ। প্রতিবাদক এস্থলে অনধিকার চর্চ্চার উল্লেখ করিয়া সমালোচককে ব্রহ্মহত্যার শাস্তিভাগী করিয়াছেন। সমালোচকের হইয়া আমরা বলিতে পারি, জানিয়া শুনিয়া সজ্ঞানে মিথ্যাপক্ষ সমর্থন করিলে সে কালে

হিন্দুরাজারাই তপ্তলৌহদ্বারা সেই সাক্ষীর জিহ্বা দগ্ধ করিতেন, ধর্ম্মের বিচার দূরে থাক। প্রবীরচিত্রে কিরূপে সামঞ্জস্য আছে তাহা প্রতিবাদকও দেখাইতে পারেন নাই।

৭০৬ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ—

জনাকে এস্থলে সমালোচক নিন্দা করেন নাই, প্রবীরকেও নহে। পিতৃ-ভক্তি ও মাতৃভক্তির পরিমাণের কথাটা তুলিয়া প্রতিবাদকই 'শোচনীয় ব্যঙ্গের' পাত্র হইয়াছেন। এইস্থলের সমালোচ-কের কথাগুলি আর একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। পিতৃমাতৃভক্তির আদর্শ রাম। রাম কি ভাবে এই সকল সন্ধি-স্থলে কথা কহিয়াছেন আর প্রবীর কি ভাবে কহিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলেই চলিত।

৭০৬ পৃষ্ঠা ১ম প্যারা—

জনাসম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাগুলি তুলিয়াই সমালোচক এস্থলের উত্তর দিয়াছেন, প্রতিবাদক বুঝিতে পারেন নাই। নীলধ্বজের সহিত জনার শেষ কথাগুলি (জনার ২৩।২৫ পৃঃ) জনার স্বেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক।

৭০৭ পৃষ্ঠা ২য় প্যারা—

এ কদর্য্য কথার উত্তর কদর্য্য ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় দেওয়া যায় না। এই মতপ্রকাশের পূর্ব্বে প্রতিবাদকের বুঝা উচিত ছিল যে, বর্ণনা পাঠে যদি বর্ণনীয় বিষয়ের ছবি মনে না উদিত হয়, তবে সে বর্ণনার আবশ্যক কি?

Unity of time সম্বন্ধে সমালো-চক সুন্দর বিচার করিয়াছেন। রাণীর ২।৩ দৃশ্যের "প্রভাত নিকট," ২।৫ দৃশ্যের "উঠ উঠ কত নিদ্রা যাও যাদুমণি" আর দূতের—"প্রাণপণে বীরগণে নিবারিতে নারে মহাচমূ", "অনায়াসে পরাজিল দেব-হুতাশনে" ও "এতক্ষণ কি হয় না জানি" ইত্যাদি পাঠ করিলে সমালোচকের কথা সপ্রমাণ হইবে। একটা রাত্রি "উৎসাহে বিপদে বাস্তবিকই কাটিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করে না, তবে কথা এই unity of time রাখিতে গেলে এরূপ ঘটনা সংস্থান করা উচিত নহে আর তাহারও সহিত একথার কোন সম্পর্ক নাই, ইহাই বৃথা তর্ক।

৭০৭ পৃষ্ঠা ৩য় প্যারা—

নেপথ্যব্যবহিত কালে যাহা যাহা ঘটে, তাহার উল্লেখ এরূপ ভাবে পরদৃশ্যে হওয়া আবশ্যক যে, পরদৃশ্যদর্শনে দর্শকে তাহা বুঝিতে পারে, নতুবা নেপথ্য-ব্যবহিত কালে কোন ঘটনা ঘটিল বা না ঘটিল, তাহাতে নাটকের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। জনা জাহ্নবীর নিকট কখন কি আজ্ঞা পাইয়াছেন, তাহা জনা যদি না বলিয়া দেন, তবে সে আজ্ঞা না পাইলেও নাটকের কোন ক্ষতি হয় না। নাটকোক্ত কোন মহাঘটনা নেপথ্যে ঘটাও যুক্তিসিদ্ধ নহে আর গঙ্গার যে এরূপ আজ্ঞা হইতে পারে না, তাহা গঙ্গারক্ষকের মুখে (জনা ৪০ পৃষ্ঠায় ২য় গঙ্গারক্ষকের শেষ কথায় এবং ৬১ পৃষ্ঠায় ১ম রক্ষকের কথায়) গঙ্গার অভিপ্রায় কবি যাহা প্রকাশ করিয়া-ছেন, তাহাতে গঙ্গা কখন যুদ্ধে অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। শুদ্ধ এই জন্যই যদি সমালোচকের দৌড় 'মসজীদ' পর্য্যন্ত হয়, তবে প্রতিবাদকের দৃষ্টিশক্তি জন্য পুস্তকের ঐ দুই-পৃষ্ঠাপর্য্যন্তও নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিবেচনা না করিলেও নিশ্চেষ্টতাই সফলতার লক্ষণ নহে। মা আসিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিবে, এরূপ গাঢ় নিদ্রা প্রবীরের এসময়ে অনুপযুক্ত। খরগস ও কচ্ছপের গল্পের কথা প্রতিবাদক জানেন বোধ হয়।

৭০৭ পৃষ্ঠা ৪র্থ প্যারা—

"কাজেই মজিল" কারণ তাহা স্বীকার না করিলে কবির কার্য্য চলে না। প্রবীর বাস্তবিক তখনও মজে নাই। (সমালোচনা ৫০৫ পৃঃ দেখ) নায়িকার অবতারণার আবশ্যকতা যে কত অল্প তাহা সমালোচক ৪০৭ ৫০৫ পৃষ্ঠায় অতি বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। মদনবাণে প্রবীর যদি মদনমুঞ্জরীর গৃহে আসিত, তাহা হইলে প্রবীরের পতন হইবার বাধা আমরা কিছু দেখি না। শ্রীকৃষ্ণের বা জাহ্নবীর আজ্ঞা "শয়নে ভোজনে রণসাজ কভু নাহি ত্যজে" সুতরাং প্রবীর পত্নীর নিকট আসিয়া যদি পত্নী-আলিঙ্গন-আশায় পত্নীর শত নিষেধ সত্ত্বেও নিজ ক্ষত্রিয়সুলভ দম্ভের বশে রণসাজ ত্যাগ করিত, তাহা হইলে হইত এবং তাহা হইলে প্রবীরকে আর পরকীয়া 'রমণীলোভের দোষে দোষী হইতে হইত না। মদন বাণে স্ত্রীতে যে মোহ ঘটে না, তাহা নহে, সাক্ষী পাণ্ডুরাজের পরিণাম।

৭০৮ পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ—

ইহার উত্তরও উপরেই এক প্রকার দেওয়া হইয়াছে। প্রবীর কি ভাবে মায়াকাননে গিয়া পড়েন, তাহার সম্বন্ধে সমালোচক কোন কথা বলেন নাই, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা মায়াকাননে প্রবেশের পূর্ব্বকালের নায়িকা দর্শনের পূর্ব্বের কথা। যুদ্ধাবসানের পর যেখানে প্রবীরের সহিত নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ (যেখানে সে একবার যন্ত্রধ্বনি শুনাইয়া ও রূপ দেখাইয়া লুকাইল, জনা ৬৫ পৃঃ), যেখানে মদন রতির নৃত্যগীত, সে দৃশ্যটি মায়াকানন নহে, তাহা রণক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব। যুদ্ধাবসানের পর মাতৃভক্ত প্রবীর মাতার নিকট না গিয়া এই রণক্ষেত্রের নিভৃত প্রদেশে কেন আসিল, এই প্রশ্ন সমালোচকের। প্রতিবাদক দৃশ্যের গোলমাল ঘটাইয়া এখানে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা তাঁহারই মহা ভ্রম।

৭০৮ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ—

কাশীদাসের অগ্নি বা জৈমিনীর অগ্নি কর্ত্তব্য-বিমুখতায় বা পক্ষপাতিতায় দুষ্ট নহেন। কাশীদাসের অগ্নি ভক্তবাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া স্বীয় তেজহরণের উপায় বলিয়াছেন। ভক্তবাৎসল্যতার যতটুকু পক্ষপাতিতা বা কর্ত্তব্যবিমুখতা আসে, তাহা ত্যাগ করিতে গেলে, দেবতার দেবত্ব থাকে না আরও ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লোপ হয়। ঠিক এই কারণেই অর্জ্জুনের নিকট খাণ্ডবদাহনহেতু ঋণী থাকিয়াও, অর্জ্জুনকে নারায়ণ-প্রিয় জানিয়াও এবং এই যুদ্ধের পরিণামও জানিয়া রাজার ইচ্ছামত অগ্নি অর্জ্জুন-সৈন্য দগ্ধ ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আর জৈমিনীর মতে অর্জ্জুন অগ্নির স্তব করিয়া নারায়ণাস্ত্র জুড়িলেন। অগ্নি নারায়ণাস্ত্র দেখিয়া শান্ত হইলেন ও বলিলেন প্রথমেই যদি তুমি নারায়ণাস্ত্র জুড়িতে তাহা হইলে আমা হইতে তোমার এত ক্ষতি হইত না ইত্যাদি।

প্রতিবাদক বলেন, জৈমিনী-ভারতে এ সম্বন্ধে কোন আভাষ নাই, কিন্তু জৈ-ভা ১২৫ অধ্যায়ের শেষাংশ দেখিলে একথার সত্যতা দৃষ্ট হইবে। প্রতিবাদক বর্ত্তমান প্রবন্ধে সমালোচকের বহু শাস্ত্র-দর্শনের বিষয়ে শ্লেষ করিয়াছেন; (৭০৩ পৃঃ দেখ) কিন্তু এখন তিনি বুঝিবেন, পৌরাণিক বিষয় লইয়া কথা কহিতে গেলে, কেবল কোন একখানি পুস্তকের উপর নির্ভর করিলে ব্যাকুব হইতে হয়। প্রতিবাদকের জৈমিনী-ভারত দেখা নাই অথচ তিনি কোন সাহসে বলেন যে জৈমিনী-ভারতে অগ্নি-পরাজয়ের কোনও আভাষ নাই! এ দুঃসাহস বিবেচক ব্যক্তির হয় না।

৭০৮ পৃষ্ঠা ১ম প্যারা—

প্রতিবাদক এইস্থলে যে তর্ক তুলিয়াছেন, তাহা অন্য কারণে সমীচীন বোধ হইল। প্রবীরের সমরবাঞ্ছা বাস্তবিক মিটিয়াছিল, কারণ অর্জ্জুন অনেক-স্থলে নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে প্রবীর কৃষ্ণার্জ্জুনকে পরাজিত করিয়াছে সুতরাং যোগ্য অরি মিলিয়াছে ও তাহার সহ যুদ্ধে সে জয়ী হইয়াছে। তবে প্রবীরের পরিণাম দেখিয়া সমালোচক যে কথা বলিয়াছেন (৫১১ পৃঃ ১ম স্তম্ভের শেষ) তাহার উত্তর প্রতিবাদক কিছু দেন নাই, দিবারও নাই, সে কথা ঠিক, সমরবাঞ্ছা মিটিয়াছে, কিন্তু তৃপ্তি কোথায়? তৃপ্তি না হইলে, সাধ যথার্থ মিটিল কি না, কেমন করিয়া বুঝা যায়? তৃপ্তি যে হয় নাই, তাহা প্রবীরের শেষ যুদ্ধ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে।

৭০৯ পৃষ্ঠা ১ম প্যারা—

সমালোচকের কথা পণ্ড হয় নাই; প্রমাণ জনার কথায়—"তোর জলে নিভাইতে স্মৃতি * * * এসেছি মা বঞ্চনা করনা।" একথা গুলি সমালোচক নিজ প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু প্রতিবাদক সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই দেখিতেছি।—"বাল্যকালে মাতৃহীনা আমি, মার কোল চিরদিন করি আকিঞ্চন"—একথার সাফল্য হয় নাই। একথার সাফল্য যদিও না হয় তবু পুত্র শোকে মৃত্যু আর "খুনে" মৃত্যু তফাৎ নাই কি? ইহাকে কি 'পরিত্রাণ' বলিব? তবে "মরিতে পারিলেই বাঁচি" মত 'পরিত্রাণ' বটে।

নৃসিংহাবতার হেঁয়ালি হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? নারায়ণকে ঐরূপে অবতার হইয়াও ব্রহ্মার বাক্যের যাথার্থ্য দিতে হইয়াছিল। এখানে সেরূপ যাথার্থ্য প্রদানের কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই কেন? বরদান ও বর পূরণের সহিত সঙ্গদয়তা যদি না থাকিবে তবে বরদানের আবশ্যকতা কি? "লিখে দিলেম কলার পাতে, ভেসে বেড়াগে পথে পথে" র মত বর দিয়া ফল কি?

৭১০ পৃষ্ঠা ২য় প্যারা—

মধুসূদনের জনার যতটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, ততটুকুতে তাহার চিত্র সম্পূর্ণ নহে, সমস্তটা পড়িলে বা দেখিলে তাঁহার জনা কি তাহা বুঝা যাইবে। এ অংশ-টুকু স্বমতপরিপোষণে সাহায্য করে বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

৭১১ পৃষ্ঠা ১ম প্যারা—

পুত্রপ্রাণতায় জনা ফুটে নাই, জনার হৃদয়ের প্রশস্ততা, বীর নারীর ঔদার্য্য সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চরিত্রের একটি গুণ ফুটাইলেই চরিত্র সুচিত্রিত হয় না, তাহার অপর গুণগুলির অল্পাধিক বিকাশ দেখান আবশ্যক। এক প্রাণে দুই ভালবাসার

স্থান না হইলে পতিস্নেহ ও পুত্রস্নেহ থাকিত না। তবে কাহারও কোনটা প্রবল থাকে কিন্তু কোনটার অভাব থাকে না। দ্রৌপদী প্রায়োপবেশন করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু গিরীশ বাবুর জনা প্রতিহিংসা সাধনের কোন উপায় অবলম্বন করিয়া বহির্গত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিলাম না। উলুকের উপর তাহার বিশ্বাস নাই, গঙ্গার নিকটেও সে কোন ভরসা পায় নাই; তবে প্রতিহিংসা কথাটার সফলতা কি হইল? জনার মৃত্যু স্বেচ্ছামৃত্যু পুত্র-শোকে পরিত্রাণের মৃত্যু বটে; কিন্তু আত্মহত্যা বা অপমৃত্যু নহে কি? (৫১১ পৃ ২৪ পং দেখ)।

জনা এরূপ আত্মহত্যা করিয়া গঙ্গা-জলে প্রাণবায়ু ত্যজিতে চাহে নাই, ইহা নিশ্চয়। এ সকল কথা সমালোচক অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রতিবাদক সে সকল ব্যাখ্যা গ্রাহ্য না করিলে কে কি করিতে পারে?

প্রতিবাদকের প্রবন্ধ শেষ হইল। মোটের উপর, এ প্রবন্ধটি 'প্রতিবাদ' বা 'সমালোচনার সমালোচনা' হয় নাই; কারণ সমালোচক জনা, রাজা, মদন-মঞ্জরী, প্রবীর, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন সম্বন্ধে যে সকল বিষম দোষের উল্লেখ ও তৎপোষক প্রমাণাদি দিয়াছেন, প্রতিবাদক তাহার কোনটিই খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন নাই। যে দু-একটি আপত্তি তুলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা যথাস্থানে আমরা বলিয়া আসিলাম। সমালোচকের সহিত কোন কোন বিষয়ে তিনি একমত তাহাও আমরা বুঝিলাম না। তিনি সমালোচককর্ত্তৃক প্রদর্শিত ভ্রমগুলি যথার্থ কি না, তাহার আলোচনা না করায় বোধ হয়, যেন তিনি ইচ্ছা করিয়া ঐ বিষয়গুলির আলোচনা হইতে পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এরূপ আলোচনাকে আমরা সম্যক্ আলোচনা বা সমালোচনা বলিতে পারি না। আমাদের অনুমান হয় যে, এ প্রবন্ধটি কেবল সমালোচকের লিখিত জনা সমালোচনাটি অপ্রতিহত রহিয়া গেল বলিয়াই যেন জিগীষাপরবশ হইয়া লিখিত হইয়াছে, কারণ ইহাতে সম্যক্ আলোচনা বা সার নাই; বচনাড়ম্বরই বেশী, দৃষ্টিও ভাসা ভাসা।

প্রতিবাদক হয়ত আমাদের মীমাং-সায় সন্তুষ্ট না হইয়া দ্বিতীয় উত্তর দিতে পারেন; কিন্তু আমরা পূর্ব্ব হইতে দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি যে, তাহা মুদ্রণের স্থান 'সমীরণ' আর দিতে পারিবে না। হয়ত সমালোচকও আমাদের অপেক্ষা দৃঢ়তর যুক্তিতে প্রতিবাদকের সন্দেহ দূর করিতে পারিতেন, কিন্তু সমীরণে একান্ত স্থানাভাব বলিয়া আমরা তাঁহাকেও ইহার উত্তর দিবার অবসর দিতে (যাহা আমাদের কর্ত্তব্য) পারিলাম না, এজন্য আমরা উভয়কেই বলিতেছি যেন কেহ এই কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হন।

আয়ুর্ব্বেদ।

রাজযক্ষ্মা।

আজ কাল রাজযক্ষ্মা রোগীও লোক সমাজে নিতান্ত বিরল নহে, তাই এ প্রবন্ধে আমরা যক্ষ্মার বিষয় কথঞ্চিৎ আলোচনা কবিব। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় হয়ত পরিহাস করিবেন, আমরা তাহাদের জন্য বলিতে চাহিনা, দেব দ্বিজে যাহাদের ভক্তি আছে, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে এবং আপ্তোপদেশে অবমাননা করেন না তাঁহাদেরই জন্য যক্ষ্মা সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীটী বিবৃত করিব।

দিবৌকসাং কথযতা মৃষিভি বৈর্ব শ্রুতা কথা।
কামব্যসনসংযুক্তা পৌরাণী শশিনং প্রতি॥

ভগবান্ চন্দ্রের কামাশক্তি বিষয়ে যে সমুদায় পৌরাণিক প্রবাদ প্রচলিত আছে, ঋষিগণ একদা দেবগণের নিকট হইতে উহা এইরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

রোহিণ্যা মতিসক্তস্য শরীরং নানুরক্ষতঃ।
আজগামাল্পতা মিন্দো র্দেহঃ স্নেহপরিক্ষয়াৎ॥

শরীরের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া চন্দ্র রোহিণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন, সুতরাং তাঁহার দৈহিক স্নেহক্ষয় বশতঃ দেহ অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

চন্দ্র দক্ষ প্রজাপতির অষ্টাবিংশতি কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, কিন্তু রজোগুণে অন্ধ হইয়া সকলের প্রতি সমভাব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, একমাত্র রোহিণীতেই অত্যন্ত প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন। মহাপ্রভাব দক্ষ প্রজাপতি, অবশিষ্ট কন্যা দিগকে অবহেলা করিয়া একমাত্র রোহিণীকে সমাদর করিতে দেখিয়া এরূপ রোষাবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিশ্বাসরূপ মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ উপস্থিত হইয়া অনুমতি অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহার আদেশ ক্রমে ঐ দুর্দ্ধর্ষ দক্ষ ক্রোধ যক্ষ্মারূপে চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিল। চন্দ্র দক্ষ প্রজাপতির সেই সুদুঃসহ যক্ষ্মারূপী ক্রোধ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া দেব ঋষিগণ সমভিব্যাহারে দক্ষের শরণাপন্ন হইয়া বহুতর স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন এবং স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য অনেক অনুতাপ করিলেন। অতঃপর প্রজাপতি দক্ষ যখন দেখিলেন, চন্দ্রের মতি শুদ্ধ হইয়াছে, তখন অনুকম্পা পুরঃসর উপদেশ দিলেন যে, তোমার এই ভীষণ রোগ অশ্বিনীকুমার ব্যতীত কেহই প্রতিকার করিতে সক্ষম হইবে না, অতএব তাঁহাদের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে যত্নবান্ হও। দক্ষ প্রজাপতির উপদেশ ক্রমে ভগবান্ চন্দ্র অশ্বিনীকুমার দ্বয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া রোগমুক্ত ও সমধিক সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া উঠিলেন ও শুদ্ধ সত্ত্ব লাভ করিলেন। যক্ষ্মা প্রথমতঃ রাজার অর্থাৎ চন্দ্রদেবের হয় বলিয়া,

ইহাকে রাজযক্ষ্মা বলে। রাজযক্ষ্মা চন্দ্রের শরীর হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া মনুষ্য লোকে আগমন করে।

লব্ধ্বা চতুর্ব্বিধং হেতুং সমাবিশতি মানবান্।
অযথাবল মারম্ভং বেগসংধারণং ক্ষয়ম্॥
যক্ষ্মণঃ কারণং বিদ্যাৎ চতুর্থং বিষমাশনম্।

উল্লিখিত কুটিল যক্ষ্মা রোগ চারি প্রকার হেতুতে মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করে, যথা—অযথাবল আরম্ভ, বেগ সন্ধারণ, ধাতু ক্ষয় ও বিষমাশন।

যুদ্ধাধ্যয়ন ভারাধ্ব লঙ্ঘন প্লবনাদিভিঃ।
পতনৈ রভিঘাতৈ র্বা সাহসৈ র্ব্বা তথাপরৈঃ॥
অযথাবলমারম্ভৈ র্জন্তোরুরসি বিক্ষতে।
বায়ুঃ প্রকুপিতো দোষাবুদীর্য্যোভৌ বিধাবতি॥
স শিরস্থঃ শিরঃশূলং করোতি গলমাশ্রিতঃ।
কণ্ঠোদ্ধ্বংসঞ্চ কাসঞ্চ স্বরভেদ মরোচকম্॥
পার্শ্বশূলঞ্চ পার্শ্বস্থো বর্চ্চোভেদং গুদেস্থিতঃ।
জৃম্ভাং জ্বরং চ সন্ধিস্থ উরস্থ শ্চোরসো রুজম্॥

অতিশয় যুদ্ধ, উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, গুরুভার বহন, সুদূর পথ গমন, অতি লঙ্ঘন, অতিশয় সন্তরণ, উচ্চ স্থান হইতে পতন, গুরুতর আঘাত প্রাপ্তি বা এবম্বিধ অপর কোন সাহসিক কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যগণের বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া পিত্ত ও কফকে উর্দ্ধগত করিয়া যক্ষ্মা ও তদানুষঙ্গিক উপদ্রব সমুদায় উৎপাদন করে। ঐ কুপিত বায়ু শিরোগত হইয়া শিরঃশূল, গলদেশাশ্রিত হইয়া উৎকাসি, কাস, স্বরভেদ, অরোচক ও পার্শ্বশূল গুহ্যদেশাশ্রিত হইয়া মলভেদ, সন্ধিগত হইয়া জৃম্ভা ও জ্বর এবং উরোগত হইয়া হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি কঠিন পীড়া সকল জন্মায়।

হ্রীমত্বাদ্বা ঘৃণিত্বাদ্বা ভয়াদ্বা বেগ মাগতম্।
বাত মূত্র পুরীষাণাং নিগৃহ্নাতি যদা নরঃ॥
তদা বেগ প্রতীঘাতাৎ কফপিত্তে সমীরয়ন্।
উর্দ্ধং তির্য্যগধঃ কুর্য্যাদ্বিকারান্ কুপিতোঽনিলঃ॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চারি প্রকার হেতুতে রাজযক্ষ্মা রোগ জন্মে। অযথাবল আরম্ভের বিষয় বলা গেল, এখন বেগরোধ-জনিত যক্ষ্মার বিষয় বলা যাইতেছে। মনুষ্য লজ্জা, ঘৃণা, বা ভয় বশতঃ বাত মূত্র ও পুরীষাদির বেগ ধারণ করিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া কফ ও পিত্তকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিয়া যক্ষ্মারোগ জন্মায়। এই যক্ষ্মা রোগে প্রতিশ্যায়, জ্বর, কাস, স্বরভেদ, অরুচি, পার্শ্বে শূল, শিরঃশূল, জ্বর, অংস দেশে বেদনা, অঙ্গ মর্দ, পুনঃ পুনঃ বমন এবং মলভেদ এই একাদশটী লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ঈর্ষোৎকণ্ঠা ভয় ত্রাস ক্রোধ শোকাতিকর্ষণাৎ।
ব্যবায়ানশনাভ্যাঞ্চ শুক্র মোজশ্চ হীয়তে॥
ততঃ স্নেহ ক্ষয়াদ্বায়ু র্বৃদ্ধো দোষাবুদীরয়ন্।
প্রতিশ্যায়ং জ্বরং কাসং অঙ্গমর্দ্দং শিরোরুজম্॥
শ্বাসং বিড়্‌ভেদ মরুচিং পার্শ্ব শূলং স্বরক্ষয়ম্।
করোতি চাংসসন্তাপ মেকাদশ মহাগ্রহঃ॥
লিঙ্গান্যাবেদয়ং স্তেতানেকাদশ মহাগদম্।
সম্প্রাপ্তং রাজযক্ষ্মাণং ক্ষয়াৎ প্রাণক্ষয়প্রদম্॥

ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, ভয়, ত্রাস, ক্রোধ ও শোক এই সমস্ত দ্বারা অতি কর্ষণ, অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, ও অনশন হেতু শুক্র ও ওজো ধাতুর ক্ষয় হয় সুতরাং দৈহিক স্নেহের ও ক্ষয় হয়, এজন্য প্রবৃদ্ধ বায়ু পিত্ত ও কফকে সঞ্চালিত করিয়া প্রতিশ্যায়, জ্বর, কাস, অঙ্গমর্দ্দ, শিরঃপীড়া, শ্বাস, মলভেদ, অরুচি, পার্শ্বে শূল, স্বরক্ষয় এবং অংস স্থানে বেদনা এই একাদশ

লক্ষণ স্বরূপ যক্ষ্মা রোগ জন্মায়। এবংবিধ যক্ষ্মা রোগ ধাতুক্ষয় কারক সুতরাং শীঘ্রই মারাত্মক হইয়া উঠে।

বিবিধান্যন্নপানানি বৈষম্যেন সমশ্নতঃ।
জনয়ন্ত্যাময়ান্ ঘোরান্ বিষমাঃ মারুতাদয়ঃ॥

যে মূঢ়াত্মা বিষম ভাবে নানা বিধ অন্ন পানাদি সেবন করে, তাহার বাত পিত্তাদি দোষ কুপিত হইয়া যক্ষ্মা রোগ জন্মায়।

মাধব কর প্রণীত নিদান গ্রন্থে এই পীড়াকে রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, চরকে রাজযক্ষ্মা ও সুশ্রুতে ইহাকে শোষরোগ বলা হইয়াছে বাস্তবিকপক্ষে এই সমস্তই এক। সুশ্রুত বলেন—

সংশোষণা দ্রসাদীনাং শোষ ইত্যভিধীয়তে।
ক্রিয়াক্ষয়করত্বাচ্চ ক্ষয় ইত্যুচ্যতে পুনঃ॥
রাজ্ঞশ্চন্দ্রমসো যস্মাদভূদেষ কিলাময়ঃ।
তস্মাত্তং রাজযক্ষ্মেতি কেচি দাহুর্মনীষিণঃ॥

রসাদির সংশোষণ হেতু শোষ, ধাতবিক ক্রিয়া ক্ষয় হেতু ক্ষয় ও রাজার প্রথমে হইয়াছিল বলিয়া রাজযক্ষ্মা ইহার নাম হইয়াছে। প্রচলিত প্রথা অনুসারে এখন এই পীড়ার রাজযক্ষ্মা ও ক্ষয় বা শোষ প্রভৃতি নাম করা হইয়া থাকে। রোগের প্রারম্ভে যক্ষ্মা ও পরিণতাবস্থায় (ধাতুক্ষয় হইতে আরম্ভ হইলে) শোষ বা ক্ষয় বলা হয়। ক্রমশঃ নিদানোক্ত মত ও প্রদর্শন করিব।

রাজ যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শ্বাস, অঙ্গ বেদনা, কফস্রাব, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, পীনস (নাসা রোগ) কাস এবং অতি নিদ্রা এই সমুদয় লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি জন্মিবার পূর্ব্বে মনুষ্য শুক্লনেত্র, মাংস প্রিয় ও মৈথুনেচ্ছু হয় এবং কতকগুলি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে—কাক, শুক, সাজারু, ময়ূর, গৃধ্র, বানর ও কৃকলাস প্রভৃতি যেন তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। নদী সকল জলশূন্য দেখে এবং দেখিতে থাকে যেন শুষ্ক বৃক্ষসকল ঝড় বাতাসে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। মহামুনি চরক বলেন—এতাদৃশ স্বপ্ন দর্শনের হেতু ব্যাধি মহিমাও মানসিক দুষ্টি।

অংস পার্শ্বাভিতাপশ্চ সন্তাপঃ কর পাদয়োঃ।
জ্বর সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ॥

অংস ও পার্শ্বের তাপ, হস্ত পদের সন্তাপ ও সর্ব্বগত জ্বর এই কয়েকটী রাজযক্ষ্মার লক্ষণ। প্রায়শঃই এই রোগে প্রলেপক জ্বর হইতে দেখাযায়। রাজযক্ষ্মা রোগটী ত্রিদোষজ হইলেও আধিক্য অনুসারে সমুদায়ের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ দৃষ্ট হয় যথা—

স্বরভেদানিলাচ্ছূলং সংকোচশ্চাংস পার্শ্বয়োঃ।
জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ পিত্তাদ্রক্তস্য চাগমঃ॥
শিরসঃ পরিপূর্ণত্বমভক্তচ্ছন্দ এব চ।
কাসঃ কণ্ঠস্য চোদ্ধ্বংসো বিজ্ঞেয়ঃ কফকোপতঃ॥

রাজ যক্ষ্মারোগে বাতাধিক্য থাকিলে—স্বরভঙ্গ, অংস ও পার্শ্বদেশের সংকোচ ও শূলবেদনা, পিত্তাধিক্য থাকিলে—জ্বর, দাহ, অতিসার ও রক্তনিষ্ঠীবন এবং শ্লেষ্মাধিক্য থাকিলে—মস্তকের পূর্ণতা, অরুচি, কাস, কণ্ঠের উদ্ধ্বংস (গলা সুর সুর করা বা উৎকাসি) এই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

একাদশভি রেভি র্ব্বা ষড়ভির্ব্বাপি সমন্বিতম্।
জহাচ্ছোষার্দ্দিতং জন্তুমিচ্ছন্ সুবিমলং যশঃ॥

কাসাতিসার পার্শ্বার্ত্তি স্বর ভেদারুচি জ্বরৈঃ।
ত্রিভি র্ব্বা পীড়িতং লিঙ্গৈঃ কাস শ্বাসাসৃগাময়ৈঃ॥
সর্ব্বৈরর্দ্ধৈ স্ত্রিভিবর্বাপি লিঙ্গৈ র্মাংস বলক্ষয়ে।
যুক্তো বর্জ্যশ্চিকস্তস্ত সর্ব্বরূপোঽপ্যতোঽন্যথা॥

উল্লিখিত একাদশ লক্ষণাক্রান্ত কিম্বা কাস, অতিসার, পার্শ্বশূল, স্বরভেদ, অরুচি ও জ্বর এই ছয়টী লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মা রোগীকে সুবিমল-যশোলিপ্সু চিকিৎসক ত্যাগ করিবেন অর্থাৎ এবম্বিধ যক্ষ্মা আরোগ্য হয় না, সুতরাং যশোহানি অবশ্যই হয়। কাস, শ্বাস ও রক্ত নিষ্ঠীবন এই তিনটী লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগীও অসাধ্য। একাদশটী, ছয়টী কিম্বা তিনটী লক্ষণাক্রান্ত যক্ষ্মারোগীর মাংস ও বলক্ষয় হইয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাহাকে ত্যাগ করিবে, নচেৎ যে কোন লক্ষণ উপস্থিত হউক না কেন তাহার চিকিৎসা করিবে। যে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অতিসার বিদ্যমান থাকে, যে অপর্য্যাপ্ত আহার করিয়াও দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে এবং যে যক্ষ্মারোগীর মুষ্ক (অণ্ডকোষ) ও উদরে শোথের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকেও চিকিৎসা করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করা যায়না। যে রোগীর চক্ষু শুক্ল অর্থাৎ রক্তশূন্য হইয়া যায়, যে রোগীর আহারে বিদ্বেষ অর্থাৎ কিছুমাত্র রুচি থাকে না, যে রোগী উর্দ্ধশ্বাস কর্ত্তৃক নিপীড়িত এবং যে রোগীর অতি কষ্টের সহিত বহু শুক্র ক্ষরণ হয়, ইহারাও অসাধ্য মধ্যে পরিগণিত।

জ্বরানুবন্ধ রহিতং বলবন্তং ক্রিয়াসহম্।
উপক্রমেদাত্মবন্তং দীপ্তাগ্নি মকৃশং নরম্॥

রোগী যদি বলবান হয়, চিকিৎসার ক্লেশ সহনে সক্ষম হয়, যত্নবান হয়, দীপ্তাগ্নি সম্পন্ন হয় ও কৃশ না হয় এবং সর্ব্বদা জ্বর না থাকে, তবে তাহাকে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবে, ইহার তাৎপর্য্য—উক্তরূপ রোগীকে যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে ক্রূরযক্ষ্মা আরোগ্য হইতে পারে।

পরং দিন সহস্রন্তু যদি জীবতি মানবঃ।
সুভিষগ্‌ভিরুপক্রান্ত স্তরুণঃ শোষ পীড়িতঃ॥

যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তি যদি যুবা ও সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হয়, তাহা হইলেও দ্বিতীয় দিন সহস্র অর্থাৎ পীড়া উৎপন্ন হইবার পর হইতে ৫ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে কিনা সন্দেহ। এতাবতা স্থির করিতে হইবে যে, তরুণ বয়স্ক যক্ষ্মারোগী সদ্বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হইলে প্রথম সহস্রদিন অর্থাৎ ২ বৎসর ৯ মাস ১০ দিন পর্য্যন্ত নিশ্চিত জীবিত থাকিতে পারে, দ্বিতীয় দিন সহস্র পর্য্যন্ত জীবিত থাকা অনিশ্চিত।

ব্যবায় শোক বার্দ্ধক্য ব্যায়ামাধ্ব প্রশোষিতান্।
ব্রণোরঃ ক্ষত সংজ্ঞৌ চ শোষিণৌ লক্ষণৈঃ শৃণু॥

ব্যবায় (মৈথুন), শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, ব্রণ ও উরঃক্ষত এই সাতটী কারণে শোষ অর্থাৎ ক্ষয়-রোগ উপস্থিত হয়। রসাদির শোষণ করে বলিয়া ইহাকে শোষ বলা হয়। অতিশয় ব্যবায় জন্য শোষে রোগী শুক্রক্ষয় লিঙ্গ অর্থাৎ শুক্রক্ষয়ে মেঢ্র ও বৃষণে বেদনা, মৈথুনে অশক্তি, চিরকালের পর রক্ত বা শুক্রচ্যুতি প্রভৃতি উপসর্গে পীড়িত হয় এবং দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়। ব্যবায় শোষির ক্রমশঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু অর্থাৎ মেদ অস্থি প্রভৃতি ক্ষয় হইতে থাকে। শোকশোষি ব্যক্তি, যাহার জন্য শোক উপস্থিত হয়, সর্ব্বদা তাহার চিন্তা করিতে

থাকে। অঙ্গ সমস্ত শিথিল হয় এবং শুক্রক্ষয় ভিন্ন আর সমুদায় শুক্রশোষের যাবতীয় লক্ষণাক্রান্ত হয় অর্থাৎ ইহার শুক্রক্ষরণ হয় না অপর—দেহ পাণ্ডু বর্ণ ও ধাতুক্ষয় হইতে থাকে। জরাজন্য শোষ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি কৃশ, হীনবীর্য্য, দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, কম্পনশীল ও অরুচি পীড়িত হয়। ইহার স্বর ভিন্ন কাংস পাত্রের ন্যায় হয়, কাংস্যপাত্র ভাঙ্গিলে তাহাতে আঘাত করিলে যেরূপ (খন্ থন্) শব্দ হয়, সেইরূপ স্বরের বৈলক্ষণ্য ঘটে। শ্লেষ্ম নিষ্ঠীবনের জন্য যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হয় না। ইহার শরীরের গুরুতা ও মানসিক অরতি সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। মুখ নাক, ও চক্ষু দিয়া জলস্রাব হইতে থাকে, ইহার মল শুষ্ক ও দেহ রূক্ষ হয়।

অতিশয় পথ পর্য্যটন জন্য যে শোষ রোগ উপস্থিত হয়, তাহাকে অধ্বশোষ বলে। ইহাতে রোগীর অঙ্গ সমুদয় শিথিল, দেহকান্তি ভৃষ্ট (ভাঁজা) দ্রব্যের ন্যায় পরুষ অর্থাৎ স্নেহহীন, অবয়ব সকল স্পর্শ শক্তি হীন ও ক্লোম (পিপাসাস্থান) কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হইয়া যায়। অতিরিক্ত ব্যায়াম জন্য শোষে অধ্ব শোষের লক্ষণ সমুদয় বিদ্যমান থাকে, পরন্তু ক্ষত ব্যতিরেকে উরঃক্ষতের লক্ষণ সমুদয় বিদ্যমান থাকে।

ব্রণিত ব্যক্তির রক্তক্ষয়, বেদনা ও আহারযন্ত্রণা হেতু যে শোষ উপস্থিত হয়, তাহাকে ব্রণশোষ বলে। এই ব্রণ শোষ অসাধ্য রোগ।

ধনুষায়াস্যতো হত্যর্থং ভারমুদ্ বহতো গুরুং।
যুধ্যমানস্য বলিভিঃ পততো বিষমোচ্চতঃ॥
বৃষং হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং বান্যং নিগৃহ্নতঃ।
শিলা কাষ্ঠাশ্ম নির্ঘাতান্ ক্ষিপতো নিঘ্নতঃপরান্॥
অধীযানস্য বাত্যুচ্চৈ দূরং বা ব্রজতো দ্রুতম্।
মহানদীং বা তরতো হয়ৈর্বা সহ ধাবতঃ॥
সহসোৎপততো দূরং তূর্ণং চাতি প্রনৃত্যতঃ।
তথান্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্রুরৈ ভৃশ মব্যাহতস্য বা॥
বিক্ষতে বক্ষসি ব্যাধি র্বলবান্ সমুদীর্যতে।
স্ত্রীষু চাতি প্রসক্তস্য রুক্ষাল্প প্রমিতাশিনঃ॥
উরো বিরুজ্যতেঽত্যর্থং ভিদ্যতেঽথ বিভজ্যতে।

অতিশয় বল সহকারে ধনুরাকর্ষণ, গুরু ভার বহন, বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধাদি, উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাবমান বৃষ, অশ্ব ও গজোষ্ট্রাদি পশুকে দমনের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক ধারণ, শিলা কাষ্ঠাদি সবেগে নিক্ষেপ, শত্রুতাড়ন, উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, দ্রুতবেগে অথবা সুদূর পথ গমন, সন্তরণ পূর্ব্বক বৃহৎ নদাদি উত্তরণ, ধাবমান অশ্বের সহিত দ্রুত বেগে ধাবন, দূর লম্ফন এবং শীঘ্র শীঘ্র অতিশয় নৃত্য করা এই সমস্ত ও এইরূপ অন্যান্য কঠোর কর্ম্ম সম্পাদন, অতিশয় স্ত্রী সঙ্গম ও রূক্ষ এবং অল্পপরিমাণে ভোজন জন্য বক্ষঃস্থল বিক্ষত হইলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া পিত্ত ও কফকে উর্দ্ধগত করিয়া ভয়ঙ্কর উরঃক্ষত রোগ উপস্থিত করে। এই পীড়ায় বক্ষঃস্থল ভগ্ন, বিদীর্ণ বা দুইভাগে বিভক্ত বলিয়া অনুমিত হয় এবং পার্শ্ব বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। ক্রমে বীর্য্য, বল, বর্ণ, রুচি ও অগ্নির হীনতা, জ্বর, ব্যথা, মনোদৈন্য, মলভেদ ও অগ্নিনাশ হয়। কাসের সহিত পচাগন্ধ, শ্যাব বা পীতবর্ণ গ্রন্থিল রক্ত সংযুক্ত বহু কফ নির্গমণ হয়। স্ত্রীসেবনাদি দ্বারা শুক্র ও ওজঃপদার্থের ক্ষয় হয় সেজন্য উরঃ ক্ষত রোগী ক্রমশঃ অত্যন্ত ক্ষীণ হইতে থাকে।

এইপীড়ায় বক্ষঃস্থল ক্ষত হয়, সুতরাং কাসিবার সময়ে বক্ষে বেদনা ও রক্তের সহিত কফ নির্গত হয়। ঐ রক্ত মিশ্রিত কফ নির্গমণ সময়ে, রোগীর বক্ষঃস্থল জর্জ্জর বলিয়া বোধ হয়, হৃদয়ের উপরি ভাগে অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিলেও উহা জানিতে পারা যায়। স্বভাবিক অবস্থায় আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ চর্ম্ম যন্ত্রের শব্দের ন্যায় শব্দ হয়। কোন বিকৃতি ঘটিলে আর ঐরূপ শব্দ হয় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কথনই উক্তরূপ সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।

অব্যক্ত লক্ষণং তস্য পূর্ব্বরূপ মিতি স্মৃতম্।

উরঃ ক্ষত রোগ উৎপন্ন হইলে যে সমুদয় লক্ষণ উপস্থিত হয়, উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও ঐ সমুদয় লক্ষণই অল্প ব্যক্ত হইয়া থাকে। সেই অনভিব্যক্ত লক্ষণকেই উহার পূর্ব্বরূপ বলা যায়। অন্যান্য পীড়ার ন্যায় ইহার স্বতন্ত্র পূর্ব্বরূপ নাই।

উরোরুক্ শোণিত চ্ছর্দ্দিঃকাসো বৈশেষিকঃক্ষতে।
ক্ষীণে সরক্ত মূত্রত্বং পার্শ্বপৃষ্ঠ কটী গ্রহঃ॥

উরঃ ক্ষত রোগীর বক্ষোবেদনা, রক্ত বমন ও অতিশয় কাস হয়, রোগী যদি রক্ত,কফ, শুক্র ও সর্ব্ব ধাতু সার ওজঃ পদার্থের ক্ষয় হেতু ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তবে সরক্ত প্রস্রাব এবং পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিতে বেদনা উপস্থিত হয়।

অল্পলিঙ্গস্য দীপ্তাগ্নেঃ সাধ্যো বলবতো নবঃ।
পরি সম্বৎসরো যাপ্যঃ সর্ব্বলিঙ্গন্তু বর্জ্জয়েৎ॥

অল্প লক্ষণাক্রান্ত দীপাগ্নি সম্পন্ন বলবান্ ব্যক্তির অচিরোৎপন্ন উরঃক্ষত রোগ সাধ্য, বর্ষাতীত হইলে যাপ্য এবং সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্ন হইলে অসাধ্য।

আয়ুর্ব্বেদ পরিভাষা।

ভেষজ গ্রহণ সঙ্কেতঃ।

পাত্রোক্তৌ চাপি মৃৎপাত্রমুৎপলে নীলমুৎপলম্।
শকৃদ্রসে গোময়রস শ্চন্দনে রক্ত চন্দনম্॥
সিদ্ধার্থঃ সর্ষপে গ্রাহ্যো লবণে সৈন্ধবং মতম্।
মূত্রে গোমূত্র মাদেয় বিশেষো যত্র নেরিতঃ॥
পয়ঃ সর্পিঃ প্রয়োগেষু গব্যমেব প্রশস্যতে।
স্ত্রির শ্চতুস্পদে গ্রাহ্যাঃ পুমাংসো বিহগেষু চ॥
জাঙ্গলানাং বয়স্থানাং চর্ম্মরোমনখাদিকম্।
হিত্বা গ্রাহ্যং পৃতমাংসং সাস্থিকং খণ্ডশঃ কৃতম্॥
পক্তব্যমাজ মাংসঞ্চ বিধিনা ঘৃত তৈলয়োঃ।
হিত্বা স্ত্রীং পুরুষঞ্চাপি ক্লীবং তত্রাপি দাপয়েৎ।
শৃগাল বর্হিণোঃপাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ।
ময়ূরী জম্বুকী ছাগী বীর্য্যহীনা স্বভাবতঃ॥
কাশীবাজ মতেনৈব ছাগ এব নপুংসকঃ।
অভাবাদপ্রতীক্ষাদ্বা বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশতঃ।
বন্ধ্যা ছাগী বিপক্তব্যা নতু শাস্ত্রমতং চরেৎ॥
স্ত্রীণাং তীক্ষ্ণং গবাং মূত্রং নতু পুংসাং বিধীয়তে।
পিত্তাত্মিকাঃ স্ত্রিয়ো যস্মাৎ সে ম্যাস্ত পুরুষা মতাঃ
ক্ষীর মূত্রপুরীষাণি জীর্ণাহারে তু সংহরেৎ।

সামান্যতঃ অর্থাৎ বিশেষ নাম করিয়া উল্লেখ না থাকিলে, পাত্র শব্দে মৃৎপাত্র, উৎপল শব্দে নীলোৎপল, পুরীষ শব্দে গোময় রস, চন্দন শব্দে রক্তচন্দন, সর্ষপ শব্দে শ্বেতসর্ষপ এবং লবণ শব্দে সৈন্ধব লবণ বুঝিতে হইবে। চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে স্ত্রীজাতি এবং পক্ষীর মধ্যে পুরুষজাতি গ্রহণীয়। জাঙ্গল পশুর মধ্যে যুবা গ্রহণীয়, উহাদের চর্ম্ম, রোম এবং নখাদি পরিত্যাগ করিয়া অস্থির সহিত খণ্ড খণ্ড কৃত মাংস গ্রহণ করিতে হইবে। ছাগের মধ্যে নপুংসক, অভাবে বন্ধ্যা ছাগী গ্রহণীয়। শৃগাল ও ময়ুর জাতির মাংস উল্লিখিত থাকিলে, পুরুষজাতির মাংস লইতে হইবে,কারণ ময়ূরী, শৃগালী ও ছাগী

ইহারা স্বভাবতঃ বীর্য্যহীনা। গোমূত্রাদি লইতে হইলে, ইহাদিগের আহার পরিপাক হইলে গ্রহণ করা বিধেয়।

অন্যচ্চ—

লবণং সৈন্ধবং প্রোক্তং চন্দনং রক্ত চন্দনম্।
চূর্ণলেহাসবস্নেহাঃ সাধ্যা ধবল চন্দনৈঃ ॥
কষায় লেপয়োঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনম্।
পয়ঃসর্পিঃ প্রয়োগেষু গবমেব হি গৃহ্যতে ॥
শকৃদ্রসো গোময়কো মূত্রং গোমূত্র মুচ্যতে।

লবণ শব্দে সৈন্ধব লবণ, চন্দন শব্দে রক্তচন্দন, চূর্ণ, অবলেহ, আসব ও স্নেহপাক কার্য্যে শ্বেতচন্দন গ্রাহ্য এবং কষায় ও প্রলেপ কার্য্যে রক্তচন্দন প্রযোজ্য। দুগ্ধ ও ঘৃত গব্য এবং শকৃৎ-(বিষ্ঠা) রস ও মূত্র শব্দেও গব্য বুঝিতে হইবে।

সারঃ স্যাৎ খদিরাদীনাং নিম্বাদীনান্তু বল্কলম্।
ফলঞ্চ দাড়িমাদীনাং পটোলাদে শ্ছদস্তথা ॥
ন্যগ্রোধাদেস্ত্বচো গ্রাহ্যাঃ সারঃ স্যাদ্ বীজকাদিতঃ।
তালীশাদেশ্চ পত্রাণি ফলং স্যাত্রিফলাদিতঃ ॥
মহান্তি যানি মূলানি কাষ্ঠ গর্ভাণি যানিচ।
তেষাঞ্চ বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানি কৃৎস্নশঃ ॥

বিশেষ উক্তি না থাকিলে খদিরাদি বৃক্ষের সার, নিম্বাদির বল্কল, দাড়িমাদির ফল, ও ত্রিফলাদির ফল গ্রহণীয়। যে সমুদয় মূলের মধ্যে কাষ্ঠ আছে ও মূল বৃহৎ, তাহার ত্বক্ গ্রাহ্য এবং ক্ষুদ্র মূল সমস্তের সর্ব্বাংশই গ্রহণ করিতে হইবে।

মূলানি শিশিরে গ্রীষ্মে পত্রং বর্ষা বসন্তয়োঃ।
ত্বক্‌কন্দৌ শরদি ক্ষীরং যথর্ত্তু কুসুমং ফলম্ ॥
হেমন্তে সার মোষধ্যা গৃহ্ণীয়াৎ কুশলো ভিষক্।

শীত ও গ্রীষ্মকালে বৃক্ষের মূল, বর্ষা ও বসন্তে পত্র, শরৎকালে ত্বক্, কন্দ ও ক্ষীর এবং হেমন্তে সার গ্রহণ করা উচিত। ফল পুষ্পাদি যে ঋতুতে জন্মে সেই ঋতুতে গ্রহণ করিবে।

শরদ্যখিল কর্ম্মার্থং গ্রাহ্যং সরসমৌষধম্।
বিরেক বমনার্থঞ্চ বসন্তান্তে সমাহরেৎ ॥

সমস্ত কার্য্যের জন্য শরৎকালে সরস ঔষধ সমস্ত গ্রহণ করিবে। বিরেচন ও বমনার্থ প্রয়োগ জন্য বসন্তের অবসানে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

দ্রবেঽপ্যনুক্তে জল মেব দেয়ম্।
ভাগেঽপ্যনুক্তে সমতা বিধেয়া।
অঙ্গেঽপ্যনুক্তে বিহিতস্তু মূলম্,
কালেঽপ্যনুক্তে দিবসস্য পূর্ব্বম্ ॥

দ্রবপদার্থের অনুক্তিতে জল, ভাগের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে সমভাগ, উদ্ভিদ অঙ্গের অনুক্তিতে মূল এবং কালের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে প্রাতঃকাল বুঝিতে হইবে।

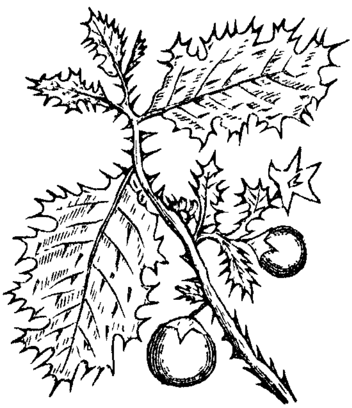
শুষ্কং নবীনং যদ্দ্রব্যং যোজ্যং সকল কর্ম্মসু।
আর্দ্রন্তু দ্বিগুণং দদ্যা দেষ সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ ॥
দ্রব্যাণ্যভিনবান্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ।
ঋতে গুড় ঘৃত ক্ষৌদ্র ধান্য কৃষ্ণা বিড়ঙ্গতঃ ॥

নূতন দ্রব্য শুষ্ক করিয়া প্রয়োগ করা বিহিত। আর্দ্র হইলে দ্বিগুণ দিতে হয়। গুড়, ঘৃত, মধু, ধান্য, পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ পুরাতন হইলেই বিশেষ ফলদায়ক হয়, অন্য সমস্তই নূতন গ্রহণ করা উচিত।

ব্যাধে রযুক্তং যদ্ দ্রব্যং গণোক্তমপি তৎত্যজেৎ।
অনুক্তমপি যদ্যুক্তং যোজয়েৎ তত্র তদ্ বুধঃ ॥

গণোক্ত দ্রব্য সমূহের মধ্যে কোন দ্রব্য যদি ব্যাধি বা রোগীর পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করা যায়, আর যদি কোন দ্রব্য গণে উক্ত নাই, অথচ সেই রোগ বা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া

বিবেচিত হয়, তবে উহা গ্রহণ করা যাইতে পারে, যথা জ্বরাধিকারোক্ত কোন কাথে হরিতকী বা অপর কোন বিরেচক পদার্থ আছে কিন্তু রোগীর বিরেচনের প্রয়োজন নাই, কোন পাচক ঔষধের প্রয়োজন, তখন হরিতকীর পরিবর্ত্তে মুতা কিম্বা কোন পাচক ঔষধ ব্যবহার করা সঙ্গত। চিকিৎসকের সর্ব্বত্রই এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টির প্রয়োজন।



কণ্টকারী।

কণ্টকারী তু দুস্পর্শা ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা।
কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথা ॥
শ্বেতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষণা ক্ষেত্রদূতিকা।
গর্ভদা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করী ॥
কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস শ্বাস জ্বর কফানিলান্ ॥
নিহন্তি পীনসং শ্বাস পার্শ্ব পীড়া হৃদাময়ান্।
তয়োঃ ফলং কটুরসং পাকে চ কটুকং ভবেৎ ॥
শুক্রস্য রেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাগ্নিকৃল্লঘু।
হন্যাৎ কফ মরুৎ কণ্ডু কাস ভেদ ক্রিমি জ্বরান্ ॥
তদ্বৎ প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাদ্‌গর্ভকারিণী।

কণ্টকারী, দুস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী ও বৃহতী কণ্টকারীর পর্য্যায়। বৃহতী ও কণ্টকারী উভয়কেই বৃহতী বলা হয়। সুশ্রুত বলেন—

ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্র ভণ্টাক্যাং বৃহতীতি নিগদ্যতে।

অন্যান্য গ্রন্থেও দেখা যায় যথা—বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরৈরিত্যাদি—বৃহতীদ্বয় শব্দে পঞ্চমূল ও দশমূলাদি পাচনে বৃহতী এবং কণ্টকারী দুইটী গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

শ্বেতকণ্টকারীর পর্য্যায়—চন্দ্রহাস, লক্ষণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী।

গুণ—কণ্টকারী সর, তিক্ত, কটু, দীপন, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ ও পাচক।

কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ ও বায়ুর প্রকোপ, পীনস, শ্বাস, পার্শ্বপীড়া ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি নিবারণ করে।

কণ্টকারীর ফল আস্বাদে ও পাকে কটু, শুক্ররেচক, তিক্ত, পিত্তজনক, অগ্নিবর্দ্ধ, লঘু ও কফ বায়ুনাশক। এই ফল কণ্ডূ, কাস, ক্রিমি ও জ্বরাদি নিবারণ করে। কণ্টকারীর মূল গ্রাহ্য, প্রচলিত প্রথা মতে অধুনা সর্ব্বাংশই গৃহীত হইয়া থাকে। এক মাষা করিয়া ইহাদের মাত্রা।

গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকমহাশয়দিগের জন্য।

প্রথম বৎসর শেষ হইতে চলিল, দ্বিতীয় বর্ষ আগত প্রায়, ২য় বর্ষে আমরা আবার নূতন উৎসাহে নব উদ্যমে আমাদের এই পত্রিকাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় পরিণত করিবার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান করিতেছি। আমাদের আড়ম্বর নাই আস্ফালন নাই ধীরে ধীরে উদ্দেশ্য ভূমির দিকে অগ্রসর হওয়াই আমাদের অভিপ্রায়, সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে আমরা অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইব না, যত্নেরও ত্রুটী রাখিব না।

মনুষ্য মাত্রই আশার দাস। আশার ফলনে মনে যেরূপ অভূত-পূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয় পক্ষান্তরে হতাশে সেইরূপ মনোকষ্ট জন্মিয়া থাকে, এটী প্রকৃতির অলক্ষ্য নিয়ম; আশা করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিলাম, পরিপাটী করিলাম, যত্নের সহিত সুবীজ বপন করতঃ জল সিঞ্চন করিলাম আশা বৃক্ষ অঙ্কুরিত, পল্লবিত ক্রমে মুকুলিত হইল, এমন সময়ে প্রবল বাত্যা আসিয়া আশাবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিলে ক্ষোভের আর সীমা থাকে না।

আমরা বড় আশা করিয়াই এই পত্রিকা খানির প্রচার আরম্ভ করিয়াছি, শুভ যাহার উদ্দেশ্য ঈশ্বর তাহার সহায়, এই কারণে আমাদের ভরসা আছে যে মঙ্গলময়ের কৃপায় আমরা কখনই বিফল মনোরথ হইব না। এই প্রথম বৎসরে শত শত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া সমারণ ধীরে ধীরে সকল গৃহেই প্রবেশ লাভে সমর্থ হইয়াছে। প্রথম বর্ষে সাধারণের যেরূপ আগ্রহ দেখিলাম দ্বিতায় বর্ষে যে ইহার অধিকতর উন্নতি হইবে তদ্বিষয়ে আমরা এক প্রকার স্থির নিশ্চয় করিয়া আছি। তবে একগাছি তৃণের শক্তিতে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, কিন্তু তৃণ সমষ্টিতে মত্ত হস্তীকেও আয়ত্ব করা যায়, সেই কারণে আমরা আমাদিগের গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠক মহোদয়গণের অনুগ্রহ প্রার্থী। সমবেত চেষ্টার ফল কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। যাঁহারা ১ম বর্ষের মূল্য এখনও দেন নাই বোধ হয় কাগজ বাহির হইবে কি না এ ওজর আর না দেখাইয়া এক্ষণে আপনাপন দেয় প্রদানে আমাদিগকে অপ্যায়িত করিবেন। কিমধিকমিতি।

সম্পাদক।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

১ম খণ্ড। } সম্পাদক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। { দ্বাদশ সংখ্যা।

প্রাইভেট টিউটরের দুঃস্বপ্ন।

একটা বড় বাড়ীর দোতলায় বড় হল। বাড়ী বাঙ্গালীর বটে, কিন্তু সাজান ইংরাজী ধরণে। আসবাবের সব কথার উল্লেখ করিতে গেলে মেকেঞ্জিলায়ালের একস্‌চেঞ্জের ক্যাটালাগ তৈয়ারি করিতে হয়। কিন্তু যখন প্রথমেই ঘরের কথা তুলিয়াছি, তখন সে সম্বন্ধে দু চারিটা কথা না বলিলেও দোষ হয়। ঘরের মেজে ম্যাটিং করা। ঘরের লম্বাভাগের দুইদিকের প্রতি ভিতের কোলে মার্ব্বেল পাতর ঢাকা মেজ; তাহার উপর গোল বাদামে কাচাবরণের ভিতর প্যারিয়ন মূর্ত্তি; কেহ জেসন, কেহ ইউনা, কেহ ভিনস্‌, কেহ এডনিস। মূর্ত্তিদের কিছু উর্দ্ধে দেয়ালের গায়ে বহুমূল্য ফ্রেমে আঁটা অএলপেণ্টিং—সবগুলাই বিলাতি দৃশ্য। কোনটা ইয়র্কসায়ারের বৃক্ষলতাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর বহুল ক্ষুদ্র গ্রামের ছবি—গোচারণের মাঠের উপর সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে—টুপি মাথায় কোটপ্যাণ্টুলেন, আঁটা বিলাতি রাখাল ভেড়ার দল লইয়া ঘরে ফিরিতেছে—সঙ্গে বড় একটা কুকুর। মাঠের পাশে আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য রাস্তা, তার উপর শস্য বোঝাই মোটা মোটা চাকাবিশিষ্ট এক-খানা গাড়ী; ঝুলি সাজ আঁটা, খুরের উপর বড় বড় লোমযুক্ত, গোদা গোদা পা, দুটা বিলাতি ঘোড়া কষ্টে তাহা টানিতেছে—পথের ধারের একখানা কুটীরের দ্বারে মোড়ার উপর, মাথাকানঢাকা টুপি পরা, চস্‌মা চোকে, গাউন আঁটা, তোবড়া-মুখী বুড়া ঠাকুরমা; তার হাঁটুর পাশে বাঙ্গামুখ, গালফুলা, হাঁদা হাঁদা দুইনাতি হাঁ করিয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে—কোন খানা সুইজার্লাণ্ডের হ্রদের ছবি—নীলজল, চারি পাশে পাহাড়, কাছের পাহাড় কাল—দূরের ঘন নীল—আরও দূরের ধূসর। পাহাড়ের কোলে বড় ছোট ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথর, তাহার উপর দিয়া একটা ছোট স্রোত সাদা

ফেন উদ্গার করিতে করিতে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে—পাহাড়ের একটা অন্ধকার বড় ফাটলের ভিতর হইতে একটা কাল, দীর্ঘকায় পার্ব্বত্য বৃক্ষ মাথা তুলিয়া, লম্বা লম্বা অসংখ্য বাহু ছড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারই পাশে, কোথাও একটা ফাটলের কাছে, কোথা বা দুচার খানা বড় পাথরের গায়ে সবুজ বিছানার উপর শুইয়া খুদে খুদে রক্তমুখী ফুলেরা ঐ গাছটার সেই অতি গম্ভীর, অন্ধকার মুখ খানা দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইতেছে—খুব দূরে একটা উচু পাহাড়ের মাথার উপর একটা কাসেল—পৃথিবী হইতে কত উচ্চে,—মেঘলোকের কোলে—দূরত্ব হেতু অস্পষ্ট—অস্পষ্ট বলিয়াই অত সুন্দর ও তাহার বিশেষত্ব। সেটার দিকে চাহিলে যেন কোন নির্ব্বাসিত রাজপুত্রের কথা—শুধু একটা চিরজীবনব্যাপী নিঃসঙ্গ প্রবাস—একটা দীর্ঘ বিরহের কথা আপনি মনে পড়িয়া যায়—ছবি হইতে সেইটুকু মুছিয়া দিলে অত বড় ছবি খানার অর্দ্ধেক প্রাণ চলিয়া যায়। আর কোনখানা সমুদ্র বেলা—সমুদ্র তটের উপর ভাঙ্গা নৌকা, পিপা, দড়ী, নোঙ্গর, একখানা নোকা উল্টান রহিয়াছে; কতকটা জলে কতকটা ডাঙ্গায়। তাহার পিঠের উপর বসিয়া চাকামুখ, নীলচোক, বুরুসের মত দাড়ী, মোটামোটা হাড়, মোটামোটা শিরা-যুক্ত হাত পা বিশিষ্ট, মস্ত একটা টুপি মাথায় একজন বিলাতী জেলে জলে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে। নৌকার পাশে মাছের ঝুড়ি। কাছেই একটা পিপা ঠেসান দিয়া ঐ রকম চেহারা আর একজন বসিয়া খুব গম্ভীরভাবে চুরট টানিতেছে—চুরটের ধুম কুণ্ডলাকৃত হইয়া উঠিতেছে—দূরে একটা ডকের কোলে দলবদ্ধ কতকগুলা জাহাজ—আর—আরও দূরে যেখানে আকাশের নীলিমা শ্রান্ত হইয়া সমুদ্রের বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—একটা লাইট-হাউস; সেই অনন্ত নীলিমার কোলে প্রস্তর আসন বিছাইয়া, তাহার উপর স্থির, অটল, নিঃসঙ্গ, আত্মসমাহিত ভাবে দাঁড়াইয়া, কোন যুগান্তের পর অভিশাপ অবসানে কাহার মিলনের আশায় চির-দিন দিগন্তের পানে চাহিয়া আছে।

ঘরের অন্য আসবাবের মধ্যে শেষ প্রান্তের দেয়ালে একখানা প্রকাণ্ড আরসি, তাহার ভিতর প্রতিবিম্বে ঘরটা দ্বিগুণ বলিয়া বোধ হইতেছে। আরসির কোলে একটা প্রকাণ্ড মেহগনি সেফ্‌নার—একখানা প্রকাণ্ড শ্বেত মার্ব্বেল পাতর ঢাকা। তাহার উপর কাচাবরণের ভিতর একটী বহুমূল্য ছোট ঘড়ী। ঘরের মাঝখানে একটা বড় সেক্রেটেরিয়েট টেবিল—পাশে একটা হোয়াট্‌নট, তাহার উপর কতক-গুলা চকচকে সোনালি কাজ করা বিলাতি বই। টেবিলের আশেপাশে অনেকগুলা, নানামূর্ত্তি চেয়ার। তাহা-দেরই ভিতর স্প্রিং-মোড়া একখানার উপর বসিয়া কাল, চসমাচোখে, সমুখের-দাঁত-উচু নেপাল।

মনে পড়ে—একবার একজন আধা-বাঙ্গালী, আধা-ফিরিঙ্গি গোছ ক্রিশ্চান বাঙ্গালায় বক্তৃতা দিবার সময় বলিয়া-ছিল,—"অনন্তর সেই পথিক, আতপ-তাপে তাপিত, পথশ্রান্ত, ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া দ্রুতপদে এক কুঁড়ের ভিতরি

ঢোকলো"। সে বেচারী শুধু ভাষার উপর অত্যাচার করিয়া সে দিন যে অপরাধ করিয়াছিল, আজ আমার অপরাধ তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক। আমি ঠিক বুঝি যে, আসবাব-সমেত ঘরের এতখানি বিস্তৃত বর্ণনার পর আমার লেখা উচিত ছিল,—"একখানা বড় স্প্রিংকৌচের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কন্দর্পনিন্দিতকান্তি এক সুপুরুষ যুবা—হাতে একখানা অর্দ্ধমুক্ত পত্র, বোধ হয় রমণীর লেখা।" তাহা হইলে সব দিক বজায় থাকিত—এবং সেই ক্ষুদ্র চিঠী-বীজের উপর যত্নে কিঞ্চিৎ কল্পনাবারি ঢালিতে পারিলে, চাই কি ভবিষ্যতে উহা একটা প্রকাণ্ড ট্রাজিডী বটবৃক্ষে পরিণত হইতে পারিত। বুঝি সব, কিন্তু আমি নাচার। কারণ গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর নিবাসী, যে কৃষ্ণকায় দন্তুর নেপালচন্দ্রের ৩২।১—ঘোষের লেনের ছাত্রাবাসে হাল সাকিম, তাহাকে আজ একজন ধনীর সুসজ্জিত গৃহে গদিমোড়া চেয়ারে বসিতে দেখিয়া সাহিত্যের কোন্ নিয়মে রমেন্দ্রনাথ বা ত্রিদিবেন্দ্র বলিয়া ডাকি, এবং সুপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করি। তবে যে পাঠক একেবারে দমিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ভরসা দিবার জন্য বলি, নেপাল এ বাড়ীর প্রাইভেট টিউটর। প্রাইভেট টিউটর নেপাল হইলে তত দোষ হয় না; কেমন!

নেপাল এবার বি্ এল পরীক্ষা দিবে। উপরে যে বাসার কথা বলিয়াছি, সেই থানেই অবস্থিতি। সকালে ল-ক্লাসে যায়—দুপুরে ল'বই পড়ে—সন্ধ্যার সময় এই বাড়ীতে পড়াইতে আসে। মাসিক বেতন ২০৲ টাকা। দেশে বিধবা মা, বুড়া জেঠা, জেঠাই, তাঁদের দুটী ছেলে। আজ কিছু অধিক তিন বছর বিবাহ হইয়াছে। গত মাঘমাসে বারাসতের নিকট বাদু গ্রামে পিত্রালয় হইতে একটী দুই মাসের শিশু লইয়া পত্নীও শাশুড়ীর কাছে গিয়াছেন। পূর্ব্বে নেপাল মাসে একবার বাড়ী যাইত,—পরীক্ষা কাছে হইলেও মাঘ মাসের পর হইতে নেপাল দুবার বাড়ী যায়। দেশে কিছু জমী ও কয় ঘর প্রজা আছে। জ্যেঠার বড় ছেলেটী তাই দেখে শুনে। যে আয় হয়, নেপাল তাহার উপর মাসে ৮৲ টাকা করিয়া পাঠায়;—মোটা ভাত কাপড়ে এক-রকমে দিন চলিয়া যায়।

যে নেপালের ছাত্র, সে বড় লোকের পৌত্র। একটা মস্ত বিষয়ের অর্দ্ধেক উত্তরাধিকারী। নাম প্রমথনাথ—বয়স সতর। ইস্কুলের শিক্ষার অনেক দোষ, এইরূপ বুঝিয়া, অনেক দিন ইস্কুলের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে। ঠাকুরদাদার তাহাতে সম্পূর্ণ মত না থাকিলেও—দায়ে পড়িয়া তখন তাঁহাকে নীরব থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে যখন এক দিন দেখিলেন, যেখানে আগে স্কুলের বই সাজান থাকিত, সেখানে একটা ছোট সেতার আড় হইয়া পড়িয়া আছে, আর তাহার পায়ের কাছে এক-জোড়া বাঁয়া তবলা দুটীতে চুপ করিয়া মুখোমুখী হইয়া বসিয়া আছে—এবং যে ঘর হইতে, পূর্ব্বে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক,—উচ্চারিত "Asia is bounded on the north by the Arctic ocean" কিম্বা "because the side B. D. is equal to the side

A. C therefore the angle" ইত্যাদি ইত্যাদি কিম্বা সুরযোগে উচ্চারিত "Forbear my son, the hermit cried, to tempt the dangerous gloom" ইত্যাদি শব্দ মধ্যে মধ্যে তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌছিত, সেই ঘর হইতে অনবরত "কধেটে নেটেতা, গধিনা ধিনতা" এবং ডা ডেরে, ডারে ডারে" শব্দ উত্থিত হইতেছে, তখন তিনি সেটাকে একটা বিশেষ দুর্লক্ষণ মনে করিলেন। তিনি ভাবিলেন, ভায়ার এখন পড়াশুনা হউক না হউক, কোন রূপে যদি লেখাপড়ায় একটু প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে উপকার হইতে পারে। কিন্তু সেটা যে সহজসাধ্য নয়, তাহাও বুঝিলেন। আপাততঃ শুধু একজনের প্রয়োজন, যে তাহাকে বায়া তবলা সেতার হইতে দূরে, বৈঠকখানায় কালি কলম, বইএর কাছে খানিকক্ষণ ভুলাইয়া আবদ্ধ রাখিতে পারে। তখনি ঐরূপ একজন পাহারাওয়ালা প্রাইভেট টিউটরের খোঁজ পড়িল। বাটীর সদর-নায়েব শ্রীকান্তের কৃষ্ণনগরে বাড়ী—নেপালের প্রতিবেশী। ঐ সময়ে তাহার নেপালের নামটা মনে পড়িয়া গেল—খোঁজ করিয়া নেপালের বাসায় গিয়া দেখা করিল। নেপাল ভাবিল, মন্দ নহে—ক্ষতি কি, কুড়ীটা টাকা। সেই অবধি নেপালের প্রাইভেট টিউটর ভাবে এই বাড়ীতে যাওয়া আসা।

প্রথম প্রথম নেপাল ভাবিল, যাহাতে আমার কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটী না হয় এইরূপ করিব। দেখি, কতদূর পারি। এইরূপ বুঝিয়া একদিন নেপাল গায়ে জীনের কোট আঁটিয়া, লাংক্লথের চাদর গায়ে দিয়া একখানা "Herbert Spencer on Education" লইয়া হাজির হইল। এক কোর্স লেকচার দিবার ইচ্ছা। যখন ছাত্র কাছে আসিয়া বসিল, তখন নেপাল গম্ভীর ভাবে চসমা চোকে দিয়া আরম্ভ করিল "প্রথম! বোধ হয় তুমি এই বইয়ের অথরের নাম শুনেছ? ইনি বিলাতের, বিলাত কেন সমস্ত ইয়ুরোপের ভিতর যে সকল বড় বড় চিন্তাশীল লেখক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন। ছাত্র বইখানা একবার হাতে করিয়া লইল—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া তাহার মলাটখানা দেখিল—একবার ভিতরের পাতা খুলিল, দেখিল ছবি আছে কি না, শেষ—ফিরাইয়া দিয়া বলিল "হ্যাঁ মাষ্টার মহাশয়! ইনি কি যে স্পেন্সার সাহেব বেলুনে উঠেছিলেন, তাঁর ভাই?"

নে। (গম্ভীর ভাবে) হ'তে পারে, তাঁর সঙ্গে কোন দূর family relation থাকিতে পারে। কিন্তু আমি সে কথা বলচি না।

প্র। আপনি Sir বলচেন ইনি বড় লোক। এঁর বই কি করিন্থিয়ান থিয়েটারে act হয়! তা হলে একদিন দেখে আসি।

নে। এখানা নাটক নয়। শিক্ষা সম্বন্ধে স্পেন্সার সাহেব যাহা বুঝিয়াছিলেন ও চিন্তা করিয়াছিলেন—ইহা সেই চিন্তার ফল।

প্র। (বাধা দিয়া) আপনি ইংলিশ থিয়েটারে কখন গিয়াছেন। ওঃ! আজ—শনিবার, আজ East Lynne play হবে। চলুন আপনাকে নিয়ে যাই। নেপেনও যাবে বলেছে।

নেপালচন্দ্র হতাশ হইয়া সেদিন ফিরিলেন।

কিন্তু শীঘ্র নেপাল আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। তাহার পর হইতে ছাত্রের সহিত ব্যবহারেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইল। দুই তিন মাসের ভিতরই নেপাল, ছাত্রের থিয়েটারে, সার্কাসে, টেনিসপার্টিতে এবং বৈকালে Eaden Garden এ বেড়াইবার সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরদাদা ভাবিতেন "ভয় নাই—বি এ পাশ, শিক্ষিত মাষ্টার সঙ্গে থাকে—ও গুলা আধুনিক শিক্ষার একটা অঙ্গ"। নেপালের বাসার সঙ্গীরা দেখিল নেপাল বদলাইতেছে।

ইদানী পড়া শুনার ভাব এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। এক দিন হয়ত ছাত্র খেয়ালের মুখে বলিল "মাষ্টার মহাশয়! Shakspeare কি বড় শক্ত? বুঝা যায় না?

নে। কিছু না! তোমার যেরূপ বুদ্ধি—একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পার।

তার পরদিন বিকালে ইডুন্‌গার্ডনে যাইবার সময় Thacker এর দোকান হইতে একসেট Shakespeare কেনা হইল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তবে যেদিন কোন বিলাতী থিয়েটরে উহাদের মধ্যে কোন নাটকের অভিনয় হইত, সেই দিন দুপুরবেলা বইখানা আলমারি হইতে পাড়া হইত। নেপাল রিডিং পড়িত—ছাত্র চেয়ারে হেলান দিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে মাথা নাড়িয়া বলিত "হুঁ হুঁ"। সব সময়েই ঐ ভাব। তবে নেপালের কুড়ী টাকা ঠিক সময়ে আসিয়া পকেটে পৌঁছিত। ঠাকুরদাদা ভাবিতেন "বাঃ, মাষ্টারের গুণ আছে। প্রায় এক আল্‌মারি নূতন বই কেনা হইয়াছে।"

আজ Tennyson এর Locksley Hall. পড়া হইবে। মাষ্টারের মুখে ছাত্র শুনিয়াছে Tennyson বিলাতের বড় কবি—রাজকবি। আর Locksley Hall একটা "Famous Piece." দুইখানা বই খোলাহইয়াছে। একখানা ছাত্রের কাছে—আর একখানা নেপালের হাতে। ইতিপূর্ব্বে আধখানা সিগার ও গোটা-পঁচিশেক "হুঁ"র সঙ্গে প্রথম আট লাইন শেষ হইয়া গিয়াছে। নেপাল পড়িতেছে ;—

"Many a night I saw the Pleiads rising through the mellow shade"

ছাত্র সিগার মুখে তুলিয়া, ধূম টানিতে টানিতে, মুখের পাশ দিয়া বলিল "Pleiads কি Sir"

নে। বাঙ্গালায় যাহাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে।

ছা। সে কি?

নে। কতকগুলা নক্ষত্র।

ছা। আচ্ছা মহাশয়! ঋষিরা কি মরিয়া আকাশে নক্ষত্র হয়। তাহা হইলে আকাশটাত একটা প্রকাণ্ড নৈমিষারণ্য। কেমন—মাষ্টার মহাশয়, কথাটা কেমন লাগল?

নে। (জোর করিয়া হাসিয়া) অতি পরিষ্কার। তোমার Mother wit আছে।

ছাত্র খুসী হইল। বলিল "চলুন আজ Rankeen এর বাড়ী এক ডজন সার্টএর ফরমাস দিয়া আসি। আপনিও সঙ্গে সঙ্গে গায়ের মাপটা দিবেন। ফিরিবার

মুখে গ্রেটইষ্টার্ণ হ'য়ে আসব।" তখনি টম টম তৈয়ার হইল। যেথানের বই সেই থানেই খোলা পড়িয়া রহিল।

কুড়ী টাকা মাহিয়ানা ছাড়া আজ-কাল ঐটুকু নেপালের উপরি লাভ। তবে কিছু লোকসানও ছিল।

বিবাহের পর, পূজার সময় নেপালের শ্বশুর একবার ভাল বার্ণিস ৬।৭ টাকা দামের একজোড়া জুতা দিয়াছিলেন। আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া নেপাল লজ্জায় সে জুতা পায়ে দিতে পারে নাই। তবে শুনিয়াছি রাত্রিতে বাসার লোক ঘুমাইলে কোন কোন দিন উহা পায়ে দিয়া চুপি চুপি ছাতের উপর বেড়াইত। কিন্তু এই ৪।৫ মাসের ভিতর নেপালের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জিনের কোট ছাড়িয়াছে—প্রথমে আদ্দির সার্ট, ক্রমে ওয়েষ্টকোর্ট, কলার—শেষে নেক্টাই, মাথায় টেনিসক্যাপ। লজ্জা একবার ভাঙ্গিলে আর কতক্ষণ। আট মাস পূর্ব্বে দর্জ্জি টিপু যে ছাতির লৌহকঙ্কালের উপর নূতন কাপড়ের ছাউনী বসাইয়া অনেক কষ্টে ৫।৭ দিন হাঁটিবার পর বাদসাদ দিয়া পাঁচআনা তিনপাই আদায় করিয়াছিল, এখন বাসায় পাচক উড়ে কুণ্ডুরি তাহা মাথায় দেয়। নেপালের হাতে ৬৷৷০ টাকার সিল্কের ছাতি। বাসার তক্তপোষের স্থানে খাট আসিয়াছে—কাপড়ের তোরঙ্গ ঝি লইয়াছে—সেখানে বসিয়াছে আরসিওয়ালা ফ্যান্সি দেরাজ। একদিন-সেও বেশী দিনের কথা নয়—নেপালের বোধ হইয়াছিল এসব অর্থ-সাপেক্ষ আড়ম্বর খুব অনাবশ্যক—দরিদ্র সন্তানের পক্ষে পাগলামী। এখন নেপা-লের বোধ হয় এ সকল না হইলে সংসার চলে না। ইহার উপর নেপাল একটা ক্লবের মেম্বর হইয়াছে। সেখানে মাসে মাসে টাকা দিলে খবরের কাগজ পড়া যায়, লেমনেড, বরফ ও চুরুট পাওয়া যায়, বিলিয়ার্ড খেলিতে পাওয়া যায়, আর ২।৪ মাস অন্তর River trip এ নিমন্ত্রণ হয়। কিন্তু এ সকলে পয়সা চাই—কুড়ী টাকা মাহিয়ানার ভিতর বাসার খরচ চালাইয়া ও বাড়ীতে আট টাকা পাঠাইয়া বজায় রাখা অসম্ভব। নেপালের কিছু দেনা হইল।

যখন এতদূর হইল তখন হোটেল ভোজনে আর বিশেষ আপত্তি রহিল না। কিন্তু সে খরচ প্রায় সকল সময়েই ছাত্র বহন কবিত। ২।৩ মাসের ভিতর নেপাল কাঁটা চাম্‌চে সড় গড় করিয়া লইল। বছরের শেষে নেপালের বোধ হইল স্ত্রীর রং টা আর একটু ফর্সা হইলে ও সে আর একটু লেখা পড়া জানিলে ভাল হইত।

*   *   *

একদিন শীত রাত্রে প্রকাণ্ড বনাতের অলষ্টার গায়ে দিয়া, বুট আটিয়া, টেনিস-ক্যাপ মাথায় দিয়া * * হোটেলের গ্যাসা-লোকিত একটা কামরায় বসিয়া গরম-কটলেট খাইতে খাইতে নেপালের মনে হইল "বা! কি সুখ, কি সম্ভ্রম! কোথায় গোয়াড়ির পাড়াগেঁয়ে বাড়ী—ঘরের কোণে পিলসুজের উপর মিট মিট করিয়া প্রদীপ জলিতেছে—আর কোলের কাছে থালা টানিয়া লইয়া মুগের ডাল দিয়া ভাত সাপ্টান। হয়ত ছেলেটা দুধ খাইবে না, কান্না ধরিয়াছে—আর রাঙ্গা কস্তাপেড়ে কাপড় জড়ান

স্ত্রী তাকে কোলে ফেলিয়া হাঁটু দোলাই-তেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক দিয়া দুধের বাটীতে ঠং ঠং আর মুখে "আয়রে ও আয়রে" শব্দ করিতেছে—ছি! ছি!! —আর আজ কোথায়। এযে কিন্নরের দেশ—একজন শিক্ষিত এন্‌লাইটেণ্ড গ্র্যাডুয়েটের haunt হবার উপযুক্ত স্থান। টেবিলের কাছে ব্লু কর্সেট পরিয়া ও কে? নাম শুনিলাম Miss Allen মরি মরি! কি রূপ She can well sit for Hebe. বা! কি bland and graceful smile—good Havens! কোন ভাগ্যবান পুরুষের—যাক কাজ নাই।

দুই তিন মিনিটের ভিতর নেপালের মনে এত গুলা কথার উদয় হইল। কিন্তু তখনি মনে হইল আর আধ ঘণ্টা পরেই এই টেবিল, এই গ্যাসালোক, এই বাবুচ্চির দল ছাড়িয়া ঐ ব্লু কর্সেট হইতে অনেক দূরে স্বধু ঐ bland smile এর স্বপ্নটুকু লইয়া ফিরিতে হইবে। কিন্তু নেপাল সহজে দমিবার ছেলে নয়। তাহার আবার মনে হইল সে তিনটা পাশ করিয়াছে—সে বুদ্ধিতে অনেকের চেয়ে বড়। চেষ্টা করিলে কি এই গ্যাসালোক নিজের ঘরে জ্বালান যায় না? কিম্বা এই কটলেট কাবাব নিত্য ভোজ্য হয় না? অথবা এই liveried waiter দরজায় খাড়া রাখা যায় না? আর এই ব্লু কর্সেট ও হাসি কি চিরকালই স্বপ্নের বস্তু থাকিবে। কেন স্বপ্নও ত সফল হয়। শুধু বুদ্ধি আর চেষ্টা! নেপালের মাথায় চট্ করিয়া একটা বুদ্ধি যোগাইল।

যখন নেপাল এণ্ট্রান্স পাশ হইয়া কলিকাতায় এফ্ এ পড়িতে আসে, তখন এক এক দিন ছুটীর দিনে দুপুর বেলা যখন বাসায় সকলে ঘুমাইত, চুপী চুপী বাসার ছাতে গিয়া বসিত। হয় ত হাতে পয়সা নাই যে ট্রেন ভাড়া দিয়া বাড়ী যায়। তখন দূরে কলিকাতার পূর্ব্বসীমায় যে শ্যামল-রেখার ন্যায় ঘন সারিবদ্ধ বৃক্ষ শ্রেণী দেখা যায় নেপাল স্থির, মুগ্ধনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া থাকিত। ঐ তালগাছ, উঃ কতদূরে? ওটা নিশ্চয়ই পালপুকুরের পাড়ের সেই গাছটা। তখন সমস্ত গ্রাম খানা নেপালের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিত—আর সঙ্গে সঙ্গে কত দিনের কত কথা—শৈশবের ছুটীর দিন—বিজন মধ্যাহ্ন—বাল্য সাথী—সেই দুপুর বেলা, ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা, সাঁতার কাটা, শৈলেনদের বাড়ীর চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া তাস খেলা, আর সেই বৈকালে নালার মাঠের কোলে ইটের সাঁকোয় বসিয়া গ্রাম্যগান—কি মুক্ত স্বাধীনতা! কি উদার আনন্দ! চাহিয়া চাহিয়া নেপালের চোক জলে ভরিয়া আসিত। কোন কোন দিন কোঁচায় মুখ ঢাকিয়া নেপাল বালকের ন্যায় কাঁদিত। তখন নেপাল ভাবিত যদি কখন বি,এ পাশ হইতে পারে ত দেশেগিয়া, দেশের ইস্কুলেই ৫০।৬০ টাকার মাষ্টারি করিবে। তাই যথেষ্ট। কলিকাতার নাম আর মুখে আনিবে না। ক্রমে যখন বি,এ পাশ হইল তখন ভাবিল বি,এল টাও একবার দিই। কিন্তু কলিকাতায় ওকালতী করা হইবে না। দেশে মুন্সেফি আদালত আছে, বেশী উকীল নাই। মাসে ১০০।১৫০ দেড়-শত টাকা পোষাবেই। তবে আর দুঃখ কি! এর অধিকই বা কি আশা

করিতে পারি। কিন্তু যে দিন তক্ত-পোষের স্থানে খাট আসিল, তোরঙ্গের কাপড় ড্রয়ারে প্রোমোশন পাইল—গটাপার্চ্চা কলারওয়ালা আদ্দির সার্ট জীনের কোটকে ভিটাছাড়া করিল, তার পর হইতে নেপালের মনে অনেক নূতন কথার উদয় হইতে লাগিল। Maine on Hindu Lawর পাশে নীল উঠ্‌পেন্সিলের দাগ মারিতে মারিতে নেপালের প্রায়ই মনে হইত, যাঁরা হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন তাঁরা সকলে উকীল ছিলেন—আর তাঁরা দুই হাত পা বিশিষ্ট মানুষের বেশী কিছু নহেন। আজ রাত্রে অলষ্টার গায়ে দিয়া, গ্যাসালোকিত ঘরে, অনেক গুলা হ্যাট্ কোট ও গাউনের সালোক্যে বসিয়া, উঁচু দাঁতের নিচে ঠোঁটের উপর ফ্রেঞ্চ ফ্যাসানে ছাঁটা দাড়ী চুমরাইতে চুমরাইতে নেপালের আর একটা নূতন কথা মনে হইল।

সে রাত্রিতে টমটমে করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় মাষ্টারে ছাত্রে অনেক কথা হইল।

* * * *

দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর শ্বাশুড়ী ঘুমাইয়াছেন। নেপালের স্ত্রী ছেলেটীকে কোলের কাছে লইয়া আপনার ঘরে শুইয়াছে। বাপের বাড়ী হইতে আসিবার সময় এক শিশি "বিনোদলাল সেনের কুন্তলবৃষ্য" তেল আনিয়াছিল। নিজের মাখিবার ভরসা হইত না পাছে শ্বাশুড়ী রাগ করেন। তবে যে দিন নেপাল বাড়ী যাইত, সেই দিন রাত্রে ঘরে যাইবার সময় চুরী করিয়া এক বিন্দু লইয়া খোঁপায় মাখাইত; তাও একটু বেশী করিয়া মাখিবার সাহস হইত না, যদি সকালে শ্বাশুড়ী টের পান। আজ সেই তেল একটু ঢালিয়া খোকার কেশবিরল মাথায় মাথান হইয়াছে—এবং সেই চুলে সিঁথি কাটিয়া দিয়া চোখে কাজল ও গালে ঠোঁটে আলতা দেওয়া হইয়াছে। খোকার এত সাজ হইয়াছে—কিন্তু তবু আজ মনটা কেমন ভার ভার। আজ প্রায় এক মাস নেপাল বাড়ী যায় নাই আর ১৫।১৬ দিন কোন পত্রও পাঠায় নাই। এত দিন এক খানা চিঠীর আশায় হা পিত্যেশ করিয়া আজ মনটা কেমন বেশী ভার হইয়া উঠিয়াছে। মনে কত দুর্ভাবনা—কত অলক্ষণে কথা আসে। তাই শুধু অন্যমনস্ক হইবার জন্য খোকার আজ এত যত্ন। কিন্তু চেষ্টা বৃথা। যখন ঘুমাইবার আগে খোকা ছোট ছোট, গোল গোল হাত পা দুপদাপ করিয়া ছুড়িতে ছিল আর মুখে "বু-ব্বা, বা-ব্বা" শব্দ করিতেছিল তখন শতবার চোখের জল অসামাল হইয়া পড়িতেছিল। কেবল মনে হইতেছিল "আমি যেন পোড়ার মুখী, কাল কুৎসিৎ, তাঁর মনের মত নই—কিন্তু বাছা আমার কি দোষ করেছে। তাকে কি একবারও মনে পড়ে না—একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না।" আর চোক মুছিয়া মুছিয়া আঁচলটা ভিজিয়া উঠিতে ছিল।

এমন সময় হরকরা ডাকিল "চিঠি!" ছোট দেওর চিঠি আনিয়া হাতে দিল। তখন বউদিদির প্রাণটা উঠিয়া তালুতে ঠেকিয়াছে। চিঠি খোলা হইল। তাহাতে লেখাছিল—"আদরিণী—

বড় তাড়াতাড়ী। সবকথা গুছাইয়া লিখিবার সময় নাই। মোটের উপর

জানিও আমার সঙ্গে ৩।৪ বৎসর দেখা হইবে না। আমি বিলাত যাইতেছি। ব্যারিষ্টার হইব। ফিরিলে তোমার দুঃখ ঘুচিবে। আমার বিদ্যা বুদ্ধি আছে, দেশে থাকিয়া তাহা কেন নষ্ট হয়। এখন তুমি যাহাই ভাব, শেষে বুঝিবে আমি একটা মানুষের মত কায করিয়াছি। টাকার যোগাড় হইয়াছে। যাহাকে পড়াই সে বড়লোকের ছেলে—সেও আমার সঙ্গে যাইবে। আমার খরচ সেই দিবে। খুব গোপনে পরামর্শ স্থির হইয়াছে, কেহ টের পায় নাই। তুমি এই ক'টাদিন চুপ চাপ করিয়া কাটাইয়া দাও। তার পর দেখিও কি কাণ্ড। তোমার মাথায় এখন আসিবে না। তোমাকে ভালবাসি, মার চেয়েও, তাই তোমাকে কথাটা জানাইলাম। মাকে এখন কিছু শুনাইওনা আমার দিব্য। আমি চলিলাম—

তোমার

নেপাল

পুঃ ইংরাজীতে, N Paul

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ ইংরাজী নামই ব্যবহার করিব।

দেবর হরিধন গিয়া নেপালের মাকে বলিল "খুড়িমা, ওঠ, কলকাতা হ'তে দাদার চিঠি এসেছে।" খুড়িমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "বৌমা! ন্যাপাল, বাছা আমার ভাল আছেত, কৈ কি লিখেছে?

বৌমা চিঠিখানা দেবরের হাতে দিয়া, ঘোমটা টানিয়া, দেলের দিকে মুখ ফিরাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। শাশুড়ীর মাথায় বাজ পড়িল।

* * *

সব ঠিক। P & O. কোম্পানির বাড়ী হইতে বিলাত যাইবার জাহাখরচের ও রসদের হিসাব আনান হইয়াছে। Rankeen এর বাড়ী suit এর ফরমাস্ গিয়াছে। এখন কেবল স্বপ্নে স্বপ্নে দিন রাত কাটিতেছে। বাঙ্গালা ইংরাজী বিলাত ভ্রমণ সম্বন্ধে যত কিছু বই বাহির হইয়াছে সবই কেনা হইয়াছে। তাহারা দিন রাতের সঙ্গী। দস্তুর মত তারিখ দেওয়া মরক্কো লেদার ঢাকা সোনা বাধান একখানা Diary ও আসিয়াছে। তাহাতে নেপাল বা ভবিষ্যৎ N. Paul সাহেবের বিলাত-জীবনের একটা ঠিকুজী প্রস্তুত হইবে। এবং আবশ্যক হইলে যে উহা কোন দিনহীন, উপোষিত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের খোরাক কিম্বা কোন সৎ সাহসী, সাহিত্য-সেবক সত্যপীর সংবাদপত্রের গ্রাহকগণের জন্য বিনামূল্যেদত্ত নিম্নিতে পরিণত হইতে পারিবেনা এমন নহে। যাহাহউক একটা সুখময় উৎকণ্ঠায় দিন কাটিতে লাগিল। নিদ্রায়, জাগরণে স্বপ্ন—গ্যাসালোকিত হল—মসৃণ কাঠের মেজে—তাহার উপর আবর্ত্তমান জোড়া জোড়া পা—গাউনের খস্ খস্, পিয়ানোর গোঁ গোঁ—আর পক্ষহীন পরীর মেলা। মরি মরি—কি দেশ। শুধু কল্পনায় যে সুখ তাহাতে যে মত্ততা জন্মে—সত্য সত্য সে আরব্য উপন্যাসের দেশে পৌঁছিলে কি হয় বুঝিতে পারিনা। উঃ—১৭ই তারিখের যে এখনও ছয় দিন দেরী। দিন গুলা এত বড় ঠেকিতেছে কেন?

কিন্তু গোড়ায় গলদ। জাহাজ ছাড়িবার আর ৪ দিন আছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত টাকা যোগাড় হয় নাই।

সেখানে একবার পৌঁছিতে পারিলে হয়, তারপর ঠাকুরদাদাকে চিঠি লিখিলেই চলিবে। সত্য তিনি কিছু পৌত্রকে বিদেশে অনাহারে মরিতে দিবেন না। কিন্তু যাইবার খরচ মিলে কোথা? অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন রাহাখরচের একটা কিনারা করিয়া উঠিতে পারে নাই, তখন পৌত্র ঠাকুর দাদার কাছে কথাটা একবার ভাঙ্গিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু বাল্যকাল হইতে পিতামহের স্বভাব বেশ বুঝিত। মনে ঠিক জানিত সাফ কবুল করিলে, ফল বিপরীত হইবে। অন্য শত বিষয়ে স্নেহশীল পিতামহ পৌত্রের অনেক অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিলেও এবিষয়ে কখন সম্মতি দিবেন না। অধিক কি, যদি পলাইবার কোন পথ থাকে তাহাও বন্ধ করিবা দিবেন। কিন্তু এত দূর আসিয়া ফেরা অসম্ভব, যাইতেই হইবে।

তবে উপায়! নেপালের বুদ্ধি বড় কাযে লাগিল। উপায় বাহির হইল। প্রমথের নিজের ব্যবহারের জন্য ২ টা হীরার আংটী ও একছড়া চেন ছিল, একটা সোনার ঘড়ীও ছিল।

তাহা ছাড়া প্রমথের মার সিন্দুকের ভিতর গহনার বাক্সে অন্যান্য বহুমূল্য অলঙ্কারের সহিত এক ছড়া বড় মতির হার ছিল। যদি কোন সুযোগে এই কটা দ্রব্য নগদ টাকায় পরিণত করা যায়, তাহা হইলে খুব কম করিয়া হিসাব করিলেও একুনে অনেক টাকা দাঁড়ায়; দুজনের বিলাত যাইবার পথ খরচের উপর অনেক টাকা। তবে আর ভাবনা কি—পথ খুব সহজ। শিক্ষক ছাত্রকে এই কথা বুঝাইল। একটা এতবড় কর্ত্তব্যের খাতিরে, খানিকটা সোনা ও গোটাকত মুক্তার সহিত যদি নীতিজ্ঞানের কতকটা আপাততঃ ছাড়িতে হয় তাহাতে ক্ষতি কি? যেটুকু ত্যাগ করা গেল তাহা পুরণ করিবার ভবিষ্যতে অনেক অবসর আসিবে।

আর দুদিন মাত্র বাকী আছে। আজ দুপুর বেলা বড়বাজারের বাহিরে একটা রাস্তার উপর টমটমে প্রমথ বসিয়া আছে—আর একটা বড় জহরীর দোকানে নেপাল বসিয়া। হাতে একছড়া বড় মতির মালা। যে দোকানে ছিল তাহার সহিত দরের হিসাব হইতেছে। দোকানী মালা ছড়া লইয়া ফিরাইতেছে, ঘুরাইতেছে—মুক্তা গণিতেছে—কিন্তু দরের ঠিক একটা মীমাংসা হইতেছে না। আশে পাশে আরও দুচার জন ছিল। সকলেই মালা আগ্রহের সহিত দেখিতেছে, যথেষ্ট প্রশংসাও করিতেছে। সহসা দোকানী পার্শ্বের এক জনের কাণে কাণে কি বলিল—সে উঠিয়া গেল। দোকানী নেপালকে বুঝাইয়া বলিল, যে মালা কেনা স্থির—তবে যিনি দোকানের মালিক-মহাজন তিনি উপস্থিত নাই, তাঁহাকে আনাইবার জন্য লোক পাঠান হইল।

আধ ঘণ্টার ভিতর এক খানা গাড়ী আসিয়া দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল। একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালীবাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। দেখিয়া নেপালের আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। একবার ভাবিল ছুটিয়া পলাই, কিন্তু ঘটিয়া উঠিল না। যিনি নামিলেন, তিনি নেপালের অন্নদাতা মনিব—প্রমথের পিতামহ।

যে পূর্ব্বে দোকানে বসিয়া নেপালের সহিত কথা কহিতেছিল সেই দোকানের প্রকৃত মালিক ও প্রমথের পিতামহের বিশেষ অনুগৃহীত। আজ ২ বৎসর পূর্ব্বে সে এই মালা প্রমথের মার জন্য বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে। আজ সহসা কোট, প্যান্টুলেন, ক্যাপ, বুট আঁটা ফিরিঙ্গি মূর্ত্তি একটা বাঙ্গালীর হাত দিয়া সেই মালা তাহারই দোকানে বিক্রয়ের জন্য ফিরিয়া আসিবে, ইহার ভিতর একটা মস্ত রহস্য আছে বুঝিতে পারিল। রহস্যটা কি স্থির করিবার জন্য সে ছলনা করিয়া প্রমথের পিতামহের নিকট লোক পাঠায়। সংবাদ পাইবা মাত্র অন্দরে মালার খোঁজ হইল—দেখা গেল মালা অদৃশ্য হইয়াছে। তখনি গাড়ী তৈয়ারি করিয়া বেহারী বাবু দোকানে আসিলেন।

বেহারী বাবু হাসিমুখে নেপালের কাছে আসিয়া বসিলেন। নেপালের সাধ্য নাই যে তাঁহার মুখের দিকে চায়। তিনি হাসিতে হাসিতেই বলিলেন "মাষ্টার মহাশয়! শুনিলাম আপনি এক ছড়া মুক্তার মালা বেচিতে চান। বেশ কথা। আমিও শীঘ একটী নাতবৌ ঘরে আনিব ভাবিতেছি। আমার ইচ্ছা একছড়া মুক্তার মালা দিয়া তার মুখ দেখি।"

নেপালের দিবাস্বপ্নের ভিতর এক মুহূর্ত্তে একটু অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। সেই গ্যাসালোকিত বলরুম ভাঙিয়া চুরিয়া দুর্ভেদ্য, উন্নত প্রাচীরবেষ্টিত, একটা প্রকাণ্ড বাড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেই পিয়ানো, বাস, বেহালার স্থানে কতকগুলা স্তূপীকৃত প্রস্তর খণ্ড আসিয়া জমিয়াছে; সেই নয়নে অধরে হাসি মাখা পরীর দেশের মানুষের মুখ কতকগুলা, শীর্ণ, উচ্চ, গভীর রেখাঙ্কিত বিষণ্ণ মানব মূর্ত্তি—আর সেই বিচিত্র বর্ণ বলড্রেশ কতকগুলা জাঙিয়া হইয়া গিয়াছে।

বেহারী বাবু স্নেহার্দ্রভাবে আবার বলিলেন "নেপাল বাবু! আমি যখন আপনার হাতের কাছে, তখন কষ্ট করিয়া এতদূর আসিবার আবশ্যক ছিল না। যখন নাতবৌএর মালা দিয়া মুখ দেখিব ইচ্ছা করিয়াছি, তখন কোন গতিকে মালা ছড়া কিনিতে পারিতাম। কৈ দেখি মালা দেখি।"

তখন নেপালের মনে হইতেছিল, নরদেব বাণাচ্যুত, ইন্দুমতীর কণ্ঠে পতিত মালার ন্যায় যদি তাহার হাতের সেই মুক্তার মালা আজ একবার সেইরূপ প্রাণনাশিনী শক্তি পায়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। কিন্তু তাহা ত হইল না।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, বেহারী বাবু হাত বাড়াইলেন। মালা সহজেই তাঁহার হাতে আসিল—তখন চিনিতে কি আর বাকী থাকে! তিনি মালা হাতে করিয়াই হাসিয়া উঠিলেন।

নেপাল মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। টেনিস ক্যাপটা কপালের উপর আর একটু নামিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার রিমটা কি বেহারীবাবুকে আড়াল করিতে পারিয়াছিল? বেহারী বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বা! দিব্যমালা—আমার জিনিস হইলে, সর্ব্বস্ব ছাড়িতে পারিতাম, কিন্তু এমন মালা ছাড়িতে পারিতাম না। ওকি মাষ্টার

মহাশয়! দুটা কথা ক'ন—চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন।"

বড় বাজারের পথ। লোকের চলা ফেরার অভাব নাই। আর যে দোকানে এই কাণ্ড হইতেছিল সেটাও একটা সমৃদ্ধ দোকান। দেখিতে দেখিতে আরও দু পাঁচ জন লোক আসিয়া জুটিল। যারা পথিক, তাদের ভিতরও অনেকে দেখিল অন্য দোকান অপেক্ষা এ দোকানে একটু রং আছে। একটা ফিরিঙ্গিমূর্ত্তি ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া আছে—আর একটা কি জিনিসের চারিপাশে অনেকগুলা মাথা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একটু মজার গন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না? যার হাতে কাজ নাই—সে দোকানের কাছে আসিয়া জুটিল। যার কাজ আছে সেও ভাবিল একটু দাঁড়াইয়া যাই—তত ক্ষতি হইবে না। ক্রমে পাঁচ, দশ—দশ বিশ হইয়া শেষে বেশ ভিড় হইয়া উঠিল।

বেহারী বাবু বলিলেন "নেপাল বাবু কাযটা চটপট সারিয়া ফেলিলে ভাল হয় না! আমার বৈকালে খিদিরপুরে কায আছে। কত টাকায় আপনি মালা ছাড়িতে পারেন?" নেপাল তবু হেঁটমাথা ও নিরুত্তর। দর্শকেরা ভাবিল মজা মন্দ নয়। তখন জনতার ভিতর কেহ বলিল "ও নেপাল সাহেব! কথা কও" কেহ বলিল "গোপাল! বদন তুলে এক বার কথা ক বাপ"! একটা হাসির গোল উঠিল। মজা জমিতে লাগিল।

দোকানদার হাসিয়া বেহারী বাবুকে বলিল "মশায়! এমালা আমার দোকান হইতেই বিক্রী হয়—আমি আসল দর জানি। দেখত হে' সরকার, ৯২এর চৈত্রের জমা।"

সরকার খাতা দেখিয়া বলিল "দুহাজার তিনশ বত্রিশ।" দোকানী আবার বলিল "দেখত জমা কার নামে।"

সর। বেহারী বাবুর নামে।

বেহারী বাবু হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন "সেকি! আমার নামে জমা! তাহা হইলে দুই বৎসর পূর্ব্বে যে মালা আমি একবার কিনিয়াছি—আজ আবার নূতন দাম দিয়া তাহাই কিনিতে হইবে। ও নেপাল বাবু, এরা বলে কি?

নেপাল তখনও হেঁটমাথা—নিরুত্তর।

আঁচে আঁচে অনেকেই মোট কথাটা বুঝিয়া লইল। দর্শকদের ভিতর একজন সুর করিয়া বলিল "গোপাল রে! গহনার বাক্স কি তোর ননীরহাঁড়ী বলে ভ্রম হয়েছিল বাপ—তাই হাত দিয়েছিলে?"

আর একজন বলিল "আহা! বোধ হয় যশোদা এতক্ষণ গোপালহারা হয়ে, পাগলিনীর মত খুঁজে বেড়াচ্চে। থোকাটীকে একটা থানায় বসাইয়া রাখুন—তাহ'লে বৃন্দাবন পৌঁছিতে বেশী দেরি হইবে না।"

অনেকেই হাসিল। আবার অনেক কথা হইতে লাগিল। একজন বেহারী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল সিংহ চর্ম্মাবৃত নিতান্ত নিরীহ এই "কৃষ্ণের জীবটী কে মহাশয়?

বেহারী বাবু এখনও আসল কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি শুধু খেয়ালের মুখে বলিয়া ফেলিলেন "সমুদ্র পারের যাত্রী" আণ্ডামান যাত্রী এরূপ অর্থও হইতে পারে। একজন বলিল "কি বলিলেন? সমুদ্র পার হয়েছিলেন? তা বেশ, বেশ! মশায়, মুক্তার মালাছড়া একবার ওঁর গলায় দিন না—দেখি

কেমন খোলে।" আবার একটা খুব হাসির গোল উঠিল।

বেহারী বাবু বলিলেন "নেপাল বাবু! এতগুলি ভদ্রলোকের অনুরোধ—কি বলেন?"

এইবার নেপাল মুখ তুলিল। একবার নিতান্ত দীননয়নে বেহারী বাবুর মুখের-দিকে চাহিল। বেহারী বাবু সে, দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন আরও বুঝিলেন, আর না—যথেষ্ট হইয়াছে। তিনি কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন "এখানে দেখিতেছি গোল মিটিবে না। উঠুন, আপনি গাড়ীতে উঠুন, ঘরে গিয়া দেখা যাবে।"

নেপাল কলের পুতুলের মত গাড়ীতে উঠিল।

মজাটা জমিয়া আসিবার মুখেই শেষ হইল দেখিয়া দর্শকের ভিতর অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইল। যারা একটা প্রকাণ্ড পুলিসের মামলার আশা করিয়াছিল—তাহারা নিরাশ ও বিরক্ত হইল।

পথে বেশী কথা হইল না। তবে যেটুকু জানিবার, তাহা বেহারী বাবু দুচার কথায় জানিয়া লইলেন।

ঘরে আসিয়া বেহারী বাবু সন্ধান লইলেন অন্য কোন গহনার গরমিল হইতেছে কি না। যখন নিশ্চিন্ত হইলেন তখন সরকারকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন মাষ্টারের প্রাপ্য বাকী টাকা হিসাব করিয়া চুকাইয়া দাও।"

এতবড় অপরাধের এত সহজে মার্জ্জনা—নেপাল কাঁদিয়া ফেলিল। একবার ভাবিল মুখ ফুটিয়া কিছু বলি, কিন্তু বেহারী বাবু সে অবসর দিলেন না। নেপাল সরকারের সহিত আর দেখা না করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল।

* * *

আশ্বিন মাস। পাঁচ ছয় দিন হইল পূজার বোধন বসিয়াছে। নেপাল বাড়ী ফিরিতেছে। হাতে একটা ছোট পুঁটলি।

নেপাল এখন নিঃস্ব। মাষ্টারী চাকুরী যাইবার পর প্রায় দুই মাস বাসায় বসিয়াছিল। কোন নূতন কাষ জুটাইতে পারে নাই। কিন্তু খরচ ঠিক সমান। ঋণও পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। দেনদারেরা প্রথম প্রথম দুচার দিন তাগাদা করিল। শেষ নালিস করিল। নেপাল আদালতে হাজির হইল না, একতরফায় মকদ্দমা ডিক্রী হইল। কিন্তু নেপালের সঙ্গতি কি, যে টাকা আদায় হইবে। শেষ তাহারা নেপালের সেই অনেক সখের আয়না-ওয়ালা দেরাজ, খাট, ড্রেসিং টেবিল ক্রোক করিয়া বেচিয়া লইল। আর বেচিল নেপালের ল বুক। বাসার যিনি কর্ত্তা, তাঁর কাছেও দুই তিন মাসের টাকা বাকি পড়িয়া ছিল। তিনিও নালিসের ভয় দেখাইলেন। দেশের বিষয় ক্রোক করিবার কথা তুলিলেন। শেষ অনেক মিষ্টকথা, হাতে ধরার পর বেশী সুদে খত লিখিয়া লইয়া আপাততঃ ছাড়িয়া দিলেন। যখন স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল, তখন নেপাল বুঝিল, সে সংসারে একজন কপর্দ্দকহীন, ঋণগ্রস্ত দরিদ্র। আর অনেকগুলি ক্ষুধিত মুখ অন্নের আশায় তাহারই দিকে হাঁ করিয়া আছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। মেঘহীন শরদ আকাশে একাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে। নেপাল মাঠের পথ বহিয়া চলিয়াছে। মাঠের ধানগাছ বড় হইয়াছে—মাথার

শিষ ধরিয়াছে। কোল হইতে চারিদিকে যতদূর যাওয়া যায় বিচ্ছেদহীন, সীমাহীন সবুজ—আর মাথার উপর দিশাহারা নীলিমা। কোথায় রাজধানীর সঙ্কীর্ণতা, আবর্জ্জনা অস্বাস্থ্য, কর্কশতা —আর একি উদারতা, কি বৈচিত্র্য কি শ্যামলকোমলতা, কি মুক্ত স্বাধীনতা! এই ত মানবের প্রকৃত স্বদেশ। কি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না—বুঝি স্পর্শ করা যায়। ধানের শিষ জ্যোৎস্না ভরে ঝুকিয়া পড়িয়াছে—আর জ্যোৎস্না শিষ বাহিয়া মাঠের উপর গড়াইয়া পড়িতেছে। ঐ শাখের শব্দ শুনা যাইতেছে! ও কোন গ্রাম হইতে আসিতেছে—কোন গৃহস্থেরা বাজাইতেছে। ও শব্দ শাঁখেরই ন্যায় শুভ্র, পবিত্র। উহারা হয় ত কত সুখী। ওখানে রাজধানীর হিংসা, দ্বেষ, গর্ব্ব, দরিদ্রের প্রতি ক্রূরপরিহাস, এসব কিছু নাই। উহাদের ঝরঝরে মাটীর দাওয়ায় শিশু নিশ্চিন্ত হইয়া দোলনায় ঘুমায়—আর আঙ্গিনায় চাঁদের আলোতে বসিয়া গৃহস্থেরা প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প করে, প্রাণ খুলিয়া হাসে; সে গল্প হাসির শেষ হয় না। বিষয়ের সঙ্গে পুত্র, পিতার ঐ হাসি ও গল্পের উত্তরাধিকারী হয়। ঐ কাদের বাড়ী আরতীর বাজনা বাজিতেছে। এই জ্যোৎস্না, এই বাতাস, এই শ্যামলা শরদ প্রকৃতি, এদের সঙ্গে ঐ কাঠের বাঁশীর গ্রাম্য রাগিণীর কত খানি আত্মীয়তা! হায়! যার দেশ নাই, যাদের দেশে মাঠ নাই, যে পূজার সময় দেশে যাইতে পায় না, আর জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া ঐ রাগিণীর আলাপ শুনিতে পায় না, সে সংসারে কি দুর্ভাগ্য!

নেপাল মাঠ ছাড়াইয়া গ্রামের রাস্তায় উঠিল। আর এক পোয়া পথ যাইলেই বাড়ীতে পৌঁছায়। নেপালের কত দিনের পূজার সময় বাড়ী যাইবার কথা মনে হইল। মনে হইল এমনি দিনে একজন ঐ বাঁকের মুখের বট গাছের তলায়, একটী ছোট লণ্ঠনে আলো জ্বালিয়া তাহার আশায় বসিয়া থাকিত। সে বাড়ীর রাখাল—স্বষ্টিধর। নেপাল বাড়ী যাইবে খবর পাইলে, মা সেদিন সকাল সকাল রাঁধা বাড়া সারিয়া বৈকাল হইতে স্বষ্টিধরকে পাঠাইয়া দিয়া আপনি দরজার কাছে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। মাঠের মাঝ খান হইতে সেই ক্ষীণ আলো দেখা যাইত। নেপালের বোধ হইত, যেন সেই অন্ধকার বিজন গ্রাম্যপথে মারই স্নেহময় নিমেষহীন আঁখি তাহার আশায় চাহিয়া রহিয়াছে। তখন কি আনন্দ! কি সুখ! আর আজ—আজ মার কথা, স্ত্রীর কথা, পুত্রের কথা মনে পড়ায় নেপালের চোক ফাটিয়া জল পড়িতে ছিল। আজ ৪ মাস দেখা নাই—খবর নাই। কেজানে কেমন আছে তারা! নেপাল হন হন করিয়া চলিল।

পাড়াগাঁ—প্রায় সন্ধ্যার পরই সব বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া যায়। নেপালের স্ত্রী সারাদিন পরিশ্রমের পর শাশুড়ী দেওরদের খাওয়াইয়া, খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া, আপনি খাইবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। এমন সময় নেপাল বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া চার মাস পরে ভাঙ্গা গলায় ডাকিল "মা।"

স্ত্রীর আর ভাতে হাত দেওয়া হইল না। চারি মাসই হউক, আর চারি

বৎসরই হউক, এ যে চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর ভুল হইবার নয়। বুড়ী ছুটিয়া নেপালের কাছে গিয়া মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কান্না শুনিয়া ছোট ভাইএরা আর বাড়ীর সকলে ছুটিয়া আসিল। তখন একটা হাসিকান্নার ঘটা পড়িয়া গেল।

নেপালের আজ সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই। বলিল "মা, ঘরে ভাত আছে?"

ঘোমটা দিয়া একজন একথাল ভাত রাখিয়া গেল। শাশুড়ী কিছু বলিতে যাইতে ছিলেন। বৌ কানের কাছে চুপি চুপি বলিল "ঘরে গরম মুড়ী, গুড় আছে, আমার তাই ঢের হবে মা।"

তখন চাদের আলোতে, ভাঙ্গা রোয়াকে, ভাঙ্গা সিঁড়ির উপর বসিয়া কলাইএর দাল দিয়া নেপাল ভাত খাইতে বসিল। পার্শ্বে মা বসিয়া, আর চারিদিকে ছোট ছোট ভাইএরা তাদের হাসি মুখ লইয়া ঘিরিয়া বসিয়াছে। তাদের আর আমোদ ধরেনা—আজ দাদা ঘরে ফিরিয়াছে। নেপালের আনন্দে চোকের পাতা ভিজিয়া উঠিতেছিল, গলায় ভাত বাধিয়া যাইতেছিল। ও নেপাল! মনে পড়ে কি? সেই হোটেল, সেই গ্যাসালোক, সেই ডাইনিং টেবিল সেই গরম কটলেট কাবাব আর সেই ব্লু কর্সেট! বল দেখি আজ, কোথায় সুখ বেশী?

সেরাত্রিতে স্ত্রী পুরুষে অনেক কান্না, অনেক হাসি অনেক কথা হইল। সে কথার চোদ্দ আনার কোন দরকার নাই—তবু বোধ হয় সে কথা না হইলে চলেনা। খোকার মুখে শত চুমো খেয়েও সোয়াস্তি নাই। নেপাল ভাবিতেছিল এ বৎসর পূজার সব আনন্দ বুঝি আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল!

সেই আবশ্যক অনাবশ্যক সহস্র কথার ভিতর হইতে নেপালের স্ত্রী শুনিয়া লইল, যে নেপালের গলায় এখনও দেনা রহিয়াছে। পড়িবার আইনের বই বিক্রী হইয়া গিয়াছে—অথচ পরীক্ষাও খুব নিকট। এ পরীক্ষা দিতে না পারিলে একটা বৎসর নষ্ট হইবে। সেটা বড় সহজ কথা নয়।

তার পরদিন নেপাল যখন খাইতে বসিয়াছে, তখন সে কতকগুলা নগদ-টাকা ও নোট আনিয়া নেপালের কাছে রাখিল। বলিল "তুমি যতশীঘ পার দেনা শোধ করিয়া পড়িবার বই কিনিও।"

নে। তুমি এত টাকা পেলে কোথা হ'তে?

স্ত্রী হাসিয়া বলিল "বিলাত যাইবার জন্য জমাইয়া ছিলাম।"

আসল কথাটা এই। নেপালের শ্বশুর সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। তিনি নাতীর ভাতের জন্য কন্যাকে নগদ দুইশত টাকা পাঠান। আর পূজার সময় বেণারসী কাপড় দিতে স্বীকৃত হন। মেয়ে শ্বশুর-বাড়ার ও স্বামীর অবস্থা জানিত। বুঝিয়াছিল বেণারসী কাপড় অপেক্ষা নগদ টাকায় অনেক বেশী কায হইবে। সেই জন্য কাপড়ের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা চায়। বাপ আরও পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দেন। আজ সেই টাকা-গুলি সে স্বামীকে হাসিমুখে বাহির করিয়া দিল।

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া নেপাল কথাটা জানিয়া লইল। বড় কষ্টে তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। তখন

সাধ্য কি সেই টাকায় হাত দেয়। বলিল "ও টাকা তুলিয়া রাখ। আমার অদৃষ্টে যা আছে হইবে।"

স্ত্রী। তুমি বাঁচিয়া থাক, খোকা বাঁচিয়া থাক্। টাকার ভাবনাই বা কি, আর ভাতের ভাবনাই বা কি। আপাততঃ মা কালীর প্রসাদ আনিয়া খোকার মুখে দিয়া রাখি। এর পর হরি দিন দেন ভাতের ঘটা কোর'। তোমার একজামিনের চেয়ে ত আর খোকার ভাত বড় নয়!

ও নেপাল। এ স্ত্রীত বলে নাচতে পারে না। এযে রাঙ্গা কস্তাপেড়ে কাপড় পরিয়া উনুনে ফুঁ পাড়ে। আর হাঁটু নাচাইয়া ছেলে ঘুম পাড়ায়।

আজ ষষ্ঠী। ভোর হইতে চারিদিকে পূজার বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। শরতের প্রভাতের মধুর রৌদ্র ফুটিয়াছে। নেপাল চণ্ডীমণ্ডপে শুইয়া "চন্দ্রশেখর" পড়িতেছিল। এমন সময় ধূলামাথা, অর্দ্ধনগ্ন দেহ একজন কে আসিয়া একটু দূরে বসিল। নেপাল চাহিয়া দেখিল, পাড়ার গণেশ পাগল।

আজ পথে ছেলে বুড়া অনেকেই নূতন কাপড় পরিয়া কলাবৌ স্নান দেখিতে বাহির হইয়াছে। গণেশের দেখিয়া সাধ হইয়াছে একখানা নূতন কাপড় পরে। কিন্তু কে দিবে। খেয়ালের ঝোঁকে সে নেপালের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া পড়িয়াছে।

এখন নেপালকে দেখিয়া বলিল "বাবু! একখানা কাপড় দিবে।"

"বোস্" বলিয়া নেপাল বাড়ীর ভিতর গেল। তখনি একটা পুঁটলি লইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। পুঁটলি খুলিলে বাহির হইল সেই কোট, প্যাণ্ট, নেক্টাই, কলার আর টেনিসক্যাপ। নেপাল পাগলকে একে একে সব পরাইয়া দিল। কেবল পেণ্টুলেনটা তার কোমরে জড়ান রহিল। পাগলের সাজ সাঙ্গ হইলে নেপাল বলিল "বাঃ গণেশ, বেশ হ'য়েছে এ তোরই উপযুক্ত সাজ এইবার পূজাবাড়ী ঠাকুর দেখগে যা।" পাগল ভোঁ দৌড় দিল।

পথে একটা কুকুর শুইয়া ছিল। পাগল হঠাৎ গলা হইতে কলারটা খুলিয়া তার গলায় পরাইয়া দিল। তার পর সেখান হইতে ছুটিয়া পথের ধারের একটা পুকুরে টেনিসক্যাপটা নৌকা করিয়া ভাসাইয়া দিল। জামা প্যাণ্টের দশা কি হইল জানা যায় নাই।

সাংখ্যস্বরলিপি।

সংজ্ঞা।

স্বরলিপি জটিল করিবার প্রয়োজন নাই। স্বরলিপি যত সরল হইবে ততই নূতন শিক্ষার্থীগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে। আজকাল স্বরলিপিতে সা রে গা মা পা ধা নি পরিবর্ত্তিত হইয়া কখন স রি গ ম, স র গ ম কখন বা সো রো গো মো ইত্যাদি বিকৃত সার্গম সঙ্কেত সকল ব্যবহৃত হয়। ইহাতে সঙ্গীত শিক্ষার্থীগণের তেমন সুবিধা হয় না, বরঞ্চ অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু এই অসুবিধা সাংখ্যস্বরলিপিতে যথাসাধ্য দূরীকৃত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সাংখ্যস্বরলিপির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে সা রে গা মা পা ধা নি প্রায় সকল সময়েই অপরিবর্ত্তিত আকারে রক্ষিত হইয়াছে। এবং ইহার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহার সপ্তক ও মাত্রা পরিমাণ প্রভৃতি প্রধানতঃ সংখ্যা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে এই কারণে বর্ত্তমান স্বরলিপি সাংখ্যস্বরলিপি বলিয়া উক্ত হইল।

সপ্তকচিহ্ন।

সা রে গা মা পা ধা নি এই সাতটী সুর লইয়া এক একটী সপ্তক। সচরাচর আমাদের সঙ্গীতে তিন সপ্তক ব্যবহৃত হয়:—উদারা, মুদারা, তারা অথবা মন্দ্র, মধ্য, তার। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রে তিন সপ্তক হইতেও অতিরিক্ত সপ্তক ব্যবহার হয়।

সহজভাবে আমাদের কণ্ঠ হইতে যে সা সুর বাহির হয় তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া নিখাদ পর্য্যন্ত সাতটী সুরকে মধ্য সপ্তক বলা যায়। এই মধ্য সপ্তকই স্বাভাবিক সপ্তক। এই মধ্য সপ্তককেই আমরা মূল বা প্রথম সপ্তক বলিয়া ধরিয়া লইলাম। ইহা দ্বারা উচ্চের এবং নিম্নের সকল সপ্তক নিয়মিত হয়। এই মধ্য সপ্তকে চিহ্নের কোন বাঁধাবাধি নাই অর্থাৎ মধ্য সপ্তকে ইচ্ছা করিলে চিহ্ন দিতেও পারি, ইচ্ছা করিলে না-ও দিতে পারি। যেমন সচরাচর শত বলিলেই একশত বুঝায়, সহস্র বলিলেই এক সহস্র বুঝায়—ইহাদের পূর্ব্বে এক না লিখিলেও চলিতে পারে, সেইরূপ মধ্য বা প্রথম সপ্তকের শিরোভাগ বা নিম্নভাগ ১এর দ্বারা চিহ্নিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। যথা,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা রে গা মা পা ধা নি

বা সা রে গা মা পা ধা নি
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

ইহা না লিখিয়া আমরা সচরাচর সা রে গা মা পা ধা নি লিখিব।

সপ্তকের প্রভেদসূচক সংখ্যাচিহ্ন উচ্চ এবং নিম্ন স্বরগ্রাম হিসাবে ক্রমান্বয়ে সুরের শিরোভাগে এবং নিম্নভাগে স্থাপিত হইবে। দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি:—

মধ্যসপ্তক (যাহাকে মুদারা বলে)

সা রে গা মা পা ধা নি।

দ্বিতীয় উচ্চ সপ্তক (যাহাকে তারা বলে)—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
সা রে গা মা পা ধা নি

তৃতীয় উচ্চ সপ্তক (তারার উচ্চ সপ্তক)—

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩
সা রে গা মা পা ধা নি

ইত্যাদি।

এইরূপ, আবশ্যক হইলে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি উচ্চ সপ্তকের স্বরগুলির শিরোভাগে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতির জ্ঞাপক ৪, ৫ আদি সংখ্যা লিখিত হইবে।

দ্বিতীয় নিম্ন সপ্তক (যাহাকে উদারা বলে)—

সা রে গা মা পা ধা নি
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

তৃতীয় নিম্ন সপ্তক (উদারার নিম্ন সপ্তক)—

সা রে গা মা পা ধা নি
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩

ইত্যাদি।

এইরূপ চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি নিম্ন সপ্তক আবশ্যক হইলে তাহাদের স্বরগুলির নিম্নভাগে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতির জ্ঞাপক ৪, ৫ আদি সংখ্যা লিখিত হইবে।

সপ্তকের ভিন্নরূপ লিখন প্রণালী।

কোন (একই) সপ্তকের স্বর পরে পরে থাকিলে সেই সপ্তকের চিহ্ন সকল স্বরগুলির উপরে না দিয়া একটি স্বরের উপরে মাত্র স্থাপন করিয়া, সেই চিহ্ন হইতে অন্য স্বরগুলি পর্য্যন্ত ফুটকি অথবা অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা টানিয়া গেলেও চলিবে। যথা,

২ ২ ২ ২.........
সা রে গা = সা রে গা
২ - - - - - -

অথবা সা রে গা ;

সা রে গা মা পা ধা নি
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩
= সা রে গা মা পা ধা নি
৩ .. . .

অথবা

সা রে গা মা পা ধা নি
৩ -

কড়ি ও কোমলের চিহ্ন।

জটিলতা পরিহারের জন্য কড়ি ও কোমল বুঝাইবার কালে স্বরের অক্ষর পরিবর্ত্তিত না করিয়া তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র সংকেত ব্যবহার করা হইয়াছে। কোমল বুঝাইবার জন্য ৺ চন্দ্রবিন্দু আর কড়ি বুঝাইবার জন্য ^ উল্টা চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হইবে। কোমলের চিহ্ন ও কড়ির চিহ্ন আবশ্যকানুসারে স্বরের মাথায় অথবা বামপার্শ্বে স্থাপিত করা যায়। যথা ৺গা বা গাঁ ; ^মা বা মা̂।

মাত্রা।

স্বরের স্থায়িত্বকালকে মাত্রা কহে।

এক বা স্বাভাবিক মাত্রা।

এককে ঠিক স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ নাতিদীর্ঘনাতিহ্রস্বভাবে উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাকেই একমাত্রা কহে।

একমাত্রার চিহ্ন — ১

এই একমাত্রা চারিবার উচ্চারণ করিলে চারিমাত্রা হইবে। যথা ১ ১ ১ ১।

এই একমাত্রা চারি চারি করিয়া চারিবার উচ্চারণ করিলে ষোলমাত্রা হইবে। যথা। ১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১।

এই স্বাভাবিক একমাত্রাকে অবলম্বন করিয়াই নানা তালের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে ও গায়ক সমাজে প্রচলিত যে সকল তাল আছে তদ্ব্যতীত ইচ্ছা করিলে আরও নানারূপ তাল উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। তাল কালেরই পরিমাপক চিহ্নমাত্র; সুতরাং কালকে যত বিভিন্ন প্রকারে সীমাবদ্ধ করিব, তত বিভিন্ন প্রকার তালেরও সৃষ্টি হইতে থাকিবে।

এক বা স্বাভাবিকমাত্রাকে যে সুর অধিকার করিবে তাহার স্থায়িত্বকাল একমাত্রা। এই একমাত্রিক সুরকে ১এর দ্বারা চিহ্নিত করিলে করিতে পারি না করিলেও না করিতে পারি। যথা ১সা = সা।

গুণিতমাত্রা।

একমাত্রার গুণিত যে মাত্রা হইবে তাহাকে গুণিত মাত্রা কহে। ইহাকে দীর্ঘমাত্রা বা গুরুমাত্রা বলা যাইতে পারে যথা দ্বিমাত্রা, ত্রিমাত্রা ইত্যাদি।

দ্বিমাত্রা।

দ্বিমাত্রা এই নামেই বুঝা যাইতেছে ইহা একমাত্রার দ্বিগুণ। প্রত্যেক দ্বিমাত্রা দুইটী একমাত্রার সময় অধিকার করে।

দ্বিমাত্রিক চিহ্ন = ২ ;

এইরূপ প্রত্যেক ত্রিমাত্রা তিনটী একমাত্রার সময় অধিকার করে।

ত্রিমাত্রার চিহ্ন = ৩;

এইরূপ চতুর্মাত্রার চিহ্ন = ৪ ইত্যাদি।

যখন কোন সুর দ্বিমাত্রা, ত্রিমাত্রা প্রভৃতি গুণিত মাত্রাকে অধিকার করিবে তখন সেই সুরের পার্শ্বে গুণিত মাত্রার চিহ্নটী লিখিতে হইবে। যথা ২সা; এখানে সা সুর দুই মাত্রা অধিকার করিয়াছে অর্থাৎ সা সুরটী দুই মাত্রা কাল পর্য্যন্ত একটানে গাহিতে হইবে। এই ২ সা কে সা + সা এইরূপেও রাখা যাইতে পারে। এজন্য স্বরযোগালঙ্কার বিশেষ রূপে দ্রষ্টব্য।

অংশমাত্রা।

একমাত্রার অংশ হইলেই তাহাকে অংশমাত্রা কহে। ইহাকে হ্রস্বমাত্রা বা লঘুমাত্রা বলা যাইতে পারে। যথা অর্দ্ধমাত্রা, সিকিমাত্রা।

অর্দ্ধমাত্রা।

অর্দ্ধমাত্রা এই নামেতেই জানা যাইতেছে ইহা একমাত্রার অর্দ্ধ। দুইটী অর্দ্ধমাত্রায় একমাত্রা হয়। অর্দ্ধমাত্রা হিসাবে একমাত্রা প্রকাশ করিলে দুইটী অর্দ্ধমাত্রা লিখিতে হইবে। যথা। ১। = । $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{২}$। সেইরূপ একমাত্রাকে এক-তৃতীয়, এক-চতুর্থ অংশমাত্রা হিসাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তিনটী এক-তৃতীয়, চারিটী এক-চতুর্থ অংশমাত্রা লিখিতে হইবে। যথা। ১। = । $\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৩}$।; । ১। = । $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৪}$।; এক-পঞ্চম, এক-ষষ্ঠ ইত্যাদি অংশমাত্রার সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

যখন কোন সুর অংশমাত্রাকে অধিকার করিবে তখন অংশমাত্রার উপরস্থিত ১ সংখ্যাটী মুছিয়া সেই সুর লিখিতে পারিবে। যথা $\frac{১}{২}$ সা = $\frac{সা}{২}$; $\frac{১}{৩}$ সা = $\frac{সা}{৩}$; $\frac{১}{৪}$ সা = $\frac{সা}{৪}$ ইত্যাদি।

স্বরের মাত্রাচিহ্ন-স্থাপনের সাধারণ নিয়ম।

স্বরের পার্শ্বে সন্নিহিত করিয়া মাত্রা-চিহ্ন স্থাপিত হইবে। একমাত্রিক স্বরের পার্শ্বে ১ বসিবে; যথা ১সা বা সা১। দ্বিমাত্রিক স্বরের পার্শ্বে ২ বসিবে; যথা ২সা বা সা২। অর্দ্ধমাত্রিক স্বরের পার্শ্বে ১/২ বসিবে; যথা ১/২সা বা সা১/২। এখন ১ সা বলিলেও সা বুঝায়, শুধু সা বলিলেও তাহাই বুঝায়, সুতরাং যেখানে ১ সা থাকিবে সেখানে শুদ্ধ সা রাখিলেই চলিবে। যথা ১সা=সা; ১/২সা=সা/২; ১/৩ সা=১ সা/৩=সা/৩; ১/৪ সা=সা/৪=সা÷৪ ইত্যাদি।

খণ্ডমাত্রা বা হসন্তমাত্রা।

যে কোন স্বর প্রাধান্যহীন হইয়া নিমেষের মধ্যে অপর স্বরের সহিত যুক্ত হয়, অর্থাৎ যে স্বরকে অতিদ্রুত স্পর্শ করিয়া স্বরান্তরে যাইতে হয় তাহার মাত্রাকাল খণ্ডমাত্রা বা হসন্তমাত্রা নামে অভিহিত হইল। বঙ্গভাষায় যেমন অস্ফুট উচ্চারণ 'হসন্ত' ত কে 'খণ্ড' ত বলা যায়, সেই নিয়ম অনুসরণ করিয়া আমরাও হসন্ত মাত্রাকে খণ্ডমাত্রা বলিলাম। এবং এই খণ্ডমাত্রিক স্বরের আমরা স্ত্রীস্বর সংজ্ঞা দিলাম। এই স্ত্রীস্বরকে মুখ্যস্বরের পার্শ্বে হসন্ত চিহ্ন-যুক্ত ও লুপ্ত স্বরবর্ণ করিয়া লিখিতে হইবে। যথা, প্ধা; ম্প্ধা; গ্ম্প্ধা। এখানে ধা স্বরেরই প্রাধান্য, ধা স্বরই মুখ্যভাবে বিদ্যমান; অন্য স্বরগুলি ছুঁইয়াই চলিয়া যাইতে হয়। ইচ্ছা করিলে খণ্ডমাত্রিক স্বরকে হসন্তচিহ্ন-যুক্ত করিয়া ক্ষুদ্র অক্ষরেও লিখিতে পারা যায়। হসন্ত বর্ণের স্বরবর্ণ থাকে না বলিয়া আমরা হসন্তমাত্রিক স্বরের স্বরবর্ণ লোপ করিয়া দিলাম।

আমাদের সিকিমাত্রিক স্বর অনেকটা হসন্তমাত্রিক স্বরের মত শোনায় বলিয়া আমরা তাহাকে ভিন্নরূপে লিখিতে গেলে তাহাতে ১/৪ (সিকিমাত্রার চিহ্ন) না দিয়া হসন্তচিহ্ন দিব এবং হসন্তমাত্রিক স্বর অপেক্ষা তাহার কিঞ্চিৎ প্রাধান্য থাকাতে-স্ত্রীস্বর হইতে সিকিমাত্রিক স্বরের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য, সিকিমাত্রিক স্বরের স্বরবর্ণ রক্ষা করিব। যথা ১/৪পা==প্া। এই পা স্বরটী যদি স্ত্রীস্বর হইত তাহা হইলে প্ এইরূপ লিখিতাম।

স্ত্রীস্বরে তড়িৎযুক্তভাব বিদ্যমান থাকাতে তাহাকে মুখ্যস্বর বা পতিস্বরের সহিত ইচ্ছা করিলে যুক্ত করিয়াও লিখিতে পারি;—বর্ণমালার নিয়মানুসারেও আমাদের যুক্ত করিয়া লিখিবার অধিকার আছে। যথা স্রে=স্রে; র্গা—র্গা; গ্মা—গ্মা ইত্যাদি। যেগুলির বেলায় একেবারে যুক্তাক্ষর পাওয়া যাইবে না অথবা যুক্তাক্ষরের সুবিধা হইবে না সেগুলির বেলায় স্ত্রীস্বরটী মুখ্যস্বরের মাথায় আড়ভাবে ক্ষুদ্র করিয়া লিখিলেই চলিবে।

আমাদের যুক্তাক্ষরের ভাবের মধ্যেই মুখ্যবর্ণের উপর আড়ভাবে বা সোজা-ভাবে, ক্ষুদ্র বা অক্ষুদ্ররূপে হসন্ত বর্ণ লিখিবার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

ক্রমশঃ—

ধর্ম্মসাধনা।

দশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গসমাজে নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা প্রায় শ্রবণগোচর হইত না। তাহা হিন্দুশাস্ত্রে ও প্রধান পণ্ডিত-মণ্ডলী মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। আজিকার দিনে ছেলে বুড়া, জ্ঞানী অজ্ঞানী, অধিকারী অনধিকারী, স্ত্রী পুরুষ, সকলেরই মুখে শুনিতে পাইবে—নিষ্কামধর্ম্ম, যোগ, ভগবদ্গীতা ও মুক্তি। আমরা জানি, নিষ্কাম ধর্ম্ম ও যোগ, অতি গুরুতর বিষয়। নিষ্কামধর্ম্ম এত উচ্চ বিষয়, যোগ এত দুর্ঘট যে, সে সকল কথা ছেলেখেলা নয়। সামান্য লোকের সহিত প্রকৃত যোগীর আকাশ-পাতাল ভেদ। মায়া-মুগ্ধ সংসারীর সহিত নিষ্কামীর প্রভেদ হিমালয় হইতে কুমারী অন্তরীপ। বিষয় অতি উচ্চ, জিনিষ অতি উত্তম, কিন্তু অত্যন্ত দুর্লভ। নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিতে অতি মিষ্ট এবং কল্পনাতে অতি পবিত্র, কিন্তু সে মধুর রব দৈববাণীর ন্যায়, আর সে পবিত্রতা কবির কল্পনার ন্যায়। কোথায় আমরা সংসারের ঘোর মায়ায় আবদ্ধ, কোথায় ঋষি-চরিত্রের নির্লিপ্ত নিষ্কাম ভাব! সে ভাব সুদূর শান্তিময় স্বর্গবাসে রহিয়াছে, আর আমরা পড়িয়া রহিয়াছি, দুঃখময় পৃথ্বীতলে। স্বপ্নবৎ সে ভাব নিদ্রাকালে সত্য বোধ হয়, কিন্তু জাগরণে দেখি, সে স্বপ্ন আকাশকুসুমবৎ চন্দ্র-লোকে মিলাইয়া গিয়াছে।

নিষ্কামধর্ম্মের মহা কর্ম্মযোগ অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। শাস্ত্রে পড়িতে বেশ, শুনিতে বেশ কিন্তু কয় জন সে যোগে সিদ্ধ হইয়াছেন? দশ বিশ হাজারের মধ্যেও একজন নিষ্কামী হইতে পারেন কি না সন্দেহ। কিন্তু না হইলেও আদর্শ থাকা চাই। সেই আদর্শ ব্যাস ভগবদ্গীতায় দিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শের দিকে যাঁহারা সমাজের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সমাজের পরম মিত্র। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদের লক্ষ্য কত উচ্চ! সে আদর্শে উঠিবার সোপানও ব্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শের সোপান সকাম প্রবৃত্তিপথ। এই সকাম প্রবৃত্তিপথের পথিক সাধারণ লোক-সমাজ ও সংসারী জনগণ। তাহাদের জন্যই বিস্তারিত পুরাণ-শাস্ত্র। গীতা এক খানি, পুরাণ আঠার খানি। কারণ, প্রাকৃত জনগণের সংখ্যাই অধিক। সেই প্রাকৃত জনগণের বিভিন্ন রুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রবৃত্তিপথ প্রদর্শন করাই বিস্তৃত ও বহুবিধ পুরাণের উদ্দেশ্য।

আমরা যে সকাম সংসার ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত, প্রবৃত্তি পথের যে বিশাল রাজ্যে আমরা পরিবৃত, অগ্রে আমাদের তাহার সমুদয় ভাব তন্ন তন্ন জানা ও বুঝা আবশ্যক। কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা যাই, নিষ্কাম তত্ত্বের অন্বেষণে। যাহা আমাদের সতত অনুষ্ঠেয়, যে ব্যাপারে আমরা সর্ব্বদা ব্যাপৃত, সে সমস্ত বিষয় আমরা তুচ্ছ করিয়াছি; তুচ্ছ করিয়া, যাহা হয় ত আমরা কখন লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া একান্ত ব্যস্ত, তাহারই আলোচনা দিন-রাত।

কিন্তু যাহার আলোচনা দিন রাত করা আবশ্যক, তাহা পড়িয়া রহিল; পড়িয়া রহিল এমত ভাবে, যেন তাহার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। সকাম ক্রিয়াকলাপ, প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, শালগ্রামাদি দেব-পূজা, বার ব্রত ও পার্ব্বণ, এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা সর্ব্বদাই ব্যাপৃত, অথচ এ সমস্ত বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এ সমস্ত বিষয়ের অর্থ ও প্রয়োজন কি, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা একেবারে নির্ব্বাক। ক্রিয়াকলাপ ও দেবপূজাদির রহস্য ও অর্থ বোঝেন না বলিয়া অনেকে তাহা ছেলে-খেলা বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাই ভক্তি-পথ ও নিষ্কামধর্ম্মের সোপান।

ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ট, শিবসংহিতাদি পাঠ করিয়া ভক্তি-পথের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই সমুদয় শাস্ত্রালাপের সহিত পুরাণাদি পাঠ করাও বিশেষ কর্ত্তব্য। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়—শাণ্ডিল্য বিদ্যা, পুরাণ, স্মৃতি ও ব্যবহার শাস্ত্রাদি। তাহাদের আদর অগ্রে; অগ্রে এই জন্য যে, তাহাদের সহিত আমরা নিকট-সম্বন্ধে আবদ্ধ। উচ্চাধিকার জন্মিলে তখন উচ্চ বিষয়ের আলোচনা। অগ্রে আমাদের গৃহে ও তৎপার্শ্বে কি আছে তাহা জানিয়া তবে দূরের সম্বাদ লওয়া উচিত। সর্ব্ববিষয়েই আমরা এইরূপ অনভিজ্ঞ। নিজ ভারতের বিষয় আমরা কিছুই জানি না, কিন্তু সুদূর ইংলণ্ড বা আমেরিকার খবর আমরা ভাল জানি। ধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে ঠিক আমরা তাহাই করি।

এক্ষণকার ইংরাজী শিক্ষিত কৃতবিদ্য জনগণের নিকট সকাম ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি তত আদরণীয় নহে। তাঁহাদের চক্ষে নিষ্কাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অধিকতর। তাঁহাদের অভাব কেবল সেই ভক্তি, যে ভক্তির সাহায্যে নিষ্কাম পথে উঠিতে পারা যায়। নিষ্কাম ধর্ম্মের মূল যাহা তাহাই নাই। নিষ্কামধর্ম্ম ত মুখের কথা নয় যে, সে ধর্ম্ম কি এবং তাহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা জানিতে পারিলেই চিত্ত অমনি নিষ্কামভাবে পরিপূর্ণ হইবে? দৃঢ় ঈশ্বরানুরাগই নিষ্কাম ধর্ম্মের মূল। অনুরাগ কখন মুখের কথায় উদয় হয় না। ভালবাসা, প্রীতি, কি দয়া বলিবা মাত্র উপস্থিত হয় না। জোর করিয়া কেহ কাহাকে ভালবাসিতে পারে না। সংসারে সামান্য বিষয়ে যাহা সত্য, ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাহা সত্য। যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, তাহার সম্বন্ধে যে কথা খাটে, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি ত সে কথা অধিকতর খাটে। যাহা দেখিতেছি তাহাকে যদি আমরা মনে করিলেই ভালবাসিতে না পারি, তবে যাহা কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, তাহাকে কিরূপে ভালবাসিতে পারিব? যাহা দেখিতেছি, তাহাকে যত শীঘ্র ভালবাসিতে পারি, অদৃশ্য পদার্থকে তত শীঘ্র ভালবাসিতে পারি না। এজন্য অনুরাগ ও ঈশ্বর-ভক্তি উদয় হইবার পূর্ব্বে, ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করা একান্ত আবশ্যক। সেই জ্ঞান এরূপ হওয়া চাই যেন, ঈশ্বর অন্তর্দৃষ্টিতে সর্ব্বদাই জাজ্বল্যমান থাকেন। শুদ্ধ জাজ্বল্যমান নয়, অতি মনোহর মূর্ত্তিতে জাজ্বল্যমান থাকেন। এই ঈশ্বরপ্রীতি জন্মিবার

পূর্ব্বে আমাদের কি কি চাই, তাহা আমরা বলিতেছি।

প্রবৃত্তি পথে লোক কেবল ঐহিক সুখেরই অভিলাষী থাকে। এই প্রবৃত্তি স্রোতকে ঐহিক সুখের দিক হইতে পারত্রিক সুখের প্রতি প্রথমে নিয়োজিত করা আবশ্যক। অভ্যাস বশতঃ ক্রমে পারত্রিক সুখ লক্ষ্য ও তিরোহিত হয় এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মে মনের আনন্দ জন্মে। তখন ধর্ম্ম-কর্ম্ম সহজ ও অভ্যস্ত হইয়া আইসে। ধর্ম্ম-কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি সাধন করা অত্যাবশ্যক।

চিত্তশুদ্ধি লাভার্থ বঙ্গসমাজে দ্বিবিধ প্রশস্ত পথ নির্দ্দিষ্ট আছে—একবিধ শাক্তের পূজাদির ব্যবস্থা, অন্যবিধ বৈষ্ণব রাগ-মার্গ। আমাদিগের মুনি ঋষিগণ জানিতেন, জনসমাজ নানাবিধ রুচি-বিশিষ্ট লোকসমূহে পরিপূর্ণ। নানাবিধ রুচির পক্ষে একমাত্র পথ সুখসেব্য হইতে পারে না। নানাবিধ রুচির উপযোগী বিভিন্ন সাধন-পথ চাই। এজন্য হিন্দুসমাজে যেমন নানাবিধ মূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত, তদ্রূপ নানাবিধ সাধন-পথও প্রচলিত। অন্যান্য ধর্ম্মে নানাবিধ সাধন-পথ নাই বলিয়া অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী জনসমাজের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও ভক্তিরাগ তত প্রবল নহে। এজন্য হিন্দুসমাজস্থ প্রাকৃত-জনগণ অন্য ধর্ম্মীয় প্রাকৃত জনগণ অপেক্ষা অধিকতর ধার্ম্মিক ও শান্ত-স্বভাব। নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে হিন্দুগণ ধর্ম্মসাধনপথ অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্ম পালনে চিরদিন ব্রতী থাকেন। সেই পথে যিনি অনুরাগের বৃদ্ধি করেন তিনিই ক্রমশঃ ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইতে পারেন। সেই জন্য ব্যাস পূজাদির সুব্যবস্থা করিয়াছেন এবং গর্গাচার্য্য শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তন ও হরি কথাদিতে অনুরাগের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেব পূর্ব্বতন শাক্তবঙ্গে বৈষ্ণব সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তিপথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত পথের সম্যক আলোচনা হওয়া এক্ষণে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, এইরূপ একটি পথের পথিক না হইলে আমরা কখন ভক্তিতে সমুন্নত হইতে পারিব না।

যে পথের পথিক হও না কেন, চিত্তশুদ্ধি সাধন করিতে হইলে হিন্দুধর্ম্মে দুই বিধ শুদ্ধিপথ গ্রহণ করিতে হইবে—দৈহিক ও মানসিক শুদ্ধি। মানসিক শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় বশীভূত না করিতে পারিলে সঞ্জাত হয় না। ইন্দ্রিয়গণের প্রাবল্য হ্রস্ব করিবার জন্য শারীরিক নিয়মাদিও আবশ্যক। যিনি শুদ্ধাচারী হইতে পারেন তাহারই ইন্দ্রিয়-দমন সুসাধ্য হয়। শুদ্ধাচার পবিত্রতা সাধনের পরিষ্কার পন্থা। শুদ্ধাচারে থাকিলে একদা দ্বিবিধ নির্ম্মলতা সংসাধিত হয়। তদ্দ্বারা শারীরিক শুদ্ধি সাধন হয় এবং ইন্দ্রিয়-দমনের সদুপায় হয়। এই শুদ্ধাচার, আর্য্যরীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট দেশাচারানুচারী হইয়া চলিলে সুসম্পন্ন হয়। আজ কাল ম্লেচ্ছাচারে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। সেই সমস্ত ম্লেচ্ছাচার আপাততঃ সুখসেব্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রাবল্য জন্মে এবং শারীরিক দুর্নিয়মের অভ্যাস হইয়া আইসে। সুতরাং ম্লেচ্ছাচার চিত্তশুদ্ধির ঘোর অন্তরায়। আর্য্যধর্ম্মের সাধন-পথ সমস্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর

করে। এই সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন না হইলে শুদ্ধাচার-সম্পন্ন হওয়া যায় না। আর্য্য রীত্যনুযায়ী চলা এজন্য একান্ত আবশ্যক। এই শুদ্ধাচারে ভক্তি-পথ আরব্ধ হয়। যিনি আর্য্য শুদ্ধাচার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিলাভের আশা করেন তাঁহার দুরাশা মাত্র। গোড়া কাটিয়া আগায় জলসেচন করিলে কোন তরু জন্মিতে পারে না। এজন্য ভক্তি-পথের ভিত্তি-স্বরূপ আর্য্য ধর্ম্মে অগ্রে শুদ্ধাচারের নিয়মাদি নিয়োজিত হইয়াছে। যিনি ভক্তি-পথে উঠিতে চান তাঁহার শুদ্ধাচারী হইয়া থাকা অগ্রে কর্ত্তব্য। এই শুদ্ধাচার হইতে ভক্তি-পথের তপস্যা আরব্ধ হয়।

মনের মালিন্য দূর করিতে না পারিলে ভক্তির উদয় সম্ভাবিত নহে। এই মনোমালিন্য অজ্ঞান ও পাপাসক্তি-সম্ভূত। যত দিন পাপাসক্তি থাকিবে, তত দিন মনোমালিন্য অনিবার্য্য। মালিন্য বিদূরিত হইলে যখন চিত্তের পবিত্রতা ঘটে, তখনই ঈশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি তাহাতে প্রতিভাত হইতে পারে, প্রতিভাত হইবে যেমন স্বচ্ছমুকুরে সূর্য্যালোক। অগ্রে চিত্ত মালিন্য দূর না করিয়া যিনি ভক্তি-সঞ্চারের আশা করেন, তাহার নিতান্ত দুরাশা বলিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধি করিবার জন্য শাণ্ডিল্য ঋষি দ্বিবিধ সাধন-পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বুদ্ধির মালিন্য দূর করিবার নিমিত্ত জ্ঞানের আবশ্যকতা এবং হৃদয় হইতে পাপাসক্তি দূরীকরণার্থ গৌণীভক্তিমূলক নানাবিধ অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা। জ্ঞানের পরিপাক না হইলে ভগবৎ বিষয়ে সন্দেহ বা অজ্ঞানতা-নিবন্ধন মালিন্য যায় না, এই মালিন্য না যাইলে ঈশ্বরের স্বরূপ ছবি মনে উদয় হয় না। তদ্রূপ পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত * এবং নানাবিধ পুণ্যানুষ্ঠান না করিলে কখন পাপাসক্তি বিনষ্ট হয় না। শ্রবণ, মননাদি দ্বারা এই দ্বিবিধ মালিন্য নিরাকৃত হইয়া থাকে। এরূপ অনুষ্ঠান ও অজ্ঞানতার নিরসন কত কাল করিতে হইবে? যত কাল না চিত্তশুদ্ধি জন্মে। একবার, দুই বার, তিন বার মাত্র করিলে হইবে না, যতবার না যত্ন সফল হয় ততবার করিতে হইবে। যেমন যতক্ষণ না ধান্যের সমুদয় তুষ ক্ষালিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অবঘাত আবশ্যক, তেমনি, যতদিন পর্য্যন্ত না সমুদয় চিত্ত-মালিন্য দূরীকৃত হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সাধনা আবশ্যক। ভক্তির সাধন-পথ এতই কঠিন। নিষ্কামধর্ম্মে আসিবার পন্থা এতই দুরূহ।

সর্ব্ব স্থানেই এই মালিন্য দূর করিবার আবশ্যকতা হয় না। অনেক সরল-চিত্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃই পরিশুদ্ধ ও ভক্তিশীল। স্ত্রীজাতির চিত্ত বিশেষতঃ এইরূপ। ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের অচলা শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তাহাদের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা তর্ক উপস্থিত হয় না। ভক্তের নিকট তর্ক নাই, অবিশ্বাস নাই, সন্দেহ নাই। তাহাদের চিত্ত স্থির। ঈশ্বর-প্রীতি তাহাদিগের চিত্তকে সরল করিয়াছে। ভক্তি-প্রভাবে তাহাদের কাছে পাপাসক্তি আসিতে পারে না। ভগবানের

* হিন্দুশাস্ত্র মতে প্রায়শ্চিত্তের অন্তরঙ্গ সাধন বা প্রধান অঙ্গ অনুতাপ, আর বহিরঙ্গ সাধন বা সামাজিক শাসন প্রায়শ্চিত্তের বহিরনুষ্ঠান।

কৃপার প্রতি তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাসী। সেই কৃপাতে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত কার্য্যে ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আছেন। তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়েই ভগবানের কৃপা দেখিতে পান; এ পৃথিবী তাঁহাদের নিকট সৌন্দর্য্যময়। পুরাণে এইরূপ স্বাভাবিক ভক্তিভাবের প্রকটন আমরা গোপীগণের দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই। যাহাদের ভালবাসা স্বাভাবিক, তাহাদের নিমিত্ত ভালবাসা সঞ্চারের উপায় নির্দ্দেশ অনাবশ্যক। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তাহাদিগের জন্য ভক্তিশাস্ত্র প্রণীত হয় নাই। নিষ্কাম ভাব তাহাদের সহজ-লভ্য। শাণ্ডিল্য বলেন এই প্রকার সরল ব্যক্তিগণের স্বাভাবিক ভক্তি জন্মান্তরের পুণ্যফল। এরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। সকল লোক যদি সহজেই পুণ্যবান, সাধু, সচ্চরিত্র ও ঈশ্বর-নিষ্ঠ হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? এ পাপ-পৃথিবী স্বর্গবাসে পরিণত হইত।

প্রাচীনকালে হিন্দু ভক্তগণ এতদূর ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন, যে তাঁহারা ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বিষয় অধিক চিন্তা করিতেন না। তাঁহারা ঈশ্বরভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাকে হস্তামলকবৎ প্রতীয়মান দেখিতেন। ঈশ্বর লইয়াই তাঁহাদের চিন্তা, রমণ, ক্রীড়া ও আনন্দ ছিল। ততদূর ঈশ্বরপরায়ণতা না জন্মিলে কেহ নিষ্কাম হইতে ও ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিতে পারে না। যে ঈশ্বরকে পূর্ব্বতন ঋষিগণ মানসচক্ষে প্রত্যক্ষবৎ জাজ্বল্যমান দেখিতেন, তাঁহার উপাসনাই তাঁহাদের সমস্ত জীবনের কার্য্য ছিল। সেই ঈশ্বরপ্রেমে তাঁহারা এতদূর ভোর হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে শুদ্ধ মানস-প্রতিমারূপে রাখিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাঁহার অশেষবিধ শক্তিরূপ স্থূলশরীরে প্রতীয়মান করিয়া সেই রূপের ষোড়শোপচারে পূজা করিতেন, সেই মূর্ত্তি লইয়া দিবা রাত্র রমণ ও আনন্দ করিয়া তবে সন্তৃপ্ত হইতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের ভক্তি তৃপ্তি লাভ করিত না *। সেই মূর্ত্তিময় ঈশ্বরকে তাঁহারা পূজা করিতেন নিজে, শিষ্যগণ সঙ্গে, পরিবারমণ্ডলী মধ্যে এবং সমাজস্থ জনগণ লইয়া। এরূপে পূজা না করিলে তাঁহাদের আনন্দ জন্মিত না। সে আনন্দ কি তাঁহাদের হৃদয়ে ধরিত? শতধারায় উৎসারিত হইয়া সর্ব্ব সমাজে ব্যাপৃত হইত। সর্ব্ব সমাজকে ভক্তিপথে আনিত। তাই হিন্দুর নিকট মূর্ত্তিপূজার এত গৌরব, এত উৎসব। যাঁহারা পরম ভক্ত, তাঁহারা এই মূর্ত্তিপূজা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাহা তাঁহাদের জীবনের আনন্দ ও যথাসর্ব্বস্ব। তাহা ভক্তিরই বৃদ্ধি সাধন করে। ভক্ত যত উন্নত হয়েন, ততই তাঁহার দেবপূজার বৃদ্ধি হয়। ভক্তি যেমন দেবপূজার বৃদ্ধি করে, দেবপূজাও তেমনি ভক্তির বৃদ্ধি করে। এই জন্য হিন্দুসমাজে মূর্ত্তি পূজার এত বাহুল্য দেখা যায়।

* হিন্দুধর্ম্মে সাকার উপাসনা দ্বিবিধ—(সগুণ ঈশ্বরের) মানসিক সূক্ষ্ম সাকার উপাসনা এবং প্রতিমাদি স্থূল সাকার উপাসনা। কেবল নির্গুণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের উপাসনাই নিরাকার-উপাসনা।

ভগবদ্গীতা, ১২ অঃ, ১—৭।

গৌণীভক্তি সম্যক প্রস্ফুটিত হইলে মূর্ত্তি-পূজায় বিকশিত হয়। ভক্তি যখন চরম সীমায় আইসে, তখন তাহা সগুণ ভগবানকে ধ্যানে প্রত্যক্ষ দেখে। সেই প্রত্যক্ষের ফল ভগবানের শাক্তশরীর ও দেবমূর্ত্তি। যে দেবমূর্ত্তি-পূজা ভক্তির পরাকাষ্ঠায় প্রকটিত হইয়াছে, সেই মূর্ত্তি-পূজা আবার ভক্তি বৃদ্ধির সাধন। যাহা ভক্তি হইতে প্রসূত, তাহাই ভক্তিতে লইয়া যায়। তাহা সেই ভক্তিতে লইয়া যায়, যে ভক্তিতে উপনীত হইলে মানব ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব হয়েন এবং ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম ও প্রাণ মন সমর্পণ করেন। হিন্দু যখন এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন তাঁহার নিষ্কামভাব স্বতঃই সম্ভূত হয়।

নিষ্কামভাব পরাভক্তির ফল। পরাভক্তি চিত্তের প্রবল ঈশ্বানুরাগ। শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন :—

"সাপরানুরক্তিরীশ্বরে।"

এই সূত্র দ্বারা শাণ্ডিল্য পরাভক্তিকে গৌণীভক্তি হইতে—প্রভিন্ন করিয়া দিলেন। তাঁহার মতে পরাভক্তিই ভক্তি নামের যোগ্য। গৌণী ভক্তিকে তিনি শ্রদ্ধা নাম দিয়াছেন। কিন্তু সচরাচর শ্রদ্ধা ও ভক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। এজন্য আমরাও অনেক স্থলে সেই অর্থে ভক্তি শব্দও ব্যবহার করিয়াছি। সে যাহাহউক, শাণ্ডিল্য বলেন, ভক্তি কেবল ঈশ্বরে অনুরাগ। তাহা ইচ্ছা করিলেই সমুৎপন্ন হয় না। ঈশ্বরে দৃঢ়ানুরক্তি অনেক সাধনার ফল। গীতা বলেন, অনেকে অনেক সাধনা করিয়াও সফল হয়েন না। যাহা এত সাধনার ফল, তাহা কি শুদ্ধ মুখের কথা? না, শ্রবণ করিলেই তাহা হৃদয়ে উদয় হইবে? চিরদিন, প্রতিদিন সাধনা কর, তবে যদি ঈশ্বর কৃপা করেন। ভক্তি-বলে ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত প্রবল ভক্তির উদয় হয় না।

মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎ কৃপালেশাদ্বা।

নারদীয় ভক্তিসূত্র।

মহাত্মাগণের কৃপা বা ভগবানের কৃপাদৃষ্টি ভক্তির মুখ্য সাধন। সেই কৃপাকণা লাভ করিতে হইলে অনেক সাধনা করিতে হয়। সাধুসঙ্গ ও দেবসঙ্গই তাহার প্রধান সাধন। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে থাকিতে থাকিতে, দেবসাধনা করিতে করিতে তবে ক্রমে ভক্তি সঞ্চারিত হয়। ভক্তির সঞ্চার না হইলে নিষ্কাম ধর্ম্ম কখনই সাধ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর কামনা ব্যতীত অন্য কামনা যখন মনে স্থান না পায়, তখনই হৃদয়ে নিষ্কামভাবের সঞ্চার হইতে পারে। শুদ্ধ ঈশ্বর কামনায় জীবনোৎসর্গ তখন ঘটে, যখন মন হইতে অন্যান্য কামনা তিরোহিত হয়। সামান্য ঈশ্বরানুরাগে মনের এ অবস্থা সম্ভাবিত নহে। সেই অনুরাগ প্রবল করিতে হইলে যাহাতে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ঘটে এরূপ সাধনা করা চাই। মায়াময় সংসারবন্ধে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ঘটা বড় সহজ কথা নহে। ইচ্ছা করিয়া কর্ম্ম-ত্যাগ করিলে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ঘটে না; কিন্তু যখন কর্ম্ম আপনা আপনি পরিত্যক্ত হয়, তখনই কর্ম্ম-সন্ন্যাস ঘটে। ইচ্ছা করিয়া সংসারবিরাগী হইলে কি মনের বাসনার অবসান হয়? হৃদয়ভরা বাসনা অতৃপ্ত থাকিলে কি কেহ বিরাগী হইতে পারে? কামনা পরিত্যাগ করা বহু অভ্যাসের ফল। অভ্যাস করিতে করিতে তবে লোক ক্রমে ক্রমে কর্ম্মফলত্যাগী

হইয়া ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিতে পারে। মনের যখন এই অবস্থা হয়, তখন তাহার কর্ম্ম-সন্ন্যাস ঘটে। কর্ম্ম সন্ন্যাসীই যথার্থ বৈরাগী। কর্ম্ম-সন্ন্যাস ঘটিলে সংসারধর্ম্মে স্বতঃই বিরাগ জন্মে। সংসার ধর্ম্মে বিরাগ জন্মিলে সে ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। সে ধর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার জন্য অগ্রে সংসারীকে প্রবৃত্তিপথের পথিক থাকিতে হইবে। এই প্রবৃত্তি-পথের পথিক থাকিয়া সকামভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করিতে করিতে যখন সংসারীর বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশঃ ভক্তির পরিণতি ঘটিবে, তখন তিনি নিজেই সংসারবিরাগী ও ঈশ্বরানুরাগী হইবেন। ঈশ্বরানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের সংসার বিরাগ উপস্থিত হয়। যিনি দুইদিক বজায় রাখিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মবীর। কিন্তু সেরূপ ধর্ম্মবীরত্ব অতি দুর্ল্লভ। প্রাকৃত জনগণে তাহা সম্ভাবিত নহে। এজন্য প্রাকৃত জনগণের পক্ষে অগ্রে সংসারধর্ম্মের সহিত সকাম প্রবৃত্তিপথের ব্যবস্থা। প্রবৃত্তিপথের অনুষ্ঠানাদি করিতে করিতে সংসারীর যখন প্রকৃত ভক্তির উদয় হইবে তখন তাহার কলি ভোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ের প্রায় শেষ, বার্দ্ধক্যের উপক্রম। সে সময়ে সংসার-বিরাগী ও ঈশ্বরানুরাগী হওয়াই উচিত। বার্দ্ধক্যেও যিনি ঈশ্বরানুরাগী না হন, তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল বিফল হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে যিনি ঈশ্বরানুরাগী হইতে পারেন, তাঁহারই ধর্ম্মানুষ্ঠান যথার্থ ফলপ্রসূ হইয়াছে। নিতান্ত পক্ষে বার্দ্ধক্যে একান্ত ঈশ্বরানুরাগী হওয়া চাই। তজ্জন্য হিন্দুধর্ম্মের নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির নিয়ম। এই নিয়মাদি সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইলে ভক্তি-সঞ্চারেরই কথা। অনেকস্থলে তাহা ঘটিয়াও থাকে। যেস্থলে তাহা না ঘটে, সেস্থলে পৌরাণিক জ্ঞান যথারীতি অর্জ্জিত হয় নাই এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয় নাই। যথারীতি সুসম্পন্ন হইবার জন্য তাহাতে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা চাই। যাহাতে এই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা জন্মে অগ্রে তাহার শিক্ষা ও তরিবদের প্রয়োজন। এই শিক্ষার জন্য সংসারীর সকাম ধর্ম্মে রীতিমত তরিবদ আবশ্যক।

এই সমস্ত সোপান ধরিয়া গেলে তবে ক্রমে ঈশ্বরানুরাগ সঞ্জাত হইতে পারে। সংসার ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরানুরাগ যাহাতে জন্মিতে পারে এইরূপ পন্থা হিন্দুধর্ম্মে ব্যবস্থিত হইয়াছে। গৃহীর যত দিনে ঈশ্বরানুরাগ জন্মিবে, তত দিনে তাহার পুত্র পৌত্রাদি মানুষ হইয়া সংসারী হইয়া আসিবে *। তজ্জন্য হিন্দুশাস্ত্রে পুত্রকামনা। পুত্রগণ গৃহীকে সংসার-বন্ধনরূপ পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করেন। পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গৃহী ঈশ্বরানুরাগের পরিণতি সাধন করেন। গৃহী তখন বানপ্রস্থ। নিষ্কামী হইয়া গৃহী তখন সংসার হইতে অপসৃত হয়েন। সুতরাং বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে, সকামের পরিণতি না হইলে নিষ্কামভাবে আসা যায় না। ভক্তিশাস্ত্রের সংকল্প ও কল্পনা এই।

---

* সাধারণ সমাজের জন্য এই নিয়ম। দু চারিজন এই নিয়মাতিরিক্ত হইলে তাহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে। তাহারা নিয়মের নিপাতন। সকল নিয়মেরই নিপাতন আছে।

এই সকাম ধর্ম্মে হিন্দু পরিপুষ্ট হইলে তবে তিনি নিষ্কামী হইতে পারিবেন। ধর্ম্মের জন্য হিন্দু সকাম, দেবত্বের জন্য হিন্দু সকাম। হিন্দুর ধনকামনা, যশোলিপ্সা প্রভৃতি সমস্ত কামনাই ধর্ম্মের জন্য। এই সকাম পথে হিন্দুকে পরিচালন করিতে পারিলে তাঁহার ভক্তির উদয় হয়। এই সকাম হিন্দুর সকাম, আমরা অন্য সকামের কথা বলি নাই। এই সকাম ধর্ম্মে হিন্দুকে সুশিক্ষিত করা অগ্রে কর্ত্তব্য। সুতরাং সকাম ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠ, পৌরাণিক চরিত-কীর্ত্তন এবং অপরাপর আলোচনা ও সাধনা দ্বারা হিন্দুসংসারীকে ভক্তি পথে উঠিতে হইবে। কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ হৃদয় মধ্যে জাজ্বল্যমান থাকা চাই। এই আদর্শ ধরিয়া গৃহী একে একে ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ করিতে অভ্যাস করিবেন। এই অভ্যাস ব্যতীত নিষ্কাম পথে আসা যায় না। এই অভ্যাস ধর্ম্মানুরাগ সাপেক্ষ। ধর্ম্মানুরাগ শ্রদ্ধা-সাপেক্ষ। শ্রদ্ধা ভজনা-সাপেক্ষ। ভজনা গৌণীভক্তিমূলক উপাসনা। পাপাসক্তি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে উপাসনা আবদ্ধ হয় না। পাপাশক্তি পরিত্যাগের উপায় প্রায়শ্চিত্ত ও আত্মসংযম। আত্মসংযমী না হইতে পারিলে পুণ্যপথে আসা যায় না। এই সোপান ধরিয়া গেলে তবে নিষ্কাম পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই নিষ্কামের প্রথম সোপান সকাম প্রবৃত্তি পথে। প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মকামনায় প্রত্যাবর্ত্তন করাই সকাম ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই অনিত্য সুখের অভিলাষী। সেই দিক হইতে ফিরাইয়া তাহাকে ধর্ম্মের দিকে আনা চাই। প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মানুগামিনী করাই প্রথম কার্য্য। এই কার্য্য হইতে ধর্ম্ম পথ আরব্ধ হয়। দুঃখের বিষয় এই, আমরা আগেকার কাজ ভুলিয়া রহিয়াছি। তদ্বিষয়ে আমাদের কিছুই অভিনিবেশ নাই। আমরা জলসর্প ধরিতে না শিখিয়া একেবারে কালসর্প ধরিতে ব্যস্ত হইতেছি। এ চেষ্টা ও যত্ন সুতরাং বিফল হইতেছে। তাই বলি, আগেকার কাজ আগে করা উচিত। সকাম প্রবৃত্তিমূলক শাস্ত্রাদি ও সাধন পথের আলোচনা আগে করা উচিত। নিষ্কাম আদর্শ ও লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়া যাহাতে ঈশ্বরানুরাগ জন্মিতে পারে, এমত সাধনায় অগ্রে মনোযোগী হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

আমরা গীতানুসারেই এই সাধনপথ বিবৃত করিয়াছি। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পরম ভক্তির সহিত গৌণী ভক্তিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। কারণ গৌণী ভক্তির সহিত পরমভক্তি অতি ঘনিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ। গৌণী ভক্তির পথ ধরিয়া গেলে তবে পরম ভক্তিতে উপনীত হওয়া যায়। গৌণী ভক্তির সহকারিতা না থাকিলে পরমভক্তি প্রস্ফুটিতে পারে না। গৌণী ভক্তির শিরে পরম ভক্তি আছে বলিয়া গৌণী ভক্তির এত গৌরব। উভয়ে এইরূপ দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ। যেমন মুখই দেহের গৌরবস্থল, মুখ না থাকিলে দেহীকে চেনা যায় না দেহের গৌরব হয় না; সেইরূপ পরম ভক্তি শেষে আছে বলিয়া গৌণী ভক্তির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু যেমন-দেহের স্ফুর্ত্তি না হইলে আস্য দেশের স্ফুর্ত্তি হয় না, দেহ নহিলে মুখ তিষ্ঠিতেই

পারে না, তেমনি গৌণী ভক্তির অবলম্বন না থাকিলে পরম ভক্তি দাঁড়াইতে পারে না। এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়া, ভগবদ্গীতা তত্ত্বভয়কে এক সঙ্গে গ্রথিত করিয়া বলিতেছেন।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভবতর্ষভ॥
গীতা। ৭— ৬।

হে অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই সুকৃতি বশতঃ আমাকে ভজনা করিয়া থাকে।

এই চতুর্ব্বিধ ভক্তগণের মধ্যে জ্ঞানীই মুখ্য, অন্য ত্রিবিধ গৌণ। শাণ্ডিল্যের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর বলেন, যেমন রাজ সমভিব্যাহারে সৈন্য থাকিলে, সৈন্যগণের গৌরব হয়, তদ্রূপ জ্ঞানীর সাহচর্য্য বশতঃ ত্রিবিধ ভক্তের প্রাধান্য হইয়াছে।" আবার একথাও সত্য যে, যেমন সৈন্যবল ব্যতীত রাজা তিষ্ঠিতে পারেন না, তেমনি ঐ ত্রিবিধ ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত মুখ্য ভক্তি সঞ্জাত হইতে পারে না। মুখ্যভক্তি সঞ্জাত হয় কিরূপে গীতা তাহার উপদেশ দিতেছেন:—

"কামনাতে যাহাদিগের বিবেক আচ্ছাদিত আছে, তাহারা বাসনার বশীভূত হইয়া দেবতাভেদে নিয়মাবলম্বনে উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ সকল দেবোপাসক মধ্যে যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমার যে যে মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তির অন্তর্যামী হইয়া সেই মূর্ত্তির উপাসনা-বিষয়িণী অচলা শ্রদ্ধা আমিই প্রদান করি। পরে ঐ দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া সেই ভক্ত আমার আরাধনা করিয়া সেই মূর্ত্তির প্রসাদাৎ সংকল্পিত ফল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমিই সেই মূর্ত্তির অন্তর্যামিত্বরূপে আসিয়া সেই ফল প্রদান করি। ঐ সকল অল্পবুদ্ধি লোকদিগের উপাসনা জন্য ফল অনিত্য, কিন্তু যাহারা পরমেশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহারা নিত্য পরমানন্দ স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।"

গীতা। ৭ অ, ২০-২৩।

তবেই দাঁড়াইতেছে অর্থার্থী ও দ্বিবিধ। একবিধ অর্থার্থী স্বর্গাদি অথবা ঐশ্বর্য্য সুখাভিলাষী। সেই সুখ অনিত্য। অন্যবিধ অর্থার্থী নিত্য সুখরূপ ভূমানন্দের অভিলাষী। এই দ্বিবিধ অর্থার্থীই ঈশ্বরের ভজনা করেন। ঈশ্বরের ভজনা কি উপায়ে সিদ্ধ হয় তাহা ভগবদ্গীতা উপদেশ দিতেছেন:—

বহবোজ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
গী. ৪অ, ১০-১১।

অনেকেই জ্ঞান ও তপস্যাদ্বারা পবিত্র হইয়া মদ্ভাবপরায়ণ হয়। সকাম এবং নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্ম দ্বারা যে ব্যক্তি আমার সাধনা করে, আমি তাহাকে তদ্দ্বারা ফল প্রদান করি। সকলেরই প্রতি আমার অনুগ্রহ। যাহারা দেবতাদের উপাসনা করে তাহারা প্রকারান্তরে আমারই উপাসনা করে।"

এই উপাসনা কিরূপে সিদ্ধ হয়? গীতা বলিতেছেন, জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা। জ্ঞান ও তপস্যা না হইলে সংশয় ও পাপ-মালিন্য যায় না। সেই সংশয় ও মালিন্য দূরীকৃত হইলে তবে পবিত্রতা জন্মে। পবিত্রতা না জন্মিলে ভক্তির উদ্রেক হয় না। তপস্যা কি? না সমুদয় ইন্দ্রিয়াসক্তি ও মনের আবেগ বশীকরণ। তপস্যাবলে চিত্তস্থির হইলে জীব একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া তাহারই প্রসাদে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ তপস্যায় সিদ্ধ হইলে তবে জীব ঈশ্বর-লাভের ধ্রুব-পথে আসিলেন। পবিত্রচিত্তে সেই ধ্রুবপথে অগ্রসর হইলে তবে তিনি ভূমানন্দরূপ "প্রহ্লাদত্ব" অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারেন। সকাম ধ্রুবের তপস্যা সেই তপস্যা। আর, প্রহ্লাদের ভক্তিতে যে ভূমানন্দ ছিল, সেই ভূমানন্দে প্রমত্ত প্রহ্লাদ সংসারের সর্ব্বভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত ধ্রুব প্রহ্লাদের দৃষ্টান্তে আমরা ভক্তিপথের সকলি সুস্পষ্ট অঙ্কিত দেখিতে পাই। ধ্রুবই প্রহ্লাদত্বে উঠিবার ধ্রুবপথ। সেই ধ্রুবপথই তপস্যা। সকাম ভক্তি যাঁহাদের নিকট আদরনীয় নহে, যাঁহারা নিষ্কাম ভক্তির একান্ত প্রয়াসী, তাঁহারা ভাবিয়া খুন হন, কিরূপে তাহাদের একেবারে নিষ্কাম ভক্তির সঞ্চার হইবে। আমরা বলি, নিষ্কাম ভক্তি সহসা উদয় হইতে পারে না। অগ্রে গৌণী ভক্তির সাধনা কর, তবে নিষ্কাম ভক্তিতে উপনীত হইতে পারিবে। সেই গৌণী ভক্তির সাধনপথ জ্ঞান ও তপস্যা। জ্ঞান ও তপস্যার সাধন পথে সিদ্ধ হইলেই তুমি গীতোক্ত জ্ঞানী হইবে এবং নিষ্কাম ভক্তি তোমার কর-তলস্থ হইবে। ঈশ্বরকে যিনি মনোহর শিবশম্ভু বা শ্যামসুন্দররূপে সর্ব্বদা মনো-মন্দিরে স্থাপিত দেখিতে পান, তিনিই তাঁহাকে অনুক্ষণ পূজা করিতেছেন, তাঁহারই জ্ঞান-স্পৃহা সার্থক হইয়াছে, তাঁহারই তপস্যা সফলতা লাভ করিয়াছে। তিনিই নিষ্কামী হইয়া সেই হরিহর পদে সমস্তই সমর্পণ করিতে পারেন। সার্থক তাঁহার জীবন, সার্থক তাঁহার তপস্যা, সার্থক তাঁহার ভক্তি! তিনিই সর্ব্বদা ঈশ্বর-সহবাস-সম্ভোগের ভূমানন্দে ভোর হইয়া আছেন!

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

১৮। মহাভারতের চতুর্থ সংস্করণ।

পূর্ব্বে (১২ পরিচ্ছেদে) আমরা প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে, জনমেজয়ের সর্প-সত্রে ভারতাখ্যান হইবার পূর্ব্বেই পর্ব্ব-সংগ্রহ সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে ব্যাসদেব তাঁহার মহা-ভারতের, শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পর্ব্বসংগ্রহ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই, তিন সংস্করণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পর্ব্বসংগ্রহা-ধ্যায়ের সমসাময়িক মহাভারতের উপরে তিনি যে আর এক সংস্করণ (finishing touch) করেন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? এই চতুর্থ সংস্করণ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে। যে গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছে, সেই গ্রন্থে গ্রন্থকারের জীবিতাবস্থায় অপর কর্ত্তৃক রচিত শ্লোক প্রবেশ করান বড় সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় না আর যদি বা সম্ভবপর হয়, তাহাও নিতান্ত অল্প সংখ্যক হইবে, হাজার হাজার শ্লোক হইতে পারে না। তবেই আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে যে সৌতির সময়ে মহাভারত অত্যন্ত প্রচলিত গ্রন্থ ছিল কি না এবং পর্ব্ব-সংগ্রহের পরে ব্যাসদেব জীবিত ছিলেন কি না।

১৯। মহাভারতের অত্যন্ত প্রচলন।

লক্ষ শ্লোকযুক্ত (অথবা তৃতীয় সংস্করণের) মহাভারত যে সৌতির সময়ে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনুক্রমণিকার আরম্ভেই আছে—"ঋষিগণ কহিলেন, মহর্ষি দ্বৈপায়ন যে পুরাণ (মহাভারত) কীর্ত্তন করেন; * * সর্পসত্রকালে বেদব্যাসের আজ্ঞানুসারে বৈশম্পায়ন মুনি * * উপাখ্যানশ্রেষ্ঠ * * কীর্ত্তন করেন। * * * ভূমণ্ডলে কোন কোন পণ্ডিতেরা এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া-ছেন, কেহ কেহ সম্প্রতি কীর্ত্তন করিতে-ছেন, ভবিষ্যৎকালেও অনেকে কীর্ত্তন করিবেন। অশেষ জ্ঞানদায়ক এই ইতিহাস ত্রিলোকপ্রশংসিত হইয়াছে, যেহেতু ব্রাহ্মণেরা ইহাকে সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে ধারণ করিয়া আসিতেছেন * * পণ্ডিতেরা ইহার অতিশয় সমাদর করেন।" এই সকল কথায় বুঝা যাই-তেছে যে সৌতির সময়ে মহাভারতের কিরূপ সমধিক প্রচলন ছিল। আদি-পর্ব্বের বৈশম্পায়নোক্ত ভারতপ্রশংসা (৬২ম) অধ্যায় দেখিলেও মহাভারতের সেই সময়ে অত্যন্ত প্রচলন বুঝা যাইতে পারে।

আরও একটি কথা আছে। আদি-পর্ব্বের ১৬ম অধ্যায়ের প্রারম্ভে শৌনক

সৌতিকে বলিতেছেন, "তোমার পিতা নিরন্তর আমাদিগের শুশ্রূষানুসারে যেরূপ পুরাণ কীর্ত্তন করিতেন, তুমিও অবিকল বর্ণন কর।" সৌতিপিতা লোমহর্ষণ যখন ব্যাসদেবের নিকট অন্যান্য পুরাণাদির সঙ্গে মহাভারতও শিক্ষা করিয়াছিলেন (১১ম পরিচ্ছেদে দেখ), তখন ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না যে, তিনি মহাভারত বাদ দিয়া শৌনক প্রভৃতিকে অন্যান্য পুরাণই শ্রবণ করাইতেন। বিশেষতঃ অনুক্রমণিকাধ্যায়োদ্ধৃত ঋষিদিগের উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন যে, কোন্ পর্ব্ব মহাভারতের অন্তর্গত এবং কোন্ কথাই বা বেদব্যাস রচিত ইত্যাদি। এই অবস্থায় যে সৌতি বলিবার কালে স্বরচিত শ্লোক চালাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমার সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এবং অন্য কর্তৃক রচিত শ্লোক প্রবেশ করান কেবল গায়ের জোরের কথা—তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

২০। সর্পসত্রকালে বেদব্যাসের বয়স নিরূপণ।

দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের দেখিতে হইবে যে পর্ব্বসংগ্রহ রচিত হইবার পরে ব্যাসদেব জীবিত ছিলেন কি না। কিন্তু ইহা দেখিবার পূর্ব্বে তাঁহার বয়স নির্দ্ধারণ করা নিতান্তই আবশ্যক। সুতরাং অগ্রে তাঁহার বয়স নিরূপণ করিতে যত্ন করিলাম।

জনমেজয়ের সর্পসত্রে ব্যাসদেব বৈশম্পায়নকে মহাভারত শুনাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। যখন এই সর্পসত্র অথবা সর্পসত্রে মহাভারত কথারম্ভ হয়, সেই সময়ে জনমেজয়ের পৌত্র অশ্বমেধ দত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (আদি, ৯৫অ, ৮৬); সুতরাং তখন জনমেজয়ের বয়স অন্যূন ৩২ বৎসর হইয়াছিল *। জনমেজয়ের পিতা পরীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনতিদীর্ঘকাল পরেই জন্মগ্রহণ করিয়া (আদি, ৪৯অ, ১৪) ২৬ বৎসর পরে † রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন (মহাপ্রং, ১ অ, ৭)। তিনি ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন "প্রজা ইমাস্তব পিতা ষষ্টিবর্ষাণ্যপালয়ৎ" ‡ আদি, ৪৯ অ ১৬। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ২৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের দেহোপশম হয় (মৌষল, ১ অ, ১৩)। বিষ্ণুপুরাণে (৫।৩৭।১৩) লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ শতাধিক বর্ষ জীবিত ছিলেন। টীকাকার শ্রীধরস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, ভাগবতীয় শুকোক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বৎসর

---

* ন্যূনকল্পে ১৬ বৎসর বয়সকে পুত্রোৎপাদনের কাল ধরিলাম, তাহার কারণ অভিমন্যু যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হন, তখন তাহার বয়স সবেমাত্র ১৬ বৎসর (আদি, ৬৭ অ,) কিন্তু ইতমধ্যে তাঁহার পত্নী বিরাট রাজদুহিতা উত্তরা তাঁহার ঔরসে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন।

† এই ছাব্বিশ বৎসর পঞ্চ পাণ্ডবেরা রাজত্ব করেন।

‡ "প্রজা ইমা" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করা হইয়াছে যে, পরীক্ষিৎ ৬০ বৎসর বয়ক্রম অবধি রাজত্ব করিয়াছিলেন (বর্দ্ধমান রাজবাটির অনুবাদ ও কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ দেখ)। কিন্তু আমরা মূলে পাইতেছি যে, তিনি ৬০ বৎসর প্রজাপালন অর্থাৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জীবিত ছিলেন।* সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৯৯ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন প্রভৃতি প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। অর্জ্জুনের পিতা পাণ্ডু বিবাহ করিয়া, রাজত্ব করিয়া, এবং ঘোরতর তপস্যা করিয়া পরে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। সুতরাং আমরা ধরিতে পারি যে, পাণ্ডু অন্ততঃ ২৫ কি ৩০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সন্দেহের মূল নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমরা ধরিলাম যে তিনি ২০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। এই ২০ বৎসর তাঁহার রাজত্ব কাল বলিয়াও ধরিতে পারি, কারণ তাঁহার জন্মিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধত্ব প্রযুক্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। পাণ্ডুর পিতা † বিচিত্রবীর্য্য সংপ্রাপ্তযৌবন হইয়া (আদি, ১০২ অ, ২) বিবাহ করিলেন এবং সাত বৎসর সুখসম্ভোগ করিয়া কালপ্রাপ্ত হইলেন (আদি, ১০২অ, ৬৩) ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকে পুত্রোৎপাদনের বা যৌবন প্রাপ্তির কাল ধরিলে দেখিতে পাই যে, বিচিত্রবীর্য্য অন্ততঃ ২৩ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর রাজা হইলেন, তখনও তিনি যৌবন প্রাপ্ত হন নাই—রাজ্য প্রাপ্তির কিছু পরে সংপ্রাপ্তযৌবন হইলেন (আদি, ১০২অ, ১)। সুতরাং তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে অন্ততঃ ১ বৎসর এবং পরবর্ত্তী ৭ বৎসর এই ৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির কোনরূপ কালনির্দ্দেশ নাই বটে, কিন্তু তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের বিশেষ বর্ণনা আছে। সুতরাং আমরা ইহা বলিতে পারি যে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি অন্তত তাঁহার ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ঘটিয়াছিল। কিছুকাল রাজত্ব করিবাব পর তিনি ক্রমাগত তিন বৎসর কাল গন্ধর্ব্বরাজের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া পরিশেষে নিহত হন (আদি, ১০১অ, ৯-১০)। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকাল ৪ বৎসর মাত্র ধরিতে পারি। তবেই হইল যে ২০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এই দুই ভ্রাতার পিতা শান্তনুর মৃত্যুর পরেই এক ভাই চিত্রাঙ্গদ রাজ্য পাইয়াছিলেন। এখন, শান্তনু যৌবনে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ৩৬ বৎসর স্ত্রী ও বিষয় সম্ভোগ করিয়াও অরতিবশতঃ বনবাসী হইলেন—

"স সমাঃ ষোড়শাষ্টৌ চ চতস্রোঽষ্টৌ তথাপরা।
রতিমপ্রাপ্নুবন্ স্ত্রীষু বভূব বনগোচরঃ॥

(আদি, ১০০অ, ২০)

সুতরাং বনবাসের সময় শান্তনুর অন্ততঃ ৫২ (৩৬+১৬) বৎসর বয়স হইয়াছিল। এই বয়সের মধ্যে তাঁহার পত্নী গঙ্গার গর্ভে একে একে আটটি পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে সাতটি নদীগর্ভে

---

* "ভারাবতারণার্থায় বর্ষানামধিকংশত"। ভগবানবতীর্ণোঽত্র ত্রিদশৈঃ সম্প্রসাদিতঃ॥ অত্র শ্রীধর স্বামিকৃতটীকা—"পঞ্চবিংশত্যধিকংশতং শরৎশতং ব্যতীতায় পঞ্চবিংশত্যধিকং ইতি শুকোক্তিঃ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৫৯২ সংখ্যা, .৪৭ পৃষ্ঠা—বাবু সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখিত কলিযুগারম্ভ প্রবন্ধ দেখ।

† বিচিত্রবীর্য্যের তিন ক্ষেত্রজ সন্তান—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর।

নিক্ষিপ্ত হইয়া অষ্টম পুত্র ভীষ্ম জীবিত থাকেন। সুতরাং ভীষ্ম, শান্তনুর অন্ততঃ ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহাইহৌক শান্তনুর বনবাসে কত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ নাই; আমরা বনবাসের সময় এক বৎসর মাত্র ধরিয়া লইলাম। এই বনবাসের পর আর চারি বৎসর কাটিযা গেলে (আদি, ১০০ অ, ৪৪) তিনি সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন। সত্যবতীর গর্ভে তাঁহার ঔরসে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য জন্মগ্রহণ করেন এবং "বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে না হইতেই" তিনি পরলোক গমন করেন। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে শান্তনুর মৃত্যুকালে চিত্রাঙ্গদের অন্ততঃ ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। এই সকল অঙ্কপাত দৃষ্টে অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে যে শান্তনু প্রায় (৫২ + ১ + ৪ + ১৬) = ৭৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইহাও দেখিয়াছি যে ভীষ্ম অন্ততঃ শান্তনুর ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা হইতেই স্থির হইতেছে যে ভীষ্ম শান্তনুর মৃত্যুর (৭৩—২৪ =)৪৯ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এদিকে আবার শান্তনুর দ্বিতীয়া পত্নী সত্যবতীর কন্যাকালে পরাশরের ঔরসে তপস্বী বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ব্যাসদেব ভীষ্মের বহু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহারা যে খুব কাছাকাছি জন্মিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

এতক্ষণ আমরা আরোহণ প্রণালী অবলম্বন করিয়া বেদব্যাসের জন্মকালে পৌঁছিয়াছি; এখন অবরোহণ প্রণালী অবলম্বন করিয়া জনমেজয়ের সর্পসত্র-কাল অবধি তাঁহার যত বয়স হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করিব। উপরে যে সকল কথা বলিয়া আসিযাছি, তাহাতেই দেখিতে পাইব যে বেদব্যাসের (অথবা ভীষ্মের) জন্ম গ্রহণের পর নিম্নলিখিতানুযাযী রাজত্বকাল কাটিয়া গিয়াছিল :— শান্তনুর ৪৯; চিত্রাঙ্গদের ৫; বিচিত্রবীর্য্যের ৮; পাণ্ডুর ২০। এই কয়েকজন রাজার পর আমরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অবধি (অর্জ্জুনের সমসাময়িক ভাবে) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত ৯৯ বৎসর অতিবাহিত বলিয়া ধরিতে পারি। তৎপরে পঞ্চপাণ্ডবদিগের রাজ্যকাল ২৬ বৎসব; অনন্তর পরীক্ষিতের রাজ্যকাল ৬০ বৎসর; তৎপরে জনমেজযের রাজ্যকাল (সর্পসত্র পর্য্যন্ত) ৩২ বৎসব। এই বৎসর সংখ্যাগুলি একত্র করিযা হইতেছে ২৯৮ বৎসর। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে জনমেজয়ের সর্পসত্রের সময় ব্যাসদেবের বয়ঃক্রম হইয়াছিল ২৯৮ বৎসর।

মহাযোগী ব্যাসদেবের পক্ষে এত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব নহে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। কেবল উড়াইয়া দিলেই চলিবে না; সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধে প্রমাণও তাঁহাদিগের প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানকালে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এই স্বভাব হইয়াছে যে, তাঁহাদের গুরু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে বিষয়ের সমর্থন বা প্রতিবাদ করিবেন, তাঁহারাও সেবিষয় ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া অবিচলিত ভাবে সমর্থন বা প্রতিবাদ করিবেন। সম্প্রতি চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ পাশ্চাত্য

পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে মাংসাশী জীব অপেক্ষা শস্যভোজী জীবগণ দীর্ঘকাল জীবিত ও নিরাময় থাকে। এখন আমরা অবশ্য বিশ্বাস করিব যে, আমাদের ঋষিরা যে সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। যোগীরা যে নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত ধ্যান করিতে পারেন, তাহা বুঝি ইংরেজগণ সমর্থন না করিলে বিশ্বাস করিব না? সাধু হরিদাসকে ইংরাজেরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা সমর্থন করিয়াছেন; তাঁহারা না দেখিয়া যদি যোগাবলম্বনকে উড়াইয়া দিতেন, তবে আমরাও অবশ্যই তাঁহার মতে মত দিতাম—নহিলে আমাদের শিক্ষিত নামের সার্থকতা হয় কিসে? আমাদের শাস্ত্রে দূরদর্শন প্রভৃতি নানা বিভূতি যোগের উল্লেখ আছে; তাহা এতদিন আমাদের বিশ্বাস যোগ্য হয় নাই। তবে সম্প্রতি না কি সুপ্রসিদ্ধ ইতালীয় অধ্যাপক লম্ব্রোজো সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে দূরের কার্য্য জানিতে পারা, দূরের শব্দশ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি বিশেষ এক প্রকার যোগাভ্যাসের (hypnotised অবস্থার) লক্ষণ, তাই শিক্ষিতদিগের যোগশাস্ত্রের প্রতি ভক্তি আবার কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় চলিয়া পড়িয়াছে। এতগুলি কথা বলিলাম এইটুকু দেখাইবার জন্য যে, যখন আমরা ঐতিহাসিক প্রণালী দ্বারা দেখিতেছি যে তপস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব ২৯৮ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন তখন আমাদের তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই।

২১। পর্ব্বসংগ্রহ রচনার পর বেদব্যাস জীবিত ছিলেন কি না?

এইবারে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে ব্যাসদেব পর্ব্বসংগ্রহ রচিত হইবার পর জীবিত ছিলেন কি না এবং যদি বা জীবিত থাকেন, তবে কত বৎসর। কারণ যদি দেখি যে পর্ব্বসংগ্রহ রচনার পর তিনি অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক মহাভারতের চতুর্থ সংস্করণ একটা অসম্ভব ব্যাপার হইবে না। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে স্বর্গারোহণ পর্ব্বকেই অষ্টাদশ-পর্ব্ব (১) মহাভারতের শেষ পর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ আছে। এই স্বর্গারোহণ পর্ব্বে পাণ্ডব প্রভৃতিদিগের স্বর্গারোহণের বিষয় বলা হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের পর অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। প্রকৃত মহাভারতে উল্লিখিত ঘটনার মধ্যে ইহাই সর্ব্বশেষ ঘটনা। এই দুইটী বিষয় মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, পর্ব্বসংগ্রহোক্ত (অথবা তৃতীয় সংস্করণের) মহাভারত পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেকের পরেই লিখিত অথবা সংস্কৃত হইয়াছে। সৌতিও বলিতেছেন যে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর পরলোকগমন করিলে বেদব্যাস (লক্ষশ্লোক) মহাভারত মনুষ্যলোকে প্রচার করেন (আদি, ১অ, ৯৬)। ইহাতে অবশ্য এমন বুঝায় না যে তাঁহাদের মৃত্যুর ঠিক পরবৎসরেই মহাভারত প্রচারিত

১ অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে যখন হরিবংশপর্ব্ব ও ভবিষ্যপর্ব্বকে ধরা হয় নাই, তখনই বুঝিলাম যে উক্ত দুই পর্ব্ব মহাভারতের অন্তর্গত নহে; সুতরাং আমরাও উক্ত দুই পর্ব্ব সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কোনরূপ আলোচনা করিব না।

হয়; বরঞ্চ ইহা বুঝায় যে তাঁহাদের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাহার প্রচার হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ১৮ বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের মৃত্যুসংঘটন হয় এবং ২৬ বৎসর পরে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হয়। যাহাই হউক, পূর্ব্বে বলিয়াছি (১৬ম পরিচ্ছেদ দেখ) যে, ব্যাসদেব লক্ষশ্লোক মহাভারত তিন বৎসর নিরলসভাবে পরিশ্রম করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা ধরিলাম যে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেকের পরে মহাভারতের তৃতীয় সংস্করণ করিতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইযাছিল। পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইতে জনমেজযের সর্পসত্র পর্য্যন্ত ধরিলে ৯২ (৬০+৩২) বৎসর হয় (২০ম পরিচ্ছেদ দেখ)। তন্মধ্য হইতে ৩ বৎসর বাদ দিলেও থাকে ৮৯ বৎসর। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বেদব্যাস জনমেজয়ের সর্পসত্রে উপস্থিত থাকিয়া বৈশম্পায়নকে মহাভারত বলিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখিতেছি যে ব্যাসদেবের সম্মুখে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইতে ৮৯ বৎসর বেশ্ পড়িয়াছিল। ইহা কি সম্ভব বোধ হয় যে এই ৮৯ বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার স্বরচিত ও প্রিয়তম মহাভারতের উপর আর একবার হস্তক্ষেপ করেন নাই? প্রত্যুত ইহাই সম্ভব যে তিনি এই ৮৯ বৎসরের ভিতর মহাভারতকে চতুর্থবার সংস্কৃত করিয়াছেন। খুব সম্ভব যে বৈশম্পায়ন পর্ব্বসংগ্রহ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ব্যাসদেবের নিকট চতুর্থ সংস্করণ মহাভারত শিখিয়া তাহাই সর্পসত্রে বলিয়াছিলেন। তৃতীয় সংস্করণে যদিও আস্তীক প্রভৃতি পর্ব্বাধ্যায় যুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু বৈশম্পায়ন যখন চতুর্থ সংস্করণ বলিবার সময় সে সকল পর্ব্বাধ্যায়োক্ত বিষয়ের কোন উল্লেখই করেন নাই, তখন ইহা বুঝিতেছি যে সেগুলি প্রকৃত মহাভারতের অন্তর্গত নহে।

বোবামেয়ে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহারাজ রণমঙ্গল সিং বাহাদুর।

দুই দিনের মধ্যেই জাহানাবাদ যাত্রার সমস্ত আয়োজন করা হইল। সুরেশ অগ্রে বর্দ্ধমান দর্শন করে জাহানাবাদে যাত্রা করিবেন স্থির কর্লেন। ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের কৃপায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বর্দ্ধমানে উপস্থিত হওয়া যায়, কিন্তু সুরেশ কেমন এক প্রকার লোক, সেরূপ শীঘ্র ভ্রমণ তাঁর মনস্থ নয়, পথের দুই পাশের সকল স্থানই দেখবার ইচ্ছা, সুতরাং ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়াই মনোনীত কর্লেন। যদিও সেরূপ ভ্রমণে অনেক অসুবিধা, তথাপি রায় বাহাদুর, সামান্য বিষয় বলে, পুত্রের ইচ্ছায় কোনরূপ আপত্য কর্লেন না। এক খানি গাড়ী ও দুটী ঘোড়া ষ্টীমারে পার করে হাবড়ায় রেখে আসা হল,

পর দিন যাত্রার প্রশস্ত শুভ দিন, বিশেষ মঙ্গলের শেষ বুধবারের উষাকাল; বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সেই সময় ছাত্রের সহিত যাত্রা কর্‌লেন। রামহরি বাবু হাবড়া পর্য্যন্ত পুত্রের সঙ্গে গিয়ে নানারূপ প্রয়োজনীয় উপদেশ ও আদেশ দিয়ে বাটীতে ফিরে গেলেন।

সুরেশ, পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। কোচম্যান গাড়ী হাঁকিয়ে দিল। বাটী হইতে বহুদূরে বিদেশে যেতে হচ্চে, পণ্ডিত মহাশয়ের মনটা বড় অসুস্থ, সুরেশও নিজের চিন্তায় ব্যস্ত সুতরাং ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবেই অতিবাহিত হয়ে গেল। প্রায় দশ মিনিটের পর সুরেশ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন পিতা আমাদের জন্য কত টাকা দিলেন? পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন "তিনশত টাকা," সুরেশ শুনে মুখ বিকৃতি কর্‌লেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বল্লেন "কেন, তিন শত টাকা কি অল্প? আমরা দুই জন বই নয়; বিশেষ তিনি বলেছেন, প্রয়োজন হয়, লিখিলেই পুনরায় টাকা পাঠিয়ে দেবেন।—আর অপরিচিত স্থানে অধিক টাকা সঙ্গে থাকাও কিছু নয়, পথে কত প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা"—

সুরেশ আর কিছু বল্লেন না, নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। ক্রমে মদন মোহনের বিষয়ে নানারূপ চিন্তা হৃদয়ে উদয় হতে লাগ্‌লো; ভাব্‌লেন মদনমোহন আর তাঁদের সঙ্গে যুট্‌তে পার্‌লেন না—হয় ত তিনি কোন সদুপায় পান নাই। সহসা এক খানা গাড়ির অস্বাভাবিক ঘড়্ ঘড়্ শব্দে সুরেশের সে চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি জানালায় মধ্য দিয়ে দেখ্‌লেন পশ্চাতে এক খান গাড়ী দ্বিগুণ বেগে দৌড়ে আস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ী খানা বেগে তাঁদের গাড়ীর উপরে এসে পড়্‌লো। সুরেশ ভয়ে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে নেমে পড়্‌লেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একে নিতান্ত অথর্ব্ব তাহাতে আবার যথেষ্ট স্থূলকায় সুতরাং তাড়াতাড়ি লাফিয়ে পড়্‌তে গিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে পথ পার্শ্বস্থ অগভীর প্রশস্ত নর্দ্দামার মধ্যে পড়ে গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে পগারটা শুষ্ক কর্দ্দমশূন্য ছিল, অধিক অনিষ্ট হল না, কেবল পণ্ডিত মহাশয় পিণ্ডাকৃতি হয়ে গড়িয়ে গেলেন মাত্র। গাড়িখানার একটা যোত ছিঁড়ে গেল, পথের মধ্যে একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়ে স্প্রীং দমে গেল। কোচ্‌ম্যানে কোচ্‌ম্যানে মহা কলহ উপস্থিত হল।

নবোপস্থিত গাড়ির আরোহী নিজের সহিসকে ডেকে কি বল্লেন, সে সুরেশের নিকট এসে বল্লে, আমাদের প্রভু রাজাধিরাজ মহারাজ সিকিমাধিপতি রণমঙ্গল সিং বাহাদুর উপস্থিত দুর্ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বল্লেন, যদি আপনাদের কিছু বিশেষ ক্ষতি হয়ে থাকে, তিনি যথাসাধ্য তার প্রতীকার করতে প্রস্তুত আছেন।

রাজাধিরাজ সিকিমাধিপতি রণমঙ্গল সিং বাহাদুর এত বড় সুদীর্ঘ নাম শুনে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আপনিই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়্‌লেন, তাঁকে আর ধরে তুল্‌তে হলো না। সুরেশ সহিসকে বল্লেন, "না আমাদের এমন কিছু বিশেষ ক্ষতি হয় নাই—তোমার প্রভুকে বল, তিনি যেন আমাদের জন্য চিন্তিত না হন।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধুলা ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে বল্লেন "বাঃ আমাদের ক্ষতি হয়

নাই? গাড়ীখানা চূর্ণ হয়ে গেল ক্ষতি হয় নাই?

পরক্ষণেই রাজাধিরাজ সিকিমাধিপতি রণমঙ্গল সিং বাহাদুর নিজ গাড়ি হতে নামলেন স্থরেশ দেখেই চিন্তে পারলেন,—ইনি সেই মদনমোহন, এখন ছদ্মবেশী রণমঙ্গল সিং বাহাদুর। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মদনমোহনকে দেখেই সসম্ভ্রমে দুই হস্ত তুলে সেলাম কর্‌তে কর্‌তে পশ্চাদ্‌গমনে নব্‌দমার এত ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন, যে আর একটু হ'লেই পুনরায় তার মধ্যে গড়িয়ে যেতেন, কিন্তু সোভাগ্যবশে স্বরেশ তাঁকে ধরে ফেল্লেন ছদ্মবেশী মদনমোহন নিকটে এসেই, যেন আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন "একি! স্থরেশ বাবু যে—ভাল আছেন?—উঃ কতদিনের পর—সাক্ষাৎ হ'ল যখন আমি ওয়ার্ডে ছিলাম, সেই আর এই, যাহোক—সকল মঙ্গল ত? মদনমোহন এই কথা ব'লেই পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে চেয়ে দেখে বল্লেন "ইনি,—ইনি কি আপনার পিতা?"

স্থরেশ ঈষৎ হাস্য করে বল্লেন আজ্ঞা ইনি আমার জন্মদাতা পিতা না হউন এক প্রকার পিতা বটে,—শিক্ষক। ইহাঁরি নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাগীশ।"

"আ! ইনিই গঙ্গাধর বিদ্যাবাগীশ" মদনমোহন এই কথা বলেই পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে ফিরে বল্লেন "মহাশয়ের বিখ্যাত নাম যদিও অনেক স্থানে শুনেচি বটে, কিন্তু কখন চাক্ষুষ আলাপ হয় নাই আজ আমার পরম সৌভাগ্য—অযাচিত ফল লাভ হ'ল।"

রাজাধিরাজ মহারাজ সিকিমাধিপতির মুখে নিজ গুণ ব্যাখ্যা শ্রবণ ক'রে পণ্ডিত মহাশয় আনন্দে কেমন এক প্রকার হ'য়ে পড়্‌লেন! কি ব'ল্‌বেন, কি ব'লে মহারাজের কথার উত্তর দিবেন, ভেবে অস্থির হ'লেন। অনেকক্ষণের পর দুই তিনবার ঢোক গিলে বল্লেন "আজ্ঞা আমরা মহারাজাধিরাজের নিকট অতি সামান্য লোক—"

"সে কি পণ্ডিত মহাশয়, ধনের মর্য্যাদা আর জ্ঞানের মর্য্যাদা!" মদনমোহন এই কথা ব'লেই স্থরেশকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "আপনাদের যাওয়া হবে কোথায়?

স্থরেশ বল্লেন "বর্দ্ধমান।"

ভালই হয়েছে—আপনাদের গাড়ীর ভগ্ন স্থানগুলির সংস্কার করতে প্রায় একদিন লাগ্‌বে, ততক্ষণ কেন আমার গাড়ীতেই চলুন না? পশ্চাতে আপনাদের গাড়ী গিয়ে জুটবে যখন।

পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার কথায় সম্মত হ'য়ে গাড়ীর কোন্ কোন্ স্থানে ভেঙ্গে গিয়েছে দেখ্‌তে গেলেন। স্থরেশ মৃদু স্বরে বল্লেন "মদন ভাই তোমার এ উপায়টা বড় ভাল হয় নাই আর একটু হ'লেই হাত পা ভেঙ্গে যেত।"

মদনমোহন চুপি চুপি উত্তর দিলেন "কি ক'র্‌ব ভাই, আমার দোষ নাই—আনাড়ি কোচ্‌ম্যান্‌টারই যত দোষ। হতভাগাকে বল্লাম যেন সে কোন প্রকারে তোমাদের গাড়ির আঘাতে আমার গাড়িখানা ফেলে দেয়। আনাড়ি হতভাগা তার বিপরীত ক'রে ফেল্লে। আমার কি ইচ্ছা যে তোমাদের একখানা ভাড়া'টে গাড়ীতে নিয়ে যাই। যতই কেন খুঁজে খুঁজে ভাল দেখে আনি না, তবু ভাড়া'টে গাড়ী, আকৃতিই এক স্বতন্ত্র। ইচ্ছা ছিল, আমার গাড়ীখানা

কোনরূপে উল্টে যায়, আর আমি তোমাদের সঙ্গে জুটে যাই। যাহক এক প্রকার করা যাবে এখন—কিন্তু ভাই তুমি যেন গোল করে ফেলো না, তোমাকেই আমার যত ভয়।"

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ফিরে এলেন, মদনমোহন বল্লেন "পণ্ডিত মহাশয়, কোচ্‌ম্যান্‌কে ব'লে ক'য়ে দিলেন কি ?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বল্লেন আজ্ঞা হাঁ ব'লে দিয়েছি, তারা গাড়িখানি মেবামত ক'রে নিয়ে, আমাদের পশ্চাৎ যাবে।"

মদনমোহন সেই কথা শুনে সন্তুষ্ট হ'য়ে নিজের গাড়িতে উঠে বস্‌লেন, সুরেশ এবং পণ্ডিত মহাশয়ও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাড়ীতে আরোহণ কব্‌লেন। মদনমোহন কোচম্যান্‌কে হুকুম দিলেন "হাঁকাও" সে তৎক্ষণাৎ হাঁকিয়ে দিলে। পণ্ডিত মহাশয় উপবিষ্ট হ'য়েই গাড়িব চতুর্দ্দিক দেখ্‌তে লাগলেন,—কি আশ্চর্য্য এত বড় ক্ষমতাশালী মহারাজ বাহাদুরের এই পুবাতন গ২নের পুরাতন গাড়ী। মনে মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হ'লো। মদনমোহন তাঁর মনোগত ভাব বুঝিতে পেবে বল্লেন "পণ্ডিত মহাশয়, এই যে গাড়ীখানি দেখ্‌চেন এখানি যে কত দিনের তার নিরূপণ নাই এখন এখানি যেমন দেখ্‌চেন আমার জ্ঞানোদয় হয়ে পর্য্যন্ত আমি সেইরূপই দেখ্‌চি কখন এর জীর্ণ সংস্কার হয় নাই।

পণ্ডিত মহাশয় কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "কেন মহারাজ ?—জীর্ণ সংস্কার কেন হয় নাই ?

"আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের এইরূপ আজ্ঞা।—দেখ্‌চেন না এ গাড়ী খানির গঠন পর্য্যন্ত একরূপ পুরাতন। আমার প্রপিতামহ পলাশির যুদ্ধের সময় নবাবকে সাহায্য করতে আহুত হয়ে ছিলেন; পরে যখন ইংরাজদের নিকট নবাব পরাজিত হলেন, তখন সমস্ত বিশৃঙ্খল হয়ে পড়্‌লে তিনি এই গাড়ি খানির দ্বারা পলায়ন করে শত্রু হস্ত হতে প্রাণ রক্ষা করেন, তাঁহারই আদেশ যে গাড়ি খানির কোন অংশ যেন কখন পরিবর্ত্তিত করা না হয়, আর পলায়ন কি আত্ম-গোপনেব প্রয়োজন হলেই যেন এক একবার ব্যবহাব করা হয়।

পণ্ডিত মহাশয় কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রেবই অধ্যাপক, তাঁর সর্ব্বদা সংস্কৃত শস্ত্রেরই আলোচনা—ইতিহাসাদির কি ধার ধারেন, বিশেষ নিতান্ত নিরীহ ভাল মানুষ সুতরাং মদনমোহনের সে সকল কথাতে কোনরূপ অবিশ্বাস তাঁর মনেও উদিত হল না; জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্ "মহা-রাজের এখন প্রয়োজন ?

"আ বটে, সেটা এখনও আপনাদের বলা হয় নাই" মদনমোহন এই কথা বলেই একটু মৃদুস্বরে বল্লেন "ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিতান্ত ইচ্ছা একটী কোন বিশেষ গুরুতর কার্য্যের জন্য আমাকে আফগানিস্তানের বাদসাহের নিকট পাঠান কিন্তু আমার কোন মতেই সে যবন দেশে যেতে ইচ্ছা নাই। বিবেচনা করুন গবর্ণর জেনেরল যদি স্বয়ং আমাকে যেতে লেখেন তাহলে আর কোন ক্রমেই অস্বীকার করতে পারব না। সুতরাং ছদ্মবেশে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্চে প্রপিতামহ যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে যে গাড়ি করে পালিয়ে ছিলেন, আমাদের এখন একটা সামান্য বিষয়ের জন্য সেই গাড়ি করে পলায়ণ

কত্তে হচ্চে সময়ের গুণ! শেষ কথাটির সঙ্গে সঙ্গে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়্‌ল, মদনমোহন পুনরায় বল্লেন হা অদৃষ্ট হা হিন্দুবল!!

সুরেশ আর হাসি চেপে রাখ্‌তে পার্‌লেন না মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেশে হেঁচে কোনরূপে কাটিয়ে দিলেন। মদনমোহন সুরেশের সেই ভাব গতিক দেখে চুপ করলেন। যদিও আরও কিছু অধিক বলবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি পাছে সুরেশ গোল করে ফেলেন সেই ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। মদনমোহনের কথায় পণ্ডিত মহাশয়ের মনে সেকাল আর একালের কথা মনে হলো। তিনি ভারত কি ছিল আর কি হয়েছে সেই বিষয়ের চিন্তা করতে লাগলেন গো হত্যা ব্রহ্মহত্যা, দেবদ্বিজের অপমান, জাতি-নাশ ধর্ম্মনাশ প্রভৃতি চিন্তা করে তাঁর মুখমণ্ডল গম্ভীর ম্লানভাব ধারণ কর্‌লেন, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন "গুরু-দেব সকলি তোমার ইচ্ছা।

ক্ষণকাল তিন জনেই নিস্তব্ধ ভাবে নিজ নিজ বিষয় চিন্তা করতে লাগ্‌লেন যাঁর যেরূপ মনোগত তবে তাঁর চিন্তাও সেইরূপ। সুরেশের চিন্তা জগতের কপট আচরণ. ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চিন্তা—নিজের সৌভাগ্য, রাজাধিরাজ তাঁহাকে চেনেন, স্বাধীন হউন পরাধীন হউন একজন রাজবংশীয়ের সহিত আলাপ হ'ল—কেবল আলাপ নয়—তাঁর পূর্ব্ব পুরুষেরা, যাঁহাদের শরীর যথার্থ সতেজ ছিল, সেই সকল স্বাধীন রাজারা এক সময়ে যে গাড়ীতে চ'ড়ে ভ্রমণ ক'রেছিলেন তিনি স্বয়ং সেই গাড়ী-খানিতেই উপবিষ্ট, মদনমোহনের চিন্তা—কিরূপে সরল হৃদয় পণ্ডিত মহাশয়কে প্রতারিত করবেন ও কিরূপে তাঁর হাত হতে টাকা কড়িগুলি নিজের হস্তে আনবেন। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা-কাল অতিবাহিত হয়ে গেল, মদনমোহন সহসা পকেটের মধ্য হ'তে কাঁচকড়া নির্ম্মিত নস্যদানীটী বাহির ক'রে বল্লেন সুরেশ বাবু, এ নস্যদানীটী চিন্তে পারেন কি? এ সেই জয়পুরের মহারাজা যেটী দিয়েছিলেন।"

সুরেশ বল্লেন "আ—বটে, সেইটীত —এটী না তিনি আপনাকে স্মরণার্থ প্রদান করেন?

ঠিক আপনার তবে মনে আছে—মদনমোহন এই কথা ব'লেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দিকে ফিরে বল্লেন "পণ্ডিত মহাশয় বোধ হয় শুনে থাক্‌বেন—জয়-পুরাধিপতি অতি নস্যপ্রিয়? নস্য আর নস্যদানীর উপর তাঁর অনুরাগ; আমি একদিন এই নস্যদানীর প্রশংসা করায় আমাকে তৎক্ষণাৎ এটী দেন। কথায় কথায় গাড়ীখানি ক্রমে একটী ছোট মাঠ পার হয়ে একটী চটীতে এসে পঁহুছিল।

দিনাজপুর বৌদ্ধ চিহ্নাবশেষ।

দিনাজপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে ও বগুড়ার নিকট বৌদ্ধ চিহ্নের এবং পাল-রাজগণের কীর্ত্তির অনেক অবশেষ আছে। হুয়েন্থ-সাং যখন ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন তখন তিনি এই অঞ্চলে পৌণ্ড্র-দেশ নামে একটি প্রতাপশালী রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। করতোয়া-তীরে গোবিন্দগঞ্জের নিকট বৰ্দ্ধনকুটি বা বৰ্দ্ধনকুট নামে যে স্থান আছে, প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মীমাংসায় স্থির হইয়াছে যে সেই স্থানেই পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন নগর ছিল। পৌণ্ড্র-দেশ এক সময়ে অতি বিস্তৃত ছিল। মিঃ ফার্গুসন ওরিয়েণ্টাল কোয়ার্টালি ম্যাগাজিনের ৪র্থ খণ্ডে হুয়েন্থ-সাং সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে উল্লেখ করেন যে বৰ্দ্ধনকোট নিবৃত্তি রাজ্যের একটি প্রধান নগর, ইহার অধি-পতি একজন যবন বা মুসলমান। নিবৃত্তি-রাজ্যের বিস্তার দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও কোচবিহারের অধিকাংশ পর্য্যন্ত ইহাই হুয়েন্থ-সাং কথিত পৌণ্ড্রদেশের পূর্ব্বাংশ মাত্র। সেন রাজগণ ঢাকা বিক্রমপুরে গিয়া বাস করিবার সময়েও এতদ্দেশে পালরাজগণের অধিকার ছিল। বৰ্দ্ধন-কুটের ৭০ মাইল উত্তরে একটি ভগ্নাবশেষ দুর্গ আছে। এই দুর্গকে ধৰ্ম্মপালের দুর্গ বলে। বাঙ্গালায় যখন সেন রাজগণ প্রবল তখনও পালরাজেরা করতোয়ার পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিতেছিলেন।

যাহা হউক এক সময়ে যে এ অংশে পালরাজগণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং এই প্রদেশে তাহার যথেষ্ট চিহ্নও আছে। গোবিন্দগঞ্জের ৩২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 'পাহাড়পুর' নামে একখানি গ্রাম আছে। এখানে একটি উচ্চ ইষ্টকস্তূপ আছে। এই স্তূপটি এক সময়ে একটি বৌদ্ধ স্তূপ ছিল। ডাঃ বুকানান তাঁহার লিখি - দিনাজপুর-বিবরণের মধ্যে এই স্তূপটির বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইহা ১০০ ফুট হইতে ১৫০ ফুট উচ্চ একটি ইষ্টক স্তূপ। ইহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলে ঢাকা এবং শিখরদেশে একটি বৃহৎ সুন্দর বৃক্ষ আছে। বুকানান যখন ইহার উপর উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি অর্দ্ধপথে ৩ খানি বৃহৎ প্রস্তর দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ ওয়েষ্টমেকট যখন ইহা দেখিতে যান তখন তিনি তাহা খুঁজিয়া পান নাই। পাথর তিনখানিতে কোন খোদিত লিপি ছিল না। ডাঃ বুকানান বলেন সর্ব্বোপরি বৃক্ষের নিকট একটি ইষ্টক গৃহ ছিল, ইহার দ্বার পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিম-দিকে একটি কুলুঙ্গী ছিল। ডাঃ বুকানান শুনিয়াছিলেন যে বহুকাল পূর্ব্বে এই গৃহে একজন মুসলমান ফকীর থাকি-তেন। এই ইষ্টক স্তূপের চতুর্দ্দিকে চতুষ্কোণ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল, ইহারও ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে। এই

প্রাচীর এক একদিকে ৪০০ গজ দীর্ঘ ছিল। প্রাচীর বেষ্টিত ইষ্টক স্তূপের উপরেও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে। কিন্তু প্রধান স্তূপ ও প্রাচীরের মধ্যে যে প্রাঙ্গন ছিল তাহা পরিষ্কার আছে। এই প্রাঙ্গনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, এখানে মধ্যে মধ্যে গৃহাদিও ছিল তাহারও চিহ্ন পাওয়া যায়। চারিটি কোণের নিকটেই এরূপ গৃহের সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া বুঝা যায়। ইহার দৈর্ঘ্য বিস্তার দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে ইহা হযত একটি দুর্গ ছিল; কিন্তু ডাঃ বুকানান বলেন যে তিনি কোনরূপ খাল বা পরিখার চিহ্ন পান নাই বা প্রধান স্তূপটির গঠন প্রণালীও সেরূপ নহে। ডাঃ বুকানান অনুমান করেন যে, এই স্তূপটি একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ মাত্র। ইহার শিখরদেশে যে গৃহটি তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহাব অনুমান সেইটিই এই মন্দিরের দেবায়-তন ছিল। এবং ইহার তলভাগের গঠন ও উচ্চতা দেখিয়া অনুমান করিয়াছেন যে ইহা নেপালের বুদ্ধ মন্দিরগুলির ন্যায় নিরেট বা পূর্ণগর্ভ ছিল। যদি ইহা শূন্যগর্ভ হইত তাহা হইলে ইহার গঠন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হওয়ারই সম্ভব। মিঃ ওয়েষ্টমেকট অনুমান করেন যে দিনাজপুর যেরূপ নাবাল স্থান তাহাতে এই প্রাচীর ভগ্নাবশেষগুলি মঠগৃহের ভিত্তিভাগ হওয়াই বেশী সম্ভব।

এই স্থান হইতে ঈষৎ উত্তর পশ্চিমে ৫ মাইল দূরে 'যোগীঘোপা' (যোগীগুহা) নামক ভূগর্ভস্থ গহ্বরগৃহ। ইহাও বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। পর্ব্বতগাত্র খুদিয়া বা পর্ব্বত গুহায় যে সকল মন্দির, মঠ, চৈত্য, বিহারাদি নির্ম্মিত হইত তাহা "গুহামন্দির" নামে আখ্যাত হইয়া থাকে আর ভূগর্ভে ঐরূপ উপাসনাস্থান নির্ম্মিত হইলে 'ঘোপা' এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অনেক স্থলে পার্ব্বতীয় গুহাকে ও ঘোপা নামে উল্লেখ করিতেও দেখা যায়। 'ঘোপা' শব্দের সামান্যতঃ অর্থ 'গহ্বর'। এই যোগী ঘোপার মধ্যে এক খানি ২১ ইঞ্চি দীর্ঘ প্রস্তর ফলকে একটি বুদ্ধ চিত্র আছে,—মায়া দেবী (বুদ্ধজননী) অর্দ্ধশয়িতাবস্থায় অবস্থিতা, কোলের কাছে শিশু বুদ্ধ শায়িত, চতুর্দ্দিকে সখীগণ উপস্থিত। আর এক খানি ৪০ ইঞ্চি দীর্ঘ প্রস্তর ফলকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। এই সকল খোদিত মূর্ত্তির কিছুই নষ্ট হয় নাই। খোতলাল থানার অন্তর্গত একটি প্রস্তরে এই যোগী ঘোপার প্রতিমাগুলির ন্যায় প্রতিমা আছে। সে প্রতিমাগুলি সংখ্যায় ৪ টি, গ্রাম্য দেবতারূপে পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে ১ টি বৌদ্ধ অপর তিনটি শৈবমূর্ত্তি। মিঃ ওয়েষ্টমেকট এগুলির সহিত যোগী ঘোপার প্রতিমা ও শিল্পলিপির সেই সোসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। খোতলাল থানার ঐ চারিটি প্রতিমার মধ্যে এক খানি ৩২ ইঞ্চি প্রস্তরে মায়াদেবী বামপদ ছড়াইয়া দক্ষিণ পদের হাটু বাকাইয়া বামহস্তে মস্তক রাখিয়া শুইয়া আছেন, শিশুবুদ্ধ নিকটে বালিস মাথায় দিয়া শুইয়া আছে। বিছানার উভয় অন্তে দুইটি মনুষ্য মূর্ত্তি আছে, উপরে খোদিত নকাসী কাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১০ টি উপবিষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি আছে। ইহা সম্ভবতঃ ৯।১০ম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে খোদিত। দ্বিতীয়

এক খানি ১২ ইঞ্চি ফলকে একটি পদ্মোপরি উপবিষ্ট মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির মুখভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি দ্বিভুজ। মূর্ত্তির নিম্নদেশে দুই ক্ষুদ্র মূর্ত্তি একের মুখে বংশীবৎ যন্ত্র, অপরের হস্তে রুমালবৎ বস্ত্র আছে। যেন বাদক ও নর্ত্তক। মিঃ ওয়েষ্টমেকট অনুমান করেন যে ইহা বুদ্ধ প্রতিমার ভগ্নাবশেষ। তৃতীয় ফলকে দুইটি স্ত্রীপুরুষ মূর্ত্তি, উভয়ে প্রেম সম্ভাষণে মগ্ন। পুরুষটি চতুর্ভুজ, তন্নিম্নে একটি বৃষ ও স্ত্রীটি দ্বিভুজা তন্নিম্নে একটি সিংহ। মিঃ ওয়েষ্টমেকটের মতে ইহা শিবপার্ব্বতীর প্রতিমা। এই ফলক খানি ২৩ ইঞ্চি দীর্ঘ ও প্রস্থে ১৪ ইঞ্চি। চতুর্থ এক খানি দীর্ঘে ৩৮ ইঞ্চি প্রস্থে ২০ ইঞ্চি ফলকে একটি পদ্মারূঢ় দেবতামূর্ত্তি। এ মূর্ত্তির অনেকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার ভগ্নাংশ দেখিয়া অনুমান্ হয় যে ইহা সম্ভবতঃ ষড়ভুজ নতুবা চতুর্ভুজই ছিল। প্রতিমার উভয় পার্শ্বে এক একটি সিংহ এক একটি হস্তীর কুম্ভের উপর সম্মুখের দুই পদের ভর দিয়া দাড়াইয়া আছে, হস্তী শুঁড় গুড়ি মারিয়া বসিয়া আছে। যোগীঘোপার নারায়ণ প্রতিমাতেও এইরূপ সিংহ-হস্তী মূর্ত্তি আছে। এ প্রতিমা বৌদ্ধগণের নির্ম্মিত নহে, তাহার অনেক পরের বলিয়া বোধ হয়। ইহার নিকটেই শিবলিঙ্গ, অর্ঘ এবং একটি গ্রাণাইট পাথরের থাম ছিল। মিঃ ওয়েষ্টমেকট এই থামটি আনিয়া খোতলাল থানার এক পার্শ্বে স্থাপন করেন।

পাহাড়পুর স্তূপের ১১ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ও পানছিবি থানার উত্তর পূর্ব্বে তুলসীগঙ্গা নদীতীরে নিমাই সা নামক এক মুসলমান ফকীরের আস্তানা। এই স্থানে নদীগর্ভে বহুসংখ্যক প্রস্তর খণ্ড থাকায় এই স্থানকে 'পাথরঘাটা' বলে। জেনারল কানিংহাম বলিয়াছেন যে মুসলমানের অধিকাংশ মঠ ও মসজীদ হিন্দুমঠ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ম্মিত, তাহা অতীব সত্য। এই সামান্য মঠটিও তাহাই। কারণ ইহার নিকটে একটি নাতিবৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকস্তূপ আছে। মিঃ ওয়েষ্টমেকট দেখিয়াছেন যে এই ভগ্নাবশেষ হইতেই যে এই মুসলমান দরগার উপকরণ গৃহীত হইয়াছে তাহারও চিহ্ন বর্ত্তমান। এই বৌদ্ধ স্তূপটী হয় পাহাড়পুর স্তূপ অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় ছিল নতুবা ইহার প্রধানাংশ তুলসীগঙ্গার গর্ভে বিলীন হইয়াছে। তুলসীগঙ্গার গর্ভে প্রস্তর বহুলতার কারণ সম্ভবতঃ ইহাই হইতে পারে। ঐ সকল প্রস্তর রাশীর মধ্যে মিঃ ওয়েষ্টমেকট একটি বৃহৎ বুদ্ধ প্রতিমার মুণ্ড ও স্কন্ধভাগের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছেন।

এই স্থান হইতে উত্তর পশ্চিমে এক মাইল দূরে মহীপুর নামে এক স্থান। এই স্থানের গভীর জঙ্গলে বহু বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ডাঃ বুকনান বলেন, ইহা পালরাজ বংশীয় রাজা মহীপালের প্রাসাদমালার ভগ্নাবশেষ। ইহারই নিকটে আতাপুর নামক স্থানেও ঐরূপ বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখা যায় তাহা উষাপালের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া খ্যাত। ঠিক এই সকল স্থানে লোকবাস নাই। মহীপাল হইতে মহীপুর ও মহীপাল দীঘীর নামকরণ হইয়াছে। মহীপাল

দিঘী রঙ্গপুরের অন্তর্গত মহীগঞ্জ সহরের ৪৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। আত্রেয়ী নদীর তীরে একটি মুসলমান দরগার অবস্থিতি স্থানকে 'মহীসন্তোষ' বলে। ইহা সন্তোষ নামক পরগণার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয় ঐ নাম পাইয়াছে কিন্তু সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে ঐ স্থানে 'মহীসন্তোষ' নামে বৌদ্ধ নগরী ছিল।

পাহাড়পুর স্তূপের ৯ মাইল দক্ষিণে যে স্থান দিয়া উত্তরবঙ্গরেলপথ চলিয়া গিয়াছে সেই স্থানে পূর্ব্বে একটি বৃহৎ নগর ছিল কারণ এই স্থানে জঙ্গলের মধ্যে বহুতর ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ আছে। ঐ সকল ইষ্টকের পরিমাণ দশ ইঞ্চি দীর্ঘে, দশ ইঞ্চি প্রস্থে, ২½ ইঞ্চি মোটা, এত বড় ইষ্টক বৌদ্ধেরাই প্রস্তুত করিত।

পাহাড়পুর স্তূপে ২০ মাইল উত্তরে করতোয়া তীরে রাজবাড়ী নামে একটি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে। বাগজনা নামক স্থানে মিঃ ওয়েষ্টমেকট সাহেব এই ভগ্ন প্রাসাদের একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত একখানা গোবরাট দেখিয়াছিলেন। এই গোবরাটের খোদিত কার্য্য অতি সুন্দর, কিন্তু কোনরূপ মনুষ্য মূর্ত্তি বা লিপিবিশিষ্ট নহে।

যোগীঘোপার নিকট যে বহু বিস্তৃত ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তাহা দেবপালের প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ। যোগীঘোপার যে প্রতিমাগুলি আছে তন্মধ্যে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি দেখাইয়া এখানকার পূজারীরা বলে যে এই দেবপালের কন্যা বিমলাদেবীর প্রতিমা। এই স্থানে একটি বিল আছে বিল পার হইয়া উত্তর পূর্ব্বে দুই মাইল গেলে চণ্ডীর নামক স্থানে আবার ঐরূপ এক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়, উহা চন্দ্রপালের প্রাসাদ ছিল। কটক ও ধোজেল নামক স্থানেও ঐরূপ আরও ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রধান স্তূপের ৭ মাইল উত্তরে বিখ্যাত বুদালস্তম্ভ। নারায়ণপালের মন্ত্রী ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহার গাত্রে খোদিত লিপিতে দেবপাল ও সুরপাল নারায়ণপালের পূর্ব্ব কালবর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বুদালস্তম্ভের ৪২ মাইল উত্তরে বিখ্যাত আমগাছি ফলক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সকল স্থান খনন ও অনুসন্ধান করিলে বাঙ্গালার পালরাজত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে যে আরও অনেক কথা জানিতে পারা যায় তাহা নিশ্চয়।

বিবাহ বিধি।

স্ত্রীপুরুষ সংযোগ দ্বারা সৃষ্টিকাল হইতে সন্তান উৎপত্তি হইয়া আসিতেছে। পুরাকালে কোন কোন ঋষি প্রবরকে যদৃচ্ছা স্ত্রীসহগমন দ্বারা প্রজা উৎপত্তি করিতে শুনা যায়, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না বলিয়া যে কেহ কেহ অনুমান করেন তাহা কতদূর প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। যাহা হউক বিবাহ প্রথা আধুনিক নহে এবং ইহা সর্ব্ব জন বিদিত, তবে যে কেন আমরা এবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম তাহার কারণ এই যে সম্প্রতি এক জন ব্রাহ্মণ প্রবঞ্চকদিগের চাতুর্য্য জালে পড়িয়া একটী নীচকুলোদ্ভবা কন্যার যথা বিধি পাণিগ্রহণ করেন। অল্প দিন পরে বিবাহ বিভ্রাট অবগত হইয়া ঐ কন্যাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করেন। পরিত্যক্তা ভার্য্যা রাজ দ্বারে বর্ত্তনের জন্য অভিযোগ উপস্থিত করে। বিচারক স্বামীকে বর্ত্তন দিবার অনুমতি দেন। ইহাতে কোন সংবাদ পত্রে অসিদ্ধ বিবাহের জন্য রাজ-আজ্ঞা সুবিচার সিদ্ধ নহে বলিয়া ঘোষিত হয়। কাজেই দেখিতে হইতেছে যে রাজআজ্ঞা হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত হইয়াছে কি না ?

বিবাহ কি ? একথা অগ্রে স্থির না করিলে উপরে লিখিত বিবাহ সিদ্ধ কি অসিদ্ধ তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব এই জন্য আমরা প্রথমেই ইহার আলোচনা করিব। যদি স্ত্রীপুরুষ সংযোগের নাম বিবাহ বলা যায় তাহা হইলে অনেক দোষ স্পর্শে, কারণ তাহা হইলে ব্যভিচার সম্ভূত সংযোগ বলিয়া একটা পৃথক অবস্থার স্থল থাকে না। বিবাহ দ্বারা স্ত্রীপুরুষ জায়া পতিত্ব সম্বন্ধে সংযুক্ত হয় এই সম্বন্ধই অপর সাধারণ সংযোগ হইতে বিবাহকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। যে ক্রিয়া কলাপ দ্বারা এই সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় তাহাই বিবাহ দ্বারা স্ত্রীপুরুষ মিলিত হইয়া একাত্ম হয়। মনু বলিয়াছেন—

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রাজতিহ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদেয়া ভর্ত্তা সা
স্মৃতাঙ্গনা ॥৪৫।৯

গৃহস্থাশ্রমী পুরুষ গৃহবর্জিত হইলে সম্পূর্ণ পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। স্ত্রী ও পুত্র সমন্বিত পুরুষই *সম্পূর্ণ পুরুষ। ভার্য্যা ও পতি অভেদাত্ম।* ইহাকে উদাহরণ দ্বারা একটু সরল ভাষায় বুঝান যাইতেছে। পত্র পুষ্পফলে শোভিত সশাখ বৃক্ষই সম্পূর্ণ বৃক্ষ। যে বৃক্ষ ফলোৎপাদন করে না তাহাকে বৃক্ষ বলিলেও তাহার সম্পূর্ণ বৃক্ষত্বের কিছু অভাব আছে সন্দেহ নাই। বৃক্ষের কাণ্ডটী শাখা, শাখা আবার প্রসাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল ধারণ করে এবং কাণ্ডের অভ্যুদয়ে শাখা প্রশাখা পত্র, পুষ্প ও ফলের উৎকৃষ্টতা ও পুষ্টতা জন্মে। কাণ্ডের কোনরূপ বৈগুণ্য জন্মিলে তাহা সমস্ত শাখা প্রশাখা পত্র ফল পুষ্পে সমভাবে লক্ষিত হয়। সেইরূপ স্ত্রীপুত্র সমন্বিত পুরুষ একটী সম্পূর্ণ

বৃক্ষের স্বরূপ। ইহার কাণ্ড পুরুষ, শাখা ধর্ম্মপত্নী আর ফল পুত্র। সম্পূর্ণ বৃক্ষ যেমন উদ্যানের রমণীয়তা সম্পাদন করে সেইরূপ সম্পূর্ণ পুরুষগণ গৃহস্থাশ্রমী-দিগের মধ্যে সমাজের শ্রীসম্পাদন করে নতুবা ফল ও শাখা বিমুক্ত কাণ্ডময় বৃক্ষ যেমন নিবিড় অরণ্যবাসের উপযুক্ত সেইরূপ স্ত্রীপুত্র বিহিন পুরুষের গৃহস্থা-শ্রমীর সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন অরণ্যবাসের জন্য প্রব্রজ্যা করাই উচিত। গৃহী না হইয়া গৃহস্থাশ্রমীর ধর্ম্ম অনুসরণ করা পাতকজনক। ধর্ম্ম প্রবল যুগে বাস্তবিকই বেদ মন্ত্রাদির সম্পূর্ণ কার্য্য হইত তখন বিবাহমন্ত্রে সংযোযিত স্ত্রীপুরুষ একাত্ম হইত। কাণ্ডের মৃত্যুতে শাখারও মৃত্যু হইত। সেই সকল স্ত্রী স্বামির অনুগমন, করিতে আসক্তা হইলে মৃতের অনুরূপ মলিন, যাবতীয় সুখসচ্ছন্দতা বিহীনা পতিগত-প্রাণা হইয়া কেবল মাত্র জীবন ধারনো-পযোগী পুষ্প ফল মূল আহার দ্বারা দেহ শোষণ করিতেন। এক্ষণে ধর্ম্মভাব অত্যন্ত শিথিল, প্রত্যুত অনেকেই সততঃ পরতঃ ধর্ম্মগ্রন্থি আরও খুলিয়া দিবার জন্য অতিশয় তৎপর কাজেই বিবাহমন্ত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় ততদূর ফলদায়ী না হইলেও, স্ত্রীপুরুষকে একাত্ম না করিতে পারিলেও অধুনা বৃক্ষাশ্রিত জড়িত লতার ন্যায় করিয়া রাখে। যুগানুসারে যদিও স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে কোন কোন স্থলে বৃক্ষ অষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে জড়িত হইয়া লতার তীব্র বেষ্টনে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে দেখা যায় তথাপি লতা আর অন্য বৃক্ষ আশ্রয় করে না সেই নীরস বৃক্ষকেই মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া থাকে। এ অবস্থাও অন্যান্য সমাজ প্রচলিত বিবাহ হইতে সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। এই একাত্মতা স্থাপন বিবাহ ও বিবাহ মন্ত্রের উদ্দেশ্য। কালবসে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হউক বা না হউক ফল লাভের আশায় অন্ততঃ তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নতুবা বিবাহ সিদ্ধ হয় না।

অনেকে মনে করেন যে মনু আট প্রকার বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ইহার মধ্যে কোন এক প্রকারে কন্যা লাভ করিলেই বিবাহ হইল ইহা নিতা-ন্তই ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ সিদ্ধান্ত। আর্য্য সন্তানের এরূপ ধারণা নিতান্ত কষ্টজনক যাঁহারা বহুদূর বাসী ইংরাজদিগের আদিম অসভ্যকালের ইতিহাস মুখাগ্রে রাখিয়া-ছেন, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের ইতিবৃত্ত কণ্ঠস্থ করিতে এত যত্নশীল তাঁহারা কি না আপনাদিগের ঘরে কোথায় কি আছে সেগুলি প্রকৃত পক্ষে জিনিস বা কি তাহার কোন তত্ত্ব রাখেন না ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়? তাঁহাদের এরূপ বিদ্যালাভ করিতে পণ্ডশ্রম করা অপেক্ষা মূর্খ হইয়া থাকিলেও দেশের অনেক মঙ্গল হইত। সমাজের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিয়া ইঁহারাই আবার সমাজের নেতা হইতে ইচ্ছুক কাজেই দেশের মঙ্গল কোথায়?

দুইটী পৃথক পৃথক ক্রিয়া দ্বারা বিবাহ সিদ্ধ হয় প্রথম কন্যালাভ দ্বিতীয় গ্রহণ। এক্ষণে দেখিতে হইবে কন্যা কত প্রকারে লাভ হইতে পারে। কন্যা ও কন্যাদাতার প্রবৃত্তি অনুসারে কন্যা চারি প্রকারে লাভ হইতে পারে ইহা শাস্ত্র-কারেরা স্থির করিয়াছেন যথা, বান্ধবাদির

দ্বারা দান এবং এইরূপে দানেই কন্যার তৃপ্তি, দ্বিতীয়, কন্যার বান্ধবাদির দ্বারা কন্যাকে বিক্রয়, তৃতীয় কন্যার আত্ম সমর্পণ, চতুর্থ কন্যা হরণ।

যেথানে দান দ্বারা কন্যা লাভ হয় সেইথানে দাতা ও গৃহিতা উভয়ই সাত্বিকগুণ সম্পন্ন লোক বলিয়া বুঝা যায়; প্রচলিত কথায় তাঁহাদিগকে সাধু লোক বলিয়া বুঝায়। এই দানের মধ্যেও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট প্রকারভেদ আছে। ব্রাহ্ম্য, দেব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য এই চারি প্রকার দান এই কক্ষের অন্তর্গত। ব্রাহ্ম্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এইরূপ ক্রমান্বয়ে পর-পর অপকৃষ্ট। প্রাজাপত্যে শুল্ক গ্রহণের ছায়া আছে বলিয়া ঐ চারিটীর মধ্যে নিকৃষ্ট।

কন্যাক্রয় করিয়া লওয়ার নাম আসুর এইরূপে কন্যালাভ করা দাতা ও গৃহিতা-দিগের নিকৃষ্ট বৃত্তির পরিচায়ক। ইহা অত্যন্ত অধর্ম্ম প্রণোদিত বলিয়া শাস্ত্রে অত্যন্ত জঘন্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কন্যা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ স্বাতন্ত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইয়া আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। এটা রাজসিক কার্য্য। রাজন্যবর্গই যে গন্ধর্ব্ব বিধানে কন্যালাভে তৎপর হন তাহা নহে যেথানে রজোগুণ অত্যন্ত প্রবল, সত্বগুণ অতিমাত্রায় বিরাজিত সেইথানেই এরূপ বিবাহের আদর সেই জন্যই পাশ্চাত্য সমাজে উহা এত আদৃত। কন্যার পিতা মাতার অথবা অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব না থাকিলে বরং একদিন আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, ইহাই প্রকৃত গান্ধর্ব্ব বিবাহের স্থল, এরূপ অবস্থায় কন্যা আত্মসর্পণ করিলে কোন দোষের কারণ হয় না কিন্তু বন্ধুবান্ধব বর্ত্তমান থাকিতে যদি কন্যা স্বাতন্ত্রতা অবলম্বন করেন তাহা সজ্জনগণের চক্ষে নিন্দনীয় আচরণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অতঃপর হরণ দ্বারা কন্যালাভ ইহা আবার প্রকৃতিভেদে দুই প্রকার এক কন্যার সম্মতি সত্বে, অন্য প্রকার কন্যার অনভিমতে। প্রথমটা রজোগুণাবলম্বী-দিগের কার্য্য দ্বিতীয়টা ঘোরতর তমো-গুণ বিশিষ্ট পিশাচদিগের করণীয়। এই দুইটী ক্রমান্বয়ে রাক্ষস ও পৈশাচিক নামে অভিহিত। শেষোক্ত ব্যাপারটী অতিশয় নীচতার লক্ষণ সুতরাং সর্ব্বতো-ভাবে নিকৃষ্ট ও হেয়।

ব্রাহ্ম্যবিধি মতে কন্যালাভ করিয়া বিধিমত হোম মন্ত্রাদির দ্বারা তাহার পাণি গ্রহণ করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম্য বিবাহ বলে অতএব দেখা যাইতেছে যে উক্ত আট প্রকার উপায়ের মধ্যে কোন একটী উপায়ে কন্যা লাভ করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয় না; সেই লব্ধা কন্যার বিধিমত পাণি গ্রহণ করিতে হয় তবে তাহাকে বিবাহ বলিয়া স্বীকার করা যায়। শাস্ত্রকারগণ ভদ্রাভদ্র ভেদে কোন্ প্রকারে কাহার কন্যা লাভ করা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ইহার অন্যথা আচরণ করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু তাহাকে অবৈধ আচরণ জন্য অধোগতি প্রাপ্ত এবং ইহলোকে সজ্জন-গণ দ্বারা পরিত্যক্ত হইতে হয়। অত-এব স্পষ্টতঃ বুঝা গেল যে আট প্রকার বিবাহ বলিয়া বুঝা গিয়া থাকে তাহা প্রকৃত পক্ষে কন্যা লাভের উপায় মাত্র ঐরূপ লব্ধা কন্যার স্ব স্ব গৃহ্যোক্ত বিধান

মতে হোম মন্ত্রাদি দ্বারা সিদ্ধ দানও গ্রহণই বিবাহ?

ব্রাহ্ম্য, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য আসুর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহে দাতাকে গৃহোক্ত মন্ত্রাদি পাঠপূর্ব্বক কন্যা গৃহিতাকে সম্প্রদান করিতে হয়। এবং গৃহিতারও হোম মন্ত্রাদি দ্বারা পাণি গ্রহণ করা বিধি। রাক্ষস ও পৈশাচিক বিবাহে কন্যা বলপূর্ব্বক অথবা ছলনাপূর্ব্বক অপহৃত হইয়া থাকে সুতরাং ইহাতে বিধিপূর্ব্বক সম্প্রদান সম্ভব না হইলেও গৃহিতাকে হৃতা কন্যার পাণি গ্রহণ করিতে হয়। দান ও পাণি গ্রহণ বিনা বিবাহ সিদ্ধ হয় না। গান্ধর্ব্ব বিবাহস্থলে কেহ কেহ পুরাকালে নিরগ্নিক বিবাহ করিয়াছিলেন। "পাণি গ্রহণিকা মন্ত্রা কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতা" এই মনুশাসনে যেখানে কন্যা সর্ব্বাগ্রে পুরুভুক্তা হইয়াছে সেইস্থলে কেবল পাণি গ্রহণ মন্ত্র পাঠ হয় নাই এমত বোধ হয়। কিন্তু যে বিবাহ করিবে সেই যদি সংসর্গ করে তাহাতে কন্যাত্ব অতিক্রম করা হয় না এরূপ শাস্ত্র আছে। কিন্তু এরূপ বিবাহ অতি বিরল।

বিধিপূর্ব্বক দান ও প্রতিগ্রহ এই দুইটী বিবাহের লক্ষণ। দান দ্বারা গ্রহিতার স্বামীত্ব ও প্রতিগ্রহণ দ্বারা কন্যার ভার্য্যাত্ব জন্মে। ভার্য্যা মন্ত্র সংস্কৃতা না হইলে ধর্ম্মপত্নী হয় না। কিন্তু বিধি পূর্ব্বক দত্তা হইলেই গ্রহিতা তাহার পতি হইবে। সুতরাং তাহার আর অন্য পাত্রে দান হইতে পারে না। বিবাহ্য ও অবিবাহ্য কন্যা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে কিন্তু যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক শাস্ত্র নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া অথবা প্রমাদবশতঃ অবিবাহ্য কন্যা বিবাহ করে তাহা হইলে বিবাহ অসিদ্ধ হয় না বটে কিন্তু অবিবাহ্য বিবাহ জন্য পাতিত্য জন্মিবে তাহার আর সন্দেহ কি! গ্রহিতা মোহ-যুক্ত হইলে যখন আপন দোষ জানিতে পারিবেন তখন বিবাহিতা কন্যা পরিত্যাগ করিয়া যথা বিধি প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারেন কিন্তু ঐ কন্যাকে, যত দিন ঐ কন্যা ব্যভিচার দোষে দুষ্টা না হয়, তত কাল পর্য্যন্ত ভরণ পোষণ করিতে হইবে কারণ গ্রহিতা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ মুক্ত হইলেও ঐ বিবাহিতা কন্যার পতি তিনি থাকিবেন, কন্যাও তাঁহার ভার্য্যা বলিয়া গণ্য হইবে এ সম্বন্ধ ত্যাগ দ্বারা বিমুক্ত হয় না। সংসর্গ পরিত্যাগ করা পৃথক কথা। স্বামী লোকান্তর গমন করিলেও যখন পতিপত্নীত্ব সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে তখন ইহলোকে স্বামী স্ত্রীর সংসর্গ ত্যাগ করিলেই কি এ সম্বন্ধের কোন হানি হইতে পারে? সগোত্রা অথবা সমান প্রবরা কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আজীবন তাহার ভরণ পোষণ করিবার বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদ।

সন্নিপাত জ্বর চিকিৎসা।

৯ম ও ১০ম সংখ্যা সমীরণে সন্নিপাত অর্থাৎ ত্রিদোষোৎপন্ন জ্বরের নিদানাদি সমস্ত বিশদরূপে প্রকাশ করা গিয়াছে, বর্ত্তমান সংখ্যায় উহার শাস্ত্রীয় ও প্রচলিত প্রথা সম্মত চিকিৎসা সমুদয় সাধারণের জ্ঞাতার্থে বিবৃত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইব।

লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা।
অবলেহোঽঞ্জনংচৈব প্রাক্‌প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে॥
সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বং কুর্য্যাদামকফাপহম্।
পশ্চাৎ শ্লেষ্মণি সংক্ষীণে শময়েৎ পিত্তমারুতৌ॥

সন্নিপাত জ্বরে প্রথমতঃ লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন ব্যবস্থেয়। সন্নিপাত জ্বরে অগ্রে যাহাতে আম ও কফের শান্তি হয় এরূপ ক্রিয়া করিয়া পশ্চাৎ পিত্ত ও বায়ুর শান্তি বিধান করিবে। ইহাতে তিন দিবস, পাঁচ দিবস, দশ দিবস কিম্বা যে পর্য্যন্ত পীড়া আরোগ্য না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উপবাস কর্ত্তব্য। অনাহারে শরীর নীরস ও শ্লেষ্ম-শূন্য হইয়া রোগের লাঘব করিতে থাকে।

সন্নিপাতে জলময়ো নরাণাং বিগ্রহো ভবেৎ।
বিনা বহ্ন্যুপচারেণ কস্তং শোষয়িতুং ক্ষমঃ॥

সন্নিপাত জ্বরে মনুষ্যের শরীর জলময় হয়, সুতরাং বহ্ন্যুপচার অর্থাৎ বালুকাস্বেদাদি ব্যতিরেকে কেহই তাহাকে শোষণ করিতে পারে না।

ন স্বেদ ব্যতিরেকেণ সন্নিপাতঃ প্রশাম্যতি।
তস্মান্মুহুর্মুহুঃ কার্য্যং স্বেদনং সন্নিপাতিনাম্॥

স্বেদক্রিয়া ব্যতিরেকে সন্নিপাত জ্বরের শান্তি হয় না, অতএব মুহুর্মুহু স্বেদ প্রদান করিবে।

প্রয়োগা বহবঃ সন্তি সবিষা নির্ব্বিষা অপি।
বহ্ন্যয়নং বিনা প্রায়ো ন বীর্য্যং দর্শয়ন্তি তে॥

সন্নিপাত জ্বরে সবিষ ও নির্ব্বিষ বহুবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যহৈতে পারে কিন্তু অগ্নিতাপ ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত ঔষধের বীর্য্য কার্য্যকর হয় না সুতরাং স্বেদ নিতান্ত প্রয়োজন। স্বেদের মধ্যে বালুকা স্বেদই ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। পোট্টলীবদ্ধ বালুকা নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বারম্বার স্বেদ প্রদান করিলে, হস্ত পদাদির বেদনা অঙ্গ সমুদায়ের গুরুতা ও তন্দ্রা প্রভৃতি উপশমিত হয়।

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড় প্রত্যেক সমভাগে ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে তন্দ্রা নিবারণ হয়। চেতনা লোপ হইলে মউলসার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নস্য প্রদান করিবে। পিপুলমূল, সৈন্ধব, পিপুল, মৌলসার ও মরিচ সমভাগ উষ্ণ জলের সহিত পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে

তন্দ্রা, প্রলাপ, মস্তকের গুরুতা ও অচৈতন্য প্রভৃতি উপদ্রবের আশু শান্তি হয়। মরিচ ও রসুন একত্র পেষণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া নস্য লইলে কফের ধ্বংস হয়। কালকুঁকড়ার ডিম্বের তরলাংশ পান করিলে অথবা নস্য বা অভ্যঙ্গ করিলে প্রবল সন্নিপাতের উপশম হয়।

লৌহিত্যে নেত্রয়োর্ব্বান্তৌ প্রলাপে মূর্দ্ধচালনে।
ন স্বেদঃ শুভদোজ্ঞেয়স্তত্র স্বেদক্রিয়া হিতা॥

চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, বমি, প্রলাপ ও শিরশ্চালন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে স্বেদ প্রদান হিতকর নহে। এরূপস্থলে স্বেদের পরিবর্ত্তে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

আর্দ্রক স্বরসোপেতং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্।
আকণ্ঠং ধারয়েদাস্যে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃ পুনঃ॥
তেনাস্য হৃদয়াৎ শ্লেষ্মা মন্যা পার্শ্ব শিরোগলাৎ।
লীনোঽপ্যাকৃষ্যতে শুষ্কো লাঘবঞ্চাস্য জায়তে॥
পর্ব্বভেদো জ্বরো মূর্চ্ছা নিদ্রা কাস গলাময়াঃ।
মুখাক্ষিগৌরবং জাড্য মুৎক্লেদ শ্চোপশাম্যতি॥
এক-দ্বি স্ত্রি শ্চতুঃ কুর্য্যাদ্ দৃষ্ট্বা দোষ বলাবলম্।
এতদ্ধি পরমং প্রাহুর্ভেষজং সন্নিপাতিনাম্॥

সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগ উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া আদার রসে তরল করিয়া আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে বারংবার শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে এবং মুখ, হৃদয়, মন্যা, পার্শ্ব, মস্তক ও গলদেশ হইতে গাঢ় সংলগ্ন শ্লেষ্মা উঠিয়া যাওয়ায় শরীর লঘু হয় এবং পর্ব্বভেদ, জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্রা, কাস, গলরোগ, মুখ ও চক্ষুর ভার, জড়তা ও বমনভাব প্রভৃতি নিবারিত হয়। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া একবার, দুইবার কিম্বা তিন চারিবার পর্য্যন্ত এইরূপ নিষ্ঠীবন ব্যবহার করা যাইতে পারে, কোনই অনিষ্ট বা আশঙ্কা নাই। সন্নিপাত জ্বরে ইহা বিশেষ হিতকর। নিষ্ঠীবনের ন্যায় অবলেহ প্রয়োগেও বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী।
শ্লক্ষ্ণ চূর্ণীকৃতং চৈতন্মধুনা সহ লেহয়েৎ॥
এষাবলেহিকা হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্।
হিক্কাংশ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোধং নিযচ্ছতি॥
উর্দ্ধগশ্লেষ্মহরণে উষ্ণে স্বেদাদি কর্ম্মণি।
বিরোধ্যুষ্ণ মধু ত্যক্ত্বা কার্য্যোযাদ্র্´কজৈ রসৈঃ॥

কট্‌ফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহন (চাটিয়া চাটিয়া খাওয়া) করিবে, ইহাতে ঘোরতর সন্নিপাত জ্বর, হিক্কা, শ্বাস ও কণ্ঠ-রোধ নিবারণ হয়। রোগীর বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠ যখন শ্লেষ্ম কর্ত্তৃক রুদ্ধ হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে, তখন পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠীবন ও অবলেহ দ্বারা আশ্চর্য্য ফল লাভ করা যায়। উর্দ্ধজত্রুগত শ্লেষ্ম-নাশার্থ উষ্ণ স্বেদাদি ক্রিয়া যদি আবশ্যক হয়, তবে মধুর স্থানে আদার রস প্রদান করিবে, কারণ মধু উষ্ণ-বিরোধী উষ্ণ স্বেদ ক্রিয়াদ্বারা মধু হইতে অপকার হওয়া বিচিত্র নহে।

শিরাষ বীজ, পিপ্পলী, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ গোমূত্রে পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে রোগীর চৈতন্য সম্পাদিত হয়। আরসুলার (তেলা পোকা) নাদি মধু সহ মর্দ্দন করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে তন্দ্রা নাশ ও চেতনা লাভ হয়।

সন্নিপাত জ্বরের প্রথম হইতেই চিকিৎসার ভার কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত, কারণ

জ্বর বিকার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি এবং ইহার চিকিৎসাও দুরূহ, ফলতঃ বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক দিগকেই ইহাতে নিযুক্ত করা সঙ্গত। বিকারের রোগীকে কদাচ কাঁচা জল পান করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। এমন কি ইহাতে দিবসের সিদ্ধ জলও রাত্রিতে পান করিতে দিবে না। অধিক জলপান দ্বারা রোগের বৃদ্ধি হয়। আজ কাল বরফ জলও কোন কোন স্থানে ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, বাস্তবিক উহা ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উহা দ্বারা শ্লেষ্মার প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। রোগীকে শুষ্ক ও প্রশস্ত গৃহমধ্যে পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ান রাখিবে। আমাশয় অজীর্ণপূর্ণ ও বমন-বেগ বর্ত্তমান থাকিলে কোন বমন কারক ঔষধ প্রদান করা উচিত। আকন্দ মূল বা উহার ছালচূর্ণ ৵০ আনা হইতে।০ আনা মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বমন হইয়া থাকে। অবৈধ বমন দ্বারা রোগীর অত্যন্ত কষ্ট ও অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, সুতরাং বমন করাইতে হইলে বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক। কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য এরণ্ড তৈল ২ হইতে ২॥০ তোলা পর্য্যন্ত উষ্ণজল সহ সেবন করান বিধেয় অথবা অন্য কোন মৃদু বিরেচক প্রদান করিবে।

পূর্ব্বোক্তরূপ বমন বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে মহাদশমূলাদি পাচন ব্যবস্থা করিতে হয়।

বিল্ব শ্যোনাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা।
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূল মিদং মহৎ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্।
বাত-পিত্তাপহং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্॥
উভয়ং দশমূলংহি সন্নিপাত জ্বরাপহম্।
কাসে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে॥
পিপ্পলী চূর্ণ সংযুক্তং কণ্ঠ হৃদ্ গ্রহ নাশনম্।

বিল্ব, শোনা, গাম্ভরী, পারুলও গণিয়ারী ইহাদের মূলের ছাল একত্র করিলে বৃহৎ পঞ্চমূল হয়। শালপানি, চাকুলে বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের মূল একত্র করিলে স্বল্প পঞ্চমূল হয়। বৃহৎ পঞ্চমূল কফ ও বায়ু নাশক এবং স্বল্প পঞ্চমূল বাত-পিত্তনাশক ও বৃষ্য। উভয় বিধ পঞ্চমূল মিলিত হইলে দশমূল কহাযায়। সন্নিপাত জ্বরে দশমূল পাচন বিশেষ হিতকর। দশমূলের কাথে পিপ্পলী চূর্ণ ৵০ আনা প্রক্ষেপ দেওয়া বিধেয়। এই কাথ পানে কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ অতি শীঘ্রই নিবারিত হয়। দশমূল পাচনের উপকারিতা কাহারই অবিদিত নাই। সন্নিপাত জ্বরে দশমূলের কাথের সহিত সৌভাগ্যবটী প্রয়োগ করিলে, অর্থাৎ সৌভাগ্যবটী ১ টী মধুদিয়া মাড়িয়া ৪ তোলা দশমূলের কাথ সহ দিবসে দুইবার সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

সন্নিপাত জ্বর অতি দীর্ঘ কাল স্থায়ী ৭ দিন ৯ দিন ১১ দিন ১৪ দিন এবং ২১ দিন পর্য্যন্ত ইহার বৃদ্ধির সময়। সম্ভবতঃ ৭।৯।১১ দিনেই অতিশয় প্রবল ও মারাত্মক হইয়া উঠে। কখন কখন ৪২ দিন পর্য্যন্তও ইহাকে ভোগ করিতে দেখা যায়। সন্নিপাত জ্বরে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা যাইতে পারেনা, কারণ কোন্ সময়ে কি উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। সর্ব্বদাই বিবেচনা পূর্ব্বক উপসর্গানুযায়ী ঔষধ সমস্ত প্রয়োগ করিতে হয়। রোগী যখন ঘোর বিকারে

অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন কফকেতু, মহালক্ষ্মী বিলাস, বৃহৎকস্তুরী ভৈরব, স্বর্ণসিন্দুর এবং উৎকৃষ্ট মৃগনাভি ইহার কোন একটী সেবন করান আবশ্যক। মহালক্ষ্মী বিলাস অর্দ্ধবটী ও বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব অর্দ্ধ বটী মধু দিয়া মাড়িয়া দোষানুসারে আদা পানের রস সহ অথবা অপর কোন অনুপানের সহিত সেবন করাইলে রোগী শীঘ্রই উপশম বোধ (চৈতন্যলাভ) করে। কর্পূর ১ রতি মৃগনাভি ১ রতি ও স্বর্ণ সিন্দুর ১ রতি একত্র মধুদিয়া মাড়িয়া আদা পান বা কেবল আদার রস সহ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইতে দেখাযায়, ইহা দ্বারা হস্ত পদাদির শীতলতা নিবারণ হয় এবং নাড়ী বৈষম্য ভাব ত্যাগ করে ও পরিশুদ্ধ হয়। রোগীর যখন একেবারেই চৈতন্য থাকে না, হস্তপদাদি শীতল ও শিথিলেন্দ্রিয় হইয়া পড়ে, তখন আমাদের মৃত সঞ্জীবনী সুরাই একমাত্র অবলম্বন। মৃগমদাসব সন্নিপাত জ্বরের এই অবস্থায় অনির্ব্বচনীয় ফল প্রদান করে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে মৃগমদাসব বা মৃত সঞ্জীবনীর সহিত মাংস রস মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রদান করা যুক্তি সঙ্গত। ইহাতে রোগীর দেহে অল্পে অল্পে বল সঞ্চার হয় এবং রক্তের ক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। এই সন্নিপাত জ্বরে রোগীর যখন দর্শন, শ্রবণ ও বাকশক্তি প্রভৃতির লোপ হইতে থাকে, কিছু মাত্র জ্ঞান থাকে না এবং নাড়ী বসিয়া যায়, তখন সূচিকাভরণ প্রয়োগই শ্রেয়স্কর। সূচিকাভরণের প্রস্তুত প্রণালী ত্রিবিধ হইলেও বংশপরম্পরানুসারে যাহা আমারা প্রয়োগ করিয়া থাকি ও উৎকট উৎকট রোগীকে সেবন করাইয়া অচিন্তনীয় ফল লাভ করিয়া আসিতেছি, সেইটী এস্থলে উল্লেখ করিলাম। ইচ্ছা হইলে অপর দুই প্রকার সূচিকাভরণের প্রস্তুত প্রণালী ভৈষজ্য রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিবেন।

অমৃতং গরলং দাক সর্ব্বতুল্যঞ্চ হিঙ্গুলম্।
পঞ্চ পিত্তেন সংমর্দ্দ্য সর্ষপাভাং বটীংচরেৎ ॥
বটিকা সূচিকাগ্রেণ সন্নিপাত কুলান্তকৃৎ।
তিলঞ্চ তিলতৈলঞ্চ ভোজনং দধি ভক্তকম্ ॥
সহস্রশো দৃষ্টফলেয়ং বটিকা।

কাষ্ঠ বিষ, সর্প বিষ ও দারমুজ প্রত্যেক ১ ভাগ হিঙ্গুল ৩ ভাগ এই সমুদয় রোহিত মৎস্য, মহিষ, ময়ূর, ছাগ ও শূকরের পিত্ত দ্বারা যথাক্রমে এক এক দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান ডাবের জল। ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে জানিয়া রোগীর গাত্রে তিল তৈল মর্দ্দন করা আবশ্যক। আবশ্যক বোধে চিকিৎসক রোগীকে বেদানা, ইক্ষু, মিছরির জল ও ডাবের জল প্রভৃতি শীতল বস্তু সেবন করিতে দিবেন। ইহাদ্বারা মৃত প্রায় রোগীকেও পুনর্জ্জীবিত হইতে দেখা গিয়াছে। একটী কথা এস্থলে বলিয়া রাখা নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে যে, ব্যক্তি মাত্রেই যেন মনে করেন, সবিষ ঔষধ সমুদয় হইতে উপকারের ন্যায় সহসা অপকারও হইতে পারে ও হইয়া থাকে অতএব যিনি ঐ সমুদয় অপকার নিবারণ করিতে সক্ষম, তাদৃশ সুচিকিৎসক ব্যক্তিরই এতাদৃশ বিষাক্ত ঔষধি ব্যবহার করা বিধেয়। বিষ বা উপবিষের উল্লেখ যেখানে থাকিবে, সেই স্থানেই শোধিত বুঝিতে হইবে।

বিষ ও উপবিষাদির শোধন প্রণালী আমরা ক্রমশঃ প্রদর্শন করিব। সংক্ষেপতঃ সূচিকাভরণের প্রস্তুত প্রণালী ও ব্যবহার উল্লিখিত হইল ক্রমশঃ কফকেতু, মহালক্ষ্মী বিলাস প্রভৃতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ ঔষধের বিষয় বলা যাইতেছে।

টঙ্কনং মাগধী শঙ্খং বৎসনাভং সমং সমম্।
আর্দ্রক স্বরসেনাথ দাপয়েদ্ ভাবনা ত্রয়ম্॥
গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্য মার্দ্রক স্বরসৈর্যুতম্।
পীনসে শ্বাস কাসে চ শিরোরোগে গলগ্রহে॥
কফ রোগান্ নিহন্ত্যাশু কফকেতু রয়ং রসঃ।

কফকেতু—সোহাগার খই, পিপুল, শঙ্খ ভস্ম ও বিষ এইসমুদয় চূর্ণ সমভাগ একত্র আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। সন্নিপাত, বাত শ্লেষ্ম বা অপর যে কোন শ্লেষ্ম ঘটিত পীড়ার প্রথমে আদা কিম্বা আদাপানের রস সহ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। কফকেতু একটী প্রসিদ্ধ ঔষধ, চিকিৎসক মাত্রেই ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পলং বজ্রাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধৌ গন্ধপারদৌ।
তদর্দ্ধং বঙ্গভস্মাপি তদর্দ্ধং তারকং তথা॥
তৎসমং মাক্ষিকঞ্চৈব তদর্দ্ধং তাম্র ভস্মকম্।
রস তুল্যঞ্চ কর্পূরং জাতী কোষফলে তথা॥
বৃদ্ধদারক বীজঞ্চ বীজং স্বর্ণ ফলস্য চ।
প্রত্যেকং কার্ষিকং ভাগং মৃতং স্বর্ণংদ্বিশানকম্॥
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ সুদারুণান্॥

অভ্র ৮ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, পারদ ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, স্বর্ণ মাক্ষিক ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জয়িত্রী, বিদ্ধড়ক বীজ ও ধুতুরা বীজ প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা এই সমুদয় একত্র পানের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার সাধারণ অনুপান আদা পানের রস। মহালক্ষ্মী বিলাস সন্নিপাত জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রূর কফজন্য ঊর্দ্ধজত্রুজ রোগে (সান্নিক) ইহার উপকারিতা সকলেই অবগত আছেন।

রসাভ্র টঙ্কণং শুণ্ঠী কস্তুরী পিপ্পলী তথা।
জয়াবীজং দন্তীমূলং কর্পূরং মরিচং সমম্॥
আর্দ্রক স্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্ত বারকম্।
শৃঙ্গবের রসৈর্যুক্তং যোজয়ে দ্রক্তিকান্বিতম্॥
বাতশ্লেষ্মণি মন্দেহগ্নৌ পিত্তশ্লেষ্মাধিকেঽপিচ।
ত্রিদোষজনিতে ঘোরে কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে তথা॥
উর্দ্ধজত্রুগরোগেচ সশোথে বিষমজ্বরে।
এষ সর্ব্বাময়ান্ হন্তি শুক্রৌজো বলকৃৎ পরঃ॥

কস্তুরী ভূষণ রস—রসসিন্দুর, অভ্র, সোহাগা, শুঁঠ, মৃগনাভি, পিপুল, সিদ্ধিবীজ, দন্তীমূল, কর্পূর ও মরিচ ইহাদিগকে সমভাগে লইয়া আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাতে বাত শ্লেষ্ম, পিত্তশ্লেষ্ম ও ত্রিদোষ জনিত জ্বর, শোথ সংযুক্ত বিষমজ্বর, ঊর্দ্ধজত্রুজ অর্থাৎ কণ্ঠ দেশের ঊর্দ্ধভাগস্থ যাবতীয় শ্লৈষ্মিক রোগ (সান্নিক) কাস, শ্বাস, ক্ষয় ও অগ্নি-মান্দ্যাদি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয় এবং ইহা অত্যন্ত শুক্র ও ওজোবর্দ্ধক।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং টঙ্কং জাতী কোষফলং তথা।
মরিচং পিপ্পলী চৈব কস্তুরী চ সমাংশিকা॥
রক্তিদ্বয়ং ততঃ খাদেৎ সন্নিপাতে সুদারুণে।

স্বল্প কস্তুরী ভৈরব—হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খই, জয়িত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিপুল এবং মৃগনাভি প্রত্যেক সমভাগে জল দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান সাধারণতঃ আদা

পানের রস। সন্নিপাত জ্বরের প্রথমাবস্থায় স্বল্পকস্তুরী ভৈরব প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ করা যায়।

মৃগমদ শশি সূর্ব্বা ধাতকী শূকশিম্বী।
রজত কনক মুক্তা বিদ্রুমং লোহপাঠাঃ॥
ক্রিমিরিপু ঘন বিশ্বা বারিতালাভ্র ধাত্রী।
রবিদল-রস পিষ্টঃ কস্তুরীভৈরবোঽয়ং॥
কস্তুরী ভৈরবঃ খ্যাতঃ সর্ব্বজ্বর বিনাশনঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পেয়ো বিষম জ্বর নাশনঃ॥
দ্বন্দ্বজান্ ভৌতিকান্ বাপি জ্বরান্ কামাদি সম্ভবান্
অভিচারকৃতাং শ্চৈব তথা শক্রকৃতান্ পুনঃ॥
নিহন্যাদ্ ভক্ষণাদেব ডাকিন্যাদিযুতাং স্তথা।
বিল্বচূর্ণ জীরকাভ্যাং মধুনা সহ পানতঃ॥
আমাতিসারং গ্রহণীং জ্বরাতিসার মেবচ।
অগ্নিদীপ্তিকরঃ শান্তঃ কাস রোগ নিকৃন্তনঃ॥
ক্ষপয়েদ্ ভক্ষণাদেব মেহরোগং হলীমকং।
জীর্ণজ্বরং নূতনং বা দ্বিকালীনঞ্চ সন্ততম্॥
প্রক্ষিপ্তং ভৌতিকং বাপি হন্তি সর্ব্বান্ বিশেষতঃ।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকম্বা ত্র্যাহিকং চাতুর্থাহিকম্
পঞ্চাহিকং ষষ্ঠসংস্থং পাক্ষিকং মাসিকং পুনঃ।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভক্ষণাদার্দ্রক দ্রবৈঃ॥

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব—মৃগনাভি, কর্পূর, তাম্র, ধাইফুল, আলকুশীবীজ, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মুতা, শুঁঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র, ও আমলকী এই সমুদয় চূর্ণ সমভাগ আকন্দ পত্ররসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

অনুপান আদার রস। মধু দিয়া মাড়িয়া বেলশুঁঠ সিদ্ধের জল অথবা জীরক চূর্ণ সহ সেবনে আমাতিসার, গ্রহণী, ও জ্বরাতিসার আরোগ্য হয়। পুস্তকে ইহার যেরূপ ফলশ্রুতি আছে, প্রায়শঃ কার্য্যেও কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। ইহাতে এক দোষজ, দ্বিদোষজ সান্নিপাতিক ও ভৌতিক জ্বর, অভিচার অর্থাৎ শত্রুকৃত যাগাদি জন্য জ্বর, কাস, মেহ, হলীমক, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুরাহিক, পাঞ্চাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ জ্বর নিবারিত হয়।

উল্লিখিত ঔষধ ও নিয়ম সমূহ দ্বারা ক্রমশঃ দোষের প্রাবল্য কমিয়া আসিতে থাকে। কোন কোন জ্বর এই অবস্থায় বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ পাইতে থাকে। কোন জ্বর বিচ্ছেদ না হইয়া ক্রমশঃ কমিয়া একেবারে নিবৃত্ত হইয়া যায়। আশা বা আশঙ্কা উভয়েই তুল্য, পরন্তু ইহার নির্ব্বিরাম অবস্থাই আমাদের শুভ বলিয়া বোধ হয়। প্রথমোক্ত অবস্থায় প্রায়শঃই জ্বরের সময় কিঞ্চিৎ দোষেরা প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়, জ্বরত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উহারও শমতা হইয়া যায়। এই অবস্থায় জ্বরকালীন মহালক্ষ্মী বিলাস, কস্তূরী ভৈরব বা স্বর্ণসিন্দূরাদি প্রদান করিয়া বিরামকালে জ্বরঘ্ন ঔষধ বা পাচন ব্যবস্থা করিতে হয়। দোষের শমতা হইয়াছে, অল্প জ্বর আছে, ঈদৃশ অবস্থায় জ্বরঘ্ন ঔষধ ও পাচন প্রদান করা আবশ্যক। তজ্জন্য নিম্নে কয়েকটী পরীক্ষিত পাচনের তালিকা দেওয়া গেল।

চির জ্বরে বাত কফোল্বণে বা
ত্রিদোষজে বা দশমূল মিশ্রঃ।
কিরাত তিক্তাদি গণঃ প্রযোজ্যঃ।
শুদ্ধার্থিনে বা ত্রিবৃতাদি মিশ্রঃ॥

চতুর্দ্দশাঙ্গ ক্বাথ—পূর্ব্বোল্লিখিত দশমূল এবং চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুণ্ঠী এই চতুর্দ্দশ দ্রব্যের সমভাগে মিলিত ২ তোলা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অল্প উষ্ণ অবস্থায় পান করিবে। একবারে

পান করা কঠিন বা রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে অর্দ্ধ মাত্রায় দুইবার পান করিবে। এই কাথ ২ তোলা সহ সৌভাগ্য বটী বা বিষম জ্বরাধিকারোক্ত বৃহৎ সর্ব্বজ্বর-হর লৌহ কিম্বা বিষম জ্বরান্তক লৌহ সেবনে অত্যাশ্চর্য্য ফল হইতে দেখা গিয়া থাকে। এই কষায় বহুকাল ব্যাপী জ্বর, বাতশ্লেষ্ম প্রধান জ্বর ও সান্নিপাতিক জ্বরের প্রসিদ্ধ মহৌষধ। শুদ্ধি অর্থাৎ ভেদের প্রয়োজন হইলে ইহার সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক ৵০ হইতে ।০ আনা মাত্রায় ত্রিবৃৎ (তেউড়ী) চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। কাথ ছাকিয়া চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন কটূফলাদি ও কারব্যাদি প্রভৃতি কাথও বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

নিদ্রোপেত মভিন্যাস ক্ষীণং বিদ্যাদ্ধতৌজসম্।
সন্নিপাতে প্রকম্পন্তং প্রলপন্তং ন বৃংহয়েৎ॥
তৃষ্ণা দাহাভিভূতেষু নদদ্যাচ্ছীতলং জলম্।
বাত-পিত্তোল্বণে চৈব ঘৃতং যোজ্যং পুরাতনম্॥
অভ্যঙ্গাৎ শময়ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণম্।

সন্নিপাত জ্বরে কম্প, প্রলাপ, নিদ্রা-বির্ভাব ও ওজঃ পদার্থের নাশ হইলে, রোগীকে অভিন্যাস জ্বরাক্রান্ত বলিয়া স্থির করিবে। তাদৃশ অবস্থায় বৃংহণ অর্থাৎ দুগ্ধাদি দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া ডাক্তারি চিকিৎসায় আবশ্যক হইলেও আমাদের মতে সঙ্গত নহে, ইহাতে শীঘ্রই ঘোর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতিশয় তৃষ্ণা ও দাহাভিভূত ব্যক্তিকে কদাচ শীতল জল পান করিতে দিবে না। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় অশ্রদ্ধার ইহাও একটী কারণ, লেমনেড্ বরফ ত্যাগ করিয়া কে বল আজকাল সহজে গরম জল খাইতে ইচ্ছা করে? তবে যখন নিরুপায় হইয়া পড়েন, তখন কাজেই স্বীকার করিতে হয়। বাতোল্বণ ও পিত্তোল্বণ সন্নিপাতে পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন হিতকর। বাতোল্বণ সন্নিপাত জ্বরে মস্তকে বক্ষস্থলে ও হস্ত পদাদিতে পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন করিয়া সেক প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

স্বেদোদ্গমে জ্বরে দেয় শ্চূর্ণোভৃষ্টকুলত্থজঃ॥

জ্বরের মধ্যে সমধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকিলে কুলথ কলায় ভাঁজিয়া চূর্ণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিবে। ইহাতে ঘর্ম্ম নিবারণ হয়। অধিক পরি-মাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকিলে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সুতরাং ঘর্ম্ম নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে।

সন্নিপাতজ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ।
শোথঃ সংজায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে॥

সন্নিপাত জ্বর বিকারে প্রায়শঃই কর্ণমূলে শোথ জন্মিতে দেখা যায়, ঐ কর্ণমূল শোথে অতি কম লোকই রক্ষা পাইয়া থাকে। দুই এক স্থলে জ্বরের আরম্ভ ও জ্বরের মধ্য সময়েও শোথ জন্মিতে দেখা যায়।

জ্বরাদিতো বা জ্বরমধ্যতো বা,
জ্বরান্ততো বা শ্রুতিমূল শোথঃ।
ক্রমেণ সাধ্যঃ খলু কৃচ্ছ্র সাধ্য
স্তুতস্ত্বসাধ্যঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিঃ॥

জ্বরের আদিতে শোথ হইলে সাধ্য, জ্বরের মধ্যে হইলে কষ্টসাধ্য ও জ্বরের অন্তে শোথ হইলে অসাধ্য বলিয়া ভিষগ্‌গণ নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক কর্ণমূল শোথ কষ্টসাধ্য হইলেও আমরা উহাকে সর্ব্বদাই অসাধ্য বলিয়া ব্যাখ্যা

করিতে পারি না। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উহার নানাবিধ চিকিৎসা লিখিত আছে। প্রথমতঃ জলৌকা দ্বারা ঐ স্থানের রক্ত মোক্ষণ করা বিধেয়, কিন্তু এ কল্পটী আমরা সাধারণের সুবিধা-জনক মনে করি না। জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে অধিকাংশ চিকিৎসকই কৃতকর্ম্মা নহেন। জলৌকা ব্যবহারের অনেক-গুলি বিবেচ্য বিষয় আছে, অভীষ্ট সিদ্ধির অন্তরায় বোধে এস্থলে উহা আমরা প্রকাশ করিতে পরিলাম না, ফলতঃ যিনি কখন জলৌকা ব্যবহার করেন নাই, কর্ণমূল শোথে তাঁহার জলৌকা প্রয়োগ বিধেয় নহে। পঞ্চতিক্ত ঘৃত ও ত্রিফলাদি ঘৃত প্রভৃতি পান কবিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু উহাও নিরাপদ নহে। ঘৃতপানে জ্বর বৃদ্ধি বা পুনরাগত হইতে পারে, সুতরাং এ কল্পটী বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ।

বাত শ্লেষ্ম-নাশক প্রলেপ ও কবল-গ্রহ ইহাতে বিশেষ হিতকর। কুলত্থ কলায়, কট্‌ফল, শুঁঠ ও কৃষ্ণ জীরা চূর্ণ সমভাবে অগ্নিস্বিন্ন সিজপত্র রসে পেষণ করিয়া বারংবার সুখোষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিবে। গেরিমাটী, যবক্ষার (কেহ বলেন পাঙ্গালবণ), শুঁঠ, বচ ও কট্‌ফল সমভাগে কাঞ্জিকদ্বারা উত্তমরূপ পেষণ করিয়া সুখোষ্ণ প্রলেপ বারম্বার প্রদান করিবে। ২।৩ বার প্রলেপ দেওয়ার পর গরম জল দ্বারা উহা ধৌত করিয়া দিবে, নচেৎ প্রলেপ সম্যক্‌রূপে শরীরে কার্য্য করিতে পারেনা। দশমূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে শোথের বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয় যোগটী ব্যবহার করিয়া আমরা অনেক স্থলে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছি। গল্ দেশে শোথ হইলে, টাবা লেবুর মূল, গণিয়ারি, দেব দারু, শুঁঠ, চই ও চিতামূল সমভাগে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি কর্ণ মূল শোথ কোন মতে বসিয়া না যায়, তবে উপযুক্ত অস্ত্র চিকিৎসক দ্বারা অস্ত্র প্রয়োগ করাইবে। অধিকাংশ স্থলে আপনা হইতেই ফাটিয়া গিয়া থাকে, তথাপি অস্ত্র চিকিৎসার সুবিধা থাকিলে তাহাই করাইবে। অনন্তর ক্ষত নাশক ঔষধ ব্যবহার করিলেই সত্বর ক্ষত নিবারাণ হইয়া যায়।

সন্নিপাত জ্বর অতি ভীষণ ব্যাধি। এই জ্বর যখন কমিয়া আসিতে থাকে, তখন সাবধান হওয়া প্রয়োজন, কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় এই ব্যাধিতে অনেক রোগী চিরদিনের জন্য চক্ষু, কর্ণ বা হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়-শক্তি-বিহীন হইয়া যায়। কখনও কর্ণমূল বা কুচকী প্রভৃতি স্থানে শোথ হইয়া পূয় রক্তাদিরূপে শরীরের বিষবদ-নিষ্টজনক পদার্থ বহির্গত হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ইহাও ভাল! কুপিত বায়ু প্রভাবে যখন চক্ষু কর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাইতে থাকে অথবা হস্ত পদাদি শুকা-ইয়া যাইতে থাকে তখন অন্য উপায় ত্যাগ করিয়া বাতব্যাধি অধিকারোক্ত চিকিৎসা করিতে হয়। এই সমুদায় চিকিৎসা বাহুল্য ভয়ে আমরা এস্থলে লিখিতে পারিলাম না। বাত ব্যাধিতে সবিশেষ দেখাইতে চেষ্টা করিব। দোষ সমুদয়ের হীন, মধ্য ও প্রবলতা এবং অঙ্গ-বৈকল্যাদি অবস্থা বিবেচনা করিয়া তত্তদুপযোগী উপায় অবলম্বন করিলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

আহার বিধি

প্রকৃতি, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, কাল, উপযোগসংস্থা ও উপযোগকর্ত্তা, আহার বিধি বিশেষের এই অষ্টবিধ আয়তন কল্পনা করা হইয়া থাকে। ক্রমশঃ প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে। আহার বিধির পৃথক্ পৃথক্ আয়তন বিচার করিয়া যাহা হিতকর তাহাই গ্রহণ করিবে।

যে বস্তু যাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ আহার ও ঔষধাদির গুরুত্ব প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণকে প্রকৃতি বলা যায়, যথা—মুগ কলায়ের লঘুতা ও মাষ কলায়ের গুরুতা, হরিণ মাংসের লঘুতা ও শূকর মাংসের গুরুতা ইত্যাদি। স্বাভাবিক দ্রব্যের সংস্কারকে করণ বলা যায়। সংযোগাদি ক্রিয়া দ্বারা গুণান্তরের উৎপত্তির নাম সংস্কার। জল ও অগ্নির সন্নিকর্ষ, মন্থন, দেশ ও কাল প্রভাব, ভাবনা, কালপ্রকর্ষ ও পাত্রাদির গুণানুসারে ঐ গুণান্তরোৎপত্তি হইয়া থাকে। তোয়াগ্নিসন্নিকর্ষে সুধৌত ও পরিষ্কৃত তণ্ডুলদ্বারা যে অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় লঘুপাক হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হইলে হয় না। ইহাই তোয়াগ্নি সন্নিকর্ষে গুণান্তরোৎপত্তির দৃষ্টান্ত স্থল। গুরুত্বাদিগুণ বিশিষ্ট যে দধি ভক্ষণে শোথের উৎপত্তি হয়, মন্থনাদি ক্রিয়া দ্বারা ঐ দধি তক্ররূপে পরিণত হইয়া শোথঘ্ন হইয়া থাকে। স্থান বিশেষে অবস্থিতি জন্যও গুণান্তরের উৎপত্তি হয় যথা ভস্মরাশি মধ্যে কোন বস্তু স্থাপন করিলে তাহাতে বিভিন্ন গুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সময়ের পরিমাণ অনুসারে অরিষ্টাদিতে গুণান্তরের উৎপত্তি হয়। কোন বস্তু [illegible] রাখিলে তাহাতেও অন্য একটা গুণ জন্মিয়া থাকে, যেমন কোন ঔষধ ত্রিফলার কাথ দ্বারা লৌহপাত্রে মাড়িয়া লেপন করিয়া রাখিলে কোন এক বিশেষ গুণের উৎপত্তি হয়। উৎপলাদি সুগন্ধি পুষ্পের ঘ্রাণে অপর বস্তুতেও সুঘ্রাণ উৎপাদিত হয়, ইহাকে সংসর্গ জন্য গুণান্তরোৎপত্তি বলা যায়। পরস্পর সংযোগে পদার্থ সমুদয়ে একরূপ গুণের উৎপত্তি হয়, ইহাকে সংযোগজ বলা হয়। মধু ও ঘৃতের সংযোগ এবং মৎস্য, মধু ও দুগ্ধের সংযোগ দ্বারা একটী বিশেষ গুণের উৎপত্তি হয়। বাস্তবিক ইহার কোনটীই অনিষ্ট জনক নহে, কিন্তু উক্তরূপ সংযোগে বিষবদনিষ্টকর হয়।

রাশি শব্দের অর্থ সর্ব্বগ্রহ ও পরিগ্রহ। আহারীয় বস্তু সমুদয় অর্থাৎ শাক, অন্ন ও দুগ্ধাদির একত্র পিণ্ডাকারে মাত্রা গ্রহণের নাম সর্ব্বগ্রহ, ইহা অনিষ্ট জনক। উক্ত দ্রব্য সমুদয়ের পৃথক্‌ভাবে পরিমাণ গ্রহণকে পরিগ্রহ বলা হয়। এই প্রকার আহার শুভ ফল জনক। বস্তু সমুদয়ের একত্র গ্রহণকে সর্ব্বগ্রহ, আর সর্ব্ব প্রকারে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণকে পরিগ্রহ বলে।

দেশ শব্দের অর্থ স্থান। উৎপত্তি ও অবস্থিতি স্থানানুসারে দ্রব্য সমুদয়ে গুণান্তরের উৎপত্তি হয। স্থান মাহাত্ম্যে দ্রব্যগুণেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কাল নিত্যগ ও আবস্থিক ভেদে দুই প্রকার। অয়ন ও ঋতু ভেদে যে কাল বৎসরাদিরূপে পরিণত হয এবং ঋতুস্বভাব জন্য শীতোষ্ণাদি যাহাতে অনুভূত হয়, তাহাকে নিত্যগ বলা যায়। রোগাভিভব অথবা বয়সাদি কৃত যে

আবস্থিক ... আবস্থিক কাল বলা যায়। কালোপযোগী সাত্ম্যাসাত্ম্য ও অবস্থাগত বলাবল বিবেচনা করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। আহারের পরিণাম অপেক্ষা করাকে উপযোগ সংস্থা বলাযায়, অর্থাৎ ভক্ষিত বস্তু জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা। অনতিদ্রুত ও অনতি বিলম্বিতাদি নিয়ম পূর্ব্বক যে ব্যক্তি আহার করে, তাহাকে উপযোক্তা বলে। এইরূপ অষ্টবিধ আহার বিধি বিশেষের আয়তন জানিবে। ইহারাই শুভাশুভ ফলদাতা এবং পরস্পরোপকারক। মোহ বা প্রমাদ বশতঃ অহিতকর ও অশুভ ফল-দায়ক বস্তু আপাত প্রিয়বোধে ব্যবহার করিবে না। বিশেষ করিয়া কতিপয় আহার বিষয়ক নিয়ম লিখিত হইতেছে, উহা কি সুস্থ, কি অসুস্থ, সকলের পক্ষেই হিতজনক।

উষ্ণং স্নিগ্ধং মাত্রাবজ্জীর্ণে বীর্য্যাবিরুদ্ধং ইষ্টে দেশে ইষ্টসর্ব্বোপকরণং নাতিদ্রুতং নাতি বিলম্বিতং ন জল্পন্ ন হসন তন্মনা ভুঞ্জীত আত্মান মভিসমীক্ষ্য সম্যক্॥

পূর্ব্বকৃত পরিমিত আহার সম্যক্ জীর্ণ হইলে, অল্প উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বীর্য্যাবিরুদ্ধ, বস্তু আহার করিবে। আহার স্থানটী মনের প্রীতিকর হওয়া প্রয়োজন এবং আহারের উপকরণ সমুদয়ের সহিত অনতিদ্রুত ও অনতিবিলম্বিত ভাবে আহার করা উচিত। আহারের সময় স্বীয় সামর্থ্য বিষয়ে লক্ষ্য রাখা অতীব প্রয়োজন। আহার কালে অন্য মনস্ক হওয়া, কথা বলা বা হাস্য করা কোন মতে উচিত নহে। ক্রমশঃ প্রত্যেক বিষয়ের উপকারিতা প্রদর্শিত হইতেছে।

... মাগ্নিমুদীর্য্য মুদীরয়তি, ক্ষিপ্রঞ্চ জরাং গচ্ছতি, বাতঞ্চানুলোময়তি, শ্লেষ্মাণঞ্চ পরিশোষয়তি তস্মাদুষ্ণ মশ্নীয়াৎ।

ঈষদুষ্ণ অবস্থায় ভোজন করিবে। অল্প অল্প উষ্ণ অন্ন সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর হয়, এবং জঠরাগ্নিকে বর্দ্ধিত করে, শীঘ্র পরিপাক হয়, বায়ুর অনুলোমতা উৎপাদন করে, এবং কফ শুষ্ক করে, অতএব ঈষদুষ্ণ অন্ন ভোজন মনুষ্যদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে হিতকর।

স্নিগ্ধ মশ্নীয়াৎ—স্নিগ্ধং হি ভুজ্যমানং স্বদতে ভুক্তশ্চাগ্নি মুদীরয়তি, ক্ষিপ্রং জরাং গচ্ছতি বাত মনু লোময়তি দৃঢীকরোতি শরীরোপচয়ং বলাভিবৃদ্ধিং চোপজনয়তি বর্ণপ্রসাদমপি চাভিনির্ব্বর্ত্তয়তি, তস্মাৎ স্নিগ্ধ মশ্নীয়াৎ।

স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন করিবে, যেহেতু স্নিগ্ধ অন্ন স্বাদু ও তৃপ্তিজনক। স্নিগ্ধান্নভোজনে জঠরাগ্নি প্রবৃদ্ধ হয়, বায়ু অনুলোম ভাব প্রাপ্ত হয়, শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়, এবং বর্ণ উজ্জ্বল হয়, অতএব ভোজন বিষয়ে স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহ পদার্থ বিশিষ্ট দ্রব্য সুপ্রশস্ত।

মাত্রাবদশ্নীয়াৎ—মাত্রাবদ্ধি ভুক্তং বাত পিত্ত কফানপ্রপীড়য়দায়রেব বিবর্দ্ধয়তি, কেবলং সুখং সম্যক্ পক্বং বিড়্ভূতং গুদমনুপর্য্যেতি ন চোষ্মাণ মুপহন্তি অব্যথঞ্চ পরিপাক মেতি। তস্মাৎ মাত্রাবদশ্নীয়াৎ।

মনুষ্যগণ পরিমিত আহার করিবে। যে ব্যক্তি যাহা আহার করিলে কোন কষ্ট হয় না, সহজে পরিপাক হয়, তাহাই তাহার মাত্রা বুঝিতে হইবে, অতএব সকলের মাত্রা সমান নহে, সেজন্য লিখিত আছে—"মাত্রা পুনরগ্নিবলাপেক্ষিণী" মাত্রা অগ্নি, বল এবং দ্রব্যের গুরুলঘুতা অনুসারে প্রত্যেকের ও প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন

[illegible] শিত্ত করেন [illegible] আয়ুঃ বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ স্থানে গমন করিয়া তত্রস্থ উষ্মাকে নষ্ট করেনা, বিনা ক্লেশে পরিপাক হয় এবং মলভাগ মলাশয়ে গমন করে। সুতরাং মনঃ ও শরীরের সুখজনক, অতএব মাত্রা পূর্ব্বক আহার করিবে।

জীর্ণে হশ্নীযাৎ—ন জীর্ণে হি ভুঞ্জানস্য পূর্ব্বস্যাহারস্য রস মপরিণত মুত্তরেণাহাররসেনোপসৃজন সর্ব্বান দোষান প্রকোপয়ত্যাশু। জীর্ণে তু ভুঞ্জানস্য স্বস্থানস্থেষু দোষেষ্বগ্নৌ চোদীর্ণে জাতায়াং বুভুক্ষায়াং বিবৃতেষু চ স্রোতসাং মুখেষু চোদগারে বিশুদ্ধে হৃদয়ে বিশুদ্ধে বাতানুলোম্যে বিসৃষ্টেষু চ বাতমূত্রপুরীষবেগেষু জীর্ণমভ্যবহৃত মাহারজাতং সর্ব্বশরীরধাতূনপ্রদূষয়দায়ুরেবাভিবর্দ্ধয়তি কেবলং। তস্মাজ্জ্যে হশ্নীযাৎ।

পূর্ব্বকৃত আহার উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে পুনর্ব্বার আহার করিবে। কারণ ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্ জীর্ণ না হইতে আহার করিলে, পূর্ব্ব ভুক্ত বস্তুজাত অপরিপক্ক রস পরক্ষণকৃত আহারীয় রসের সহিত মিলিত ও দূষিত হয় এবং বাত পিত্তাদি সমস্ত দোষকে শীঘ্রই প্রকুপিত করে এবং বাতাদি কুপিত হইয়া বিবিধ পীড়া উৎপাদন করে। পূর্ব্বকৃত আহার জীর্ণ হইলে যে ব্যক্তি আহার করে, তাহার বাত পিত্তাদি দোষ স্বস্থানে অবস্থিত হয়, জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং উত্তম ক্ষুধা জন্মে। স্রোতঃ পথের সমুদয় মুখ বিকসিত হয়। বিশুদ্ধ উদ্‌গার উঠিতে থাকে। হৃদয় পরিষ্কৃত হয়, বায়ুর অনুলোমতা জন্মে এবং যথাকালে নিরুদ্‌বেগে মূত্র পুরীষাদি নির্গত হয়, অতএব উল্লিখিত লক্ষণ সমুদয় উপস্থিত হইলে আহার সম্যক্ জীর্ণ হইয়াছে স্থির করিবে। এইরূপ জীর্ণাবস্থায় আহার করিলে আহার [illegible] অদূষিত রাখিয়া আয়ুকে বৃদ্ধি [illegible] সুতরাং পূর্ব্বকৃত আহার জীর্ণ হ[illegible] সকলের আহার করা বিধেয়।

বীর্য্যাবিরুদ্ধমশ্নীযাৎ—অবিরুদ্ধ বীর্য্য[illegible] ন বিরুদ্ধবীর্য্যাহারজৈ র্বিকারৈ রয় মুপ[illegible] তস্মাদ বীর্য্যাবিরুদ্ধ মশ্নীযাৎ।

বীর্য্যতঃ যে যে বস্তু অবিরুদ্ধ, [illegible] ভোজন করিবে, কারণ যে ব্যক্তি [illegible] বীর্য্য দ্রব্য ভোজন করেন না, তা[illegible] বিরুদ্ধবীর্য্য পদার্থ ভোজন জনিত কু[illegible] পীড়া ভোগ করিতে হয় না। অ[illegible] বীর্য্যাবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন করাই বু[illegible] ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

ইষ্টে দেশে হশ্নীযাৎ—ইষ্টে হি দেশে [illegible] নানিষ্টদেশজৈ র্মনোবিঘাতকরৈ র্ভাবৈ র্ম[illegible] ঘাতং প্রাপ্নোতি। তথেষ্ট সর্ব্বোপকরণৈ[illegible] দিষ্টে দেশে তথেষ্টসর্ব্বোপকরণশ্চাশ্নীযাৎ।

মনোরম স্থানে ভোজন ক[illegible] মনোরম স্থানে ভোজন করিলে, ম[illegible] বিঘাত কর অর্থাৎ মনের অপ্রীতি জ[illegible] পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয় [illegible] এইরূপ অভিলষিত উপকরণের স[illegible] ভোজন না করিলেও ঐরূপ মান[illegible] পীড়াদি হইয়া থাকে, অতএব বাঞ্ছিত উপকরণের সহিত মনোমত স্থানে ভো[illegible] করিবে।

নাতি দ্রুত মশ্নীয়াৎ—অতিদ্রুতং হি ভু[illegible] উৎস্নেহন মবসদনং ভোজনস্যাপ্রতিষ্ঠানং ভোজ[illegible] দোষ সাদগুণ্যাপলব্ধিশ্চ ন নিয়তা। তস্মান্না[illegible] দ্রুত মশ্নীযাৎ।

অতিশয় শীঘ্র ভোজন করিবে [illegible] অতিশয় দ্রুত ভোজন করিলে ভুক্ত ব[illegible] ঊর্দ্ধগামী হয় ও শরীরে অবসন্নতা উপস্থি[illegible] হয়। ভুক্ত বস্তু সম্যক্‌রূপে স্বস্থা[illegible]

ষ অর্থাৎ কেশ-লোমাদি-পতন
র করিতে পারা যায় না, সুতরাং
ভাজন করা উচিত নহে।

ত বিলম্বিত মশ্নীযাৎ—অতি বিলম্বিতং
ানো ন তৃপ্তি মধিগচ্ছতি, বহু ভুংক্তে শীতী
আহারজাতং বিষমপাকঞ্চ ভবতি, তস্মা
বলম্বিত মশ্নীয়াৎ।

অতিশয় ধীরে ধীরে ভোজন কবিবে
যাহারা ধীরে ধীরে ভোজন করে,
ারা আহার কবিয়া তৃপ্তিলাভ
তে পারে না, ক্রমশঃ অধিক ভোজন
ফেলে, ভোজ্য বস্তু শীতল হইযা
সুতরাং পাচকাগ্নির বৈষম্য উপ-
য়, অতএব অতিশয় ধীরে ধীরে
জন করাও সঙ্গত নহে।

অজল্পন্নহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত—জল্পতো হসতো
নসো বা ভুঞ্জানস্য ত এব হি দোষা ভবন্তি
তিদ্রুত মশ্নতঃ। তস্মাদজল্পন্নহসন্ তন্মনা
ত।

নিবিষ্ট চিত্তে কথা না বলিয়া হাস্য
করিয়া ভোজন করিবে, নচেৎ উল্লিখিত
তদ্রুত-ভোজন-জনিত দোষ প্রাপ্ত
ত হয়, সুতরাং আহার কবিতে
য়া অন্যমনস্ক হইবে না, কথা বলিবে
কিম্বা হাস্য করিবে না।

াত্মান মভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যক্—ইদং
শেতে, ইদং নোপশেতে ইতি বিদিতং
মাত্মনঃ আত্মসাত্ম্যং ভবতি, তস্মাদাত্মানমভি
মীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যগিতি।

আপনার হিতাহিত বিবেচনা করিয়া
ভাজন করিবে অর্থাৎ ইহা আমার পক্ষে
উপকারক, ইহা আমার অপকারক,
ত্যাদি বিবেচনা করিয়া ভোজন করিলে

সাত্ম্য বিচা...
উচিত।

উল্লিখিত নিয়ম সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে চিরকাল সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়। আহারের প্রতি যত্ন থাকিলে যে, শরীর সুস্থ থাকে, এ বিষয় বিশেষ কবিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। আহার না করিলে জীব কথনই জীবিত থাকিতে পাবে না, কিন্তু আবাব অনিযমিত আহারেই জীবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ("প্রাণাঃ প্রাণভৃতা মন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্") আহাব বিষযক নিয়মাদি পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কিন্তু কালগতিকে আমাদেব সকল বিষয়েবই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং তজ্জন্যই আমাদের এই দুর্দ্দশা। প্রকৃত কাবণ অনুসন্ধানে যত্ন নাই, পরেব মুখে যাহা শুনি তাহাই ধ্রুব বিশ্বাস। স্থানের দোষ জল বায়ুর দোষ প্রভৃতি কতকগুলি বাহ্য বিষয় লইয়া আমরা বৃথা আড়ম্বর করি। বাস্তবিক যাহা আমাদের ইচ্ছাধীন, সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, এবং যাহাতে চিরকাল রোগ ভোগ করিতে হয় না, সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই। সাধারণতঃ কিছু কিছু বুঝিলে বিশেষ মনোযোগ করিতে ইচ্ছা হয় না। পক্ষান্তরে আমাদের অনভিজ্ঞতাই ইহার কারণ। একটী বিষয়ের দোষগুণ বিশেষরূপে জানা না থাকিলে ঐ বিষয়ে লোকের যত্ন হয় না। জানা থাকিলে হয়ত অনেক সময় অনেকে সুনিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হইতেও পারেন, সুতরাং ক্রমশঃ আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় গুলি প্রকাশ করিতে

...বেন।

ত্রিবিধং কুক্ষৌ স্থাপয়েদবকাশাংশমাহারস্যা-হারমুপযুঞ্জানঃ।

আহার করিবার সময় বিবেচনা পূর্ব্বক কুক্ষিকে তিনভাগ করিবে, অর্থাৎ উদরের অবকাশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবে।

তদ্‌যথৈকং অবকাশাংশং মূর্ত্তানা মাহার-বিকারাণা মেকং দ্রবাণা মেকং পুনর্বাত পিত্ত-শ্লেষ্মণাম্।

ঐ তিন অংশের এক অংশ মূর্ত্ত অর্থাৎ কঠিন (চর্ব্ব্য) খাদ্য বস্তু দ্বারা পূরণ করিবে এবং এক অংশ দ্রব অর্থাৎ দুগ্ধ জলাদি লেহ্য পেয় তরল পদার্থ দ্বারা পূরণ করিবে এবং অপর এক অংশ বাত পিত্ত শ্লেষ্মার সঞ্চারের জন্য শূন্য রাখিবে, এতাবতা স্থির করিতে হইবে যে, যে ব্যক্তি যত আহার করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম করিয়া আহার করিবে। বাস্তবিক দেখা যায় অধিক মাত্রায় আহার করিলে আহারের পরক্ষণে একরূপ যন্ত্রণাবিশেষ হইয়া দাড়ায় কিন্তু কিছু কম করিয়া আহার করিলে আর ঐ যন্ত্রণাটী ভোগ করিতে হয় না। আহার বিষয়ক নিয়-মটী আমাদের প্রায়শঃই স্থির থাকে না। যে দিন বেশী কিম্বা ভাল উপকরণ থাকে, সে দিন সম্ভবতঃ অধিক মাত্রাতেই আহার করা হয়, আর নিমন্ত্রণাদি থাকিলে ত কথাই নাই। জীবন থাক বা যাক সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই, সন্দেস রস গোল্লা একটীও পড়িয়া না থাকে।

এই দোষে আমরা অনেক সময় বিষম কষ্টে পতিত হইয়া থাকি। দুই এক স্থলে হিতাহিত-জ্ঞান-বর্জ্জিত ... ক-ষকে শাস্ত্রে একরূপ পশুর ন্যায় বলা হইয়াছে, কিন্তু আমরা উহাদিগকে স্বীয় ইষ্টানিষ্ট-জ্ঞানবিষয়ে পশু অপেক্ষাও নিন্দা করি, কারণ পশুরাও স্বীয় শক্তি অনুসারে ভোজন করে। যাহা হউক আমাদের জিজ্ঞাস্য—মুহূর্ত্ত কাল-স্থায়ি-সুখের জন্য বহু ক্লেশ ভোগ বা চিরসুখে জলাঞ্জলি দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য?

অনাপ্তবস্তুঃ পশুবদ ভুঞ্জতে যেঽপ্রমাণতঃ। রোগানীকস্য তে মূল মজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি॥

হিতাহিতান। মাত্রার যে পুরুষ পশুর ন্যায় অপরিমিত ভোজন করে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি রোগ সমূহের কারণভূত অজীর্ণ রোগ প্রাপ্ত হয়। অজীর্ণ যে সমস্ত রোগেরই কারণ, ইহা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে কিন্তু কি উপায়ে অজীর্ণ জন্মে না, চিরকাল সুখে যাপন করা যায়, সেই সমুদায় প্রদর্শন জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা। আশা করি আহারবিষয়ে সতর্ক হইয়া পাঠক শারী-রিক ও মানসিক সুখে সুদীর্ঘকাল অতি-বাহিত করিবেন।

তদ্ ভূয়ো বিস্তরেণানুব্যাখ্যাস্যামঃ—কুক্ষে-রপ্রপীড়ন মাহারেণ হৃদয়স্যানবরোধঃ পার্শ্বয়ো-রবিপাটন মনতিগৌরব মুদরস্য প্রীণনমিন্দ্রি-য়াণাং ক্ষুৎপিপাসোপরমঃ স্থানাসন শয়ন গমনো-চ্ছ্বাস প্রশ্বাস হাস্য সংকথাসু চ সুখানুবৃত্তিঃ সায়ং প্রাতশ্চ সুখেন পরিণমনং বলবর্ণোপচয়কর ত্বঞ্চেতি মাত্রাবতো লক্ষণ মাহারস্য ভবতি।

পরিমিত ভোজনের লক্ষণ বিস্তারিত-রূপে বলা যাইতেছে—ভুক্ত বস্তু দ্বারা কুক্ষির কোন রূপ পীড়া অর্থাৎ যন্ত্রণা হয় না, হৃদয় পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয়,

[illegible] ধ হয়, ইন্দ্রিয় সমুদায় সবল হয়, ক্ষুধা ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়, শয়ন, উপবেশন, গমন, শ্বাস প্রশ্বাস-নির্গমন এবং হাস্যাদি করিতে কোন ক্লেশ হয় না, সায়ং ও প্রাতঃকালে ভুক্ত-বস্তু জীর্ণ হইয়া ক্ষুধা জন্মে এবং শরীরের বল, বর্ণ ও পুষ্টির বৃদ্ধি হয়। উল্লিখিত এই সমস্ত লক্ষণ যথামাত্রায় আহারের পরিচায়ক। অতঃপর অমাত্রার বিষয় বলা যাইতেছে—

অমাত্রাবত্বং পুনর্দ্বিবিধ মাচক্ষতে—হীনমধিকঞ্চ। তত্র হীন মাত্র [illegible]রাশিং [illegible]বলো পচয়ক্ষযকর মতৃপ্তিকর মুদাবর্ত্তকর [illegible] মনায়ুষ্য ম[illegible] [illegible]বুদ্ধীন্দ্রিয়োপঘা[illegible] কর[illegible] সার বিধমন মলক্ষ্মাবহ মশীতেশ্চ বাত বিকারাণা মায়তন মাচক্ষতে।

অমাত্রায় আহার দুই প্রকার. হীন-মাত্রা ও অধিক মাত্রা। তন্মধ্যে হীন মাত্রায় আহার করিলে বল, বর্ণ এবং শারীরিক বৃদ্ধির ক্ষয় হইতে থাকে, আহারে তৃপ্তি জন্মে না, উদাবর্ত্তরোগ জন্মে। হীনমাত্রায় আহার অবৃষ্য, আয়ু হ্রাসকর, শরীরের ওজোধাতুর ক্ষয়-কারক, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সামর্থ্যনাশক, বিমানস্থানোক্তত্বক্ সারাদি সারবিধমনক, শ্রীভ্রংশকর এবং অশীতি প্রকার বায়ু বিকারের কারণ হয়। অর্থাৎ হীন মাত্রায় আহার করিলে বায়ুজনিত বিবিধ রোগ জন্মিতে পারে।

অতিমাত্রং পুনঃ সর্ব্বদোষ প্রকোপন মিচ্ছন্তি সর্ব্বকুশলাঃ।

অতি মাত্রায় আহার করিলে বাত পিত্তাদি সমস্ত দোষ কুপিত হয় এবং তজ্জন্য সমস্ত পীড়াই জন্মিতে পারে।

গত্বা পশ্চাৎ [illegible] মাশযগতা বাত পিত্ত শ্লেষ্মাণোহভ্যবহারে [illegible] মাত্রেণাতিপ্রপীড্যমানাঃ সর্ব্বে যুগপৎ প্রকোপ মাপদ্যন্তে।

কঠিন বস্তু দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া বারংবার আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া জল পান করিলে আমাশয়স্থিত বাত পিত্ত কফ প্রপীড়িত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রকুপিত হয়।

তে প্রকুপিতা স্তমেবাহাররাশি মপরিণত মাবিশ্য কুক্ষেকদেশ মন্নাশ্রিতা বিষ্টম্ভযন্তঃ পৃথক্ পৃথগ্ বিকারানভি নির্বর্ত্তয়ন্তি অতিভোক্তুঃ।

উল্লিখিত প্রকারে কুপিত বাত পিত্তাদি ঐ অতি মাত্রায়-ভুক্ত অপরি-পক্ক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া উহাকে কুক্ষিতে আবদ্ধ করিয়া রাখে, ঊর্দ্ধ বা অধঃপথে নিঃসৃত হইতে দেয় না, এই-রূপে নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করে।

তত্র বাতঃ শূলানাহাঙ্গমর্দ্দ মুখশোষ মূর্চ্ছা ভ্রমাগ্নিবৈষম্য শিরাসংকোচন স্তম্ভনানি করোতি।

বায়ু কুপিত হইয়া উদরে শূলবেদনা, আনাহ (মলমূত্রের আবদ্ধতা), অঙ্গমর্দ্দ (হাত পা কামড়ান), মুখশোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পাচকাগ্নির বৈষম্য, শিরা সঙ্কোচন, এবং স্তম্ভন (জড়তা) প্রভৃতি রোগের উৎপাদন করে।

পিত্তং পুনর্জ্বর মতীসার মন্তর্দাহং তৃষ্ণা মদ-ভ্রম প্রলপনানি।

পিত্ত কুপিত হইয়া জ্বর, অতীসার, অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, ভ্রম ও প্রলাপ প্রভৃতির উৎপাদন করে।

শ্লেষ্মা তু ছর্দ্দ্যরোচকাবিপাক শীতজ্বরালস্য গাত্র গৌরবাভিনির্বৃত্তিকরঃ সম্পদ্যতে।

শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া ছর্দ্দি, অরোচক, অগ্নিমান্দ্য, শীত জ্বর, আলস্য এবং গাত্র গৌরব প্রভৃতি উৎপাদন করে।

মাম প্রদোষকর মিচ্ছন্তি: অপি তু খলু গুরু রূক্ষ, শীত শুষ্ক দ্বিষ্ট বিষ্টম্ভি বিদাহ্যশুচি বিরুদ্ধানা মকালে অন্নপানানা মুপসেব্যমানং। কাম ক্রোধ মোহের্ষ্যাহ্রী শোক লোভোদ্বেগ ভয়োপতপ্তেন মনসা বা যদন্নপান মুপযুজ্যতে, তদপ্যামমেব প্রদূষয়তি।

উল্লিখিত হীন ও অতি মাত্রায় আহার করিলেই যে আম অর্থাৎ অপক্ক রসের উৎপত্তি হয় এরূপ নহে। গুরু, রূক্ষ, শীতল, শুষ্ক, বিদ্বেষজনক, বিষ্টম্ভি, বিদাহি, অশুচি, সংযোগ-বিরুদ্ধ ও অসময়ে ভুক্ত যে অন্নপান এবং কাম, ক্রোধ মোহ, ঈর্ষ্যা, লজ্জা, শোক, লোভ, উদ্বেগ এবং অন্নপান, ইহারাও অগ্নিদোষের উৎপাদন করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সমুদায় দোষাবহ আহার পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবেন।

মাত্রযাপ্যভ্যবহৃতং পথ্যং চান্নং ন জীর্য্যতি।
চিন্তা শোক ভয় ক্রোধ দুঃখ শয্যা প্রজাগরৈঃ॥

চিন্তা, শোক, ভয়, ক্রোধ ও দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত-চিত্ত ব্যক্তির উপযুক্ত মাত্রায় ভক্ষিত হিতজনক অন্ন ও সম্যক্‌রূপে জীর্ণ হয় না। অতএব সুবোধ ব্যক্তি ঐ সমুদায় মানসিক উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে আহার করিবেন।

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।



মুক্তাবর্ষী।

মুক্তবর্চ্চাঃ ও রুদ্রা এই দুইটী ইহার সংস্কৃত নাম। স্থানভেদে ইহার বিবিধ প্রচলিত নাম শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মুক্তাবর্ষী নামটাই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইতে শুনা যায়। কেহ কেহ মুক্তাঝুরী ও বলেন। এতদ্ভিন্ন বিড়াল-পাগলা বিড়ালকান্দান ও নারিকেলী শাক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামও শুনিতে

পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলেই ইহা জন্মে। সম্ভবতঃ পতিত উচ্চ-ভূমিতেই অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

গুণ—বমনকারক, বিরেচক ও বাত-শ্লেষ্মনাশক। কাস, শ্বাস, জ্বর ও বিষ রোগে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার স্বরস পান করিলে বমনের সহিত অনেক শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া যায়। শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে পুরাতন ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে সুন্দর মৃদু বিরেচন হয়। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে যখন আভ্যন্তরিক বিরেচন প্রদান করা যায় না, তখন ইহার দ্বারা বিরেচন করান হইয়া থাকে। পুরাতন ঘৃতের সহিত ইহার পাতা বাঁটিয়া ১টী বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। বর্ত্তিটী কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল ও ১ বা ১॥ অঙ্গুলী দীর্ঘ এবং স্থূলাগ্র হওয়া আবশ্যক। অতঃপর গুহ্যদ্বারে পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন করিয়া ঐস্থানের ত্বক্ কোমল করিবে ও ঐ বর্ত্তিটী কিঞ্চিৎ প্রবেশ করাইয়া কিছুক্ষণ রাখিলেই তরলভেদ হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়। বর্ত্তি প্রস্তুত কঠিন বোধ হইলে কয়েকটী পাতা লবণের সহিত অল্প রগড়াইয়া ঘৃত সংযোগে উক্তরূপে গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইলেও কার্য্য হইয়া থাকে। মলত্যাগের বেগ উপস্থিত হইলেও কিছুকাল অপেক্ষা করা প্রয়োজন, [illegible] অল্প অল্প জ্বর হয়, অল্প আহার করে, এরূপ বিষমজ্বরে ইহার শাক রন্ধন করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে বিলক্ষণ কোষ্ঠ পরিষ্কার ও পীড়ার উপশম হয়। ফলতঃ ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করা আবশ্যক, যেন অধিক মাত্রায় বিরেচন না হয়। মাত্রা সকলের পক্ষে সমান না হইলেও ইহার ১ হইতে ১॥ তোলা পর্য্যন্ত পত্রশাক সেবনেই যথেষ্ট হইতে পারে।

ইহার আর একটী আশ্চর্য্য শক্তি দেখা যায়। মূল সমেত একটী গাছ তুলিয়া বিড়ালের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিলে, আগ্রহের সহিত উহা চিবাইতে থাকে এবং ৫।৭।১০ মিনিট এইরূপ চিবাইয়া বিড়ালটী উন্মত্তের ন্যায় গড়াগড়ি করিতে থাকে ও ডাকিতে থাকে। ২।১ ঘণ্টা পরে পুনরায় প্রকৃতিস্থ হয়। আমাদের বোধ হয়, মুক্তাবর্ষীতে মাদকতা শক্তি আছে, সে জন্যই ঐরূপ ঘটনা হয়। সর্পদষ্ট রোগীকে ইহার পত্রের রস ।০ হইতে ॥০ তোলা পর্য্যন্ত সেবন করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহার মূল ১ বা ২ আনা ৩টী গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। বিষ ভক্ষণ করিলেও উল্লিখিত ক্রিয়া দ্বারা উপকারের বিশেষ সম্ভাবনা।

চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

২য় খণ্ড। | ১৩০১ সাল আশ্বিন। | ১ম সংখ্যা।

আগমনী।

বেদান্তবাদী যথার্থ বলিয়াছেন, এ সংসার মায়াময়। মায়াময় হিন্দুর সংসার ও পরিবারমণ্ডলী। যে পরিবার প্রতি সংসার পাতিয়াছেন, চারিদিকেই তাহার মায়া—পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, পুত্র কলত্র, সকলই মায়াময়। বৃদ্ধ পিতাকে হিন্দু চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারেন না, মাতার মধুর বাক্য শুনিলে তাঁহার হৃদয়-জুড়াইয়া যায়। হিন্দুর জায়া তাঁহার প্রাণসমা প্রিয়তমা। সবাই তাঁহার হৃদয় বন্ধনে গ্রথিত—পিতামাতা ভক্তি ও প্রেমে গ্রথিত, জায়া প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ। যাঁহারা স্নেহসূত্রে গ্রথিত সেই পুত্রগণ মায়ার পুত্তলী। হিন্দুর পুত্র স্নেহরসে মাখা, কিন্তু পুত্র অপেক্ষা কন্যা বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা মায়াবিনী। পুত্র পালনীয়, শাসনীয়; কন্যা কেবল পালনীয়া শিক্ষণীয় উভয়েই। পুত্র অপেক্ষা কন্যার হৃদয় আরও কোমল। সেই কোমল হৃদয়ে কন্যা শিশুকালে জনক জননীকে একেবারে মোহিত করিয়া রাখে। কন্যার আচরণ, ব্যবহার তাহাদের একান্ত মনোহরণ করে। তাহারা জানে, কন্যা দুদিন বাদে পরগৃহে যাইবে, তাই সে তত মায়াবিনী হয়।

হিন্দুর সংসার যেমন মায়াময় তেমনি ধর্ম্মময়। সেকালে আর্য্যেরা গৃহী হইতেন, কেবল ধর্ম্মসাধনার জন্য। তাঁহাদের গৃহ অতিথির আশ্রয়, গুরুজনের সেবা-স্থান, দেবতার অর্চ্চনালয় এবং ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্র। সেকালে ব্রহ্মচারী সংসারা-শ্রমে প্রবেশ করিতেন কেবল ধর্ম্মভাবের পরিণতি সাধন করিবার নিমিত্ত। গৃহ-ধামে ধর্ম্মভাবের সম্যক্ পরিপাক না হইলে সংসারী তৃতীয় আশ্রমে যাইবার উপ-যোগী হইতেন না। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র স্বর্গের দ্বারস্বরূপ ছিল। হিন্দুমতে সংসার-ধর্ম্মে পরিণত না হইলে স্বর্গধাম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। তাই সেকালে হিন্দুর গৃহ দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি ছিল।

গৃহী কি করিতেন? তিনি পরিবার মধ্যে মায়ায় পরিবৃত হইয়া কি চিরকাল থাকিতেন? তিনি জানিতেন গৃহপুর

তাঁহার গন্তব্য স্থলে যাইবার পথ মাত্র। তাঁহার যাইবার স্থান মায়াময় গৃহের অনেক দূরে। সেই স্থানে যাইবার জন্য তিনি গৃহধামে প্রস্তুত হইতেন। যে মায়ায় পুত্র পরিবারগণ আবদ্ধ, সেই মায়াকে তিনি সংসার হইতে অপনীত করিয়া ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে নিয়োজিত করিতেন। তিনি পিতৃভক্তিতে সর্ব্বপালন-কর্ত্তাকে সর্ব্বোপরি পিতৃরূপে দেখিতেন। জননীর উপর বিশ্বজননীকে পূজা করিতেন। তদপেক্ষা আরও নিকট ভাবের অধিকারী হইলে, যশোদা যেরূপ ব্রজদুলালকে একবারও চক্ষুহারা করিতে পারিতেন না তদ্রূপ নিকট-ভাবে ইষ্টদেবকে তিনি পুত্রবৎ দেখিতেন। পুত্রবাৎসল্য তখন ঈশ্বরে গিয়া স্থাপিত হইত। যে স্নেহে লোকে পুত্রকে ভালবাসে, সেই স্নেহে আর্য্যঋষি ঈশ্বরকে ভালবাসিতেন। তাঁহার ভালবাসা তদপেক্ষাও ঘনতর হইত। যে বাৎসল্য কন্যাতে স্থাপিত, সেই বাৎসল্য রসে নিমগ্ন হইয়া ঋষি ঈশ্বরকে আরও ঘনিষ্ট ভাবে দেখিতেন। তখন তাঁহার যশোদার ভাব গিয়া মেনকার বাৎসল্যোদয় হইয়াছে। যে বাৎসল্যোদয়ে পাষাণীও গলিয়া যায়, সেই বাৎসল্যে ঋষি ইষ্টদেবকে হৃদয়-পুরী মধ্যে স্থাপিত করিতেন। তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতেন, ক্ষীর ননী খাওয়াইতেন, আদরে হৃদয়ে বসাইতেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না। মাতা যেমন পুত্রকেও লুকাইয়া কন্যার স্নেহ-পাশে বদ্ধ হইয়া তাহার তৃপ্ত্যর্থ নিজ গোপনীয় সমস্ত ধন বিতরণ করেন, আর্য্যঋষি তেমনই ভাবে ঈশ্বরকে হৃদয় খুলিয়া সমস্ত ভালবাসা অর্পণ করিতেন। এই ভালবাসাভাব আগমনীতে প্রকটিত।

কন্যার প্রতি মাতার যতদূর হৃদয়ের টান, ততদূর টানে পূর্ব্বতন ঈশ্বরপরায়ণ আর্য্যগণ ব্রহ্মানুরাগী ছিলেন। সাত্ত্বিক বাৎসল্যরসে নিমগ্ন হইয়া দেবতাকে পুত্রবৎ স্নেহ, পুত্রবৎ কেন, মাতা যেমন কন্যাকে স্নেহ করেন ততই স্নেহে দেবতাকে হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত করিতেন। কিন্তু শুদ্ধ এই কথা বলিলেই তাঁহাদের সাত্ত্বিক বাৎসল্যভাবের সম্যক্ পরিচয় হয় না। যদি বল, পুত্র অপেক্ষা কন্যার প্রতি মাতার অধিক টান কেন হয়? তাহার একটি কারণ এই, কন্যা সর্ব্বদা পরগৃহেই থাকেন। চক্ষের অন্তরালে থাকাতে কন্যার জন্য মাতা অধিকতর ব্যাকুলা। তিনি কন্যার নিমিত্ত যেন সতত অন্যমনস্কা। তিনি কন্যার জন্য যখন তখন ভাবিতেছেন। সেই কাতরতায় তিনি মধ্যে মধ্যে কন্যাকে নিজ পার্শ্বে আনিয়া বিশেষরূপে যত্ন করেন। যাহাকে এতদিন যত্ন করিতে পারেন নাই, তাহাকে পাইয়া মনের সাধে যত্ন করেন। সেই যত্নে কন্যা মাতার বিশেষ আদরিণী। কন্যারও হৃদয়-ব্যথা উথলিয়া উঠে। তিনি শ্বশুর গৃহের সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট মাতাকে জানান। দুজনে এক সঙ্গে বসিয়া অশ্রুজলে চক্ষু ভাসাইয়া দেন। তাহাতে তাহাদের হৃদয়-ব্যথা আরও বর্দ্ধিত হয়। কন্যা, মাতার আরও নিকটবর্ত্তিনী হন। আবার যখন মাতৃ-ক্রোড় হইতে ছিন্না হইয়া সেই কন্যাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাওয়া হয়, তখন মাতার সমুদয় হৃদয়-ব্যথা উথলিয়া উঠে। সেই হৃদয়-ব্যথায় মাতা কাঁদেন,

তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া কন্যারও ক্রন্দন আইসে। এইরূপে কন্যার প্রতি মাতার টান চিরদিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। উমার প্রতি মেনকার টান তদ্রূপ চির-দিনের টান। তাহা চিরদিন বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাঁহারা একান্ত ঈশ্বর-পরা-য়ণ, তাঁহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠা তদ্রূপ চিরদিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একবার তাহা-দের হৃদয় হইতে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলে তাঁহারা কাতর হন। আবার ব্রহ্মকে লাভ করিয়া দ্বিগুণতর যত্নে তাঁহাকে হৃদয়-কন্দরে স্থাপন করেন।

কিন্তু কন্যার প্রতি মাতার টান সর্ব্বস্থলে সমান প্রকাশিত হয় না। কন্যার অবস্থানুসারে তাহা প্রকটিত হয়। কন্যার অবস্থা ভাল হইলে মাতার টান কিছু কমে না, তাহা কেবল সকল সময়ে বাহ্য কাতরতায় তত প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যে স্থলে কন্যার অবস্থা তত সুখের নহে, সে স্থলে মাতার কাত-রতা দেখে কে? তাহার কাতরতা যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া বাহিরে দেখা দেয়। কন্যা রাজরাণী হইলে মাতার যে একে-বারে কাতরতা নাই এমত নহে, তবে তাঁহার হৃদয়-ব্যথার অনেক দূর শান্তি হয়। কন্যা রাজরাণী হইলে যে পরি-মাণে সেই ব্যথার শান্তি হয়, কন্যা ভিখা-রিণী হইলে তাঁহার ততোধিক অশান্তি ঘটে। কাতরতার আর ইয়ত্তা থাকে না। মাতা অহঃরহ অশ্রুজলে ভাসিতে থাকেন। উমার জন্য মেনকার কাতরতা ততদূর অশান্ত ছিল। সেই কাতরতায় পাষাণও গলিয়া গিয়াছিল। গিরিরাজ গলিয়া গিয়া উমাকে আনিলেন। ব্রহ্মের জন্য মানবহৃদয়ের কাতরতা এইরূপ হওয়া চাই। যে ঈশ্বরপরায়ণতা ততদূর কাতর নহে, সে ঈশ্বরপরায়ণতার সম্যক পরিণতি হয় নাই। ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকটস্থ হইলে পাষণ্ডেরও ভক্তি সঞ্চার হওয়া চাই। তাহাতে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাওয়া চাই। এই রাগই প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগ। এই রাগের ছবি আগমনীতে দেওয়া আছে।

সেই বসন্তকালে বঙ্গবাসী দেবপরায়ণ একবার দুর্গাপূজার উৎসবে মাতিয়া-ছিলেন। সে উৎসব মনে অনেকদিন জাগরিত ছিল। কিন্তু সে উৎসবের তরঙ্গ মনে মনে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল। তখন সাত্ত্বিক বঙ্গবাসীর হৃদয় দেববিরহে কাতর। তিনি ঈশ্বরের সমস্ত শক্তিরূপ একবার প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে যে ভগবৎ শক্তি জাজ্বল্যমান, তাহা ভগ-বতীতে আঁকিয়া ছিলেন; ঈশ্বরভক্তের অন্তরে যে ঐশ্বর্য্য, তাহা লক্ষ্মীতে দিয়া ছিলেন; ভক্তের যে উজ্জ্বল দিব্যজ্ঞান ও পবিত্রতা, তাহা সরস্বতীতে প্রতি-ফলিত করিয়াছিলেন; ভক্ত-হৃদয়ের যে অদম্য বীরত্ব, যে বীরত্বে সমস্ত পাপা-সক্তিরূপ পাপাসুর বিজিত হয়, যে সংযম-বীরত্বে রিপুকুল বশীভূত হয়, ভক্ত হৃদয়ের সেই বীরত্ব, যাহা ভগবৎ শক্তিরই অঙ্গ, তাহা কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান দেখিয়াছিলেন; আর ততদূর বীরত্ব নহিলে কি যোগসিদ্ধি লাভ হয়? ভগবৎ-শক্তি-প্রসূত সেই সিদ্ধি গণেশের প্রতিমায় অগ্নিবৎ উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া তিনি যে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখেন, যাঁহাকে কার্য্যে, অনু-ষ্ঠানে, ধ্যানে, ধারণায় হৃদয়ে মূর্ত্তিমান

করিয়াছেন, সেই দেবার্চ্চনার উৎসবে তিনি একদা যেরূপ মত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহরাগে কত যত্নের সহিত পূজা করিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি কখন ভুলিতে পারেন? আবার বঙ্গীয় ভক্ত হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। ভক্ত সেই দেবমূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। মাতা যেরূপ পরগৃহবাসিনী কন্যার স্বপ্ন দেখেন, বঙ্গীয় ভক্ত সেইরূপ দেবস্বপ্নে কাতর হইলেন। কেন তিনি এতদিন দেবতাকে দূরে রাখিয়াছিলেন? আর কি তিনি সে ঈশ্বরকে ধ্যানে আনিতে পারিবেন?

তিনি যে অনেক কষ্টে ভগবৎ শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছিলেন। সে সংযম তাঁহার মনে আছে যে সংযমে রিপু ও ইন্দ্রিয়দমন হইয়াছিল। সেই অগ্নিতেজ তাঁহার স্মরণ হইল, যে অগ্নি-তেজে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার স্মরণ হইল যে তত্ত্বজ্ঞানে তিনি পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন; সেই হৃদয়-পূর্ণতা তাঁহার স্মরণ হইল, যে পূর্ণতায় তিনি সমস্ত ভগবৎ বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন; এই সমস্ত স্মরণ করিয়া তিনি সমগ্র ভগবৎ শক্তি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। এই কৈবল্যদায়িনী ভগবৎ শক্তিকে তিনি স্বপ্নে প্রতীয়মান দেখিতে লাগিলেন। অনেক দিনের বিরহে ভক্তি এইরূপে প্রকটিত হইল। বিরহে ভক্তি এইরূপ স্বপ্নময়ী হইয়া উঠে। কৃষ্ণবিরহে রাধিকা শতবৎসর ধরিয়া শ্যামস্বপ্নে জীবিতা ছিলেন। মেনকাও স্বপ্নময়ী ভক্তি। বিরহেই ভক্তির প্রকৃত রূপ প্রকটিত হয়। তাই পরমভক্ত নারদ বলিয়াছেন;—

"তদর্পিতাখিলাচারতাতদ্বিস্মরণে
পরমব্যাকুলতেতি।"

নিজকৃত সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ এবং তাঁহাকে বিস্মৃত হইলে যে চিত্তের একান্ত ব্যাকুলতা জন্মে তাহারই নাম ভক্তি।

বিরহেই অনুরাগের প্রকোপ। অনুরাগের প্রকোপ মিলনের জন্য। বিরহেই ভক্তির পরিপুষ্টি সাধন হয়।

ভক্তের কাছে যেমন দেবতার আদর, তেমনি দেবতার কাছে ভক্তির আদর। ভক্তি যেমন দেবতার প্রিয়, ততদূর প্রিয় আর কিছুই নাই। দেবী যে ভক্তের নিকট বসন্তোৎসবে উদয় হইয়াছিলেন, তাহার ভক্তি ছয় মাস পরে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্দ্ধিতা ভক্তির নিকট চির যৌবনা উমা তাই কন্যাভাব ধরিলেন। সন্তান বৃদ্ধ হইলে মাতা যেমন কন্যাস্থানীয় হয়েন, বৃদ্ধা ভক্তির নিকট, উমা সেইরূপ কন্যাভাবে আসিলেন। সন্তানের পালনীয়া মাতা, সন্তানকে যে ভাবে দেখেন, আজি উমা বৃদ্ধ ভক্তকে সেই ভাবে দেখিতেছেন। ভক্তও সেই জন্য বাৎসল্যরসে দেবীকে গৃহে আনিতেছেন। একদিন মাতৃভক্তিতে উদ্বোধিত হইয়া যাঁহাকে পূজা করিয়াছেন, আজি কন্যা বাৎসল্যে তাঁহাকে আদরে হৃদয়মন্দিরে আহ্বান করিতেছেন। এ আহ্বান অতি মধুর, সঙ্গীতের ন্যায় মধুর। সেই মধুর সঙ্গীত রবে আগমনী ধ্বনিত হয়। আগমনী হৃদয়ের আহ্বান-গীত—দেবীকে ভক্তহৃদয় আহ্বান করিতেছে। দেবীও ভক্তের হৃদয়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই পরস্পর আকর্ষণের মিলন-ছবি দুর্গোৎসব। আগমনী সেই আকর্ষণ শক্তি।

বোধনে ভক্তির উদয়, প্রতিষ্ঠা ও ঘট-স্থাপনা; আর মিলনের ফল দশভুজা প্রতিমা। ভক্তি-জগতে এমন এক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল। যা'হা একদিন ঘটিয়াছিল, জগতে তাহা অমূল্য নিধি। সে অমূল্য নিধি কি জগৎ ভুলিতে পারে? তাই তাহা প্রতিবৎসরে ভক্তির উচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করে—পূজা করে। বাস্তবিক এ আদর্শ প্রতিবৎসর নয়ন-ছবি-রূপে জাগরূক রাখা আবশ্যক। এ আদর্শ ভক্তির দেবত্ব। দেবত্বের পূজায় সত্ত্বগুণেরই গৌরব বৃদ্ধি হয়।

এই উদ্দেশেই কালিকাপুরাণ পৌরাণিক ভাষায় বলিতেছেন;—

"পূর্ব্বকালে সায়ম্ভুব মনুর অন্তরে দেবী ভগবতী, দেবগণের হিতের নিমিত্ত দশ-ভুজা রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এই রূপ ইতিবৃত্ত আছে। উহা মনুষ্যদিগের ত্রেতাযুগের আদিতে জগতের হিতের নিমিত্ত সংঘটিত হয়। পূর্ব্বকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল, প্রতিকল্পেই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রতি কল্পেই দৈত্য দিগের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্ত হন এবং রাবণ, রাক্ষস ও রামও প্রতি কল্পে উৎপন্ন হন। প্রতিকল্পে ঐ উভয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হয় এবং পূর্ব্বের মত দেবতাদিগের সহিতও রামের সঙ্গ হয়। এই রূপ হাজার হাজার রাম এবং হাজার হাজার রাবণ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে; ভূত ও ভবিষ্যতে দেবীরও এইরূপ প্রবৃত্তি হইবে। সকল দেবগণ কল্পে কল্পে দেবীর পূজা ও স্বসৈন্যের নীরাজন করেন; অতএব মনুষ্যদিগেরও যথাবিধি দেবীর পূজা করা উচিত।"

দেবী কে? এই দেবী-তত্ত্ব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে;--

"একদা শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দকে বলিতেছেন, দুর্গা আদিভূতা নারায়ণী শক্তি। আমার ঐ শক্তি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারিণী। আমার ঐ শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মাদি দেবতা সকল বিশ্বসংসার জয় করেন। ঐ শক্তি হইতেই এই সংসারের উৎপত্তি। আমি জগতের সংহারের নিমিত্ত দেব দেব মহাদেবকে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছি। আমার ঐ শক্তি দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ও লজ্জাস্বরূপিণী। উনিই গোলকে রাধিকা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, কৈলাসে সতী এবং হিমালয়ে পার্ব্বতী। উনিই সরস্বতী ও সাবিত্রী। বহ্নিতে দাহিকা শক্তি, ভাস্করে প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শৈত্য শক্তি, শস্যে প্রসূতিশক্তি, ধরণীতে ধারণাশক্তি, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ্য শক্তি, দেবগণে দেবশক্তি, তপস্বীতে তপস্যাশক্তি, সকলই উনি। আমার ঐ শক্তি গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তের মুক্তি রূপা এবং সাংসারিকের মায়া। আমার ভক্তগণের মধ্যে উনিই ভক্তিদেবীরূপে বিরাজিতা। রাজার রাজলক্ষ্মী, বণিকের লভ্যরূপা, সংসার-সাগরোত্তরণে দুস্তর তারিণী বেদরূপা, শাস্ত্রে ব্যাখ্যা-রূপিণী, সাধুগণের সদ্বুদ্ধিরূপা, মেধাবীতে মেধা স্বরূপা, দাতৃগণে দানরূপা, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে বিপ্রভক্তিরূপা, সাধ্বী স্ত্রীতে পতি-ভক্তিরূপা, সকলই ঐ শক্তি। এক কথায় আমার দুর্গাশক্তি সর্ব্বশক্তি স্বরূপা।"

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা সর্ব্বশক্তির শক্তিরূপিণী তাহাই ভগবতী। এই শক্তির

প্রভাব উপলব্ধি করিয়া যখন ভক্ত মস্তক অবনত করেন তখনই তাঁহার পূজা করেন। যখন সেই দেবশক্তিতে জীব অনুপ্রাণিত হন তখনই তাঁহার উদ্বোধন হয়।

এক্ষণে রামতত্ত্ব কিরূপ বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকটিত হইতেছে। "রামশব্দে অদ্বৈত পরমাত্মাকেই বুঝায়, যোগিগণ অন্তে যাহাতে রমণ করেন, তিনিই রাম।

"রমন্তে যোগিনোঽন্তে।"

অন্যত্র ;—

প্রণবের অকার জাগ্রদভিমানী লক্ষ্মণ, উকার স্বপ্নাভিমানী শত্রুঘ্ন, মকার সুষুপ্ত্যভিমানী ভরত, রাম ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ অর্দ্ধমাত্রাত্মক আর শ্রীরামের সান্নিধ্য বশতঃ জগতের আনন্দদায়িনী এবং সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণীভূত সীতাকে মূল প্রকৃতিরূপা জানিবে। তিনিই বিন্দু। যখন সীতা প্রণবের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন ব্রহ্মবাদিরা তাঁহাকে প্রকৃতি বলেন।

"অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রি র্বিশ্বভাবনঃ।
উকারাক্ষমসম্ভূতঃ শত্রুঘ্নস্তৈজসাত্মকঃ॥
প্রজ্ঞাত্মকস্তু ভরতো মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥
শ্রীরামসান্নিধ্য বশাজ্জগদানন্দদায়িনী।
উৎপত্তি স্থিতিসংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূল প্রকৃতিসংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥"

রামতাপনীয়োপনিষদঃ।

বেদে যে যোগতত্ত্ব প্রচারিত, রামায়ণে তাহার কাব্য সৃষ্টি। যোগীর চিত্তাবস্থাই দৈত্য দানব এবং রক্ষঃ পিশাচ। যোগশাস্ত্রে দেখুন রক্ষঃ এবং দৈত্য দানব কি?

"অন্তকরণকে চিত্ত কহে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আর নিরুদ্ধ ভেদেচিত্তের অবস্থা পঞ্চবিধ। রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় যে অবস্থাতে চিত্ত অস্থির হইয়া সুখ দুঃখাদি জনক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় সেই অবস্থাকে ক্ষিপ্তাবস্থা কহে। তাহাই দৈত্য দানবাদির অবস্থা। যে অবস্থায় তমোগুণের উদ্রিক্ততাদি নিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচার-বিমূঢ় হইয়া ক্রোধাদি বশতঃ চিত্ত সর্ব্বদা বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মূঢ়াবস্থা কহে। সেই মূঢ়াবস্থাই রক্ষঃ পিশাচের অবস্থা। সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে চিত্ত দুঃখকর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা সুখ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ঐকালে চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা জন্মে। এই অবস্থা দেবতাদিগের অবস্থা। সত্ত্বগুণে বিশুদ্ধ হইলে চিত্তের একাগ্রতা ও নিরুদ্ধাবস্থা জন্মে।" *

এই রাক্ষস ও পিশাচের অর্থে আমাদের শাস্ত্রে রাক্ষস ও পৈশাচিক বিবাহ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, বোধ হয়।

সুতরাং প্রতীত হইতেছে, যতদিন ইন্দ্রিয়গণ শাসিত না হয়, ততদিন তমোগুণের প্রাধান্য আছে। দশেন্দ্রিয়রূপী দশানন রাক্ষস। ইন্দ্রিয়লালসা সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসবৎ। সেই রাক্ষস, প্রকৃতিরূপিণী সীতাকে দেবক্রোড় হইতে হরণ করে। সেই দেবত্বে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করাই রামায়ণ ও যোগ। পরমাত্মরূপী জীব যখন রাক্ষস-বিজয়ী হয় তখন সীতার সহিত রামের মিলন হয়। জীব এই বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া একদা যোগমায়া শক্তির আরাধনা করেন। যখনই সেই রূপ আরাধনা করেন, তখনই দুর্গাপূজা

* শ্রীজয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।

হয়। দুর্গাপূজা যোগশক্তির সাধনা। যোগসিদ্ধিরূপ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যোগী এই সাধনায় প্রবৃত্ত হন। সাধনাই সিদ্ধির কারণ। যে সিদ্ধির ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যিনি ভগবতীর আরাধনা করেন, ভগবতী তাঁহাকে সেই ফলই প্রদান করেন। কারণ,

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

যোগী সেই ফলাভিলাষী হইয়া যখন যোগারূঢ় হয়েন, তখনই তিনি শক্তিতে উদ্বোধিত হন। তাহাব চিত্তে যোগশক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তিতে পূর্ণ হইয়া তিনি যোগ সাধনায় দৃঢ়ব্রত হয়েন। এই উদ্বোধনই দুর্গোৎসবের বোধন।

গীতায় কথিত হইয়াছে ফলকামনায় যাঁহারা ঈশ্বরাধনা করেন, তাঁহারা ফলই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের নিকট ঈশ্বর ফলদাতা মাত্র। যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঈশ্বর পূজা করেন, তাঁহারা আর ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না, ফলই লাভ করেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে কামনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকেই লাভ করেন। কিন্তু ঈশ্বর-কামনা করিতে গেলে অন্য সর্ব্ব-কামনা পরিত্যাগ করিতে হয়। তত-দূর ঈশ্বর-পরায়ণতা বড় সহজ কথা নহে। তাহা ঈশ্বরানুরাগের পরিপূর্ণতা। ঈশ্বরানুরাগ অত্যন্ত প্রবল না হইলে আর জীব সর্ব্বকামনা পরিত্যাগী হইয়া কেবল ঈশ্বরেরই অভিলাষী হইতে পারেন না। চিত্তের যখন এই অবস্থা ঘটে, যখন চিত্ত কেবল ঈশ্বরানুরাগী হয়, তখনই চিত্তের একমাত্র স্বপ্ন ঈশ্বর। ঈশ্বর লাভের জন্য তখন চিত্ত একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সেইরূপ ব্যাকুলতা হয়, যেরূপ ব্যাকুলতায় গিরিরাণী গিরিরাজকে গলাইয়াছিলেন, যেরূপ ব্যাকুলতায় মহারাসে গোপীগণ অচেতন বৃক্ষকেও বলিয়াছিলেন, হে বৃক্ষ, কৃষ্ণ কোথায় গেলেন বলিতে পার? যাহা যাহা সম্মুখে দেখিয়াছিলেন তাহাকেই অধীরতার সহিত সেই প্রশ্ন বারম্বার করিয়াছিলেন। তাহাদের জ্ঞান ছিল না, কাহাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে। বাস্তবিক, অত্যন্ত ব্যাকুলতা হইলে চিত্তের ঠিকভাব এই রূপই ঘটিয়া থাকে। যখন চিত্ত এই অবস্থায় উপনীত হয়, তখনই তাহা গিরিরাণীর স্বরে কাঁদিয়া উঠে। ঈশ্বর লাভের জন্য কাঁদিয়া পাগল হয়।

আগমনীতে এই কাতরতা উচ্ছ্বসিত। ঈশ্বরের জন্য চিত্তের এই কাতরতা কিসের সহিত তুলনা হয়? মাতৃভক্তি এ ব্যাকুলতা নয়। বাৎসল্য বুঝি তাহার তুলনীয়। বহুদিন কৃষ্ণকে না দেখিয়া যশোদা যেরূপ কাতরা হইয়া প্রভাসে গিয়াছিলেন, সেই কাতরতা একদিন যোগীর ঈশ্বরলাভ জন্য ব্যাকুলতার সহিত তুলনীয় হইতে পারে। আর তুলনীয় বহুকাল কন্যাহারা মাতার বাৎসল্য। সে বাৎসল্য উথলিয়া উঠে। এক পল-কের বিরহ তাহা বুঝি আর সহ্য করিতে পারে না।

"এনে দাও আমার উমারে।"—

বলিয়া সে বাৎসল্য একেবারে অধীর হইয়া উঠে। এই প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগের ছবি আগমনীতে প্রতিফলিত। ভক্তির এই ঐকান্তিকতা প্রতিবৎসরে উদ্বোধিত করিবার জন্য আগমনীর গান বঙ্গধামে সঙ্গীত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসরেই তাহা নূতন হইয়া আইসে। এমত দেব-তুল্য ভগবদ্‌ভক্তি যদি নূতন বলিয়া না

বোধ হইবে, তবে ত জীব নিতান্ত অচেতন। বঙ্গদেশ এত অচেতন নয় যে, এই গানে উদ্বোধিত না হইবে। তাই যখনই আগমনীর সুর হেমন্তাগমনে বঙ্গবাসীর শ্রবণে প্রবেশ লাভ করে, তাঁহার হৃদয় তখনই অমনি উথলিয়া উঠে। দুর্গোৎসবের জন্য বঙ্গবাসী অধীর হইতে থাকেন। তাঁহার ভক্তির উৎস উৎসারিত হইবার জন্য যেন উন্মুখী হয়। তাঁহার হৃদয়ে দুর্গোৎসব আইসে। এই ভক্তি-ভাব কি মধুর!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

ফুলরাণী।

১

রাবটি কেঁদে গেছে—
ছবিটি বিধে আছে
এখনো প্রাণেরে!
আকাশে তারাগুলি
উজ্জ্বল আঁখি মেলি'
চাহিছে ধীরে ধীরে
চাঁদিমা পানে রে!

*   *   *

২

ফুটিল ফুলদল,
ছুটিল পরিমল,
লুটিল সমীরে!—
ত্যেজিয়া সুরপুরী,
মাধুরী-কর ধরি,'
নামিল সুরবালা
কুসুম-নিকেতনে—
গাঁথিল ফুল-মালা
সোহাগে—সযতনে,
সোহাগে দিল ফুলে
মোহন চুমি রে!—

৩

সলাজে মরি! মরি!!
কুসুম পড়ে ঝরি'
তটিনী-বুকে রে!
সমীরে কাঁপি কাঁপি,
সোহাগে ঝাঁপি ঝাঁপি,
গাহিল গরবিনী
মোহন মৃদু তানে—
ফুলের "ফুলরাণী"
মরিল ফুল-বানে;
জীবনে সঁপি' কায়া
ভাসিল সুখে রে!!—

শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

জম্বু

ও

মণিচোরার স্বড়ঙ্গ !

জম্বু হিন্দু রাজ্য—কাশ্মির-রাজের শীতাবাস। ইহাকে কাশ্মিরের প্রবেশ-দ্বার বলিলেও বলা যাইতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা জম্বুতে গিয়াছিলাম। আমার কাকা জম্বুতে থাকিতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহোপলক্ষে আমরা প্রায় সকলেই জম্বুযাত্রা করিলাম। তখন আমি সামান্য বালক মাত্র—কিন্তু শিশু নহে। তখনও উপন্যাস পড়িতাম; কবিতা খুড় ভাল লাগিত। তখনও 'কপালকুণ্ডলা' পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম; 'ছিন্নমুকুল' পড়িয়া কাঁদিয়াছিলাম—এক কথায়, তখনই আমার মনে কি যেন কিসের 'ছায়া পড়িয়াছিল; সুতরাং দেশ ভ্রমণের নামে হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন লাহোর হইতে কেবল সেয়ালকোট পর্য্যন্ত রেল হইয়াছিল—জম্বু পর্য্যন্ত হয় নাই; সুতরাং আমরা সেয়ালকোটের টিকিট লইলাম। রাত্রি ১০ টার সময় ট্রেন লাহোর ছাড়িল—ভীম গর্জ্জনে মেদিনী কাঁপাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল! লাহোর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে যেমন জনকোলাহল-পূর্ণ সুন্দর সুন্দর ষ্টেশন গুলি দেখিতে পাওয়া যায়, এ পথে সেরূপ একটীও দেখিলাম না। যাহাও দেখিলাম তাহার অধিকাংশই ক্ষুদ্র, ভগ্ন, ও জনহীন।

উষার কনক-মাধুরীতে জগৎ হাসিল, আমরাও সেয়ালকোট পৌঁছিলাম। সেয়ালকোট নগরটী ক্ষুদ্র কিন্তু মনোহর। আমার চক্ষে আরও মনোহর বোধ হইল, কারণ সুবিখ্যাত পূর্ণচন্দ্র এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার সহিত সুন্দরার প্রণয় সংঘটিত হয়, এবং এই স্থানেই তাঁহার বিমাতা 'লোনা' তাঁহার সহিত অবৈধ প্রণয়-লাভে হতাশ হইয়া ঘোর ষড়যন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করেন। সেই কূপটীও দেখিলাম—দেখিয়া মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হইল!

সে যাহা হউক আমরা একখানি পাল্কি-গাড়ী ভাড়া করিয়া জম্বুযাত্রা করিলাম।

আকাশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত, নির্ম্মল। সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণে জগৎ হাসিতেছিল—দূরে দু'একটী পাখি গাছের সুন্দর শ্যামিকায় গা ঢাকিয়া তরুণ অরুণের প্রতি চাহিয়া করুণ স্বরে যেন কোন অজানিত অদৃষ্ট শক্তিকে আহ্বান করিতেছিল। যেন সে আহ্বানে মানবের স্বার্থপরতা নাই—তাহাতে যেন "কি যেন" মাখান! সে আহ্বান হৃদয় মাঝারে কি যেন এক সঙ্গীত-প্রবাহ ঢালিয়া দেয়—নীরব বীণা জাগিয়া কাঁদিয়া উঠে, হৃদয়-মাঝারে যেন কোন উদাস স্বরলহরীর মৃদুল প্রতিধ্বনি আনয়ন করে!

সে যাহা হউক আমাদের গাড়ি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। পথটী প্রস্তর পূর্ণ; কষ্টের কথা বলা বাহুল্য। পথের উভয় পার্শ্বে-গোধুম-ক্ষেত্রের অনন্ত বিস্তার—প্রভাত-সমীরণে অনন্ত সাগরোর্ম্মির ন্যায় হিল্লোলিত হইতেছিল! দূরে—বহু দূরে হিমাণী-মণ্ডিত পর্ব্বত রাজির ক্ষীণ নীলিমা নবোদিত নীরদমালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল! আমার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল—বোধ হইল যেন কোন মেঘপুরে কিন্নর বৃন্দের কুসুম-রাজ্যে গমন করিতেছি! ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, সূর্য্য-কিরণ প্রখর হইল; আমরা "নওয়া সরাই" পৌছিলাম। নওয়া সরাই" একটী ক্ষুদ্র চটী। ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার 'কৈচোর' বা গুগুনদিঘী'র ন্যায় নহে,—ইহা একটী ক্ষুদ্র বারিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উভয় পার্শ্বে কতকগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ ও দোকান; এক পার্শ্বে এক গভীর কূপ, এবং মধ্যে প্রশস্ত প্রাঙ্গন।

পিশিমা এখানে রন্ধনাদির যোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু গাড়োয়ান বিষম আপত্তি তুলিল, কহিল, এখানে বিলম্ব করিলে জম্বু পৌছিতে রাত্রি হইবে, পথে পাহাড়ী দস্যুরা মারিয়া ফেলিবে। আমাদের নানা জেদ সত্ত্বেও সে সেখানে থাকিতে রাজি হইল না, কাজেই আমাদের জলযোগের ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। আমরা দলে পাচজন। আমি, পিশিমা, তাঁহার দুই পৌত্র, ও কাঙ্গাড়াজেলা নিবাসী জনৈক 'অদ্ভুত' পাহাড়ী ভৃত্য। দুধ ও বরফী কিনিলাম। এখানে দুধ ভারি সস্তা—খাঁটি দুধ টাকায় ১৬।১৭ সের। কিন্তু বরফী মুখে দিয়া ই—হরি! হরি!! এ যে আটার ঢিবি!!! বোধ হয় দোকানী তাহার মান্ধাতার আমলের, ছাতা-ধরা, "সুন্দর সবুজ" বরফীর বৌনিটা সর্ব্ব প্রথম আমাদের উপরই ঝাড়িল! যাহা হউক, কোন প্রকারে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। সমস্ত দিন নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই জম্বুর নিকটবর্ত্তী হইলাম। প্রথমেই সম্মুখে দেখিলাম—বাহুদেবীর বিশাল পর্ব্বত। বোধ হইল পর্ব্বতটী আমাদের নিকট হইতে যেন এক রশি তফাতেই আছে—দৌড়িয়া গিয়া ছুঁইলেই হয়। কিন্তু গাড়োয়ান বলিল এখনও ৭ মাইল তফাৎ আছে—সে আরও বলিল যে 'সতীর' বাহু ঐ স্থানে পড়াতে উহার নাম "বাহুদেবী" হইয়াছে। ইহা ঐ স্থানের হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থ স্থান।

পর্ব্বতটী 'তাবী' নদীর উপরেই, এবং উহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে জম্বুর সুদৃঢ় কেল্লা—আকাশ পটে চিত্রিত চিত্রের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া উন্নতমস্তকে দক্ষিণদিকে চাহিয়া দেখিতেছে—পঞ্জাব কতদূর—যেখানে গোলাবসিংহের প্রতাপের প্রথম বিকাশ পরিস্ফুট হয়।

গাড়ি একটী বাঁক ফিরিল—তাবিতট-স্থিত অসংখ্য গৃহমালা-শোভিত রবিকর-প্রোজ্জ্বল জম্বু নগরী একখানি চিত্রিত চিত্রের ন্যায় নয়ন-সম্মুখে জ্বলিয়া উঠিল! আনন্দোৎফুল্ল লোচনে দেখিলাম প্রসন্ন-সলিলা "তাবী" 'সৌধ-কিরীটিনী' জম্বুর সুন্দর ছায়া বুকে করিয়া আপন মনে ভাসিয়া চলিয়াছে! জম্বু পর্ব্বতোপরি স্থিত—সুতরাং মনোমুগ্ধকর! তার

হিন্দুরাজ্য ; অসংখ্য স্বর্ণ-চূড় মন্দির অস্তমান সূর্য্যের হেমকিরণে জ্বল্ জ্বল্ জ্বলিতেছে ! দূরে এক উচ্চ শীখরে রাজভবন। তাহারপর পর্ব্বত—পর্ব্বতের পর পর্ব্বত—সাগর-তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গে তরঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া যেন দূরে গিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কুজ্ঝটিকায় পরিণত হইয়াছে !!

আমরা অগ্রসর হইলাম, কিন্তু সহসা গাড়ির চাকা চোরাবালিতে বসিয়া গেল! আমরা নামিতে বাধ্য হইলাম, এবং বহুকষ্টে কতকগুলি বিশাল বপু কাশ্মিরী কুলীর সাহায্যে তীরে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, কাকা আমাদের জন্য কয়েক খানি পাল্কি পাঠাইয়া দিযাছেন, কারণ পাল্কি বা পদযুগলের সাহায্য ভিন্ন পাহাড়ে উঠিবার অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু পাল্কি দেখিয়াই আমার হরি ভক্তি উড়িয়া গেল ! "পাল্কি" নাম শুনিয়া পূর্ব্বে আমাদের দেশের 'পতড়-সেবনকারী গুন্‌গুনে উড়ে বেহারা-বাহিত সুন্দর পাল্কির 'ফোটো' আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পাল্কি দেখিয়াই হরিষে বিষাদ' হইল—প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রাণ থাকিতে এই "নারদের ঢেঁকি"তে চড়িয়া 'স্বর্গে উঠিব না ! মনে করুণ—দুইখানি বংশখণ্ড, তাহার উপর চারি কোনা কঞ্চির উপরে একখানি রাঙা 'টুন' জড়ান, তাহা আবার দুইজন মুটে মাথায় করিয়া পাহাড়ে উঠিবে—ইহাই জম্মুতে "পাল্কি" নামে অভিহিত। ইহাতে চড়া কি সহজ ব্যাপার ? যোল আনার উপর আমার পিশিমা স্থূলাঙ্গী ছিলেন, সুতরাং তিনি তো পাল্কি (অগত্যা ইহাই বলিতে হইবে) দেখিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। চারিদিকে লোক জড় হইল। যাহাহউক কোনপ্রকারে তিনি ঐ সকল অদ্ভুত পদার্থের মধ্য হইতে একখানি 'জো সো রকমের, চলন সই গোছ' বাছিয়া লইলেন ; আদর করিয়া আমাদের ডাকিলেন—"তোরা কেউ আস্‌বি রে ?" আমরা দূর হইতে প্রণাম করিয়া পদব্রজেই চলিলাম।

পুল পার হইলাম, পেরুণী একপয়সা করিয়া পড়িল। তাহার পর পাহাড় আরম্ভ হইল। মহারাজ পাহাড় কাটাইয়া পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। পথটি আঁকিয়া বাকিয়া উপরে উঠিয়াছে আমরাও হেলিয়া দুলিয়া উপরে উঠিলাম। সম্মুখেই জম্বুর তোরণ-দ্বার। চারিজন দীর্ঘকায় সশস্ত্র তোগরা সৈনিক উলঙ্গ অসি হস্তে দণ্ডায়মান। তখনও শানিত কৃপাণ-ফলকে বেলা ঝিকিমিকি করিতেছিল। আমরা তোরণের নিকটবর্ত্তী হইলাম। একজন বিশালকায় তোগ্‌রা অগ্রসর হইয়া দীর্ঘ তরবারী হেলাইয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—"খড়া রও!" আমরা দাঁড়াইলাম। একজন একখানা খাতা লইয়া আমাদের নাম ধামাদি লিখিয়া লইল। যে অক্ষরে লিখিল তাহার কিছুই বুঝিলাম না, বুঝিলাম শুধু—ঘটি, বাটি, হাতা, বেড়ী, খন্তা ইত্যাদি। নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিবার কারণ, পাছে কেহ গুপ্তচর নগরে প্রবেশ করে। যে সময়ের কথা আমি লিখিতেছি তখন সেখানে ইংরাজের এত আধিপত্য ছিল না।

আমরা নগরে প্রবেশ করিলাম। নগরটী মন্দ নহে। দোকান গুলি রঙ্গীন—দেখিতে প্রায় একরকম ; নম্বর

না থাকিলে কাহার কোন্‌টা চেনা ভার হইত। সব ভাল কেবল রাস্তাগুলি পাহাড় কাটা বলিয়া অসমান—সামান্য অমনোযোগেই হোঁচট খাইতে হয়। যাহাহউক, ঘরে পৌঁছিলাম, কাকাকে দেখিলাম—জীবনে কাকাকে এই প্রথম দেখিলাম প্রণাম করিলাম। কাকিমা নাই, সুতরাং আদর কবিবার লোক নাই; তবে দিদি ইন্দুমতী ও কাকা খুব যত্ন করিলেন। সে রাত্রি বেশ এক রকম কাটিল; তবে তোগরা-রমণীদিগের একঘেয়ে বিকট বিবাহ গীত ও ধমাধম্ ঢোলপেটার উৎকট জ্বালায় স্বপ্নের ব্যাঘাত হইযাছিল। জম্বুতে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম, সুতরাং বাঙ্গালী রমণী অধিক পাওয়া দুষ্কর, অতএব সেই দেশীয় স্ত্রীলোকগণকেই একপ্রকার স্ত্রী আচার মঙ্গলাচার প্রভৃতি সমাধা করিতে হইয়াছিল, কাজেই এই ঘোর জ্বালা !!

প্রভাতে উঠিয়াই নগর ভ্রমণে বাহির হইলাম। সঙ্গে দুইজন তোগ্‌রা পথ প্রদর্শক।

জম্বুর পাহাড়ী অধিবাসীগণকে "তোগ্‌রা" বা "তোগব" বলে। দুই গড়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়াই "দোগড়" বা "তোগড়" তথা "তোগর" হইয়াছে। ইহারা দীর্ঘকায় ও সুশ্রী, সাহসী ও সত্যবাদী। দেখিতে প্রায় পঞ্জাবের বিখ্যাত বীর জাতি শিখদিগের ন্যায়; ভাষাতেও অল্প প্রভেদ।

শারীরিক প্রভেদের মধ্যে শিখেরা কেশ রাখে, ইহারা রাখে না। ধর্ম্ম-বিষয়ে—শিখগণ, একেশ্বরবাদী, ইহারা অনেকে শৈব। ইহারা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়।

যে সময়ের কথা আমি লিখিতেছি তখন অনেকের কটিদেশেই তরবারী বিলম্বিত দেখিয়াছি।* তখন অস্ত্রের লাইসেন্স ছিল না।

আমরা নগর ভ্রমণ করিয়া জম্বুর "মিউজিয়ম" দেখিলাম—"সালামার বাগ" দেখিলাম। বলিবার কিছুই নাই।

সেদিন 'হোলী'। পথ, ঘাট, মাঠ, সকলই বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত—কিছুই বাকি নাই। বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, বালক, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই রঙে মাতিয়াছে! বাজারে বাজারে রঙের ফোয়ারা বসিয়াছে। আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে, হাসির খল খল রবে, অলঙ্কারের সুমিষ্ট নিক্কনে ও গীতে মধুময় তানে প্রত্যেক হৃদয়ই প্রফুল্ল! কোথাও কাহারা গাহিতেছে "দেখ্ যে সারি দুনিয়া হ্যায় রং বরং"—আবার কোথাও বা "রঙ্গিলা শ্যাম খেলে হোরী বিরজ মে" ইত্যাদী।

আমাদের ভিজাইতেও কেহ কসুর করিল না। দোল যাত্রার সময় আমাদের দেশে শীত নাই বলিলে হয়, কিন্তু এখানে এত শীত যে হাত বাহির করিলেই "হাত নাই"!

সে যাহা হউক, আহারাদি করিয়া আমরা "বাহুদেবীর কেল্লা" ও "মণিচোরার সুড়ঙ্গ" দেখিবার নিমিত্ত বাহির হইলাম। এখানকার লোকের বিশ্বাস মতে এই সুড়ঙ্গই নাকি "মহাভারতোল্লিখিত মণিচোরা জম্বুবানের সুড়ঙ্গ; এবং এই জম্বুবানের নামানুসারেই নাকি নগরের নাম 'জম্বু' হইয়াছে।

সে কথা যাক—আমরা প্রথমে "বাহুদেবীর কেল্লা" দেখিয়া সুড়ঙ্গে যাইব

* এখনও সকলে অস্ত্রত্যাগ করে নাই।

স্থির করিলাম, কারণ কেল্লার পর পারে সুড়ঙ্গ দেখিয়া যাইতে হইলে বেলা থাকে না। সুতরাং অগ্রে তথায় চলিলাম। বহু কষ্টে পাহাড়ীদের অনুসরণ করিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিলাম। পূর্ব্বে কখনও অভ্যাস ছিল না, সুতরাং কষ্ট বিলক্ষণ হইল; কিন্তু নামিবার সময় যে সকল মনোহর দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে সকল কষ্ট অনায়াসেই ভুলিয়া গেলাম।

সম্মুখেই নির্ম্মল-সলিলা 'তাবী'—নীহার-মণ্ডিত শৈলমালার মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাকিয়া, হেলিয়া, দুলিয়া, নাচিয়া, হাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। শৈলগুলি মস্তক অবনত করিয়া যেন সেই প্রকৃতির কোমল দর্পণে আপনাদের তুষার মণ্ডিত উন্নত বদনের অবনত প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে। এখানে পাখিরা বঙ্গদেশের ন্যায় "স্ফটিক জল, স্ফটিক জল" রবে অনবরত চিৎকার করে না—এখানে তাহারা দলে দলে, দুলে দুলে, স্ফটিক জলে সাঁতার কাটে!

আমরা অঞ্জলি পুরিয়া নদীর জল পান করিলাম। রিফাইন করা কলের জলও ইহার নিকট লজ্জা পায়, কিন্তু এত ঠাণ্ডা যে মুখে দিলেই মুখ "নাই!"

আমরা কিরূপে পার হইব ভাবিয়া আকুল। কারণ খেয়া পারে গিয়াছে, আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব, কাজেই আমরা তীরে বসিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিলাম। রূপসী পাহাড়ী ললনাগণ দলে দলে ঘাট আলো করিয়া স্নান করিতেছে—সে দিকে পুরুষের যাইবার যো নাই; রাজ আজ্ঞা। কিছু দূরে সুশ্রী, সবলকায়, গৌরবর্ণ পাহাড়ীরা কেহবা স্নান করিতেছে—কেহবা আহ্নিক করিতেছে—আবার কেহবা "হর হর বম্ বম্ জয় মহাদেও" রবে সুপ্ত পর্ব্বত রাজিকে জাগরিত করিতেছে! একজন ডোগরা অশ্বারোহী আমাদের নিকটে আসিয়া ঐরূপ ভাবে বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল; আমরাও সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। সে আমাদের পাইয়া বসিল, বলিল, "আমি ঘোড়া দিতেছি তোমরা একে একে পার হইয়া যাও।" আমরা স্বীকৃত হই না, সেও ছাড়ে না, এমন সময় নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল, আমরাও বাঁচিলাম।

পার হইলাম। তাহার পর পদ-ব্রজেই চলিলাম। দুই দিকে পাহাড়ের সারি, মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ—উঠিয়া, পড়িয়া, আঁকিয়া, বাঁকিয়া চলিয়াছে; আমরাও তদ্রূপ ভাবেই চলিলাম। চলিতে বিলক্ষণ কষ্ট হইতে লাগিল, পায়ের নিচে পাথরে পাথরে ঠোকর খাইয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে কোন কোনটা পাহাড় এরূপ ভাবে মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে দেখিলেই বোধ হয় বুঝি এই পড়িল!!

দুই ধারে কুল গাছ—কুলে লাল; আরও নানা জাতি তরু লতা ফল ফুলে শোভিত।

পাহাড়ের কোলে এক প্রকার ফল পাওয়া যায়, তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। গাছ ছোট ছোট, আমাদের দেশের সেওড়া, কাল্‌কাসন্দার চেয়ে বেশী বাড়ে না। ফল ফলসার ন্যায়—আস্বাদন অম্ল-মধু—খাইতে মন্দ লাগে না। আমরা তাহাই খাইতে খাইতে চলিলাম। মাথার উপর দিয়া কতরকম পাখী উড়িয়া

গেল—বাতাসে উজ্জ্বল পাহাড়ী ফুলগুলি মাথার উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল! আমরা চলিলাম— কোথাও পথ বন্ধুর, কোথাও বিস্তৃত; কোথাও মাথার উপর লতায় লতায় একত্র হইয়া একটি সুন্দর চন্দ্রাতপ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক এক খণ্ড-আকাশ স্বচ্ছ স্ফটীক-মুকুরের ন্যায় শোভা পাইতেছে; আবার কোথাও আকাশ বিস্তৃত, গভীর—তরঙ্গশূন্য সমুদ্রবৎ স্থির, প্রকাণ্ড! যত উর্দ্ধে উঠিতেছি, প্রকৃতির কোমল মাধুরীতে স্বর্গের বিমল ছায়া যেন ততই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে! স্বর্গ আর কোথায়? *

আরও উর্দ্ধে উঠিলাম। পর্ব্বতারোহনে অনভ্যস্ত, পা আর চলে না, তবুও বিরাম নাই।

অবশেষে পর্ব্বত-শীখরে আরোহন করিলাম। আহা! কি রমণীয় দৃশ্য! যতদুর দৃষ্টি চলে পর্ব্বতের অসীম তরঙ্গবিস্তার—মধ্যে মৃদুলকলনাদিনী ফুল্ল-নীরা তাবী—একটি ক্ষীণ রজত রেখার ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া নির্জীব পাষাণ-হৃদয়কে সজীব করিয়া দূরে—দূরে—বহুদূরে গিয়া কি জানি কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে! দূরে—দূরে—আরও দূরে—জন কোলাহল শূন্য শান্তিময় নীহার-রাজ্যে—আকাশের ধূসর প্রান্ত ভেদ করিয়া হিমালয়ের উন্নত মস্তক শোভা পাইতেছে। হেমন্ত সূর্য্যের কোমলকর-সংলগ্ন সুশুভ্র মেঘমালার ন্যায় সেই তুষার মণ্ডিত হিমালয় যেন, গর্ব্বোন্নত মস্তকে, শ্রবণভেদী কোলাহলপূর্ণ বিস্তীর্ণ জগতের প্রতি চাহিয়া বলিতেছে—"নিদ্রিত ভারতকে আর জাগাইও না। অদৃষ্ট-সমরে ক্লান্ত হইয়া ভারত আজি আমার শান্তিময় ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিতেছে—ভারতকে আর জাগাইও না!"

* * * * *

তাহার পর দুর্গ দেখিলাম। দুর্গে বিস্তর সৈন্য—বেশ সুরক্ষিত দুর্গটী এইরূপ স্থানে অবস্থিত যে ইচ্ছা করিলে কাশ্মির রাজ অনায়াসে সেয়ালকোট উড়াইয়া দিতে পারেন।

বাহুদেবীর মন্দিরে গেলাম। ব্রাহ্মন শুনিয়া তাহারা আমাদিগকে খুব যত্ন করিল। মন্দিরে দেব দেবী কিছুই নাই, শুধু একস্থানে তৈলসিন্দুর-চর্চ্চিত একখানি বস্ত্র, শুনিলাম এই বস্ত্রের নিচেই সতীর বাহু আছে। থাকুক বা না থাকুক আমি তাহা দেখি নাই *, সুতরাং বিশ্বাস, অবিশ্বাসের কথা বলিয়া সুনাম বা কুনাম কিনিতে চাহি না।

সে যাহা হউক, বাহু দেবীর পাহাড়ের উপর কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া আমরা "মণিচোরার সুড়ঙ্গ" দেখিতে চলিলাম। পুনর্ব্বার নদী পার হওয়া গেল। বেলা প্রায় ৫ টার সময় বহু কষ্টে গাছ পাথর ধরিয়া একটা খাড়া পাহাড় উঠা গেল। সম্মুখেই সুড়ঙ্গ-দ্বার। সুড়ঙ্গ-দ্বারে, শিব, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি দেব দেবীগণের

* আমি সেই বৎসরে স্বর্গে যাইবার মানসে ৭ সাতবার রামায়ণ ও মহাভারত শেষ করিয়াছিলাম। বলা বাহুলা, তখন আমি "আলোক" হইতে অনেক দূরে ছিলাম স্বর্গ দেখিলাম কি না তাহার উত্তর না মরিয়া দিতে পারিব না, তজ্জন্য পাঠক পাঠিকাগণ মার্জ্জনা করিবেন।

* পাণ্ডারা কাহাকেও তাহা দেখায় না, দেখিলেই অন্ধ হয়।

অসংখ্য প্রস্তর মূর্ত্তী। পাহাড়ে প্রস্তরের অভাব নাই। পাণ্ডাগণ এই মূর্ত্তিরাশির সাহায্যে যাত্রীগণের নিকট হইতে বিলক্ষণ দুইহাত আদায় করিয়া থাকে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে পাণ্ডা মহোদয়গণ কার্য্যান্তরে ব্যস্তছিলেন। পুরোহিত মহাশয়ও স্থানান্তরে গিয়াছিলেন—আমরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

ফাটকে ঢুকিয়া আর একটা ফাটক দেখিলাম। আমাদের পথ প্রদশক পাহাড়ীদ্বয় অগ্রসর হইল। ক্রমাগত ১৫টী সিঁড়ি নামিয়া আমরা একস্থানে আসিলাম। সেটা অন্ধকূপ কি যমালয় তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, কারণ মৃত্যুর নিবিড় ছায়ার ন্যায়, গভীর নিস্তব্ধতা-মাখা এক ঘোর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না! দৃষ্টিই বা ছিল কোথায়? নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইল— ভাবিলাম ইহা বুঝি Black hole এর দ্বিতীয় সংস্করণ!"—পাহাড়ীগণ বলিল, আর একটু অগ্রসর হইলেই আলো পাইব কিন্তু কিরূপে অগ্রসর হইব বুঝিতে পারিলাম না। কারণ পথ প্রদর্শকের দীর্ঘ শিখা পর্য্যন্ত তিমিরাচ্ছন্ন'। তখন আমরা নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলাম! কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত জাতিগণের নিকট অশিক্ষিত বর্ব্বর পাহাড়ী Humdrum নামে আখ্যাত হইলেও আমাদের পথ প্রদর্শক পাহাড়ীদ্বয় নেহাত Humdrum শ্রেণীভুক্ত ছিল না। তাহাদের ঘটে কিছু বুদ্ধি ছিল। তাহারা তাহাদের উত্তরীয় দুইখানি আমাদের ধরাইয়া পশ্চাতানুসরণ করিতে বলিল। আমার ঠিক সেই সময় নল, নীল, গবাক্ষের হাত ধরাধরি করিয়া লঙ্কার দ্বার রক্ষার কথা মনে পড়িল। কি করি? উপায় নাই! কাজেই Humdrum পাহাড়ীর মোটা বুদ্ধির নিকট মাথা নোওাইয়া আমরা তিন বাঙ্গালী—রাম রমা, উপেন্—নল, নীল, গবাক্ষের শ্রেণীভুক্ত হইয়াই চলিলাম, বা চলিতে বাধ্য হইলাম। প্রায় দুই দণ্ড অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া দূরে একটী ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইলাম। সেই ক্ষীণ আলোক যে তখন কত মধুর, কত উজ্জ্বল বোধ হইয়াছিল তাহা লিখিয়া জানাইতে অক্ষম।

যাহা হউক, নিকটে গিয়া দেখিলাম, একটী শিবলিঙ্গের নিকট একটী প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। সে আলোকে শুধু 'অন্ধকাব' দেখা যায়! সম্মুখে চন্দন-চর্চ্চিত কুসুমরাশি—সুবিমল পরিমল বিস্তার করিয়া নির্জ্জন ভয়াবহ গুহাকে কথঞ্চিৎ কোমল ভাব-সম্পন্ন করিয়াছে। পাহাড়ীরা বলিল যে জাম্বুবানের বধ সাধনার্থ † আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে শ্রান্তি দূর করেন এবং উক্ত শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও তাহার পূজা করিয়া গুহা প্রবেশ করেন। সে যাহাই হউক, লিঙ্গের মস্তকোপরিস্থ প্রস্তরাবরণ দেখিলে উহা সামান্য মনুষ্যকৃত বলিয়া বোধ হয় না। ঐরূপ ভয়ঙ্কর পাহাড়ের গা কাটিয়া ঐরূপ মনোহর কারুকার্য্য সম্পন্ন করা সামান্য মনুষ্যের সাধ্যাতীত। পাহাড়ের গায়ে, লিঙ্গের বাম পার্শ্বে, দুইটা প্রকাণ্ড গহ্বর, যেন মুখ ব্যাদান করিয়া গিলিতে আসিতেছে!! শুনিলাম

† এই গল্পটী বঙ্গের নরনারীর নিকট অবিদিত নহে, সুতরাং ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

উহাই সুড়ঙ্গের প্রকৃত পথ। আমাদের নিকট মোমবাতি ছিল, প্রদীপের সাহায্যে তাহা জ্বালিয়া একটা গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু ১০।১২ হাতের অধিক যাইতে পারিলাম না। তা'ছাড়া ইহাও জানিতাম যে অধিক সাহস করিলে অজাগর সর্পের বিশাল উদরে আমাদের অধিষ্ঠান হইবে! শুনিলাম কাশ্মির-সেনাপতি যুবরাজ রামসিংহ একবার কৌতুহলপরবশ হইয়া অনুচরগণসহ উহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ২।৩ মাইলের অধিক যাইতে পারেন নাই—আগে কেবল জল। তা'ছাড়া তাঁহাকে অনেক পাহাড়ী-সাপের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

আমরা ফিরিলাম। এই সময় পাণ্ডাগণও ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, এবং—ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য—আমাদের এই দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্য বিশেষ সুখ্যাতিও করিল না। তাহাদের মতে দৈব বলে আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি, কারণ দ্বার হইতে শিবলিঙ্গ পর্য্যন্ত—সর্প-রাজ্য। আলো না লইয়া যাওয়া আমাদের বুদ্ধিহীনতার যে এক প্রধান সাক্ষ্য ইহাতে তাহাদের আর কোন সন্দেহ রহিল না। শুনিলাম সর্পগুলিকে প্রত্যহ দুগ্ধ দেওয়া হয়।

ইহার পর মহাত্মাগণ আমাদের নগ্ন-মস্তকে হস্ত বুলাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে, অতি সাবধানতা সহকারে স্বীয় স্বীয় অভ্যস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের পথ প্রদর্শক দ্বয় Humdrum শ্রেণীভুক্ত ছিল না; সুতরাং বলা বাহুল্য যে তাহাদের পাহাড়ী-কৌশলে (অর্থাৎ মুষ্টাঘাত) কোথাও বা দিয়া, কোথাও বা না দিয়া সে যাত্রায় উদ্ধার লাভ করিলাম।

পাণ্ডাগণকে সুড়ঙ্গ-সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহ বলিল, "এই সুড়ঙ্গ আমেরিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে।" কেহ বলিল "না কাশ্মির।" কেহ—"লদাক", কেহ "তিব্বত"—তাহার পর বাকবিতণ্ডা, অবশেষে হাতাহাতি। বেগতিক দেখিয়া আমরা সরিয়া পড়িলাম।

শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

স্মৃতি।

চন্দ্রমার রজত কিরণে,
বাঁশরীর মোহময় তানে,
সমীরের সুমন্দ হিল্লোলে,
বিহগের মৃদু মধু বোলে,
বিকশিত কুসুম-শোভায়,
প্রভাতের কনক বিভায়,

উছলিত দিবস যামিনী
ক'ার যেন স্নিগ্ধ ভালবাসা,
এই ফুলে, শিশিরের সনে
করেছিল ক'ার মৃদু আশা!
স্মৃতি তার স্বপন মতন,
মনে হয়—কে ছিল কখন!!

কুমারী সরযূবালা দেবী।

গৌরী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তালগাছ কাটুম, বোসের বাটুম
গৌরী হেন ঝি।
তোর কপালে বুড় বর,
আমি কর্ব্ব কি ?
ও গৌরি ! ঐ দেখ্ তোর বর।"

পাড়ার চৌধুরী বুড়ো, হাতে লাঠী, কাঁধে গামছা লইয়া, ঠক ঠক করিয়া মিত্রদের বাড়ীর সামনে হাটখোলায়, বাজার করিতে যাইতেছিল। হর-গোবিন্দের মেজ মেয়ে সুশীলা তাহাকে উল্লেখ করিয়া গৌরীকে ঐ কথা বলিতেছিল। কথাটা বুড়োর কাণে পৌঁছিল। বুড়ো গৌরীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। ওষ্ঠের দুই পাশ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে গোত্রজহীন, সাথীহারা দুটী শুভ্র-দন্ত বাহির হইয়া পড়িল। বুড়ো গৌরীকে বলিল "পুঁটী ! আমার ক'নে হবি ? বেশ ছোকরা বর হবো। দুজনে রাঁধবো, বাড়বো, খা'ব। যা পুঁটী, মাকে বলগে যা।"

সুশীলা মজা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। সে বড় দুষ্ট। পাড়ার কোন মেয়ে তাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতনা।

গৌরী কাঁদ কাঁদ হইয়া ছল ছল চোকে মার কাছে গেল। বলিল "হাঁ মা ! চৌধুরী বুড়ো কি আমার বর ? সুশী খালি খালি আমাকে কাঁদাচ্ছিলো।"

মা হাসিলেন। বলিলেন "বালাই ! বুড়ো তোমার বর হতে যাবে কেন ? ও সুশীর বর হবে। তোমার জন্য আমি গোরার মত রাঙা বর আনবো।"

তবে মেয়ে চুপ করে।

* * *

তার পর একদিন মা বুঝিলেন গোরার মত রাঙা হউক, আর বাঙালীর মত কালই হউক গৌরীর জন্য বরের সন্ধান করিতে হইবে। নইলে আর ভাল দেখায় না। কর্ত্তাকেও ঐ রূপ বুঝাইলেন। কর্ত্তা আহারের পর নিশ্চিন্ত ভাবে তামাক খাইতে খাইতে কথাটা শুনিলেন। কিন্তু হুঁকাটা নামাইয়া রাখিবার পর হইতে সে নিশ্চিন্ত ভাবের অনেকটা হ্রাস হইয়া গেল।

বরের অনেক সন্ধান হইল। বর জুটিলও অনেক। বাতিল হইলও অনেক। কর্ত্তা গৃহিণী দুজনের মনের মত বর জুটে কৈ ? পাবনা জেলায় একবার এক বরের হদিশ মিলে। কর্ত্তার ও খুব ইচ্ছা তারই হাতে গৌরীকে সঁপিয়া দিয়া আবার দিনকতক নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক টানেন। কিন্তু গৃহিণীর মত হইল না। প্রথমতঃ বরের দেশ সে কোন মুলুকে। একবার মেয়ের তত্ব লইতে গেলে চাল চিড়া বাঁধিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। সাত নয়, পাঁচ নয়, ঐ একটী মেয়ে—তাকে কি সেই কোন রাজ্যিতে পাঠাইয়া প্রাণ ধরিয়া থাকা যায়। তারপর, বরের বয়স পঁয়ত্রিশ—আবার দোজবরে। হোকগে

মাইনে আড়াইশ। শুধু তাই নয় সে আবার জেলার হাকিম—মেয়েকে লইয়া এ দেশ সে দেশ করিয়া বেড়াইবে। গৃহিণী একেবারে বাকিয়া বসিলেন। অগত্যা সকালের ইস্তাটা রাত্রির আহারের সঙ্গে কর্ত্তাকে হজম করিয়া ফেলিতে হইল।

আবার নূতন বরের সন্ধান হইতে লাগিল। শীঘ্র বরও জুটিল। এবার আর গৃহিণীর কোন আপত্তি রহিলনা। বরের বাড়ী ও কনের বাড়ীর মাঝে শুধু একটা ছোট গ্রাম ব্যবধান। সে ত এপাড়া ওপাড়া। বিশেষতঃ যে গ্রামে বরের বাড়ী, তারই কোলে মাঠের মাঝখানে গৌরীর বাপের জমাবিলি ৮।১০ টা কনি আছে। কর্ত্তাকে মাঝে মাঝে তাহা দেখিতে যাইতে হয; ফিরিবার সময় চাইকি গৌরীর খবরটা লইয়া আসিতে পারিবেন। মার প্রাণ তবু কতটা ঠাণ্ডা থাকিবে। তার পর বরের সংসারে সব জাজ্বল্যমান। মা, বাপ, ভাই, বোন, সব আছে। অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল। ছেলে মানুষ বর—বয়স ১৭।১৮ একটা পাশ করিয়া কলিকাতায় দু'টা পাশের পড়া পড়িতেছে। দেখিতেও চাঁদপানা। আর চাই কি? কর্ত্তা গৃহিণী দুজনেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথমে লোকদিয় কথা পাঠাইলেন। শেষে একদিন গৌরীর বাপ, পশুপতি ঘোষাল স্বয়ং বরের বাপকে গিয়া ধরিয়া বসিলেন। অনূঢ়া কন্যাভারগ্রস্ত একজন ব্যক্তি তাঁহার নিকট একটা মস্ত অনুগ্রহ যাচঞা করিতে আসিয়াছে দেখিয়া, শ্যামনিধি চাটুর্য্যের মনে, তিনি একজন পাশকরা ছেলের সঙ্গতিপন্ন পিতা শুধু এইকথাই উদয় হইতে লাগিল। পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকেও যে রায়নার হরসুন্দর মুখুর্য্যের বাড়িতে নিতান্ত দীন ভাবে, কর্ত্তার মুখপানে চাহিয়া মাঝে মাঝে হত্যাদিয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল সে কথা একবারও মনে হইলনা। তিনি একটা বড় তাকিয়ার উপর কনুইএর ভর দিয়া, আড় হইয়া শুইয়া, আগরার গড় গড়ায় রূপার মুখওয়ালা নল লাগাইয়া, চোক বুজিয়া তামাক খাইতে ছিলেন। আর ভাবিতে ছিলেন, তিনি শুধু একটা ছোট মুখের কথায় এইরকম কত কন্যা-বিপদগ্রস্ত পিতার মাথা কিনিতে পারেন। এসকল পিতৃ কুলের মস্তকের কি অল্প মূল্য!

অনেক গুলা ঢোক গিলিয়া, এবং তদপেক্ষা অধিক বাজে কথায় ভূমিকার পর, যখন পশুপতি নিতান্ত ভয়ে ভয়ে চাটুর্য্যে মহাশয়কে জানাইল, যে সে বাস্তবিকই স্বয়ং উপযাচক হইয়া আজ তাঁহার নিকট মাথা বেচিতে আসিয়াছে এবং ইহলোক হইতে অবসৃত তাহার প্রাক্তন চতুর্দ্দশ পুরুষেরাও আপনাদের অদৃশ্য মাথা গুলিও ঐ সঙ্গে বেচিতে আসিয়াছেন—এবং আরও জানাইল যে, যে অভাগা কন্যার সে হতভাগ্য পিতা, তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার অশুভ মুহূর্ত্ত হইতে প্রাগুক্ত পুরুষগুলি আপনাদের অধিকারচ্যুত হইয়া এতদিন শূন্যে যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং অভিশাপ মোচনের আশায়, অনুগ্রহ-

পয়োধী-মন্থিত, চাটুর্য্যে মহাশয়ের মুখ-ভাণ্ডক্ষরিত শুধু একবিন্দু সুধার লালসায় তৃষিত হইয়া কাল কাটাইতেছেন, তখন রামনিধি চাটুর্য্যে মহাশয় একবার চোক মেলিয়া চাহিলেন। আলবোলায় একটা লম্বা টান দিয়া—একটা ছোট হাসির কিরণে পশুপতির সন্দেহ—কণ্টকিত অন্ধকার পথ চকিতে আলোকিত করিয়া, নলটা তাহার হাতে দিলেন।

অনেকটা পথ হাঁটিবার পর সম্মুখে সুখসেব্য তাম্রকূট দেখিয়া পশুপতি এতক্ষণ একটা রুদ্ধ-রুদ্ধ বাসনার যাতনা অনুভব করিতেছিল। এখন নলটা হাতে পাইয়া ভাবিল, চাটুর্য্যের মুখ না হউক অন্ততঃ ঐ ফুরসিটা সুধাভাণ্ড।

বেশী কথা হইল না। তবে যাহা হইল, তাহাতে পশুপতি এইটুকু বুঝিলেন যে সুরেশ বাপাজীবন যতদিন না বিএ পাশ হয় ততদিন চাটুর্য্যে মহাশয়ের পুত্রের বিবাহে অভিমত নাই। বিশেষতঃ বাবাজীউ এখন বিদ্যা—রাজপথের একজন পথিক। এখন তাহাকে বিবাহ বন্ধনে স্ত্রীরূপ খোঁটায় বাঁধিয়া দিলে, তাহার গতির সহসা শেষ হইবার খুব সম্ভাবনা। আপত্তিও শুধু সেই আশঙ্কায়।

কথাটা শুনিয়া পশুপতি বিনীতভাবে জানাইল, যে যতদিন বাবাজীউ বিএ পাশ হইতে না পারেন, ততদিন বধূকে ঘরে না আনিলে আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবে না। তবে শুভ কর্ম্মটা আপাততঃ সারিয়া রাখিতে আপত্তি কি?

আপত্তি যে বিশেষ ছিল এমন নহে। কারণ শুনিয়াছি চাটুয্যে মহাশয় ত একটী সুন্দরী পাত্রীর সন্ধানও লইতেছিলেন। উঠিবার সময় পশুপতি এইটুকু জানিতে পারিলেন যে, যে সুধাভাণ্ড ক্ষরিত অমৃত—বিন্দুর আশায় তিনি এবং চতুর্দ্দশ পুরুষ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া আছেন, তাহার প্রকৃত মালিক মহালক্ষ্মী চাটুর্য্যে মহাশয়ের অন্তঃপুরে বিরাজ করিতেছেন। চাটুর্য্যেরূপী যাহাকে বহির্ব্বাটীতে দেখিলেন তিনি ঐরাবত বা উচ্চৈশ্রবা।

বিদ্যুম্মালা বা বিদ্যুল্লতা সংক্ষেপে বিদ্যানি লক্ষণ কাঞ্জারের স্ত্রী। পশুপতির প্রতিবেশী। পাড়াসম্বাদে গৌরীর পিশী। গৌরীকে সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। তাহাকে দিয়া পশুপতি তার পর দিন সেই লক্ষ্মীর নিকট দরখাস্ত পেশ করিলেন। সে একখানা ফর্দ্দ লইয়া ফিরিল। সেটা সেই সুধাবিন্দুর মূল্যের হিসাব।

হিসাবটা হাতে লইয়া পশুপতির চক্ষু স্থির হইল। তিন ছিলাম তামাক পুড়িয়া গেল কিন্তু হিসাবটা রীতিমত আয়ত্ত হইল না। গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন "অন্যত্র চেষ্টা দেখি। এ বরের আশা ছাড়িয়া দাও।"

ফর্দ্দ শুনিয়া গৃহিণীও মাথায় হাত দিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ বলিলেন "জন্মের মধ্যে এইত একটী কর্ম্ম। আর ছেলে মেয়েও নাই। বিশেষতঃ সব দিকে ভাল এমন পাত্র আর সহজে মিলিবে না। চেষ্টার ত আর ক্রটি হয় নাই। তুমি এইখানেই গৌরীর বিয়ে দাও। শ্বাশুড়ী ননদ সব আছে; মেয়ে সুখে থাকবে। আর বাড়ীর কাছে, দুবেলা খবর পাওয়া যাবে।

পশুপতি চুপ করিয়া সব শুনিয়া বলিলেন "ফর্দ্দের অত টাকা মিলিবে কোথা?"

গৃ। গড়ের কাছে নলপুকুরের ধারে যে বড় ফলের বাগান আছে সেইখানা বাঁধা দাও। কনি কটা বেচে ফেল। আর আমার হাতের নোয়া অক্ষয় হয়ে থাকুক। আমার যে কখানা গহনা আছে তাই দিও।

প। ভরসা ত ঐ বাগান আর কনি-কটা। যে দুচারঘর প্রজা আছে, আমরা খাই ভাঁড়ে জল ত তারা খায় ঘাটে। তার পর! পেট দু'টা ত আর বেহাই টাকার সঙ্গে লইবেন না।

গৃহিণী। মেয়ের ভালত আগে চাই। আমাদের কথা পরে। আর ভাবনাইবা কি? বাগানখানা যেমন প্রজাবিলি আছে তেমনি থাক। যে টাকা পাও তাই থেকে মাসে মাসে সুদটা ফেলে দিও। বাকী যা থাকিবে তাইতে শাক ভাতও চলিবে। তবেই ঢের। কোলেত আর কচি কাছা নাই, যে তার ভাবনা ভাবিতে হইবে।

অগত্যা কর্ত্তাও সেইরূপ বুঝিলেন—অন্ততঃ বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু খুব বেশী করিয়া ধরিয়া একটা কাল্পনিক হিসাব করিয়া দেখিলেন যে তাহাতেও সব টাকা কুলায় না। কিন্তু তখন অন্য আর কোন কথা না কহিয়া বিদ্যুনির মুখে বলিয়া পাঠাইলেন ফর্দ্দের সব টাকা দিব।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ রামনিধি চাটুর্য্যে কন্যা দেখিতে আসিবেন। কন্যা দেখা, আশীর্ব্বাদ এক সঙ্গেই হইবে। তিনি সংসার-অভিজ্ঞ লোক। পছন্দ অপছন্দ অত বুঝেন না। ফর্দ্দের টাকা মিলিলেই হইল। সে অঙ্গীকারও পাইয়াছেন।

পশুপতির আশা, উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিন বুকের ভিতর দুর দুর করিতেছিল। ভাবী বেহাইকে ভালরূপ আদর অভ্যর্থনার যাহাতে কোন ত্রুটী না হয় এই ভয়েই বেচারা সারা হইয়া যাইতেছিল। নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জাল ফেলিয়া কনি হইতে ভাল মাছ ধরা হইয়াছে। গোয়ালাবাড়ী দই ক্ষীরের ফরমাস গিয়াছে। ফলের বাগানে যে কটা উৎকৃষ্ট ফলের গাছ, তাহারই ফল পাড়া হইয়াছে। শুধু গৃহদেবতা নারায়ণ আর গৌরীর সে ফল ইজারা করা। কর্ত্তা গৃহিণী কখন তাহা মুখে পর্য্যন্ত দেন নাই। আর সেদিনকার তামাকের কথাটা খুব মনে ছিল। বেচারামকে চাকরীর বরাতে প্রতিদিন কলিকাতায় যাওয়া আসা করিতে হয়। তাহাকে দিয়া পূর্ব্বদিন কলিকাতা হইতে খুব উৎকৃষ্ট তামাক আনাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সব যোগাড় করিতে প্রায় আড়াই প্রহর বাজিয়া যায়। তখন তাড়াতাড়ী পুকুরে একটা ডুব দিয়া পশুপতির দুটী ভাত মুখে দিবার একটু অবসর ঘটে।

গৃহিণীও কর্ত্তার অপেক্ষা কম ব্যস্ত নহেন। তিনিও সকাল সকাল গৌরীকে দুটী ভাত খাওয়াইয়া, আপনি ও শুধু দুটী মুখে গুঁজিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়াছেন।

রন্ধনশাস্ত্রে তাঁহার এতদিনের অভিজ্ঞতার যেন আজ একটা মহা পরীক্ষা হইবে। আর এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর যেন একটা মস্ত লাভ লোকসান নির্ভর করিতেছে। নইলে এত যত্ন, এত পরিশ্রম সব মিথ্যা। বিদ্যুন্মালা ও সকাল হইতে হাঁমরাও হইয়া রহিয়াছে। বাটনাবাটা কুটনাকোটা, দৌড়-ঝাঁপের সব কাযের ভার সে আপনার ঘাড়ে লইয়াছে।

ক্রমে পুরোহিত সঙ্গে করিয়া চাটুর্য্যে মহাশয় আসিয়া দেখা দিলেন। কিরূপে অভ্যর্থনা করিলে যথেষ্ট শীলতা, নম্রতা, ও সৌজন্য প্রকাশ প্রায় পশুপতি প্রায় ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া আপনার সহিত সে সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিচার করিয়াছিল। অনেকগুলা ভাল ভাল কথা ও জিহ্বাগ্রে জড় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন চাটুয্যে মহাশয় তাঁহার ভুঁড়ি, রেলির থান, গরদের চায়না কোট, আর মোটা ঘড়ির চেন লইয়া হাজির হইলেন এবং উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষার যাতনা—শ্লিষ্ট ঘোষাল ঠাকুরকে দেখিয়া কাঁচাপাকা গোঁফের পাশ হইতে খুব গম্ভীর স্বরে বলিলেন "নমস্কার ঘোষাল মহাশয়" তখন ঘোষাল ঠাকুর একটা বড় রকম ঢোক গিলিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অত যত্নে সংগৃহীত "ভাল" কথাগুলা, সহসা ধাক্কা পাইয়া, মসৃণ জিহ্বার উপর গড়াইতে গড়াইতে কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। পশুপতি যখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাদের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে গেলেন, তখন তাহারা নাগালের অনেক বাহিরে। পশুপতির ইচ্ছা ছিল সৌজন্যের একটা রীতিমত অভিনয় করিয়া ভাবী বেহাইকে আপ্যায়িত করে। কিন্তু শেষে। "আজ্ঞা হাঁ" "পরম সৌভাগ্য" মহাশয়ের পদধূলি" ইত্যাদি ভগ্নপদ, ন্যুব্জদেহ দু একজন মাত্র অনেক সাধনার পর জিহ্বামঞ্চে দেখা দিয়া কতকটা মান রাখিল। অভিনয়ের সেটুকু অঙ্গহানি হইয়াছিল অতিরিক্ত মাত্রায় হাত কচলাইয়া পশুপতি সেটুকু সারিবার চেষ্টায় ছিলেন।

তারপর মেয়ে দেখা। বিদ্যুনি পিশির হেফাজোতে থাকিয়া গৌরী জড় সড় হইয়া কনে-দেখা দিতে আসিল। তাহাও অনেক কষ্টে। বাড়ীর ভিতর মার অনেকগুলা বকুনি খাইয়া। শেষে দুচারিবার পিশির অঙ্গুলির গুপ্ত প্ররোচনার পর, গৌরা থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ী ভাবী শ্বশুরের পায়ের কাছে একটা ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া ফেলিল।

চাটুর্য্যে মহাশয় হাসিলেন। বলিলেন "মুখখানা একবার তোল ত মা।"

এইবার পশুপতি হরি স্মরণ করিলেন।

গৌরী কাল। স্পষ্ট কাল। পাড়ার সকল মেয়ের চেয়ে কাল। অত কাল মেয়েকে সাধ করিয়া কে ঘরের বৌ করিবে। কিন্তু হরি বুঝি শুনিলেন। যখন গৌরী তাহার সেই ঝুমুর ঝুমুর চুল-ঘেরা, পুরন্ত, নিটোল পানপানা মুখখান তুলিয়া, সলজ্জ ছলছলে চোক মেলিয়া একবার ভাবী শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল, তখন বুড়োর মনে হইল, অনেক মেয়ে দেখিয়াছি, অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছি—কিন্তু কালরঙ্গে এমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে ত দেখি নাই। হোগ কাল, এই মেয়েটীকেই বৌ করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে হইবে। এতটা মনে

হইল বটে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া পশুপতিকে বলিতে পারিলেন না, যে আমার ছেলে তোমাকে দিতেছি, শুধু তোমার মেয়েটী আমাকে দাও। অন্য দেনাপাওনায় আর কায নাই।

যাহা হউক, কাল মেয়ে পছন্দ হইল। আশীর্ব্বাদও হইয়া গেল। পশুপতি স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন।

আহারের পর ঘরে ফিরিবার পূর্ব্বে যখন চা র্য্যে মহাশয় ধীর ভাবে তামাক টানিতেছিলেন, তখন পশুপতি কাছে গিয়া বসিলেন। কথা অনেক হইতে লাগিল; কিন্তু একটা কথা তাঁহার গলায় কাঁটার মত বিধিয়াছিল। ঢোক গিলিয়া তাহা চাপিবার যো নাই। সেটা বলিতেই হইবে। না বলিলে সোয়াস্তি নাই। শেষ যখন তামাক পুড়িয়া গেল—চাটুর্য্যে মহাশয় উঠিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন পশুপতি হঠাৎ হাত দিয়া তাঁহার পা দুটা চাপিয়া ধরিল। সাহস করিয়া, মুখ ফুটিয়া বলিল "বেহাই মহাশয়! আমাকে মাপ করিতে হইবে। আমার সর্ব্বস্ব দিয়াছি, তবু সব টাকার কিনারা করিতে পারি নাই। দয়া করিয়া শুধু তিন শত টাকা ছাড়িয়া দিতে হইবে। আপনি বড় লোক। আপনার সংসারের অর্দ্ধেক মাসের খরচ উহা অপেক্ষা অধিক।

কথাটা শুনিয়া রামনিধি চাটুর্য্যের সহসা মুখখানা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বে কথাটা জানাইলে ভাল হইত। তাহা হইলে অন্য ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। এখন সময় বড় অল্প। ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা ঠিক উত্তর দিবার অবকাশ নাই।"

পশুপতি পা ছাড়িয়া দিয়া চুপকরিয়া সব শুনিল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বিবাহের এখনও দেরী আছে। আপনি একবার ভাবিয়া দেখিবেন। তার পর যাহা ভাল হয় করিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যখন বিদ্যান বাড়ীর ভিতর খবর দিল, কাল গৌরীকে শ্বশুরের মনে ধরিয়াছে তখন গৃহিণী একেবারে আহ্লাদে কাঁদ কাঁদ হইয়া পড়িল। শুধু তাই নয়। আজ আনন্দেব উপর আনন্দ। আহারে বসিয়া বেহাই ব্যঞ্জনের বড় সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। সে কথাগুলা গৃহিণীর গলা হইতে বুকের কাছে সড় সড় করিয়া বেড়াইতে ছিল। দু দশজনের কাছে সে গল্প না করিলে আর রাত্রিতে ঘুম হইবে না। কিন্তু এখন দু দশজন শ্রোতাই বা কোথায় মিলে। একশ্রোতা বিদ্যান। কিন্তু সে খোদ বেহাইএর মুখ হইতে তাহা মৌলিক অবস্থায় শুনিয়াছে। তবু তাহাকে ডাকিয়া নূতন করিয়া শুনাইতে হইবে। তাই ভাষার একটু পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহিণী বলিতে ছিলেন "দেখ্ বিদ্যে ঠাকুরজী! আমার সত্য ভাই বড় ভয় হয়েছিল। ভেবেছিলাম, হয় ত বেহাই খাবার দাবার একটু মুখেও করিতে পারিবেন না। কৈ তোর দাদাকে কখন কোনদিন কোন রান্না ভাল বলিতে শুনি নাই।'

বিদ্যানি হাসিয়া বলিল "দেখিস বউ দাদাকে পথে বসাসনে। আজ রান্না খাওয়াইয়া বেহাইকে যে রকম গুণ

করেছিল, ভয় হয় কোন দিন না বেহাই তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে, হেঁসেলে কয়েদ করে রাখে।”

পশুপতি বাড়ীব ভিতরে আসিয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন “আমাকে না শেষ এক মেয়েব বিয়ের দায়ে কযেদ হ'তে হয়। চুরী ভিন্ন ত আর অন্য উপায় দেখি না।”

যখন মোট কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিলেন তখন গৃহিণীর অত আনন্দ সছিদ্র বেলুনেব বাষ্পের ন্যায় নিমেষ মধ্যে বাহিব হইযা গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাও যেন কেমন চুপসিয়া গেল। বিদ্যানিও কথাটা শুনিযা লইল।

সে দিন ঘবে ফিবিযা যাইবার সময় শুধু সে বলিয়া গেল—“যখন ভগবান এতদূর মুখ তুলে চেযেছেন, তখন কি আর দু'শ টাকার জন্যে বিয়ে আটকাবে!

* * *

বিদ্যানির স্বামী লক্ষণ কামারের কলিকাতায বড়বাজারে একখানা লোহার দোকান ছিল। তাহার আযও মন্দ ছিল না। সংসাবে সে নিজে, স্ত্রী আর একটী তিন বছরের মেয়ে। যখন একদিন সেই আদরের মেয়ে, বাপ মাব সব মায়া কাটাইয়া, কাহাকে কিছু না বলিয়া চুপী চুপী পলাইয়া গেল, তখন লক্ষণের সংসার একটা মস্ত ভূয়োবাজী বলিয়া বোধহইল। তার এক মাস পরেই দোকান উঠাইয়া দিল। জিনিষ পত্র বেচিয়া ফেলিল। ইচ্ছা, যে নগদ টাকা হইবে, তাহা লইয়া স্ত্রীপুরুষে কাশী বাস করিবে। কিন্তু সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই মেয়ে বাপকে ডাকিয়া লইল। তখন বিদ্যান সংসারে বড় একা হইয়া পড়িল। ভাবিল, অদৃষ্টে ত সব সুখই হইল, এখন দিনকতক তীর্থ ধর্ম্ম করি। তারপর কপালে যাহা থাকে! যাইবার প্রায় সব ঠিক। এমন সময় কোথা হইতে গৌরী আসিয়া তাহার ছোট ছোট হাত দিয়া পথ আগুলিযা দাঁড়াইল। বিদ্যান্ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুকে তুলিযা লইল। মুখে চুমো খাইয়া ভাবিল “কোন্ চুলোয় আর তীর্থ করিতে যাইব!”

সংসাবেব ভাবনা বড় ভাবিতে হইল না। স্বামী যাহা রাখিয়া গিয়াছিল তাহার কতক টাকা কোম্পানিতে জমা দিল, কতক সুদে খাটাইল। আর কতক টাকা কাছে রাখিল—শুধু নাড়িবার চাড়িবার, গণিবার, দেখিবার জন্য। দুদিক দিযা মাসে মাসে সুদ আসে, সংসাবও দুবেলা বেশ চলে—তবু হাতের কাছে কিছু টাকা না থাকিলে বোধ হয় কিছুই নাই।

তার পরদিন বিদ্যানি নগদ দু'শ টাকা লইযা পশুপতির হাতে দিয়া বলিল “দাদা! পাড়ায় বড় চোরের দৌরাত্ম্য হইয়াছে। আর আমার ঘরের সিন্দুক বাক্স ভাঙা; কোন দিন চোরে সর্ব্বস্ব লইযা যাইবে। তুমি টাকাগুলা রাখিয়া দাও। যখন চাইব—দিও।”

পশুপতি আসল কথাটা বুঝিলেন। একটা বড় কষ্টের হাসি হাসিয়া বলিলেন “বিদ্যান! তোর টাকা ফিরাইয়া লইয়া যা। আইবুড় মেয়ের বাপ একজন মস্ত চোর।”

বি। তোমার ঘোরফের অত কথা আমি বুঝি না। চাই বজায় থাক, চাই খোয়া যাক, আমি টাকা ফিরাইয়া লইব না।

পশু। শোন্ বিদ্যুন! আমার কথা শোন্! তোর ঐ টাকা বিধবার সম্বল। আমি উহাতে হাত দিয়া কি শেষে মহা পাতকের ভাগী হইব।

বিদ্যুনি এইবার বড় রাগ করিল। বলিল "বাপ মায়ের বুকের রক্তের টাকায় কেনা বাগান, বাড়া বেচিবার সময় মহা-পাতক হয় না?"

পশুপতির চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। শেষ গদগদ স্বরে বলিল "মহাপাতক ত হইয়াছেই। যে দিন মেয়ের বাপ হইয়াছি সেই দিন হইতেই নরকের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। এখন আর নূতন পাপ চাপাইয়া কেন বোঝা ভারী করি।'

গৌরীর মা স্বামীর কাছেই বসিয়া-ছিল। বিদ্যুন প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া তাহাকে বলিল "প্রসব করিলেই মা হয় না। তুমি ত পেট হইতে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলে। তার পর এত দিন খাওয়াইয়া, পরাইয়া, মাথাইয়া, মুছাইয়া গৌরীকে কে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে? ও ত আমারই মেয়ে। আমার মেয়ের বিয়েতে যদি আমি টাকা খরচ করি, তোমরা বারণ করিবার কে?"

আর তর্ক চলে না। পশুপতিকে সেঁ দিন হার মানিতে হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তার পর একদিন সকাল হইতে দেউড়ীর কাছে ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া সানাইওয়ালারা আসর জাঁকাইয়া বসিল। পাল-ঢাকা হইয়া বাড়ী মেঘলা মেঘলা দেখাইতে লাগিল। পশুপতির গ্রামস্থ দু'পাঁচজন খুব ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধব ও ভিন্ন গ্রামস্থ আত্মীয় কুটুম্ব ভিয়ানের বামুনের সঙ্গে বাড়ীতে আসিয়া, সকালে আহার, দুপুরে চণ্ডিমণ্ডপে শয়ন ও নিদ্রা, এবং বৈকাল হইতে কায়মনে যত না হউক এক বাক্যে দুয়ের সমস্ত অভাব সংশো-ধন করিয়া লইয়া, পশুপতির সাধ্য-মত উপকার করিতে লাগিলেন। বাটীর ভিতর ও বাক্যের যে খুব অভাব ছিল তাহা নহে। পশুপতির নিমন্ত্রিতা আত্মীয়া কুটুম্বিনীদের মধ্যে যাঁহারা প্রৌঢ়া ও পশুপতিকে নিতান্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন তাঁহারা অপর্য্যাপ্ত পরি-মাণে ঐ দ্রব্যটা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ছিলেন এবং আজ মমতা বশে মুক্তহস্তে উহা খয়রাত করিতে ছিলেন। তবে কায়মনের যদি কোথাও কিছু অভাব থাকে, একা বিদ্যুন্মালা তাহা সারিয়া লইয়া ছিল। সে আজ একাই এক সহস্র—আজ গৌরীর বিয়ে। সে বিদ্যু-তেরই মত ছুটিয়া বেড়াইতে ছিল। রসুই বামুন বলিল "লুচি বেলিবার তেল ফুরা-ইয়াছে" বিদ্যুনি আপনি কলুর বাড়ী ছুটিল। যেখানে মাছ কুটা হইতেছে বিদ্যুন সেইখানে গিয়া দাড়াইল। দেখিল পার্ব্বতী চক্রবর্ত্তীর বড় মেয়ে পান্না একটা বড় মাছ লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যুন তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আপনি মাছটা কাড়িয়া লইয়া কুটিতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিল "তোর বাছা! এ গেরো কেন? তুই পান সাজগে যা। গলির পথে কুলুঙ্গিতে খোল আছে, হাতটা ভাল করে ধুয়ে যাস্।" দেখিতে দেখিতে এক রাশ মাছ কুটিয়া দিয়া, যেখানে পান সাজা হইতেছে একবার

সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল অঙ্গুলি ও জিহ্বার কাজ সমান ভাবে চলিতেছে। মরুক! তত দোষের কিছু নাই। তবে এক স্থানে একটা কাজ বড় অসঙ্গত ঠেকিল। মাঝের ঘরের এক কোণে মাদুরের উপর তাস চলিতেছিল। খেলুড়ে চারিজনই পাড়ার মেয়ে। খেলা খুব জমিয়া গিয়াছে। বনমালি মিত্রের ভাইঝি বড়পুঁটী একখানা ছকা ও চারখানা কাগজ হারিয়াছে। এবার খেলা সামলাইতে না পারিলে পঞ্জা হারিতে হইবে। কাজেই খুব সমজাইয়া খেলিতে হইবে। পাশে দশমাসের শিশু উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল। অবশ্য তার একটা বিশেষ কিছু অভাব হইয়াছিল। কিন্তু খেলার পড়তা আর শিশুর অভাব একসঙ্গে কিছু সাম্‌লান যায় না। কাজেই বড়পুঁটী খেলাটাই ভাল ক'রে সাম্‌লাইতেছিল। তবু অন্যমনস্কে মুখে এক একবার বলিতেছিল "লক্ষ্মী চাঁদ আমার যাদু আমার, একটু থাম—এইবার তোমাকে কোলে নিচ্চি।" কিন্তু লক্ষ্মী ছেলেটী যখন কিছুতেই বুঝিল না যে তাহার আপাততঃ স্বরসংযম করা বিশেষ আবশ্যক, নতুবা মাতার চিত্ত-বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা এবং তৎফলস্বরূপ খেলায় পরাজিত হইয়া পুত্রশোকেরও অধিক শোক পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা—তখন মাতা পুত্রের বোধহীনতার পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইলেন এবং সুবুদ্ধি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে মাতৃ কুলের চিরাভ্যস্ত প্রথা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু ঔষধে রোগ বাড়িয়া উঠিল। বিব্রত ও নিরুপায় মাতা যখন ঔষধের মাত্রা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন তখন বিদ্যুৎ সেই খানে গিয়া পেঁছিল। কাণ্ডটা দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল "মর অভাগীরা! গিলবেন, কুটবেন, আর কাযের সঙ্গে খোজ নাই। কাণের কাছে ছেলেটা ডা পিট্‌ছে, সে খেয়ালই নেই। বাছা ক্ষিদেয সাবা হয়ে গেল ওঁর এখন খেলাই বড় হ'ল।" বকিতে বকিতে শিশুকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহাব অশ্রু, লালা, কজ্জল রঞ্জিত মুখ মুছাইযা দিল। আপনি উদ্যোগ করিয়া ভুলাইয়া একবাটী দুধ খাওয়াইয়া শেষে মার কোলে দিযা বলিল "এখন নে তোব ছেলে ধর, আমার হাতে ঢের কায আছে।" বাড়ীব খিড়কির পুকুর পাড়ে যেখানে দইমাখা কলাপাত আর ভাঙা ভাঁড় খুবিব চারিপাশে কুকুরের দল সভা করিয়া বসিয়াছিল সেইখানে, ছেঁড়া, মলিন কাপড়-পরা একজন ভিখারিণী চিবদারিদ্র্যের পরিচয় স্বরূপ, আপনারই অনুরূপ একটী শিশু কোলে করিয়া বসিয়াছিল। আর মাঝে মাঝে খিড়কীব পাশ হইতে বাড়ীর ভিতর যেখানে রোযাকের উপর বসিয়া নিমন্ত্রিতারা খাইতেছিল, সেইদিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। হঠাৎ বিদ্যুতের সেই দিকে নজর পড়িল। একেবারে তার কাছে গিয়া বলিল "তুই মাগী এখানে বসে কি কচ্চিস? খাওয়া দেখ্‌লে কি তোর পেট ভরবে? আমি ত লক্ষবার এই থান দিয়ে আনা গোনা কচ্চি। আমাকে একবার ডেকে বলতে কি বাক্‌রোধ হয়েছিল? আয়! উঠে আয়!" তখন গলির পথে একপাশে তার জন্য পাত পড়িল। যে পরিবেশন

করিতেছিল তাহাকে বিদ্যুন গিয়া বলিল "বেনারসী সাড়ীআঁটা গয়নাপরাদের কাছে কেবল ভাতের থালা নিয়ে ঘুরে ম'চ্চ কেন? ঐ গলির ভিতর টেণী পরা একজন আছে, ঐ দিকে একবাব যাও।"

গৌরী একখানা রাঙ্গা গুলবাহার ঢাকাই শাড়ী পরিয়া, কপালে চন্দনের টিপ কাটিয়া, খোঁপায় রূপার কাজলনাতা গুঁজিয়া, আলতা, আর ঘুমুর দেওয়া মলে পা দুখানি ঢাকিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিল। আজ যেন কেমন একটু চুপচাপ। শ্বশুরবাড়ী গিয়া যে গাম্ভীর্য্য, যে সংযম শিখিতে হইবে, আজ বুঝি ঘরে তাহার হাতেখড়ি। বাড়ীতে আজ খাওয়া দাও-য়ার এত ঘটা—জিনিষ পত্রের এত ছড়াছড়ি। গৌরীর কিন্তু আজ কোন জিনিষে অধিকাব নাই—আজ তার উপোষ। অন্য দিন হইলে এতক্ষণ খাবার বায়নায় মাকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত।

বাড়ীর ভিতরে এত গোল—বাহিরে আরও বেশী। গৌরীর এক একবার মনে হইতেছিল, বিদ্যুনি পিশির মুখে যে সকল রূপকথা শুনিয়াছিল, আজ যেন সেই রকম একটা কি কাণ্ড তাহাদেব বাড়ীতে ঘটিবে: আর সে যেন নিজে সেই ঘটনার সঙ্গে সকলের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত। নহিলে যে বাড়ীতে আসিতেছে সেই কেন একবার তাহাকে দেখিতে চায়। কেন বাপু! তারা কি গৌরীকে কখন দেখে নি? তবে আজ কেন আবার এমন নূতন করিয়া দেখিতে চায়? আর বিদ্যুনি পিশি, হাজার কাজের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে ছুটিয়া আসিয়া গৌরীর মুখখানি তুলিয়া দেখিতেছে আর বলিতেছে "দেখিস মা! পরের ঘরে গিয়ে পিশিকে একেবারে ভুলে যাস্‌নি।" গলার আওয়াজটা কেমন ধরা ধরা না? কিন্তু খানিক আগে নফরা জেলেকে বকিবার সময় ত স্বরের খুব জোর ছিল।

আর একজন – শুধু আজ নয়—আজ ক'দিন গৌরীর সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে হরগোবিন্দের মেজ মেয়ে সুশীলা। গৌরীর বিয়ে—কাযেই সে কেমন করে ঘরে থাকে। বিয়ের পাঁচদিন আগে হ'তে সে গৌরীদের বাড়ীতে বাস বাঁধিয়াছে। সুপারিকাটা, বড়ি দেওয়া, ডালঝাড়া, চালকাঁড়া, সব কাযেই আজ ক'দিন বাড়ীর অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সমান অংশ লইয়াছে। গায়েহলুদের দিন সকাল হ'তে শাঁকটা একচেটে কবিয়া লইয়াছে। কদিন ধবিযা তাহার উপব এত জুলুম হইতেছে যে সে বেচারা ভাবিতেছে হায়! কেন সমুদ্র-স্বদেশ ছাড়িয়া দুখানি কচি পাতলা ঠোঁটের লোভে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছি। বড় ভুল করিয়াছি—কিন্তু আর উপায় নাই। মরিয়াছি যে—নহিলে ফিরিতাম।

গৌরীর বিয়ে—এত আহ্লাদ। তবু বোধ হইতেছে, যেন আহ্লাদের তলায় একটা লুকান অসোয়াস্তি রহিয়াছে। সুশীলার বোধ হইতেছে যেন আজ রাত্রে কোন দেশ হইতে বাজনাবাদ্যি করিয়া কাহারা আসিয়া গৌরীকে ডাকাতি করিয়া লইয়া যাইবে। যদি তারা আর কখন না পাঠায়! গৌরী আসিতে পাবেনা—শুধু বসে বসে কাঁদবে! বাপের জন্যে, মার জন্যে, বিদ্যুনি পিশির জন্যে—আর—আর কার জন্যে? আর এখানে কি কেউ তার জন্যে কাঁদবেনা?

যদি না পাঠায় সেই বড় ভয়। তবে এবাড়ীতে সুশী আর কেমন করে পা বাড়াবে। দুপুর বেলা মাসীমা ঘুমাইলে কার সঙ্গে আর খিড়কীর বাগানে আঁকুসী দিয়া গাছ ঠেঙ্গাইয়া জামরুল পাড়বে—শেষে ভাগ করিবার সময়, একটা বাডুড়ে খেকো, আধপচা জামরুল লইয়া, এক কাঠা জমী লইয়া বাঙ্গালার দুই দুর্দ্দান্ত জমীদারের ন্যায়, বা আবহাত সরু একটা নর্দ্দমা লইয়া কলিকাতার সমাজের শীর্ষ স্থানীয়, সুনীতির প্রতিপালক, গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উচ্চ উপাধী ভূষিত দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড ফৌজদারী মামলা বাধাইবে। আঁচলে মুড়ি লইয়া, সানের ঘাটের পুকুরের রানায় বসিয়া, যখন মাছেদের মুড়ি খাওয়াইবে, তখন কে তাহার পাশে বসিয়া মজা দেখিবে। আবার মানুষের মত বুদ্ধিমান, একটা বলবান বড় মাছ যখন অন্য ক্ষুদ্র ক্ষীণকায় প্রতিবাসীদের ঠেলিয়া ফেলিয়া, সবলে অগ্রসর হইয়া তাহাদের প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার গ্রাস করিয়া গৌরবে ন্যাজ আছড়াইতে আছড়াইতে ফিরিয়া যাইবে, তখন কে তাহার গলা জড়াইয়া হাসিয়া খুন হইবে। আর সেই চিলের ছাতের ঘরে বসিয়া, হাঁড়ী-হইতে কুলচুর, কাসুন্দি চুরি করিয়া খাইবার সময় "ম সীমার চেয়ে বেনা নাপতের খুড়ী ভাল কাসুন্দি কর্ত্তে পারে" এই কথা লইয়া কার সঙ্গে প্রায় ২।৩ ঘণ্টাস্থায়ী একটা মহা কলহের সৃষ্টি করিবে? যদি গে বীকে না পাঠায়! তবে কি হইবে! তবে সুশী বাঁচে কি করিয়া! তবে—প্রভাতগুলা কত শুষ্ক, নীরস—রৌদ্রতপ্ত বিজন মধ্যাহ্ন গুলা কত কর্ম্মহীন, অর্থহীন—সন্ধ্যাগুলা কত বিষণ্ণ অশ্রুময়—আর নিদ্রাহীন রাত্রিগুলা কত দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাময়ী হইয়া দাঁড়াইবে। তবে আর কি রহিল—যদি গৌরী চলিয়া যায়—তবে এতবড় গ্রাম খানায় সুখের আর কি রহিল! তাই আজ সুশীলা ক'দিন গৌরীর পাছু পাছু ফিরিতেছে। প্রাণ পণে কাছ ছাড়া হইতে চায় না।

ক্রমশঃ—

শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত।

সাংখ্যস্বরলিপি।

১ম খণ্ড ৭৪৮ পৃষ্ঠার পর।

অলঙ্কারচিহ্ন।

স্বরযোগ।

স্বরের পর স্বর গাহিতে বা বাজাইতে গেলে তাহাদিগের মধ্যে যে একটী স্বাভাবিক যোগ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই স্বরযোগ। এই স্বাভাবিক স্বরযোগ-অলঙ্কার হইতেই আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের অলঙ্কারসমূহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই স্বাভাবিক স্বরযোগের জ্ঞাপকচিহ্নস্বরূপে যোগচিহ্ন অথবা "কমা" (,) বা ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হইবে। কিম্বা ঐ সকল চিহ্ন ব্যবহার না করিয়া পরে পরে কিঞ্চিৎ ব্যবধান রাখিয়া স্বরগুলি লিখিয়া গেলেও চলিবে। যথা, সা – রে – মা = সা, রে, মা = সা রে মা।

এই স্বাভাবিক স্বরযোগই স্বরের সাধারণ যোগ। ইহাকে ছেদযোগ বা সংক্ষেপে গৌণত স্বর বিযোগও বলিতে পারা যায়। কিন্তু স্বরের বিশেষ যোগকে ছেদহীন যোগ অর্থাৎ শুদ্ধ যোগ কহা যায়। এই যোগে, যোগের ছেদ শনির উপর একটি রেখা অশনির সমান পড়িয়া সেই ছেদ টুকুকে ছিন্ন করে বলিয়া তাহার চিহ্ন (+); এই চিহ্নকে সংস্কৃত ভাষায় বজ্রচিহ্ন নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে। এই শুদ্ধ যোগেই স্বরের টানের উৎপত্তি হয়।

স্বরের টান।

যতমাত্রা পর্য্যন্ত কোন স্বরের টান চলিবে তত মাত্রা পর্য্যন্ত সেই স্বরের অক্ষরের মাথা হইতে একটী কসি টানিয়া যাইতেঃ হইবে। যথা,। সা + ১ + ১ + ১ = সা + ৩। বলা বাহুল্য যে সা স্বরের একমাত্রাও রক্ষিত হইবে এবং তৎসঙ্গে তিনমাত্রা টান চলিবে অর্থাৎ সা স্বরটী একটানে চারিমাত্রা কাল গাহিতে হইবে। স্বরের টান গুণিতমাত্রার দ্বারাই ব্যক্ত হইতে পারে, তথাপি প্রয়োজনবশতঃ স্বরের টানের স্বতন্ত্র চিহ্নও করা গেল। যথা। $\overline{\text{সা + ১ + ১ + ১}}$ = $\overline{\text{সা + ৩}}$। = ৪সা = সা + সা + সা + সা। *

আশ।

গানের কথার একটী অক্ষরে স্বর হইতে স্বরে গমনকে আশ কহে। আশ বুঝাইবার জন্য স্বরগুলির মধ্যে মধ্যে এক একটী করিয়া আকার কসি অথবা সমতান ভাবে স্থাপিত আকার (—) টানিতে হইবে।

যদি একটী স্বরও দুই বা ততোধিকবার একটী অক্ষরে উচ্চারিত হয় তাহা হইলেও স্বরগুলির মধ্যে আশচিহ্ন লিখিতে হইবে।

মীড়।

অতি ঘন সংলগ্ন আশকে মীড় কহে। মীড়ে স্বরের হিঁচড়ান ভাব প্রকাশ পায়।

* গুণিতমাত্রার শেষ অংশটুকু দেখ।

মীড় বুঝাইবার জন্য আশযুক্ত সুরগুলির উপরে একটী রেখা টানিয়া যাইতে হইবে।

এক জাতীয় সুরের মধ্যে মীড় হইতে পারে না।

গমক।†

সুরের ধীর কম্পনকে গমক বলে। ইহাতে প্রত্যেক সুর কম্পিত এবং প্রস্বনিত হয়। গমকের চিহ্ন = ং। যে যে সুর গমকযুক্ত হইবে সেই সেই সুর অনুস্বার সমেত করিয়া লিখিতে হইবে। যথা সাং। গানের কথার একটী অক্ষরে যদি কোন সুর দুই বা ততোধিকবার সগমক উচ্চারিত হয় তাহা হইলে সেই সগমক সুরগুলির মধ্যে মধ্যে আশ-চিহ্ন দেওয়া যাইবে।

সুরের ঝোক।

যে যে সুরে ঝোঁক পড়িবে সেই সেই সুরের উপর ছোট ছোট দাঁড়ি পড়িবে। যথা

। । । ।

সা রে গা মা।

গিট্‌কিরি।

আশ সহকারে সুর হইতে দ্রুত গমনকে গিট্‌কিরি কহে। গিট্‌কিরির চিহ্ন = সুরের মাথায় ঋফলা যতদূর গিট্‌কিরি চলিবে ততদূর ঋফলা হইতে ফুটকি দিয়া যাইতে হইবে। যথা

ৃ . . . .

ধা—ধা—পা—মা—পা ;

কে — — — —

অথবা ঋফলাকে যদৃচ্ছা অবস্থানে অবস্থিত করিয়া সারি সারি সাজাইয়া রাখিতেও পারা যায় অর্থাৎ ঋফলার ফাঁকের দিক বা মুখের দিকটা উপরে কিম্বা নিম্নে বা পার্শ্বে যেরূপভাবে ইচ্ছা রক্ষা পূর্ব্বক সারি সারি সাজাইয়া লিখিতে পারা যায় অথবা সারি সারির পরিবর্ত্তে যেরূপ অবস্থানে হউক ঋফলাটী একবার লিখিয়া তাহার পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ফুট্‌কি-রাশি গিট্‌কিরির গতি পর্য্যন্ত বসাইয়া যাইতেও পারা যায়।

গিট্‌কিরি অতি দ্রুত হইলে সুরের মাথায় দীর্ঘঋ ফলা বসিবে ; সেই অতি-দ্রুত গিট্‌কিরিটীও যতদূর চলিবে ততদূর দীর্ঘ ঋফলা হইতে ফুটকি দিয়া যাইতে হইবে। এবং তাহার অন্যান্য সজ্জাতেও গিট্‌কিরির নিয়ম খাটিবে।

স্বরমিশ্র (Harmony)

স্বরগুণন।

আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতের দিকেও লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। দুএকটি ইংরাজী গৎ আজকাল অনেকেরই মুখে প্রায় শোনা যায়। যদিও আমাদের দেশীয় সঙ্গীত ইউরোপীয় সঙ্গীত অপেক্ষা নানাগুণে শ্রেষ্ঠ তথাপি কবি মুরের আইরিষ গান এবং মোজার্ট রসিনি প্রভৃতি জর্ম্মণ ও ইটালীয় স্বর-কবিগণের

---

† বৈদিক শ্লোকে কোন কোন স্থলে অনুস্বারের পরিবর্ত্তে গুম্‌চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। গুম্‌চিহ্নের উচ্চারণ গুম্। এই গুমে আমরা অনেকটা গমকের ভাব পাই এই জন্য গুম চিহ্নটীকেই আমাদের গমকের চিহ্নরূপে ব্যবহার করিবার ইচ্ছা ছিল. কিন্তু ইহা সচরাচর চলিত নয় বলিয়া আমরা সুবিধার্থে গুমের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত অনুস্বারের এবং আরও বিশেষরূপে কার্য্যতঃ বাঙ্গালা অনুস্বারের চিহ্ন সাংখ্য স্বরলিপিতে ব্যবহার করিলাম।

সঙ্গীত যাঁহারা জানেন তাঁহারা ইউরোপীয় সঙ্গীতের মধুরতা অস্বীকার করিতে পারেন না। ইউরোপীয় সঙ্গীত স্বরমিশ্র-প্রধান।

স্বরমিশ্র-প্রধান সঙ্গীতের স্বরগুণই মুখ্য উপাদান। দুই বা ততোধিক স্বরের একস্বরী -রণকে স্বরগুণন কহে। একস্বরীকরণ অর্থাৎ বিভিন্ন স্বরের যুগপৎবাদন, পরে পরে নয়।

স্বরের গুণচিহ্ন = × অথবা . বিন্দু। স্বরগুণনের চিহ্ন স্বর সমূহের মধ্যে মধ্যে স্থাপিত হইবে। যথা, সা × গা × পা অথবা সা. গা পা।

একস্বরীভাবে ক্রীড়িত দুই বা ততোধিক স্বরকে গুণিতস্বর (chord) কহে। যথা সা × গা × পা। এই গুণন চিহ্নযুক্ত তিনটী স্বর একটী গুণিতস্বর। যদি এই গুণিত স্বর দ্বিমাত্রিক হয় তাহা হইলে ২ সা. গা. পা. এইরূপ লিখিতে হইবে। যদি অর্দ্ধমাত্রিক হয় তাহা হইলে ½ সা. গা. পা. অথবা সা গা. পা. অথবা সা. গা. পা ÷ ২ লিখিত হইবে ইত্যাদি।

স্বররাজ্যে গুণন।

বীজগণিতের নিয়মানুসারে যেমন একাধিক বর্ণ এবং বর্ণ ও সংখ্যা অবিচ্ছিন্নভাবে পাশাপাশি থাকিলে তাহারা গুণিত হইয়া যায় সেইরূপ সাংখ্য স্বরলিপির নিয়মানুসারে একাধিক স্বরবর্ণ এবং স্বরবর্ণ ও তাহার সংখ্যা অবিচ্ছিন্নভাবে পাশাপাশি থাকিলে তাহারা গুণিত হইয়া যায়।

স্বরবর্ণ ও তাহার সংখ্যা = স্বরবর্ণ ও তাহার শ্রম বা বিশ্রম নিরূপক কালসংখ্যা।

স্বরযোগ ও স্বরগুণন।

স্বরের আত্যন্তিক যোগভাবই স্বরগুণন। স্বরযোগে স্বরসমূহের মধ্যে ব্যবধান থাকে কিন্তু স্বরগুণনে স্বরগুলির মধ্যে সে প্রকার ব্যবধান থাকে না, বিশেষরূপে অব্যবহিত ভাব ধারণ করে। স্বরগুণনে সুরদিগের আন্তরিক গাঢ় মিলন রাজত্ব করে।

স্বরযোগ প্রধানতঃ প্রাচ্য এবং স্বরগুণন প্রধানতঃ প্রতীচ্য। স্বরযোগ লইয়া প্রাচ্য ভূমির সঙ্গীত রাজ্যে প্রধানতঃ যত কৌশল ও খেলা; এবং স্বরগুণন লইয়া প্রতীচ্য ভূমির সঙ্গীত রাজ্যে প্রধানতঃ যত কৌশল ও খেলা।

স্বরযোগ ও স্বরগুণন ইহাদের পৃথক ভাবে মুখ্যতঃ উন্নতিসাধন করতঃ এবং তাহাদের পরস্পরের সাহায্যে সঙ্গীত রাজ্যে মহোন্নতি সাধন করা যায়।

সাংখ্য স্বরলিপির নিয়মানুসারে স্বরলিপিতে সশ্রম ও সবিশ্রম স্বররাশির—একাধিক স্বরের মধ্যেই যোগ—গুণন ইত্যাদি চলিতে পারে। এই সশ্রম ও সবিশ্রম স্বরসমূহের মধ্যে সশ্রম সুরেরই যোগ—গুণন ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ।

সশ্রমস্বর = কাল বা মাত্রাসহ শ্রমীস্বর। সবিশ্রম স্বর = কাল বা মাত্রাসহ শ্রমহীন নীরব স্বর।

গুণনস্বর ও তাহার নানাবিধসজ্ঞা।

অব্যবহিত ভাবে কতিপয় সুর একত্র বিরাজ করিলে তাহা গুণিত ভাব ধারণ করে। যথা সাগাপা = সা,গা,পা = সা × গা × পা।

সা × গা × পা = × (এরূপ
গা
×
সা

অতিরিক্ত সজ্জাতেও গুণিতস্বর রাখা যাইতে পারে।)

স্ত্রীস্বর ও গুণিতস্বর।

স্ত্রীস্বরের অর্থাৎ প্রকৃত হসন্তমাত্রিক স্বরের বেলায় দুইটী স্বর অব্যবহিত ভাবে বসিলেও প্রকৃতপক্ষে মুখ্য স্বরটীই বিরাজ করে, স্ত্রীস্বরের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না; সেই কারণে—স্বরবর্ণ-হীনতা প্রযুক্ত স্ত্রীস্বরের বেলায় হসন্ত-চিহ্নের বিধি বলীয়ান হয় এবং তাহা গুণিতচিহ্নের প্রভাব নষ্ট করিয়া দেয়।

সিকিমাত্রিক স্বরের বেলায়, তাহাতে হসন্তচিহ্নের অধিকার থাকিলেও তাহা প্রকৃত হসন্তমাত্রিক স্বর নহে বলিয়া স্ত্রী স্বরের উপরোক্ত নিয়মটী তাহাতে খাটিবে না। কারণ সিকিমাত্রিক স্বরের স্বীয় প্রাধান্য আছে, তাহা স্ত্রীস্বরের ন্যায় স্বরবর্ণহীন নয় তবে এই পর্য্যন্ত, তাহার ভাবটা কিয়ৎপরিমাণে স্ত্রীস্বরের ভাবের কাছে পৌঁছে।

স্বরের চারিটী অবস্থা।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী অবস্থার দ্বারা যেমন মানব জীবন সার্থক হয় সেইরূপ স্বরের চারিটী অবস্থা—স্বরযোগ স্বরবিয়োগ, স্বরগুণন স্বর-ভাগ অর্থাৎ স্বরের শুদ্ধযোগ, ছেদযোগ, গুণযোগ, এবং অংশ ও খণ্ডযোগ দ্বারা সঙ্গীত-জীবন সার্থক হয়। স্বরের এই সকল অবস্থা কালের তারতম্যে ঘটে।

স্বরযোগ ও স্বরবিয়োগ।

এই জগৎরাজ্যে অসৎ থাকিলেও যেমন তাহার মধ্যে সত্ই প্রধানতঃ রাজত্ব করে সেইরূপ স্বররাজ্যে—সঙ্গীত রাজ্যে—বিয়োগ থাকিলেও তাহার মধ্যে যোগই মুখ্যত রাজত্ব করে। এইহেতু স্বরযোগ ও স্বরবিয়োগের মধ্যে স্বরযোগই প্রধান। যেমন আত্মা পরমাত্মার সহিত নানাপ্রকারে বিযুক্ত হইয়া চলিতে প্রয়াস পাইলেও তাঁহার সহিত আত্মার যোগ কখনও ছিন্ন হয় না অলক্ষিত ভাবে বিদ্য-মান থাকে সেইরূপ একটী স্বরের সহিত অপর স্বর বিযুক্ত ভাবে চলিলেও তাহা-দের মধ্যে যোগ অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান থাকে—শত বিয়োগের মধ্যেও যোগ বিরাজ করে। তাহা যদি না হইত তাহাহইলে স্বররাজ্য অবসন্ন হইয়া মৃত-দশা প্রাপ্ত হইবার উপক্রম করিত।

(অন্তরে অন্তরে যোগ বিদ্যমান আছে বলিয়াই বিয়োগ সম্পূর্ণরূপে বিয়ো-গাত্মক নহে কিন্তু আপেক্ষিক যোগা-ত্মক—যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া যোগমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে।)

উদাসীন যোগীবেশে সাজারে আমায়।

উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়।
কাজ নাই এ সংসারে
মোহময় কারাগারে
জ্বলিছে জীবন ঘোর বিষের জ্বালায়।
উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়॥
কাজ নাই বেশ ভূষা
কনক মুকুতা ভূষা
কাজ নাই নগরের মোহিনী শোভায়।
উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়।
ছুটেছে পরাণ মোর
ছিঁড়েছে মায়ার ডোর
মনোমত্ত মাতঙ্গেরে বেধে রাখা দায়
যায়—নাহি মানে মানা-ছুটিয়া পলায়॥

(২)

উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়।
কে আছ সুহৃদ হেন
করবে জীবন দান
রাখ রাখ—করে ধরি সংহারের দায়
জ্বলিছে পরাণ মোর বিষের জ্বালায়।
চাহেনা অন্তর আজি
রম্য হর্ম্ম গজ বাজী
মুকুতা প্রবাল রাজি
লুটুক ধূলায়
সাজিব তাপশ আজি ভস্ম মাখি গায়॥
কি ছার সে সুখাসন
সুকোমল রাজাসন
কিছার সে সুখ শয্যা
হেরি লজ্জা পায়
প্রকৃতির প্রেমময় অচল শোভায়।
বসিব উপল তলে,
পেখিবরে কুতূহলে
অনন্তের মোহান্তক হরিত শোভায়
উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়॥

(৩)

উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়,
দেরে কমণ্ডলু করে
জটাভার ধরি শিরে
অক্ষমালা বক্ষোপরে কিবা শোভা পায়
জুড়াব পরাণ মোর বিষের জ্বালায়॥
যাব না যাব না ফিরে
আর পুন দুখনীরে
বল না বল না সখে ভাসিতে আমায়।
পেয়েছি পরম স্থান
সুখ দুঃখ মায়া আন
পুতুলের হাসি খুসি সকলি লুকায়
ভুলেছি ভুলেছি আজি মায়ার মায়ায়

(৪)

হে অচল! মহা যোগী তুমি এ—ধরায়
হেরিলে তোমাবে ক্ষণ
নাহি জানি কি কারণ—
সংসারের সুখ দুঃখ সব ভুলে যায়
কি জানি পরাণ কেন কাঁদে উভরায়॥
অনন্ত তোমার নাম
তুমি অনন্তের ধাম
মজি তপে ধরেছ কি এ সুন্দরকায়?
কে বলে পাযাণ তুমি?
অনন্ত প্রেমের ভূমি
প্রেম নয় অনন্তের অনন্ত প্রভায়
জানিলাম মহাযোগী তুমি এ ধরায়

(৫)

তুমি রত্নাকর, গিরি, রতন নিলয়।
তব মহা ভীমোদরে,
আছে গুপ্ত থরে থরে
কুবেরের রত্নরাজি মাণিক্য নিচয়।
কিন্তু মরি, একি শোভা,
মুনিগণ মনোলোভা!—
রতনের লেশ অঙ্গে নাহি দেখা যায়
সর্ব্ব অঙ্গে শ্যাম শষ্প, কত শোভা তায়!
মুকুতা বিদ্রুম পাঁতি
কনকের তাবে গাঁথি,
জড়া'য়ে হীবক পুষ্পে কনক পাতায়,
মণ্ডিত করিত যদি তব সর্ব্ব কায;
হইত কি হেন শোভা কখন তাহায়?
নিজে গুল্ম সাজ ধ'রে
আপনি বিলাও পবে,
আপন রতন ধন যাহায় তাহায়।
সর্ব্ব ত্যাগী মহাযোগী তুমি মহোদয়!
চাহি না রতন রাজি,
তব শ্যাম সাজে সাজি,
রহিব চরণে তব, দাও হে আশ্রয়।
চরণে শরণ মাগে দীন দুরাশয়॥

(৬)

মরি গিরি, এত প্রেম শিখিলে কোথায়?
প্রেমেতে আপন হারা,
প্রেমেতে পাগল পারা,
প্রেমে বহে সুধা ধারা, পবিত্রি ধরায়,
পূত তরঙ্গিনী রূপে দূরে বহি যায়।
কিবা কল কল স্বন,
কিবা সে উদ্দাম ঘন,
কিবা নিবমল বাবি, অমিয় আশয়!
ভুলিব কেমনে ইহা? একি ভুলা যায়?
এ মোর মিনতি ধর,
কর কৃপা গিবিবর
দাও দাও অভাগারে পূত পদাশ্রয়
উদাসীন যোগী বেশে রহিনু হেথায়।
উদাসীন যোগী বেশে,
আজি এ বিজন দেশে
রহিনু পাশবি গিবি সংসার মায়ায়।
জনমেব আশা বাসা,
যত আজি মরা পাশা,
সোহাগেব যত ভাষা, আর না জুয়ায়।
ভূত চিন্তা—স্বপ্ন। আমি ভুলেছি তাহায়।
কোথা যাও, নির্ঝরিণি!
করি কুলু কুলু ধ্বনি,
কোথা যাও উন্মাদিনী বলগো আমায়।
দাঁড়াও যেওনা ফেলে,
ক্ষেপা প্রাণ তব জলে
গলেছে—মিশেছে—হের ওই ভেসে যায়।
তব কল কল স্বনে,
মিশি আছি এক তানে
গাহিয়া প্রেমের গীতি সে আমার ধায়।
বাসনা মিশিতে অন্তে অনন্তের গায়॥

আমার পশ্চিমে চাকরি।

প্রথম অধ্যায়।

সাঁইত্রিশ বৎসরের কথা আজ লিখিতে বসিয়াছি। এই দীর্ঘকালে জড় প্রকৃতির কতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি এই কয় বৎসরে কত অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে। যাহারা জন্মে নাই তাহারা এখন পুত্রের পিতা, যাহারা বিদ্যালয়ে সবে মাত্র পাঠ শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা এখন সংসার সাগরের তীরে নৌকা ভিড়াইয়াছে। কত নগর রাজধানী হইয়াছে, কত রাজধানী শ্মশান হইয়াছে, কত শ্বাপদ সঙ্কুল প্রদেশ, মনোহর নগরে পরিণত হইয়াছে। কত পরিবর্ত্তনই যে হইয়াছে তাহা আর কি লিখিব?

নিজের কথাই বলি, এই সাঁইত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে যাহা ছিলাম, এখন তাহা নাই। তখন সংসারের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্রে নবোৎসাহে নবীন উদ্যমে বুক বাঁধিয়া প্রবেশ করিয়া ছিলাম। বাসন্তী সমীর প্রস্ফুটিত নূতন ফুলের ন্যায় নবীন—আশা, কেমন হৃদয় খানিকে প্রফুল্লিত করিয়া ছিল—ভবিষ্যৎ উন্নতি, সুদূর সুখ—আশা, কতই সেই নবীন চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া ছিল—কিন্তু এখন আমি— পূর্ব্বের সেই ভগ্নাবশেষ মাত্র। যৌবন গিয়াছে—জরা আসিয়াছে; প্রফুল্লতা—বিষন্নতার জন্য আমার হৃদয়ে আসন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে; উদ্যম—আলস্যের জন্য স্থান রাখিয়াছে; উৎসাহ—চলিয়া গিয়াছে, নিরুৎসাহ পূর্ণমাত্রায়, এই ভগ্ন হৃদয়ে—আধিপত্য করিতেছে। যাহা ছিল—সবই গিয়াছে—কিন্তু আছে কেবল মাত্র স্মৃতি। সেই স্মৃতি—বড় ভীষণ। জীবনের কত সুখ দুঃখের কথা ভুলিয়াছি—যৌবনের কত বিলাস বিভ্রমের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়াছি—কিন্তু একটী—ওঃ—তাহা অতি ভয়ানক—আজও আমার সম্মুখে ভীষণ দৃশ্য বিস্তার করিতেছে। সেটী একটী শোণিতময়ী কাহিনী, হিন্দুস্থানে কখনও তাহা ঘটে নাই ও ঘটিবে না। ঈশ্বর করুন—সহস্র উৎপাত, অত্যাচার দুর্দ্দৈব ভারতবর্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাক্ তবু যেন—তাহা আর না ঘটে।।

আমি ১৮৫৪ সালে, কলিকাতা হইতে মীরটে—কমিসেরিয়েট বিভাগে বদলি হই। আমার মনিব, কমিসারি জেনারেল—মেজর জেনারেল্ সি, বি হপ্‌কিন্স সাহেব তখন মীরটে অবস্থান করিতেছিলেন। হপ্‌কিন্সই আমাকে কলিকাতায় চাকরী করিয়া দেন। তাঁহার বড়—সিবিলিয়ান হপকিন্স সাহেব মুরশীদাবাদের কালেক্টার ছিলেন। আমার পিতা কালেক্টরির প্রথম পেস্কার, পিতার প্রার্থনায়, আমার কমিসেরিয়েটে চাকরি হয়।

মীরটে যখন বদলি হইলাম, তখন আমার বয়স ৩৩ বৎসর। আমার এক বৃদ্ধা পিসি আমায় মানুষ করিয়া ছিলেন শৈশবে মাতৃ বিয়োগ হইয়াছিল—কাজেই

তিনি আমায় চখের আড়াল করিতে না পারিয়া সঙ্গে গিয়া ছিলেন। মীরটে দেড়-বৎসর থাকিয়া সাহেবের সঙ্গে পুনরায়—আগরায় বদলী হই।

আগরায় মোটে ছয়মাস থাকিলাম, আমি হিসাব বিভাগে কাজ করিতাম। মনিবের—বেস সুনজর ছিল। ছয়মাস পরে—কাণপুরে হেড্ এসিস্টাণ্টের পদ শূন্য হইল। সাবেক হেড্ এসিস্ট্যাণ্ট হিন্দুস্থানী ছিলেন—পদটী হিন্দুস্থানীর জন্য সৃজিত—কিন্তু অন্য উপযুক্ত লোক না থাকাতে উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারিরা আমায় সেই কৰ্ম্মে বাহাল করিলেন।

আমার বেতন তখন দুইশত টাকা, ত্রিশ টাকায় কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলাম—এই অসম্ভব পদোন্নতিতে ঈশ্বরকে, ইষ্টদেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। মনে বড় দুঃখ হইল পিতা মাতা বাঁচিয়া থাকিলে আজ তাঁহাদের কতই না আনন্দ হইত।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আগে দেশে চিঠি লিখিলাম। জবাব আসিল—তখন ডাকের এত সুবিধা হয় নাই—জবাব দেরিতে পাইলাম। পত্র পড়িয়া জানিলাম, আমার মঙ্গলার্থে বাটীর সকলে কালীঘাটে পূজা দিয়া আসিয়াছে এবং আমার কাছে আসিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

এতদিন সকলকে আনি নাই খরচ পত্র বড় বেশী পড়িবে। সেই সময়ে সবে রাণীগঞ্জ অবধি লাইন খোলা হইয়াছে। এখন বুঝিলাম আনিলেই বা ক্ষতি কি?

তিনমাসের ছুটী লইয়া—দেশের দিকে যাত্রা করিলাম। সেকালে অনেক দিনের পর দেশে আসায় যে সুখ, তাহা ভুক্ত ভোগি ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবে না।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিল, ছুটী ফুরাইবার পূর্ব্বে কাজে লাগিবার জন্য—আপিস হইতে চিঠি পাইলাম। সুতরাং দেশে আর বেশী বিলম্ব করিতে পারিলাম না। পরিবারবর্গকে লইয়া বিষয় আশয়ের বন্দোবস্ত করিয়া কাণপুর যাত্রা করিলাম।

রেলের রাস্তা ফুরাইল—সুখেরও শেষ হইল। গোরুর গাড়ি সকল কষ্টের পূর্ব্ব সূচনা করিল। তারপর বয়েল—মাঝে মাঝে একা, এইরূপে পঁচিশ দিনের পর—কাশী হইয়া কাণপুরে পৌছিলাম। আমার সঙ্গে আসিলেন—আমার এক ভগিনী, দুই ভাগিনেয়ী, এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ, এবং আমার স্ত্রী ও দুটী ছোট ছেলে। তখন সকলে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইতে পারিতেন না। সে সময়ে পশ্চিমে বাঙ্গালীর সংখ্যা বড় কম ছিল। আমি আত্মীয় স্বজন বেষ্টিত হইয়া "বিদেশ কথাটা ভুলিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়! পরে এই কার্য্যের জন্য আমায় বিশেষ অনুতাপ করিতে হইয়াছিল।

ভবিষ্যৎ কে কোথায় দেখিতে পায়! যে দেখিয়াছে—সে মহাপুরুষ, কিন্তু প্রজ্ঞাচক্ষু কয়জনের আছে? আমাদের ন্যায় সামান্য মানব ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইলে এত কষ্টভোগ করিবে কেন? যে পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া আমি আত্মসুখে—বিস্মৃতির অগাধ জলে ডুবিতেছিলাম, সেই পরিবারবর্গই কয়েক মাস পরে আমার মহা বিপদের কারণ হইয়াছিল।

আমি যথন কাণপুরে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন কবিলাম, তখন রাজনৈতিক আকাশ শারদীয় জ্যোৎস্না প্লাবিত, পৌর্ণমাসী-ময়ী—সুনীল—প্রশান্ত—সুদূর বিস্তৃত, তাহাতে কালমেঘের ছাযা মাত্র দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু কে জানে কয়েক মাসের মধ্যে কোথা হইতে সেই বিমলা-ম্বরে কালমেঘের ছাযা পড়িল, মেঘের পর মেঘ আসিয়া, সেই শারদ কৌমুদিব দীপ্ত হাসি মুছিযা দিল। মহাঝটিকার পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ জোর বাতাস উঠিল।

আমি পাঁচ মাস কাণপুরে বিশেষ দক্ষতার সহিত কাজ করিলাম। খাই দাই—আপিস যাই, কাজ কবিযা ফিবিযা আসি। দিন যায় রাত্রি আসে, সূর্য্য অস্ত যায়, আকাশে চাঁদ ভাসে, নক্ষত্র উঠে, প্রকৃতি ঘুমায, জগত যেমন চলিযা থাকে তেমনি চলে। মাঝে সবকারী কোন একটা কাজের জন্য—আমায এক-বার ফতেপুর যাইতে হইল। আমি সাহেবের সঙ্গে ডাক গাড়িতে রওযানা হইলাম।

ফতেপুর হইতে কাণপুর ৪৮ মাইল চব্বিশ ক্রোশ। সকালে বাহির হইয়া রাত্রি—নয় ঘটিকার সময় আমরা ফতে-পুরের বাঙ্গলায় পৌছিলাম। আমাব আহারাদি সম্বন্ধে ফতেপুরের কণ্ট্রাক্টর লালা—কুমার প্রসাদের বাটীতে পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত হইয়া ছিল।

কুমার প্রসাদ—লক্ষ্মীমন্ত লোক। বড় বাড়ী, লোক জন, বিষয় আশয়, গাড়ি ঘোড়া, যাহা থাকিলে লোকে বড় লোক বলে সবই তাঁর আছে। তার উপর তিনি ব্যবহারে বড় ভদ্র। আমার যথেষ্ট খাতির করিলেন। এই তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়। প্রথম আলাপে যেন কতকালের পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। আমি জলযোগ করিলাম—সাহেবের জন্য লালাসাহেব, খাঁটি দুধ, ভাল বথরার মাস, ও কতক মেওযা ও ভাল ফল পাঠাইযাদিলেন। রাত্রি কাটিল—পর-দিন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সকাল সকাল রসুইএর কাজ সারিল—আহারাদি করিযা—সাহেবের কাছে গেলাম। লালাসাহেবও সঙ্গে গেলেন, সেখানকার কাজ সারিতে আরও দুই দিন বিলম্ব হইল। আমি, লালাজী, ও সাহেব পুনরায় কানপুরে ফিরিলাম।

পথে আসিতে আসিতে লালাজী দুইজন পরিচিত লোকের মুখে মীরট ও দিল্লীর বিদ্রোহ ও সিপাহির অবাধ্যতা সম্বন্ধে সংবাদ শুনিলেন। কথাটা সাহে-বেরও কাণে উঠিল কিন্তু তখন আমরা কেহ বিশ্বাস করিলাম না।

১৫ই মে আমরা কাণপুর পৌছি-লাম। ফতেপুরের পথে যে বিদ্রোহের গল্প শুনিয়াছিলাম, কাণপুরে পৌছিয়া তাহা যে সত্য তৎসম্বন্ধে প্রমাণ পাই লাম। কিন্তু তখন সকলেরই মনে ঘটনাটা সামান্য বলিয়া বোধ হইল। আমিও ঐরূপ ভাবিলাম বটে। কিন্তু আমরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হইয়াছিলাম।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, যাহা প্রথমে জনরব ছিল—তাহা যেন, কতকটা সত্যভাব ধারণ করিল। যাহাতে লোক আদৌ বিশ্বাস করে নাই—তাহা যেন কতকটা ভয় আনিয়া দিল। একটা নির্দ্ধারিত কিছুই ঘটিতেছে না অথচ সাহেব—দেশী সকল কর্ম্মচারিই যেন

সতর্ক। নগরে কোন অসন্তোষের কারণ নাই—ছাউনীতে কোন গোল-যোগ ঘটে নাই—তথাপি লোক যেন মনে ভাবিতে লাগিল কি যেন একটা ঘটিবে। কোথাও কিছু নাই অথচ যেন ভয়ের একটা শূন্য ছায়া সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অদৃশ্য প্রেতমূর্ত্তির ন্যায় ঘুরিতে লাগিল।

আগরার—বিষণদয়াল, আমার ধর্ম্ম-ভ্রাতা। তাঁহার সহিত আমার বড় ঘনিষ্ট, আত্মীয়ভাব হইয়াছিল। এক প্রাণ ভিন্ন দেহ। আমি তাঁহার "মা"কে "মা" বলিতাম। তিনি হিন্দুস্থানী, আমি বাঙ্গালী, তাঁহাকে ভিন্ন জ্ঞান ছিল না। একবার মনে ভাবিলাম কাজ কি, দিল্লী ও মিরাটের যেরূপ সংবাদ শুনি-তেছি, যদি কিছু ঘটে, সাবধান হওয়াই ভাল। পবিবারবর্গকে আগবার বিষণ-দয়ালের বাড়া পাঠাইয়া দিই। কিন্তু আবার সে সংকল্প ত্যাগ করিলাম। যেদিন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছি সেই দিনই আপনি আপনি গিয়া সর-কারী চিঠি দেখিলাম—যে গুজরেরা * দিল্লী হইতে কাণপুরের পথে আসিতেছে এবং পথিমধ্যে—আমাদের কমিসরি-এটের—মাল পত্র লুঠ করিয়া লইয়াছে। আমার বাটীর সকলে—অন্য কাহারও সঙ্গে যাইতে অস্বীকৃত হইল। বিশেষতঃ আমার পিশি ঠাকরুণ ও স্ত্রী ত বিষম বাঁকিয়া বসিল। আমার পক্ষে তখন ছুটী লওয়া বড় বিষম ব্যাপার। কাজের বিষম ভীড়, বিশেষতঃ সেদিন তিন মাস ছুটী লইয়াছি। শেষ না পাঠানই মত স্থির করিলাম। অদৃষ্টে কষ্ট থাকিতে তাহার ভোগ লঙ্ঘন করে কার সাধ্য! মানুষে নিজের বুদ্ধির দোষে মজিয়া শেষ দেবতার দোষ দেয়। এই সন্দিগ্ধ অব-স্থায় ৪।৫ দিন কাটিয়া গেল। সন্ধান পাইলাম জনকতক সাহেব সওদাগর, পূর্ব্ব হইতেই নৌকা ভাড়া করিয়া রাখি-তেছেন, অন্যান্য দুই চার জনে ডাক বন্দোবস্ত করিতেছেন। একটু গোল-যোগ দেখিলেই তাঁহারা ভৃত্যদিগের উপর বাঙ্গলার ভার দিয়া এলাহাবাদ প্রস্থান করিবেন। এরপর আবার দুই তিন জন সত্য সত্যই কাণপুর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এই সময়ে একটী সামান্য ঘটনা ঘটিল! অন্য সময়ে হইলে হয়ত কেহ তাহার দিকে চাহিয়াও দেখিত না। তিলকে ত'ল. করিত না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে এই সময়ে এক নৌকা আটা কমিশেরিয়েটবিভাগে কাণপুর সৈন্যদলের ব্যবহারের জন্য আসিল। অনেক দিনের কেনা বলিয়াই হউক বা গমগুলিতে কোন কারণবশতঃ জল লাগাতেই হউক—আটার অবস্থা অতি খারাপ হইয়া গিয়াছিল। দস্তুর মত তাহা গুদামজাত হইয়া সিপাহীদের মধ্যে বিলি হইতে লাগিল। আটার দোষ এই—রুটীতে কেবল একরূপ দুর্গন্ধ হইত। সিপাহীরা এ সম্বন্ধে রসদদারের কাছে অভিযোগ করিল। রসদদার একজন ইংরাজ—সুতরাং তিনি এ কথাটায় মাথা ঘামাইবার তত প্রয়োজন বোধ করি-লেন না।

সিপাহীরা একটু অসন্তুষ্ট হইল। অসন্তোষ প্রথম প্রথম তাহাদের মনের

* ইহারা ডাকাতি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

ভিতর ছিল—পরে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। দুষ্টলোকে সুযোগ পাইল। তাহারা এককে আর করিয়া তুলিল। সহরে চাউনীতে সিপাহী মহলে প্রচারিত হইল যে ফিরিঙ্গি আটার সহিত গরু ও শূকরের অস্থি চূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে। ঘরে আগুণ লাগিলেই বৈশাখী প্রচণ্ড বায়ুতে সেই অগ্নিরাশি যেমন প্রবল-বেগে চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়ে এই জনরবও সেইরূপ চারিদিকে নানা আকারে প্রচারিত হইতে লাগিল। গোলযোগ দেখিয়া, সেই রসদ পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইল।

আর একটী রব উঠিল—যে এক নে কা নূতন টোটা মীরট হইতে আসিতেছে—তাহাতে সুবিধার জন্য শুকর ও গোরুর চর্ব্বি মিশ্রিত করা হইয়াছে। হিন্দু মুসলমানকে তাহা দাঁতে কাটিয়া ছুঁড়িতে হইবে। যাহারা অস্বীকার করিবে তাহাদের তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

তৃতীয় কারণ এই—সেই সময়ে সিপাহিদিগের পুরাতন ছাউনী নূতন করিয়া তৈয়ারি হইতেছিল। ইউরোপীয় সৈনিক ও পদস্থ কর্ম্মচারিগণ নিজেদের সুবিধা বুঝিয়া গঙ্গার খালের পূর্ব্বদিকের কোটা বাড়ী গুলিতে সরিয়া গিয়াছিল। গরীব সিপাহিরা সেই ছাউনীর কাছে তাঁবু গাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। শীত গেল পশ্চিমে শীতের দারুণ কষ্ট তাহারা—বিনাবাক্য ব্যয়ে সেই তাঁবুর মধ্যে কাটাইয়া, সহ্য করিল। তার পর গ্রীষ্ম আসিল। দিনের বেলায় লু ছোটে, রাত্রে ভয়ানক ঠাণ্ডা। সিপাহীরা বড় কষ্টে পড়িল। বলিবার কোন উপায় নাই—বলিলেও কেহ শুনে না। ইহাতে তাহাদের মনে এক ভয়ানক বিদ্বেষ বহ্নি ধুমাইত হইতে লাগিল। লক্ষ্ণৌএ এক শিশি উচ্ছিষ্ট ঔষধের জন্য মহা বিদ্রোহ সূচিত হইয়া উঠিল। এতগুলি কারণ "সত্ত্বে" এতদিন কাণপুরে যে তাহা হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

দাবাগ্নি প্রবল হইলে যেমন সমুদের উপরের জল চঞ্চল ও আলোড়িত হইয়া উঠে—অথচ প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্থির দেখিয়া লোকে তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে পারেনা, কাণপুরে আমাদেরও তাহাই হইল। লোকের মন দিন দিন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে সকলেই যেন কি একটা অব্যক্ত আশঙ্কায় আকুল হইয়া পড়িতেছে, অথবা তাহার প্রকৃত কারণ কি তাহাব স্থির হইতেছে না। ১৯এ মে গুজব উঠিল—যে সিপাহিরা বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যোগ করিতেছে এবং গুজরেরা কাণপুরের খুব কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে। *জনরবটা চিন্তার কারণ বটে।* আমি আমাদের বিভাগীয় একজন কাপ্তেন সাহেবের নিকট ইহার তথ্য জানিতে পাঠাইলাম। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন কোন ভয় নাই। ওসব বাজার গুজব মাত্র।" পাছে কাপুরুষতা প্রকাশ পায়, কেহ কোন আত্মরক্ষার বিশেষ উপায় করিতেছে না—অথচ আমি করিলে যদি তাহারা আমায় উপহাস করে—এই ভয়ে আমি পরিবার বর্গের ভবিষ্যৎ নিরাপদতার কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলাম না। এই লোকলজ্জাই আমার কাল হইল। আমি যদি তখন আত্মরক্ষার কোন উপায় করিতাম, পরিবারদের দেশে পাঠাইয়া

দিতাম তাহা হইলে পরে আমায় অত কষ্ট পাইতে হইত না।

ভয় যে খালি আমার হইয়াছিল তাহা নয়। বড় বড় পদস্থ সিবিল মিলিটারি সাহেব—যাঁহারা, বন্দুক পিস্তলের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানেন তাঁহারাও ভয় পাইয়াছিলেন। আমার সাহেবের অনুগ্রহে—অনেক পদস্থ সাহেব আমায় বিশেষ বন্ধুভাবে দেখিতেন। আমি অবসর ক্রমে তাঁহাদের বৈঠকে জুটিতাম। সেখানেও অই কথা। কতরকম মতলব আঁটা হইল একটীও মনঃপুত হইল না, শেষ স্থির হইল—এসম্বন্ধে কাণপুর বিভাগের সেনাপতি—জেনারেল স্যর হেনরী হুইলারের পরামর্শ ও অনুমতি লওয়াই বিশেষ যুক্তি যুক্ত।

তাহাই হইল। চারি পাঁচ জন বড় সাহেব—ও দুই জন হিন্দুস্থানী—সওদাগর, সাহেবের সহিত দেখা করিলেন'। সেদিন আমি সমস্ত দিন আপিসে কাজে ব্যস্ত ছিলাম, পরে শুনিলাম, হুইলার সাহেব বলিয়াছেন—"বর্ত্তমানে কোন ভয়ের কারণ নাই তবে ভবিষ্যতের জন্য গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিরা (ইউরোপীয়) ৩২ নং পদাতিক দলের পরিত্যক্ত বারাক শ্রেণীতে বাস করিতে পারেন। এবং দেশীয় কর্ম্মচারিরা তাহার পার্শ্বের আর একটী বাড়ি দখল করিতে পারেন।" হুইলার সাহেব যে বাড়ীর কথা বলিয়াছিলেন তাহা এক নিভৃত অংশে, এবং যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় তবে সেই দুইটী বারাকে যে কি উপকার হইবে তাহা অনেকে বুঝিতে পারিলেন না।

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, আমার সহ কর্ম্মচারি বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সহরের বাহিরে বাস করেন। যদি কোন বিপদের সূচনা দেখি, তাহা হইলে পরিবার বর্গকে অন্ততঃ তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিব। নিজের জন্য ভাবি না যখন চাকরি করিতে আসিয়াছি বিশেষতঃ কমিসেরিএটে—তখন আমার মাথাটার মূল্য যে বড় বেশী নয়, তাহা গোড়া হইতেই জানিতাম। কাহাকে কিছু না বলিয়া—মনে মনে সংকল্প স্থির করিয়া রাখিলাম। কেবল আপিসে গিয়া অবসর ক্রমে লক্ষ্মীনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিবার মতলব রহিল।

সে রাত্রিটা নানা ভাবনায় কাটিল। পর দিন—দশটার সময় আপিসে গেলাম। আপিসে গিয়া দেখিলাম, দেশীয় কর্ম্মচারিদের মধ্যে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিন জন বাঙ্গালী। আমার এক দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি খুড়তুত ভাই সেই সময়ে অর্ডানেন্সে কাজ করিতেন। তিনি আমার ঘরে আসিযা বলিলেন "দাদা! পরিবারবর্গের রক্ষার কি উপায় করিতেছেন? এদিকে যে সর্ব্বনাশ!! আর বুঝি বিভ্রাট ঘটিবার দেরি নাই। সাহেবরা সব ষ্টেসন ছাড়িয়া পলাইতেছেন, আজ সকালে আমাদের আফিসের কাপ্তেন উইলিয়াম সহর ত্যাগ করিয়া ছাউনির দিকে সপরিবারে চলিয়া গিয়াছেন। আর একজন মিলিটারি সাহেব তিনি স্ত্রীপুত্রদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিতে গিয়াছেন তিনি এত ব্যস্ত হইয়া গিয়াছেন যে গাড়ী করিবার অবকাশ হয় নাই। আমাদের কি উপায় হইবে?"

আমি বলিলাম—জগদীশ্বরই আমাদের উপায়। সেকথা এখন ভাবিয়া

কি হইবে? যদি প্রকৃতই বিপদ ঘটে তখন বুদ্ধিও জোগাইবে। আর এখন যাইবা কোথায়? চাকবি ছাড়িয়া দিলেই বা পরিত্রাণ কই? ভায়া ত এই কথা শুনিয়া চলিয়া গেলেন। আমি আপিশের কাজে লাগিলাম। কেবাণী-দের অনেকেই অন্য মনস্ক। বেলা হইতেছে ছোট সাহেব আসিতেছে না, ইহাতে কাজকর্ম্মের বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। বড় সাহেব তিন মাসের ছুটীতে আছেন, ছোট সাহেব তাঁহাব কাজ করিতেছেন। তিনি মিলিটাবি নহেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কায্য দক্ষ। ছোট সাহেবের বাড়ীতে চাপবাসী পাঠাইলাম সে আসিয়া বলিল—বাটী শূন্য বাহিব হইতে চাবি দেওয়া। ঘবে জিনিসপত্র কিছু নাই। কেবল খাট বিছানা পড়িয়া রহিয়াছে। সাহেব কোন চিঠি পত্র রাখিয়া যান নাই সুতবাং কি যে কবিব, কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না।

মনে করিলাম, গোলযোগ দেখিয়া সাহেব হয় ত, পরিবাব বর্গকে অন্যত্র কোথাও রাখিতে গিয়াছেন। যখন গোলযোগ এতটা উঠিয়াছে—যে সকলেই আত্মরক্ষাব চেষ্টা কবিতেছে, তখন আমার মনে হইল আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আমিও সকাল সকাল আপিস বন্ধ করিলাম। আপিসের পিযা-দার কাছে সাহেবের নামে এক চিঠি রাখিয়া গেলাম।

সর্ব্ব প্রথমেই আমার পরিবার বর্গকে স্থানান্তর করা যুক্তিসিদ্ধ ভাবিলাম। আমার বন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার বাড়ী সহরের বাহিরে, সহর হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে। আমি দুই খান গাড়ি করিয়া আবশ্যকীয় জিনিস পত্র সমেত সেই ভরা বার বেলায় শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। আমাব বন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু আমার সঙ্গে যাত্রা কবিলেন।

সন্ধ্যাব সময আমরা সেখানে পৌছিলাম। লক্ষ্মীনাবায়ণ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। তাঁহাব সংসারে তাঁহার এক বৃদ্ধা মাতামহী, বিধবা মাতা ও স্ত্রী। তাঁহাব পবিবার বর্গ সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও তাঁহাদের অমাযিকতা গুণে আমাদের পরিবারেরা তাঁহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশিযা গেল। আমি লক্ষ্মী-নাবায়ণ বাবুব সহিত পরামর্শ করিয়া চাবিজন আরদালী তাঁহার বাটী বক্ষণার্থ নিযোজিত কবিলাম। এবং প্রতি সপ্তাহে দুইবার কবিযা তাঁহাদেব দেখিয়া আসিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

এইবাবে আমার চিন্তাব অর্দ্ধেক অংশ কমিযা গেল। নিজের জন্য তত ভাবনা নাই। অন্যকযজন বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদেব বাসায় গিয়া মিশিলাম। আর-দালির নিকট ছোটসাহেবের জন্য যে পত্র বাখিয়া গিয়া ছিলাম, তাহার জবাব আসিযাছে। সাহেব লিখিয়াছেন—আমার দুই চারি দিন বিলম্ব হইবে। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আপিসের কাজ কর্ম্ম বন্দ করিওনা, কাগজ পত্র সহীব জন্য অমুকস্থানে আরদালী দ্বারা পাঠাইও। যেরূপ জনরব শোনা যাই-তেছে—তাহাতে, বিশেষ ভয়ের কথা বটে। বাহির বাহির হইতে নানাগোল-যোগের সংবাদ আসিতেছে। আমি সে দিন দুইবার সাহেবের সহিত দেখা করিয়া ছিলাম। তিনি সাবধান হইতে

পরামর্শ দিলেন বলিলেন আমাদের পরিবারবর্গ সহর হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছি। আপিসের সরকারী কাগজ পত্র ও ক্যাশ সম্বন্ধে খুব সাবধান। সর্ব্বদা গুহ্য সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিবে। তোমার কার্য্য দক্ষতার উপর আমার খুব বিশ্বাস আছে। আবশ্যক মতে তুমি অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পার। তোমাকে দুইটী রিভল্‌ভার, দুই খানি তরবারি ও দুইটী বন্দুক দিবার জন্য আমি পিক্ সাহেবকে পত্র দিলাম। ইত্যাদি—ইত্যাদি। * আমি পত্র পাইয়া দস্তর মত কাজ চালাইতে লাগিলাম। অস্ত্র গুলি আনাইয়া বাসায় রাখিলাম। একটী পিস্তল, ও একটী বন্দুক ও কিছু বারুদ ও গুলি লক্ষ্মী প্রসাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম।

একদিন কৌতুহলী হইয়া পুরাতন বারিকে সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলাম। সে থানে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে একবারে চক্ষুস্থির। সহরের যত সিবিল্ মিলিটারি, ও সওদাগরগণ স্বস্ব স্ত্রী পুত্র দিগকে সেই বারাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঘর অপেক্ষা লোক বেশী, কাজেই ঠাসা ঠাসি আরম্ভ হইয়াছে যে ঘরে এক জন করিয়া লোক থাকিলে নির্জ্জনতা প্রিয় ইংরাজের অসহ্য বোধ হইত সেই ঘরে এখন ৫।৭ টা বিছানা পড়িয়াছে। দিনরাত খস্‌খস্ টাটীর জলসিক্ত, শীতল সমীর সেবন করিয়াও যাঁহাদের গ্রীষ্ম দূর হইতনা, এখন তাঁহারা সকলে এক খোলা লম্বা বারান্দায় কুণ্ডলীকৃত হইয়া রহিয়াছেন। যদিও এস্থানে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইতেছে তথাপি নিরাপদতা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়া—তাঁহারা এ সমস্ত আদৌ গ্রাহ্য করিতেছেন না। আরও দেখিলাম সেই পুরাতন বারাকের অন্য এক বাড়ীতে একদল গোরা গোলন্দাজ—ছাউনী করিয়াছে। ইহা অবশ্য সেই আগন্তক স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকা দিগের রক্ষার জন্য। ক্রমশঃ—

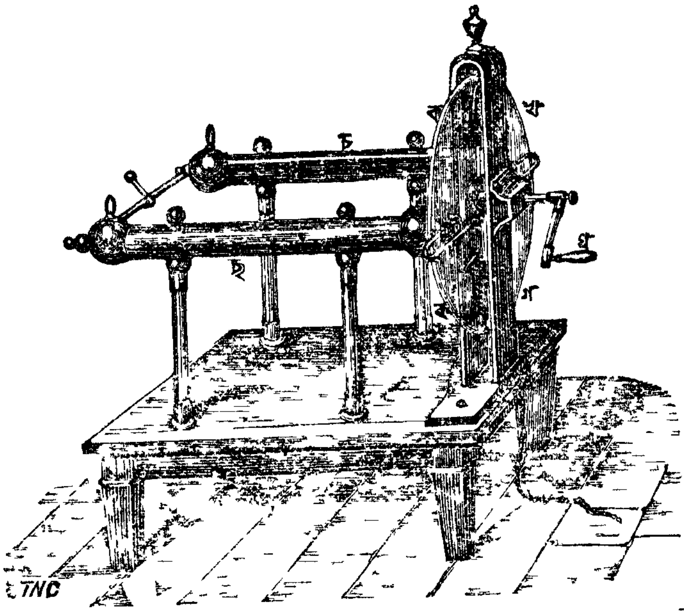
* ইনি Ordanance এর বড সাহেব।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

৫। তড়িত।

কোন কোন দ্রব্য ঘর্ষিত হইলে নিকটবর্ত্তী সকল প্রকার হাল্‌কা পদার্থকে যে আকর্ষণ করে, তড়িৎ তাহার কারণ। যদি ধুনা বা গালার খুব মোটা শলাকে লোমশ বা রেশমী কানির দ্বারা খুব ঘর্ষণ করিয়া, গাছের মাইজের ছোট ছোট গুলি পাকাইয়া মসিনা বা শণের সুতা দিয়া অথবা চেক্‌নাই রেশমী সুতা দিয়া সেই শলার সাম্‌নে টাঙ্গাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ ধুনা বা গালার শলা তাহাদিগকে অনেক দূর হইতেও আকর্ষণ করে। ইহা কাঠের গুঁড়া, পালকের লোম, সোনার পাত প্রভৃতি আর আর দ্রব্যকেও আকর্ষণ করে। কাচ, গন্ধক, তৃণমণি (amber) বিশেষত লাক্ষাও এই গুণ উচ্চ পরিমাণে ধারণ করে। ধুনার শলা ঐ গুণ যেমন অধিকক্ষণ রাখিতে পারে না, সেইরূপ কাচ প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যের শলাতেও ঐ গুণ কতক ক্ষণ পরে আর থাকে না, তখন আবার ঘর্ষণ করিলে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

তড়িৎ কল এই নিয়মমূলের উপর নির্ভর করে। ইহাতে বৃহৎ একটি কাচের চাকৃতি আছে, তাহার উপরে ও নীচে, দুই দিকে দুইটা গদির



মত আছে—তাহাব মাঝে কাচটা বহিযাছে। কাচের মধ্যখানে একটা বাঁট লাগান বহিয়াছে। সেই বাঁট যত ঘোবান যায, কাচটা তত ঘোবে, ঘুবিলেই গদিতে খুব ঘর্ষণ লাগে—তাহাতে যে তডিৎ কাচে প্রকাশ হয, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে, কিন্তু মধ্যস্থ সম্বন্ধে পবিচালকে প্রবেশ করিযা অধিকাধিক কবিযা জমা হইতে থাকে। পবিচালকেবা এইরূপ তডিদুপেত হইয়া যে কেবল হাল্‌কা সামগ্রী আকর্ষণ করে তাহা নহে কিন্তু যদি তাহার কতক অঙ্গুলি পরিমিত বা বিঘৎপবিমিত নিকটে হস্ত লইযা যাওয়া যায়, অকস্মাৎ জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখা যায় এবং তাহাব সঙ্গে সঙ্গে নিরেট পুট্‌পুট্‌ শব্দও শ্রুত হয় এবং হস্তে, বাহুতে এবং কখন কখন সমুদয় শরীরে, অল্পই হউক বা অধিকই হউক, এক প্রকার উত্তেজনা উপস্থিত হয়।

তড়িৎ তবে কাচের চাক্‌তি হইতে নিকটস্থ পরিচালককে সংগত হয় এবং নিমেষ মধ্যে তাহার সমুদায় আয়তনে, প্রসৃত হয়; এই অবস্থায় যদি কোন দ্রব্যকে তাহাব নিকটে উপনীত করা যায়, তথা হইতে ঐ তডিৎ পুনরায় দ্রব্যে আগমন করে এবং স্ফুলিঙ্গ দ্বাবা অর্থাৎ আলোক ও শব্দ দ্বারা আপনাব গৃহীত পথকে ব্যক্ত করে।

কিন্তু সকল পদার্থেরই সমান পবিচালকতা গুণ নাই অর্থাৎ সমান পবিমাণে তডিৎকে প্রসৃত হইতে বা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে দেয না, ধাতুকে পবিচালক বলে, যেহেতু ইহা, যত বডই হউক না, তড়িৎকে ক্ষণমাত্রে আপনাব সমুদয আযতনে উপনীত বা পরিচালিত করে। জল, ভিজে বাতাস, ভিজে মাটি, মনুষ্যদেহ সুতা বা তূলাব দ্রব্য, ইহারাও পরিচালক, যদিচ ধাতু অপেক্ষা তাহাদের পরিচালকতা কম। ইহার বিপরীতে কাচ, লাক্ষা, ধুনা, গন্ধক, শুষ্ক বায়ু, বেশমী বা লোমশ দ্রব্য ইহাবা অপরিচালক বা ধারক, ইহারা তড়িৎকে উপনযন করে না, কিন্তু তাহাকে ধরিয়া রাখে, আবদ্ধ রাখে।

অতএব তড়িৎকে এক প্রকার তরল পদার্থ কহা যাইতে পারে, যাহা ঘর্ষণ দ্বারা কোন

কোন বস্তুতে প্রকাশ হয, যাহা তড়িৎ যন্ত্রের ধাতুময় পরিচালকে এবং সামান্যত সকল পরিচালকেই সঞ্চলন করে এবং তাহা হইতে বাহির হইয়া নিকটস্থ দ্রব্যে প্রস্থত হয়। ইহাকে তড়িৎ পদার্থ কহে, ইহা ভারহীন। গালার দণ্ড যখন খুব শুষ্ক এবং অত্যন্ত তড়িতাযিত হয, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত করে এইরূপ অদৃশ্যপ্রায় স্ফুলিঙ্গ প্রায দুই খৃষ্টীয শতাব্দ গত হইলে প্রথম দৃষ্ট হইযাছিল এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ওযাল নামক যে বিজ্ঞানবিৎ ইহা প্রথম দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি এইরূপ ব্যক্ত করিযাছিলেন যে ইহার শব্দ বজ্রধ্বনির ক্ষুদ্র অনুকৃতি এবং ইহার আলোকবিন্দু বিদ্যুৎপদ্ধতির অনুরূপ। এই যে মহাঘটনার সহিত ঐ অতি ক্ষুদ্র ঘটনার আশ্চর্য্য তুলনা—ইহা দ্বারা কিন্তু বাস্তবিক সত্যই ব্যক্ত হইয়াছিল অথবা ইহা সেই প্রথম ঊষাকিরণের ন্যায প্রকাশ পাইযাছিল, যাহা হইতে অবশেষে সত্যসূর্য্য দীপ্তি পাইল, কেননা এই তুলনার সত্যতা সাব্যস্ত করিবার জন্য আরও এক শতাব্দীর অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও পরীক্ষা লাগিল।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বিখ্যাত ফ্রাঙ্কলিন প্রতিভা দ্বারা চালিত হইযা ঝোড়ো (ঝড়ের) মেঘ হইতে স্বকীয় পদতলে বজ্রশিখা আনযন করিবার জন্য প্রগলভ হস্ত দ্বারা তাহার কক্ষদেশ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং পদতলে আনীত স্বযং বজ্রের নিকট হইতেই তাহার উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই অবধি নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল, গাঢ় অন্ধকার ঘুচিযা গেল এবং সত্যের জ্যোতি উজ্জ্বল হইযা উঠিল। এই সময় বিশেষত ফ্রান্স দেশে তাড়িৎ ঘুড়ির দ্বারা যে সকল জমকাল পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা তড়িৎস্ফুলিঙ্গ নহে কিন্তু বহুগজ লম্বা বিদ্যুৎশিখাপত্র সকল ভূমিতলে অবতরণ করান গিয়াছিল এবং তাহা সঠিক প্রমাণ দ্বারা আমাদের তড়িৎযন্ত্রনির্গত তড়িতের সদৃশ বলিয়া অনায়াসে চিনিতে পারা গিয়াছিল। অতএব যেখানেই ভারবান্ পদার্থ আছে (যেমন সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলে), সেখানেই যে তাপের ন্যায় তড়িৎও বিদ্যমান আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন ঘটনা আজও পর্য্যন্ত আমাদের মনে ইহা উদ্দীপ্ত করিয়া দেয় নাই যে আমাদের সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের পরস্পরের মধ্যে তড়িতের গতিবিধি আছে।

৬। তাড়িৎচৌম্বক।

গাল্বা বা প্রাণিতড়িত, বলটার স্তম্ভ এবং ঐ সমস্ত ক্রিযা যাহা চৌম্বক ও তড়িৎ পদার্থের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত হয এ সমস্তই অধুনাতন তাড়িৎচৌম্বকের অন্তর্ভূত।

বিজ্ঞানের এই শাখাটী যেমন নূতন আবিষ্কৃত তেমনি বিস্তৃত ও উর্ব্বরা। অর্দ্ধশতাব্দীর কিছু বেশী হইল, ইহার মধ্যেই ইহা হইতে রাসাযনিক তড়িৎ ও তাড়িত সম্বাদ আবিষ্কৃত হইযাছে। প্রধান তিনটী আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা এই শাখার জন্মলাভ হইযাছে।—১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গাল্বানির আবিষ্ক্রিযা দ্বারা ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বল্টার আবিষ্ক্রিযা দ্বারা এবং ১৮২০ খৃষ্টাব্দে অয়রষ্টেডের আবিষ্ক্রিযা দ্বারা।

এখন এই তিন প্রাথমিক তথ্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সংক্ষেপে ইহাদের লক্ষণ বিবরণে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাদের দ্বারা বিজ্ঞানের নূতন পথ সকল উন্মুক্ত হওয়াতে ইহাদের হস্তে আবার এক এক শ্রেণী নূতন আবিষ্ক্রিয়া সকল বাহির হইযাছে।

গাল্বান। গাল্বানি সুস্পষ্টরূপে নিষ্পাদিত অনুসন্ধানপরম্পরা দ্বারা এই একটী প্রধান তথ্যের আবিষ্ক্রিযা করিতে সমর্থ হইলেন যে, যদি অনেকক্ষণ মৃত ব্যাঙের শরীরকেও উপযুক্ত মতে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার মাংসপেশী ও ধমনীকে একদা স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে ঐ মাংসপেশী ও ধমনীর সঙ্গে যে যে অঙ্গের যোগ আছে, সেই সেই অঙ্গেতে, ভেক জীবিত থাকিলে স্ববলে তাহারদিগেতে যেরূপ গতিক্রিয়া উত্তেজিত করিতে পারিত, ঠিক সেইরূপ সংকুচ্য গতি বিধান করা যাইতে পারে।

এরূপ ঘটনার কারণ কি হইতে পারে? এই তো নিজচেষ্টাবিহীন, প্রাণক্রিয়াশূন্য ছিন্ন কলেবর জড়রাশি (inert mass)—ইহা অকস্মাৎ

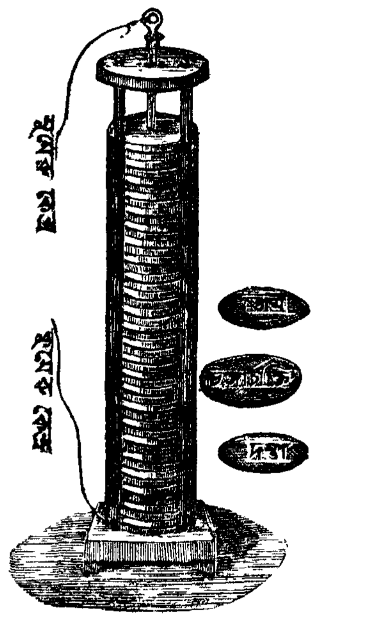
জীবনের আকার ইঙ্গিত কিরূপে পুন প্রাপ্ত হইল? প্রথমে সকলে মনে করিয়াছিল, দেহ-সঞ্চালন দ্বারা বুঝি শারীর রচনাপ্রণালীরই কোন ভেদ ব্যক্ত হইতেছে; তাহাদের মনে এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে বুঝি শরীরের মধ্যে এমন কোন জৈবনিক তরল পদার্থ আছে যাহা, ধমনী ও মাংসপেশীকে একদা স্পর্শ করিলে, দেহমধ্যে সঞ্চালিত হইয়া ঐরূপ অঙ্গচালনা উৎপন্ন করে। এই যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত, ইহার আর প্রমাণ গ্রহণ না করিয়াই ততই সকলে আদর পূর্ব্বক ইহাকে স্বীকার করিয়া লইল, যতই লোকে দেখিতে লাগিল যে, ঐ ব্যাপার কেবল যে ভেকেরই মৃত শরীরে দেখা যায় তাহা নহে, কিন্তু সকলেরই মৃতদেহে ঐরূপ হয়. কেবল যে মৃতদেহে তাহাও নহে, আবার জীবৎ পশুতেও ঐরূপ ঘটনা ঘটে এবং উহা নানারূপে প্রকাশ পায়; এবং যখন পরীক্ষকেরাও নিজে উৎসাহপূর্ণ হইয়া স্বীয় শরীরের নানাস্থানে উপরের চর্ম্ম উঠাইয়া খিলান আকার ধাতু দ্বারা একদা নিম্নস্থ চর্ম্মের দুই ভিন্ন অংশ স্পর্শ করিতেন, তাঁহারাও ঐরূপ অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়বোধ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনুমানসিদ্ধ পদার্থের নাম সকলে গাল্বানি তরল পদার্থ রাখিলেন এবং যে সকল ঘটনা গাল্বানি কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত ঘটনার অনুরূপ, তাহাদিগকে লোকে গাল্বানিত্ব অথবা গাল্বানিক্রিয়া বলে।

বল্টা। বল্টা এই প্রমাণ করিলেন যে ঐরূপ গাল্বানিক সংকুচ্যতা এবং অপর অপর ঘটনা যাহা গাল্বানিত্বের উপর নির্ভর করে, তাহা তড়িৎ ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু ঐ তড়িৎ অন্য তড়িতের মত ঘর্ষণ দ্বারা আবিষ্কৃত না হইয়া, যাহা আগে জানা ছিল না এমন বিশেষ অবস্থায় ইহার আবির্ভাব হয়। পরে তিনি অনেক নূতন পরীক্ষা দ্বারা আপনার মত সমর্থন করিয়া শ্রেণী-বদ্ধ সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তপরম্পরা দ্বারা স্তম্ভযন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন—এই আশ্চর্য্য যন্ত্র বিজ্ঞানের পক্ষে এক নূতন অব্দের সূচনা করিয়া দিয়াছে, বলিতে হইবে।

বল্টার স্তম্ভকে তড়িতের স্বাভাবিক ও অক্ষয় আকররূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহা তাড়িত স্রোতকে তদ্রূপই প্রবাহিত করে, যেমন মশাল আলোক দান করে এবং উনন তাপ প্রদান করে। ইহার পরবর্ত্তী যে সকল আবিষ্ক্রিয়া, তাহা বল্টার প্রথম আরম্ভকে এরূপ সুসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে যে তাড়িতস্রোত এখন কবচের মধ্যে আসিয়াছে—একটী সুনিশ্চিত নিয়মের মধ্যে আসিয়াছে; ইহার স্রোতের গতিকে যেদিকে ইচ্ছা চালান যাইতে পারে; ইহার আতিশয্য বা প্রগাঢ়তা নিয়মিত করা যাইতে পারে; এই স্রোতকে এত মৃদু করা যাইতে পারে যে তাহা ব্যাঙের অঙ্গ সংকোচ করিতে পারে কি না সন্দেহ; আবার ইহাকে এত পরাক্রমশালী করিয়া তোলা যাইতে পারে যে আকাশের বজ্রের সঙ্গে ইহার তুলনা হয়, কারণ বজ্রের ন্যায় ইহা জীবন ধ্বংস করে, বজ্রের ন্যায় বড় বড় লৌহ স্বর্ণ প্লাটিন খণ্ডকে গলাইয়া বাষ্প করিয়া ফেলে; তবে কিনা, ইহা এমন এক প্রকার বজ্র, যাহা ইচ্ছাতে করিয়া উৎপন্ন হয়, ইচ্ছাতে করিয়া চালিত হয় এবং ইচ্ছাতে করিয়া নিয়মিত হয়।

প্রথম প্রথম যে সকল তড়িদুদ্গাম যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাদের, উপরে যেরূপ বলা গেল, সেরূপ কিছুই অসাধারণ ক্ষমতা ছিলনা বটে কিন্তু ঐ ক্ষমতাকে সূত্ররূপে ধারণ করিত; সেই ক্ষমতাকে সম্যক্ প্রকাশ করিতে তখন অনেক পরীক্ষাপরম্পরার আবশ্যক ছিল। কিন্তু কোন বিষয়ের প্রথম আরম্ভ জানিতে আমাদের যেমন আনন্দ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না; এইজন্য বল্টা তাঁহার যন্ত্রের গড়ন যেরূপ প্রথম মনে করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এইরূপ স্তম্ভাকারে স্থাপন করাতে ইহার নামই স্তম্ভযন্ত্র হইয়া গেল।

এই স্তম্ভ, যাহাকে স্তম্ভের পোস্তাও বলে, পরপৃষ্ঠার উপকরণে রচিত হয়—সকলের নীচে



দস্তার চাক্‌তি, তাহার উপর একটা ভিজা পদার্থের চাক্‌তি, তাহার উপর একটা তাম্র চাক্‌তি—ইহাই স্তম্ভের প্রথম মূল থাক হইল; তার পরে এবং বরাবরই ঐরূপ শ্রেণীপরম্পরায় উহাদিগেকে বসাইতে হইবে—দস্তার চাক্‌তি, ভিজা চাক্‌তি, তাম্র চাক্‌তি—এইটী আবার স্তম্ভের দ্বিতীয় মূল থাক হইল; এইরূপ শত থাক পোস্তা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। কানির, কাঠের, লোমজমাট বস্ত্রের বা মণ্ডপাটের (কাগজ জমাট) চাক্‌তিকে ঈষৎ অম্ললবণ বা ক্ষারবান্ জলের দ্বারা সিক্ত করিলে তাহাকে ভিজে চাক্‌তি বলে। এইরূপ, যখন পোস্তা গাঁথা শেষ হইল, তখন যদি কেহ একদা একহাতে তাহার মূল ও আর এক হাতে তাহার অগ্রভাগ স্পর্শ করে, সে তীব্র উত্তেজনা অনুভব করে; সেই উত্তেজনা আরও অধিক হয়, যদি হাত ভিজে থাকে—বিশেষতঃ যদি দুই হাতে দুই ধাতুনির্ম্মিত ভিজে চোঙা দ্বারা যোগসাধন করা যায়। পাছে উত্তেজনা আত্যন্তিক হয়, এই জন্য স্তম্ভের কতক অংশমাত্র ঘেরের মধ্যে আনিয়া উহার মৃদুতা সম্পাদন করা যাইতে পারে; অর্থাৎ এক হাত গোড়ায় দিয়া আর এক হাত ক্রমে ক্রমে উচ্চে দিয়া দেখিতে হয়, কোন্ অবধি হাত সহে; কিন্তু বরাবরই ভিন্ন থাক্ স্পর্শ করিতে হইবে, যেমন প্রথম এবং দশম, প্রথম এবং পঞ্চদশ, প্রথম এবং শেষ—যাহাদিগকে দুই কেন্দ্র বলে। ঐ দুই কেন্দ্র বা স্পৃষ্টস্থানের মধ্যে যত অধিক সংখ্যক থাক ব্যবধান থাকে, ততই তড়িতের কার্য্য বেশী হয়।

দুই জন হে'ক, দশজন হৌক্, শতজন হৌক্, যদি পরস্পর হাতাহাতি করিয়া গোল হইয়া দাঁড়াইয়া, প্রথম ব্যক্তি যখন স্তম্ভের গোড়ায় হাত দিয়া রহিয়াছে, শেষ ব্যক্তি যদি তখন স্তম্ভের আগায় হস্তার্পণ করে, ঘেরের তাবৎ মানুষই সেই একই সময়ে উত্তেজনা অনুভব করিবে এবং ঐ উত্তেজনা ততক্ষণ বরাবর থাকে, যতক্ষণ স্তম্ভের সহিত সংস্পর্শ থাকে এবং ঘেরটাও জোড়া থাকে, ঘেরের মধ্যে বিচ্ছেদ না থাকে অর্থাৎ যদি সকলেই পরে পরে আপনার ভিজে হাত দিয়া অন্যের ভিজে হাত ধরিয়া বা স্পর্শ করিয়া থাকে; মধ্যে যদি কিছুমাত্র বিচ্ছেদ থাকে, তাহা হইলে ঘের খুলিয়া গেল, তড়িৎ আর যাইবে না, তৎক্ষণাৎ সকল ক্রিয়া ফল (effect) বন্ধ হইয়া যাইবে।

আরও, ঘেরটা স্তম্ভ হইতে অনেক দূরে থাকিতে পারে। স্তম্ভটা যেন পারী নগরে থাকিল, যেখানে বল্‌টা প্রথম ঐ যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, ঘেরটা লণ্ডন নগরে থাকিতে পারে; কেবল ঐ ঘেরকে পূরণ করিবার জন্য বার্ত্তাবহের তারের মত লণ্ডন হইতে পারী পর্য্যন্ত দুইটা সংবৃত (isolated) তার আবশ্যক। যথায় (পারীনগরে) একটা তার স্তম্ভের গোড়ার সঙ্গে যোগ থাকা, আর একটা তার উহার আগার সঙ্গে যোগ থাকা চাই। এখন, লণ্ডনেই হৌক, পারীতেই হৌক্, যেখানেই হৌক্, যেই ঘেরকে জোড়া দেওয়া যাইবে, অমনি ঘেরের তাবৎ মানুষই উত্তেজনা অনুভব করিবে এবং যে পর্য্যন্ত ঘেরটা বন্ধ থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত উত্তেজনাও বরাবর থাকিবে। ইহা ভিন্ন ট্যুরিন, লিয়ঁ এবং আর আর মাঝামাঝি স্থলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরিধি হওয়ার বাধা হয় না, স্তম্ভের বল বৃদ্ধি করিলে সর্ব্বত্রই একদা ঐ উত্তেজনা অনুভূত হইবে, কিন্তু যদি ঘেরের মধ্যে কোন স্থান খোলা না থাকে, যদি সংলগ্নতার (continuity) মধ্যে কিছু বিচ্ছেদ না থাকে। যে ঘেরে বিচ্ছেদ থাকিবে, সেই ঘেরের মানুষের উত্তেজনা অনুভূত হইবে না।

ইন্দ্র।

১ম খণ্ড ৩১২ পৃষ্ঠার পর।

আনুষঙ্গিক কথা।

ইন্দ্রের বিরুদ্ধে বৈদিক অভিযোগ এই ঃ—

(১) তাঁহার একজন নির্দ্দিষ্ট জনক আছে বলিয়া বোধ হয় না।

(২) তিনি মাতৃঘাতী।

(৩) তিনি সোমপায়ী ও সোমপ্রিয়।

আর পুরাণের প্রচলিত কাহিনীগুলি পাঠে সহজেই মনে হয়, পিনাল কোডে এমন কিছু গুরুতর অপরাধের বিধান নাই যাহা ইন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইতে পারে।

ইন্দ্র সম্বন্ধে বেদবাণী ও পৌরাণিকী কথা স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র হইবারই কথা। বেদ পুরাণ নহে, শ্রুতি—স্মৃতি নহে। তবে কিনা স্মৃতি বল, দর্শন বল, পুরাণ বল, তন্ত্র বল সকলই বেদমূলক। কেবল বেদ মূলক নহে—বেদবিরোধি আর্য্যধর্ম্মমত অগ্রাহ্য। আর বেদ সভ্যতার শৈশব যুগের অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য কৃষক বালকগণের উল্লাস সঙ্গীত নহে, বেদ অপৌরুষের আর্য্যশাস্ত্র। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ।

বেদ "আর্য্য" জাতির আদিম ধর্ম্মগ্রন্থ, সম্ভবতঃ এই কারণেই কৃষকগীতি চাষার গান, কল্পিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অর্ ধাতু হইতে আর্য্যশব্দ সিদ্ধ করেন। অর্ ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ। "ল্যাটিন, গ্রীক, এংলো স্যাক্সন, ইংরাজী, রুষ, আয়রিশ, কর্ণিস, ওয়েল্‌স্, প্রভৃতি অনেক য়ুরোপীয় ভাষায় হাল বা কৃষিবাচক শব্দগুলি এই অর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাঁহাদের মতে এই জাতি কৃষিকার্য্য করিত বলিয়া এই নাম হইয়াছে। য়ুরোপীয় উক্ত জাতিগুলি এই আর্য্য জাতি হইতে সমুদ্ভূত।" কৃষিই তখন প্রধান জীবনোপায় ছিল, এরূপ অনুমান করা অসম্ভব না হইতে পারে। সে যাহা হউক, বিশ্বস্ত পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "আসরীয়ার শিল্পলিপির অরি শব্দ হল বাচক। এই শব্দটীও আর্য্যের প্রতিরূপ হইতে পারে। যখন অরি, অর্য্য বা আর্য্য কৃষক বুঝাইতেছে, তখন আদিম আর্য্যশাস্ত্র চাষার গান ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কি বৈদেশিক, কি লৌকিক উভয়তই দেখা গেল আর্য্য শব্দ কৃষিবাচক তবে আদিম আর্য্যগ্রন্থ কৃষকের গান বলায় আপত্তি কি?

আপত্তি আছে। অপরের কথা শুনায় মহাপাপ হয় না বটে কিন্তু আত্মসম্মান ও জাতীয় গৌরবের কথার দিকে সযত্ন সম্ভ্রম দৃষ্টিপাতও একান্ত প্রার্থনীয়। দেশের লোক আর্য্য বলিতে কি বুঝে, যে বেদের কথার আলোচনা হইতেছে, সেই বেদের আচার্য্যগণ আর্য্য বলিতে কি বুঝিতেন, সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

কতকাল হইতে আর্য্য নাম প্রচলিত, এবং কি অর্থে তাহার ব্যবহার, অনুসন্ধান করিতে যাইলে দেখিতে পাই,

জগতের আদিম গ্রন্থ বেদেও ইহার উল্লেখ আছে। সে সময়ের লোকে আর্য্য বলিতে কি বুঝিত, স্পষ্ট জানিতে না পারিলেও ইহা জানা যায় যে, বৈদিক ব্যাকরণে বা ধাতু কোষে অর্ ধাতু নাই। সংস্কৃত অর্ ধাতু কাল্পনিক; ইহার অর্থ হল বা ভূমিকর্ষণ সুতরাং শূন্যভিত্তি সিদ্ধান্তস্তম্ভ। ইহারই উপর প্রাসাদ নির্ম্মাণ তাহাও কি আশ্রয়যোগ্য।

বৈদিক সময়ের যাঁহাদের কথা কোনমতে উপেক্ষা করা যাইতে পারে না, সেই যাস্ক ও সায়ণাচার্য্য ইহার *কিরূপ অর্থ করিয়াছেন, দেখা যাক্।*

যাস্ক বলেন, "আর্য্য ঈশ্বরপুত্রঃ।" আর্য্য শব্দের অর্থ ঈশ্বরপুত্র।৬।২৬

সায়ণাচার্য্য ইন্দ্র সম্বন্ধে কতক গুলি ঋকে আর্য্য শব্দের অর্থ করিতে গিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে সেগুলি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

(১) "হে ইন্দ্র! কাহারা আর্য্য এবং কাহারা দস্যু তাহা অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদিগের শাসন করিয়া (যজমানদিগের) বশীভূত কর ..১।৫১।৮। সায়ণ এই স্থলে আর্য্য অর্থ করিলেন "বিদুযোঽনুষ্টাত্রীন্" অর্থাৎ বিজ্ঞ যজ্ঞানুষ্ঠাতা।

(২) "হে ইন্দ্র! আর্য্যগণের বল ও যশ বর্দ্ধন কর।" ১।১০৩।৩। সায়ণ এস্থলেও কৃষকের বল ও যশ না বাড়াইয়া "বিদ্বাংসঃ স্তোতার" বিজ্ঞ স্তোতারই বল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন।

(৩) "হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা (চাষ করাইয়া) যব বপন করাইয়া ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া এবং বজ্র দ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া তাহার প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছ।" ১।১১০।২১। লাঙ্গল ছিল, যব বপন ছিল তথাপি সায়ণ আর্য্য অর্থ "বিদ্বান" "বিজ্ঞ" করিলেন।

(৪) ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করিয়াছেন।" ২।১৩০।৮

সায়ণ এইস্থলে আর্য্য অর্থ করিলেন "অরণীয়ং সর্ব্বগন্তব্যং" অরণীয় বা সর্ব্ব-গন্তব্য।

(৫) "ইন্দ্র অশ্ব দান করিয়াছেন, সূর্য্য দান করিয়াছেন, বহু লোকের উপদেশযোগ্য বোধন দান করিয়াছেন, *সুবর্ণময় ধন দান করিয়াছেন, দস্যু-*দিগকে বধ করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।" ৩।৩৪।৯

সায়ণ এস্থলেও আর্য্য শব্দে কৃষক না বুঝাইয়া "উত্তমং বর্ণং ত্রৈবর্ণিকম" ত্রৈবর্ণিক উত্তম বর্ণ অর্থ করিয়াছেন।

(৬) ইন্দ্র বলিতেছেন, "আমি আর্য্যকে পৃথিবী দান করিয়াছি। ৪।২৫।২

সায়ণ চাষা হস্তে পৃথিবী দান না করাইয়া "মনবে" মনুর হস্তে পৃথিবী দান করিয়াছেন।

আরও দেখুন—

(৭) হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে সমবেত বিপুল মঙ্গলময় সম্পত্তি প্রদান কর, যেন শত্রুগণ বর্ষণ করিতে সমর্থ না হয়? হে বজ্রধর! তুমি সম্পত্তি দ্বারা কি দস্যু কি আর্য্য সমুদয় মানব শত্রুকে সুজেয় সম্পাদন করিয়াছ। ৬।২২।১০

সায়ণ তথাপি ভুলিয়াও বলিলেন না আর্য্য অর্থে কৃষক। তিনি আর্য্য শব্দের "কর্ম্মযুক্তানি" কর্ম্মযুক্ত অর্থ করিয়াছেন।

(৮) "হে বীর ইন্দ্র! তুমি কি দস্যু, কি আর্য্য উভয়বিধ মানবই সংহার করিয়াছ।" ৬।৩৩।৩

সায়ণ ইন্দ্রের উপরি এস্থলে দুষ্ট দস্যু এবং অসভ্য বা অৰ্দ্ধসভ্য কৃষক, উভয়-বিধ শত্রু সংহার গুণ অর্পণ না করিয়া "কৰ্ম্মানুষ্ঠাতৃত্বেন শ্রেষ্ঠানি" কৰ্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠদিগের সংহারের ব্যবস্থায় কুণ্ঠিত হন নাই।

সায়ণের ব্যাখ্যায় এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, সেই অনাদিপ্রায় প্রাচীনকালে একটি জ্ঞানবান জাতি ছিল। যজ্ঞাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহা-দিগের গতি সর্ব্বতোমুখী। হয়ত তাহারা ঈশ্বরকে সকলেরই পিতা বলিয়া বুঝিয়াছিল।

এখনকার মতে ধাতুগত অর্থ ধরিয়া অর্থ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, ঋ ধাতু ণ্যৎ করিয়া আর্য্য শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ঋ ধাতুর যে অর্থ গমন ও ব্যক্ত কর। ইহা হইতে সায়-ণের অরণীয়ং সর্ব্বগন্তব্যম্ অর্থ স্থিরতর হইতে পারে। গমন বা ব্যাপ্ত দেখিয়া হলচালনা বা ভূমিকর্ষণ অর্থ কল্পনা করা যদি অতিকল্পনা না হয়, তাহা হইলে যাহাদের ধীশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি সর্ব্বগামিনী, অগ্নিইন্দ্রে তারকা তপনে ভূলোকে, স্বলোকে গমন করিতে সমর্থ বা ব্যস্ত, তাহারাই আমাদের আর্য্যজাতি, এরূপ অনুমান অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক বলিবে কি?

বৈদিক প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিলেও প্রচলিত সকল স্থলে আর্য্য শব্দে বিজ্ঞতা বা শ্রেষ্ঠত্ব বুঝায়। হলচালনা বা ভূমি-কর্ষণ বোধক প্রয়োগ কোথাও নাই।

"পারসীকদিগের আবেস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রে ঐর্য্য শব্দ শ্রদ্ধাস্পদ ও লোকসাধারণ এই দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর্মাণি ভাষায় অরি শব্দের অর্থ ইরানি ও মানসিক। অতএব যখন বেদব্যতীত আসিয়া খণ্ডের অপর প্রাচীন ভাষাতেও বিকৃতাকার প্রাপ্ত আর্য্য শব্দের অর্থ হল বা ভূমিকর্ষণ উভয়ের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে না" তখন "আর্য্য" শব্দের কৃষক বা ভূমিকর্ষণ প্রভৃতি অর্থগ্রহণ কিরূপে যুক্তিসঙ্গত বলা যাইতে পারে? *

এখন এই অগ্রাহ্য কথা ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয় কথা, বেদ অপৌরুষেয়। আর্য্য ধৰ্ম্ম শাস্ত্র অসংখ্য কিন্তু বেদ নিত্য অপৌ-রুষেয় ব্রহ্মবাণী। ইহা মানবের মুখের কথা নহে। কথাটা আজিকার দিনে অনেকের নিকট উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আর্য্য ঋষি মুনি-গণ ইহা উপহাসের বিষয় মনে করিতেন না। আত্মদর্শী দর্শনকারদিগের নিকটও ইহা উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। মহাভারত প্রণেতার ন্যায় বিশ্ব-বলিনী বুদ্ধিমান ও কল্পনাপ্রিয় পুরুষও ইহা অযৌক্তিক মনে করেন নাই। বর্ত্তমানকালে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ধৰ্ম্ম-বীরও কথাটিকে উপেক্ষা করেন নাই। আর অসাধারণ পুস্তক অসাধারণ আজ-গবি মত প্রচার করিয়া লাভবান বা কীর্ত্তিমান হইবে এরূপ কোন গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনার জন্যও এই মত সাধা-রণ্যে জাহির হয় নাই। পূর্ব্বতন আচা-র্য্যেরা এই কথায় কি বুঝিতেন, তাহাই একবার আলোচনা করিয়া দেখিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী।

* কবশজীএদলজী কাঙ্গাকৃত বন্দী দাসের গুজরাটী অনুবাদের শেষে একখানি অভিধানে ঐর্য্য শব্দের আসল অর্থ অর্য্য বা আর্য্যগৃহিত হইয়াছে। এই ঐর্য্য শব্দ হইতে ফার্সী ইরান শব্দ হইয়াছে। (বিশ্বকোষ)

আয়ুর্ব্বেদ।

মদাত্যয়।

অন্যান্য চিকিৎসার ন্যায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় মদ্যপান বিধি সমধিক প্রচলিত না থাকিলেও মদ্যপান বিরল বা একেবারে নিষিদ্ধ নহে। গুণগ্রাহি মহাত্মাগণ গুণেরই আদর করিতেন, ভক্ষ্য অভক্ষ্য বা পাপ পুণ্য লইয়া সমাজকে বিচলিত করিতেন না, সেই জন্য আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায়ও কতকগুলি ঘৃণার্হ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অদ্য সে বিষয়ের মীমাংসার কোন প্রয়োজন নাই, তবে বলিতে হইবে মদ্যপান শাস্ত্র ও সমাজ-বিরুদ্ধ হইলেও আয়ুর্ব্বেদ মতে নিষিদ্ধ নহে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সমুদায় রীতিতে মদ্যপান উল্লিখিত হইয়াছে, আধুনিক মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে ঐ রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা অতীব দুরূহ ব্যাপার। এখন সুখের বিনিময়ে ঘোর দুঃখভোগ মদ্যপায়ীর সতঃসিদ্ধ। যাহার হৃদয়ে বল আছে, চিত্ত সংযমিনী শক্তি আছে, তিনিই যেন সুখের আশায় মদ্যপান করেন। নচেৎ নির্ধন ধনবান্, রোগী নীরোগ, ইতর ভদ্র কাহারও পক্ষে মদ্যপান সঙ্গত নহে, পরন্তু সর্ব্বতোভাবেই নিষিদ্ধ। এখন ধর্ম্মের জন্য মদ্যপান নাই, যোগসিদ্ধির জন্য মদ্যপান নাই, ঔষধার্থ মদ্যপান নাই, আছে বিলাসিনীর কালকূটপূর্ণ কটাক্ষরূপ কন্দর্প-শর জর্জ্জরিত যুবকের যন্ত্রণা নিবারণার্থ, তন্ত্রযুক্তি প্রভাবে ভারতবর্ষে মদ্য পান-প্রথা বহুকাল হইতে গুপ্তভাবে চলিতেছিল কিন্তু ইংরাজ রাজের মহিমায় ভারতে আর সে গুপ্তভাব নাই, প্রকাশ্যেই সমস্ত সংঘটিত হইতেছে, পক্ষান্তরে যাহাদিগকে আমরা শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রভাবশালী, ধনবান্ ও বিদ্বান্ বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের অধিকাংশই ঐ ভয়ঙ্কর দোষে দূষিত, অনুকরণপ্রিয় ভারতবাসী আবার উহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া মজিতে বসিয়াছে। সুরা রাক্ষসীর করাল দশন-বিকাশ কে না দেখিয়াছে? সর্ব্বসংহারিণী সুরার অসীম শক্তিতে কত শত অমরাবতী বিনিন্দিত সুরম্যহর্ম্ম্য মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। সুরা সাহায্যে কত শত বলিষ্ঠ যুবক শীর্ণ বিশীর্ণ কঙ্কাল-সার কলেবরে কাল কবলে কবলিত হইতেছে। মনুষ্য সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া গোহত্যা নরহত্যা স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি কোন্ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে? বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ধর্ম্ম শাসনের ন্যায়, সমাজ শাসনের ন্যায়, পারিবারিক শাসনের ন্যায়, রাজ শাসন সুদৃঢ় নহে। পুরাকালে ভারতে মদ্যপান প্রথা ছিল বটে, কিন্তু এরূপ নৃশংসতা কে কবে দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে? অনেকে মনে করেন, ঈদৃশ অনিষ্টজনক মদ্যপান কিরূপে সর্ব্বজনীন আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত হইল? আবার অনেক সময় আয়ুর্ব্বেদের দোহাই দিয়া অনেকে সুরা পিপাসার

শান্তিও করিয়া থাকেন। আজ আমরা সেই জন্য কিরূপ সুরাপান আয়ুর্ব্বেদানুমোদিত ও সুরার দোষ গুণ কি, তাহাই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রেত্য চেহ চ যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রেয়ো মোক্ষশ্চ যৎ পরম্।
মনঃসমাধৌ তৎ সর্ব্ব মায়ত্তং সর্ব্বদেহিনাম্॥

মনুষ্যদিগের ইহকাল ও পরকালে যাহা শ্রেয়ঃ, মঙ্গল ও মোক্ষ, উহা সম্পূর্ণভাবে চিত্তৈকাগ্রতার আয়ত্ত অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত ইহও পরকালে শ্রেয়ঃ মোক্ষ বা মঙ্গল লাভ করা যায় না। মদ্যপানে চিত্তের সংক্ষোভ উপস্থিত হয়, সুতরাং ইহ ও পরকালে মদ্যপায়ীরা কখনই শ্রেয়ঃ বা মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় না।

মদ্যেন মনস শ্চাস্য সংক্ষোভঃ ক্রিয়তে মহান্।
মহামারুতবেগেন তটস্থস্যেব শাখিনঃ॥

প্রবল বায়ুবেগে নদীতটস্থ বৃক্ষ যেরূপ আন্দোলিত হয়, সেইরূপ মদ্যপানে মনের যৎপরোনাস্তি সংক্ষোভ উপস্থিত হয়। মদ্যপানে মনের স্থিরতা সম্পাদন অতীব দুরূহ ব্যাপার।

মদ্যপ্রসঙ্গ মজ্ঞাত্বা মহাদোষং মহাগদম্।
সুখ মিত্যধিগচ্ছন্তি রজোমোহ পরাজিতাঃ॥

রজঃ ও তমোগুণাভিভূত ব্যক্তিগণ মদ্যপানের রোগোৎপাদক মহাদোষ না জানিয়া সুখের আশায় মদ্যাসক্ত হইয়া পড়েন ও চিরকাল মদ্যপানের দুর্নিবার অপকার ভোগ করিতে থাকেন।

মদ্যোপহতবিজ্ঞানা বিযুক্তাঃ সাত্ত্বিকৈ গুণৈঃ।
শ্রেয়োভি র্বিপ্রযুজ্যন্তে মদান্ধা মদলালসাঃ॥
মদ্যে মোহো ভয়ং শোকঃ ক্রোধো মৃত্যুশ্চ সংশ্রিতাঃ
সোন্মাদ মদ মূর্চ্ছাদ্যাঃ সাপস্মারাপতানকাঃ॥
যত্রৈকঃ স্মৃতিবিভ্রংশ স্তত্র সর্ব্ব মসাধুবৎ।
ইত্যেবং মদ্যদোষজ্ঞা মদ্যং গর্হন্তি বক্তৃতঃ॥

মনুষ্যগণ মদ্যপান করিয়া অজ্ঞানরূপ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, স্বাভাবিক সাত্ত্বিক গুণ সমুদায় হীন হয়, সুতরাং মদলালস মদান্ধ ব্যক্তিকে সত্বর মঙ্গল সমূহ হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িতে হয়। মদ্য হইতে মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ, উন্মাদ, মত্ততা, মূর্চ্ছা, অপস্মার ও অপতানক প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মদ্য হইতে মৃত্যুপর্য্যন্তও সংঘটিত হইয়া থাকে। পরন্তু যাহা হইতে একমাত্র স্মৃতিভ্রংশ উপস্থিত হয়, এমন কোন অমঙ্গল নাই, যাহা তাহা হইতে সংঘটিত হইতে পারে না। মদ্যদোষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপে সর্ব্বদা মদ্যের নিন্দা করিয়া থাকেন।

যে বিষস্য গুণাঃ প্রোক্তা স্তেহপি মদ্যে পতিষ্ঠিতাঃ।

বিষের যে সমুদায় গুণ অর্থাৎ বিষে যে সমুদায় অনিষ্টকারিণী শক্তি আছে, মদ্যের ও তাদৃশী শক্তি।

সত্য মেতে মহাদোষা মদ্যস্যোক্তা ন সংশয়ঃ।
অহিতস্যাতিমাত্রস্য পীতস্য বিধিবর্জ্জনম্॥
কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথাস্মৃতম্।
অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতম্॥
প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥

পূর্ব্বে মদ্যের যে সমুদায় দোষ উল্লিখিত হইল, মদ্যপান বিধি অতিক্রম করিলে বাস্তবিকই ঐ সমুদায় অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে কিন্তু বিধিবিহিত মদ্যপানে অপকার না ঘটিয়া উপকারই সংঘটিত হয়। উহা ক্রমশঃ প্রদর্শন করা যাইতেছে। মদ্য স্বভাবতঃ অন্নসদৃশ হিতকর দ্রব্য। অবৈধভাবে সেবিত হইলে নানাবিধ রোগের কারণ হয় বটে, কিন্তু বিধি অনুসারে পীত মদ্য অমৃতসদৃশ হিতকর

বস্তু। যে অন্ন প্রাণিদিগের প্রাণস্বরূপ, তাহাও অযথারূপে সেবিত হইয়া প্রাণনাশক হয় এবং স্বভাবতঃ প্রাণনাশক গুণসম্পন্ন বিষও যুক্তি অনুসারে সেবিত হইয়া রসায়ন সদৃশ উপকার করে। মদ্যও তদ্রূপ।

যুক্তিপূর্ব্বক মদ্যপান করিলে হর্ষ, বল, পুষ্টি, আরোগ্য ও পৌরুষ জন্মে। যে মদ্যপানে মত্ততা জন্মে, দুঃখ না হইয়া সুখ হয়, ঐ মদ্য রুচিকারক, পাচকাগ্নির উদ্দীপক, হৃদয়ের সন্তোষজনক, বলকারক, ভয় শোক এবং শ্রমনাশক, নিদ্রাজনক, বাক্‌পটুতাজনক, অতিনিদ্র ব্যক্তির প্রবোধক, মলমূত্রের বিবন্ধ নাশক, আঘাতপ্রাপ্তি এবং বন্ধনাদি যন্ত্রণার নিবর্ত্তক। মদ্যোত্থ রোগের নিবর্ত্তক, রতিবর্দ্ধক, মনঃসংযোগকারক, প্রীতিবর্দ্ধক এবং অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরও উৎসব ও আনন্দজনক।

বহু দুঃখকৃতস্যাস্য শোকেনোপহতস্য চ।
বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতম্॥

বহুবিধ দুঃখ ও শোকোপহত ব্যক্তির যুক্তিপূর্ব্বক নিষেবিত মদ্যই একরূপ বিশ্রামস্থল অর্থাৎ ক্লেশ-নিবারক।

অন্ন পান বয়োব্যাধি বল কাল ত্রিকাণি ষট্।
ত্রীন্ দোষাংস্ত্রিবিধং সত্বং জ্ঞাত্বা মদ্যং পিবেৎ সদা॥

ত্রিবিধ অন্ন, ত্রিবিধ পান, ত্রিবিধ বয়ক্রম, ত্রিবিধ ব্যাধি, ত্রিবিধ কাল, ত্রিবিধ দোষ ও ত্রিবিধ সত্ব এই সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া মদ্যপান করা কর্ত্তব্য।

তেষাং ত্রিকাণামষ্টানাং যোজনা যুক্তি রুচ্যতে।
যথাযুক্ত্যা পিবেন্ মদ্যং মদ্যদোষৈ র্ন যুজ্যতে॥

উল্লিখিত ত্রিবিধ অন্নাদির সম্যক্ যোজনার নাম যুক্তি, ঐ যুক্তি অনুসারে মদ্যপান করিলে কোন দোষই ঘটে না।

আপানে সাত্বিকান্ বুদ্ধা তথা রাজস তামসান্।
জহ্যাৎ সহায়ান্ যৈঃ পীত্বা সহদোষানুপাপ্নুতে॥

মদ্যপান স্থলে সাত্বিক, রাজস ও তামস বিবেচনা করিয়া মদ্য পান করা উচিত, যাহাদের সহিত মদ্যপান করিলে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত কথনই মদ্যপান করা বিধেয় নহে। আজ কাল এই সঙ্গ দোষ বিবেচনা না করার জন্যই অনেক লোককে বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়। যে সমুদায় ব্যক্তি সুশীল, মিষ্টভাষী, সুমুখ, সজ্জন, গীত বাদ্যাদি কলাকুশল, বিশদ বাক্, বিষয়াদিতে অত্যাসক্তিরহিত, পরস্পর বশীভূত ও সৌহার্দ্দযুক্ত, যাহারা সুমধুর হাস্য ও প্রীতিজনক বাক্য দ্বারা পান ভূমিব উৎসব পূর্ণ করে এবং যাহারা পরস্পর দর্শনে সুখ বোধ করে, তাহাদিগের সহিত মদ্যপান করিলে মদ্যপায়ী আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। অনিচ্ছা সত্বেও মদ্যপানের কতিপয় ক্রম লিখিত হইল, অধিক লেখা আবশ্যক মনে করি না, কারণ আমাদের মতে মদ্যপান অনাবশ্যক ও অনুচিত।

মদ্যের পরিমাণ ও তীব্রতাভেদে চারি প্রকার মত্ততা উপস্থিত হয়। অতঃপর যথাক্রমে ঐ সমুদায়ের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বুদ্ধিস্মৃতিপ্রীতিকরঃ সুখশ্চ, পানান্ন নিদ্রারতি বর্দ্ধনশ্চ। সংপাঠগীত স্বর বর্দ্ধনশ্চ, প্রোক্তোঽতি রম্যঃ প্রথমো মদো হি॥

প্রথম মদ বুদ্ধিপ্রকাশক, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, প্রীতিজনক, সুখোৎপাদক এবং

পান, ভোজন, রতিশক্তি ও কণ্ঠস্বর সংবর্দ্ধক এইরূপ মদাবস্থা অতীব সুখকর। যাহাদের মদ্যপান নিতান্ত প্রয়োজন, তাহারা যেন এরূপ ভাবে মদ্যপান করেন, অর্থাৎ উল্লিখিত লক্ষণ সমুদায় হইতে অতিরিক্ত কোন লক্ষণ উপস্থিত না হয়। বাস্তবিক পক্ষে কেহই মদ্যপানে স্থির থাকিতে পারে না, আকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তিই ইহার মূল কারণ অর্থাৎ প্রথম মদ্যপানের পর সকলেই মনে করেন, আরও একটু পান করিলে ইহাপেক্ষা অধিকতর সুখোদয় হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত হইয়া পড়ে।

অব্যক্ত বুদ্ধিস্মৃতি বাগ্ বিচেষ্টং,
সোন্মত্তলীলাকৃতি বপ্রশান্তং ॥
আলস্য নিদ্রাভিহতো মুহুশ্চ,
মধ্যেন মত্তঃ পুরুষো মদেন ॥

দ্বিতীয়মদমত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি, স্মরণ শক্তি ও বাক্য সম্যক্ ব্যক্ত নহে অর্থাৎ জড়তাযুক্ত, চেষ্টার বিকৃতি, আকৃতি ও কার্য্য উন্মত্তের ন্যায় এবং মুহুর্মুহু আলস্য ও নিদ্রার অবির্ভাব এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইলেও মদ্য পান হইতে বিরত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য নচেৎ অতীব দুরবস্থাগ্রস্ত হইতে হয়। ইহার নাম দ্বিতীয় মদ।

গচ্ছেদগম্যাং ন গুরূংশ্চ মন্যেৎ,
খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্টসংজ্ঞঃ ॥
ব্রূয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদিস্থিতানি
মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ ॥

মদ্যপানে দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা নিবৃত্ত হয়না আরও অধিক পান করিতে থাকে, ঐ সমুদায় ব্যক্তির নিন্দনীয় তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হইলে মনুষ্য অগম্যা নারীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, গুরুজনের অবমাননা করে, এবং হৃদয়স্থ গুহ্য বিষয় প্রকাশ করে ও অভক্ষ্য ভক্ষণ করে। এতদবস্থ ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য ও আপনার অনায়ত্ত হইয়া পড়ে।

চতুর্থে তু মদে মূঢো ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
কার্য্যাকার্য্য বিভাগাজ্ঞো মৃতাদপ্যপরো মৃতঃ ॥
কো মদং তাদৃশং গচ্ছেদুন্মাদ মিব চাপরম্।
বহুদোষমিবামূঢঃ কান্তারং স্ববশঃ কৃতী ॥

অতঃপর চতুর্থ মদাবস্থায় মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানশূন্য, ভগ্ন কাষ্ঠের ন্যায় নিষ্ক্রিয় ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার শূন্য হইয়া পড়ে। চতুর্থমদাবস্থ ব্যক্তি অবিকল মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। অমূঢ় অর্থাৎ বিচার শক্তি সম্পন্ন আত্মবান্ কোন্ কৃতী ব্যক্তি বহুদোষোৎপাদক বিবিধ হিংস্রজন্তুসংকুল দুর্গম পথের ন্যায় চতুর্থ মদাবস্থায় উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন। মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলে প্রায়শঃই সকলকে যুক্তিচ্যুত হইয়া পড়িতে হয় এবং অবশেষে নানা বিধ বিপদে পতিত হইতে হয়। তুলনা করিতে গেলে মদ্যপানে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক। সুতরাং কাহারই পক্ষে মদ্যপান যুক্তি বা শাস্ত্রসম্মত নহে।

নির্ভক্ত মেকান্তত এব মদ্যং, নিষেব্যমানং মনুজেন নিত্যং। আপাদয়েৎ কষ্ট তমান্ বিকারান্ আপাদয়েচ্চাপি শরীরভেদম্ ॥

নিত্য অধিক পরিমাণে অন্নাদি উপকরণহীন মদ্যপান করিলে, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য কষ্টদায়ক রোগ জন্মে এবং পরিশেষে তদ্দ্বারা মৃত্যুপর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে।

ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন,
শোকাভিতপ্তেন বুভুক্ষিতেন॥
ব্যায়ামভারাধ্ব পরিক্ষতেন,
বেগাবরোধাভিহতেন চাপি॥
অত্যম্ল ভক্ষাবততোদরেণ
সাজীর্ণভুক্তেন তথাবলেন॥
উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্যমানম্,
করোতি মদ্যং বিবিধান্ বিকারান্॥

ক্রোধ, ভয়, পিপাসা, শোক ও ক্ষুধার সময়, ব্যায়াম ভারবহন বা পথ পর্য্যটন দ্বারা ক্লান্ত অবস্থায়, মল মূত্রাদির উপস্থিত বেগ রোধ করিয়া, অন্ন ভোজন বা জলপান দ্বারা উদরের পূর্ণাবস্থায়, দৌর্ব্বল্যাবস্থায় এবং উষ্ণাবস্থায় অর্থাৎ পরিশ্রমাদি দ্বারা শরীর উষ্ণ হইলে মদ্যপান করিবে না উহাতে পানাত্যয়াদি কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়।

পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণ মথাপি চ।
পান বিভ্রম মুগ্রঞ্চ যকৃদ্রোগং করোতি তৎ॥
তৎ অবধিপীত মদ্য মিত্যর্থঃ।

শাস্ত্রীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া মদ্যপান করিলে, পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ, পান বিভ্রম ও দারুণ যকৃৎ রোগ উৎপন্ন হয়। পানাত্যয় ও মদাত্যয় এই দুইটী শব্দ একার্থ বাচক সুতরাং মদাত্যয়াধিকার নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

হিক্কা শ্বাস শিরঃকম্প পার্শ্বশূল প্রজাগরৈঃ।
বিদ্যাদ্ বহুপ্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

বাতিক মদাত্যয় রোগে হিক্কা, শ্বাস, শিরঃকম্পন, পার্শ্ববেদনা, নিদ্রানাশ ও প্রলাপ বাহুল্য এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

তৃষ্ণাদাহ জ্বর স্বেদ মোহাতিসার বিভ্রমৈঃ।
বিদ্যাদ্ধরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

পৈত্তিক মদাত্যয় রোগে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা, অতিসার, ভ্রম ও দেহের হরিতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ছর্দ্দ্যরোচক হৃল্লাস তন্দ্রাস্তৈমিত্য গৌরবৈঃ।
বিদ্যাচ্ছীতপরীতস্য কফপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

শ্লৈষ্মিক মদাত্যযে বমি, অরুচি, বমনবেগ, তন্দ্রা, গাত্রে আর্দ্র বস্ত্রাবৃতবৎ বোধ, দেহের গুরুতা ও অতিশয় শীত এই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উল্লিখিত বাতিকাদি ত্রিবিধ মদাত্যয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সান্নিপাতিক মদাত্যয় জানিতে হইবে। পরমদ প্রভৃতিতে মদাত্যয লক্ষণের অতিরিক্ত কতকগুলি লক্ষণ লক্ষিত হয়। পরমদ নামক রোগে শ্লেষ্ম-প্রাচুর্য্য, নাসাস্রাব, দেহভার, মুখ বৈরস্য, মলমূত্র রোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা, শিরোবেদনা ও সন্ধি সমুদয়ে ভঙ্গবৎ বেদনা প্রভৃতি শ্লেষ্ম লক্ষণ সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পীত মদ্য জীর্ণ না হইয়া পানাজীর্ণ রোগ জন্মায়। ইহাতে অতি ক্লেশকর উদরাধ্মান, বমন, অথবা মদ্যগন্ধযুক্ত উদ্গার ও গাত্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পান বিভ্রমাখ্য রোগে সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বক্ষস্থলে সূচিবেধবৎ বেদনা, কফ স্রাব, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমনবৎ বোধ, মূর্চ্ছা, বমি, শিরঃপীড়া, দাহ এবং গৌড়ী (ধেনো) কাদম্বরী (তাড়ী) প্রভৃতি মদ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়।

মদ্যানাং সততাভ্যাসাৎ তীব্রমদ্য নিষেবণাৎ।
নিরন্নাদপি পানাচ্চ যকৃদ্রোগা ভবন্তি হি॥
যকৃদ্রোগাধিকারে তান্ সলক্ষণ চিকিৎসিতান্।
পুরাসেচনকেভ্যো বো ব্যাসতোঽহমকীর্ত্তয়ম্॥

বিবিধ মদ্যের নিরন্তর পান, তীব্র মদ্য পান, ও খাদ্য রহিত মদ্যপান প্রভৃতি কারণে যকৃৎ রোগ উৎপন্ন হয়। যকৃতে যে সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে, ঐ সমুদয় এবং তাহার চিকিৎসা যকৃদধিকারে ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

রাজযক্ষ্মা চিকিৎসা।

দোষাধিকানাং বমনং শস্ততে সবিরেচনম্!
স্নেহ স্বেদোপপন্নানাং সস্নেহং যন্ন কর্ষণম্॥

দোষের আধিক্য থাকিলে স্নেহ ও স্বেদ প্রদানের পর স্নেহযুক্ত বমন কিম্বা বিরেচন প্রদান করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের বল মলায়ত্ত এবং শুক্রায়ত্ত জীবন, অতএব কিরূপে যক্ষ্মারোগীকে বমন বিরেচন দেওয়া যায়? বস্তুতঃ যক্ষ্মারোগী যদি বলবান্ হয় এবং দোষের আধিক্য থাকে, তবে যাহা শরীরের পক্ষে কর্ষণ অর্থাৎ ক্ষয়কর নহে, তাদৃশ মৃদুবিরেচন দেওয়া যাইতে পারে। কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

যোগান্ সংশুদ্ধকোষ্ঠানাং কাসে শ্বাসে স্বরক্ষয়ে।
শিরঃ পার্শ্বাংস শূলেষু সিদ্ধানেতান্ প্রযোজয়েৎ॥

উক্তরূপ সংশোধন দ্বারা কোষ্ঠ শুদ্ধ হইলে, কাস, শ্বাস, স্বরক্ষয়, শিরঃশূল, পার্শ্ববেদনা, ও অংস বেদনা প্রভৃতিতে বক্ষ্যমাণ ঔষধ সমুদায় ব্যবস্থা করিবে।

খর্জ্জূর ও কিস্‌মিস্ সমভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ চিনি, পিপ্পলী চূর্ণ, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, কাস ও শ্বাস প্রভৃতির নিবৃত্তি হয়।

দশমূল শৃতাৎ ক্ষীরাৎ সর্পির্যদুদীয়াৎ নবম্।
সপিপ্পলীকং সক্ষৌদ্রং তৎপরং স্বরবোধনম্॥
শিরঃ পার্শ্বাংস শূলঘ্নং কাস শ্বাস জ্বরাপহম্।

একসের দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া দশমূলের সহিত চারিসের জল দিয়া পাক করিবে ও দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং উহা হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া পরিপাক শক্তি অনুসারে অর্দ্ধ বা এক তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু সহ সেবনে, স্বরভঙ্গ, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, অংসশূল, কাস, শ্বাস, ও জ্বর নিশ্চয় নিবারিত হয়। বিশেষতঃ ইহাতে কণ্ঠ-স্বরের অতীব উৎকর্ষ সাধিত হয়, গাথকগণ স্বরের উৎকর্ষ সাধনার্থ ইহা পান করিয়া থাকেন। শ্লোকোক্ত নব শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে সদ্যোঘৃতই প্রশস্ত। একদিন প্রস্তুত করিয়া ২।৪ দিন সেবনে কোন বিশেষ অনিষ্ট না থাকিলেও অবশ্যই উপকারের তারতম্য স্বীকার করিতে হইবে।

সিতোপলাদি লেহ—দারচিনি ১ তোলা, এলাচি ২ তোলা, পিপ্পলী ৪ তোলা, বংশলোচন ৮ তোলা ও মিছরি ১৬ তোলা একত্র সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ৵০ হইতে ।০ আনা মাত্রার কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, শ্বাস, কাস ও অন্যান্য কফ জন্য পীড়া নিবারিত হয় এবং আনুষাঙ্গিক জিহ্বাসুপ্ততা (স্বাদ গ্রহণে অশক্তি) অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও পার্শ্বশূল বিনষ্ট হয়। মধু দিয়া মাড়িয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

অজাপঞ্চক ঘৃত—ছাগ ঘৃত ৪ সের ছাগ বিষ্ঠার রস ৪ সের, ছাগমূত্র ৪ সের, ছাগ দুগ্ধ ৪ সের ও ছাগদধি ৪ সের,

ঘৃত পাকোক্ত নিয়মে পাক করিয়া ১সের যবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা ॥০ হইতে ১ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাস রোগ প্রশমিত হয়।

ছাগ মাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ॥

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, শর্করার সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগ সেবা ও ছাগ মধ্যে শয়ন করিয়া থাকা যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারক।

জীবন্তীং মধুকং দ্রাক্ষাং ফলানি কুটজস্য চ।
শটীং পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রীং গোক্ষুরকং বলাম্॥
নীলোৎপলং চামলকীং ত্রায়মাণাং দুরালভাম্।
পিপ্পলীঞ্চ সমং পিষ্ট্বা ঘৃতং বৈদ্যো বিপাচযেৎ।
"এতদ্ব্যাধি সমূহস্য রোগেশস্য সমুত্থিতম্।
রূপ মেকাদশবিধং সর্পি রগ্র্যং ব্যপোহতি॥"

জীবন্ত্যাদ্য ঘৃত—ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের, কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, শঠি, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, নীলোৎপল, ভুঁইআমলা, বলা ডুমুর, দুরালভা ও পিপ্পলী মিলিত ১ সের। ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঘৃত সেবনে কাসাদি উদ্রিক্ত একাদশ লক্ষণাক্রান্ত ঘোর রাজযক্ষ্মা প্রশমিত হয়।

বাসায়াং বিদ্যমানায়াং আশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কথং সীদসি মানব॥

বহুকাল যাবৎ এই বচনটী প্রচলিত আছে যে, বাসক বিদ্যমান থাকিতে জীবিতাকাঙ্ক্ষী রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও কাস গ্রস্ত ব্যক্তি কেন অবসন্ন হইতেছ। বাস্তবিক শ্লোকটীর যাথার্থ্য শত শত স্থলে প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে ও হইতেছে। বাসকের অসীম শক্তি কাহারই অবিদিত নহে। অন্য ঔষধের অভাবে কেবল বাসক পত্র রস সেবনেও কাসাদি রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। একমাত্র বাসকই যখন এতাদৃশ উপকারী, তখন তাহার সহিত অন্য বস্তু মিশ্রিত হইলে যে নিশ্চয় আরোগ্য জনক হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

শতং সংগৃহ্য বাসায়া স্তোয়দ্রোণে বিপাচয়েৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিন্ শর্করায়াঃ পলং শতম্॥
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধিঞ্চ কট্‌ফলং মুস্তকং গদম্।
জীরকং পিপ্পলীমূলং রোচনী চবিকা শুভা॥
কটুকী শ্রেয়সী চৈব তালীশং মধনীয়কম্।
কাষিকং পৃথগেতেষাং ক্ষিপেন্মধুপলাষ্টকম্॥
তদ্ যথাগ্নিবলং লিহ্যাচ্ছৃত শীতাম্বু পানতঃ।
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং রক্তপিত্তং ক্ষতং ক্ষয়ম্॥
বাতিকং পৌত্তিকঞ্চৈব শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কাসঞ্চৈবারুচিং জ্বরম্॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতো হ্যেষ বৃহদ্ বাসাবলেহকঃ।

বৃহৎ বাসাবলেহ—বাসক মূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের অর্থাৎ ৬৪ সের জলে ১২॥০ সের বাসক মূলের ছাল (অভাবে গাছের ছাল) জাল দিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া উহাতে ১২॥০ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্‌ফল, মুতা, কুড়, জীরা, পিপুলমূল, কমলাগুড়ী, চই, বংশলোচন, কট্‌কী, গজপিপ্পলী, তালীশ পত্র ও ধনে ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে ও আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে উহাতে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ॥০ হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা স্থির করিয়া

শৃতশীতল (উষ্ণজল শীতল) জলের সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, যক্ষ্মা ও শ্বাসাদি নানা রোগ নিবারিত হয়। গ্রন্থান্তরে বৃহৎ বাসাবলেহের অনুরূপ প্রস্তুত প্রাণালী দেখা যায়, উহাতে কতিপয় দ্রব্য অধিক থাকায় ইহাপেক্ষা আশু ফলদায়ক হয়, সুতরাং, উহার নিয়মও লিখিত হইতেছে।

বৃহতী ২০০ তোলা, কণ্টকারী ২০০ তোলা, বালক মূলের ছাল ২০০ তোলা বামনহাটীর মূলের ছাল ২০০ তোলা ৬৪ সের জলে জ্বাল দিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, ইহাতে ২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে অভ্র ৮ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৩২ তোলা, কুড়, তালীশপত্র, তেজপত্র, মরিচ, বেনার মূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক্, বামন হাটী, বালা ও মুতা ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ঘৃত অর্দ্ধ সের প্রদান করিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ১ সের প্রদান করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা বালক, বৃদ্ধ ও যুবা সকলের পক্ষেই সমান উপকারক। রাজযক্ষ্মা ও রক্ত পিত্ত প্রভৃতি রোগে ইহার আশ্চর্য্য ফল সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্ষয়কারক সান্নিপাতিক যক্ষ্মারোগে জ্বর, সর্ব্বদা ঘর্ম্ম, অরুচি, ও ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যাদি উপস্থিত হইলে প্রবাল ভস্ম ও কস্তুরী ১ রতি মধুসহ সেবন করিতে দিবে। মৃতসঞ্জীবনী সুরা এবং বাসকারিষ্ট প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ ১।২ তোলা মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার হয়। মেহ, উপদংশ ও পারদবিকৃতি জন্য সান্নিপাতিক যক্ষ্মারোগে বিবেচনাপূর্ব্বক উল্লিখিত ও বক্ষ্যমাণ ঔষধ সমস্ত ব্যবস্থা করিবে।

শোষ (ক্ষয়) রোগে জ্বরাদি যে সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়, উহার চিকিৎসায় বিবেচনা করিয়া তত্তদ্রোগাধিকারোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

সুপ্রসিদ্ধ চ্যবনপ্রাশের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। চ্যবন নামে ঋষি প্রথমে ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সেবন করেন, এজন্য উহাব নাম হইয়াছে চ্যবনপ্রাশ। ইহার ফল আমরা কিছু বলিতে চাহি না, যাহাবা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহারাই ইহার সুফল অবগত আছেন। বাস্তবিক ইহার উপকারিতার সীমা নাই বলিতে হইবে শ্লেষ্ম দোষ অর্থাৎ যাহাদের অল্প অল্প শ্বাস বা কাসের উদ্বেগ থাকে। তাহাদের ঐ রোগ নিবারণ করিয়া শরীর বিলক্ষণ স্থূল ও বলিষ্ঠ করে। শুক্র বৃদ্ধির পক্ষে ইহা অমোঘ ঔষধ।

চ্যবনপ্রাশ।

বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাক কাশ্মর্য্যঃ পাটলা বলা।
পর্ণাশ্চতস্রঃ পিপ্পলাঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
শৃঙ্গী তামলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরুঃ।
অভয়া চামৃতা ঋদ্ধি জীবকর্ষভকৌ শঠী॥
মুস্তং পুনর্নবা মেদা সূক্ষ্মৈলোৎপল চন্দনে।
বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাক নাসিকা॥
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ শতান্যামলকস্য চ।
পঞ্চ দদ্যাত্তদৈকধ্যং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
জ্ঞাত্বা গত রসান্যেতা ন্যৌষধান্যথ তং রসম্।
তচ্চামলক মুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈল সর্পিষোঃ॥
পল দ্বিদ্বশকে ভৃষ্ট্বা দত্বাচার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥

ষট্‌পলং মধুন শ্চাত্র সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
চতুঃপলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যা দ্বিপলং তথা॥
পলমেকং বিদধ্যাচ্চ ত্বগেলা পত্রকেশরাৎ।
ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ॥
কাস শ্বাস হরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে।
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গ-বর্দ্ধনঃ॥
স্বরক্ষয় মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্।
পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চৈবাপকর্ষতি॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত নোপরুন্ধ্যাচ্চ ভোজনম্।
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যাবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎ পুনর্যুবা॥
মেধাংস্মৃতিং কান্তি মনাময়ত্ব
মায়ুপ্রকর্ষং বল মিন্দ্রিযাণাম্॥
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিম্
বর্ণপ্রসাদং পবনানুলোম্যম্॥
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগা-
ল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটিপ্রবেশাৎ॥
জরাকৃতং রূপমপাস্যরূপং, বিভর্ত্তিরূপং নবযৌবনস্থ।
সিতা মৎস্যণ্ডিকালাভে, ধাত্র্যাশ্চ মৃদুভর্জ্জনম্।
চতুর্ভাগজলে প্রাযো দ্রব্যং গস্তরসং ভবেৎ॥

বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলাছাল, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষাণি, পিঁপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, ভূঁইআলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরিতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শঠী, মুতা, পুনর্নবা, ছোট এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, প্রত্যেক ৮ তোলা। শ্লথ (ঢিলে) পোটুলীবদ্ধ কাচা আমলকী ৫০০টা বা ৭৸৴০ ছটাক। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ৬৪ সের জলে উল্লিখিত দ্রব্যগুলি অল্প থেঁতো করিয়া দিবে এবং ৫০০টা আমলকী একখানি নূতন কাপড়ে ঢিলে করিয়া বান্ধিয়া ঐ জলে প্রদান করিবে ঐ বস্ত্রের উপরিভাগ (দোলা-যন্ত্রবৎ) একখানি কাঁঠ বা বাখারিতে বান্ধিয়া রাখিতে হয়। ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া আমলকী গুলি বস্ত্রের অগ্রভাগ ধরিয়া পৃথক একটী প্রস্তর পাত্রে রাখিবে ও কাথটী ছাঁকিয়া লইবে।

পোটুলী বদ্ধ আমলকী সকল খুলিয়া উহার বীজ গুলি ফেলিয়া দিবে, এবং তিন পোয়া ঘৃত ও তিন পোয়া তিল তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে আমলকী ভাঁজিয়া শিলায় উত্তমরূপ পেষণ করিবে। পরে মিছরি ৴৬৷ সের (৫০ পল), ঐ ক্বাথ জল ও আমলকী একত্র পাক করিবে। লেহবৎ গাঢ় হইলে বংশলোচন ৩২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, গুড়-ত্বক্ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলা-ইচ ২ তোলা, ও নাগেশ্বর ২ তোলা উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৩ পোয়া মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ৷৷০ হইতে ২ তোলা। অনুপান ছাগদুগ্ধ বা ঈষদুষ্ণ গোদুগ্ধ।

ইহা সেবনে স্বরভঙ্গ, যক্ষ্মা, শুক্রগত দোষ, অর্থাৎ প্রমেহ ও ধাতু দৌর্ব্বল্যাদি প্রশমিত হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয় সামর্থ্য, বায়ুর অনুলোমতা, আয়ুর্বৃদ্ধি ও বৃদ্ধেরও যৌবন ভাব উপস্থিত হয়। দুর্ব্বল ও ক্ষীণধাতুর পক্ষে ইহার ন্যায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পীড়ার প্রবৃদ্ধাবস্থায় যক্ষ্মারি লৌহ, ক্ষয়কেশরী, যক্ষ্মান্তক লৌহ, রসেন্দ্র গুড়িকা, মৃগাঙ্ক চূর্ণ, মৃগাঙ্ক বটিকা, রাজ মৃগাঙ্ক, মহামৃগাঙ্ক, রত্নগর্ভপোট্টলী রস ও কাঞ্চনাভ্র প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। উহাদের প্রস্তুত প্রণালী অতঃপর লিখিত হইতেছে।

ক্রমশঃ—

পুটপাক প্রণালী।

অতীত ও বর্ত্তমান সংখ্যা সমীরণে যে সমুদায় ঔষধ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি ঔষধ পুটপাক দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। পুটপাক প্রণালী বিজ্ঞ ভিষগ্‌গণের জানা থকিলেও আমাদের গ্রাহক মাত্রেরই জানা আছে বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্য আমরা আজ পুটপাকের বিষয় আলোচনা করিব অতঃপর ধাত্বাদির শোধনাদি লিখিতে চেষ্টা করিব।

পুট শব্দের আবরণার্থ লইয়া ঔষধ মারণ উপযোগী মুছি (কটোরা) ও স্থালী (হাঁড়ী) প্রভৃতি দ্রব্য গ্রহণ করা হয়। ঐরূপ স্থালী প্রভৃতিতে পাকের নাম পুটপাক। লোক সকল বিভিন্ন-রুচি, কেহ সংস্কৃতের সমাদর করেন, আবাব হয়ত কেহ সংস্কৃত পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ করেন। যাহা হউক আমরা যেখানে যেখানে মূল সংস্কৃত দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছি, সেই সেই স্থলে সংস্কৃত মূল উদ্ধৃত করিলাম। কারণ মূল ও বিশদ অনুবাদ থাকিলে কাহারই মনে সন্দেহের সঞ্চার হইতে পারিবে না। পাঠক মহাশয় যথারুচি পাঠ করিবেন।

গম্ভীরে বিস্তৃতে কুণ্ডে দ্বিহস্তে চতুরস্রকে।
বনোপলসহস্রেণ পূরিতে পুষ্টনোষধম্॥
কোষ্ঠে রুদ্ধং প্রযত্নেন গোবিষ্টোপরি ধারয়েৎ।
বনোপল সহস্রার্দ্ধং কোষ্ঠিকোপরি নিক্ষিপেৎ॥
বহ্নিং বিনিক্ষিপেৎ তত্র মহাপুট মিতি স্মৃতম্॥

মহাপুট—দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতা সকল দিকেই দুই হস্ত প্রমাণ একটী চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া, তন্মধ্যে এক হাজার বিল ঘুঁটে সুন্দররূপে স্থাপন করিবে, উহার উপরিভাগে ঠিক মধ্যস্থলে পুটনীয় বস্তুপূর্ণ মূষা অর্থাৎ পুটপাক পাত্র স্থাপন করিবে। পরে ঐ মূষার উপরিভাগে আর পাচশত খানি বিলঘুঁটে দিয়া মূষা সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদন করিবে এবং উহার উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিবে। অনন্তর সমুদায় ঘুঁটে ভস্মীভূত ও তাপশূন্য হইলে মূষা উদ্ধৃত করিবে ও মূষার উপরিভাগস্থ দগ্ধ মৃত্তিকাদি পরিষ্কৃত করিয়া অভ্যন্তরস্থ পুটিত বস্তু গ্রহণ করিবে এবং প্রয়োজনানুরূপ ব্যবহার করিবে। মহাপুটের উল্লেখ থাকিলে সর্ব্বত্রই এইরূপে কার্য্য করিতে হইবে।

পুটপাকের পূর্ব্বে যে দ্রব্যে পুট প্রদান করিতে হইবে, উহা দৃঢ় পাত্রে (যেস্থলে যে পাত্রের উল্লেখ থাকে) রাখিয়া মূষার মুখরুদ্ধ কবিবে অর্থাৎ মুছিতে পুট দিতে হইলে অপর একখানি মুছি দ্বারা ও হাড়ীতে দিতে হইলে, হাড়ীর মুখে পড়ে, কোন দিকে শূন্য না থাকে, এরূপ একখানি সরাব (সরা) দ্বারা মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা ঐ সন্ধিস্থল উত্তমরূপে লেপন ও শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়। লেপন করিবাব সময় মৃত্তিকার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, অর্থাৎ এরূপ মৃত্তিকা দ্বারা মুখ লেপন করিতে হয়, যাহাতে পরে উহা না ফাঁটিয়া যায়।

সপাদ হস্তমানেন কুণ্ডে নিম্নে তথায়তে।
বনোপলসহস্রেণ পূর্ব্বে মধ্যে বিধারয়েৎ॥
পুটন দ্রব্যসংযুক্তাং কোষ্ঠিকাং মুদ্রিতাং মুখে।
অধোহর্দ্ধানি করণ্ডানি অর্দ্ধান্যুপরি নিক্ষিপেৎ॥
এতদ্‌গজপুটং প্রোক্তং খ্যাতং সর্ব্বপুটোত্তমম্।
সাধারণ-নরাঙ্গুল্যা ত্রিংশদঙ্গুলকো গজঃ॥

গজপুট—দীর্ঘ প্রস্থ ও গভীরতা সকলদিকেই সওয়াহাত অর্থাৎ ত্রিশ

অঙ্গুলি পরিমিত একটী চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে ৫০০ পাঁচশত খানি বিলঘুঁটে উত্তমরূপে সাজাইয়া রাখিয়া উপরিভাগে মধ্যস্থলে উল্লিখিত নিয়মে মৃত্তিকালিপ্ত, শুষ্ক ও ঔষধপূর্ণ মূষা সংস্থাপন করিবে এবং উহার উপরিভাগে আর ৫০০ পাঁচশতখানি বিলঘুঁটে দিয়া চাঁপা দিবে। অনন্তর পূর্ব্ববৎ উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিবে। এই পুট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহার নাম গজপুট।

মধ্যাবয়ব পুরুষের ত্রিশ অঙ্গুলিতে এক গজ হয়। গজ প্রমাণ গর্ত্তে পুট প্রদান করা হয় বলিয়া ইহার নাম গজপুট।

অন্যচ্চ—গজ প্রমাণগম্ভীরং শুষিরং ক্রমশস্ততম্।
বিতস্তিদ্বিতয়মুখং ত্রিবিতস্তিতলং তথা॥
এবং বিধায় যত্নেন বিশিবস্কবীববৎ।
তস্য পাদত্রয়ং সম্যক্ পূরয়িত্বা বনোপলৈঃ॥
ভৈষজ্য কোষ্ঠিকাং তত্র স্থাপয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
বনোপলৈঃ সংবৃণুযাদেতদ্ গজপুটং স্মৃতম্॥
অত্র পাদোনহস্তদ্বয় প্রমাণো গজঃ।

গজপুট—একগজ অর্থাৎ পৌনে দুই হস্ত গভীর গোলাকৃতি একটী গর্ত্ত খনন করিবে। ঐ গর্ত্তের ঊর্দ্ধভাগের বিস্তার দুই বিতস্তি অর্থাৎ একহস্ত এবং তলদেশের বিস্তার তিন বিতস্তি বা দেড়-হাত। বংশাঙ্কুরের (বাঁশের কোড়) অগ্রভাগ কাঁটিয়া ফেলিলে দেখিতে যেরূপ হয়, এই গর্ত্তটীও দেখিতে সেইরূপ হইয়া থাকে। গর্ত্তের মধ্যে ঘুঁটে দিয়া চারিভাগের তিন ভাগ পূর্ণ করিবে, এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে মধ্যস্থলে ঔষধ-গর্ভ মূষা স্থাপন করিবে। পরে পুনরায় বিলঘুঁটে দ্বারা অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ সমস্ত গর্ত্ত পূর্ণ করিবে ও উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিবে। ইহাও একরূপ গজপুট, সম্প্রতি এতদ্দেশে ঈদৃশ গজপুটই প্রচলিত।

অরত্নিমাত্রকে কুণ্ডে পুটং বারাহমুচ্যতে।

বরাহ পুট—দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি ও গভীরতা সকল দিকেই এক অরত্নি (কনিষ্ঠাঙ্গুলি লইয়া যে হাত হয়) প্রমাণ চতুষ্কোণ গর্ত্তে পুট প্রদানকে বারাহ পুট বলে। এই পুটে ঘুঁটের পরিমাণ নাই বটে, কিন্তু গর্ত্তে যাহা ধরে, উহাই ইহার পরিমাণ। পূর্ব্ববৎ ঘুঁটে দ্বারা গর্ত্তের তৃতীয়াংশ পূরণ করিয়া মূষা সংস্থাপন করিবে এবং চতুর্থাংশও ঐরূপ ঘুঁটে দ্বারা পূরণ করিয়া উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিবে ও শীতল হইলে তুলিয়া লইবে।

ষোড়শাঙ্গুলকে খাতে কস্যচিৎ কৌকুটং পুটম্।

কৌক্কুট পুট—সমস্ত দিকে ১৬ অঙ্গুলি পরিমিত গর্ত্তে পুট দেওয়াকে কৌক্কুট পুট বলে।

যৎপুটং দীয়তে খাতে হ্যষ্টসংখ্যৈর্বনোপলৈঃ।
কপোতপুট মেতত্তু কথিতং পুটপণ্ডিতৈঃ॥
এতদেব লঘুপুটনাম্না খ্যাতম্।

যে খাতে আটখানি ঘুঁটে দ্বারা পুট-পাক সাধিত হয়, তাহাকে কপোত পুট বলে। সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ঘুঁটে ও খাতে এই পুট প্রদত্ত হয় বলিয়া ইহার নাম লঘুপুট। যেস্থলে লঘুপুট উল্লেখ থাকিবে। সেইস্থলে এই রীতিতে পুট প্রদান করিতে হইবে।

বৃহদ্ভাণ্ডস্থিতৈ যন্ত্রে গোবরৈ র্দীয়তে পুটম্।
তদ্গোবরপুটং প্রোক্তং ভিষগ্ভিঃ সূতভস্মকৃৎ॥
গোষ্ঠান্ত গোখুরক্ষুণ্ণং শুষ্ক চূর্ণিত গোময়ম্।
গোবরং তৎ সমাখ্যাতং বরিষ্ঠং রসসাধনে॥

গোবরপুট—যে যন্ত্রে পুটপাক করিতে হইবে, ঐ যন্ত্রটীর মধ্যে ঔষধ রাখিয়া পূর্ব্ববৎ মুখ রোধ, মৃত্তিকা লেপন ও শুষ্ক করিয়া একটী বৃহদ্‌ভাণ্ডে ঐ মূষা স্থাপন করিবে এবং ভাণ্ডের মুখে শরাবাদি প্রদান করিয়া রুদ্ধ করিবে। অনন্তর গোবর দ্বারা ঐ ভাণ্ডটী এরূপভাবে আবৃত করিবে যে ঐ ভাণ্ডটীর নিম্ন পার্শ্ব ও উপরিভাগ সুন্দর আচ্ছাদিত হয়, যেন কোন স্থল অনাবৃত না থাকে। পরে পার্শ্বভাগে অগ্নি প্রদান করিয়া সাবধান থাকিতে হইবে যেন উপরিভাগের গোবর না পড়িয়া যায়। গোবর সাজাইবার সময়েই এবিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। এই পুটে পারদ ভস্ম করিতে হয়।

গোষ্ঠমধ্যস্থ গোময় সমস্ত গরুর খুর দ্বারা মর্দ্দিত, শুষ্ক ও চূর্ণিত হইলে উহাকে গোবর বলা যায়। সামান্যতঃ ইহাকে ঘসি বা ঘুঁটে বলা হইয়া থাকে। এই গোবর রসসাধন-বিষয়ে বিশেষ উপযোগী।

বৃহদ্‌ভাণ্ডে তুষৈঃ পূর্ণে মধ্যে মূষাং বিধারয়েৎ।
ক্ষিপ্তাগ্নিং মুদ্রয়েদ্ ভাণ্ডং তদভাণ্ডপুটমুচ্যতে॥

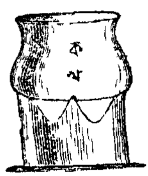
একটী বৃহদ্‌ভাণ্ডের তৃতীয়াংশ তুষ দ্বারা পূর্ণ করিয়া পূর্ব্ববৎ নির্ম্মিত ঔষধপূর্ণ মূষা স্থাপন করিবে ও অবশিষ্টাংশ তুষ দ্বারা পূর্ণ করিয়া অগ্নি প্রদান করিবে। অনন্তর শরাবাদি দ্বারা ভাণ্ডের মুখ ঢাকিয়া দিবে। কোনদিকে একটু শূন্য থাকা প্রয়োজন, নচেৎ অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

যন্ত্রপ্রকরণ।

কবচী যন্ত্র।

নাতিহ্রস্বাং কাচকুপীং নচাতি মহতীং দৃঢ়াম্।
বাসসা কর্দ্দমাক্তেন পরিবৃত্য সমন্ততঃ॥
সংলিপ্য মৃদুমৃৎস্নাভিঃ শোধয়েদ্ভানুবহ্নিনা।
নিধায় ভেষজং তত্র মুখমাচ্ছয়েত্ততঃ॥
কঠিন্যা দৃঢ়য়া বাপি পচেদ্ যন্ত্রে বিধানতঃ।
কবচী যন্ত্র মেতদ্ধি রসাদিপচনে মতম্॥

একটী মধ্যবিধ সমতল দৃঢ় বোতল কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উত্তমরূপ বেষ্টন করিবে এবং কর্দ্দম দ্বারা লেপন করিয়া ক্রমে শুষ্ক ও পুনবায় লেপন করিবে। অনন্তর ঐ বোতলের মধ্যে ভেষজ দ্রব্য নিহিত করিয়া বালুকা যন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে স্থাপন করিয়া তত্তদ্ যন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পাক ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। আবশ্যক হইলে খড়ী দ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করিবে। ঈদৃশ প্রলিপ্ত বোতলের নাম কবচী যন্ত্র। পারদাদির পাক ক্রিয়া উল্লিখিত রীতিতেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বালুকা যন্ত্রাদির নিয়ম ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।



বালুকা যন্ত্র।

ভাণ্ডে বিতস্তি গম্ভীরে মধ্যে নিহিত কূপিকে।
কূপিকাকণ্ঠপর্য্যন্তং বালুকাভিশ্চ পূরিতে॥
ভেষজং কূপিকাসংস্থং বহ্নিনা যত্র পচ্যতে।
বালুকা যন্ত্র মেতদ্ধি যন্ত্রংতত্র বুধৈঃ স্মৃতম্॥

উল্লিখিত চিত্রের 'ক' চিহ্নিত পদার্থ কূপিকা এবং 'খ' চিহ্নিত পদার্থ ভাণ্ডস্থ

ভৈষজ্যতত্ত্ব।

পটোল।

ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বোধ হয় পটোলের বিষয় অবগত আছেন, সুতরাং বিশেষ করিয়া প্রতিরূপ (চিত্র) প্রদর্শনের কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। পটোলের পত্র ফলাদি সমস্তই ব্যবহার করা যায়, কিন্তু উহার উপকারিতা হয়ত অনেকেই জ্ঞাত নহেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কাহাকে যে কোন্ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, কে বলিতে পারে? লক্ষ কোটী সুবর্ণ মুদ্রায় যাহা সাধিত না হয়, একটী সমান্য তৃণ দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টিরাজ্যে একটী সামান্য তৃণের মহিমা চিন্তা করিলেও, বিস্মিত হইতে হয়।

পটোল পত্রং পিত্তঘ্নং নাড়ী তস্য কফাপহা।
ফলং ত্রিদোষশমনং মূলং তস্য বিরেচনম্॥

পটোল পত্র ভক্ষণে পিত্ত নাশ হয়, নাড়ী অর্থাৎ পটোলের ডাটা সেবনে কফ বিনষ্ট হয়, ফল ভক্ষণে ত্রিদোষের শমতা হয় এবং মূল সেবনে বিরেচন হয়।

পিত্তজ্বরে পটোল পত্রের রসের সহিত হিঙ্গুলেশ্বর প্রভৃতি বটী সেবনে বিশেষ উপকার হয়। ঐ অবস্থায় কেবল মাত্র পটোলপত্র রস ১৷২ ছটাক সেবনেও বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়া থাকে। পরন্ত পিত্তপ্রধান বিষমজ্বরে ধনে ১ তোলা ও পলতা (পটোল পত্রকে সাধারণতঃ পলতা বলা হয়) ১ তোলা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন ছাকিয়া লইয়া ঐ জলসহ চন্দনাদি লৌহ, পিত্তান্তকলৌহ ও বিষম জ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ধনে পলতার জল সেবনেও শত শত স্থলে পিত্ত-প্রধান জীর্ণ জ্বর আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। পলতার ঝোল ও পলতার ডালনা তিক্ত হইলেও অতি উপাদেয় ও হিতকর সামগ্রী।

শ্লেষ্ম-প্রধান জ্বরাদি রোগে পটোলের ডাঁটার রসের সহিত সর্ব্বেশ্বর, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি শ্লেষ্মজ্বরাধিকারোক্ত ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে অরুচি, তন্দ্রা ও আলস্য প্রভৃতি উপসর্গ অতি সত্বর নিবারিত হয়। পটোলের রসের সহিত অনেক ঔষধ সেবিত হইয়া থাকে। ত্রিদোষ জনিত ব্যাধির ইহা প্রধান অনুপান। পটোলের মূলের ছাল চূর্ণ ৪ হইতে ৮ রতি মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবনে ৪৷৫ বার তরল মলভেদ হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। এই বিরেচনটী নিতান্ত মৃদু নহে, সুতরাং বিবেচনা পূর্ব্বক পীড়া বিশেষে প্রদান করিবে। মৃদু বিরেচনের আবশ্যক হইলে ইহা কদাচ দেওয়া বিধেয় নহে। জ্বর, উদর ও পাণ্ডু কামলা প্রভৃতি রোগে এই চূর্ণ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

সমালোচনা।

আমরা সমালোচনার্থ অনেক গুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, আগামী বার হইতে ক্রমান্বয়ে সেই সকলের যথা-যথ সমালোচনা করা যাইবে, প্রথম বৎসরে বিশেষ কোন কারণে সেগুলির সমালোচনা করা হয় নাই, গ্রন্থকারগণ নিরাশ হইবেন না—

এমারেল্ডে—"মা"।

অনেকদিনের পর সুপ্রসিদ্ধ অভি-নেতা শ্রীযুক্ত বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী নূতন দলবল নূতন সাজ সরঞ্জাম লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে উক্ত কমিটীর সম্মতিক্রমে অনেকদিনের পরে থিয়েটরের পূর্ব্বতন ম্যানেজার ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল সুর পুনর্ব্বার ম্যানেজার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, কতকগুলি পাকা অভিজ্ঞ অভিনেতাও ইহাতে যোগ দান করিয়াছেন। সম্প্রতি মরকতের পূর্ব্ব ম্যানেজার ও নাটক রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ মিত্র, কবিকঙ্কণ হইতে ফুল্লরা উপাখ্যান ভাগকে, ভগবতীর মূর্ত্তিকেই প্রধানা করিয়া নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া "মা" নামে অভিহিত করিয়াছেন; নাটক খানি যখন কল্পনা করা হয়, তখন সাধারণের রুচির প্রতি যে অতুল বাবু দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না, আড়ম্বর-পূর্ণ কতকগুলি বাক্যচ্ছটায় সাধারণে প্রীতি পাইবে এই আশা বলবৎ হওয়াতে তিনি বিষয়টীকে সাধারণের বিশেষ বিরক্তির কারণ করিয়া ফেলিয়া-ছেন। যাহাই হউক চরিত্র চিত্রণে দোষ থাকিলেও অভিনেতাগণ আপনাপন কার্য্যে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছেন। নৃত্য সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, অথচ সুরুচির পরিচায়ক, কালকেতুর মধুর কণ্ঠে সক-লেই বিমোহিত হইয়াছিল, সাধু সিদ্ধি-নাথ যখন খড়্গ লইয়া উন্মত্তভাবে মাতৃ-পদে নরবলি প্রদান করিতেছিল, সে সময়ে সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল। প্রথ-মাঙ্কে, সহসা চণ্ডীর, অসুর মর্দ্দিনীরূপ ধারণ সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, নাটক রচয়িতা দৃশ্যপটগুলি সম্বন্ধে, বিশেষ মনযোগ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। কতকগুলি চরিত্র নাটকে না থাকিলে সম্ভবতঃ আমরাও প্রীতিলাভ করিতে পারিতাম। মরকতের উন্নতি সম্বন্ধে এবার আমাদের বিশেষ আশা জন্মিয়াছে, সুতরাং ভরসা করি নাট্যকার নাটক নির্ব্বাচন কালে বিশেষ ধীরতা সহকারে বিবেচনার সহিত কার্য্য করিবেন।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান
এবং
সমীরণ।

২য় খণ্ড।	১৩০১ সাল কার্ত্তিক।	২য় সংখ্যা।

পেঁড়োর মন্দির।

১ম খণ্ডের ৪৮৪ পৃষ্ঠার পর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আবার রাত্রি সমাগত হইল এবং পরদিবস পুনরায় প্রভাতগগনে নবীন তপন দেখা দিল। মুসলমানেরাও অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পুনরায় দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল। বিগত দিবসের দারুণ পরাজয়ের পর হিন্দুরা যে আবার অসমসাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইবে, তাহারা তাহা ভাবে নাই, তাই তাহারা সগর্ব্বপদক্ষেপে চলিতে লাগিল। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেখিল যে হিন্দুরা ইতিপূর্ব্বেই মৃত সৈন্যদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছে এবং আহতদিগকে দুর্গের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া মুসলমানেরা স্থির ধারণা করিল যে হিন্দুরা আর সহজে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধ করিবে না—মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা ভীত হইয়াছে। তাহাদিগের এই ভ্রম অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না।

প্রাকারের যে অংশে পূর্ব্ব দিবসে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, মুসলমানসেনা সেই অংশ পরিত্যাগ করিয়া আক্রমণ করিবার পক্ষে সুবিধাজনক অপর এক অংশ পর্যাবেক্ষণ করিবার জন্য যেই পশ্চাৎ ফিরিল, দুর্গের সেই পূর্ব্বোক্ত প্রাকারে এক সুন্দরী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকেরই ন্যায় তাহাদিগকে মধুর কণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিল এবং চকিতের মধ্যে তাহাদিগের মস্তকে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় অজস্রধারে জুতারাশি বর্ষিত হইতে লাগিল। জুতা-বর্ষণও যেমন থামিল, দুর্গের দ্বাদশ সিংহদ্বারও সহসা খুলিয়া গেল। আরও

আশ্চর্য্য! মুসলমানসেনা কাল যে বলভদ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখিয়াছিল, আজ সেই বলভদ্র ও তাঁহার দুই ভ্রাতা, রামভদ্র ও বীরভদ্র, দুর্গ হইতে বেশ সুস্থশরীরে বিনির্গত হইয়া সত্বর উপযুক্ত ব্যূহ রচনা করিয়া তাহাদিগকে সিংহবিক্রমে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। সুফিউদ্দীন ইহা দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে কোরাণের "বয়েদ্"-লিখিত পতাকা ধারণ করিয়া স্বীয় ভীত সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিতে লাগিলেন "ভ্রাতৃগণ! ভীত হইও না; এ সকলই কাফেরদিগের জাদুগিরি; ইহাতে কদাপি ভীত হইও না; সাহসপ্রদর্শনপূর্ব্বক কাফেরদিগকে বিনাশ কর।"

ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আবার সুফিউদ্দীন ও বলভদ্র পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। আবার বাবর আলী আসন্নমৃত্যু হইতে ফার্দ্দুস আলী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেন। এবারে বাবর মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেও কিছু গুরুতররূপে আহত হইলেন। হিন্দুদিগের পক্ষে এবারে বলভদ্র ও তাঁহার দুই ভ্রাতা, তিনজনেই আহত হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। মুসলমানসেনারও বাবর ব্যতীত অনেকগুলি সেনানী এই যুদ্ধে হতাহত হইলেন। বলভদ্র প্রভৃতি আহত হইবামাত্র হিন্দুরা পূর্ব্বের ন্যায় দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিল এবং মুসলমানেরা তাহাদিগের নিহত সেনানী ও সৈন্যদিগের কবর দেওয়া সমাধা করিয়া আনন্দ করিতে করিতে শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাবর আলী তাঁহার কতকগুলি সহচর অনুচরের স্কন্ধে শিবিরে আনীত হইলেন। ফার্দ্দুস আলীও তথায় আসিয়া উপস্থিত। ফার্দ্দুস তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার ক্ষতস্থানগুলি এরূপ যত্নসহকারে বাঁধিতে লাগিলেন এবং তাঁহার কষ্টের লাঘব করিবার জন্য এত চেষ্টাচরিত্র করিতে লাগিলেন যে দর্শকমাত্রেই তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু বাবর এই সকল যত্ন তেমন ভাল মনে গ্রহণ করিতেছিলেন না। এত যত্ন, এত চেষ্টা তাঁহার মনে যে কোন গভীর ভাব ফেলিয়াছে, তাহা বোধ হইল না। বাবর ও ফার্দ্দুসের মধ্যে কি এক আশ্চর্য্য ভাব বর্ত্তমান! যেখানে বাবর, সেইখানেই ফার্দ্দুস; ফার্দ্দুস বাবরের প্রীতিপাত্র হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, আর বাবর তাহা অতি নিষ্ঠুরভাবে অবহেলা করিতেছে। এত অবহেলাতেও ফার্দ্দুসের যত্নের ত্রুটি নাই—বরঞ্চ বর্দ্ধিতই হইতেছে।

বাবরের পিতা মুসলমানসেনার অন্যতর প্রধান সেনানী ছিলেন; তিনি ইতিপূর্ব্বেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। বাবরের চরিত্র যেমন উন্নত, তাঁহার স্বভাবও তেমনি উদার ও মধুর।

দেখিতে শুনিতেও তিনি অতি সুশ্রী ছিলেন। এদিকে, তাঁহার বিতাড়িত বন্ধু ফার্দ্দুস আলীর জন্মস্থান বা তাঁহার পিতামাতার বিষয় কেহই জানিত না। তাঁহার আকৃতি নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব—মাঝারি রকমের কিন্তু তাঁহার মুখের এবং শরীরের গঠন এরূপ পরিপাটী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং তাঁহার চোথ দুটী এমন পটলচেরা চোখ ছিল যে, সুফিউদ্দীনের চতুর ও তীক্ষ্ণদর্শী সহচর সরফখাঁর অনেক বার সন্দেহ আসিয়াছিল যে ফার্দ্দুস যে সাজে সজ্জিত হইয়াছেন, সে সাজ তাঁহার উপযুক্ত নহে।

বাবরের বন্ধুরা যখন দেখিলেন যে তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন, কেবল ফার্দ্দুস তাঁহার শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস দিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল; চারিদিক্ নিস্তব্ধ—জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, এই অবসরে ফার্দ্দুস বাবরকে গভীর নিদ্রা মগ্ন দেখিয়া, শিবিরগাত্রে একখানি সেতার ঝুলিতে দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া ঝঙ্কার দিতে লাগিলেন। ঝঙ্কারের শব্দে বাবরের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ফার্দ্দুসের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য নিদ্রামগ্নের ন্যায়ই পড়িয়া রহিলেন। ফার্দ্দুস তাহা জানিতে পারিলেন না। ক্রমে তিনি সেতারের ঝঙ্কারের সঙ্গে আপনার সুকণ্ঠ মিশাইয়া স্বীয় রুদ্ধপ্রাণের কাতর গাথা গাহিতে লাগিলেন; হায়!

বুঝিবারে পারি আমি নারীর প্রণয়,
আমার অন্তরে বাজে নারীর হৃদয়;
সতী ও বিশ্বাসীভাবে রব চিরন্তর
অপেখি' নীরবে তব মধু প্রত্যাদর।

হায়!

তাহার কোমল তনু হ'ত যদি মোর,
পারিতাম গলাইতে পাষাণে কাতর;
তখন হে প্রিয় তুমি সুন্দর যুবক!
সতত রহিতে ভোর আমার সেবক।

একপুত্রা মাতৃসম সেবিতাম তোরে,
মাথাটী যতনে থুয়ে হৃদয়ের পরে;
আনন্দে উঠিত তাহা নাচি' ধুকি ধুকি;—
সকল নারীর মাঝে হইতাম সুখী।

বাবরআলী সেতারের প্রথম ঝঙ্কারেই জাগ্রত হইলেও ফার্দ্দুসের কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য সাড়াশব্দ না করিয়া নিদ্রাচ্ছলে শয়ান থাকিয়াই সকলই দেখিতে লাগিলেন ও শুনিতে লাগিলেন। অবশেষে ফার্দ্দুসের গানটী শেষ হইয়া গেলে বাবর তাঁহাকে বলিলেন "ফার্দ্দুস! আর গাহিতে হইবে না, এখান হইতে প্রস্থান কর; আমার অপ্রিয় হইলেও তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর না, তোমাকে লইয়া যে কি করিব তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতেছি না, আমার বিশ্বাস ছিল যে তুমি স্ত্রীলোক নহ, কিন্তু এখন বিশেষ সন্দেহ হইতেছে যে তুমি স্ত্রীলোক। আমার প্রতি এত যত্ন ও সেবা প্রদর্শন করিয়া তোমার যে কি লাভ হইবে তাহাত বুঝি না। তুমি আমার এত উপকার করিয়াছ ও করিতেছ যে আমার পক্ষে তাহা পরিশোধ করিবার আশা করা বৃথা। যাই হৌক, আমি একজন যোদ্ধা ও বীরপুরুষ, অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু আমাদের প্রার্থনীয়; সুতরাং

তোমার আর এত সেবা ও যত্ন করিতে হইবে না।"

ফার্দ্দুস এতদিন পুরুষের সাজে সজ্জিত হইয়া পুরুষের স্বর অনুকরণ করিতেছিলেন, কিন্তু এখন বাবরের বাক্যবাণে পীড়িত হওয়াতে তাঁহার স্বাভাবিক স্ত্রীকণ্ঠ প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "হায়! তবে কি তোমার জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করা দোষাবহ হইল? বাবর! আমার মুখেরদিকে একটীবার ও তাকাও; সকলেই এই মুখের সৌন্দর্য্য দেখিতে অনিমিষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে কেবল তুমিই কি ইহা দেখিবে না? এই আমার বাহুদ্বয় দেখ, এরূপ সুগোল বাহু স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্যত্র সম্ভবে? এখন, যদি এই স্ত্রীশরীরের মধ্যে স্ত্রীহৃদয় ও বাজিতে থাকে, তবে বল প্রিয়তম বাবর! বল যে তুমি আর পুরস্কারের কথা উল্লেখ না করিয়া সর্ব্বদা তোমার নিকটে বসিয়া তোমার সেবা ও শুশ্রূষা করিবার অনুমতি দিবে।"

ফার্দ্দুস এই কথাগুলি বলিয়া আবার সেতার ধরিলেন এবং বাবরের মন প্রাণ কাড়িয়া লইয়া গাহিতে লাগিলেন, আর তাঁহার দুই কপোল বহিয়া মুক্তাকণা সকল ঝরিতে লাগিল—

বৃথা প্রেমাহ্বান করে কপোতী সাথীর তরে
হৃদয় তাহার গিয়াছে সরিয়া;
বৃথা বুলবুল হায় সারানিশি গুঞ্জরে গায়
সহচর লাগি' অশ্রুতে ভাসিয়া;
অপর কুসুম তার
নয়নে দিয়েছে আঁধা;—
অপর আসবে তার
হৃদয় পড়েছে বাঁধা!

ফার্দ্দুস যখন এই গানটী গাহিতে ছিলেন, তখন বাবর তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন এবং দেখিয়া তাঁহার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইল। সেই সন্দেহ পাছে অপ্রিয় সত্যে পরিণত হয়, সেই ভয়ে তিনি তাহা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে আপনার মনকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন "না, না, তাহা অসম্ভব—জুমিলার এখানে আসা নিতান্তই অসম্ভব"। কিন্তু সন্দেহ একবার ধরিলে শীঘ্র যাইতে চাহে না। বাবর সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ করিবার জন্য আর একবার ফার্দ্দুসের মুখ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার সন্দেহ সত্য বলিয়াই জানা গেল। তিনি দেখিলেন যে ফার্দ্দুস জুমিলাই বটে,—তাঁহার প্রিয়তমা পরাণপুত্তলী বন্নুর প্রতিযোগী জুমিলা। জুমিলা যে বাবরের প্রেমের অধিকতর উপযুক্ত পাত্র, তাহাই বাবরকে দেখাইবার জন্য এই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের ছদ্মবেশে আসিয়া বাবরের রক্ষা-দেবতারূপে ঘুরিতেছেন। ফার্দ্দুসকে দেখিয়া বাবরের মনে অনেকবার জুমিলা বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সবিশেষ না জানিতে পারায় হঠকারিতার সহিত তাহা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু জুমিলা যখন তাঁহার নিকট স্বীয় দুর্দ্দমনীয় প্রেম ব্যক্ত করিলেন তখন তিনিও কর্ত্তব্যবোধে প্রকাশ করিলেন যে তিনি তাঁহার আপনার হইতে পারেন না।

বাবর বলিলেন "জুমিলা! তুমিতো জানই যে আমি বন্নু ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না, আর তাহার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাবও চলিতেছে; সুতরাং আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিব না, তবে কেন এইরূপে আমার অনুসরণ করিয়া আপনাকে বৃথা কষ্ট দিতেছ? যে তোমার প্রেমের প্রতিদান করিবে না, তাহার জন্য কেন এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে অগ্রসর হইতেছ? আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমার হৃদয় যদি স্বাধীন থাকিত, তবে তোমাকেই তাহা সমর্পণ করিবার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিতাম; কিন্তু এখন—তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই"।

প্রেমের প্রতিদান না পাইলেও জুমিলা যে উপকার করিয়াছেন, বাবরের স্মৃতিপথে তাহা উদিত হওয়ায় এবং তাঁহার নিজের তীব্র বাক্যবাণের নিষ্ঠুরতা বুঝিতে পারায় তাঁহার চক্ষে অশ্রু উথলিয়া উঠিল; তিনি তাহা গোপন করিবার অভিপ্রায়ে মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া ইঙ্গিতের দ্বারা জুমিলাকে প্রস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যাঁহার কাছে তিনি এত যত্ন ও সেবা এবং ভালবাসা পাইয়াছেন, এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানকালে তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইতেও যেন কষ্টবোধ করিতেছিলেন। যাহাইহউক তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরী বন্নুর কথা স্মরণ করিয়া জুমিলাকে একজন প্রকৃত বন্ধু মাত্র বলিয়া হৃদয়ে স্থান দান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বন্নুর জন্ম সম্রাটের বংশে; তাঁহার মাতা সুফিউদ্দীনের ভগ্নী। শৈশবে তাঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়ায় সুফিই তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক নানাবিধ আছে; কেহ বা গৃহের কোমল ছায়ার তলে বসিয়া গৃহকার্য্য করিতে উৎসুক ও দক্ষ; কেহ বা গৃহের গৃহিণী হইবার অপেক্ষা পুরুষোচিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে অধিক তৎপর। বন্নু প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি আদতেই সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার নিকটে কেহ সংগ্রামের অবস্থা বর্ণনা করিলে তিনি আন্তরিক বিরক্তি প্রকাশ করিতেন এবং যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে করুণা দুঃখ প্রকাশ করিতেন। জুমিলা বন্নুর বিপরীত ছিলেন। তিনি গৃহের নিৰ্জ্জনতা ও শান্তিরস তত পসন্দ করিতেন না। তিনি অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রিয় ছিলেন। তাই বলিয়া কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে বন্নু কাপুরুষের ন্যায় ছিলেন। কাপুরুষের প্রতি বন্নুর আন্তরিক ঘৃণা ছিল। ভাগিনেয়ী বন্নুর অভিপ্রায়ানুসারে সুফিউদ্দীন স্থির করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে সমধিক সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন, তিনিই বন্নুর পাণিগ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন। বাবর আলীর সহিত পরিচয়ে বন্নু বুঝিয়াছিলেন যে তিনিই তাঁহার পাণিগ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত

পাত্র সুতরাং তাঁহাকেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন; আবার বাবরও বন্নুর সরলতামাখা মূর্ত্তিখানি দেখিয়া আত্মহারা হইয়া তাঁহাকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। যে, যে প্রকৃতির লোক হয়, অনেক সময়ে সে তাহার প্রতিযোগী স্বভাবের সহচর প্রার্থনা করে। এই সূত্রেই "বৃদ্ধস্য তরুণীভার্য্যা" এই প্রবাদ চলিত হইয়াছে। বাবরআলী নিজে বীরপুরুষ ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, তাই তাঁহার শান্তিরসপ্রিয় বন্নুকে অতি প্রিয় বোধ হইয়াছিল। সংগ্রামক্ষেত্র দূরে থাক্, বন্নু সহরেরও কোলাহল দূরে পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে ভাল বাসিতেন;—পল্লীগ্রামের স্রোতস্বতীর নীরব কুলুকুলু ধ্বনি, পল্লীগ্রামে প্রবাহিত মলয়পবন তাঁহার প্রিয়তর বোধ হইত। বন্নুর প্রশান্তসরল মুখ দেখিলে সকলেরই ভালবাসিবার ইচ্ছা হইত।

জুমিলাও রূপবতী ছিলেন—সকলেই তাঁহার রূপের প্রশংসা করিত বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে মনের সহিত ভালবাসিতে পারিত না। ইংরাজীতে এই ভাবটী পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় "She might be liked but not loved." সে রূপের কছে যে আসিত, সে দগ্ধপ্রায় হইয়া যাইত কিন্তু বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করিতে পারিত না। সে রূপের কাছে দাঁড়াইলে রূপভূষা জলিয়া উঠিত কিন্তু প্রশমিত হইত না। সেই রূপ যখন আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিত, তখন তাহার শত্রুদিগেরও হৃদয় কাঁপাইয়া দিত। সেই রূপেরই তেজে জুমিলা চতুঃপার্শ্বস্থ লোক সকলকে ঝলসিত করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথ বাহির করিয়া লইতেন। যুদ্ধকালে জুমিলা যেরূপ উৎসাহধ্বনি প্রকাশ করিতেন, বন্নু তাহা দেখিলে জুমিলার প্রতি হয়তো দুদণ্ড অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। বন্নু যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া জুমিলার ন্যায় প্রিয়তমের পার্শ্বসহচর হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু লোকের দুঃখ দেখিলে তাহার দুঃখমোচন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতে পারিতেন; আহত বা রোগীদিগেব পার্শ্বে বসিয়া তাহাদিগের সেবা করা, তাহাদিগকে বাতাস দেওয়া, তাহাদিগের মুখে জল তুলিয়া দেওয়া, তাহাদিগের আহারের ব্যবস্থা করা, এই সকল বিষয়ে বন্নু সম্যক্ পারদর্শী ছিলেন। জুমিলার ন্যায় তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া দুদণ্ডের জন্য অপরের হৃদয়কে কাড়িয়া লইতে শেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক মধুরিমায় সকলেই মুগ্ধ হইত। জুমিলা যে দিকে চাহিতেন, সে দিকে যেন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর তেজরাশি ছুটিত; বন্নু যে দিকে চাহিতেন সে দিকে যেন শারদীয় পূর্ণিমার মধুময় জোৎস্না বিকীর্ণ হইত। জুমিলার কটাক্ষ যেন হৃদয়কে অসিপত্রে বিদীর্ণ করিতে চাহে, বন্নুর মধুমাখা চাহনি যেন হৃদয়কে গোলাপপত্রে আবৃত করিয়া রাখে। জুমিলা স্বীয় মোহিনী শক্তি চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করিতে ভাল বাসেন; বন্নু আবরণের আড়ালে লুকাইয়া থাকিতে চাহেন—তাঁহার রূপে যে অন্যের হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা যেন তিনি দেখিতে চাহেন না।

জুমিলা ও বন্নু এই প্রকারের দুই প্রতিদ্বন্দী সুন্দরী। ইহাঁরা যখন উভয়ে দিল্লীতে ছিলেন, তখন পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল। জুমিলা বন্নুর নিকটে বসিয়া অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করিতেন। বোধ হয় পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না যে, ইদানীং বাবর আলীর প্রণয় লইয়া তাঁহাদিগের কিছু মনকষাকষি চলিতেছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে কোন প্রকার বিবাদ কলহ ঘটে নাই। জুমিলার ন্যায় বন্নুও যদি ঈর্ষাপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে সম্প্রীতি থাকা সহজ হইত না। বন্নু নিজে অতি সরলপ্রকৃতি; তাই তিনি আপনার সফলপ্রেমজনিত সুখে উল্লাস করিবার পরিবর্ত্তে অনেক সময়ে জুমিলার নিরাশপ্রেমজনিত দুঃখ অপনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন।

একবার জুমিলা বাবরকে উদ্দেশ করিয়া বন্নুর নিকট পুরুষের পাষাণহৃদয়ের কথা বলিতেছিলেন, তখন বন্নু তাঁহাকে অতি মিষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন—"ভাই জুমিলা! তুমি তাঁহার উদ্দেশে কেন এই সকল কঠোর কথা প্রয়োগ করিতেছ? তাঁহার ভগিনী থাকিলে তিনি যেরূপ ভাল বাসিতেন, তোমাকেও সেইরূপই ভাল বাসেন; তবে আর এ সকল কঠোর কথা কেন?"

জুমিলা রাগে ও অভিমানে গরগর করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"এ সকল কথা কেন? কেন?—আমি কি তাঁহার ভগিনী যে তিনি আমাকে ভগিনীর মত ভাল বাসিবেন? না বন্নু, তাহা অসম্ভব। আমি বেশ জানি যে বাবর প্রেম কি, তাহা বুঝিতে পারে নাই—না, না; আমি যে বন্নুর কাছে বলিতেছি তাহা ভুলিয়া যাইতেছি; সৌভাগ্যবতী বন্নু জানে যে বাবর ভালবাসিতে জানে। তিনি যদি বিচার করিয়া উপযুক্ত পাত্রে প্রেম অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে আমি কিছুই দুঃখ করিতাম না।"

বন্নুও তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"হাঁ, তিনি বিচার করিয়া দেখিলে আমার প্রিয়তম বন্ধু জুমিলাকেই ভাল বাসিতেন এবং তিনি এখনও যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, বন্নু তাঁহার প্রীতির নিতান্ত অনুপযুক্ত পাত্র, তাহা হইলে এখনও হয় ত তিনি তোমাকেই আমার পরিবর্ত্তে ভাল বাসিতে পারেন।"

এই সুন্দরীদ্বয়ের মধ্যে কে বাবর আলীর প্রীতির অধিকতর উপযুক্ত পাত্র, তাহা সুন্দরী পাঠিকাগণ বিচার করিয়া বাবরকে প্রেমিক অথবা নিষ্ঠুর, যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পারেন। আমরা এইটুকু জানি যে বাবর একমাত্র বন্নুকেই অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। তিনি জুমিলার নিকটে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলেও তাহা পরিশোধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। জুমিলা তাঁহার হৃদয় চাহিতেন, বাবর তাহা দিতে পারেন না—সে হৃদয় আর একজন আপনার হৃদয়ের বিনিময়ে ইতিপূর্ব্বেই ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

জুমিলাকে বাবর আলী যেরূপ কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, অন্য কোন স্ত্রীলোক হইলে তাহার ছায়া মাড়াইতেও চাহিত না। জুমিলা কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন না। বাবরের প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। জুমিলার রূপ, অনুরাগ ও কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া মুসলমানেরা তাঁহাকে পরী বলিয়া সন্দেহ করিত। তিনি যখন সভামধ্যে প্রবেশ করিতেন, তখন সকলেরই মুখে তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছায়া পড়িয়া প্রফুল্লতা আনয়ন করিত; তিনিও চলিয়া যাইতেন, আর সভামধ্যে ম্লানভাব রাজ্যবিস্তার করিত। জুমিলার রূপে মুগ্ধ হয় নাই, মুসলমানদিগের মধ্যে এমন কেহই ছিল না। কেবল সরফ খাঁকে দেখিয়া বোধ হইত যে, জুমিলার রূপ তাহার হৃদয়ে কোনরূপ চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে নাই। তাহার এই প্রকার অনুভবহীনতা দেখিয়া নানা লোকে নানা কথা বলিত; কিন্তু বাবর ভাবিতেন যে, সে অন্য কোন রমণীকে হৃদয়ে স্থান দিয়া জুমিলা হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সমবেদনাবিশিষ্ট ব্যক্তিরা শীঘ্রই পরস্পরের বন্ধু হইয়া উঠে। বাবর ও সরফ উভয়ে সত্বরই পরস্পরের দৃঢ়বন্ধু হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে বাবরই সরফের নিকট অনেক মনের কথা ব্যক্ত করিতেন, কিন্তু সরফ নীরবে তাহা শুনিয়া যাইত; তাহার নিজের প্রণয়িনী আছে কি না, তদ্বিষয়ে ইঙ্গিতেও কিছু-মাত্র ব্যক্ত করিত না। বাবর সময়ে সময়ে তাঁহার প্রণয়িনী বন্নুর কথা সরফের নিকট বলিতেন; কিন্তু তাহার একটীও মনের কথা না পাইয়া ভাবি-তেন যে, 'আমি আমার ভাবী সুখের বিষয় বলিতে গেলেই এই কথাই বার বার বলি যে যতদিন বন্নু আমার হৃদয়কে তাহার কোমলতায় ছাইয়া না ফেলিবে, ততদিন আমার সুখ নাই; যখন যুদ্ধে জয়লাভহেতু আমার গৌরব-বৃদ্ধির কথা হয়, তখন উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া ফেলি যে, যতদিন আমি আমার জয়পতাকাসকল বন্নুর পদতলে দিতে না পারি, ততদিন আমি গৌরবকে গৌরব বলিয়াই মনে করি না; যখন সিরাজের সুগন্ধি আসব পান করিতে উদ্যত হই, তখন প্রথম পেয়ালা তাঁহারই উদ্দেশে উৎসর্গ করি। কিন্তু সরফ তো এ সকল কিছুই করে না; সে প্রেমের কথাই বলে না—সে বিষ-য়ের একটী অক্ষরও তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় না। সে কি সত্য সত্য প্রেমের জালে ধরা পড়েছে—পড়েনি, তাই বা বলি কি প্রকারে? সেও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; আমার সহিত বন্নুর বিবাহ হউক, এ বিষয়ে কত আশা প্রকাশ করে, আর এই বন্নুর কথাই আমার নিকট শুনিতে ভাল-বাসে। প্রেমিক না হইলে সে প্রেমি-কের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করে কিরূপে?'

দশম পরিচ্ছেদ।

বাবরের প্রত্যাখ্যানে জুমিলা তাঁহার নিকট কিয়ৎক্ষণের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে সরফ খাঁ বাবরের শিবিরে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া এক পার্শ্বে লুকাইয়া থাকিয়া বাবর ও জুমিলার কথোপকথন আদ্যন্ত শুনিয়াছিল। এখন সে ত্বরা পূর্ব্বক সুফিউদ্দীনের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সকল কথাই বলিল। সুফি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জুমিলাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং সরফের সকল কথাই সত্য বলিয়া জানিলেন। পরদিন প্রভাতে ফার্দ্দুস যে বাবরের প্রণয়ভিখারী জুমিলা ব্যতীত অন্য কেহ নহে, একথা রাষ্ট্র হইতে বড় বিলম্ব হইল না। সকলেই আশ্চর্য্য হইল। মুসলমানেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল এবং আপনাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতি ধিক্কার দিতে লাগিল, কারণ তাহারা এতদিন বুঝিতে পারে নাই যে, ফার্দ্দুস একজন স্ত্রীলোক। জুমিলার নানা চাতুরীতে বিমূঢ় হইয়া তাহারা এতদিন এবিষয়ে ভাবিবার অবসরই প্রাপ্ত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে যদিও বাবর ও সরফের মনে তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া অনেকবার সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়াতে এবং অন্যান্য নানা কারণে তাহা ব্যক্ত করেন নাই। এখন, সরফ নিজের পদবৃদ্ধির আশায় এই সংবাদ সর্ব্ব প্রথম সৈন্যাধ্যক্ষের গোচর করিল।

এরূপ স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের পরেও যে জুমিলা বাবরের প্রতি এত অনুরক্ত, তাহাতে সকলেরই আশ্চর্য্যবোধ হইতে লাগিল। যাহারা প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ জানে নাই, তাহারা বাবরের রূপতৃষ্ণা মিটাইবার এরূপ সুন্দর অবসর পরিত্যাগ করাকে নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য ভাবিতে লাগিল। আবার যাহারা জুমিলাকে স্বায়ত্ত করিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল, তাহারা বাবরের বন্ধুর প্রতি ঐকান্তিক প্রীতির প্রশংসা করিয়া জুমিলাকে বাবরের প্রতি বিরক্ত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল।

পাণ্ডুয়ার দুর্গসম্মুখে যে সকল যুদ্ধ হইয়া গেল, সেই সকলে যেমন বাবরের, তেমনি জুমিলারও বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। বাবরকে রক্ষা করিবার জন্য জুমিলা তাঁহার কাছাকাছি থাকিয়া শত্রুসংহার করিতে করিতে এরূপ বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইতেন যে, সেনাগণ নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া তাহা ক্ষণকাল তাকাইয়া দেখিত। আবার তাহাদের মধ্যে ঐরূপ মন-কষাকষি দেখিয়া সৈন্যেরা বলাবলি করিত যে "জুমিলা বাবরের উপযুক্ত অথবা বাবর জুমিলার উপযুক্ত? এরূপ দুইটী প্রেমস্রোত কেন মিলিত হইতেছে না"?

আমরা যে যুদ্ধের বিষয় পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, তাহা সেদিন কিছু পূর্ব্বাহ্নেই স্থগিত হইয়া গেল। সেই দিন রাত্রিতে মুসলমানদের এক মন্ত্রণাসভা বসিল; তাহাতে স্থির হইল যে, যখন উঠিবার

সিঁড়ি সকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং প্রাকারের একপার্শ্বে উঠিবার উপযুক্ত স্থানও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখন আর খোলা মাঠে যুদ্ধ না করিয়া একেবারেই প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

মধ্যরাত্রে বাছা বাছা এক হাজার সৈন্য লইয়া মুসলমান সেনার এক প্রধান সেনানী ফতেআলী নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রাকারের নির্ব্বাচিত স্থানে আসিয়া তথায় সিঁড়ি লাগাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাকারের উপরে উঠিয়া পড়িলেন। সেইখানেই তাহাদের ভবলীলা সাঙ্গ হইল, সুবর্ণ মধুরের ভয়াবহ চীৎকার ধ্বনিতে হিন্দুসেনা জাগ্রত হইয়া সহসা তথায় আসিয়া সহস্র সৈন্যের একটীকেও অবশিষ্ট রাখিল না। ক্ষণকালের জন্য সকলেই নিস্তব্ধ হইল, অবশেষে হিন্দুদের উল্লাসধ্বনি ও সঙ্গীতে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। প্রাকারের উপর হিন্দুরা সঙ্গীত করিয়াছিল। এই ভীষণ কালে এইরূপ সঙ্গীতাদি করা সয়তান ব্যতীত অপরের পক্ষে সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া মুসলমানেরা বলাবলি করিতে লাগিল "আল্লাই ইহার খবর জানেন; আসমানে সঙ্গীরা হত হইতে লাগিল, আমরা এখন কি করিব"? তাহারা বিমর্ষে অভিভূত হইয়া আপনাদের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে মুসলমান মাত্রেরই মুখ মেঘাচ্ছন্ন। এদিকে হিন্দুরা প্রাকারগুলি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া তদুপরি প্রত্যূষ হইতে নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়াছিল। সঙ্গীতে বলভদ্রের বীরত্ব-কাহিনী বর্ণিত ছিল। কতকগুলি পরমা সুন্দরী স্বর্ণাভরণভূষিতা হইয়া নাচিতে নাচিতে মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল "হে কামুকগণ! তোরা কবে আমাদের অন্তঃপুরে আসিবি? এইত আবার তোদের এক হাজার সৈন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া তোদের পেয়গম্বরের স্বর্গের হুরিদের কাছে গিয়াছে—তাদের প্রাণ কি পাষাণ!"

পেয়গম্বরের নাম শুনিয়া মুসলমানেরা আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া প্রাকারস্থিত নর্ত্তকীদিগের প্রতি তীরনিক্ষেপ করিতে করিতে বেগে অগ্রসর হইল। তাহের অব্যর্থ সন্ধানে কতকগুলি নর্ত্তকী নিহত হইল—ক্ষণকালের জন্য সব নিস্তব্ধ হইল। কিন্তু একি! মুহূর্ত্তের মধ্যে দুর্গের দ্বাদশ সিংহদ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হইল এবং সেই বলভদ্র তাঁহার দুই ভ্রাতার সহিত সহসা বহির্গত হইয়া মুসলমানদিগের উপর ভীষণবেগে আপতিত হইয়া তাহাদের ধ্বংসসাধন করিতে লাগিলেন। মুসলমানেরা আহত বলভদ্র প্রভৃতিকে পুনরুজ্জীবিত দেখিয়া ভয়ে অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল, এমন সময়ে তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষের উৎসাহবাণীতে উৎসাহিত হইয়া পুনরায় ঘুরিয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল। এবারেও যেমন বলভদ্র ও তাঁহার দুই ভ্রাতা আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিলেন, অমনি হিন্দুরা দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

মুসলমানেরা সৈন্যাধিক্যবশতঃ যদিও প্রায় প্রতি যুদ্ধেই জয়লাভ করিতেছিল, কিন্তু বলভদ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃদিগকে

পুনরুজ্জীবিত দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। তাহাদের অন্তরে এই প্রশ্ন উঠিল যে উহাঁরা কে? উহাঁরা কি মানব? তাহা অসম্ভব বোধ হইল। তবে উহারা কি ছায়া? সুফি ও অন্যান্য মুসলমান বীরদিগের তরবারি তাহাও অসম্ভব প্রমাণ করিয়াছে। তবে উহারা কে? মুসলমানেরা উহাদিগকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতে দেখিয়াছে এবং উহাদের গাত্র হইতে বহুমূল্য দ্রব্য সকল অপহরণ করিয়াছে। উহারা যে ছায়া নহে, তাহা সেই সকল দ্রব্যই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিতে লাগিল। এই সকল বলবত্তর প্রমাণ না থাকিলে মুসলমানদিগের কেহই যুদ্ধ করিতে আর অগ্রসর হইত না। যুদ্ধক্ষেত্রে আরও বহুমূল্য দ্রব্য লাভ করিবার আশাতেও তাহারা খানিকটা বহিয়া গেল। কিন্তু অনেক মুসলমানরক্ত বৃথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি রাজা দাউ অপরাজিতই রহিলেন, এই সকল ভাবিয়া তিন সপ্তাহের জন্য সন্ধি প্রার্থনা করা হইল এবং উভয় পক্ষই তাহাতে স্বীকৃত হওয়াতে সন্ধি মঞ্জুর হইল। এই তিন সপ্তাহ মধ্যে আর কোন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

মহাভারত (২)।

পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়।

এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে 'অনুক্রমণিকাধ্যায়' (আদিপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়) সম্বন্ধে গতবারে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। মহাভারতের দ্বিতীয় অধ্যায় পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ। এইবারে এই অধ্যায়ের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির দিকে পাঠকগণের মনোযোগ-আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

এই "পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়।" দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্বাধ্যায় সমূহের নাম ও সংখ্যা এবং অপরাংশে প্রত্যেক পর্ব্বের শ্লোক ও অধ্যায় সংখ্যা এবং বিষয়ানুক্রমণিকা বিস্তারিতভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত প্রথমাংশকে "সংক্ষিপ্ত পর্ব্বসংগ্রহ" ও অপরাংশকে "বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহ" বলে। আমরা এই সমগ্র পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় ও বিভিন্ন সংস্করণের মহাভারত অবলম্বনে পরবর্ত্তী দুইটি তালিকা প্রস্তুত করিলাম। (ক)

এই তালিকা ও তৎসন্নিবিষ্ট পাদ টীকাগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ১ম,—আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায় মতে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা বোম্বাই ও প্রতাপ বাবুর সংস্করণানুসারে ৮৪৮৩৬, কিন্তু "শব্দকল্পদ্রুম" গ্রাহকগণের অবলম্বিত মূল মতে ৮৪৮৩৭ শ্লোক, অপরাপর সংস্করণে ৮৩৮১১ শ্লোকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকের বোম্বাই সংস্করণে এখন পাওয়া যায় ৯১০১৬টি শ্লোক। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা বাড়িয়াছে ৮৭২৫, ও কমিয়াছে ২৫৪৫ শ্লোক। সুতরাং মোটের উপর বাড়িয়াছে (৮৭২৫—২৫৪৫)=৬১৮০ শ্লোক। হেতু মুদ্রিত পুস্তকে বর্ত্তমানে ৮৪৮৩৬ ৬১৮০=৯১০১৬ শ্লোক দৃষ্ট হয়। গেল বোম্বাই সংস্করণের কথা। ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণের মুদ্রিত পুস্তকের শ্লোক সংখ্যাও পরস্পর মিলে না। এক সংস্করণের মহাভারতে যে শ্লোক দৃষ্ট হয়, অপর সংস্করণে তাহা প্রায়ই পাওয়া যায় না, এরূপ উদাহরণও বিরল নহে। ডাক্তার বর্ণেল বলেন, Tanjore palace Libraryতে 'মল্যালম' অক্ষরে লিখিত যে সংস্কৃত মহাভারতের প্রাচীন পুঁথি আছে, তাহাতে মুদ্রিত পুস্তকাপেক্ষা সচরাচর শতকরা প্রায় ৫টি শ্লোক অধিক দৃষ্ট হয়। তাঁহার উক্তি এই,—"The difference in entire Slokas do not amount to more than 5 per cent and these are generally ...d in the Northern recension" এতদনুসারে উক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত পুস্তকাপেক্ষা মোটের উপর প্রায় চারি সহস্র শ্লোক অধিক দৃষ্ট হয়। এইরূপ আরও অনেক গরমিল আছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

২য়।— মহাভারতের পর্ব্বাধ্যায় সংখ্যা আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনানুসারে (হরিবংশ বাদে) ১২০, টীকাকার নীলকণ্ঠ মতে ৯৭, আর বর্ত্তমান মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায় ১১২টি মাত্র।

৩য়।—মহাভারতের অধ্যায় সংখ্যা (অপরাপর সংস্করণ মতে) পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় মতে ১৯৩৩, বোম্বাই সংস্করণ মতে ১৯২৩ মাত্র। এখন মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায়—বোম্বাই সংস্করণে ২১১১, প্রতাপ বাবুর সংস্করণে ২১১৪, বর্দ্ধমান রাজবাটীর সংস্করণে ২১০২ মাত্র। অধ্যায় সংখ্যার এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধির অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ ;—লেখকগণের অনভিজ্ঞতা বা অসাবধানতা। অনবধানতাবশতঃ কোনও কোনও পুস্তকের কোনও কোনও স্থলে একটি অধ্যায় বিভক্ত হইয়া ২।৩ অধ্যায়ে পরিণত হইয়াছে। আবার কোথাও বা দুইটি অধ্যায় একত্রীভূত হইয়া গিয়াছে। উল্লিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেও উপলব্ধি হইবে যে, কোনও কোনও পর্ব্বে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাপেক্ষা শ্লোক কমিয়াছে কিন্তু অধ্যায় সংখ্যা বাড়িয়াছে। অধ্যায় বিভাগকরণকালীন অসাবধানতাই এরূপ অনৈক্যের এক প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়।

মহাভারতের নিম্নলিখিত (ক) চিহ্নিত স্থানের এ

পর্ব্বের নাম	শ্লোক সংখ্যা পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় মতে (১)	বর্ত্তমান পুস্তকের শ্লোক-সংখ্যা (২)	পর্ব্বাধ্যায় সংখ্যা পর্ব্ব-সংগ্রহাধ্যায় মতে (৩)	প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকের পর্ব্বাধ্যায় সংখ্যা (৩)	নীলকণ্ঠ ধৃত পর্ব্বাধ্যায় সংখ্যা	অধ্যায় সংখ্যা পর্ব্বসংগ্রহ-অধ্যায় মতে (৪)	প্রচলিত পুস্তকের অধ্যায় সংখ্যা (৪)
আদি পর্ব্ব	৮৮৮৪ (ক)	৮৪৭৯	১৯	১৯	১৮	২২৭	২৩৪
সভা পর্ব্ব	২৫১১	২৭০৯	৯	৯	৯	৭৮	৮১
বন পর্ব্ব	১১৬৬৪	১৭৪৭৮	২৩	২২	১৬	২৬৯	৩১৫
বিরাট পর্ব্ব	২০৫০	২৩৭৬	৫	৫	৪	৬৭	৭২
উদ্যোগ পর্ব্ব	৬৬৯৮ (খ)	৭৬৫৬২	২২	১৬	১১	১৮৬(গ)	১৯৬
ভীষ্ম পর্ব্ব	৫৮৮৪	৫৮৫৬	৫	৫	৫	১১৭	১২২
দ্রোণ পর্ব্ব	৮৯০৯ (ঘ)	৯৬৪৯	৮	৮	৮	১৭০	২০২
কর্ণ পর্ব্ব	৪৯৬৪	৫০৪৬	১	১	১	৬৯	৯৬
শল্য পর্ব্ব	৩২২০	৩৬৭১	৪	৪	৪	৫৯	৬৫
সৌপ্তিক পর্ব্ব	৮৭০	৮১১	২	২	৩	১৮	১৮
স্ত্রী পর্ব্ব	৭৭৫	৮২৭২	৩	৩	৫	২৭	২৭
শান্তি পর্ব্ব	১৪৭৩২(ঙ)	১৩৯৪৩	৯	৮	৪	৩২৯(চ)	৩৬৬
অনুশাসন পর্ব্ব	৮০০০	৭৭৯৬	২	২	১	১৪৬	১৬৯
অশ্বমেধ পর্ব্ব	৩৩২০	২৯০০	২	২	২	১০৩	৯২
আশ্রম বাসিক	১৫০৬	১১০৫	৩	৩	৩	৪২	৩৯
মৌষল পর্ব্ব	৩০০ (ছ)	২৯২	১	১	১	৬	৮
মহা প্রস্থানিক	৩২০	১০৯	১	১	১	৩	৩
স্বর্গারোহণিক	২০৯ (জ)	৩১২	১	১	১	৫	৬
সর্ব্বশুদ্ধ	৮৪৮৩৬	৯১০১৬	১২০	১১২	৯৭*	১৯২৩	২১১১

দ্বিতীয় তালিকা।

পর্ব্বাধ্যায় সমূহের নাম।

আদি পর্ব্ব।—১ অনুক্রমণিকা পর্ব্ব। ২ পর্ব্ব সংগ্রহাধ্যায় পর্ব্ব। ৩ পৌষ্য পর্ব্ব। ৪ পৌলোম পর্ব্ব। ৫ আস্তীক পর্ব্ব। ৬ আদিবংশাবতারণ পর্ব্ব। ৭ সম্ভব পর্ব্ব। ৮ জতুগৃহদাহ পর্ব্ব। ৯ হিড়িম্ব বধ পর্ব্ব। ১০ বকবধ পর্ব্ব। ১১ চৈত্ররথ পর্ব্ব। ১২ স্বয়ম্বর পর্ব্ব। ১৩ বৈবাহিক পর্ব্ব। ১৪ বিদুরাগমন পর্ব্ব। ১৫ রাজ্যলাভ পর্ব্ব। ১৬ অর্জ্জুনবনবাস পর্ব্ব। ১৭ সুভদ্রাহরণ পর্ব্ব। ১৮ হরণা-হরণ পর্ব্ব। ১৯ খাণ্ডবদাহ পর্ব্ব।

টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে, "বিদুরা গমনং রাজ্যলব্ধশ্চৈকং পর্ব্ব।" অর্থাৎ বিদুরাগমন ও রাজ্য লাভ এক পর্ব্বাধ্যায়ের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট এবং "খাণ্ডবদাহো ময়দর্শনং চৈকৈকং পর্ব্ব।" অর্থাৎ খাণ্ডব-দাহ পর্ব্বের (অর্থাৎ পর্ব্বাধ্যায়ের) শেষাংশ "ময়দর্শন পর্ব্ব" নামে পৃথক গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু মূলে আছে, "ততঃ খাণ্ডবদাহাখ্যং তত্রৈব ময়দর্শনং।" যাহা হউক, ফলে, ঘটনা সম্বন্ধীয় কোনও অনৈক্য নাই।

সভাপর্ব্ব।—১ সভাক্রিয়া পর্ব্ব। ২ মন্ত্রণা পর্ব্ব। ৩ জরাসন্ধ বধ পর্ব্ব। ৪ দিগ্বিজয় পর্ব্ব। ৫ রাজসূয়িক পর্ব্ব। ৬ অর্ঘাভিহরণ পর্ব্ব। ৭ শিশুপাল বধ পর্ব্ব। ৮ দ্যূত পর্ব্ব। ৯ অনুদ্যূত পর্ব্ব।

বোম্বাই সংস্করণে মন্ত্রণা পর্ব্ব পৃথক্ রূপে গৃহীত হয় নাই। ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের পর্ব্ব সংগ্রহাধ্যায়ের সহিত উদ্ধৃত তালিকার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তাঁহার সভাপর্ব্বে মন্ত্রণাপর্ব্বের পরিবর্ত্তে "লোকপাল সভাখ্যান পর্ব্ব" ও "রাজ-সূয়ারম্ভ পর্ব্ব" দৃষ্ট হয়। পর্ব্ব সংগ্রহে কিন্তু এ দুটির নাম নাই। প্রকৃত পক্ষে ও অন্যান্য সমস্ত মহাভারতে উক্ত পর্ব্বাধ্যায় দুটি সভাক্রিয়া ও মন্ত্রণা পর্ব্বের অন্তর্গত।

বন পর্ব্ব।—১অরণ্য যাত্রা পর্ব্ব। ২ কির্ম্মীর বধ পর্ব্ব। ৩ অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্ব। ৪ কৈরাত পর্ব্ব। ৫ ইন্দ্রলোকাভি-গমন পর্ব্ব। ৬ নলোপাখ্যান পর্ব্ব। ৭ তীর্থ যাত্রা পর্ব্ব। ৮ জটাসুর বধ পর্ব্ব। ৯ যক্ষযুদ্ধ পর্ব্ব। ১০ নিবাত কবচ যুদ্ধ পর্ব্ব। ১১ আজগর পর্ব্ব। ১২ মার্ক-ণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্ব। ১৩ দ্রৌপদী সত্য-ভামা সংবাদ পর্ব্ব। ১৪ ঘোষ যাত্রা পর্ব্ব। ১৫ মৃগ স্বপ্নোদ্ভব পর্ব্ব। ১৬ ব্রীহি-দ্রৌণিকোপাখ্যান পর্ব্ব। ১৭ ইন্দ্রদ্যুম্নো-পাখ্যান পর্ব্ব। ১৮ দ্রৌপদী হরণ পর্ব্ব। ১৯ জয়দ্রথ বিমোক্ষণ পর্ব্ব। ২০ রামোপা-খ্যান পর্ব্ব। ২১ পতিব্রতামাহাত্ম্য (সাবিত্রী উপাখ্যান) পর্ব্ব। ২২ কুণ্ডলাহরণ পর্ব্ব। ২৩ আরণেয় পর্ব্ব।

বর্দ্ধমান রাজবাটীর পণ্ডিতগণ "জটা-সুরবধ পর্ব্বকে" "তীর্থযাত্রা পর্ব্বের" অন্ত-র্ভুক্ত করিয়াছেন। মূলে কিন্তু স্পষ্ট আছে, "তীর্থযাত্রা ততঃ পর্ব্ব কুরুরাজস্য ধীমতঃ। জটাসুর বধঃ পর্ব্ব যক্ষযুদ্ধমতঃ পরং॥" এখানে "তীর্থযাত্রা পর্ব্ব" ও "জটাসুর বধ পর্ব্ব" দুইটি বিভিন্ন পর্ব্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বর্দ্ধমান রাজ-বাটীর পণ্ডিতগণ এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন, "তৎপরে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা পর্ব্ব, তাহাতেই জটাসুর বধ উক্ত হইয়াছে।' বলা বাহুল্য এই অনু-বাদ ভ্রমপূর্ণ। রাজবাটীর অনুবাদকগণ

"মৃগ স্বপ্নোদ্ভব" ও "ব্রীহি দ্রৌনিক উপাখ্যান" ঘোষযাত্রা পর্ব্বের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। এবং "ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান" পর্ব্বের নাম অনুবাদে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মূলে এই তিনটি প্রকরণ পৃথক্ পৃথক্ পর্ব্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই রূপ আবার জয়দ্রথ বিমোক্ষণ, রামোপাখ্যান ও সাবিত্রী উপাখ্যান রাজবাটীর অনুবাদে দ্রৌপদী হরণ পর্ব্বের অন্তর্গত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ সেগুলি দ্রৌপদী হরণ পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নহে। অপরাপর অনুবাদকগণ আমাদের স্থায় ভটাপূর্ব্ব বব, মৃগ স্বপ্নোদ্ভব, ব্রীহি দ্রৌনিকোপাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, জয়দ্রথ বিমোক্ষণ, সাবিত্রী উপাখ্যান ও রামোপাখ্যান—এই কয়টি প্রকরণ স্বতন্ত্র পর্ব্বরূপে গণনা ও অনুবাদ করিয়াছেন।

মুদ্রিত মহাভারতের বনপর্ব্বে দ্রৌপদী হরণ পর্ব্বের পূর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান দৃষ্ট হইল না। অনেক অনুসন্ধানের পর, মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ের এক স্থলে উহা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখিলাম। তৎপরে বিস্তৃত পর্ব্ব সংগ্রহে দেখি, সেখানেও "ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান" মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বের অন্তর্গত;—দ্রৌপদী হরণ পর্ব্বের পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই (ক) সংক্ষিপ্ত পর্ব্ব সংগ্রহ ও বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহ এক সৌতির এক সময়ের উক্তি হইয়াও উহাতে কেন এরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয়, বলিতে পারি না।

বিরাট পর্ব্ব।—১ পাণ্ডব প্রবেশ পর্ব্ব। ২ সময় পালন পর্ব্ব। ৩ কীচক বধ পর্ব্ব। ৪ গোগ্রহণ পর্ব্ব। ৫ বৈবাহিক পর্ব্ব।

উদ্যোগপর্ব্ব।—১ সেনোদ্যোগ পর্ব্ব। ২ সঞ্জয় যান পর্ব্ব। ৩ প্রজাগর পর্ব্ব। ৪ সনৎ সুজাত পর্ব্ব। ৫ যানসন্ধি পর্ব্ব। ৬ ভগবদ্ যান পর্ব্ব। ৭ মাতলীয় উপাখ্যান পর্ব্ব। ৮ গালব চরিত পর্ব্ব। ৯ "সাবিত্রী উপাখ্যান পর্ব্ব।" "১০ বামদেবোপাখ্যান পর্ব্ব।" "১১ বৈণ্যোপাখ্যান পর্ব্ব।" ১২ জামদগ্ন্যোপাখ্যান পর্ব্ব। "১৩ ষোড়শ রাজিক পর্ব্ব।" ১৪ সভাপ্রবেশ পর্ব্ব। ১৫ বিদুলা পুত্র শাসন পর্ব্ব। ১৬ সৈন্যোদ্যোগ পর্ব্ব। ১৭ "শ্বেতোপাখ্যান পর্ব্ব।" ১৮ বিবাদ পর্ব্ব। ১৯ সৈন্য নির্য্যাণ পর্ব্ব। ২০ রথাতি সংখ্যান পর্ব্ব। ২১ উলূক দূতাগমন পর্ব্ব। ২২ অম্বোপাখ্যান পর্ব্ব।

মুদ্রিত মহাভারতের (বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদের) উদ্যোগ পর্ব্বে উদ্ধৃত চিহ্নান্তর্গত ৫টী পর্ব্ব দৃষ্ট হয় না। অন্য কোনও সংস্করণের মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে সেগুলি আছে কি না, সবিশেষ অবগত নহি। যদি না থাকে তবে কি ঐ কয়টি পর্ব্বাধ্যায় কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে? প্রতাপ বাবু, কালীসিংহ ও রাজকৃষ্ণ রায়ের অবলম্বিত মূলের সংক্ষিপ্ত পর্ব্ব সংগ্রহে ঐ সকলের উল্লেখ আছে; কিন্তু বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহে আবার ঐ ছয়টি প্রকরণের কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না;—রাজবাটীর বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহেও দৃষ্ট হয় না। তৎ পরিবর্ত্তে "দম্ভোদ্ভবোপাখ্যান"

(ক) এই প্রস্তাব লিখিত হওয়ার পর এই অংশের নীলকণ্ঠের টীকা আমার হস্তগত হয়। তাহাতে দেখি, লিখিত আছে,—"ইন্দ্রদ্যুম্নমিত্যত্র ক্রমেণ বিবক্ষিতঃ সংখ্যায়াং তাৎপর্য্যাৎ, সমস্যান্তর্গতং বেদং পর্ব্ব।" ৫৫ শ্লোকের নীলকণ্ঠটীকা।

নামক একটি উপাখ্যান বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহে ও উদ্যোগ পর্ব্বে দৃষ্ট হয়। এই উপাখ্যান জামদগ্ন্য পরশুরামপ্রোক্ত। ইহাই কি সংক্ষিপ্ত পর্ব্বসংগ্রহোক্ত "জামদগ্ন্যোপাখ্যান" ?

৮রাজকৃষ্ণ রায় ও কালীপ্রসন্ন সিংহের বঙ্গানুবাদের সংক্ষিপ্ত পর্ব্বসংগ্রহে শ্বেতোপাখ্যানের পর "মন্ত্রমূল কার্য্য চিন্তন" "সেনাপতি নিয়োগাখ্যান" ও "শ্বেত বাসুদেব সংবাদ" এই তিনটি পর্ব্বাধ্যায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহে সেগুলির অভাব। ষোড়শ রাজিকোপাখ্যান বহু অনুসন্ধানের পর শান্তি পর্ব্বের এক স্থলে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। কিন্তু পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের কোনও স্থলেই ইহাকে শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত বলা হয় নাই।

বোম্বাই সংস্করণের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে শ্বেতোপাখ্যানের পরিবর্ত্তে "বিশ্বোপাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়ের" উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ভীষ্ম পর্ব্ব।—১ ভীষ্মাভিষেচন পর্ব্ব। ২ জম্বুদ্বীপ নির্ম্মাণ পর্ব্ব। ৩ ভূমিপর্ব্ব। ৪ ভগবদ্গীতাপর্ব্ব। ৫ ভীষ্মবধ পর্ব্ব।

দ্রোণপর্ব্ব।—১ দ্রোণাভিষেক পর্ব্ব। ২ সংসপ্তক পর্ব্ব। ৩ অভিমন্যু বধ পর্ব্ব। ৪ প্রতিজ্ঞা পর্ব্ব। ৫ জয়দ্রথ বধ পর্ব্ব। ৬ ঘটোৎকচ বধ পর্ব্ব। ৭ দ্রোণ বধ পর্ব্ব। ৮ নারায়ণাস্ত্র মোক্ষণ পর্ব্ব।

১ কর্ণ পর্ব্ব।

শল্য পর্ব্ব।—১ শল্য বধ পর্ব্ব। ২ হ্রদ প্রবেশন পর্ব্ব। ৩ গদাযুদ্ধ পর্ব্ব। ৪ সারস্বত তীর্থ বংশানুকীর্ত্তন পর্ব্ব।

মূলে আছে,—"সারস্বতং ততঃ পর্ব্ব তীর্থ বংশানুকীর্ত্তনং।" প্রতাপ বাবুর অনুবাদ এই, Then comes *Saraswata* and then descriptions of holy shrines, and then geneologies." (PP 25) এখানে "তীর্থ বংশানুকীর্ত্তন" মানে কি "তীর্থ বিবরণ ও বংশতালিকা কথন' ? বিস্তৃত পর্ব্বসংগ্রহে ও মূল গ্রন্থেও (শল্য পর্ব্বে) যখন বংশানুকীর্ত্তনের প্রসঙ্গ মাত্র দেখা যায় না, তখন "তীর্থ বংশানুকীর্ত্তন" "তীর্থ সমূহের ইতিহাস কথন" হওয়া উচিত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব।—১ সৌপ্তিক পর্ব্ব। ২ ঐষীক পর্ব্ব।

স্ত্রীপর্ব্ব।—১ জল প্রাদানিক পর্ব্ব। ২ স্ত্রী বিলাপ পর্ব্ব। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, "জল প্রাদানিকে এব স্ত্রীবিলাপনং।" ৩ শ্রাদ্ধ পর্ব্ব।

শান্তি পর্ব্ব।—১ চার্ব্বাক বধ পর্ব্ব। ২ আভিষেচনিক পর্ব্ব। ৩ গৃহ প্রবিভাগ পর্ব্ব। ৪ শান্তি পর্ব্ব (যাহাতে রাজধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে)। ৫ আপদ্ ধর্ম্ম। ৬ মোক্ষধর্ম্ম। ৭ শুক প্রশ্নাভিগমন পর্ব্ব। ৮ ব্রহ্ম প্রশ্নানুশাসন পর্ব্ব। ৯ দুর্ব্বাসা প্রাদুর্ভাব ও মায়াসংবাদ পর্ব্ব।

শান্তিপর্ব্বের ৩৮শ অধ্যায়ে চার্ব্বাক বধ বর্ণিত হইয়াছে ও সেইখানে চার্ব্বাকবধ পর্ব্বের প্রারম্ভ। তাহা হইলে শান্তি পর্ব্বের প্রথম ৩৭টি অধ্যায় কোন্ পর্ব্বাধ্যায়ের অন্তর্গত? বিস্তৃত পর্ব্ব সংগ্রহে চার্ব্বাক বধ, আভিষেচনিক, শুক প্রশ্নাভিগমন, ব্রহ্ম প্রশ্নানুশাসন ও দুর্ব্বাসা প্রাদুর্ভাবাদির উল্লেখ নাই। "দুর্ব্বাসা প্রাদুর্ভাব পর্ব্ব" শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হয় না। বহু অনুসন্ধানের পর অনুশাসন পর্ব্বের শেষভাগে দুর্ব্বাসার প্রভাব সম্বন্ধীয় একটি উপাখ্যান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে দেখিলাম। উহাই কি দুর্ব্বাসা প্রাদুর্ভাব পর্ব্ব? কিন্তু উহাতে মায়া সংবাদ দৃষ্ট হয় না।

অনুশাসনপর্ব্ব।—১ অনুশাসনপর্ব্ব। ২ ভীষ্ম স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

অশ্বমেধপর্ব্ব।—১ আশ্বমেধিকপর্ব্ব। ২ অনুগীতাপর্ব্ব।

৮ বঙ্কিম বাবু বলেন, পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা পর্ব্বাধ্যায়ের নামোল্লেখ নাই। আমরা কিন্তু অনুগীতার উল্লেখ সকল সংস্করণের মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়েই পাইয়াছি।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব।—১ আশ্রমবাসিকপর্ব্ব। ২ পুত্রদর্শনপর্ব্ব। ৩ নারদাগমনপর্ব্ব।

১ মৌষলপর্ব্ব।

১ মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব।

১ স্বর্গারোহণিকপর্ব্ব।

(প্রতাপচন্দ্র রায়ের প্রকাশিত মহাভারতের দ্বিতীয় অধ্যায় অবলম্বনে উপরিলিখিত তালিকা প্রস্তুত হইল)।

ইহার পর "হরিবংশপর্ব্ব, বিষ্ণুপর্ব্ব ও ভবিষ্যৎপর্ব্ব" এই পর্ব্বাধ্যায়ত্রয়ের নামোল্লেখ করিয়া সৌতি বলিতেছেন,—

"এতৎ পর্ব্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা।" কিন্তু পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় কথিত নামাবলীর সমষ্টি করিলে ১২০ হয়। ব্যাসপ্রোক্ত শত পর্ব্বের উপর এই ২০টি অধিকপর্ব্ব কোথা হইতে আসিল, জানা যায় না। যে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় অবলম্বনে এই তালিকা প্রস্তুত হইল, প্রতাপ বাবুর প্রকাশিত সংস্করণে উহা ৩৮৪ শ্লোকবিশিষ্ট, কিন্তু বোম্বাই সংস্করণের মহাভারতের আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে-অর্থাৎ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ৩৯৬ শ্লোক বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যায়। এইরূপ গরমিল আরও অনেক বিষয়ে অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়।

এইখানে আমরা মহাভারতের ২য় অধ্যায়ের সমালোচনা শেষ করিলাম। ইহার পর মহাভারত বর্ণিত মূল ঘটনা ও অপরাপর বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা মহাভারতের টীকাকারগণের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। পূর্ব্বে মহাভারতের অনেকগুলি টীকা ছিল; তন্মধ্যে এখন একমাত্র নীলকণ্ঠের টীকাই সুপ্রাপ্য। তাঁহার টীকার নাম "ভারতভাবদীপ"। নীলকণ্ঠ সমগ্র মহাভারতের টীকা করেন নাই, কেবল জটিল শ্লোকগুলিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

উত্তানেঽস্মিহ কোষবিগ্রহবলং পদোঃযুনৈবাশ্রিতং।
গম্ভ রেষু ন সেতবো ন বিহিতাঃ কূটানন
স্ফোটিতাঃ॥
ন ছিন্না ন তমশ্চরাননতর্ভিক্তা ন নাহ্লাদিতা।
নো দীনাশ্চ ন বিভীষণা ন বিহিতাঃ শ্রীলক্ষ্মণার্য্যা-
শ্রিতৈঃ॥

মহাভারতের পরিশিষ্ট স্বরূপ হরিবংশের টীকার উপসংহারে নীলকণ্ঠ যেরূপ ভাবে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, গোদাবরী তীরস্থিত "কর্পূরগ্রামে" (বর্ত্তমান নাম 'কোপরগাঁও') গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার উপাধি "চতুর্ধর" (চৌধুরী) ছিল। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দ ও মাতার নাম অম্বাদেবী। শিব, কৃষ্ণ, ত্র্যম্বক নামে, তাঁহার তিনটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। নীলকণ্ঠ বারাণশীতে অবস্থানকালে মহাভারতের টীকা রচনা করেন। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের টীকার প্রারম্ভে আরও একটু পরিচয় পাওয়া যায় যথা,—

বেদান্তে লক্ষ্মণাচার্য্যং ক্রতুবিধিবিবৃতৌ তীর্থ নারায়ণার্য্যং। তর্কে শ্রীবেশমিশ্রান্ ফণিপতি ভণিতৌ পোল গঙ্গাধরার্য্যং। বেদেসাঙ্গে পিতৃব্যং শিবমথ পিতরং দক্ষিণামূর্ত্তাপাস্তৌ। শ্রৌতে চিন্তামণিং যঃ শরণমুপগতো ভূমি গোপালদেবং। ইত্যাদি।

ইহাতে জানা গেল, নীলকণ্ঠ চতুর্ধর—লক্ষ্মণ, নারায়ণ, শ্রীবেশ, গঙ্গাধর পোল, পিতৃব্য শিব, পিতা গোবিন্দ, চিন্তামণি ও গোপালদেব এই অষ্ট গুরুর নিকট আটটি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্বীয় টীকার উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

টীকান্তরাণীন্দ্রবিগ্রভাণি
বাহ্যার্থবস্তূনি প্রকাশয়ন্তু।
অন্তর্নিগূঢার্থচয়প্রকাশে,
দীপক্রমো ভারতমন্দিরেঽস্মিন॥"

মহাভারতের অর্জ্জুনমিশ্রকৃত টীকার সকল অংশ এখন আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বহু পরিশ্রমে অর্জ্জুনমিশ্রকৃত টীকার ৪টি মাত্র পর্ব্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পদ্মানন্দ নামক জনৈক পণ্ডিত সমগ্র মহাভারতের টীকা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তৎকৃত টীকার দুইটি পর্ব্ব (আদি ও কর্ণপর্ব্ব) ব্যতীত অপরাপর অংশ এখন আর পাওয়া যায় না।

শ্রীমদভগবদ্গীতা মহাভারতের একটী প্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকরণ। বিভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ইহার বিবিধ ভাষ্য টীকা ও টীকার টীকা রচনা করিয়াছেন। সেই সমস্ত ভাষ্য ও টীকার সংখ্যা ২৫এর অপেক্ষা ন্যূন নহে। উদ্যোগপর্ব্বের অন্তর্গত "সনৎসুজাতীয়" প্রকরণেরও বিবিধ টীকা দৃষ্ট হয়। সেইরূপ শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় ও তাহার বিশেষ বিশেষ অংশের অনেকগুলি বিবিধ টীকা রচিত হইয়াছে।

ফলতঃ, সমগ্র মহাভারতের তিনটি ভিন্ন অপর কোনও টীকার বিষয় আমরা এপর্য্যন্ত অবগত নহি। এই তিনটির মধ্যে একটি (নীলকণ্ঠ প্রণীত টীকাটি) সর্ব্বত্র সুপ্রাপ্য। অপর (অর্জ্জুনমিশ্র ও পদ্মানন্দ পণ্ডিত কৃত) দুইটির কিয়দংশমাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অপরাংশ এখনও বিলুপ্তপ্রায়।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র।

অসি।

এই অস্ত্রটী সর্ব্বদেশ সাধারণ এবং ইহার প্রচার ও ব্যবহার অদ্যাপি সমভাবে বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন জনশ্রুতি ও ধনুর্ব্বেদের লিপি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, পূর্ব্বকালে যেরূপ তীক্ষ্ণধার অসি উৎপন্ন হইত—এখন আর সেইরূপ শক্তিসম্পন্ন তীক্ষ্ণ অসি কোন শিল্পীই প্রস্তুত করিতে পারে না। শুনা গিয়াছে এবং ধনুর্ব্বেদেও লিখিত আছে যে, অসির আঘাতে প্রস্তর স্তম্ভও কর্ত্তিত হয়। পাথরে আঘাত করিলেও ধার থাকে ভাঙ্গিয়া যায় না এরূপ অসি আর এখন নাই। কেন নাই? তাহা জানি না। এ সকল কথা যেরূপ হয় হউক, পরন্তু পূর্ব্বকালে কত প্রকার অসি ছিল, কিরূপ লোহায় কোন্ প্রদেশে প্রস্তুত হইত, কিরূপ পায়ন অর্থাৎ পান্ দিয়া তাহার ধার বাঁধা হইত এবং কিরূপ কৌশলেই বা তাহারা ব্যবহৃত হইত, অদ্য আমরা এই সকল বৃত্তান্ত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া পাঠকগণের অক্ষি সমক্ষে অর্পণ করিব। যদিও এরূপ প্রস্তাবে কিছু শিক্ষিতব্য থাকে না—তথাপি ইহাদ্বারা কুতুহল বৃদ্ধি ও পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মহিমা অনুভূত হইতে পারে তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

এই অস্ত্র অতি পুরাতন। অতি পূর্ব্বকালে ইহার আটটী মাত্র নাম ছিল। যথা—অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধর্ম্মা, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মমাল। অনন্তর ইহার আরও কএকটী নাম বৃদ্ধি হইয়াছিল। যথা—নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, রিষ্টি, কৌক্ষেয়ক, মণ্ডলাগ্র, করপাল, করবাল, তরবার ও তরবারি। ছোট বড় ও গঠনের তারতম্য অনুসারে ইহার আরও দুই চারিটী নামে আছে সে সকল ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অসিসম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা লিখিত আছে। তাহাহইতে প্রথমে আমরা লৌহ-পরীক্ষাটী বিবৃত করিব। অগ্রে লৌহ-পরীক্ষা, পশ্চাৎ দোষগুণের পরীক্ষা করাই উচিত।

অসির উপযুক্ত লৌহ প্রথমতঃ বিবিধ। নিরলি ও সালি। প্রথমোক্ত নিরলি লোহ আবার অনেকবিধ। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত লৌহকে কাঞ্চী প্রভৃতি নামদ্বারা ব্যক্ত করা হয়। সেই সকল লৌহই অসিনির্ম্মাণের উপযুক্ত এবং বিবিধ ব্যাধির বিনাশক। যথা—

"লৌহানাং লক্ষণং বক্ষ্যে যথোক্তং মুনিপুঙ্গবৈঃ।
নিরঙ্গ সাঙ্গভেদেন তে লৌহা বিবিধা মতাঃ॥
নিরঙ্গা. কাঞ্চিপাণ্ড্যাদি ভেদাৎ বহুবিধা মতাঃ।
অসিকর্ম্মসু তেনাস্তা নানাব্যাধিবিনাশনাঃ॥"

বীরচিন্তামণি।

খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র প্রায়শঃই সাঙ্গ লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হয়, এজন্য সেই সঙ্গে লৌহের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও চিহ্ন সকল ব্যক্ত করাই কর্ত্তব্য। বীর

চিন্তামণি ও শাঙ্গ'ধর-পদ্ধতি নামক গ্রন্থে এতদনুরূপ একটী বচন আছে তাহা এই—

"বক্ষ্যন্তে প্রায়শো যস্মাৎ সাঙ্গাঃ খড়্গাদিকর্ম্মসু।
নামভেদেন চিহ্নানি লৌহানামভিদধ্মহে॥"

খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্রের উপাদান প্রধান প্রধান সাঙ্গ লৌহের নাম দশটী। যথা রোহিণী, নীলপিণ্ড, ময়ূরগ্রৈবক্, ময়ূর-বজ্র, তিত্তিরাঙ্গ, সুবর্ণবজ্র, শৈবলমালান, মৌষলবজ্র, কঙ্গোলবজ্র বা স্বর্ণক ও গ্রন্থিবজ্র এতদ্ভিন্ন আরও কএক প্রকার লৌহ আছে তাহা সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। এ সকলের লক্ষণ বা চিহ্ন উক্ত গ্রন্থে অতি বিস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। যথা—

রোহিণী।

"ক্ষুদ্রাঙ্গং সুদৃঢ়ং যস্য নীলমীষৎ প্রতীয়তে।
রোহিণীং তাং বিজানীয়াৎ তৎক্ষতে বহুবেদনা॥"

যাহার অবয়ব ক্ষুদ্র (কুন্দুই বা ক্ষুদ্র কাঁকরের ন্যায় আকার বিশিষ্ট) নীলবর্ণ দেখাইবে তাহাকে রোহিণী বলিয়া জানিবে। এই রোহিণী লৌহদ্বারা ক্ষত হইলে ক্ষত স্থানে অত্যন্ত বেদনা জন্মে।

নীলপণ্ড।

"নীলপিণ্ডসমাঙ্গঞ্চ নীলপিণ্ডং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

যাহা নীলপিণ্ড অর্থাৎ নীলবড়ীর ন্যায় তাহা নীলপিণ্ড বলিয়া জানিবে।

ময়ূরগ্রৈবক।

"ময়ূরকণ্ঠসংস্থানমঙ্গং যস্য প্রতীতয়ে।
ময়ূরগ্রৈবকং লৌহং তং বিদুর্ম্মুনিপুঙ্গবাঃ॥"

যাহার অবয়ব ময়ূরের কণ্ঠ তুল্য—তাদৃশ লৌহকে মুনিগণ ময়ূরগ্রৈবক বলিয়া থাকেন।

ময়ূরবজ্রক।

"নাগকেশরপুষ্পাভমঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।
ময়ূরবজ্রকং প্রাহুর্লোহশাস্ত্রবিদো জনাঃ॥"

যাহার অঙ্গে নাগকেশর ফুলের আভা দৃষ্ট হয়—লৌহ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে ময়ূরবজ্র নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

তিত্তিরাঙ্গ।

"যস্মিংস্তিত্তিরপক্ষাভমঙ্গং লৌহে প্রতীয়তে।
দুর্লভং বহুমূল্যং তিত্তিরাঙ্গং সুপাকজম্॥"

যে লৌহের অঙ্গ তিত্তির পাখীর পক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হয়—সেই লৌহই তিত্তিরাদি নামে বিখ্যাত। এই তিত্তিরাদি লৌহ অতি দুর্লভ ও অতি মূল্যবান্ এবং ইহা অতি সুপাকজাত অর্থাৎ সুধাতু লৌহ। এই সুধাতু লৌহদ্বারা যে কোন অস্ত্র নির্ম্মিত হয় সমস্তই উত্তম ও গুণবান্।

সুবর্ণবজ্রক।

"সুবর্ণসদৃশাকারাত্বঙ্গভূমিঃ প্রতীয়তে।
সুবর্ণবজ্রকং বিদ্যাৎ বহুমূল্যং মহাগুণম্॥"

যাহার অঙ্গে সুবর্ণাকার চিহ্ন প্রতীত হয়—সেই লৌহকে সুবর্ণবজ্র বলিয়া জানিবে। এই সুবর্ণবজ্র নামক লৌহও বহুমূল্য ও গুণবান্।

শৈবলমালান।

"অবিচ্ছিন্নং সুসূক্ষ্মাঙ্গং দুর্ব্বাভাঙ্গমপাকজম্।
যস্মিন্ শৈবলমালানমাহুস্তং মুনিপুঙ্গবাঃ॥"

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, যে লৌহে অবিচ্ছিন্ন সুসূক্ষ্ম অঙ্গ (আঁস্) থাকে এবং উহার আভা যদি দুর্ব্বাদলের ন্যায় হয়, তবে তাহাকে শৈবলমালান আখ্যা প্রদান করিবেক।

মৌষলবজ্র।

"শুক্লং পার্শ্বদ্বয়ং যস্য মধ্যে স্বর্ণময়াঙ্ককম্।
ধূম্রবৎসীমসংস্থানং মৌষলং বজ্রকং বিদুঃ॥"

যাহার পার্শ্বদ্বয়ে শ্বেতাভা স্ফুরিত হয়, মধ্যে স্বর্ণরেখা দৃষ্ট হয়, সংহত করিলে সংঘাত স্থান ধূম্রবর্ণ হয়, তাদৃশ লৌহকে মৌষলবজ্রক বলিয়া জানিবে।

কঙ্কোলবজ্র বা স্বর্ণক।

"মৃণালনামপ্রতিমং বিনোদৈবগ্রসংস্থিতৈঃ।
কঙ্কোলবজ্রকং প্রাহুঃ স্বর্ণকং লোহচিন্তকাঃ॥"

লৌহতত্ত্ব-অনুসন্ধায়ীরা বলিয়া থাকেন যে, যাহাকে ভাঙ্গিলে তদগ্রভাগে মৃণালের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রসকল দেখা যায়—তাহাকে কঙ্কোলবজ্রক অথবা স্বর্ণক বলিয়া জানিবে।

গ্রন্থিবজ্র।

"অঙ্গং প্রতীয়তে যত্র বহুগ্রন্থিসমন্বিতম্।
দুর্লভং তন্মহামৌল্যং গ্রন্থিবজ্রকমুচ্যতে॥"

যাহার সর্ব্বাঙ্গে গ্রন্থিল অর্থাৎ যাহার অনেকস্থানে গাঁইট্ আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার নাম গ্রন্থিবজ্র। এই গ্রন্থিবজ্র লৌহও দুর্লভ ও মহামূল্য।

এতদ্ভিন্ন নিরঙ্গ লৌহও অনেকপ্রকার আছে। তাহাদের নাম ও চিহ্ন সকল লৌহার্ণব গ্রন্থে বিবৃত আছে। রোহিণী, পাণ্ডু ও রুক্ষ এই তিন প্রকার মাত্র নিরঙ্গ লৌহ অস্ত্রের উপযুক্ত। রুক্ষ বা কান্তলৌহ নিরঙ্গ মধ্যপাতী। আজকাল ইংলিশ লৌহে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। তজ্জন্য আর সেই কষ্টসংগ্রহ ও বহুমূল্য দেশী লৌহ কেহ আহরণ করেন না। এমন কি এ দেশীয় লোকেরা প্রায় দেশী লৌহের স্বরূপ, চিহ্ন, গুণাগুণ সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে লৌহের আকর আছে কি না তাহাও কেহ জ্ঞাত নহেন, বা অনুসন্ধান করেন না।—করিবারও প্রয়োজন নাই। কারণ, এখন কেবল অলাবুচ্ছেদনের উপযুক্ত বঁটি নির্ম্মাণের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র লৌহের প্রয়োজন হয় পরন্তু তাহা অল্প মূল্যের মৃৎকল্প ইংলিশ লৌহদ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারে। পূর্ব্বে এদেশে ইংলিশ লৌহের আমদানি ছিল না এবং মেষ, মহিষ, হয়, হস্তী, বা কাষ্ঠযষ্টি, লৌহযষ্টি, ও অস্থিযষ্টি প্রভৃতি বৃহৎ ও সারবান্ বস্তুচ্ছেদনের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন ছিল; সুতরাং তদুপযুক্ত লৌহেরও প্রয়োজন হইত। প্রয়োজন বুঝিয়া কৃপাণী পরীক্ষক পুরুষেরাও দেশে দেশে এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া লৌহের অনুসন্ধান সংগ্রহ ও পরীক্ষা করিতেন। এখন আর কিছুই করিতে হয় না, চারি পয়সা ফেলিয়া দিলেই দিব্য একখানি প্রস্তুত বটি পাওয়া যায়। ফল, এ সকল প্রসঙ্গগত কথার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে প্রকৃত কথায় মনোনিবেশ করুন।

উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত কোন এক লৌহদ্বারা অসি নির্ম্মাণ করিবে। অসিনির্ম্মাতার যদি নৈপুণ্য না থাকে তবে উত্তম লৌহ পাইলেও তিনি উত্তম অসি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন না। কোন্ লৌহকে কিরূপ প্রকারে ও কতবার পোড় দিয়া পিটিতে হয়, তাহা জানা আবশ্যক। পরন্তু পায়ন অর্থাৎ পানের গুণেই তাহার ধার তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় হয়; এজন্য শিল্পীকে অগ্রে অস্ত্রের পায়নকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ হইতে হয়। পায়ন-কার্য্যটী যদি উত্তম বা

সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তবেই অস্ত্রের উত্তমতা জন্মে—নচেৎ সমস্তই বিফল। পায়নকার্য্যের পাকটী লিপিদ্বারা শিক্ষা করা যায় না। উহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্বহস্তে তৎকার্য্য সাধন—এই প্রক্রিয়াদ্বারাই শিখা যায়। অন্য কোন প্রকারে শিক্ষা করা যায় না। তথাপি পণ্ডিতেরা পায়নের দ্রব্য ও প্রক্রিয়াগুলি যথাসাধ্য লিখিতে ক্রটী করেন নাই। বৃহৎসংহিতা-প্রোক্ত অসির পায়নবিধিটী এস্থলে পাঠকবর্গের সুগোচরার্থ উদ্ধৃত করিলাম।

পায়ন অর্থাৎ পাইন্ (পান) দিবার বিধি।

অসি প্রস্তুত হইলে উহা পরিষ্কৃত করিয়া ধারের মুখে লবণ কি অন্য কোন ক্ষার, মৃত্তিকা দ্রবে মিশ্রিত করণপূর্ব্বক প্রলেপ দিয়া, সেই প্রলিপ্ত ধারটী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ উহাকে জল, কি অন্যান্য দ্রব দ্রব্য পান করানকে পায়ন বলে। দগ্ধ করিয়া জল কি অন্য কোন তরল দ্রব্যে নিক্ষেপ করিলেই তাহা পান করান হয়। অসিকে যে যে দ্রব্য পান করাইলে উত্তম হয়, মহর্ষি উশনা অর্থাৎ অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"ইদমৌশনঞ্চ শস্ত্রপানং
রুধিরেণ শ্রিয়মিচ্ছতঃ প্রদীপ্তাম্।
হবিষা গুণবৎসুতাভিলিপ্সোঃ
সলিলেনাক্ষয়মিচ্ছতশ্চ বিত্তম্॥
বড়বোষ্ট্রকরেণুদুগ্ধপানং
যদি পাপেন সমাহতেহর্থসিদ্ধিম্।
ঋষপিত্তমৃগাশ্ববস্তদুগ্ধৈঃ
করিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগর্ভৈঃ॥
আর্কং পয়ো হুডুবিষাণমষীসমেতম্
পারাবতাখুশকৃতা চ যুতঃ প্রলেপঃ।
শস্ত্রস্য তৈলমথিতস্য ততোঽস্য পানয়
পশ্চাচ্ছিতস্য ন শিলাসু ভবেদ্বিঘাতঃ॥
ক্ষারে কদল্যা মথিতেন যুক্তে
দিনোষিতে পায়িতমায়সং যৎ।
সম্যক্ শিতং চাশ্মনিনেতি ভঙ্গং
ন চান্য লৌহেষপি তস্য কৌণ্ঠ্যম্॥"

অর্থ এই যে, যিনি শ্রীবৃদ্ধি ইচ্ছা করেন, তিনি শস্ত্রকে রুধির পান করাইবেন। অর্থাৎ শস্ত্রের ধার দগ্ধ করিয়া রুধিরে নিক্ষেপ করিবেন। (১) আর যিনি গুণবান্ পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি শস্ত্রে ঘৃত পান দিবেন। (২) এবং যিনি অক্ষয় ধন কামনা করেন, অসিকে তিনি জল পান করাইবেন। (৩) এইরূপ, প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত অসিকে ঘোটকীর দুগ্ধ, উষ্ট্রের দুগ্ধ, হস্তিনীর দুগ্ধও পান করাইবেন। (৪।৫।৬) আর যদি হস্তীর শুণ্ড কাটিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি অস্ত্রকে মৎস্যের পিত্ত, মৃগীর দুগ্ধ, কুকুরের দুগ্ধ, ছাগীর দুগ্ধ পান করাইবেন। (জনশ্রুতি আছে যে, মহারাণা প্রতাপসিংহের নাকি এতদ্রূপ তরবারি ছিল)। (৭।৮।৯।১০) আকন্দের আঠা, হুডু বিষাণ (?), কয়লা, পারাবত ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্রিত ও মর্দ্দিত করিয়া তৈলমথিত শস্ত্রের ধারে প্রলেপ দিবেক। অনন্তর উহাকে পূর্ব্বোক্ত কোন দ্রব্য পান করাইবেক। পরে উহাকে সুশাণিত করিবেক। এইরূপ করিলে সে অস্ত্র প্রস্তরেও কুণ্ঠিত হইবে না। অর্থাৎ পাথরে চোট মারিলে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবেক, ভাঙ্গিয়া যাইবে না। (১১) অপিচ অস্ত্র কদলীক্ষারে ম্রক্ষিত করিয়া এক দিন ও এক রাত্রি

রাখিবেক। পশ্চাৎ উহাতে পান দিয়া উত্তমরূপে শাণিত করিবেক। এরূপ করিলেও সে অস্ত্র প্রস্তরে ভাঙ্গিবে না এবং অন্য লৌহতে কুণ্ঠিত হইবে না। (১২)।

এইরূপ আরও কয়েকপ্রকার পায়ন বিধি আছে। পরন্তু সে সকল—তীরের ফলার জন্য বিহিত। বিষ কিংবা বিষবৎ দ্রব্য পান করাইলে অস্ত্র অতি ভীষণাকার ধারণ করে। বিষপায়িত অস্ত্রদ্বারা অত্যল্প রক্তপাত ঘটনা হইলেই উহা প্রাণ-সংহারক হইয়া উঠে।

অস্ত্রে পান দিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গন্ধ বহির্গত হয়। সেই সকল গন্ধ-দ্বারা অস্ত্রের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানা যায় বলিয়া বর্ণিত আছে এবং পানের সময় অস্ত্রকে যে দগ্ধ করিতে হয়—তৎকালের যে বর্ণ বা রঙ্ হয়—তাহা দেখিয়াও তাহার ভবিষ্যৎ শুভাশুভ অনুমিত হয়। যথা—

"করবীরোৎপলগজমদ
ঘৃতকুঙ্কুমকুন্দচম্পক সগন্ধঃ।
শুভদোঽনিষ্টো গোমূত্র-
পঙ্কভেদঃ সদৃশ গন্ধঃ॥
কূর্ম্মবসাসৃক্‌ক্ষারোপমশ্চ
ভয়দুঃখদো ভবতি গন্ধঃ।
বৈদূর্য্যকনকবিদ্যুৎপ্রভো
জয়ারোগ্যবৃদ্ধিকরঃ॥"

করবীর, উৎপল, হস্তিমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম, কুঁদফুল, ও চাঁপা ফুলের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইলে জানিবে যে, সে অস্ত্রে শুভ হইবে। আর যদি গোমূত্র পঙ্ক-ঘট্টন, কূর্ম্ম, বসা, রক্ত কিংবা ক্ষারতুল্য কোন গন্ধ উত্থিত হয়, তবে জানিবে যে, সে অস্ত্র অশুভ। দাহকালে যদি বৈদূর্য্য, কনক, কি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা বহির্গত হয় তাহা হইলে সে অস্ত্র জয় ও আরোগ্য বৃদ্ধি করিবে, নচেৎ অশুভ বৃদ্ধি করিবে। এসকল কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই, পরন্তু প্রাচীনদিগের মতামত বর্ণন করিবার জন্যই এসকল সঙ্কলন করিলাম। অপিচ অসি সম্বন্ধে আরও কএক লক্ষণানুযায়ী নাম আছে তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

১ ধবলগিরি।

"রূপ্যাযতসমা ভূমিরঙ্গং শ্বেতং প্রতীয়তে।
তং ধবলগিরিং পাণ্ড্যং পাণ্ডিজ্ঞাঃ প্রবদন্তি হি॥"

পাণ্ড্য লৌহজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, যাহার ক্ষেত্র রূপার ন্যায় ও অবয়ব শুভ্র তাহা পাণ্ড্যলৌহ সমুদ্ভব এবং তাহার নাম ধবলগিরি।

২ কালগিরি।

"তন্বী পত্রাবলি কালা সৌবর্ণাঙ্গাসিপত্রিকা।
প্রাহুঃ কালগিরিঃ পাণ্ডি লৌহশাস্ত্রবিশারদাঃ॥"

যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুবর্ণাকার অথবা কৃষ্ণাভাযুক্ত পত্রাঙ্গাকার চিহ্ন দেখা যায়, তাহার নাম কালগিরি; ইহা লৌহশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন।

৩ কজ্জলগাত্র।

"ধারা শুভ্রা ভবেৎ যস্য মধ্যং কজ্জলসন্নিভম্।
কৃষ্ণবর্ণৈশ্চিতং গাত্রং বিদ্যাৎ কজ্জলগাত্রকম্॥"

যাহার ধার শুভ্রবর্ণ, মধ্যে কজ্জলবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে কালদাগ,—তাহাকে কজ্জলগাত্র বলিয়া জানিবে।

৪ কুটীরক।

"সূক্ষ্মং রজতপত্রাভমঙ্গং কৃষ্ণাসিপত্রিকা।
কুটীরকঃ সমাখ্যাতা তৎক্ষতে ক্ষয়থুর্ভবেৎ॥"

যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রজতপত্রের চিহ্ন থাকে—অথচ কৃষ্ণবর্ণ—এতাদৃশ অসিপত্রিকাকে কুটীরক বলে। এই কুটীরক অসিদ্বারা ক্ষত হইলে শরীরে শ্বয়থু অর্থাৎ শোথ জন্মে।

৫ কেতকীবজ্র।

"কেতকীপত্রসদৃশমঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।
বিদ্যাৎ কেতকবজ্রং তু—————॥"

যদঙ্গে কেতকী পত্রাকার চিহ্ন থাকে সে অসির নাম কেতকবজ্র।

৬ কান্তিলৌহ বা নিরঙ্গ।

"নিরঙ্গং রৌপ্যপত্রাভমীষন্নীলনিভঞ্চ যৎ।
দুর্লভং তন্মহামূল্যং কান্তিলৌহং প্রচক্ষতে॥"

যাহা কান্ত লৌহদ্বারা নির্ম্মিত ও যদঙ্গে রৌপ্য পত্রাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং বর্ণ অল্প নীল—এরূপ অসি দুর্লভ ও মহামূল্য।

৭ দমনবক্ত্র।

"অঙ্গং দমনপত্রাভমঙ্গে যস্মিন প্রতীযতে।
বিদ্যাদ্দমনবক্ত্রন্তু তীক্ষ্ণধারং মহাগুণম্॥"

যাহার অঙ্গে দমন পত্র—অর্থাৎ দোনা নামক বৃক্ষের কিংবা কুন্দ বৃক্ষের পত্রাকার চিহ্ন জন্মে—তাহার নাম দমনবক্ত্র। এই দমনবক্ত্র অসি প্রায়ই তীক্ষ্ণধার ও মহাগুণশালী হয়।

৮ কাল-খড়্গ।

"কৃষ্ণভূমিস্সুবর্ণাভমীষৎ বজ্রাঙ্গসংগতম্।
ডাহুনীবজ্রকং বিদ্যাৎ কালসংজ্ঞমথাপরে॥"

যাহার ক্ষেত্র কাল, পরন্ত উহার আভা যদি সুবর্ণ বর্ণ হয়, আর যদি তাহাতে অল্প বজ্র চিহ্ন থাকে, তবে তাহাকে ডাহুনীবজ্র বলিয়া জানিবে। কেহ বলেন, এতদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত খড়্গের নাম কালখড়্গ।

৯ নকুলাঙ্গ।

"ঊর্দ্ধগং কপিলাভাসমঙ্গং যস্মিন্ প্রতীয়তে।
নকুলাঙ্গস্ত তং বিদ্যাৎ স্পর্শতস্তস্য হি নাশনম্॥"

যাহার অঙ্গে ঊর্দ্ধগামী কপিল দ্যুতি দৃষ্ট হয়—তাহার নাম নকুলাঙ্গ। এই নকুলাঙ্গ অসির স্পর্শে সর্পও প্রাণত্যাগ করে।

১০ ক্ষুদ্রবজ্র।

"আসীকা মালিকা যস্য ক্ষুদ্রাঙ্গং কুণ্ডলীকৃতম্।
ক্ষুদ্রবজ্রক নামানং প্রাহ নাগার্জুনোমুনিঃ॥"

যাহার শরীরে কুণ্ডলীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসীকামালা দৃষ্ট হয় নাগার্জুন মুনি তাহাকে ক্ষুদ্রবজ্র নামে প্রখ্যাত করেন।

১১ মহৎ।

"অন্তর্গাঢ়ং চিহ্নহীনং বিশালং
মধ্যে স্থূলং স্থূলধারাতি তীক্ষ্ণম্।
রক্ষোবক্ষঃ চ্ছেদনার্থং মহান্তম্
কৃত্বাখড়্গং দেবরাজোহতি হৃষ্টঃ॥"

যাহার অন্তর্ভাগ অতি গাঢ় অর্থাৎ কঠিন, গাত্র সর্ব্ব প্রকার চিহ্ন বর্জ্জিত, মধ্যদেশ স্থূল, ধারও স্থূল কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,—দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসগণের বক্ষ বিদারণের নিমিত্ত এতদ্রূপ মহান্ খড়্গ নির্ম্মাণ করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন।

১২ বামনাক্ষ।

"বামনাক্ষং মহাস্তস্য যেন তন্ত্রর্নজায়তে।
ছেদে গাঢ়ং চিহ্ন হীনং প্রাহুঃ খড়্গং বিবক্ষণাঃ॥"

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে মহান্ খড়্গ অত্যন্ত গাঢ় অথচ ছেদকালে যাহা ছেদ্য বস্তুতে তন্ত্র সৃষ্টিকরেনা এবং যাহার অঙ্গে কোন চিহ্ন থাকে না, তাদৃশখড়্গের নাম বামনাক্ষ।

১৩ মহিষাখ্য।

"এরণ্ডবীজ প্রতিমমঙ্গং যস্মিন্ প্রতীয়তে।
মহিষাখ্যঃ স বৈ খড়্গো নীলমেঘসমচ্ছবি॥"

যে খড়্গের গাত্রে এরণ্ডবীজের ন্যায় চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং যাহার দীপ্তি নীল মেঘের ন্যায়, এতাদৃশ খড়্গের নাম মহিষাখ্য।

১৪ অঙ্গপত্র।

"দৃষ্ট যস্মিন্ ভবেৎ খড়্গে শরীরং প্রতিবিম্বিতম্।
অঙ্গপত্রাভিধং খড়্গং প্রাহুঃ খড়্গ বিচক্ষণাঃ॥"

খড়্গকে মর্জ্জন করিলে যদি তাহা দর্পনের ন্যায় শরীরপ্রতিবিম্ব ধারণ করে—তবে উহাকে খড়্গতত্ত্ব নিপুন-পণ্ডিতেরা অঙ্গপত্র নামে উল্লেখ করেন।

১৫ গজবজ্র।

"যস্যাঙ্গে স্থূলরেখাঘনমসৃণরুচিঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্য তিষ্ঠেৎ
ধারা তীক্ষ্ণাতিসূক্ষ্মা প্রবিশতি রুধিরস্পর্শমাত্রেণ খড়্গ।
যস্যাস্তঃ পীয়মানং শাময়তি নিখিলং ব্যাধিমাধি সমগ্রাং
বৈরিশ্রেণীং ....প্রবদতি গিরিশো বজ্রমেতৎ গজাদি॥"

যাহার অঙ্গে স্থূল রেখা, অঙ্গ রুচি অতি ঘন ও মসৃণ, ধার অতি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম, রক্তস্পর্শ মাত্রে যাহা অভ্যন্তর প্রবিষ্ট হয়, যাহার অঙ্গধৌত জল পান করিলে আধিব্যাধি বিনষ্ট হয়, দেবাদি-দেব গিরিশ তাহাকে গজবজ্র নামে অভিহিত করেন।

বিভিন্ন দেশীয় অসির গুণাগুণ।

অসি সকল দেশে সমান হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত অসি উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে যে দেশে যে যে প্রকার অসি নির্ম্মিত হইত তত্তাবতের একটী তালিকা আছে। সে গুলি এই—

"লৌহং প্রধানং খড়্গার্থং প্রশস্তং তদ্বিশেষতঃ।
খটী খট্টর-ঋষিক-বঙ্গ-শূর্পারকেষু চ॥
বিদেহেষু তথাঙ্গেষু মধ্যমগ্রামবেদিষু।
সহগ্রামেষু চীনেষু তথা কালঞ্জরেষু চ॥"

অনেক প্রকার লৌহ আছে, পরন্তু তন্মধ্যে যাহা প্রধান অর্থাৎ উৎকৃষ্ট তাহাই খড়্গের নিমিত্ত প্রশস্ত। (খড়্গ নির্ম্মাণের লৌহ ঔষধার্থ লৌহ হইতে স্বতন্ত্র এবং উহা উৎকৃষ্ট বিবরণযুক্ত ও স্বতন্ত্র লক্ষণাক্রান্ত) বিশেষতঃ খটী, খট্টর, ঋষিক, বঙ্গ, শূর্পারক, বিদেহ, অঙ্গ, মধ্যম গ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, চীন, কালঞ্জর,—এই সকল স্থানে যাহা উৎপন্ন হয় উহা অত্যন্ত প্রশস্ত।

"খটীখট্টরজাতা যে দর্শনীয়াস্তু তে মতাঃ॥"

খটী ও খট্টর দেশজাত অসি সকল অত্যন্ত সুদৃশ্য জানিবে।

"কায়চ্ছিদস্ত্বষিকা যে মর্ম্মজ্ঞা গুরবস্তথা।"

ঋষিকদেশজাত অসি শরীরচ্ছেদ করিতে সমর্থ এবং গুরুভারযুক্ত। ঋষিকদেশ হিমালয়ের উত্তরভাগে ছিল।

"তীক্ষ্ণাশ্ছেদসহা বঙ্গা দৃঢ়াঃ শূর্পারকোদ্ভবাঃ॥"

বঙ্গদেশজাত অসি তীক্ষ্ণ ও চ্ছেদভেদে পটু এবং শূর্পারকদেশীয় অসি সমধিক কঠিন। (লৌহিত্য নদীর পশ্চিমে অঙ্গদেশের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে উহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। বর্ত্তমান দ্বারকার উত্তর পশ্চিমভাগে শূর্পারকদেশ অবস্থিত ছিল)।

"অসহ্যাশ্চৈব বিজ্ঞেয়া প্রভাবন্তো বিদেহজাঃ।"

বিদেহদেশজাত অসি প্রভাশালী ও অসহ্য তেজ। বর্ত্তমান ত্রিহুতদেশকে পূর্ব্বে বিদেহ বলিত।

"অঙ্গদেশোদ্ভবস্তীক্ষ্ণা ——————।"

অঙ্গদেশজাত অসি তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়। বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা ও চম্পারণ প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে অঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

"লঘবশ্চ তথা তীক্ষ্ণা মধ্যমগ্রামসম্ভবাঃ।"

মধ্যগ্রাম সম্ভূত অসি লঘুভার ও তীক্ষ্ণ। (এই মধ্যমগ্রাম এক্ষণে কোথায়, তাহা নির্ণয় হয় না)।

"অসারা লঘবোস্তীক্ষ্ণা চেদিদেশসমুদ্ভবাঃ।"

চেদিদেশ প্রভব খড়্গ হাল্কা, তীক্ষ্ণ, কিন্তু সারহীন। (পঞ্জাব ও কনোজ প্রভৃতি দেশের অংশ বিশেষকে চেদীদেশ বলিত)।

"সহগ্রামোদ্ভবাঃ খড়্গাঃ সুতীক্ষ্ণা লঘবস্তু॥।"

সহগ্রামজাত খড়্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও লঘু অর্থাৎ হাল্কা। মধ্যগ্রাম এক্ষণে অপরিচিত অবস্থায় আছে।

"নিরূর্ণা নির্ম্মলাস্তু ক্ষ্ণার্ণ নদেশসমুদ্ভবাঃ।"

চীনদেশীয় খড়্গ অত্যন্ত নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ। চীনদেশ আজিও সমভাবে পরিচিত আছে।

"কালঞ্জরা কালসহাস্তীক্ষ্ণাশ্চ লক্ষণান্বিতাঃ।"

কালঞ্জর পর্ব্বতের সন্নিহিত দেশে যে সকল খড়্গ উৎপন্ন হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও সুলক্ষণ। কালঞ্জর পর্ব্বত প্রয়াগের অনেক দূর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আছে।

অসির পরিমাণ।

৪ অঙ্গুল পরিসর ও ৫০ অঙ্গুল লম্বা অসি শ্রেষ্ঠ এবং ইহার অল্প হইলে তাহা মধ্যম। ২০ অঙ্গুলের ন্যূন হইলে তাহাকে অসি না বলিয়া অসি-পুত্র বলা যায়। এইরূপে বিস্তারে ২ অঙ্গুলের ন্যূন হইলেও তাহা অসি নামে গণ্য হইবে না। বৃহৎ শার্ঙ্গধর, আগ্নেয়-ধনুর্ব্বেদ ও বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ—সর্ব্বত্র এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা—

"শতাদ্ধমঙ্গুলানাম্ খড়্গঃ শ্রেষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্।
তদর্দ্ধং মধ্যমং জ্ঞেযং ততো হীনং ন কারয়েৎ॥"
"পঞ্চাশদঙ্গুলোৎসেধশ্চতুরঙ্গুলবিস্তৃতঃ।"

কেহ কেহ বলেন যে, ৩০ অঙ্গুলের অধিক দীর্ঘ অসি নিংস্ত্রিংশ নামে খ্যাত ও উহাই উত্তম। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"অঙ্গুলশতাৰ্দ্ধমুত্তম ঊনঃ স্যাৎ পঞ্চবিংশতিং
খড়্গঃ।"

পদ্মপুষ্পের পাবড়ীর অগ্রভাগ যেরূপ, অসির অগ্রদেশ যদি সেইরূপে গঠিত হয়, তবে সে অসি উত্তম এবং করবীর পত্রের তুল্যাকার হইলে উহা তদপেক্ষা উত্তম। যাহার অগ্রভাগ মণ্ডলাকার অর্থাৎ সুগোল কিংবা কিঞ্চিৎ বক্র—সে অসি তত প্রশস্ত নহে। যথা—

"খড়্গঃ পদ্মপলাশাগ্রমণ্ডলাগ্রশ্চ শস্যতে।
করবীরপলাশাগ্রসদৃশশ্চ বিশেষতঃ॥"

মণ্ডলাগ্র অসি এক্ষণে "বগী" নামে খ্যাত। কোন কোন অস্ত্রবিৎ যোদ্ধা ইহাকেও প্রশংসা করিয়া থাকেন। বৃহৎসংহিতা গ্রন্থেও ইহার এবং অন্যান্য প্রকার খড়্গের প্রশংসা আছে।

"গোজিহ্বাসংস্থানো নীলোৎপলবংশপত্রসদৃশশ্চ।
করবীরপত্রশূলাগ্রমণ্ডলাগ্রাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ॥"

গোজিহ্বা, সূঁদী, নাল ফুলের পাপড়ি, বাঁশের পাতা, করবীর ফুলের পাতা ও

শূলের অগ্রভাগের তুল্যাকার খড়্গ ও মণ্ডলাগ্র খড়্গ প্রশস্ত অর্থাৎ উত্তম।

অসির ধ্বনি।

আঘাত করিলে যদি কাকস্বরের ন্যায় কর্কশ ধ্বনি বা শব্দ উত্থিত হয় কিংবা অং—ইত্যাকার শব্দ হয় তবে সে তরবারি রাজাদিগের পরিত্যজ্য। পরন্তু যাহার শব্দ মধুর, কিঙ্কিনীধ্বনিসদৃশ অর্থাৎ কন্‌কনে এবং দীর্ঘ অর্থাৎ বহুক্ষণ স্থায়ী, সেই খড়্গই শ্রেষ্ঠ খড়্গ এবং রাজারা এতদ্রূপ খড়্গই ধারণ করিবেন। যথা—

"আহতে যত্র খড়্গে স্যাৎ ধ্বনিঃ কাকস্বরোপমঃ।
অংআকারধ্বনির্বা স্যাৎ স বর্জ্যো নবপুঙ্গবৈঃ॥"
"দীর্ঘঃ সুমধুরঃ শব্দো যস্য খড়্গস্য ভার্গব।
কিঙ্কিণীসদৃশস্তস্য ধারণং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥"

এতভিন্ন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, অগ্নিপুরাণ ও কল্পদ্রুমধৃতযুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে খড়্গ সম্বন্ধে কতকগুলি সুচিহ্ন কুচিহ্নের কথা আছে তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবে। তৎপশ্চাৎ খড়্গ-যুদ্ধের সঞ্চরণমার্গ অর্থাৎ গতি সকল বলা যাইবে। এক্ষণে বৃহৎসংহিতার লিখিত ব্রণাদি দোষ এবং শার্ঙ্গধরের লিখিত খড়্গের দোষ ও তাহার পূজা প্রভৃতি কএক প্রকার অবান্তরিত বিষয় বলা যাইতেছে।

"অঙ্গুলমানাজ্‌জ্ঞেয়ো ব্রণোঽশুভো বিষমপর্ব্বস্থঃ।"
"শ্রীবৃক্ষোবর্দ্ধমানাতপত্রশিবলিঙ্গকুণ্ডলাব্জানাম্।
সদৃশাঃ ব্রণাঃ প্রশস্তা ধ্বজায়ুধস্বস্তিকানাঞ্চ॥"
"কৃকলাসকাককঙ্কক্রব্যাদকবন্ধবৃশ্চিকাতয়ঃ।
খড়্গে ব্রণা ন শুভদা বংশানুগাঃ প্রভূতাশ্চ॥"
"স্ফুটিতো হ্রস্বঃ কুণ্ঠো বংশচ্ছিন্নো ন দৃষ্টমনোনুগতঃ।
অস্বন ইতি চানিষ্টঃ প্রোক্ত বিপর্য্যস্ত ইষ্টফলঃ॥"

"কণিতং মরণায়োক্তং পরাজয়ায় প্রবর্ত্তনং কোষাৎ।
স্বয়মুদ্গীর্ণে যুদ্ধং জ্বলিতে বিজয়ো ভবতি খড়্গে॥"
"নাকারণং বিবৃণুয়ান্ন বিঘট্টয়েচ্চ।
পশ্যেন্ন তত্র বদনং ন বদেচ্চ মূল্যম্॥"
দেশং ন চাস্য কথয়েৎ ন প্রতিমানায়েচ্চ।
নৈব স্পৃশেৎ নৃপতিরপ্রয়তোঽসযষ্টিম্॥"
"নিষ্পন্নো ন চ্ছেদ্যো নিকষৈঃ কার্য্যঃ প্রমাণযুক্তঃ সঃ
মূলে ম্রিয়তে স্বামী নমনীতস্যাগ্রে তচ্ছিন্নে॥"
"কাকোলূকসবর্ণাভা বিষমাঙ্গুলিসংস্থিতাঃ।
বংশানুগাঃ প্রশস্তাশ্চ ন শস্তাস্তে কদাচন॥"

"খড়্গং প্রশস্তং মণিময়যুক্তং
কোষে সদা চন্দনচূর্ণযুক্তম্।
স স্থাপ ভূমিপাতঃ প্রযত্নাৎ
রক্ষেৎ তথৈনং শরীরবচ্চ॥"
"শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরভাষিতানি
চিহ্নানি খড়্গস্য শুভাশুভানি।
বিজ্ঞায় ভূমিপতয়ঃ সদৈব
সঙ্কারয়েয়ুঃ সমুদে কৃপাণম্॥"

অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি অঙ্গুল হইতে শতার্দ্ধ অঙ্গুল পর্য্যন্ত খড়্গ নির্ম্মাণ করিলে যদি তাহাতে ব্রণ অর্থাৎ চিহ্ন বিশেষ উৎপন্ন হয়, তবে তাহার শুভাশুভ লক্ষণ অঙ্গুলি পরিমাণদ্বারা নির্ণয় করিবেক। বিষমাঙ্গুলি স্থানে চিহ্নপাত হইলে তাহা অশুভ বলিয়া স্থির করিবেক। চিহ্ন অনেক প্রকার হইতে পারে, পরন্তু তন্মধ্যে শ্রীবৃক্ষ, বর্দ্ধমান, (পর্ব্বত) ছত্র, শিবলিঙ্গ, কুণ্ডল, পদ্ম, ধ্বজ, কোন প্রকার অস্ত্র ও স্বস্তিক অর্থাৎ ত্রিকোণ তুল্য চিহ্নই শুভদায়ক। আর কৃকলাস (গির্‌গিটে) কাক, কঙ্কপক্ষী, মাংসাশী জন্তু, মস্তকশূন্য-জীবশরীর ও বৃশ্চিকের সদৃশ আকৃতি বিশিষ্ট ব্রণ ও বহু ব্রণযুক্ত হইলে উহা অশুভদায়ক, স্ফুটিত অর্থাৎ ভাঙ্গা অথবা সচ্ছিদ্র, হ্রস্ব, কুণ্ঠ এবং দেখিতে কুদৃশ্য ও মনের বিরক্তিজনক ও শব্দ বর্জ্জিত—

এরূপ খড়্গও অনিষ্টকারী হয়। খড়্গে যদি অকস্মাৎ শব্দ জন্মে তবে জানিবে যে, তাহা মরণের উপদেশ করিতেছে। খড়্গ যদি আপনা আপনি কোষ হইতে বহিরাগত হয় তবে জানিবে, যে নিশ্চিত পরাজয় হইবে। খড়্গ যদি বিনা কারণে উদ্গীর্ণ হয় তবে জানিবে যে, শীঘ্রই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং খড়্গ যদি আপনা আপনি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হয়, তবে জানিবে যে, যুদ্ধে জয় হইবে।

বিনা কারণে অসিকে উলঙ্গ করিবে না। খড়্গাগাত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব অবলোকন করিবে না। উত্তম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইলে বিনা প্রয়োজনে অসির মূল্য ব্যক্ত করিবে না। কোন দেশের অসি—তাহাও বলিবে না। কোন সময়েই অসিকে অসম্মান করিবে না। রাজা অশুচি হইয়া অসিযষ্টি স্পর্শও করিবেন না। নির্ম্মাণের পর বিষমাঙ্গুলি হইল দেখিয়া সমাঙ্গুলি করিবার জন্য তাহাকে ছিন্ন করিবে না। নির্ম্মাণের পর সমাঙ্গুলি করিতে হইলে শানযন্ত্রদ্বারা ইচ্ছামত প্রমাণ যুক্ত করিবে। যদি মূলভাগে ছিন্ন করা হয় তবে সে অসি ধারণ করিলে মৃত্যু হইবে। যদি অগ্রভাগে ছিন্ন করা হয় তবে সে অসি ধারণ করিলে জননীর মৃত্যু দেখিতে হইবে। কাক, উলূক, কি বসার ন্যায় আভাযুক্ত, বিষমাঙ্গুলি পরিমাণ (বিযোড় অর্থাৎ ৪৯।৪৭ ইত্যাদি) ও বংশানুগ অসি কোন কালেই শুভদায়ক হয় না। উত্তম অসিকে মণি ও সুবর্ণভূষিত ও চন্দন চূর্ণযুক্ত সদা সর্ব্বদা কোষ মধ্যে রক্ষা করিবেক। যেরূপ নিজের শরীর যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়, রাজা সেইরূপ যত্নে অসিকেও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর, বীরচিন্তামণি, শার্ঙ্গধর পদ্ধতি ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে খড়্গ সম্বন্ধে উক্তরূপ অনেক কথাবার্ত্তা আছে। তত্তাবতের সারসংগ্রহরূপ এই প্রস্তাব এবারে এই স্থানেই সম্পন্ন করা গেল। পরবর্ত্তী পত্রিকায় ক্রমে ইহার অবশিষ্ট কার্য্যগুলি অর্থাৎ যুদ্ধকালে ইহা কিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি বর্ণন করা যাইবেক।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

রাসমালা।

১ম খণ্ড পৃঃ ৬০০ পর।

ভূবরদেব।

শঙ্করকবির আগমন।

একদা রাজা ভূবর স্বীয় পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কৈলাস সদৃশ পরম মনোহর এক প্রমোদ্যানে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন। উদ্যানটী বিবিধ ফলপুষ্প-পাদপ ও কান্ত কুঞ্জবাটিকায় সমলঙ্কৃত। যুবরাজ কর্ণ মনোরম রাজ-বেশে বিভূষিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে সমাসীন এবং চন্দ প্রভৃতি সামন্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দেবমণ্ডল সদৃশ বিরাজ করিতেছিলেন। তথায় কবি ও কোবিদ্‌গণ এবং কবিকুলকেশরী কামরাজও নানা শাস্ত্রালাপনে আনন্দবাসরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে নিবিষ্ট। কামরাজ কাব্য-শাস্ত্রে পরম পারদর্শী; বীরকুলের মধ্যে যেমন ভূবব প্রধান, কবিগণের মধ্যে তেমনই কামরাজ শ্রেষ্ঠ। তিনি রাজার পরম বন্ধু; রাজা তাঁহাকে বড় আদর করিয়া থাকেন। এইরূপ সুন্দর পাত্র-মিত্রদলে পরিবেষ্টিত হইয়া শোলাঙ্কি রাজ ভূবর আনন্দে কাল যাপন করিতেছেন, এমন সময়ে একজন বিদেশীয় কবি আসিয়া তাঁহাকে অনুপম মণিমালা সদৃশ একটী মনোহর কবিতাহার দিয়া তাঁহার স্তুতিগান করিল। রাজা ভূবর সেই কবিতার অনুপম লালিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবিবর! আপনি কোন রাজ্য উজ্জ্বল করেন?" তৎপরে তিনি স্বীয় সভাস্থ কবিগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "যে কেহ ইহাঁর উপযোগী কবিতা রচনা করিয়া এই কবিতার উত্তর দিতে পারিবে, তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।" কাহারও সাহস হইল না; কেহই তদুপযোগী কবিত্বময় শ্লোক রচনা করিতে অগ্রসর হইল না। তথন ভূবর সেই অভ্যাগত কবিকে সম্মানসূচক মহার্হ সজ্জা পুরস্কার দিয়া পরম সমাদর সহকারে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবিশিরোমণি! এতদিন কোন্ গভীর প্রদেশে লুক্কায়িত ছিলেন?"

তদনুসারে সেই অভ্যাগত কবি সবিনয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "রাজন্! এ দীনের নাম শঙ্কর! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনোরম রাজ্য গুর্জ্জর হইতে আমি আসিতেছি। সে রাজ্য অতিশয় উর্ব্বর; তাহা সুবিমল সলিল ও বিবিধ শস্য, তৃণ ও পাদপদলে সুশোভিত। তাহা কমলার চিরলীলাস্থল এবং সাধু, সচ্চরিত্র ও দয়াবান পুরুষগণের রমণীয় আবাসভূমি। তাহার রাজধানীর নাম পঞ্চাসর; পঞ্চাসর বীণাপাণির বিলাসভূমি। ফল কথা সেই রাজ্য এত রমণীয় যে, যাহারা তাহাতে কিছু দিনের জন্য বাস করিয়াছে তাহাদের আর অমরাবতীতে বাস

করিবার বাসনা নাই। সৌররাজ তথায় রাজত্ব করেন; তিনি সমগ্র ক্ষত্রিয়কুলের চূড়ামণি। স্বীয় অনুপম বীরত্ব ও অবদান পরম্পরায় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া তিনি দেশীয় কবিগণ কর্ত্তৃক "জয়শেখর" নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অনুপম রূপগুণবতী রূপসুন্দরী তাঁহার প্রধানা মহিষী; বিজ্ঞ ও বীর শূরপাল তাঁহার শ্যালক ও প্রধান সখা জয়শেখর ও শূরপাল একত্রে মিলিত হইলে স্বর্গসিংহাসন হইতে মহেন্দ্রকেও আচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহাদের অল্পই প্রয়োজন; কেননা একমাত্র গুর্জ্জরই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট; গুর্জ্জর বিশ্বের সারভূত। ভগবতী বীণাপাণি তথায় চিরকাল বিরাজ করেন; সেই অনুপম গুর্জ্জররাজ্যেই আমি এই কাব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বিশ্বজয় করিবার বাসনায় বহির্গত হইয়াছি।"

গুর্জ্জরের এই বিপুল খ্যাতি শ্রবণ করিয়া শোলাঙ্কিরাজ ভূবর সদর্পে স্বীয় গুম্ফ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন; তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে যেন জ্বলন্ত অনলস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতে লাগিল। তথনই কবি কামরাজ সদম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্করকে কবিতা-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। শঙ্কর তদনুরূপ দর্প সহকারে তাঁহার সহিত সেই অনুপম বাণিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে কামরাজেরই পরাজয় হইল। তখন বিজয়ী শঙ্কর সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন "শঙ্কর যে চিরকালই কামজিৎ, তাহা কি তুমি জান না।"

ভূবরের তৃপ্তি হইল না; তিনি প্রমোদকাননে আমোদ প্রমোদ করিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিপরীত ফল হইল। স্বীয় কাল্পনিক সার্ব্বভৌমিকত্বের সুখস্বপ্নে মোহিত হইয়া তিনি এতদিন অসীম বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু আজি তাঁহার সে আনন্দের ভঙ্গ হইল, বিশুদ্ধ অমৃতরাশিতে কে গরল ঢালিয়া দিল। প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে তিনি স্বীয় সামন্ত ও সচিবগণকে আহ্বান করিলেন এবং গুর্জ্জরের বিষয় আরও শুনিতে চাহিলেন। সমবেত সর্দ্দারগণ আপনাদিগের বীরত্ব কীর্ত্তন করিয়া সমস্বরে বলিল "আমরা গুর্জ্জর জয় করিয়া জয়শেখরকে পরাস্ত করিয়াছি; সৌর রাজা অধীনতা স্বীকার করাতে তাঁহার নগর ধ্বংস করি নাই। প্রভো! আপনি বিশ্বজিৎ।" এ কথায় রাজার আদৌ বিশ্বাস হইল না; তিনি তাহাদিগের প্রতি কুটিল ভ্রূকুটি বিক্ষেপ করিয়া চন্দকে বলিলেন "বীরবর! তুমি সত্যবাদী, তুমিই আমাকে সত্য বিষয় প্রকাশ করিয়া বল।" চন্দ ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! কল্যাণপুরীর সামন্তগণ অর্ব্বুধগিরি হইতে দক্ষিণপথে আসিবার কালে পথিমধ্যে জয়শেখরের শ্যালক শূরপালের সেনাদলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শূরপাল সেই বাহিনীর পুরোভাগে আসীন ছিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া দুরূহ ব্যাপার মনে করিয়া অবশেষে আমরা বক্রপথে সৌরাষ্ট্রে উপস্থিত হইয়াছি।" সৌররাজ ভূবরের জয়তৃষা দারুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তিনি অচিরে বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার আদেশ পরিপালিত হইল। চতুরঙ্গিনী

সেনা যথানিয়মে সজ্জীভূত হইয়া ভীষণ বিক্রম সহকারে পঞ্চাসরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে নানা দুর্লক্ষণ প্রতিপদে তাহাদের নয়নগোচর হইল; কিন্তু রাজাদেশ অখণ্ডনীয়; সুতরাং সর্দ্দারগণ কোন স্থলেও বিরাম করিতে পারিলেন না।

এদিকে কবিবর শঙ্কর স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়া রাজাকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। জয়শেখর বুঝিতে পারিলেন যে, যুদ্ধ অনিবার্য্য; তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। সংগ্রামতৃষায় সেই সমরকেশরীর উন্নত হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি অচিরে স্বীয় সামন্তদিগকে বলয়, কুন্তল ও অন্যান্য অলঙ্কার বিতরণ করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ।

কল্যাণপুরের প্রশস্ত রঙ্গক্ষেত্রে রণদামামা বাজিয়া উঠিল। সর্দ্দার ও সেনানিগণ স্ব স্ব সেনাদল সমভিব্যাহারে সেই বিশাল প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সেনা ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত হইয়া আস্ফালন সহকারে ক্রমে ক্রমে দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। চতুঃসহস্র যুদ্ধরথ; তদ্ব্যতীত অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব এবং অগণ্য ধনুষ্ক পদাতি সৈন্য। এই ভয়াবহ অনীকিনীর প্রচণ্ড পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। রাজ্যের লোকজন ত্রস্তবিত্রস্ত হইয়া প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে যে পথে বিরাট চমূ অগ্রসর হইল, তৎপ্রদেশের নগর গ্রাম একবারে জনহীন হইয়া পড়িল। পরিত্যক্ত গৃহবাটীকাদির ধনসামগ্রী অভিযাত্রিগণের হস্তগত হইতে লাগিল। যাহারা ইহাদের গতিরোধ করিতে সাহস করিল, তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। উন্মত্ত সৈন্যগণ তাহাদিগের প্রতি অসীম অত্যাচার করিয়া হতভাগ্যাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল। ইহাদের অতুল বিক্রমে জলাশয়সমূহ শুষ্ক হইয়া পড়িল এবং শুষ্ক ক্ষেত্র সকল জলাশয়ে পরিণত হইতে লাগিল। এইরূপ অপ্রতিহত বিক্রম সহকারে সেই বিশাল আক্রমিক সেনা পঞ্চসরের নিকট শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইল। প্রত্যেক বিরামস্থলেই সৈন্যগণ মল্লযুদ্ধ, দ্বন্দযুদ্ধ, প্রভৃতি বিবিধ ব্যায়াম করিতে লাগিল; এইরূপে প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসর হইয়া অবশেষে ইহারা পঞ্চসরের তিনক্রোশ দূরে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক প্রান্তসীমাস্থ নগর গ্রামাদি লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেক নরনারী তাহাদিগের হস্তে পতিত হইয়া স্বাধীনতা হারাইল।

এই সকল লোমহর্ষণ সংবাদ অচিরে জয়শেখরের শ্রুতিগোচর হইল। শত্রুকুলের বিষম অত্যাচারের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি প্রচণ্ড রোষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং শত্রুকুলের প্রধান সেনানায়ক মিরকে বিস্তর তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্রে এই মর্ম্ম প্রকটিত ছিল;—"কাপুরুষ! দীনদরিদ্রদিগের প্রতি অত্যাচার করা কি বীরের ধর্ম্ম? পশ্চাতে লুক্কায়িত থাকিয়া নিরস্ত্র ব্যক্তিদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা কি বীরাভিমানীর কর্ত্তব্য? বুঝিলাম, তুমি বীরাখ্যার

অযোগ্য। কুক্কুর যেমন শিলাখণ্ড দ্বারা আঘাতিত হইলে ঘাতকের সম্মুখীন হইতে সাহস না করিয়া কেবল সেই শিলাকেই দংশন করিতে থাকে, তুই তেমনই আমার সম্মুখে আসিতে না পারিয়া অসাক্ষাতে ভীরুর ন্যায় আমার নগর গ্রাম পীড়ন করিতেছিস্।" এই বিষদিগ্ধ তীব্র গালি-বর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া শোলাঙ্কি-রাজ ভূবরের প্রধান সেনাপতি প্রত্যুত্তরে জয়শেখরকে লিখিয়া পাঠাইলেন "দন্তে তৃণ লইয়া রাজাধিরাজ ভূবরের শরণাপন্ন হও, নতুবা তোমার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। ঘোর যুদ্ধে তোমার রাজ্য ছারখারে দিব। আইস, অন্যথা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" তেজস্বী জয়শেখর অবিলম্বে স্বীয় ভ্রাতা ও অপরাপর যোদ্ধদিগকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন।

মিরের উদ্ধত প্রত্যুত্তর যৎকালে জয়শেখরের হস্তগত হয়, শূরপাল তখন রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না; তিনি তখন স্বীয় দলবল লইয়া নিশাকালে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। দৈব তাঁহার অনুকূল হইল; তিনি চরমুখে অবগত হইলেন যে, আক্রমকগণ সম্পূর্ণ অসতর্ক রহিয়াছে;—কেহ নৃত্য, কেহ গীত, কেহ বাদ্য করিতেছে;—কেহ বা পান ভোজনে ব্যাপৃত অথবা গভীর নিদ্রায় পতিত রহিয়াছে; অবশিষ্ট সকলে লুণ্ঠনাভিলাষে নিকটস্থ পল্লী সমূহে গমন করিয়াছে। এই সুযোগে শূরপালের সৈন্যগণ অসিহস্তে যমদূতের ন্যায় তাহাদিগের উপর আপতিত হইল এবং সম্মুখে যাহাকে পাইল, তাহাকে সংহার করিল। এইরূপে অনেক হতভাগ্য প্রাণত্যাগ করিল। শূরপাল স্বহস্তে চন্দ্রকে আহত করিলেন। চন্দ্র ঘোরতর আহত হইয়া পলাইয়া গেলেন; কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হইল। সিংহ যেমন মৃগপালের মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, শূরপাল সেইরূপ শত্রুসৈন্য দলিত করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলেন। বৈদ উচ্চ প্রামার-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই নিদারুণ অপমানে তাঁহার হৃদয় ঘোরতর আলোড়িত হইল,—মনোমধ্যে বিষম আত্মগ্লানি তাড়না করিতে লাগিল; অতিশয় মনোদুঃখে ভগ্নহৃদয় হইয়া তিনি স্বীয় যুদ্ধসজ্জা দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং সন্ন্যাসীর বেশে বারাণসীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রধান সেনাপতি মিরেরও মনোবেদনার সীমা রহিল না; কোথায় পঞ্চসর জয় করিবেন ভাবিয়া তিনি সদর্পে আসিলেন, তাহা না হইয়া ঘোরতর অপমানের সহিত তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইল। রাজা ভূবর যে একমাত্র তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া এই কঠোর ও দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মির কি এইরূপে তাহার প্রতিদান করিলেন? যদি তাঁহার প্রকৃত বীরের দূরদর্শিতা থাকিত, তাহা হইলে যুদ্ধ করিতে আসিয়া তিনি কখনই অসতর্ক থাকিতেন না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহারই দোষে পরাস্ত হইতে হইয়াছে। মিরের চরিত্রে গভীর কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইল, তাঁহার উন্নত মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। পলায়মান ছিন্নভিন্ন সৈন্যদিগকে একত্রিত করিয়া তিনি

কল্যাণপুরের আটদিনের দূরপথে শিবির স্থাপন করিলেন।

এই ঘোর পরাজয় বার্ত্তা ভুবরের শ্রুতিগোচর হইল; তিনি অবিলম্বে মিরের সেনানিবেশে উপস্থিত হইলেন এবং হতাশ্বাস সৈন্যমণ্ডলকে পুনরুৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সৈন্যগণ! তোমাদের এ পরাজয় ও পলায়নে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই; তোমরা জান যে, পশ্চাদপসরণ সময়ে সময়ে জয়লাভের সূচনা স্বরূপ হইয়া থাকে; দেখ, খড়্গ পশ্চাদ্ভাগে নমিত না হইলে কখনও প্রচণ্ড বলে আঘাত করিতে পারে না। অতএব তোমরা অস্ত্র লইয়া শত্রু বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হও। এইবার নিশ্চয়ই তোমাদের জয়লাভ হইবে।" শোলাঙ্কিসৈন্যগণের মহ্যমান হৃদয় আবার বৈদ্যুতিক উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বিকট রণনাদ ত্যাগ করিয়া তাহারা তখনই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। অনন্তর ভুবর অবশিষ্ট প্রধান প্রধান সামন্ত ও সেনানিদিগকে আহ্বান করিয়া একটী সমরসভার অধিবেশন করিলেন। সকলের ঐকমত্যক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে গুর্জ্জরের বিরুদ্ধে অচিরে সেনাদল পুনঃ চালনা করা আবশ্যক;—রাজা ভুবর স্বয়ং এই দলের অধিনায়ক হইয়া যাইবেন। তখনই চারিদিক বিকম্পিত করিয়া ভীম নির্ঘোষে রণভেরি বাজিয়া উঠিল। শোলাঙ্কিসেনাদল ভিন্নভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত হইয়া প্রচণ্ড বিক্রম সহকারে পঞ্চসরের অভিমুখে পুনর্ব্বার ধাবিত হইল। পথিমধ্যে নানা মঙ্গলসূচক লক্ষণ তাহাদিগের নয়নগোচর হইয়া সৈন্যমণ্ডলের উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

শত্রুসৈন্য পঞ্চসর দৃঢ়তর অবরোধ করিল। তখন জয়শেখর দুর্গের সমস্ত বহির্দ্বার বদ্ধ করিয়া শত্রুকুলের আক্রমণ রোধ করিবার অয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে মীর একদা দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায়ে পঞ্চসরের ভিতরে নানা অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু শূরপাল তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এইরূপে দুই চারি দিবস অতীত হইলে জয়শেখর একদিন স্বীয় সৈন্যসামন্তদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যদি স্বাধীনতার প্রতি মমতা থাকে, স্বদেশের প্রতি স্নেহ থাকে, তবে সকলে প্রাণপণে মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ প্রস্তুত হও। "জীবনের মায়ায়" মোহিত হইলে, এ পবিত্র পুরী হইতে বিদায় লইয়া যাও।" এই কথা শুনিয়া সৌর যোধগণ উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "মহারাজ! আমরা সকলেই পবিত্র রাজপুত-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আমাদিগের চিরন্তন ব্রত; অদ্য আমরা সেই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিবার নিমিত্ত অম্লানবদনে আপনার সহিত সমরক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করিব; মাতৃভূমির এই বিষম সঙ্কটে,—স্বাধীনতার এই ঘোর বিপদকালে যদি কেহ জীবনের মমতায় মহারাজকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার আর কিছুতেই সদ্‌গতি হইবে না; কাকগণও তাহার পাপ-মাংস স্পর্শ করিতে ঘৃণা করিবে;—সে নরাধম কোটি কোটি বৎসর ভীষণ নরকানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে।"

এইরূপে প্রায় দুই মাস অতীত হইল,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধব্যাপারে ক্রমে দ্বিপঞ্চাশৎ দিবস চলিয়া গেল, তথাপি ভূবর কিছুই করিতে পারিলেন না; সমরকুশল শূরপাল তাঁহাদিগের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে শোলাঙ্কিরাজ ভূবর একদা সেনাপতি মীরকে মন্ত্রণাগারে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বীর! এক্ষণে উপায় কি? শূরপালের বাহুবলে ত সকল চেষ্টাই ক্রমে ক্রমে নিষ্ফল হইতে লাগিল। এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে অভীষ্ট সাধন হইতে পারে?" তখন মীর উত্তর করিলেন, "মহারাজ! ঐ শূরপাল পরম চতুর ও রণদক্ষ, উহার ন্যায় অতন্দ্রিত যোধ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; বলিতে কি ঐ বীরই এক্ষণে জয়শেখরের একমাত্র প্রধান সহায়। কৌশলে অথবা প্রলোভন দেখাইয়া যদি উহাকে ভিন্ন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদিগের নিশ্চয়ই জয় হইবে। অতএব চেষ্টা করিয়া দেখুন যদি কোন উপায়ে উহাকে স্বদলে আনিতে পারেন।" এই পরামর্শই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইল। অনন্তর রাজা ভূবর কোন লতারসে একখানি প্রলোভনময় পত্র লিখিয়া গোপনে শূরপালের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শূরপাল তদুপরি কুঙ্কুম প্রয়োগ করিয়া সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইলেন। ক্রোধে তাঁহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কি এতই নীচাশয়, এতই লঘুচেতা এতই অর্থপিশাচ যে, প্রলোভনের বশীভূত হইবেন? শূরপাল তখনই সেই পাপপত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, "মূঢ়! আমি উচ্চ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; তবে কি প্রকারে তুমি লোভে আমাকে মোহিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। আজি জানিলাম তোমার নিতান্তই কুবুদ্ধি হইয়াছে। যদি ত্রিলোকের সাম্রাজ্য আমার করতলস্থ হয়, তথাপি কেহ শূরপালকে মহারাজ জয়শেখরের নিকট হইতে ভিন্ন করিতে পারিবে না। যে জারজ, যে উচ্ছিষ্টান্নভোজী, যে তোষামোদপ্রিয়, সেই মূঢ় নীচাশয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে।"

এইরূপে দুই মাস অতীত হইয়া গেল। তথাপি উভয় পক্ষের জয় পরাজয়ের কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হইল না। দিবাভাগ যুদ্ধব্যাপারে অতিবাহিত করিয়া প্রত্যেক রজনীতে উভয় নরপতিই স্বস্ব শিবিরে সৈন্য সামন্তদিগকে লইয়া মহাভারতের যুদ্ধ পর্ব্ব সকল পাঠ করেন। পাণ্ডব বীর ভীম সেনের অসীম সাহস ও বীরত্বের কথা শ্রবণ করিলেই সৌর যোধগণ তাড়িত তেজে উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠে,—"কখন রজনী প্রভাত হইবে;—কখন প্রাতঃকাল দেখা দিবে—রণরঙ্গে লিপ্ত হইব?"

ক্রমশঃ—

পাতঞ্জলদর্শন।

১ম খণ্ড ২১৩ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থিত হইলে কি হয় তাহা পরে কথিত হইবে; এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্॥ ৩॥

তদা তস্মিন্ কালে নিরোধসময়ে দ্রষ্টুঃ চিৎস্বভাবস্য স্বরূপে চিন্মাত্রতায়াং অবস্থানং ভবতীতি শেষঃ। পুরুষস্য চৈতন্যমাত্রং স্বভাবো নতু বৃত্তয়ঃ ইতি কুসুমস্যাপগমে স্ফটিকস্যেব বৃত্ত্যপগমে তস্য স্বরূপপ্রাপ্তিরিতি দিক্।

তদা সেই কালে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ অথবা নিরুত্থান সময়ে দ্রষ্টার অর্থাৎ দর্শনকর্ত্তা আত্মার বা পুরুষের স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি হয়। ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, এই অবস্থাতেই আত্মার স্বরূপ অপ্রচ্যুতভাবে অবস্থিত থাকে; অন্যান্য সময়ে তিনি বুদ্ধিবৃত্তি সহিত একীভূত থাকাতে তাঁহার স্বরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। সেই হেতুই মানবগণ এখন অযোগীর অবস্থায় প্রকৃত বা যথার্থ আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া থাকে। চৈতন্যমাত্রই পুরুষের স্বভাব, কিন্তু বৃত্তি সকল স্বভাব নহে; যেমন স্ফটিকের উপরি পতিত কুসুমপ্রভার অপগম হইলে তাহার স্বরূপতা প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ বৃত্তির অপগম হইলে পুরুষেরও স্বরূপপ্রাপ্তি হয়।

এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, নিরুদ্ধ-অবস্থা এবং মনের লয় অথবা বিনাশ প্রায় একই কথা; নিরুদ্ধ-অবস্থায় যদি চিত্তের লয় অথবা অভাব হয়, তবে আর থাকিল কি? যখন কিছুই থাকিল না তখন সেই অবস্থাকে যোগ না বলিয়া অন্য এক প্রকারের মরণ বলা হউক; যেহেতু মনের লয় বা আত্মার লয় একই কথা। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে এই বিষয়ে অনেক প্রভেদ আছে; অনভিজ্ঞ মানবগণের ঐরূপ ভ্রম বটে কিন্তু মন ও আত্মা এই দুইটি এক নহে, পৃথক্ পদার্থ; ইহা যোগিদিগের সমাধিকালেই অনুভূত হয়, এবং তাহাই ইহার যথার্থ প্রমাণস্থল। মন ও আত্মা এই উভয়ে এক বস্তু হইলে সমাধি অর্থাৎ চিত্তের লয়াবস্থা হইবামাত্র অবশ্যই সেই যোগিদের দেহের পতন হইত। কিন্তু যখন তাহা ঘটে না, তাঁহাদের শরীর যেমন তেমনই থাকে, তখন তাঁহাদিগের মনোলয় হইয়াছে বলিয়া আত্মার লয় হইয়াছে এরূপ বলিতে পারা যায় না; বরং এরূপ বলা যায় যে তৎকালে তাঁহাদের আত্মার যথার্থ স্বরূপ (অনারোপিতত্ব হেতু) ও পার্থক্য অনুভূত হয়। অতএব মনোবৃত্তির নিরোধকালেই পুরুষ বা আত্মা আপনার যথার্থরূপে অবস্থিত থাকেন অন্যান্য সময়ে সেরূপ থাকেন না। অন্যান্য সময়ে যেরূপ থাকেন এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র॥ ৪॥

ইতরত্র অন্যস্যামবস্থায়াম্। বৃত্তয়ঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণাঃ। তাভিঃ সারূপ্যং সমানাকারত্বং

তত্তাদাত্ম্যভ্রমো ভবতীতি বাক্যশেষঃ। অতএব ন তদাপি তস্য স্বরূপক্ষতির্বাস্ত লোহিত্যভ্রমকালে স্ফটিকস্যেবেতি দ্রষ্টব্যম্।

অন্যান্য সময়ে তিনি চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া বিবিধ প্রকারে দৃশ্য হইয়া থাকেন। ফলতঃ সেই সময়ে বৃত্তির সহিত সমানাকারত্বহেতু তত্তাদাত্ম্য-ভ্রম হয়, অতএব তখনও তাঁহার স্বরূপ-ক্ষতি হয় না, যেমন লৌহিত্যভ্রমকালে স্ফটিকের স্বরূপ ক্ষতি হয় না তদ্রূপ জানিবেন। মনোবৃত্তি কত প্রকার এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

বৃত্তয় বিষয়সম্বন্ধাৎ চিত্তস্য পরিণামবিশেষাঃ। তাশ্চ ক্লিষ্টাদিভেদেন দ্বিধা, প্রমাণাদিভেদেন চ পঞ্চতয্যঃ। পঞ্চাবয়বাঃ পঞ্চভিরঙ্গৈরুপেতা বিভক্তা বেত্যর্থঃ। তত্র অবিদ্যাদিক্লেশফলাঃ ক্লিষ্টাঃ। অক্লিষ্টাস্তু তদ্বিপরীতাঃ। তে চাগ্রেস্ফুটীভবিষ্যন্তি।

মনোবৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। সেই প্রকার মনোবৃত্তি আবার দুই প্রকার হইয়া থাকে, এই উভয়ের মধ্যে ক্লেশদায়ক বলিয়া একের নাম ক্লিষ্ট এবং ক্লেশের অর্থাৎ সংসার-দুঃখের বিনাশক বলিয়া অন্য প্রকারের নাম অক্লিষ্ট। আরও বিস্তারিতরূপে বলিতে হইলে এইরূপে বলিতে হয়, বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইবামাত্র চিত্ত, বিষয়ের (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থই বিষয়) আকার প্রাপ্ত হয়, চিত্তের সেইরূপ বিষয়াকার প্রাপ্তি হওয়াকে বৃত্তি কহে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে ইন্দ্রিয় দেহস্থিত এবং বিষয় বহিঃস্থিত এই উভয়ের সম্বন্ধহেতু চিত্তের নানাবিধ অবস্থা বা বিবিধ পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেই মনের পরিবর্ত্তিত অবস্থার নাম বৃত্তি। বিষয় অসংখ্য সুতরাং বৃত্তিও অসংখ্য। ঐ বৃত্তি অসংখ্য হইলেও সেই সমস্তের শ্রেণীগত বা প্রকারগত বিভাগ অসংখ্য নহে। প্রকারগত বিভাগ প্রধানকল্পে পাঁচ এবং দ্বিতীয় কল্পে দুই। সেই দুইটির মধ্যে একটির নাম ক্লিষ্ট ও অন্যতরটিকে অক্লিষ্ট কহে। রাগ, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধাদি বৃত্তি সকল সংসার-ক্লেশের কারণ সেই হেতুই তাহাদের নাম ক্লিষ্ট, এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য, মৈত্রী ও দয়াদি বৃত্তিসকল তাহার বিপরীত অর্থাৎ সংসারদুঃখনিবৃত্তির অর্থাৎ মুক্তির কারণ, সেইহেতু তাহাদের নাম অক্লিষ্ট। ক্লিষ্টবৃত্তিসকল পরিত্যাগ এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিগুলি অবলম্বন যোগ্য। কিন্তু যোগকালে ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট সমস্ত মনোবৃত্তিই নিরোধ করিতে হয়; তাহা না হইলে অক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তিদ্বারাও যোগের বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে। এক্ষণে মনোবৃত্তির প্রধানকল্পের পঞ্চবিভাগ কি কি তাহা উক্ত হইতেছে।

প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

প্রমাণাদীনাং লক্ষণানি অব্যবহিত পরত এব সূত্রৈরুক্তম্।

মনের বৃত্তি প্রধানতঃ প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি ও স্মৃতিবৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার। ক্রমে ক্রমে এই পঞ্চবিধবৃত্তির বিষয় বর্ণিত হইবে। এক্ষণে প্রমাণবৃত্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

প্রমাণশব্দোঽজহল্লিঙ্গঃ তেন প্রমাণানীতি প্রয়োগঃ। প্রমাকরণং প্রমাণমিতি সামান্য লক্ষণম্। প্রমা চ অবাধিতার্থাবগাহীবোধঃ।

চিত্তস্য অর্থাকারায়াং বৃত্তৌ চিদাত্মনো যঃ প্রতিবিম্বঃ স চাস্মিন্ শাস্ত্রে পৌরুষেয়ো বোধঃ ফলমিতি চোচ্যতে। তত্র ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা চিত্তস্য বিষয়সম্বন্ধে সতি যা তত্র বিশেষনির্দ্ধারণা বৃত্তিরূপজায়তে সা প্রত্যক্ষম্। হেতুদর্শনাদ হেতুমতি যা সাধ্যতাবচ্ছেদকসামান্যনির্দ্ধারণাবৃত্তির্জায়তে সা অনুমানম্। আপ্তেন দৃষ্টো বানুমিতো বার্থো যেন শব্দেনোপদিশ্যতে তস্মাচ্চ শব্দাৎ শ্রোতুর্যা তদর্থবিষয়াবৃত্তিরুদেতি সা আগম ইতি সংক্ষেপঃ।

প্রমাণবৃত্তি তিন প্রকার প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম। প্রমার যে করণ তাহার নাম প্রমাণ। অবধারিত অর্থাবগাহীবোধের নাম প্রমা, চিত্তের অর্থাকারা বৃত্তিতে চিদাত্মার যে প্রতিবিম্ব তাহাই এই শাস্ত্রে পৌরুষেয় জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা চিত্তের বিষয়সম্বন্ধ ঘটিলে পর তাহা যে বিশেষ নির্দ্ধারণাবৃত্তির উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম প্রত্যক্ষ। হেতুদর্শন হেতু, হেতুবিশিষ্টপদার্থে যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসামান্যনির্দ্ধারণা (সাধ্য বা উদ্দেশ্যের যাথার্থ্যাবধারক যে সামান্যনিশ্চয়) বৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম অনুমান। আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্তব্যক্তিকর্ত্তৃক দৃষ্ট বা অনুমিত অর্থ যে শব্দদ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই শব্দ হইতে শ্রোতার যে তদর্থবিষয়কবৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম আগম।

নৈয়ায়িকেরা উপমানকেও প্রমাণ মধ্যে গণ্য করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রমাণ চারি প্রকার। কিন্তু পাতঞ্জলবেত্তা পণ্ডিতগণ তাহাকে অনুমান মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন।

ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারে। যেমন কোনও ধাতুদ্রব্য দ্রবীভূত করিয়া ছাঁচে ঢালিলে তাহা যেমন অবিকল ছাঁচের আকার ধারণ করে, সেইরূপ জীবগণের মন বাহ্য বস্তুতে সংযুক্ত হইবামাত্র ঠিক তদাকারে পরিণত হয়। মনের সেইরূপ পরিণামকেই আমরা সাধারণতঃ জ্ঞান বলিয়া থাকি; যোগশাস্ত্রকারেরা তাহাকে বৃত্তি বলিয়া থাকেন। মনোবৃত্তি সকল অবলম্বিত পদার্থের অবিকল সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইলেই তাহা প্রমা বা সত্যজ্ঞান নামে পরিচিত হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারাই ঐ প্রমার উৎপত্তি হয়। এক্ষণে বিপর্য্যয় বৃত্তির বিষয় উক্ত হইতেছে।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপ প্রতিষ্ঠম্॥ ৮॥

যস্য যৎ পরমার্থিকং রূপং তস্মিন্ ন প্রতিষ্ঠীতা তদ্রূপ প্রতিষ্ঠম্। অতথাভুতেঽথে তথাভূততযোৎপদ্যমানং মিথ্যাজ্ঞানং বিপর্য্যয় ভ্রম ইতি যাবৎ। অস্যৈব ভেদাঃ পঞ্চক্লেশা ইত্যগ্রে স্ফুটী ভবিষ্যতি।

যাহার পারমার্থিক বা যথার্থরূপ যাহা, তাহাতে যাহা প্রতিষ্ঠিত বা স্থির থাকেনা, সেই মিথ্যাজ্ঞানই বিপর্য্যয় বা ভ্রম। আরও সরল করিয়া বুঝাইতে হইলে এইরূপ বলিতে হয় যে, যে জ্ঞান মিথ্যা, যে জ্ঞান পূর্ব্বরূপে স্থায়ী হয় না অর্থাৎ এক সময়ে যে জ্ঞান জন্মিল অন্যক্ষণে সেই জ্ঞান স্থির না থাকিয়া অন্যপ্রকার হইয়া গেল, তাহার নামই বিপর্য্যয়। পূর্ব্বে যে ছাঁচের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, এই বিপর্য্যয় জ্ঞান তাহার বিপরীত অর্থাৎ ছাঁচের ঢালিবার দোষে যাহা ঠিক ছাঁচের আকারে না হইয়া অন্য প্রকার হইয়া যায়, তাহাকেই বিপর্য্যয় কহে। এক কথায় বলিতে হইলে, যে বস্তু যাহা নহে তাহাতে তদ্বুদ্ধির উদয় হইলে

তাহাই মিথ্যাজ্ঞান বিপর্য্যয় বা ভ্রম। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজত জ্ঞান, মরীচিকায় বারিবুদ্ধি, শরীরাদিতে আত্মত্ব বুদ্ধি ইত্যাদি।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ॥ ৯॥

শব্দজন্যং জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং তৎ অনুপতিতং শীলং যস্য স তথোক্তঃ। বস্তুশূন্যো নির্ব্বিষয়ঃ তাদৃশো যোঽধ্যবসায়ঃ স বিকল্পঃ। নরশৃঙ্গাদি শ্রবণ সমনন্তরমবশ্যমেব ভবতি নির্ব্বিষয়া বৃত্তিঃ। তস্যা যো বিষয়ো নর শৃঙ্গাদিঃ স নাস্তীতি তস্যা নির্ব্বিষয়ত্বম্। তস্যা বিপর্য্যয়বৎ বাধো নাস্তীতি পূর্ব্বোক্তাৎবিপর্য্যযাদ্ ভেদঃ।

কেবল কথায় যাহা প্রতিপন্ন কিন্তু বস্তু শূন্য তাহাই বিকল্প। ফলতঃ বস্তু নাই অথচ শব্দজন্য একরূপ মনোবৃত্তি জন্মে; সেই মনোবৃত্তির নাম বিকল্প। যেমন আকাশ-কুসুম, নরশৃঙ্গ, শশশৃঙ্গ. বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি। আকাশপুষ্প নাই অথচ তাহা শুনিবামাত্র মনোমধ্যে এক প্রকার প্রবৃত্তির উদয় হয়। দুইটি পদার্থে একটি মাত্র মনোবৃত্তি জন্মিলেও তাহা বিকল্প বৃত্তি হইবে। পদার্থ একটি কিন্তু শব্দ প্রভাবে দুইটি সংশ্লিষ্ট বৃত্তি জন্মিলেও তাহাও বিকল্প বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। আত্মা ও চৈতন্য পদার্থ বস্তুতঃ একবস্তু হইলেও আত্মার চৈতন্য এইরূপ বলিলে দুইটি সংশ্লিষ্ট বৃত্তির উৎপত্তি হয়। চৈতন্য বিশিষ্ট মূল বুদ্ধিতত্ত্ব রূপ অহংতত্ত্ব বস্তুতঃ দুই বস্তু কিন্তু অহং বা আমি, এই শব্দের দ্বারা একভিন্ন দুইটি বৃত্তি বা জ্ঞান জন্মেনা। অতএব বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বিবেচনা না করিয়া পদার্থান্তর কল্পনাত্মক মিথ্যা বৃত্তির নাম বিকল্প।

অভাব প্রত্যযাবলম্বনা বৃত্তি নিদ্রা॥ ১০॥

কার্য্যংপ্রতি অযতে গচ্ছতীতি প্রত্যয়ঃ কারণম্। অভাবে জাগ্রৎ স্বপ্ন বৃত্তীনাং প্রবিলয়ে কারণং তমঃ। তদেব আলম্বনং বিষয়ো যস্যাঃ সা তথোক্তা বৃত্তি নিদ্রেত্যুচ্যতে।

যাহাতে সমস্ত মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনোবৃত্তি উদিত থাকে, তখন তাহা নিদ্রা বা সুষুপ্তি নামে উক্ত হয়। আরও যখন বাহ্য বোধের নিবোধ হয়, তাহাকে নিদ্রা কহে। বাহ্য পদার্থ বোধের অভাবেব প্রত্যয় হইলেই তখন নিদ্রা হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ—

শ্রীবেণীমাধব ন্যায়রত্ন।

গোপাল নায়ক ও আমীর খস্রু।

১ম খণ্ড ৫৯৩ পৃষ্ঠার পর।

২

যাহা হউক খস্রুর বুদ্ধিকে ধন্য! ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে উক্ত প্রকার জয় আমীর খস্রুর পক্ষে সেরূপ গৌরবজনক না হইলেও কভু যে তাহা সঙ্গীতে অবুদ্ধিমত্তা ও অক্ষমতার পরিচায়ক নহে ইহা নিঃসংশয়।—যেহেতু রাগে রাগ মিশ্রিত করিয়া তিনি নূতন প্রকার রাগরাগিণী উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছিলেন তো। তাঁহার এই রাগোদ্ভাবনী ক্ষমতা অবিমিশ্রপ্রাণ না হইলেও অসাধারণ গুণবিশিষ্ট—যে গুণবলে দিল্লী সাঙ্গীতিক পরাভব হইতে রক্ষা পাইল।

এখানে অনেকে মনে করিতে পারেন যে ঐরূপ রাগে রাগ মিশাইয়া নূতন রাগের উপসৃষ্টি করা এত কি দুরূহ বিষয় যাহার জন্য খস্রু প্রশংসনীয় হইতে পারেন। তাহাতে উত্তর এই যে তাহা যতটা আমরা সহজ বলিয়া মনে করি ততটা নহে; তাহা হইলে পেতোকেই অতি সহজে—অনায়াসে এক একজন সঙ্গীতবিশারদ ব্যক্তি হইতে পারিতেন।

অপরের রাগের সাহায্যে হইলেও, পৃথক্ রাগাদির মিলনে নবরাগের সঞ্চার কার্য্য যে সে লোকের বুদ্ধিবলে হয় না, তাহাতে বিশেষরূপ সূক্ষ্ম সাঙ্গীতিক প্রাণ চাই; যাহার অভাবে, তড়িৎবিনা যেমন উদজান ও অম্লজান পৃথক্ বায়ুদ্বয় কাছাকাছি একত্রে থাকিলেও মিশিয়া জলে পরিণত হইতে পায় না, সেইরূপ পৃথক্ রাগসমূহও সফল সংযোগলাভে সমর্থ হয় না।

আমীর খস্রুর অন্তরে সঙ্গীতসুধা অন্তঃসলিল হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত ছিল বলিয়াই যেমন তাহা কোন কার্য্যসূত্রে আহত ও খনিত হইল অমনি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সাঙ্গীতিক সূক্ষ্ম বুদ্ধি আদৌ না থাকিলে তিনি কখন শ্রুতমাত্রেই অন্যের রাগসংযোগে অমন রাগবর্ণ সমূহের জন্ম দান করতঃ সভাশুদ্ধ চকিতে চমকিত করিতে পারিতেন না। সঙ্গীতের গূঢ় প্রবাহবলেই তিনি অত সত্বর গোপাল নায়কের রাগরাগিণী বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইলেন এবং তাহাদিগেব প্রাণে আরব ও পারসীক রাগের প্রাণ সম্মিলন দ্বারা অচিরে বার তের প্রকার রাগরাগিণী উদ্ভাবন করিয়া ফেলিলেন:—এরাক নামে এক পারসীক রাগ লইয়া তাহার একাংশ গারার সহিত মিশ্রিত করিয়া, মতান্তরে টোড়ির সহিত এরাকের অঙ্গ মিশ্রিত করতঃ, একটী রাগ প্রস্তুত করিলেন তাহার নাম খস্রু দিলেন মোহিয়র। এই মোহিযর মিহির বলিয়াও কেচিৎ কথিত হইয়া থাকে। খস্রু এই রাগটী প্রথমতঃ উদ্ভাবিত কবিলেন। দ্বিতীয়তঃ পুরবীতে গৌরা, গুণকেলী ও পারসীক এক রাগের মিশ্রণদ্বারা অথবা মতান্তরে পুরবীবিভাসের সহিত পারসীক রাগ মিশাইয়া

একটী রাগ রচনা করিলেন, তাহার সাজগিরি আখ্যা দিলেন। তৃতীয়তঃ হিন্দোলেতে পারসীক রাগের মিলন সাধনের দ্বারা একটী রাগ প্রস্তুত করতঃ তাহার ইয়ামন নামকরণ করিলেন; এই ইয়ামন কাহারও মতে ইমন, আবার কোন মতে তাহা নহে; পরন্তু আমার পূর্ব্বোক্ত মতের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে কারণ এমন এমন ইমন আছে যাহার সহিত হিন্দোলের তুলনা করতঃ উভয় রাগকে ভালরূপে আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে ইমনের প্রাণের মধ্যে হিন্দোলের ছায়া কম বর্ত্তমান নহে। ইহা গায়কেরা অত্যন্ত গভীরভাবে তলাইয়া না দেখিলে সহজে ধরিতে পারিবেন না। চতুর্থতঃ সারঙ্গ ও বসন্তের সঙ্গে পারস্যের এক রাগের সংযোগ সাধন পূর্ব্বক ওসাক নামে এক রাগ প্রকাশ করিলেন। পঞ্চমতঃ, টোড়ি ও মালশ্রীতে দোগা বলিয়া এক পারসীক রাগ ও আরবী হোসেনী রাগ মিলিত করিয়া মওয়াফেক নামে একটী রাগ উদ্ভাবিত করিলেন; এই মওযাফেককে দেওয়ালী বলিয়াও কেহ কেহ কহেন। ষষ্ঠতঃ পুরবীতে পারসীক রাগ মিশাইয়া গানম্ বলিয়া একটী রাগ প্রস্তুত করিলেন। সপ্তমতঃ খটে একটী পারসীক রাগের অল্পাংশ মিশাইয়া জিলফ রাগ তৈয়ারি করিলেন; পূর্ব্ব পূর্ব্ব ওস্তাদেরা খট ও জিলফকে প্রায় একই চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। অষ্টমতঃ, গুণকেলির সঙ্গে গওরা সম্মিশ্রিত করিয়া ফরগণা নামে এক পারসীক ধাঁচের রাগ প্রস্তুত করিলেন। নবমতঃ গৌড়সারঙ্গেতে পারসীক রাগ সংযুক্ত করিয়া, কিম্বা ভিন্নমতে, গৌড়, বেলাবল ও পুরবীর সঙ্গে পারসীক রাগের সম্মিলনে, অথবা মতান্তরে, মল্লার ও টোড়ির সহিত একটী রাগ মিশাইয়া সরফরদা রাগ গড়িলেন। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখিতেছি, কেহ এই একটী রাগ গড়িতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাগমিশ্রণের বিধান দেখিয়া যেন আশ্চর্য্যান্বিত না হন ও ইহা অসঙ্গত মনে না করেন যেহেতু ইহা সকলেই জানেন বোধ হয় যে সংসারে বিভিন্ন মার্গের দ্বারা একটী লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আরও দেখুন, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণের নানা নিয়ম প্রণালীর দ্বারা একই ভাষার ভাষ্য কীর্ত্তিত হইতেছে, পুনশ্চ চিত্ররাজ্যেও দেখা যায় যে কোন একটী চিত্ররাগ এক এক শ্রেণীর বিচিত্র বর্ণদলের দ্বারা পরিকল্পিত করা যায়।—দশমতঃ, দেশকারকে পারসীক রাগরঞ্জিত করিয়া বাজরি নামে একটী রাগোদ্ভাবন করিলেন। একাদশতঃ, কানাড়া, গৌরি ও পুরবীর সঙ্গে এক পারস্যক রাগ মিশ্রিত করতঃ ফরোদস্ত নামক রাগ উপস্থজন করিলেন। দ্বাদশতঃ, কল্যাণের সঙ্গে এক পারস্য রাগ মিলিত করিয়া সনম নামে একটী রাগ উৎপন্ন করিলেন; এবং অতিরিক্ত মতে খস্রু কল্যাণ রাগের সহিত ইমনের সহবাস ঘটাইয়া ইমণ কল্যাণও তৈয়ারি করিয়াছিলেন।

গোপালনায়ক খস্রুর সুকৌশলোদ্ভাবিত এই ত্রয়োদশ প্রকার রাগরাগিণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহার রাগমিশ্রণচাতুর্য্যকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। গোপাল, আমীর খস্রুর রাগমিশ্রণপাণ্ডিত্যে বড়ই

মুগ্ধ হইয়াছিলেন—খস্রু এরূপ সুচারুরূপে সুবুদ্ধিসহকারে মিলনকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন যে গোপালের তদ্বিশ্লেষণে ভালরূপ সামর্থ্য ছিল না, তিনি সেই মিলনদলের উপাদানসমূহ ধরিতে ছুঁইতে পারেন নাই; শেষে নায়কশ্রেষ্ঠ নিজমস্তক হইতে তিন তুম্বি খুলিয়া খস্রুকে প্রদান করিলেন এবং আপনার তুল্যব্যক্তিরূপে গ্রাহ্য ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। খস্রু এইরূপে নায়কসমতা লাভপূর্ব্বক নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। গোপালের সহিত খস্রু এখন তুল্যমূল্যতা লাভ করিলেন, কিন্তু তিনি যদি দক্ষিণী-নেতাকে বিশুদ্ধরূপে, একেবারে পর-সহায়তাহীন স্বোদ্ভাবনীশক্তিপ্রভাবে জয় করিতে সমর্থ হইতেন তাহা হইলে তিনি গোপালের নিকট হইতে ছয়তুম্বি অর্থাৎ তাঁহার জয়লব্ধ সমুদয় তুম্বি লাভ করতঃ ভারতে নায়কসিংহাসনে আসীন হইতে সক্ষম হইতেন।

এই জয়ব্যাপারে বুঝিতে পারা যায় যে খস্রুর রাগোদ্ভাবনে কম মৌলিকতা ছিল না। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্রভাবাপন্ন না হইয়া পরতন্ত্রভাবাপন্ন ছিল।—স্বাতন্ত্রিক মৌলিকতা প্রত্যক্ষভাবে স্বভাব হইতে গৃহীত হয়, কিন্তু পারতন্ত্রিক মৌলিকতা প্রকৃতি হইতে পরোক্ষভাবে অনুকৃত হইয়া থাকে। ইহাও ঐকান্তিক অভ্যাসের ফল, তদ্ব্যতিরেকে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা দুষ্কর।—অনভ্যস্ত ব্যক্তি তাহাতে নির্জ্জীবতা আনিয়া ফেলে।—যেমন রাশীকৃত পরের চিত্র পাইলেও চিত্রে অপটু ব্যক্তি তৎসাহায্যে কোনরূপ নূতন বিষয় কিছু বাহির করিতে পারেন না, আনিতে গেলে চিত্রে সামঞ্জস্যহীনতা আনিয়া ফেলেন, সেইরূপ রাগে অকবি ও রাগসকল করতলন্যস্তবৎ পাইলেও তৎসাহায্যে নব রাগ তৈয়ারি করতঃ রাগোদ্ভাবনে পারতন্ত্রিক মৌলিকতাও দেখাইতে সমর্থ হয়েন না। পারতন্ত্রিক মৌলিকতা আনয়ন করাও কম গুণীর কার্য্য নহে। যেহেতু অপরের রাগরাগিণী লইয়া ভালরূপে পরিপাক না করিতে পারিলে তাহা হইতে পারতন্ত্রিক মৌলিকতার সঞ্চার হয় না। ইহা রাগসমূহের মধ্যে আনিতে গেলে সঙ্গীতদেহে পরকীয় রাগরসের জীর্ণতা উৎপাদনপূর্ব্বক তাহার মধ্যে রাগরক্তের আবির্ভাব করাইতে হয়। অনভিজ্ঞের হাতে তদভাব পরিলক্ষিত হয়। পরকীয় রাগগুলি ভাল পরিপাক না পাইয়া রাগবিপাকরূপে শ্রোতাগণের বিরক্তি-কারণ হয়। সংক্ষেপে বিশিষ্টরূপে বৈজ্ঞানিক ধাঁচে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে অনভিজ্ঞ অকবি ব্যক্তি রাগগুলি পাইলে তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ শুধু যোগমাত্র সাধন করিতে পারেন কিন্তু অভিজ্ঞ জন তাহাদের গুণ উপলব্ধি করিয়া তাহাদের গুণন বা গুণযোগ সাধনের দ্বারা শ্রোতাদিগের মনকে অনুরক্ত করিয়া তোলেন।

পরকীয় রাগগুলির মধ্যে রাগরক্ত উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতে খস্রু আশ্চর্য্যরূপ নিপুণ ছিলেন বটে; কিন্তু যখন আমরা তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখি তখন আমরা আর তত বিস্মিত হই না কারণ তিনি একজন অসাধারণ কবি ও মনীষি ছিলেন। পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাঁহার রসাত্মক ভাবেরও আভাস

দিয়াছি এবং তাঁহার মনীষিতার সম্বন্ধেও একপ্রকার ইঙ্গিতমাত্র করিয়া আসিয়াছি—বলিয়াছি যে তিনি ত্রয়োদশ বিদ্যার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু আর একটু খুলিয়া বলিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে সেই ত্রয়োদশটী বিদ্যা বড় কম নহে, যা'তা লইয়া যে সেই ত্রয়োদশ বিদ্যা হইয়াছে তাহা নয়। তাহা পারস্যের কয়টী কঠিন বিদ্যা লইয়া গঠিত নিম্নলিখিত কয়টী বিদ্যা তাহার অন্তর্গত;—তসরি (পারস্যের নিদান), তেব (পারস্যের বাগ্‌ভট বা চরক), হেন্দেশা (পারস্যের গণিতশাস্ত্র), হায়েৎ (পারস্যের খগোল গণনাশাস্ত্র), জবর মোকাবেলা (পারস্যের লীলাবতী), ফেকা (পারস্যের ধর্ম্মশাস্ত্র), এলাহিয়েৎ (পারস্যের বেদ), মনাজেরা (বিচার বা পরীক্ষাশাস্ত্র), মনাজের (অক্ষিবিদ্যা), তবই (সমুদয় বিদ্যার সারসংগ্রহ; রেয়াজি পারস্যের দর্শনশাস্ত্র ও তবইর অন্তর্গত), নজুম (পারস্যের জ্যোতিষ)।

খস্রু শুধু যে এই প্রকার বিদ্যা অধ্যয়ন মাত্র করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি তাঁহার রসাত্মক ভাবের সহিত অধ্যয়ন ফল মিশ্রিত করিয়া পারস্য ভাষায় নিরেনব্বইটী গ্রন্থ রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। এই নিরেনব্বই গ্রন্থের প্রায় সকলই কাব্যে লিখিত। কাব্যরচনাই তাঁহার মুখ্য জীবন ছিল। কবি খস্রু বলিয়াই তিনি ভারতে প্রসিদ্ধ, কবি আমীর খস্রু বলিয়াই ইতিহাসাদিতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায় কাব্যেই যেন তাঁহার চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের ঘটনার মধ্যে কবিজনোচিত কৌশলই যেন প্রভুত্বলাভ করিয়াছে। গোপাল নায়ককে তিনি যেরূপে পরাজিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবিজনসঙ্গত একটী কৌশলই প্রকাশ পাইয়াছে; তাঁহার ঐ কীর্ত্তিটীর মধ্যে একটী কাব্যক্রীড়া স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহার ঐরূপ চতুর কার্য্য তাঁহার কল্পনানৈপুণ্যকে দীপ্ত করিয়াছিল, তাঁহার অন্তরস্থ কাব্যেরই গূঢ়দৃশ্য যেন প্রকাশিত করিয়াছিল। কাব্যে তাঁহার সমুদয় জীবন প্রধানতঃ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে; যথার্থ কবির ন্যায় তিনি অল্পেতেই উচ্ছ্বাসিত হইয়া কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন। প্রকৃত কবির ভাবে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইত। টোগলাকনামা নামক তাঁহার একটী কাব্যরচনা তৎসম্বন্ধে মন্দ সাক্ষ্যদান করে না; সার্ এইচ্ এম্ ইলিয়ট্ সাহেব বলেন, "দুর্ভাগ্যবশতঃ খস্রু যে সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন সেই সময়ে হিন্দুস্থানে পাপাসক্তি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল; যাহা হউক তিনি তাঁহার জীবনের শেষাংশে কতিপয় বৎসর ভারতে ঘায়েস্ উদ্দীন টোগলাক নামে একজন ন্যায়বান্ রাজপুত্রকে সিংহাসনারূঢ় দেখিতে পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন; এবং সুখে টোগলাকনামা নামক কাব্য লিখিয়াছিলেন।" কবির হৃদয় সদ্‌গুণ দেখিলেই গুণবর্ণনায় আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; কবি খস্রুর ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল, তিনি ন্যায়পরায়ণ রাজপুত্র ঘায়েস্ উদ্দীন টোগলাকের সদ্‌গুণ দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না অমনি তাহা কাব্যোচ্ছ্বাসে ধ্বনিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন,

তাঁহার কাব্যানল কেহই নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয় নাই, তিনি বিচিত্র-ভাবে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার ইষখিয়া (আসক্তি- আষগ্) নামক গ্রন্থে প্রেম-বিষয়ক কবিতাসমূহ লিখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মাৎলাউল্ আন্ওয়ার্ নামক গ্রন্থে সুফিমতসম্বন্ধীয় কবিতাসকল লিখিত হইয়াছে; তাঁহার দিবান (দিব্য—Divine) নামক কাব্যের কবিতাগুলি প্রধানতঃ সগূঢ়াত্মক দেব-তত্ত্ব এবং স্বর্গীয় প্রেমের উপর লিখিত; ইহার কবিতাগুলি সুরে বসাইয়া সুফি অর্থাৎ মুসলমানধর্ম্ম-সন্ন্যাসীরা গাহিয়া থাকেন; এই সকল গান গাহিবার সময় তাহাদের অন্তরে একরূপ ঘোর উচ্ছ্বাসের আবির্ভাব হয়; ইহাকে তাহারা ওয়াজদ্ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্রমাদ কহে।

শ্রীহিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ষ্টারে চন্দ্রশেখর।

উপযুক্ত চরিত্র সৃষ্টিই কাব্যের চরমোৎকর্ষ—আদর্শ চরিত্র সৃষ্টিই কাব্যের সফলতা। এই আদর্শ যদি প্রকৃত আদর্শ হয়, তবে উপন্যাসের মধ্য দিয়া যে শিক্ষা হয়, ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াও সেরূপ হয় না।

আদি কবিগুরুদের কত পরে কালিদাস জন্মিয়াছেন—তাঁহাদের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট উপকরণ লইয়া কালিদাস যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—তাহাতেই তাঁহার নাম সর্ব্বদেশে অমর হইয়াছে। মহাভারতের শকুন্তলায় ও তাঁর শকুন্তলায় কত প্রভেদ। ভবভূতি উত্তর-রামচরিতে রামের যে আদর্শ লোকের সম্মুখে ধরিয়াছেন—তাহাতেই তাঁহার যশ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাকবি সেক্ষপীয়রকে চরিত্রাঙ্কনী প্রতিভায় কোন পাশ্চাত্য কবিই ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। Lape De Vega সহস্রাধিক নাটকে শত সহস্র ভিন্ন প্রকৃতির চিত্র আঁকিয়া যাহা না করিতে পারিয়াছেন সেক্ষপীয়র—কেবলমাত্র রোমিও জুলিয়েট, দেসডামিনা, প্রভৃতি দুই তিনটী চিত্রে তাঁহাকে কতনীচে ফেলিয়া—অমরত্ব লাভ করিয়াছেন—এই জন্যই গেটে, শিলার, হেইন্ প্রভৃতি কবি *উপন্যাসিকগণ পাশ্চাত্য সাহিত্য জগতে* এত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বাঙ্গালার উপন্যাসকারদিগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার চরমোৎকর্ষ উদাহরণ। তাঁহার সূর্য্যমুখী, শৈবলিনী, কুন্দ, কমলমণি, ভ্রমর, রজনী, লবঙ্গলতা, চঞ্চলকুমারী, শান্তি ও শ্রী, প্রফুল্ল ও দলনী কাব্য কাননের সম্যক প্রস্ফুটিত আনন্দ উদ্ভাসিত পবিত্র পারিজাত কুসুম। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি খুব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি আধফুটন্ত অবস্থাতেই সুগন্ধে প্রাণ মজাইতেছে—কতকগুলি সরলতা, মলিনতাতে আচ্ছন্ন হইয়া তাহার মধ্য হইতে একটী অদ্ভুত বৈদ্যুতিক শক্তি

মানব হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছে। উল্লিখিত স্ত্রীচরিত্রগুলি যেমন একদিকে এক শ্রেণীর আদর্শ আবার অন্যদিকে তেমনি প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, নগেন্দ্রনাথ, অমরনাথ, জীবানন্দ, গোবিন্দ লাল, রাজসিংহ প্রভৃতি আর এক ভাবের আদর্শ।

সৃষ্টসৌন্দর্য্যে বঙ্কিমের "বিষবৃক্ষ" ও "চন্দ্রশেখর" সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে। চন্দ্রশেখরের যাহা অভাব, রজনীতে তাহা পরিপূরিত। কিন্তু চন্দ্রশেখরে আমরা বিশেষ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া যে একটী অদ্ভুত জিনিস পাই—বিষবৃক্ষে তাহা আমরা পাই না। "চন্দ্রশেখরের" "প্রতাপ" সৃষ্টিসৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব উদাহরণ। বঙ্কিম বাবু নিতান্ত সাহসী কবি নিতান্তইনাকি আধ্যাত্মিক তেজপূর্ণ, এই আর্য্য ভূমিতে জন্মিয়াছেন তাই প্রতাপের ন্যায় তেজোময় চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রতাপকে লইয়া চন্দ্রশেখরের মেরু-দণ্ড সংগঠিত হইয়াছে। মজ্জারূপিণী শৈবলিনী তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রতাপ চরিত্র আরও দৃঢ় করিয়াছে। চন্দ্রশেখর সেই প্রতাপ শৈবলিনী সম্মিলিত, অপরিস্ফুট শরীর গ্রন্থির মধ্যে জীবনীশক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনটীর কাহাকেও পৃথক করিবার যো নাই। কাহারও শ্রেষ্ঠতা কমাইবার যো নাই—কাহাকেও অপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবার যো নাই—তাহা হইলেই যেন বোধ হয় কবির প্রতি আমরা মহা অত্যাচার করিলাম।

"চন্দ্রশেখরের" মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ও মনোবিজ্ঞানের কয়েকটী কূট সমস্যার মীমাংসা আছে। একটী অপূর্ব্ব উদ্দেশ্য সাধারণ চক্ষু হইতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ইহার গভীরতম স্তরে বিচরণ করিতেছে। চন্দ্রশেখরকে উপন্যাস বলিয়া ভাবিতে হয় ভাবিও গল্পচ্ছলে পড়িয়া যাও এক-রূপ দেখিবে। বিশেষ চিন্তার সহিত একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া চরিত্রগুলি আলোড়ন বিশ্লেষণ ও উৎক্ষেপণ করিয়া একটুবেশী নাড়িয়া চাড়িয়া যাও, আরও এক অদ্ভুত পদার্থ দেখিবে। মানবের শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তিগুলি যাহা না থাকিলে মানুষ মানুষ হইতে পারে না, চন্দ্রশেখরের সৃষ্ট চরিত্র কয়েকটীর সহিত পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদের কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধ পরিণাম, ইত্যাদি আলোচনা কর তাহা হইলে চন্দ্রশেখরের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে।

কবি নিজ সৃষ্ট আদর্শ চরিত্রগুলি কোন কোন স্থলে সৃষ্টির যথার্থ অনুকরণে কতকগুলি বা কল্পনা প্রভাবে নূতন সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়া থাকেন, কোনগুলি বা Subjective এবং কোনগুলি বা Objective হয়। কোনগুলির আদর্শ বা আমরা এই সংসারের মধ্য হইতে খুজিয়া লইয়া কার্লাইলের মতানুবর্ত্তী হইয়া আমরা সেইগুলির পূজা করি আর কতকগুলি বা আমাদের, দূরবগম্য, আয়াস প্রাপ্য আদর্শ বলিয়া তাহার অনুকরণ করিয়া থাকি।

চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের চরিত্র কেবল মাত্র হিন্দুর দেশেই সম্ভব। হিন্দু কবিই এই প্রকার আদর্শ চরিত্রের অবতারণায় সক্ষম। বিদেশীয় উপন্যাসে আমরা ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র দেখিতে পাই না। পাই না বলিয়াই তাহা পাঠ

করিয়া আমাদের সম্পূর্ণরূপে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। কর্ম্মক্ষেত্র ভারতে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আর্য্যভূমিতে—মানব-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম প্রবৃত্তিবিশিষ্ট এই এক সময়ে উন্নত ও আদর্শ, এখন অধঃপতিত হিন্দুজাতিতে কেবল প্রতাপের ন্যায় চরিত্রই সম্ভবে।

দুইটী বিভিন্নমুখী ঘটনা, একত্র করিয়া চন্দ্রশেখরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। একটা প্রতাপ শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরকে লইয়া একদিকে গিয়াছে—অপরটী মীর-কাশেম ও দলনীকে লইয়া। আবার এই দুইটী পৃথক ঘটনাস্রোত, কবির কৌশলে এক স্থলে আসিয়া মিশিয়া, পরস্পরের প্রতিঘাত-প্রতিঘাত উৎপাদন করিয়া উল্লিখিত দুইটী পৃথক ও বিভিন্ন-মুখী স্রোতকে একত্রিত করিয়াছে।

এক্ষণে বিবেচ্য এই—অদ্ভুত ঘটনা-ময় বিচিত্র চরিত্রপূর্ণ চন্দ্রশেখর পাঠ অপেক্ষা তাহার অভিনয়ে কোন বিশেষ লাভ আছে কি না? কবি চন্দ্রশেখর গ্রন্থকে যেরূপ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে, তাহার যে পূর্ণ নাটকীয় সৌন্দর্য্য সকল স্থলেই বিকশিত হইয়াছে এরূপ নহে। কোন স্থানে ভাব, খুব ফুটন্ত, কোথাও বা আধ বিকশিত। কোথাও বা মানব হৃদয়ের শ্রেষ্ঠভাবগুলি বর্ণনার পূর্ণ দীপালোকে—উজ্জলভাবে, সাধারণ-চক্ষের উপর জাগিয়া উঠিয়াছে—আবার কোথাও বা সেগুলিকে বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। চন্দ্রশেখর পাঠে যে ফল—অভিনয় দর্শনে সেই ফলের সার্থকতা। পাঠে—হৃদয় যে একটী অপূর্ব্বভাব কি--যেন কি-এক একটী সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ-স্রোতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—যথাযথ অভিনয় দর্শনে সেই অপূর্ব্ব ভাবের আরও পরিপুষ্টি হয়—সেই কি—যেন—কি—একটী ভাব যেন পূর্ণ-শক্তিতে উত্তেজনা আনিয়া দেয়। দৃশ্য-কাব্যখানি পড়িলে মনের ভাবগুলি কেবল মনের মধ্যেই উত্তেজিত ভাবে বিচরণ করিতে থাকে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয় দেখিলে সেই উত্তেজিত ভাবের সহিত একটা আকাঙ্ক্ষা, পরি-তৃপ্তি, চিত্তপ্রসন্নতা ও সর্ব্বাপেক্ষা একটী স্থায়ী সহানুভূতি, সৌন্দর্য্যবোধ, অত্যা-চারে ঘৃণা, পাপে বিতৃষ্ণা, প্রণয়ে দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যে কর্ম্মক্ষমতা প্রভৃতি ভাবের আবির্ভাব হয়। নাটক ছায়া—প্রকৃত অভিনয়, তাহার শরীর, নাটক, নাটক-তেজ, অভিনয় কার্য্যকারী ব্যক্তি, নাটক নীরব শিক্ষাদাতা, অভিনয় সজীব শিক্ষাদাতা। নাটকে আকাঙ্ক্ষা, অভি-নয়ে পরিতৃপ্তি, নাটকে পিপাসা, অভি-নয়ে নিবৃত্তি, নাটকে ইচ্ছা ও আগ্রহ, অভি-নয়ে তাহার সার্থকতা ও স্থিরতা। নাটকে যাহা পরিস্ফুট—অভিনয়ে তাহা আরও পরিস্ফুট, নাটকে যাহা ফুল—অভিনয়ে তাহা গন্ধ, পাঠের ফল নির্ব্বাক্,—হৃদয়ের এক কেন্দ্রগত; অভিনয়ের ফল স্ফুটবাক্, হৃদয়ে বৈদ্যুতিক ইতস্ততঃ ব্যাপী তেজ-সঞ্চারকারী। কাব্য বৃক্ষ, অভিনয় ফল, কাব্য-সৌন্দর্য্য, অভিনয় উপভোগ, কাব্য-কোমলতা, অভিনয় স্পর্শজ্ঞান, কাব্য-মেঘ, অভিনয় জল, কাব্য-তেজ, অভিনয় বিদ্যুৎ। একে উত্তেজনা অপরে স্থায়ীভাব, একে আকাঙ্ক্ষা অপরে তাহার চরিতার্থতা, একে বাসনা অপরে তাহার সার্থকতা, একে বিলাস অপরে তাহার পরিতৃপ্তি। যাহা কল্পনার—

অভিনয়ে তাহা সত্য, যাহা অপরিস্ফুট—অভিনয়ে তাহার পরিস্ফুট, যাহা নিদ্রিত—অভিনয়ে তাহা জাগরিত। অভিনয়ের ফল এত বলিয়াই "টুকী" আখ্যাধারী নাট্য-সম্প্রদায় নরপিশাচ নাদের সাহের সম্মুখে অভিনয় দ্বারা দিল্লীর হত্যাকাণ্ড হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

মূল পুস্তক বঙ্কিম বাবুর। নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন নটপ্রবর বাবু অমৃতলাল বসু। অমৃত বাবু কেবল দক্ষ অভিনেতা নহেন। তিনি নিজে একজন বিখ্যাত নাট্যকার। তাঁহার "তরুবালা" একখানি মনোহর নাটক। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর এরূপ নাটক বাঙ্গালার নাটকীয় সাহিত্যে অতি অল্পই জন্মিয়াছে। বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরের নাটকাকারে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অমৃত বাবু বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছেন। কবির সৃষ্ট সৌন্দর্য্যগুলির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া Dramatise করিবার জন্য তিনি বিশেষ পরিশ্রম, চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। নিজে যে সকল স্থানে কলম চালাইয়াছেন, নূতন দুই চারিটী চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে নাটকীয় সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তিনি বিশেষ সাবধানতার সহিত কবির সৃষ্ট-সৌন্দর্য্য ও ভাবের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "চন্দ্রশেখর" নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার হাতে চন্দ্রশেখরের মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে, ইহাতে আমরা তত সন্তুষ্ট নহি কিন্তু কোন প্রকারে মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য হানি হইলে, আমাদের দুঃখের ইয়ত্তা থাকিত না।

চন্দ্রশেখরের প্রথম ও প্রধান চরিত্র প্রতাপ। নাটকের যে টুকু Romance তাহা প্রতাপকে লইয়া। প্রতাপ-শৈবলিনী এক বৃন্তে দুইটী ফুল। প্রতাপ কিশোর বয়স্ক, শৈবলিনী সাত আট বৎসরের বালিকা। বালক-বালিকা ভাগিরথী তীরে বসিয়া সান্ধ্য-জলকল্লোল শ্রবণ করিত, নীলাকাশে তারকা গুণিত, মালা লইয়া বিবাদ করিত, নৌকা গুণিত, নৌকার দাঁড়ের জলে কেমন সোনা জ্বলিত তাহাই দেখিত।

কিন্তু "বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে" কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক; প্রতাপ-শৈবলিনার বিবাহ হইল না—সমাজ প্রতিবন্ধকতা করিল। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা, ভালবাসা হইল—সেই ক্ষুদ্র, পবিত্র পারিজাতবৎ শুভ্র সৌন্দর্য্যশালী কোমল হৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইল, কিন্তু ফলিল না। দুইটী একমুখগামী তরঙ্গ একদিকে তীব্র বেগে আসিতেছিল, সহসা বাধা পাইয়া দুইটী বিভিন্ন মুখে প্রতিধাবিত হইল।

"বাল্য প্রণয়ে অভিশাপ" থাকিলেও, সমাজ প্রতিবন্ধকতা করিলেও "অঙ্কুরে বীজের" গুণ কোথায় যাইবে? প্রতাপ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিল, কিন্তু তখন কিশোর-যৌবনের সন্ধিস্থল। যৌবনের আধ ফুটন্ত, উদ্দাম প্রবৃত্তি সে কথঞ্চিৎ দমন করিল বটে, কিন্তু শৈবলিনী তাহাও পারিল না। শৈবলিনী জীবনেও এ প্রকৃতি দমন করিতে পারে নাই। তাই চন্দ্রশেখর এত পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

তখনও শৈবলিনীর অন্যত্র বিবাহের সম্বন্ধ হয় নাই। অবস্থা হীনতাই তাহার

মূল কারণ। প্রতাপ শৈবলিনী নিজ নিজ অবস্থা বুঝিল, একদিন গোপনে মন্ত্রণা করিয়া উভয়ে গঙ্গাস্নানে গেল। প্রতাপ শৈবলিনীকে ডাকিল—"আয় শৈবলিনী সাঁতার দিই।" অনেক দূর গিয়া প্রতাপ বলিল—"শৈবলিনি! এই আমাদের বিয়ে।" শৈবলিনী বলিল—"আর কেন এইখানেই", প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। তাহার কারণ শৈবলিনীর উপাদানে আকাঙ্ক্ষা বলিয়া একটা পদার্থ ছিল। এই "আকাঙ্ক্ষা" তাহাকে আজীবন পবিচালিত করিয়াছে। "আকাঙ্ক্ষার" পতন—"পরিরতৃপ্তিতে"। "পরিতৃপ্তি" তখন কোথায়? শৈবলিনী ভাবিল—"প্রতাপ আমার কে? আমার ভয়করে আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে আসিল।

"আত্মবিসর্জ্জনের" এই খানেই প্রথম প্রতিষ্ঠা হইল। কবি যে অপূর্ব্ব চিত্র ভবিষ্যতে চিত্রিত করিবেন তাহার প্রথম রং এইখানেই ফলান হইল। শৈবলিনী-প্রতাপ নাটকের বীজ এইখানেই প্রোথিত হইল।

প্রতাপ মরিল না—একজন নৌকারোহী তাহাকে আসিয়া উদ্ধার করিলেন। উদ্ধার কারী স্বয়ং চন্দ্রশেখর। ইহার পর প্রতাপ শৈবলিনীর মধ্যে আর একটী দুশ্ছেদ্য ব্যবধান জন্মিল চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইল।

এই ঘটনার পর হইতে প্রকৃত নাটকের সূচনা হইয়াছে। অমৃত বাবু এইখান হইতেই তাহার অনুসরণ করিয়াছেন।

প্রতাপ শৈবলিনী বিচ্ছিন্ন হইল। আজন্ম বর্দ্ধিত মাধবী সহকার হইতে চ্যুত হইয়া অপর এক মহাতরুর সহিত সম্মিলিতা হইল। চন্দ্রশেখর বিবাহ করিলেন দুইটী উদ্দেশ্যে—এক বিবাহ না করিলে তাঁহার সংসার চলেনা; সংসারিক কার্য্যে নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে গেলে তাঁহার আযৌবন পরিপুষ্ঠ শাস্ত্র চর্চ্চায় ব্যাঘাত হয়। তার উপর শৈবলিনী সুন্দরী—

শৈবলিনী জীবনের এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনে অপরের ধর্ম্ম পত্নী হইয়াও প্রতাপকে ভুলিতে পারিল না। দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তখন তাহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্তরে স্তরে জ্বলিতে ছিল। প্রতাপ যখন বেদগ্রামে আসিয়া চন্দ্রশেখরের বন্দোবস্ত অনুসারে সুন্দরীর ভগিনী রূপসীকে বিবাহ করিলেন তখন উভয়ের আবার দেখা সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। প্রতাপ সে কথাটা বড় স্থির ভাবে আলোচনা করিয়া শৈবলিনার "বিষের ভয়ে" বেদগ্রাম ত্যাগ করিলেন।

শৈবলিনীর বাল্য প্রণয়—যৌবনের সমাগমে আরও বাড়িয়া উঠিল। একদিকে আসঙ্গ লিপ্সা অপর দিকে সমাজ, একদিকে প্রবৃত্তি অপর দিকে নিবৃত্তি একদিকে সংসার ধর্ম্ম অপর দিকে প্রেমধর্ম্ম, একদিকে বিরাগ অপর দিকে অনুরাগ, শৈবলিনীর সেই ক্ষুদ্র হৃদয়কে আরও আলোড়িত করিয়া তুলিল। প্রতাপ শৈবলিনীর সম্মুখ হইতে পলাইলেন বটে, কিন্তু তাহার মনোরাজ্য তিনি পূর্ণ প্রভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার বিবাহ শরীরের—মনের বিবাহ প্রতাপের সঙ্গে। শৈবলিনী ও প্রতাপের প্রেম, রোমিও

জুলিয়েটের মত প্রথম সন্দর্শন জনিত নহে। তাহা হইলে সব আপদ চুকিয়া যাইত। এ প্রেম বাল্য পরিপুষ্ট, কিশোরে পরিমার্জ্জিত, যৌবনে সম্যক উদ্ভাসিত। শৈবলিনী প্রতাপের জন্য ব্যাকুল হইল দেশ না ছাড়িলে সে প্রতাপের সহিত মিলিত হইতে পারিবেনা কাজেই সে ফষ্টরের সঙ্গে দেশত্যাগ করিল।

"আকাঙ্ক্ষা" অপেক্ষা ভয়ানক পদার্থ আর বুঝি কিছুই জগতে নাই। ইহা নির্জ্জীব হৃদয়ে তাড়িত শক্তি উচ্ছাসিত করিয়া দেয়; ভীতকে সাহসী করে। প্রেমের প্রথম অবস্থায় "আকাঙ্ক্ষা" বড় প্রচ্ছন্ন থাকে। "প্রেম" "রিপুতে" পরিণত হইলে "আকাঙ্ক্ষা" তাহার সহিত সাহস ও উৎসাহ আনিয়া দেয়। শৈবলিনীর তাহাই হইয়া ছিল। শৈবলিনী অসীম সাহসে ভর করিয়া গৃহত্যাগ করিল। ফষ্টর কেবল তাহার কার্য্যোদ্ধাবের অতি সামান্য অধিরোহণী—কিন্তু যতটা প্রথমে সহজ বোধ হইয়া ছিল শেষটা ততটা রহিল না। শেষ ঘটনাবশে প্রতাপকেই শৈবলিনীর উদ্ধাব জন্য ধাবিত হইতে হইয়াছিল। এই খানেই কবি—সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের আর একটী মুখ খুলিয়া দিয়াছেন। প্রতাপ শৈবলিনী উদ্ধার করিল নিজের স্বার্থে নহে, শৈবলিনীর জন্যও নহে কেবল চন্দ্রশেখরের জন্য, যে চন্দ্রশেখর তাহাকে জীবন দিয়াছেন, যাঁহা হইতে তিনি দারিদ্রতার ভীষণ ক্রোড় মুক্ত হইয়া একজন "মান্যগণ্য" জমিদার হইয়াছেন সেই চন্দ্রশেখরের স্ত্রী সেই শৈবলিনী।

শৈবলিনী—ফষ্টর সঙ্গ মুক্তি লাভের পর ঘটনাবৈগুণ্যে প্রতাপের গৃহেই স্থান প্রাপ্ত হইল। প্রতাপ বাড়িতে আসিয়া দেখিলেন পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী। প্রতাপ "জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন শ্বেত শয্যার উপর কে যেন নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুম রাশি ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে, প্রতাপ স্থির হইয়া সেই অনিন্দ্য যৌবন প্রস্ফুটিত মনোমোহিনী মুর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তিনি ইন্দ্রিয় জয়ী বীর পুরুষ, ইন্দ্রিয় বশ্যতা তাহার এতাদৃশ আগ্রহময় দর্শন কারণ নহে। একটা অতি সুন্দর কিছু দেখিলে যেমন লোক বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া থাকে ইহাও সেই রূপ।" অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল, সহসা স্মৃতি সাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী নিদ্রাযান নাই—মুদ্রিত নয়নে নিজের অবস্থা ভাবিতে ছিলেন। এত চিন্তায় মগ্ন যে প্রতাপের পদধ্বনিতেও তাহাব মনোযোগ আকর্ষিত হয় নাই, সহসা দেয়াল রক্ষিত বন্দুক পতনের শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল শৈবলিনী চাহিয়া দেখিল সম্মুখে প্রতাপ, সেই প্রতাপ যাহার জন্য সে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল—যে প্রতাপকে নেত্র সম্মুখে রাখিয়া সে পাপিষ্ঠা ফষ্টরের সহিত কথা কহিতে সাহসী হইয়াছিল যে প্রতাপ তাহার জন্য জলে ডুবিয়াছিল কিন্তু সে ডুবে নাই, যে প্রতাপের অনুসন্ধানে সে এত কাণ্ড করিয়া কৃতকার্য্য হয় নাই, সেই প্রতাপ তাহার সম্মুখে। শৈবলিনী আশ্চর্য্যে বলিল—একি এ? কে তুমি?

আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু, যাহা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই—যাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গিয়াছে-যাহার জন্য অনেক কষ্ট

সহ্য করিতে হইয়াছে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ঘুরিয়াছে। তথাপি তাহাকে পাই নাই—সেই আকাঙ্ক্ষার জিনিস যদি সহসা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় ও তাহাতে আসঙ্গ লিপ্সা, অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা দুর্দ্দমণীয় উত্তেজিত মনোবৃত্তি নিরাশায় আশার সঞ্চার, উপস্থিত হইলে মানব প্রকৃতি যেরূপ হওয়া সম্ভব শৈবলিনীরও সেইরূপ হইল—এই গুলি শৈবলিনীর হৃদয়ে—একটী অভূতপূর্ব্ব, অননুভূত উত্তেজনার সৃষ্টি করিল সেই উত্তেজনার—তড়িৎ শক্তিতে শৈবলিনী সংজ্ঞা হারাইল।

ইন্দ্রিয় বিজয়ী বীর প্রতাপের মহা পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। প্রতাপ অপূর্ব্ব আন্তরিক বারত্বের পরিচয় দিয়া শৈবলিনীর সংজ্ঞা প্রদান করিলেন, শৈবলিনী স্থিরভাবে বলিল, "কে তুমি? প্রতাপ!" না কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ?

শৈবলিনী বিমুগ্ধা কিন্তু প্রতাপ প্রকৃতিস্থ—শৈবলিনী উত্তেজিতা, প্রতাপ, অচঞ্চল সমুদ্রবৎ স্থির, প্রতাপ বলিলেন "আমি প্রতাপ?"

"তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

প্রতাপ বলিলেন—এই আমার বাসা শৈবলিনীর হৃদয় মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল তাহার নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছিল, সে বলিল, আমায় এখানে কে আনিল?

প্র। আমরাই আনিয়াছি।

শৈ। আমরাই? আমরা কে?

প্র। আমি ও আমার চাকর।

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন "তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম, তুমি আবার বল—এখানে কেন আনিলে?"

শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিল না, বিনীত ভাবে বাস্প গদগদ হইয়া বলিলেন "যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়া ছিলে, তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।"

প্রতাপ বলিলেন—"তাও করিতাম কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই। তোমার মরণই ভাল।"

শৈবলিনী কাঁদিল—রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল আমার মরাই ভাল, কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হইতে? তোমা হইতে। কে আমার জীবনকে অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার আশায় কুপথ সুপথ জ্ঞান শূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য! কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য গৃহ ধর্ম্মে মন রাখিতে পারি নাই? তোমার জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।"

প্রতাপ বলিলেন, "তুমি পাপিষ্ঠা তাই তোমায় গালি দিই, আমার দোষ! ঈশ্বর জানেন আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন ইদানীং সর্প মনে করিয়া আমি তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া ছিলাম তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ তোমার প্রকৃতির

দোষ; তুমি পাপিষ্ঠা তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি।”

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল, “তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে! আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কালে কেন তুমি ও রূপের জ্যোতি আমার সম্মুখে জ্বালিয়া ছিলে! যাহা একবার ভুলিয়া ছিলাম, তাহা আমার কেন আমার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়া ছিলাম? দেখিয়া ছিলাম ত তোমায় পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জাননা তোমার রূপ ধ্যান করিয়াই গৃহ আমার অরণ্য হইয়া ছিল? তুমি কি জাননা যে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, যদি কখন তোমায় পাইতে পারি এই আশায় গৃহ ত্যাগিনী হইয়াছি। নহিলে কণ্টক আমার কে?

যে কথা কবি এতক্ষণ কৌশল করিয়া প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন যাহা পাঠকের জানা দূরে থাক্—প্রতাপই জানিতে পারেন নাই পাপিষ্ঠা শৈবলিনী—সেই কথাই নিজমুখে ব্যক্ত করিল।

“তোমার মরণই ভাল” “তুমি পাপিষ্ঠা” এই কথাগুলি শৈবলিনীর হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। যাহার জন্য সে সর্ব্বত্যাগিনী তাহার এই কথা!! ক্রুদ্ধা শৈবলিনী ভাবিল, “প্রতাপ আমার কে? কে তাহা জানিনা কিন্তু সে শৈবলিনী পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি। সে এই সংসার প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহ ত্যাগ করিলাম কেন ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?”

শৈবলিনী—যখন কিছু বুঝিত না, তখন তাহার প্রবল প্রণয় স্রোতে, সমাজ আসিয়া বাধা দিয়াছিল। তখন স্রোত ও তত খর ছিলনা। এখন যৌবনের ষোলকলা ভরিয়া উঠিয়াছে। শৈবলিনীর চক্ষু ফুটিয়াছে—দুর্দ্দমনীয় প্রেম তাহাকে সমাজ বিগর্হিত, ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করাইয়াছে—তাহার উপর আবার বাধা!! শৈবলিনী—মহা নিরাশায় ভাসিল, অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। আবার বেদগ্রাম—বেদগ্রামের সুখস্মৃতি, চন্দ্রশেখরের দেবতুল্য হৃদয়ের অপার স্নেহ—সবই মনে পড়িল। কবির প্রথম পরিচ্ছেদে নিহিত বীজের ফলোৎপাদন হইল।

ভাবিল —প্রতাপ শৈবলিনীর জন্যই ইংরাজ হস্তে বন্দী হইলেন। শৈবলিনী এখন প্রতাপের উপর রাগ ভুলিয়া—নিরাশা ভুলিল, তাহাকে ইংরাজ হস্ত হইতে উদ্ধার করিল। কিন্তু তখনও প্রতাপ দৃঢ় তখনও তিনি শৈবলিনীর “বিষের ভয়ে আকুল”। তখনও চন্দ্রশেখরের সুখের জন্য আত্মবলি দিতে প্রস্তুত।

এদৃশ্য মহা পরীক্ষার। উভয় পক্ষেই আত্মত্যাগ আবশ্যক। কিন্তু এক পক্ষে সাহস অপর পক্ষে ভয়। এক পক্ষে আসক্তি অন্য পক্ষে বিরক্তি—মহা—পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া উভয়ে নদীতে সাঁতার দিতেছে।

উপরে চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদের কিরণ জাহ্নবীর চঞ্চল তরঙ্গ মালায় প্রতিহত হইয়া শত শত হীরক চূর্ণ উচ্ছসিত করিতেছে। প্রতাপ আজ ইন্দ্রিয় বিজয়ী মহাপুরুষ—মহাপরিক্ষায় তিনি উদ্যোগী

হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার আনন্দ। তাঁহাদের জীবনে প্রথম সন্তরণের দিন প্রতিষ্ঠার,—আজ বিসর্জ্জনের; প্রতাপ প্রফুল্ল; শৈবলিনী বিষণ্ণা—শৈবলিনীর হৃদয়ের মরা গঙ্গায় প্রতাপচন্দ্রের মনোহর জ্যোতি আজ অনেক দিনের পর পড়িয়াছে তাহার উপর আবার প্রতাপ সেই চির প্রিয় বাল্য সম্বোধন—"শৈবলিনী সৈ" বলিয়া ডাকিয়াছে। সে আবার কতকাল পরে!! তাই হতভাগিনী শৈবলিনী বলিল, প্রতাপ! আজি এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

প্রতাপ বলিল—চাঁদের! না সূর্য্য উঠিয়াছে।

শৈ। চল তীরে উঠি।

প্র। সৈ—

আবার "সৈ"

শৈ। কি

প্র। মনে পড়ে?

শৈ। কি

প্র। আর এক দিন এমনি সাঁতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী—তখন ক্লান্ত, একখণ্ড কাষ্ঠ পাইয়া প্রতাপকে বলিল—"ধর" ভর সহিবে।

প্রতাপ বলিল—

মনে পড়ে—তুমি ডুবিতে পারিলে না আমি ডুবিলাম?

শৈ। মনে পড়ে। তুমি যদি সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?"

বড় শক্ত কথা। গভীর সমস্যা। কে বল দেখি ইহার রহস্য ভেদ করিবে? প্রতাপ বলিলেন—"তবে মনে আছে যে আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি।

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল—"চল প্রতাপ চল তীরে উঠি?

প্র। আমি উঠিবনা আজি মরিব। প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।

শৈ। কেন প্রতাপ?

প্র। তামাসা নয়—নিশ্চিত ডুবিব। তোমার হাত। শৈবলিনীর হাত! আজ এতস্থলের মাঝে এত দুঃখের মাঝে তাহার হাত। সে ইচ্ছা করিলে প্রতাপ বাঁচিতে পাবে! শৈবলিনী তাহা করিতে প্রস্তুত। বলিল—

কি চাও প্রতাপ! যা বল তাই করিব।

প্র। একটী শপথ কর—তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ প্রতাপ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল। তাহার চক্ষে তারা সব নিবিয়া গেল। সে শপথ কি তাহা বুঝিতে পারিল। নীলজল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। শৈবলিনী রুদ্ধশ্বাসে বলিল-কি শপথ প্রতাপ? শপথ যে কি তাহা কি শৈবলিনী বুঝে নাই!!

প্র। এই গঙ্গার জলে—

শৈ। আমার গঙ্গা কি?

প্র। তবে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বল।

শৈ। আমার ধর্ম্মই বা কোথায়?

প্র। তবে আমার শপথ।

শৈ। কাছে আইস হাত দাও।

বহুকাল পরে প্রতাপ শৈবলিনীর হাত ধরিল।

শৈ। এখন যে কথা বল শপথ করিয়া বলিতে পরিব। কতকাল পরে প্রতাপ!!

প্র। শপথ কর—নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া এ পাপ জীবনের ভার সহিতে চায়? চাঁদের আলোয় এ স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ

বোঝা নামাইতে পারি—তবে তার চেয়ে আর সুখ কি ?

শৈ। তোমার শপথ—কি বলিব ?

প্র। শপথ কর, আমায় স্পর্শ করিয়া শপথ কর— আমার মরণ বাঁচনের শুভাশুভের তুমি দায়ী।

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে ইহার জন্যে তাহাই আমার স্থির।

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন—অতিশয় মর্ম্মঘাতী, তাহার পালন অসাধ্য। প্রাণান্তকর। শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না, বলিল—

"এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে প্রতাপ"। পাঠক ! এমন মর্ম্মভেদী কথা কি কখন শুনিয়াছেন ?

প্র। আমি।

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে, কীর্ত্তি-আছে, বন্ধু আছে—ভরসা আছে, রূপসী আছে, আমার এক আছে প্রতাপ ?

প্র। কিছু না আইস তবে ডুবিয়া মরি।

এবার শৈবলিনীর চিন্তা নূতন ধরনের। অনেক দিন পূর্ব্বে সে যখন সাঁতার দেয়, তখন বলিয়াছিল—"প্রতাপ আমার কে ?" এখন ভাবিল, "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি ? আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন ?"

শৈবলিনী শপথে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া প্রতাপ আবার ডুবিল—শৈবলিনী আবার প্রতাপের হাত টানিয়া তুলিল—সে বলিল "আমি শপথ করিব। তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাহি না, তোমার চিন্তা ছাড়িব কেন ?" কি গভীর আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ প্রেম !! শেষ হতভাগিনী শৈবলিনী শপথ করিল, পবিত্র প্রেমের নিকট আপনার সর্ব্বস্ব বলি দিল, বলিল—"প্রতাপ হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ শুন। তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ—আজি হইতে তোমায় ভুলিব—আজি হইতে আমার সর্ব্ব সুখে জলাঞ্জলি—আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

বস্তুতঃ এইখানে শৈবলিনী মরিল। আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি, আশার সমাধি, নূতন শৈবলিনী গঠন করিল। ইহার পর সে যাহা হইল, তাহার পূর্ব্ব চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

তার পর শেষ দৃশ্যে প্রতাপের সহিত আমাদের শেষ দেখা। সে দৃশ্য অতি ভয়ানক—ভীতিবিধায়ক। বোধ হয়, সেরূপ দৃশ্য চন্দ্রশেখরে আর নাই। তাহার পূর্ব্বে আমরা চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব।

চন্দ্রশেখর আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ হইতে পারিতেন, কিন্তু কবি বরাবর তাঁহাকে উচ্চ রাখিয়া একস্থলে বড়ই নীচে ফেলিয়া দিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের প্রথম কার্য্যে-পরিচয় প্রতাপের উদ্ধার-সম্পাদনে। তিনি কি ধাতুতে নির্ম্মিত, ইহাতেই তাহার প্রথম আভাস। "তিনি ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত" শাস্ত্রপাঠ তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, শৈবলিনীকে

বিবাহ করিবার পরও তিনি সে কর্ত্তব্য ভুলেন নাই। শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম। তিনি স্বামীর মত স্বামী, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি সেরূপ করিতে জানেন না। বিধাতা তাঁহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। অধীত গ্রন্থগুলি হৃদয় শোণিতবৎ তাঁহার জীবনের সঙ্গী ছিল, কিন্তু শৈবলিনীর গৃহত্যাগের পর তিনি সেগুলিকেও অগ্নিসাৎ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী তাঁহার গৃহে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার গৃহ যেমন ছিল, চলিয়া যাইবার পর তাহা অপেক্ষাও ভীষণ হইল।

তার পর চন্দ্রশেখরের পরোপকার প্রবৃত্তি। তাঁহার পরোপকার যে নিস্বার্থ,—কেবল নিষ্কাম ধর্ম্মাশ্রয়ী হিন্দুরই উপযুক্ত আর সে পরোপকারিতা ধর্ম্ম যে কেবল কর্ম্মক্ষেত্র ভারতেই সম্ভব ইহার পরিচয়—পথপরিত্যক্তা-দলনী, কলঙ্কিনী শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার ব্যবহারেই বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখর যেরূপ বরাবর অদ্ভুত দয়া প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, গৃহত্যাগিনী কলঙ্কিনী ভার্য্যার বিরহে তিনি যেরূপভাবে সন্ন্যাসীবৎ সংসার-সমুদ্রে বিচরণ করিয়াছেন, মহাপাপিনী শৈবলিনী যেমন পাপ স্বীকার করিল, অমনি তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া দয়ার পাত্রী ভাবিয়া যেরূপ ভাবে উদারতার সহিত পরিচর্য্যা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার উদারতায় আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও সন্দেহান্বিত হই। কিন্তু শৈবলিনী প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারে শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার উদারতা ও সদ্ব্যবহার ঐ প্রকার ঘটনাস্থলে সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাঁহার প্রকৃত আদর্শে যেন একটু কলঙ্কের ছায়া পড়ে। কবি কেন যে এইখানে চন্দ্রশেখরের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক চরিত্র একটু মলিন করিয়া দিলেন, তাহা বড়ই রহস্যজনক। প্রায়শ্চিত্তের পরও শৈবলিনী যেরূপভাবে চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক আদৃতা ও পরিগৃহীতা হইলেন, তাহাতে "চন্দ্রশেখর" চরিত্রে একটী আমাদের সহজ জ্ঞান বিরোধী উদারতার প্রকৃত উদাহরণ পাওয়া যায়।

এক্ষণে অভিনয়সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলা আবশ্যক। তিনটী বিষয় লইয়া অভিনয়ের সার্থকতা হয়। (১) দৃশ্যপট ও বেশভূষা, (২) পাত্রনির্ব্বাচন, (৩) গ্রন্থনিহিত চরিত্রচয়ের মর্য্যাদা বুঝিয়া অভিনয়। দৃশ্যপট ও বেশভূষা ঠিক কাব্যনিহিত সময়ের ঘটনাবলীর অনুরূপ হইয়াছে। প্রথম দৃশ্য ভীমা পুষ্করিণী, চারিদিকে ঘন তাল গাছের সারি, অস্তগামী সূর্য্যের হেমাভ কিরণ সেই তরুশিখরে পড়িয়াছে, শৈবলিনী ও সুন্দরী আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া ভীমার জলে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে ধীরে ধীরে লরেন্স ফষ্টরের প্রবেশ বেশ স্বাভাবিক। গুরগন খাঁর মুঙ্গেরের দুর্গ, পার্শ্ব-প্রবাহিনী জাহ্নবীর মনোমোহিনী দৃশ্য বেশ সুসঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী।

তার পর গঙ্গাবক্ষে শৈবলিনী ও প্রতাপ। উভয়ে সন্তরণ করিতেছেন, গঙ্গায় চাঁদের আলো পড়িয়াছে, স্রোতে স্রোতে, তরঙ্গে তরঙ্গে, সেই কিরণরাশি, মিশ্রিত, স্ফুটিত, চূর্ণীকৃত হইয়া আধ অন্ধকার, আধ আলো, আধ সজীব, আধ নির্জ্জীব ভাবের মধ্যে থাকিয়া অদ্ভুত

শোভার বিস্তার করিতেছে, শৈবলিনীর কেশরাশি জলসিক্ত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! উভয়েরই ক্লান্তি, অবসাদজনিত কষ্টশ্বাস, আর তাহার মধ্যে ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে প্রতাপের "সৈ" "শৈবলিনী" সম্বোধন—শৈবলিনীর শপথ,প্রতাপের আত্মবিসর্জ্জন দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। ষ্টারের অভিনয়ের সমস্ত কথা ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব হইলেও, গঙ্গাবক্ষে এই মহান্ দৃশ্য ও রণক্ষেত্রের বিভীষিকাময় শেষ অঙ্ক স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলা একটু অসম্ভব বোধ হয়।

পাত্র-নির্ব্বাচনে অমৃত বাবু কৃতিপুরুষ, "চন্দ্রশেখরের" প্রধান প্রধান পাত্রগুলি, যাঁহারা দক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী বলিয়া বিখ্যাত তাহাদেরই দেওয়া হইয়াছে। "চন্দ্রশেখরের" প্রধান চরিত্র গুলি, অর্থাৎ চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও প্রতাপ কবির স্বষ্ট সৌন্দর্য্যের ও আরোপিত ভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অভিনীত হইয়া ছিল। কিন্তু এই দুই অংশ যাঁহারা অভিনয় করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ—যিনি "চন্দ্রশেখর" তিনি ষ্টার মঞ্চের একজন অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা অভিনেতা। চন্দ্রশেখরের অংশ তাঁহার ন্যায় কৃতীলোকদ্বারা আরও উজ্জ্বল ও আবেগময়ী ভাবে অভিনীত হইয়া কবির কল্পনা সৌন্দর্য্যের পুর্ণতায় উপস্থিত হইবে, আমরা এরূপ প্রত্যাশা রাখি। প্রতাপ চরিত্র ঠিক বঙ্কিম বাবুর চিত্তনিহিত কল্পনানুযায়ী যথাযথ ভাবে অভিনয় করা সম্পূর্ণ সম্ভব ও সহজসাধ্য কি না এ বিষয়ে আমাদের একটু সন্দেহ আছে। "প্রতাপ" চরিত্র যাহা ফুটিয়াছে তাহাতে অভিনেতার বিশেষ প্রশংসা করা যায়। কিন্তু তদপেক্ষা তিনি কি আরও ফুটিয়া উঠিতে পারেন না? আর এরূপ আশাও কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? কখনই নহে।

তার পর শৈবলিনী—

শৈবলিনীর চরিত্রে কবি প্রকৃতিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, প্রতাপে লোকধর্ম্মের তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন। একজনকে ইহলোকের সজীব সাক্ষ্য করিয়া কবি সৃষ্টি করিয়াছেন; অপরকে পরলোকের উপযুক্ত করিয়াছেন। এইজন্যই আমরা বলিতেছি, শৈবলিনীর অভিনয় সকলকে ছাড়িয়া না উঠিলে পুর্ণসৌন্দর্য্য অনুভূতি সম্বন্ধে একটু অপেক্ষা থাকে; কিন্তু এসম্বন্ধে আমাদের মনক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। শৈবলিনীর অংশ আদ্যোপান্তই কবির সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা ও স্থলে স্থলে তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বল অভিনয় হইয়াছিল।

ইহার পর অন্যান্য চরিত্র, যাহারা চন্দ্রশেখরের আশে পাশে, অথচ মধ্যে মধ্যে প্রস্ফুট ও অস্ফুট ভাবে বিজড়িত। ইহাদের মধ্যে মীরকাশেম লরেন্স ফষ্টর সর্ব্বপ্রধান। ফষ্টর না হইলে, শৈবলিনী এত স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিত না। অভিনয়াংশে ধরিতে গেলে নাট্যশালার অধ্যক্ষ ফষ্টরের আকৃতি প্রকৃতিতে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে "জন—কোম্পানীর" কর্ম্মচারীর প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত করিয়াছেন। হাবভাবে, কার্য্যে, কর্ম্মক্ষেত্রে ফষ্টর ইংরাজ-প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অভিনয় করিয়াছেন। মীর কাশেম বাঙ্গালার শেষ মুসলমান ভূপতি। মীর কাশেমকে বঙ্কিম বাবু বিশেষরূপে ফুটাইয়া তোলেন

নাই। বোধ হয় তাহার ততটা আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। অমৃত বাবু মীর কাশেমকে আরও পরিস্ফুট করিয়া দর্শকের চক্ষে ধরিয়াছেন। মীর কাশেম দলনী ও সুন্দরী অতি সুসঙ্গত ও সুন্দরভাবে অভিনয় করিয়াছে।

অমৃত বাবু চন্দ্রশেখরে এমন ভাবে দুই একটী নূতন পার্শ্ব চরিত্রের (Supplementary Character) অবতারণা করিয়াছেন যে, তাহাদের মূলগ্রন্থের সহিত কোন সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় নাই। এগুলি সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য। এমন অনেক দর্শক আছেন, যাঁহারা চন্দ্রশেখরে নাচ গান আমোদ প্রমোদ বেশী নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই সকল প্রকৃতিবিশিষ্ট লোককে ভুলাইবার জন্য, ভিন্ন রুচির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই চরিত্রগুলির অবতারণা। ইহাদের মধ্যে গন্ধগোকুল কিছু বেশী আমোদ করিয়া যান।

শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ দৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্র। দৃশ্যসম্বন্ধে ইহাও উৎকৃষ্ট। রণস্থলে মৃত অশ্বের উপর পিঠ দিয়া পড়িয়া প্রতাপ। সেই শৈবলিনীর প্রতাপ—যে শৈবলিনীর জন্যই রণক্ষেত্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছিল। সেই প্রতাপ, যে শৈবলিনীর "তুমি জীবিত থাকিলে আমি সুখী হইব না" এই মর্ম্মঘাতী কথা শুনিয়া, জীবনকে অতি তুচ্ছ ভাবিয়া, হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছিল। যে প্রতাপ যে প্রথম হইতেই আত্মত্যাগী, যে প্রতাপ নিঃস্বার্থ-প্রণয়ী, যে প্রতাপ ইন্দ্রিয়জয়ী, যে প্রতাপ বাসনাকে কর্ত্তব্যের মন্দিরে বলি দিয়া মহাপুরুষ—যে প্রতাপ ইহকালের নয়—পরকালের, যে প্রতাপে চন্দ্রশেখরের "প্রতিষ্ঠা"; এই দৃশ্যে সেই প্রতাপের "বিসর্জ্জন" দেখিয়া হৃদয়ে শত শত শোকপ্রবাহ ছুটিতে থাকে। শৈবলিনীকে অমর-কবি যবনিকা পতনের পূর্ব্বেই মনের সকল কথাই বলাইয়াছেন; কিন্তু প্রতাপ বলেন নাই—বলিতেনও না। যাহার বিষের ভয়ে তিনি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি জাহ্নবী-প্রবাহে আত্মবিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিলেন, যাহার জন্য ইংরাজের হস্তে বন্দী, লাঞ্ছিত ও অপমানিত, সেই প্রতাপ যদি মৃত্যুমুখে আত্মবির্জ্জন না করিতেন, রমানন্দ স্বামী সেই, শেষ সময়ে তাঁহার সেই আঘাত-জর্জ্জরিত অন্তরের অন্তরে একটী কথা বলিয়া আঘাত না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যতের ন্যায় প্রতাপের মনের কথাও প্রকাশ পাইত না। রমানন্দ স্বামী যখন বলিলেন—"শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এ ইন্দ্রিয়-জয়ের তুল্য হইতে পারে না, তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে।"—তখন সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। আর একটু পরেই প্রাণবায়ু দেহ-ত্যাগ করিবে, তথাপি এই কথায় যেন সেই মুমূর্ষু দেহে নূতন জীবনী সঞ্চার হইল। কি এক অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, অননুভূত, অপরিমেয় তেজ আসিয়া প্রতাপের বাক্যস্ফূর্ত্তি করিয়া দিল; প্রতাপ বলিল—কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী?—এ জগতে কে মনুষ্য আছে যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে? কে বুঝিবে এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত

ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি। আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা, শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখনও মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না। এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ ত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে, কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন উপায় নাই—তাই মরিলাম। আপনি আমার এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন; আপনি জ্ঞানী, শাস্ত্রদর্শী; আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন—"তাহা জানি না—মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে ইহাই বলিতে পারি ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই যদি চিত্ত-সংযমে পুণ্য থাকে তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে তবে দধিচীর অপেক্ষাও তুমি স্বর্গাধিকারি—প্রার্থনা করি জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয় জয়ী হই।"

এ দৃশ্য হৃদয় বিদারক এ দৃশ্য আর্য্যক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র হিন্দু হৃদয়ের মহা প্রবৃত্তি সংগ্রাম—আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ এ চিত্ত কেবল এই এক সময়-মহোন্নত—এক্ষণে মহা পতিত স্বর্ণ ভূমি ভারতেই সম্ভবে। বাঙ্গলায় অমর কবি অমর-চিত্র চিরজ্বলন্ত বর্ণে আঁকিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবু তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের অভিনয়ে নাট্যশালার প্রতি বিরক্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু আজ যদি তিনি তাঁহার "প্রতাপের" ন্যায় সেই অনন্ত ধামে না যাইতেন তাঁহার নিজ-মুখ-কথিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য চন্দ্রশেখরের অভিনয় দেখিয়া হয়ত তাঁহার বিরক্তি জন্মিত না।

ধন্য সেই কবি—যিনি এরূপ অদ্ভুত, জ্বলন্ত, অননুভূত, অদৃষ্টপূর্ব্ব আদর্শ চিত্র আঁকিতে পারেন। ধন্য সেই দেশ! যেখানে এই চিত্র ফুটাইবার জন্য অভিনয় ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যম; পরিশ্রম ও কৃতিত্বের প্রয়োজন হয়। *

* মন্তব্য—মুখে আমরা দুই চারিটী সামান্য ত্রুটির কথা উল্লেখ করিব। এ গুলি বোধ হয় অতি সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে।—মীর কাশেমের গৃহ-ব্যবহার্য্য উষ্ণীষটীর সম্বন্ধে আমাদের একটু আপত্তি আছে। চন্দ্রশেখরের শাস্ত্রপাঠ—অর্থাৎ যে দৃশ্যে শৈবলিনী "ভীমা" হইতে অধিক রাত্রে গৃহ প্রত্যাগতা হইল—তাহা আসনে উপবেশন করিয়া আরও নিবিষ্টতার সহিত হইলে আরও ভাল দেখাইত। প্রতাপের স্ত্রী "রূপসী" প্রতাপের স্ত্রীর মত দেখায় নাই। বঙ্কিম বাবু রূপসীকে ফুটাইয়া তুলেন নাই বটে, কিন্তু তাহাকে প্রস্ফুটিত গৌরবময়ী চরিত্র "সুন্দরী"র ভগিনী বলিয়া ত উল্লেখ করিয়াছেন। দলনীর প্রথম দৃশ্য কক্ষসজ্জা, বেশভূষা, কাষ্ঠাধারের আবরণী সব লাল হওয়া ভাল হয় নাই।

আয়ুর্ব্বেদ।

গ্রহণী।

আয়ুর্ব্বর্ণো বলংস্বাস্থ্য মুৎসাহোপচয়ৌ প্রভা।
ওজস্তেজোঽগ্নয়ঃ প্রাণাশ্চোক্তা দেহাগ্নিহেতুকাঃ॥

যে অগ্নি বিকৃত হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে এবং অবিকৃত থাকিয়া যাবজ্জীবন মনুষ্যকে সুখ প্রদান করে, সেই জঠরাগ্নির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আজ আমরা গ্রহণী রোগের বিষয় সম্যক্ ব্যাখ্যা করিব। মনুষ্যের আয়ু, বর্ণ, বল, স্বাস্থ্য, উৎসাহ, উপচয়, প্রভা, ওজঃ, তেজঃ, অগ্নি ও প্রাণ এ সমস্তই দেহাগ্নি হইতে উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়। এই দেহাগ্নি নির্ব্বাণ হইলে মনুষ্যাদি জীব ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারে না। এই অগ্নি অবিকৃত থাকিলে চিরকাল সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এবং বিকৃত হইলে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং অগ্নিই সমস্তের মূল কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

শান্তেঽগ্নৌ ম্রিয়তে যুক্তে চিরঞ্জীবত্যনাময়ঃ।
রোগরস্যাদ্বিকৃতে মূলমগ্নিস্তস্মান্নিরুচ্যতে॥

অন্ন জীবের সমস্ত ধাতু পোষণ করে বটে, কিন্তু অগ্নি ঐ অন্নের পাচক, অপক্ক অন্ন হইতে রসাদি উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রথমতঃ,প্রাণবায়ু ভুক্ত অন্নকে কোষ্ঠে আকর্ষণ করিয়া লয়, কারণ অন্ন গ্রহণ করা প্রাণবায়ুর স্বধর্ম্ম। অতঃপর আমাশয়ের দ্রবপদার্থ দ্বারা ভুক্ত অন্ন ক্লিন্ন, বিশ্লিষ্ট ও মৃদুতা প্রাপ্ত হয় অনন্তর সমান বায়ু দ্বারা জঠরাগ্নি কম্পিত ও প্রজ্জ্বলিত হইয়া যথাকালে ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া আয়ুর্বৃদ্ধি করে। স্থালীতে অধস্থিত অগ্নি দ্বারা যেরূপ অন্নপাক ক্রিয়া সাধিত হয়, তদ্রূপ জঠরাগ্নি দ্বারা আমাশয়স্থ অন্ন পরিপাক ও রস মলাদি উৎপাদন ক্রিয়া জীব শরীরে নিরন্তর সাধিত হইয়া আসিতেছে।

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্ মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জাতঃ শুক্রসম্ভবঃ॥

ভুক্ত বস্তু সম্যক্ পরিপাক হইলে উহা হইতে যে তরল সারভাগ বহির্গত হয়, তাহার নাম রস। রস যকৃতে গমন করিলে পিত্ত কর্ত্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্তে পরিণত হয়। ঐ রক্ত স্বীয় উষ্মাদ্বারা পক্ক ও বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হইয়া মাংসাকারে পরিণত হয়। মাংস হইতে মেদঃ জন্মে। মেদঃ পক্ক ও শুষ্ক হইয়া অস্থিরূপ ধারণ করে। অগ্নিতেপাক হইয়া অস্থি হইতে এক প্রকার তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই পদার্থ বায়ুদ্বারা ঘনীভূত হইয়া অস্থিরন্ধ্র পূর্ণ করে, ইহারই নাম মজ্জা এবং এই মজ্জা হইতে সার ভাগ বিভক্ত হইয়া শুক্র উৎপন্ন হয়।

রসাদি ধাতুর পরিস্কৃত ভাগই রক্তাদি রূপ ধারণ করে, মলভাগ পৃথক্ পড়িয়া থাকে। ঐ অপরিস্কৃত অংশের নাম কিট্ট। অন্নের কিট্ট মল ও মূত্র, রসের

কিট্ট কফ, রক্ত ও মাংসের কিট্ট পিত্ত, মেদের কিট্ট ঘর্ম্ম, অস্থির কিট্ট কেশ ও লোম, মজ্জার কিট্ট শরীরের স্নিগ্ধতা, চক্ষের মল ও ত্বক্। এইরূপ প্রসাদ ও কিট্টরূপে ধাতু সমুদায়ের পরিণতি হয়।

ষড়্‌ভিঃ কেচিদহোরাত্রৈ রিচ্ছন্তি পরিবর্ত্তনম্।
সন্তত্যা ভোজ্য ধাতুনাং পরিবৃত্তিস্তু চক্রবৎ॥

কেহ কেহ বলেন ছয় দিন রাত্রিতে একটী ধাতু অপর ধাতুতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন আহারের নূতনত্ব-হেতু সর্ব্বদাই চক্রবৎ ধাতুর ধাত্বন্তর-পরিণমন ক্রিয়া সাধিত হইয়া আসিতেছে। ভুক্ত বস্তুর পরিপাক ও রসাদি ধাতুর উৎপত্তির বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল, অতঃপর গ্রহণীরোগের বিষয় বলা যাইতেছে।

যোহি ভুঙ্‌ক্তে বিধিং মুক্ত্বা গ্রহণীদোষজান্ গদান্।
স লোল্যাল্লভতে শীঘ্রং বক্ষ্যন্তেঽতঃপরন্তু যে॥

যে সমুদয় ব্যক্তি লোভপরতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছামত ভোজন করে, ঐ মূঢ় ব্যক্তিগণ বক্ষ্যমাণ গ্রহণীদোষজ পীড়া সমুদায় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ভোজন না করিয়া একেবারে উপবাসী থাকা, অজীর্ণ সত্ত্বে অতিভোজন, কোন দিন গুরু বস্তু ও কোন দিন লঘু বস্তু, কিম্বা কোন দিন অল্পাহার ও কোন দিন অধিক আহার করা প্রভৃতি বিষমাহার, অসাত্ম্য বস্তু আহার, অতিশয় গুরু বস্তু, অতি শীতল বস্তু, অতি রুক্ষ ও দূষিত বস্তু ভোজন, বমন, বিরেচন ও স্নেহপ্রয়োগের ব্যতিক্রম, কোন পীড়া কর্ত্তৃক অতি কৃশতা, দেশ, কাল ও ঋতুর বৈষম্য এবং মলমূত্রাদির উপস্থিত বেগ ধারণ প্রভৃতি কারণে পাচকাগ্নির বৈষম্য সংঘটিত হয়।

স দুষ্টোঽন্নং নতৎ পচতি লঘ্বপি।
অপচ্যমানং শুক্তত্বং যাত্যন্নং বিষতাঞ্চ তৎ॥

উল্লিখিত হেতু সমুদায়ে সংদূষিত অগ্নি স্বীয় মন্দতাবশতঃ লঘু অন্নকেও পরিপাক করিতে পারে না সুতরাং অপচ্যমান অন্ন শুক্ত ও বিষবদনিষ্টকারিতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে অন্ন অজীর্ণ হইলে, স্তব্ধতা, অঙ্গের অবসন্নতা, শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পৃষ্ঠগ্রহ, কটিগ্রহ, জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, কুন্থন, অরুচি ও অপরিপাক এই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে পিত্তের সংস্রব থাকিলে, দাহ, তৃষ্ণা, মুখপাক ও অম্লপিত্তাদ পিত্তজনিত ব্যাধি উৎপাদন করে। কফের সংস্রব থাকিলে, যক্ষ্মা, পীনস ও মেহ প্রভৃতি কফজ রোগ সকল উৎপাদন করে। এবং বায়ুর সংস্রব থাকিলে বাতজ নানা পীড়া উৎপন্ন হয়।

বিষম আহারে পাচকাগ্নি বিষমভাব প্রাপ্ত হইয়া ধাতুবৈষম্য জন্মায়, অল্পাহারে তীক্ষ্ণ হইয়া ধাতু শোষণ করে এবং সম আহারে সমতা প্রাপ্ত হইয়া ধাতু সকলের সমতা বিধান করে।

দুর্ব্বলো বিদহত্যন্নং তদ্‌যাত্যূর্দ্ধ মধোঽপি বা।
অধস্তু পক্বমামং বা প্রবৃত্তং গ্রহণী গদঃ॥
উচ্যতে সর্ব্বমেবান্নং প্রায়োহস্য বিদহ্যতে।

অতিমাত্রায় আহারে পাচকাগ্নি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হইয়া বিদগ্ধভাব (আধ পোড়া) ধারণ করে। ঐ বিদগ্ধান্ন অজীর্ণাবস্থায় ঊর্দ্ধ বা অধঃপথে নিঃসৃত হয়। অধঃপথে ঐরূপ পক্ক বা আমরূপে নিঃসরণকে গ্রহণীরোগ বলে। গ্রহণীরোগে যাহা কিছু আহার করা যায়, তৎসমস্তই বিদগ্ধভাব প্রাপ্ত হয়। ঐ বিদগ্ধ অন্ন তরলভাবে মলদ্বার

দিয়া সরলভাবে কিম্বা বিবদ্ধভাবে নিঃসৃত হইতে থাকে।

অগ্ন্যধিষ্ঠান মন্নস্য গ্রহণাদ্ গ্রহণী মতা।
নাভে রুপরি সা হ্যগ্নিবলোপস্তম্ভবৃংহিতা॥

অন্নাদি গ্রহণহেতু এই নাড়ীর নাম গ্রহণী, ইহাই অগ্নির অধিষ্ঠান। পাচকাগ্নি অবলম্বনে বৃংহিত হইয়া গ্রহণী নাভীর উপবিভাগে অবস্থিতি করে।

যদাহ সুশ্রুতঃ ;—

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীর্ত্তিতা।
পক্কামাশয়মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকল্পিতা॥

পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবর্ত্তিনী পিত্তধরা ষষ্ঠী কলাকে গ্রহণী বলে। অহিত ভোজনাদি দ্বারা এই গ্রহণী নাড়ী দুষ্ট হইয়া গ্রহণীরোগ জন্মায়।

অতীসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নে রহিতাশিনঃ।
ভূয়ঃ সংদূষিতো বহ্নি র্গ্রহণী মভিদূষয়েৎ॥

অতীসার নিবৃত্ত হইয়াছে অথচ পাচকাগ্নির সম্যক্ বল জন্মে নাই, এরূপ অবস্থায় যদি অহিত অর্থাৎ গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করা যায়, তবে পুনরায় পাচকাগ্নি দুর্ব্বল হইয়া গ্রহণী নাড়ীকে দূষিত করে।

একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈ রত্যর্থ মূর্চ্ছিতৈঃ।
সা দুষ্টা বহুশো ভুক্ত মামমেব বিমুঞ্চতি॥

প্রকুপিত পৃথক্ অথবা মিলিত বাতাদি দোষ দ্বারা গ্রহণী দুষ্ট হইয়া ভুক্ত বস্তুকে অপক্ক অবস্থায় বারংবার ত্যাগ করিতে থাকে। কখনও বা পক্কাবস্থায় অতি দুর্গন্ধযুক্ত মল নিঃসরণ করে। ইহাতে শূলবেদনা উপস্থিত হয়। গ্রহণী রোগে কোন সময় মলবদ্ধ থাকে, কখনও বা তরল ভেদ হইতে থাকে। গ্রহণী নাড়ী দূষিত হইলে এই পীড়া জন্মে, এজন্য আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ইহার নাম গ্রহণী রাখিয়াছেন। গ্রহণীরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে তৃষ্ণা, আলস্য, বলক্ষয়, ভুক্ত অন্নের দীর্ঘকালে বিদাহপাক ও শরীরের গুরুতা এই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কটু, তিক্ত, কষায়, অতি রুক্ষ ও সংযোগবিরুদ্ধ (ক্ষীর মৎস্যাদি) দ্রব্য ভোজন, অল্প ভোজন কিম্বা উপবাস, অতিশয় পথভ্রমণ, মলমূত্রাদির উপস্থিত বেগধারণ ও অতি মৈথুন প্রভৃতি দ্বারা কুপিত বায়ু পাচকাগ্নিকে দূষিত করিয়া বাতিক গ্রহণীরোগ উৎপাদন করে। ইহাতে অতি কষ্টে ভুক্ত অন্ন অল্পরসে পরিপাক হয়, শরীর রুক্ষ, কণ্ঠ ও মুখের শোষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, কর্ণে শব্দের ন্যায় বোধ, পার্শ্ব, উরু, বংক্ষণ ও গলদেশে নিরন্তর বেদনা, তরল ভেদ ও বমন, হৃৎপীড়া, অঙ্গের কৃশতা ও দৌর্ব্বল্য, মুখের বিরসতা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, মধুরাদি ষট্‌প্রকার রসাস্বাদেই স্পৃহা, মনের অবসাদ, কাস ও শ্বাস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বায়ুজনিত গ্রহণীরোগে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে অথবা পরিপাক হইলে উদরাধ্মান উপস্থিত হয়। কিন্তু আহার করিলে পুনরায় স্বাস্থ্যবোধ হয়। এই পীড়ায় রোগী সর্ব্বদা বোধ করে, যেন তাহার বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ কিম্বা প্লীহা জন্মিয়াছে। ইহাতে কখন দ্রব কখনও বা শুষ্ক ফেনবিশিষ্ট অপক্ক মল শব্দের সহিত কষ্টে বারংবার নির্গত হয়।

কটু, অজীর্ণ, বিদাহী (যে আহারে দাহ জন্মে) অম্ল, ক্ষার, লবণ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা প্রবৃদ্ধ পিত্ত উত্তপ্ত

জলের ন্যায় অগ্নিকে অল্লাবিত ও নষ্ট করিয়া পিত্তগ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। পিত্তই যখন অগ্নি, তখন পিত্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া অগ্নিকে বৃদ্ধি না করিয়া কেন নষ্ট করিবে? এইরূপ সন্দেহ নিরাসার্থ বলা হইয়াছে—"জলং তপ্তমিবানলম্" তপ্ত জলেও যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ প্রবৃদ্ধ পিত্ত পাচকাগ্নিকে প্লাবিত করিয়া নষ্ট করে। এই পিত্ত-গ্রহণীরোগে দুর্গন্ধ অম্ল উদ্গার, হৃদয় ও কণ্ঠের দাহ, অরুচি ও পিপাসা হয়। নীল বা পীত-বর্ণ অজীর্ণ দ্রব মল নিঃসৃত হইতে থাকে এবং রোগীর শরীর পীতবর্ণ হইয়া যায়।

অতিশয় গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল, ও মধুরাদি বস্তু ভোজন, অতিভোজন, কিম্বা দিবসে আহার করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ইত্যাদি কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া জঠরাগ্নিকে দুর্ব্বল করিয়া শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগ জন্মায়। শ্লৈষ্মিক গ্রহণী রোগে ভুক্তদ্রব্য অতি কষ্টে পরিপাক হয়, শ্লেষ্মা দ্বারা মুখ লিপ্ত ও মিষ্ট হয়, রোগী হৃদয়কে শ্লেষ্মা দ্বারা পূর্ণ মনে করে, উদর ভার ও নিশ্চল (বিবদ্ধ) থাকে, বিকৃত মধুর উদ্গার উঠিতে থাকে, শরীর অবসন্ন হয়, স্ত্রী সম্ভোগে প্রীতি থাকে না, এবং আম ও শ্লেষ্মসংসৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন (ছেক্ড়া ছেক্ড়া) গুরু মল নিঃসরণ হয়। এই শ্লৈষ্মিক-গ্রহণী রোগী কৃশ হয় না, অথচ দুর্ব্বল ও আলস্য-পরতন্ত্র হয়।

উল্লিখিত বাতজাদি গ্রহণী রোগের নিদান ও লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক গ্রহণী রোগ বলা যায়।

সংগ্রহ গ্রহণীরোগে কাহারও এক মাস পরে, কাহারও এক পক্ষ পরে, কাহারও দশ দিন পরে, কাহারও বা প্রত্যহই তরল, গাঢ়, শীতল, স্নিগ্ধ, আম-যুক্ত এবং পিচ্ছিল মল শব্দসহ ও কটি-দেশে অল্প অল্প বেদনার সহিত বহু পরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে। দিবসে এই পীড়ার বৃদ্ধি ও রাত্রিতে শান্তি হয়। সংগ্রহগ্রহণী অতি দুর্জ্ঞেয়, দুশ্চিকিৎস্য ও দীর্ঘকালব্যাপী ব্যাধি। আম ও বায়ুর প্রকোপে এই পীড়ার উৎপত্তি হয়।

গ্রহণীরোগে প্রথমতঃ লঙ্ঘন ও পাঁচন দ্বারা গ্রহণীগত দোষের পরিপাক করিবে। শরীরে আমরস বিদ্যমান থাকিলেও লঙ্ঘন এবং পাঁচন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর আমাশয় শুদ্ধি হইলে লঘু অন্ন প্রদান করিবে। গ্রহণীরোগে সদ্যোজাত তক্র একটী সুপথ্য ও মহৌষধ। লঘুতাপ্রযুক্ত তক্র অগ্নিদীপক, গ্রাহী ও সুপথ্য। পরিণামে মধুর রস হয় বলিয়া পিত্তপ্রকোপক নহে, কষায়, উষ্ণ, বিকাশী ও রুক্ষ বলিয়া কফ শান্তি করে এবং স্বাদু, অম্ল ও ঘন বলিয়া বায়ু দমন করে। যথা—

গ্রহণীদোষিণাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ।
পথ্যং মধুরপাকিত্বা ন্ন চ পিত্তপ্রকোপনম্॥
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্ রৌক্ষ্যাচ্চৈব কফে হিতম্।
বাতে স্বাদ্বম্লসান্দ্রত্বাৎ সদ্যস্ক মবিদাহি তৎ॥

চিত্রকগুড়িকা।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ।
ব্যোষং হিঙ্গ্বজমোদাঞ্চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥
গুড়িকা মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা।
কৃতা বিপাচয়ত্যামং দীপয়ত্যাশু চানলম্॥
সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ।
সামুদ্রেণ সমং পঞ্চলবণান্যত্র যোজয়েৎ॥

চিতামূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচি-ক্ষার, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্ ও

ঔদ্ভিদ এই পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিং, বনযমানী ও চই এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া মাতুলুঙ্গ (ছোলঙ্গলেবু) বা ডালিমের রসে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ গুড়িকা করিবে জলসহ ইহার একটী গুড়িকা সেবনে, আমরসের পরিপাক ও অতিশয় অগ্নি বৃদ্ধি হয়। অধিকাংশ চিকিৎসকই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

গ্রহণীরোগে বিবেচনাপূর্ব্বক গঙ্গাধর চূর্ণ, পাঠাদ্য চূর্ণ, লবঙ্গাদ্য চূর্ণ, আয়ামকাঞ্জিক, কল্যাণগুড়, পিপ্পল্যাদি আসব, জাতীফলাদ্য বটিকা, নৃপবল্লভ, রসপর্পটী, বিজয়পর্পটী, পঞ্চামৃতপর্পটী ও গ্রহণীকপাট রস ইত্যাদি ঔষধ যথাযোগ্য অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে।

নাগরাদ্য চূর্ণ—শুঁঠ, আতইচ, মুতা, ধাঁইফুল, রসোত, কুড়চিমূলের ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেলশুঁঠ ও কট্‌কী এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া ।০ আনা হইতে ।৵০ আনা মাত্রায় মধু দিয়া মাড়িয়া তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে পিত্তজনিত গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। ৬ গুণ বা ৮ গুণ জলে রাত্রিতে আতপতণ্ডুল ভিজাইয়া প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া লইলে তণ্ডুলজল প্রস্তুত হয়।

পাঠাদ্য চূর্ণ—আকনাদি, বেলশুঁঠ, চিতামূল, ত্রিকটু, জামছাল, দাড়িমবীজ, ধাইফুল, কট্‌কী, আতইচ, মুতা, দারুহরিদ্রা, চিরাতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ সর্ব্বসমান কুড়চিমূলের ছাল চূর্ণ সমুদায় উত্তমরূপে মিশ্রিত ও সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ।০ বা ।৵০ আনা মাত্রায় মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী ও জ্বরাতীসার আরোগ্য হয়।

বিল্বং মোচরসং পাঠা ধাতকী ধান্যমেব চ।
হ্রীবেরং নাগরং মুস্তং তথৈবাতিবিষা সমম্॥
অহিফেনং লোধ্রকঞ্চ দাড়িমং কুটজং তথা।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ॥
তক্রেণ খাদয়েৎ প্রাতশ্চূর্ণং গঙ্গাধরং মহৎ।
জ্বরমষ্টবিধং হন্যাদতীসারং সুদুস্তরম্॥
গ্রহণীং বিবিধাঞ্চৈব কোষ্ঠব্যাধিহরং পরম্।

বৃহদ্ গঙ্গাধর চূর্ণ—বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাঁইফুল, ধনিয়া, বালা, শুঁঠ, মুতা, আতইচ, অহিফেন, লোধ, কচি দাড়িম ফলের ছাল, কুড়চি ছাল, পারা ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ একত্র উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান তক্র অভাবে আতপ তণ্ডুলোদক। ইহা সেবনে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, সুতরাং অষ্টবিধ জ্বর, প্রবল অতীসার, নানাবিধ গ্রহণী ও কোষ্ঠাশ্রিত বিবিধ ব্যাধি প্রশমিত হয়। বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণই সর্ব্বদা ব্যবহার করা হয়, তজ্জন্য এস্থলে স্বল্প ও মধ্য গঙ্গাধরের বিষয় উল্লেখ করা গেল না, আবশ্যক হইলে ভৈষজ্য রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন।

বৃহল্লবঙ্গাদ্যচূর্ণ—লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষ, ধনিয়া, কট্‌ফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, রসোত, ধাঁইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিটলবণ, তিতলাউ, বেলশুঁঠ, গুড়ত্বক, এলাইচ, পিপুলমূল, বনযমানী, যমানী বরাক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধুনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেনা, সোহাগার খই, বালা, কুড়চিমূলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কট্‌কী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক

সমভাগ চূর্ণ। মাত্রা ⁄০ হইতে ৵০ আনা। অনুপান মধু কিম্বা তণ্ডুলোদক। ইহা সেবনে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গ্রহণী নানাবর্ণ ও বেদনা-যুক্ত পক্ক বা অপক্ক অতীসার এবং জ্বর, অরোচক, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস ও বমি প্রভৃতি উপদ্রব, অম্লপিত্ত, হিক্কা, প্রমেহ, হলীমক, পাণ্ডু, উদরাধ্মান, সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, শোথ, অতীসার, পীনস, আমবাত, সংগ্রহগ্রহণী ও প্রদর প্রভৃতি বহু রোগ আরোগ্য হয়।

বৃহন্নায়িকা চূর্ণ—চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলারমুটী যমানী, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, ঝুল, বচ, কুড়, মুতা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্পলা, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বসমান সিদ্ধি চূর্ণ, সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ইহার ⁄০ বা ৵০ আনা যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, কাস, পাণ্ডু, বিষমজ্বর, প্রমেহ, শোথ, বিষ্টম্ভ, সংগ্রহগ্রহণী, সকল প্রকার অতীসার ও শূল আমবাত ও সূতিকা প্রভৃতি যাবতীয় পীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া কাঞ্জিক, দধি ও মাংস সেবন হিতকর। ইহাতে অতিশয় অগ্নিদীপ্তি হয়।

"কাষ্ঠমপ্যুদরে যস্য ভক্ষণাদ্ যাতি জীর্ণতাম্।"

জাতীফলাদি চূর্ণ—জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাদুকা, তালিশপত্র, রক্ত-চন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরিতকী, আমলা, মরিচ, পিপ্পলী, বংশ-লোচন, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৫৬ তোলা বা ৭ পল, সকল চূর্ণের সমান চিনি। সুন্দররূপে একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা হইতে ।০ আনা। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে কাস, ক্ষয়, শ্বাস, অরোচক, অতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, পীনস ও বাতশ্লেষ্মজ রোগ আরোগ্য হয়।

জীরকাদ্য চূর্ণ—জীরা, সোহাগার খৈ, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, বালা, শুল্‌ফা, দাড়িমফলের ছাল, কুড়চিমূলের ছাল, বরাক্রান্তা, ধাঁইফুল, ত্রিকটু, গুড়-ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক এবং পারদ প্রত্যেক সম-ভাগ ও সকল চূর্ণের সমান জায়ফল চূর্ণ, এই সমুদায় সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া যথাযোগ্য জলাদি অনুপানের সহিত সেবন করিবে। মাত্রা ৬ রতি। ইহা সেবনে দুস্তর গ্রহণী, অতিসার, কামলা, পাণ্ডু ও অগ্নিমান্দ্য নিশ্চয় প্রশমিত হয়।

কঞ্চটাবলেহ—কাচড়াদাম ১ সের ও তালমূলী ১ সের ১৬ সের জলে জ্বাল দিয়া ৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, ঐ কাথে চিনি ১ সের পাক করিবে। ১ সের অবশিষ্ট থাকিতে বরাক্রান্তা, ধাঁইফুল, আকনাদি, বেল-শুঁঠ, পিঁপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচললবণ, রসোত ও মোচরস ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে একপোয়া মধু মিশ্রিত করিবে। দোষাদির বলাবল বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধতোলা হইতে ইহার মাত্রা নির্দ্দিষ্ট করিবে। ছাগদুগ্ধ অনু-পানের সহিত সেবনই প্রশস্ত। ইহাতে সকল প্রকার অতীসার, সংগ্রহ গ্রহণী ও অম্লপিত্ত জনিত সর্ব্বপ্রকার কোষ্ঠরোগ

এবং শূল, অরুচি অতি সত্বর প্রশমিত হয়।

তক্রারিষ্ট—যমানী, আমলা, হরিতকী ও মরিচ প্রত্যেক ২৪ তোলা এবং পঞ্চলবণ ৮ তোলা চূর্ণ করিয়া ৮ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৪ দিন রাখিবে, মাত্রা ৵০ ছটাক, ইহা সেবনে অগ্নির অতিশয় দীপ্তি হয় ও গ্রহণ্যাদি পীড়া অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

মুস্তকাদ্য মোদক—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরী, পান, শুল্‌ফা, শতমূলী, ধন্যা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী ও জায়ফল প্রত্যেক ২ তোলা মুতা ৪৮ তোলা, চিনি সর্ব্বদ্বিগুণ অর্থাৎ ১৷৷০ সের। পাকযোগ্য জল দিয়া চিনি পাক করিয়া ক্রমশঃ আসন্নপাকে সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে ও নামাইবে, শীতল হইলে তৎপরদিন কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ১ তোলা। অনুপান শীতল জল, সায়ংকালে সেব্য। ইহাতে গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অজীর্ণ, আমদোষ ও বিসূচিকাদি নানা রোগ আরোগ্য হয়। এই মোদক সেবনে বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়, বলী, পলিত ও কৃশতা নাশ হয় এবং দেহের পুষ্টি সাধিত হয়।

জীরকাদি মোদক—উত্তমরূপ চূর্ণিত জীরা ১ সের, বস্ত্রপূত (কাপড়ে ছাঁকা) ঘৃতভর্জ্জিত সিদ্ধিবীজচূর্ণ অর্দ্ধ সের, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী সোহাগার খই, কুন্দুরখোটী, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুল্‌ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ, ও নালুকা ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, সর্ব্বদ্বিগুণ চিনি। যথোপযুক্ত জলে চিনি পাক করিয়া সমুদায় চূর্ণ প্রদান করিবে। শীতল হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে ১ তোলা সেবন করিবে। অনুপান শীতল জল। ইহার উপকারিতার সীমা নাই; রক্তাতিসার, বিষমজ্বর, অম্লপিত্তজ রোগ, সকল প্রকার উদররোগ, সংগ্রহ গ্রহণী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গ্রহণী, শূল, অরোচকাদি যাবতীয় বহ্নিমান্দ্যজনিত রোগ আরোগ্য হয়, ইহা অতি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ঔষধ।

গ্রহণী কপাট—পারদ, গন্ধক, জায়ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া হুড়হুড়ে, বিল্বপত্র ও পানিফলের পাতা ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমিত রসে মর্দ্দন করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার একটী দধির সহিত সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার, পাণ্ডুরোগ ও জ্বরাদি প্রশমিত হয়।

মহাগন্ধক—পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, ঐ কজ্জলী কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া পঙ্কবৎ করিবে ও লৌহপাত্রে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া তাহার সহিত জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও নিম্বপত্র প্রত্যেক

চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। অনন্তর এই ঔষধ একখানি ঝিনুক বা কটরার মধ্যে রাখিয়া অপর একখানি দ্বারা আবৃত করিবে এবং কদলীপত্র বেষ্টন করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিবে। শুষ্ক হইলে বিলঘুটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। পুড়িয়া ঈষৎ রক্তবর্ণ ও শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। ব্যাধি অনুসারে অনুপানের সহিত সেবন করিলে, ইহাতে গ্রহণী, অতিসার, সূতিকা ও জ্বর নিবৃত্তি হয়। বালকদিগের উদরাময়ে ইহা অতি প্রসিদ্ধ ও উপকারী।

বৃহৎ নৃপবল্লভ—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, চিতামূল, মুতা, সোহাগার খই, জায়ফল, হিং, গুড়ত্বক্, এলাইচ, চিতামূল, বঙ্গ, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, মরিচ ও তাম্র প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ॥০ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া আদার রসে ও আমলার রসে ভাবনা দিয়া চণকপ্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

শ্রীনৃপতিবল্লভ—জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, সোহাগার খই, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেক ৮ তোলা, মরিচ ১৬ তোলা (তাম্রের স্থলে কেহ কেহ রৌপ্য ব্যবস্থা করেন) এই সমুদায় দ্রব্য ছাগদুগ্ধে বা আমলকীর রসে মাড়িয়া ৫ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, শূল, শ্বাস, কাস ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হইয়া বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়। অনুপান মুতার রস, লবঙ্গচূর্ণ ও ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি। ইহার অমোঘ ফল শত সহস্রস্থলে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

রসেন্দ্রচূর্ণ (লাল গুঁড়া)—রসসিন্দুর ৮ তোলা, বংশলোচন, মুক্তাভস্ম ও স্বর্ণভস্ম প্রত্যেক ॥০ তোলা, অহিফেন ॥০ তোলা দুগ্ধে ভিজাইয়া ছাকিয়া লইয়া তদ্দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িবে ও শুষ্ক কবিয়া চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। পূর্ণ মাত্রা ৪ রতি, ২ রতি হইতে সেবন আরম্ভ করাই নিরাপদ। অনুপান দুগ্ধ। এই মহৌষধ সেবনকালে দুগ্ধান্ন সেবন ও লবণ জল একেবারে ত্যাগ করা বিধেয়। ক্ষুধার বৃদ্ধি অনুসারে হালুয়া ও মোহনভোগাদি ঘৃতপক অল্প মিষ্ট দ্রব্য ভোজন ব্যবস্থেয়। শৌচ ও আচমনাদি ক্রিয়া উষ্ণজলে সম্পাদন করিতে হয়। বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা গাত্র আবৃত রাখিবে। স্নানাদি ক্রিয়া নিষিদ্ধ। এই চূর্ণ সেবনে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, রক্তাতিসার, সূতিকা ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ আরোগ্য হয় এবং শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। সুস্থ শরীরেও ইহা বলবৃদ্ধির নিমিত্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার প্রসিদ্ধ নাম লাল গুঁড়া। এই ঔষধ সেবনকালে অতিশয় সাবধান থাকিতে হয়, কোন রূপে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেই বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা।

হিরণ্যগর্ভ পোট্টলী রস—পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, সোহাগার খই ২০ রতি এই সমুদায় দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মুষা (কটরা) মধ্যে স্থাপন

পূর্ব্বক অপর মূষা দ্বারা মুখ রুদ্ধ ও মৃত্তিকা লেপন করিবে। অনন্তর ক্ষুদ্র পুটে ৩০ খানি বিল ঘুঁটের অগ্নিতে পুট দিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইবে এবং খলে মর্দ্দন করিয়া ২ হইতে ৪ রতি মাত্রায় ঘৃত, মধু ও ২৯টী মরিচচূর্ণ সহ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, বিষম জ্বর, অতীসার, গ্রহণী ও শোথ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিরাকৃত হয়, ইহা অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ ক্রমশঃ গ্রহণী-রোগোক্ত তৈল ও পর্পটীর বিষয় আলোচিত হইবে।

ভৈষজ্য-বিজ্ঞান।

১। টাট্‌কা গোমূত্রে নারিকেল-ফুল বাটিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে নেত্রাভিষ্যন্দ বা চক্ষু ওঠা আরোগ্য হয়। হরিদ্রা মাথান বস্ত্রখণ্ড দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদিত রাখা ও নূতন সরায় অল্প জল দ্বারা হরিদ্রা ঘসিয়া চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে প্রলেপ দেওয়া হিতকর।

২। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দাঁতে পোকা লাগিয়া শিশুরা অস্থির হইয়া পড়ে। দ্রোণ (ঘল্‌ঘসে) পুষ্পের রস, মধু ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণপূরণ করিলে ঐ যন্ত্রণার নিবৃত্তি অর্থাৎ দন্তক্রিমি নষ্ট হয়। বকুল ছালের কাথে কুল্য এবং উহা দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলে দাঁত নড়া ভাল হয়।

৩। উত্তম গব্য ঘৃত একটী বাটিতে করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিয়া নিস্ফেণ হইলে তাহাতে কতকগুলি জাতি ফুলের পাতা ফেলিয়া দিবে ও ভাজা ভাজা হইলে নামাইয়া অল্প উষ্ণ অবস্থায় গলার ঘায়ে, মুখের ঘায়ে ও দাঁতের গোড়ার ঘায়ে দিলে ২।৩ দিনের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শিশিরের জল কিম্বা মাখন দিলে ওষ্ঠ ফাটা আরোগ্য হয়। শীতকালেই এই সমুদায় রোগের আধিক্য দেখা যায়।

৪। স্তন্যপায়ী শিশু স্তনদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলে। এরূপ অবস্থায় গব্যদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধের সহিত এক চামচে চূণের জল মিশাইয়া খাওয়াইলে দুধতোলা নিবৃত্তি হয়। পূর্ব্ব দিন চূণ জলে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে না নাড়িয়া উপরের স্বচ্ছ অংশ লইতে হয়, চূণের অংশ উহার সহিত থাকিলে অনিষ্ট হইতে পারে।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা ও আতইচ সমভাগে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করাইলে, শিশুর কফ, কাসি ও বমন নিবারণ হয়।

খই, যষ্টিমধু ও ইক্ষুচিনি সমভাগে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি মাত্রায় মধুসহ মাড়িয়া এক চামচে আতপ চাউলের জলসহ পান করাইলে, শিশুদিগের আমাশয় আরোগ্য হয়।

৫। কোন স্থান কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া রক্তপাত হইতে থাকিলে, টাট্‌কা গোময় ঐ স্থানে দিয়া নেকড়া দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে, ইহাতে রক্ত পড়া বন্ধ হয় ও ক্ষত স্থান জোড়া লাগিয়া যায়।

৬। ঘুষঘুষে ঘায়ে পোকা হইলে পচা মানের ডাঁটা ও মাখন একত্রে বাটিয়া ঘায়ের উপর প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে বসিবে, এই উপায়ে সমস্ত পোকা বাহির হইয়া ঘা শুকাইয়া যায়। ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

২য় খণ্ড। | ১৩০১ সাল—অগ্রহায়ণ। | ৩য় সংখ্যা।

নক্সা।

জরীর জুতা।

গেজেট বাহির হইবার পর হইতেই পাঁচকড়ি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় দমিয়া পড়িয়াছে। শত্রুপক্ষের মধ্যে অনেকে বলে "কাবু" হইয়াছে। কারণ এবার দ্বিতীয়বার এফ, এ, ফেল।

তাহা যাহাই হউক, উৎসাহহারা হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। পাঁচু গোটা নাম পঞ্চানন—থাকেন খুড়ার বাড়ী। পড়েন একটা ক্রিশ্চানি কলেজে। খোরাকের ভারটা খুড়ার—পোষাক ও জলখাবারের ভারটা নিজের। ছেলে পড়াইয়া সেটা সারিতে হয়। যে হাঁড়িতে সংসারের ভাত হয়, তাহাতেই খুড়ী, পাঁচুর নাম করিয়া একমুঠো চাল ফেলিয়া দেন। তাহা সিদ্ধ হইয়া ভাতে দাঁড়াইলে—সরকারী ব্যঞ্জনেরই কিছু দিয়া পাঁচু তাহা খাইয়া কলেজে যায়। সন্ধ্যার পর পড়াইতে যায়—তোপের আগে ফিরিয়া আসিয়া, সকালেরই ন্যায় উপকরণে আহারের দ্বিতীয় পালাটা সারিয়া, বাড়ীর বাহিরের ঘরে শুইয়া পড়ে। সে ঘরটার একটা নির্দ্দিষ্ট, অপরিবর্ত্তনশীল সংজ্ঞা নাই। কখন হয় বারবাড়ী, কখন বাহিরের ঘর, কখন বৈঠকখানা। একটা তল্‌তা বাঁশের, দড়িতে খাটান আল্‌নার উপর সকালে পাঁচুর শয্যা উঠিয়া বসে, এবং সারাদিন ধরিয়া কখন ঝুলিতে, কখন দুলিতে থাকে। রাত্রিতে নামিয়া পাঁচুর শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহের সকল অবসাদ আপনি বুক পাতিয়া লয়। মাথার কাছে কুলুঙ্গির ভিতর একটা অসন্তুষ্ট আঁধারমুখ টিনের ডিবে প্রায়ই আধপেট কেরোসিন্ তেলের খোরাক লইয়া জ্বলিতে থাকে—এবং কণ্ঠশ্বাস্ পর্য্যন্ত চারদিকে কৃষ্ণধূম ও দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া তাহার প্রতি এ দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। পূর্ণ উদর পর্য্যন্ত সেবা

পাইলে তাহার স্বভাবের যে বিশেষ কিছু উন্নতি হইত সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ রহিয়াছে। আকণ্ঠ মাত্রায় তোমার *হৃদয়ের স্নেহ পান করাও যে, নীচ সে* নীচই থাকিবে। খুড়ার বাড়ীর সহিত পাঁচুর এইরূপ সম্পর্ক।

পাশের খবর বাহির হইবার পর খুড়া একদিন সুযোগমত পাঁচুকে ডাকিয়া কিছু ভর্ৎসনা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে একস্থান হইতে পাচুর বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কন্যাপক্ষের বর পছন্দও হইয়াছিল। এফ, এ পাশ হইতে পারিলেই বিবাহ স্থির। খড়ারও বিবাহে অমত ছিল না। কারণ এ বিবাহে তাঁর লাভ ভিন্ন লোকসান ছিল না। জ্যেষ্ঠের পরলোকপ্রাপ্তি হইবার পর হইতে তিনি পিতৃহীন পঞ্চাননের পিতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন। এবং অভিভাবক ও অন্নদাতা হইয়া পিতৃসত্ত্বের ওয়ারিশন হইয়াছেন এমনটা প্রায় মনে হইত। *সুতরাং উপস্থিত বিবাহের সুযোগে,* আধুনিক প্রথানুসারে বরপক্ষের প্রাপ্য আর্থিক লভ্যাংশে তাঁহারই একমাত্র আইনসঙ্গত অধিকার একথা কেনই বা তাঁহার মনে উদয় না হইবে? তারপর কন্যার পিতার ঐ কন্যাটী একমাত্র সন্তান। তিনিও একটী অভিভাবক হীন, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। ইচ্ছা, মূল্য দিয়া পাত্রের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত দায়িত্ব কিনিয়া লইয়া তাহাকে গৃহে রাখিবেন। "পরের ছেলের প্রতি একটা জীবনব্যাপী, পদে পদে ক্ষুদ্র ত্রুটীতে অপরাধীকৃত, শঙ্কিত, কর্ত্তব্যের দায় অপেক্ষা তাঁহার নিকট ঘরের একটী ক্ষুদ্র বালিকার প্রতি কর্ত্তব্যের ভার অন্যের হস্তে অসঙ্কোচে সমর্পণ করা, গুরুতর দায় বলিয়া ঠেকিয়াছিল। *পাঁচুর খুড়ার ন্যায় অতবড় একটা অভি*ভাবক সত্ত্বেও তিনি ঠিক বুঝিয়াছিলেন যে পাঁচুর উপর তাঁহার মৌরশীসত্ব নাই। তিনি শুধু পত্তনীদার। উচিত মূল্য দিলে তিনি সহজেই ইজারাসত্ব আপনার নামে খারিজ করিয়া লইতে পারিবেন। এখন দুটা পাশ করিতে পারিলে পাঁচুর বুদ্ধির একটা পাকা পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেই অপেক্ষাতেই তিনি ছিলেন।

সুতরাং এই বিবাহে খুড়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে পারিবেন, এই আশায় অনেকটা উৎফুল্ল ছিলেন। এমন সময় পাচুর ছাত্রজীবনের এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া পূর্ব্বে অতিরিক্ত কল্পনা বলে অনেক গুলি নূতন সুবিধা লইয়া ভবিষ্যৎ জীবনপথে যতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, *বাধ্য হইয়া সেটা ফিরিয়া আসিতে* হইল। তিনি ভর্ৎসনা করিবার সময় কিছু ক্রোধ বা উষ্মা প্রকাশ করিলেন না। খুব ধীরে ধীরে তিনি পাঁচুকে সময়ের ক্রমপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে চিন্তা ও বিচার করিতে বলিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের অবস্থার সচ্ছলতার হ্রাস ও সাংসারিক সকল দ্রব্যের ন্যায় জীবিকার অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সকলের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়ায়, লোকের অসুবিধা কিরূপ বাড়িয়াছে সে কথাও ভাবিয়া দেখিতে বলিলেন। বিশেষতঃ অল্পবেতনভোগী কুপোষ্য-পরিবৃত পিতৃব্যকুলের উপর এই বিষম সাময়িক পরিবর্ত্তনবশে অন্নদুর্ম্মূল্যতার পরিণাম

যে কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা পাঁচুর ন্যায় বুদ্ধিজীবি, সুবোধ বালকের দ্বারা লক্ষিত হওয়া উচিত, সে কথাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। খুড়া বক্তৃতা খুব সংক্ষেপে সারিলেন। পাঁচু চুপ করিয়া শুনিয়া গেল। খুড়া উঠিয়া গেলে পাঁচুর বোধ হইল, যেন খুড়া মহাশয় কতকগুলি বড় বড় শিশার গোলা আনিয়া, তাঁহার প্রতি পাঁজরায় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিয়া গেলেন। ভবিষ্যতে সুবিধা পাইলে একগাছি লাঠি দিয়া উহাদের মাঝে মাঝে দোল দিবেন।

সুতরাং ফেল হইবার পর পাঁচুর উৎসাহভঙ্গ হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ খুড়া ঠাকুরাণীর সে মুষ্টিতে পাঁচুর ক্ষুধা পরিমিত হইত, তাহার ক্রমশঃ হ্রস্বতা সম্বন্ধে একটা শঙ্কা জাগিয়া উঠিল। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বের সহাধ্যায়ী বন্ধু বান্ধবগণের সঙ্গে এই অদৃষ্ট বিভিন্নতা হেতু সেই অসঙ্কোচ সম্মিলনের মাঝখানে, যে একটা অস্থুল, তীক্ষ্ণপ্রান্ত, স্বচ্ছ কাচের বেড়ার ন্যায় ব্যবধান মাথা তুলিয়া উঠিবে—একটু অন্যমনস্কে একটু অসাবধানে অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদেহব্যাপী কোন বেগময় অনুরাগ বা প্রীতি জানাইতে গেলে, মুখে বুকে, সর্ব্বশরীরে বড় বড় রক্তময় আঁচড় লাগিবে—সে আশঙ্কাও হইল। বিশেষতঃ এই বিবাহ কথাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া, সে একটা যে কি গড়িয়া তুলিয়াছিল, সেইটা সহসা ভাঙ্গিয়া ঘাড়ের উপর পড়ায় যেন পাঁচুর উৎসাহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাঁচুর বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই বিবাহিত। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বেই পঞ্চানন বিবাহিতজীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। পাঁচু বাঙ্গলা, ইংরাজী কাব্য পড়িত। বন্ধুরাও সকলে মিলিয়া প্রেমাশ্রু, অধরসুধাসারসিক্ত, হাস্য কিরণউজলিত বিবাহ কাব্যতরু মাঝে মাঝে সবলে নাড়া দিয়া পাঁচুর নীরস কল্পনাকে ভিজাইয়া দিত, উর্ব্বর করিয়া তুলিত। পাঁচু ঘরে আসিয়া রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া তাই ভাবিত। এক একদিন অদ্ধরাত্রে উঠিয়া, প্রায় তৈলহীন ডিবে কাত করিয়া, ক্ষীণ আলোতে "আধহাসি" "দুটী কথা" "অভিমান" "বাতায়ন পথে" "কবরীতে তুলে ফুল" প্রভৃতি শীর্ষক কবিতা লিখিত, আপনি পড়িত, বন্ধুদের শুনাইত। এক এক সময় ভ্রম হইত যেন সত্যই তাহার বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইয়াছে। এবং কে যেন সত্যই কবরীতে ফুল তুলাইয়া, বাতায়নে বসিয়া, আধহাসি হাসিতেছিল—আর পাঁচু যেন তাহার নিকট শুধু দুটী কথার করুণা ভিক্ষা করিতে গেল—সে ভিক্ষা দিল না, ফলে লাভ হইল শুধু "অভিমান"। লিখিতে লিখিতে পাঁচুর হৃদয়ের জলন্ত অগ্নির উপর তরল কল্পনা ফুটিতে থাকিত—কলমকাঠীর তাড়নায় উহা স্ফীত ফেনিল হইয়া উঠিত—অবশেষে ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাসের সহিত বাষ্প কাটিয়া গেলে—অতি উপাদেয় সর্ব্ববিরহজ্বরহর কাব্য ক্বাথ প্রস্তুত হইত। যখন পাঁচুর এইরূপ অবস্থা তখন পাঁচু ফেল হইল, খুড়া বকিল, বিবাহের কথা চাপা পড়িল। কাযেই আঘাতটা লাগিল ভাল।

আজ পাঁচু বৈকাল বেলা বাহিরের ঘরে, জানালার নিকট, পথের দিকে মুখ

ফিরাইয়া বসিয়াছিল। ফেল হইবার পর আর বড় বাড়ী হইতে বাহির হইত না। কেবল সকালে পাড়ার "রিডিং রুমে" গিয়া এক আধ ঘণ্টা খবরের কাগজ পড়িত, কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনগুলা ভাল করিয়া দেখিত, আর ২০৲ টাকা মাহিনায় একজন শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র, গ্রাডুয়েট অন্ততঃ এফ এ, পাশ মাষ্টারের প্রয়োজন দেখিয়া প্রতিদিন নিরাশ হৃদয়ে ফিরিত। সকালের জন্য একটা নূতন ছেলে পড়ান কাজ জুটাইবার প্রতি যে লক্ষ্য রাখিত না এমন নহে। সন্ধ্যার পড়ান ত ছিলই।

পাঁচু আপনার কথাই ভাবিতেছিল। যেরূপ উৎসাহহীনতা আসিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া, নূতন উদ্যম সঞ্চয় করিয়া আবার সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, এ কথা মনে করিতেও সাহস হইতেছিল না। কিন্তু তা না করিতে পারিলে অন্য উপায়ই বা কি? পড়া ছাড়িয়া অবলম্বন করিতে পারে এমন নূতন কর্ত্তব্যই বা কি? চাকরীর যেরূপ অবস্থা ও যেরূপ মারামারী, কাড়াকাড়ী তাহাতে ভরসা বড় কম; বিশেষতঃ যখন কোন বলবান্ পৃষ্ঠপোষক নাই। ব্যবসা করিবে! সে মূলধন কোথায়? সে শিক্ষা, সে বুদ্ধি কোথায়? পাঁচু ভাবিতেছিল, বাঙ্গালী স্ত্রীলোক যে বাঙ্গালী পুরুষ অপেক্ষা অধিক অসহায় এমন ত বোধ হয় না। পুরুষ—গর্ব্ব লইয়া, পুরুষের স্বাধীনতা, পুরুষের বুদ্ধি লইয়াত্ সে জন্মিয়াছে—কিন্তু আজ সে সত্যই স্ত্রীলোকের অপেক্ষা অধিক সহায়হীন। সম্মুখে একটা মস্ত ভবিষ্যৎ পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন তাহার কিছুই নাই। পুরুষ—মানুষ হয়, কীর্ত্তি করে—কিন্তু সেই পুরুষ আবার স্ত্রীলোক হইয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদে। স্বাধীনভাবে আপনার জন্য এক মুঠা ভাতের সংস্থান করিতে শুধু মাথা কুটিয়া মরে। কিন্তু কেন এমন হয়? সে কার দোষ? শুধু অদৃষ্ট! পুরুষকার, আত্মচেষ্টা ওসব কেবল কথামাত্র। ভাবিয়া ভাবিয়া পাঁচু স্থির করিল, এই নিখিল সংসারব্যাপী অবিরাম প্রবহমান, তরঙ্গময় কর্ম্মস্রোত এক মহা নিয়তির অঙ্গুলির রহস্যচালিত খেলামাত্র!

পাচু বার বার ঐ কথাই ভাবিতেছিল। এমন সময় একখানা বড় জুড়ী রাস্তার অপর পারে, একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পল্লী গ্রাম হইতে একজন যুবক জমীদার আসিয়া সম্প্রতি ঐ বাড়ী কিনিয়াছিলেন। নূতন জমীদারের নিকট কলিকাতা একটা স্বপ্নপুরী বলিয়া ঠেকিয়াছিল—এখনও সে কুহকের ঘোর কাটে নাই। তিনি সকালে জুড়ী করিয়া ইংরাজ পাড়ার ভিতর দিয়া গড়ের মাঠ, আলিপুর, খিদিরপুরের গঙ্গাতীর ঘুরিয়া থাকেন—দুপুরে মোসাহেব লইয়া গল্প করেন, বা নিদ্রা যান—বৈকালে সকালের ন্যায় বেড়াইতে যান—সন্ধ্যার পর গ্যাসালোকিত, সুসজ্জিত বৈঠকখানা হইতে হারমোনিয়ম্, এসরাজের সুরের সহিত "তেরে নয়নোমে যাদু ভারা" বা "ফরামুষিনে দেল্ হারে, সনম্ জানে কি হাম্ জানে"—ইত্যাদি সুরস্রোত ছাড়িয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পল্লী জাগাইয়া রাখেন। আজ প্রায় এক মাসের অধিক

তিনি পাড়ায় আসিয়াছেন—ঘরের সম্মুখে প্রতিদিন গাড়ী আসিয়া দাঁড়ায়, বাবু, সাজিয়া বাহির হন—রাত্রিতে সঙ্গীত-ধ্বনি উঠে। পাঁচু এতদিন ভাল করিয়া দেখে নাই—শুনেও নাই। আজ সহসা গাড়ীর উপর পাঁচুর সমনোযোগ দৃষ্টি পড়িল। সুন্দর মূর্ত্তি, সুন্দর পোষাক পরিয়া একজন যুবক গাড়াতে উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন উঠিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। তাহাকে পাঁচু চিনিতে পারিল। সে বাঙ্গালা স্কুলের একজন সহপাঠী। অনেক দিন স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। বড় বড় পা ফেলিয়া ঘোড়া, গাড়ী লইয়া অদৃশ্য হইল।

গাড়া চলিয়া গেল। কিন্তু পাঁচুর মনের ভিতর হইতে গেল না। তাহার একটা নূতন ভাবনা জুটিল।

প্রথমেই পাঁচুর মাথার ভিতর যে কথাটা আসিল সেটা এই রকম। এ সংসারে কেহ আবশ্যকের অনেক অধিক সুখসম্পদ অধিকারী, ধনবান্ হইয়া জন্মে কেন, আর অন্য একজন তাহারই গৃহের পার্শ্বে, পথের উপর ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত হইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকে কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যে তোমার গাড়ীর চাকার উৎক্ষিপ্ত ধূলায় অন্ধ হইয়া পথে পড়িয়া যাইব, আর তুমি স্বচ্ছন্দে আমার জীর্ণ পঞ্জরের উপর দিয়া গাড়ী ছুটাইয়া চলিয়া যাইবে। এই কি ভগবানের পক্ষপাতশূন্য বিচার? সেই জন্য কি একই পথের একপারে, শুধু একজনের বিলাস-সুখের জন্য, দেহের নিম্নেস্থিত পা নামে, ভগবানের অতবড় দু'টা উদ্দেশ্যকে নিষ্ফল করিবার জন্য প্রতিদিন গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইবে, আর অপর পার হইতে একজন চিরদিন তৃষিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিবে এবং একটা নিষ্ফল আশার তীব্র যাতনা সহ্য করিবে? তুমি বলিবে পূর্ব্বজন্ম, পর-জন্ম, কর্ম্মফল, কত কি ছেলে-ভুলান ভূয়াকথা। হাঃ হাঃ! হাসি পায়। এমন কথাত শুনি নাই যে, ইহজন্মে কোন গতিকে একটা পাকা হরিতকি সংগ্রহ করিয়া, তোমার নিরন্ন ভিটায় পুতিতে পারিলে এবং চিরজীবন্‌ধৈর্য্য সহকারে উহাতে অশ্রু-সেক করিতে পারিলে, তাহা হইতে অসংখ্য অমৃতস্বাদী ফলের গাছ জন্মিয়া, পরজন্মে তোমার জন্য বড় বড় বাগান সৃষ্টি হইবে। ভাল! তাই বা মেলে কোথা? তাহা হইলে ত অনেক দিন পূর্ব্বে খুড়ীর হাঁড়ীর বানাব কাছ হইতে এই শূন্য উদরটাকে সরাইয়া ফেলিতে পারিতাম। কিছু নয়! আজ ঠিক বুঝিয়াছি। পাপপুণ্য—শুধু জুজুর ভয়। পাচুর এই সময় একটা রাম-প্রসাদী গান মনে পড়ায় হাসিয়া আকুল হইল—"আমি নই আটাসে ছেলে।"

তারপর পাঁচু ভাবিল। বেশ! তোমার পূর্ব্বজন্ম, তোমার সুকৃতি দুষ্কৃতি মানিলাম। সেই জন্যই ঐ বাবুটা আজ ধরায় মস্ত জমীদারলীলা করিতেছেন কিন্তু বাপু! ঐ যে উহার পাশে আর একটী—নিরক্ষর, আমাপেক্ষা অনেক বুদ্ধিহীন ব্যক্তি বসিয়া—ক্লাশে প্রতিদিন সকলের নিচে থাকিত, এখনও ঐ গিলেকরা, সুইসের লম্বাআস্তিন জামা তুলিলে, পিঠে মাষ্টারের বেতের অনেক দাগ বাহির হয়—ঐ বাবরি কাটা লতানে চুলে মাথার কালশিরার দাগ ঢাকিয়া বেড়াইতেছে—ঐ মূর্খ! কি সুকৃতি করিয়াছে, যে অতবড় জমীদারের

ভোগবিলাসের অংশীদার হইয়া বেড়াইবে। কোন চেষ্টা নাই, ভাবনা নাই, খসখসে দেওয়া পাখার হাওয়ায় কপালে একবিন্দু ঘাম জমিতে পায়না স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়া যাইতেছে। আজ উহার গাড়ীর পাশে বসিতেছে, কাল হয়ত ঐ জমীদারেরই অর্থে উহার বাড়ীর পাশে ঐরূপ বাড়ী তুলিবে। আর হয়ত প্রতিদিন এক একটা ছোট টুকরা ইট আমাদের রান্নাঘরে ছুটিয়া আসিয়া খুড়ীর তপ্ত ভাতের হাঁড়ী ফাঁসাইয়া দিবে। ধিক্ ধিক্! কে বলিবে আমি উহার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান! তাহা হইলে আজ আমি কেন উহাকে গাড়ী হইতে মাটীতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, ঐ স্থান অধিকার করিয়া বসিতে পারিতেছিনা? এই কথাই ঠিক! ভগবান আছেন—আর তিনি নিতান্ত বিচারশূন্য নহেন। এই পৃথিবীর উপর, ঐ রকম বড় বড় গাছের তলায় তিনি টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছেন। গাছ চিনিয়া লইয়া, তলা খুঁড়িতে পারিলেই হইল! ও লোকটা ঠিক বুঝিয়াছে। বাঃ! কি সহজ উপায়! দেখদেখি, এতদিন এ বুদ্ধি আমার মাথায় আসে নাই! আহা! ভগবান্ আছেন। তিনিই সময় বুঝিয়া সবিতারূপে বুদ্ধির প্রেরণা করিয়া থাকেন। এতদিন সে লগ্ন আসে নাই। এখন দেখি কি করিতে পারি! উৎসাহে পাঁচু বুকে চাপড় মারিল।

কথাগুলা যত মনের মধ্যে তোলাপাড়া, নাড়াচাড়া করে, পাঁচুর ততই আনন্দ হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে পাঁচুর নিদ্রাকর্ষণ হইল। পাঁচু হাতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিল—

যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটা প্রকাণ্ড আদি অন্তহীন, প্রশস্ত পথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পথের ধারে কেবল সারি সারি জুতার দোকান। বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র আকারের জুতা সাজান রহিয়াছে। পথের উপর মানুষ নাই। কেবল দলে দলে, পা আসিতেছে যাইতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, চলিতেছে। আবার কেহ যানে, কেহ অশ্বপৃষ্টে কেহ পাল্কির ভিতর। কিন্তু সওয়ার, চালক বাহক, সকলেই ঐ পা। সেই অসংখ্য মানব পদের প্রায় সকলেই অপূর্ব্ব জুতা শোভিত। কেহ চটি, কেহ বুট, কেহ স্প্রিংওয়ালা, কেহ হণ্টিং, কেহ বগলোষ, কেহ ফিতাবাঁধা। সেই প্রশস্ত বর্ত্মের উপর দিবারাত্রি গতিশীল সংখ্যাতীত পদসংলগ্ন জুতার বিচিত্র শব্দে, এক অপূর্ব্ব ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছে। পাঁচু সে উপানহ জাতির ভাষার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না—কিন্তু সেই পথবাহী বিনামা কুলের ভিতর যে একটা কথার আদান প্রদান চলিতেছে তাহা অনুমান করিতে পারিল। সহসা একটা বড় জুতার দোকানের সম্মুখে একখানা বড় জুড়ী আসিয়া লাগিল। পাঁচুর বোধ হইল যেন, উহা সেই জমীদারের গাড়ীরই মত। তাহা হইতে কিংখাবের পায়জামা মোড়া একজোড়া সুন্দর, বিনামাহীন চরণ নামিল। পদদ্বয় দোকানে উঠিবামাত্র, সেই দলে দলে সজ্জিত জুতার ঝাঁক সমস্বরে কিচি কিচি শব্দ করিয়া উঠিল। ক্রমে চরণদ্বয়, একের পর, আরেক. এইরূপে প্রায় সকল জুতাই পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কোন জোড়া মনের মত হইল না।

নিরাশ হইয়া পদ যুগল ফিরিয়া গাড়ীতে উঠিবে। পাঁচু গাড়ীর চাকার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ পাঁচুর দেহে সেই অপূর্ব্ব চরণ স্পর্শ হইল। স্পর্শমাত্র পাঁচু মানবদেহ ত্যাগ করিয়া, একজোড়া সুন্দর জরীর কাজ করা চটীতে পরিণত হইল এবং বিনামাজন্ম লাভ করিবামাত্রই সেই চরণদ্বয়ে সংলগ্ন হইয়া গেল।

চটা চট্, পটা পট্— কি শব্দ! পাঁচু-সেই কিংথাপমোড়া পা বুকে করিয়া অসাধারণ উৎসাহের সহিত পথের মাঝ-খান দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে। পথের উপর হইতে পায়ের ভিড়, পথের দুইপাশে সরিয়া গিয়াছে। এবং সেই সকল পদসংলগ্ন বিনামাকুল বিস্মিত হইয়া পাঁচুকে দেখিতেছে। হণ্টিং-ওয়ালারা শত চক্ষু মেলিয়া, স্প্রিংওয়ালারা স্প্রিংএর কাণ খাড়া করিয়া পাঁচুকে দেখিতেছে ও তাহার শব্দ শুনিতেছে। কাহারও মুখের ভিতর হইতে লম্বা জিব বাহির হইয়া পড়িয়াছে— কাহারও কসের পাশ দিয়া দন্ত বিকাশ হইয়াছে। সকলেই বিস্মিত, শঙ্কিত, স্তম্ভিত। কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিল "বোধ হয় কোন সম্ভ্রান্ত, বনিয়াদি বিনামা বংশের দৌহিত্র সন্তান হইবে। নতুবা এত শব্দ ও সাজ। বাঃ! মখ-মলের উপর কি চমৎকার সাঁচ্চা কায।" পাঁচু দ্বিগুণ শব্দে তাহাদের বিস্ময়-বর্দ্ধন করিয়া, তাহাদের গা ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল। সকলেই অবাক!

পাশ দিয়া একজোড়া ধুলামাথা, ফাটা, শিরাযুক্ত, জুতাহীন শীর্ণপদ চলি-তেছিল। পাঁচু হাঁকিয়া বলিল "কেহে! তুমি বেল্লিক? পথের ধূলা উড়াইয়া গায়ে দাও? তুমি আমাকে চেন না? চটীর মর্য্যাদা বুঝ না।

তখন সেই মাংসহীন শীর্ণ পদের ভিতর হইতে কথা বাহির হইল। সে বলিল "আমি বাপু! একজন পথিক। অত রাগ কেন? তোমার চেহারা দেখিয়া বেশ ভদ্র বলিয়াই বোধ হয়। পরিচয়টি কি বাপু?"

পাঁচু। আমাকে চেন না। তবে দুনি-য়ার কি খবর রাখ। আমি * * ঘাটীর মহা চট্টোবংশাবতংশ। ফুলপুকুরের ওঁরা আমাদেরই বাড়ীর ভাগ্নে। ঠনঠনিয়ার যাঁহাদের আজকাল বড় পসার প্রতিপত্তি আমাদেরই ঘরে খেয়ে মানুষ। তবে সম্প্রতি বড়লোক হইয়া আলাদা হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বের কথা আর মনে নাই।

শুনিয়া সেই সঙ্গী, পথচারী চরণ কহিল "ওঃ! তাহা হইলে ত দেখিতেছি তুমি একজন মস্ত কুলীন। ভাল! ভাল!

"ক্যাঁচ" করিয়া পাঁচু হাসিল। বলিল "ওহে বাপু! মুচিখোলা নামে একটা স্থানের নাম শুনেছ? সেটা আমাদেরই মাতৃভূমি। অতি পুরাকালে ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত "মুচি" নামে একজন রাজা প্রথমে ঐ স্থানে আসিয়া রাজ্য-স্থাপন করেন। "মুচি" বা "মোচি" স্বর্গে অমরপতি ইন্দ্রের বিনামা প্রস্তুত করিতেন। ভাল কথা! তোমার কিছু শাস্ত্র পড়া আছে?

চরণ কহিল "কিছু কিছু! তুমি কোন শাস্ত্রের কথা কহিতেছ?

পাঁচু। উপানহ্-পুরাণ।

চরণ। নাম শুনি নাই বাপু। মিথ্যা কহিব কেন? তবে পুরাণটা কি একটা শাস্ত্র?

আবার "ক্যাঁচ" করিয়া শব্দ হইল। পাঁচু বলিল—ভাল! পড় নাই আবার বাক্য ব্যয় কর কেন? আমি বলি, মনদিয়া শুন। ঐ পুরাণেই আমাদের বংশপরিচয় পাইবে। তাহাতে লেখা আছে "মোচি" ত্রিদশাধিপের উপানহ-কার ছিলেন। ভগবান ইন্দ্র তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করেন 'অতঃপর তুমি মর্ত্ত্যে গিয়া এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইবে। চরণের আধি মোচন কর বলিয়া। তোমার নাম "মোচি" হইল। তোমার সন্তান সন্ততি গণ জগতে প্রথিতযশা হইবে। এবং নামের বিশেষরূপ পরিব্যাপ্তি হইবে বলিয়া. উহারা "বিনামা" আখ্যা পাইবে। শুনিতেছ?"

চরণ 'হুঁ' দিল। পাঁচু বলিতে লাগিল "সেই রাজবংশের আদি-পুরুষ 'মোচিরাজ' যেখানে আসিয়া প্রথমে রাজ্যস্থাপন করেন, সেই স্থান আজও মুচিখোলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখন কতকটা আমা-দের বংশপবিচয় পাইয়াছ?" সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় রকম 'ক্যাঁচ' শব্দ হইল।

চরণ একটু গা ঝাড়া দিয়া বলিল "তোমার পূর্ব্ব গৌরবের কথা যথেষ্ট শুনিলাম। তোমার আধুনিক কিছু পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি। যাঁহাকে তুমি আশ্রয় করিয়া আছ দেখিতেছি উনি কে?"

পটা পট্ শব্দ হইল। চরণ বুঝিল চটি চটিয়াছে। সে একটু সরিয়া গেল। তখন পাঁচু কহিল" কোন শাস্ত্রইত পড়া নাই দেখিতেছি। ভাল! শব্দশাস্ত্রটাতেও কি একটু দৃষ্টি রাখিতে নাই? ঐ যে আশ্রয় কথাটা প্রয়োগ করিলে, ওটার তাৎপর্য্য কি জানা আছে? শব্দ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহার অর্থবোধ হওয়া উচিত!"

কিছু বিস্মিত হইয়া চরণ কহিল "অতটা শব্দশাস্ত্র জ্ঞান আমার নাই বাপু। তবে দেখিতেছি উহার তলে তোমার দিনরাত কাটিতেছে; এবং ঐস্থান হইতে সরিয়া পড়িলে তোমার বল, বীর্য্য গতি সব শেষ হইয়া যায়। তখন তোমা-দের মধ্যে সম্বন্ধের কথা কহিতে গেলে সহজেই আশ্রয়, আশ্রিত ভাবটাই আগে মনে আসে। সুতরাং শব্দটা প্রয়োগ কালে অতটা দোষের হইয়া দাড়াইবে বুঝিতে পারি নাই।"

পাঁচু রাগিয়া কহিল "সে বুদ্ধি থাকিলেই বা তোমার এ দশা কেন? তুমি জান—আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কত মহৎ। একনিষ্ঠ পরহিতব্রতই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমরা না থাকিলে আজ জগতের অভাগা চরণ-কুলের কি দুর্দ্দশা হইত, বুঝিতে পার? কঠিন তপ্ত, ধূলিময়, মৃত্তিকার সহিত নিয়ত সংগ্রামের মাঝে আসিয়া, অকুতো-ভয়ে আপনাদের প্রশস্ত বক্ষ পাতিয়া দিয়া, সকল ক্লেশ আয়াস সহ্য করিয়া, নির্ম্মম মৃত্তিকাকে কে অবিরত পরাভূত করিতেছে? ধিক! তুমি কহিলে আশ্রয় করিয়া আছি! ন্যায় শাস্ত্র কিছু জান? "তৈলাধাব পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল" সে বাক্যটা মনে পড়ে? আর সে সমস্যার উত্তর কি?

তখন চরণ ধীরে ধীরে কতকটা সভয়ে কহিল, "পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাপু! আমার কোন শাস্ত্রই ভাল রকম জানা নাই।

পাঁচু বাধা দিয়া কহিল—"বাক্যেনালম্। তোমার বিদ্যা অনেক পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। এখন বিনামা-তত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

চরণ কহিল—"তথাস্তু"।

পাঁচু কহিতে লাগিল—"যে সম্মানের আমি যোগ্য, যাহাতে আমার ন্যায্য অধিকার, তাহার তিলমাত্র তোমার নিকট হইতে প্রত্যাশা করি না। চটী বলিয়া বোধ হয় তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ। গুল্‌ফ, তোমাদের প্রাকৃত ভাষায় যাহাকে গোড়ালী কহে, সেই উচ্চ আসনে আসীন দেখিলে বোধ হয় তুমি আমার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে এত কুণ্ঠিত হইতে না। কিন্তু হে পদমহাশয়। সেই এড়িতোলা রূপে যাহাদের দেখিয়া থাক, তাহাদের যে আমরাই পূর্ব্বপুরুষ; এবং তাহারা যে Evolution সিঁড়ির শুধু একটা পৈঠে উঠিয়াছে মাত্র এটুকু বুঝ না?"

চরণ কহিল—"ঠিক বলিয়াছ বাপ। চটীরই পশ্চাদ্ভাগে কতকটা চর্ম্মবৃদ্ধি হইলেই ঘোড়তোলা বা এড়িতোলা হইয়া দাঁড়ায়। বাঃ! সুন্দর রহস্য। ইহাই প্রকৃত ক্রমবিকাশ। Darwin সাহেব ঠিক উল্টাটা বুঝিয়াছিলেন।

পাঁচু মৃদু হাসিয়া কহিল—"বেশী কথা খরচ না করিয়া শুনিয়া যাও। বড় বড় তত্ত্ব জানিতে পারিবে। "বুট" নামে এক শ্রেষ্ঠতর- বিনামা বংশের নাম শুনিয়াছ?"

চরণ। তোমাদের মৌলিক সনাতন চটী বংশেরই একটা বিদেশী শাখা বলিয়া বোধ হইতেছে, কেমন?

পাঁচু। হাঁ। তাই বটে। তবে উহাঁরা অনেকটা উন্নততর অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন।

চরণ। সে কথা সত্য! বিশেষতঃ উহাদের চর্ম্মটা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়াছে। বোধ হয় উহারা Evolution সিড়ির অনেকগুলা ধাপ উপরে উঠিয়াছেন!

পাচু। তুমি কি কথা সংক্ষেপ করিতে জান না? যাক্—উহাদের জীবনের একখানি এত কত মহৎ তাহা জান?

চরণ। কাহাদের বাপু? তোমাদের "বুট" নামে বিদেশী বংশধরগণের? আহা। অতি সাধু—শুধু অসহায় চরণকুলের গ্রাসাচ্ছাদন। কেমন?

পাচু। কথাটা ভাল বুঝিলাম না।

চরণ। কথাটা খুবই সোজা। আমি দেখি ঐ বুটাখ্য মহাত্মাগণের তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গ্রাস করিবার শক্তি কিছু অধিক। যখনই উহাঁরা দেখেন চরণকুল খুব নিশ্চিন্তভাবে, অবাধে, স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর উপর স্বেচ্ছামত চলিয়া বেড়াইতেছে, তখনই উহাঁরা সেইখানে আপনাদের মহৎ সংকল্প লইয়া উপস্থিত হন—তাহাদের উপানহ-সঙ্গহীন অসহায় অবস্থা দেখিয়া কাতর হইয়া পড়েন—ক্রমে ধীরে ধীরে আপনাদের সমস্ত কায়া দিয়া উহাদের রীতিমত আচ্ছাদন বা গ্রাস করিয়া, বুঝাইয়া বলেন—"হে অভাগা চরণগণ! আজ হইতে আমরা তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইলাম।" "হত ইতি গজ" ন্যায়ের হিসাবে কথাটা খুব সত্য বটে। যাহা হউক বাপু! কথায় কথায়, তোমাদের জীবনের ইতিহাসের

অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এই-খানেই বিদায় লইতে ইচ্ছা করি।

পাঁচু। "বক্তা শ্রোতাচ যত্রাস্তে রমন্তে তত্র 'সম্পদঃ।" তোমার মত শ্রোতা পাইয়া বড় সুখী হইয়া ছিলাম। যাহা হউক তুমি এখন যাইতে পার। অসময়ে উপকারের প্রয়োজন হইলে আমায় স্মরণ করিও।

চরণ চলিয়া গেল।

পাঁচু দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু কতদিন—স্বপ্নে সেটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। একদিন পাঁচু দেখিল তাহার জরী ঝরিয়া পড়িয়াছে—মখমল বিবর্ণ হইয়াছে—এবং তলায় অনেক গুলা ছিদ্র হইয়াছে। আরও বোধ হইল, যে পদে এতদিন সংলগ্ন হইয়াছিল, তাহাপেক্ষা কতকটা বড় হইয়া ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে। পাঁচু প্রাণপণে পা দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া রহিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু পারিল না। শেষে একদিন চরণচ্যুত হইয়া পথে পড়িয়া গেল। যে চরণ এতদিন তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল সে অন্য জুতার সন্ধানে চলিয়া গেল। পাঁচু শক্তিহীন হইয়া জড়ের মত পথের ধারে পড়িয়া রহিল।

পথের উপর একদল কুক্কুর বেড়াইতেছিল। পাঁচুকে দেখিয়া, অতি উপাদেয় খাদ্য বিশেষ হইবে বিবেচনা করিয়া ছুটিয়া আসিল। দন্ত, জিহ্বা নখ দিয়া একে একে পরীক্ষা আরম্ভ করিল। পাঁচু যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "ভো! ভো! শ্বাপদাঃ।"

কুকুরের দল ভয়ে দূরে সরিয়া গেল। এরূপ বাঙ্ময় ভোজ্য পদার্থ ইতি পূর্ব্বে কখন দেখেনাই। তাহাদের পলাইতে দেখিয়া পাঁচুর ইচ্ছা হইল পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া একবার বিজেতা বীরের গর্ব্ব ও আনন্দ কতকটা উপভোগ করে। কিন্তু দেখিল সর্ব্ব শরীরব্যাপী পক্ষাঘাত-গ্রস্তরোগীর ন্যায় তাহার নড়িবার পর্য্যন্ত শক্তি লোপ পাইয়াছে। একবার হাসিবার চেষ্টাকরিল, কিন্তু তাহাতে জোর পৌঁছিল না। শুধু আশে পাশের ছিদ্র-দিয়া খানিকটা বাতাস বাহির হইয়া গেল। পাঁচু পথের ধারে পড়িয়া রহিল। সেই নিরাবরণ পথেব উপর পড়িয়া পড়িয়া পাঁচু রৌদ্র বৃষ্টি শীতের যাতনা সহ্য করিতে লাগিল। পথ দিয়া দলে দলে পা যায় আসে। সেই সকল পদসংলগ্ন জুতারা শব্দ করিয়া গল্প করিতে করিতে ধূলা উড়াইয়া চলিয়া যায। সে ধূলা পাঁচুর গায়ে আসিয়া পড়ে। পাঁচু দেখে যাহারা পূর্ব্বে তাহাকে দেখিলে পথছাড়িয়া দিয়া পাশে গিয়া দাড়াইত, তাহারা এখন পাঁচুকে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া হাসে যাইবার সময় পাঁচুব কাছে আসিয়া এমন জোব করিয়া মাটিতে আঘাত করে ও গা ঝাড়া দেয় যে এক একখানা ধূলার মেঘ সৃষ্টি হইয়া পাঁচুকে ঘিরিয়া ফেলে, পাঁচুর শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়।

একদিন বড় জোরে পথের উপর শব্দ হইতে লাগিল। পাঁচু দেখে এক জোড়া বিলাতি বুট সগর্ব্বে সশব্দে সেই দিকে আসিতেছে। বুট যখন কাছে আসিল, তখন কষ্টে পাঁচু ফাটিয়া যাইবার মত হইল। কিন্তু তাহা হইল না, শুধু ছিদ্র দিয়া এক ঝলক গরম বাতাস বাহির হইয়াগেল। জুতার ভিতর যে চরণ প্রায় আগ্রীব মগ্ন হইয়াছিল দেখিয়াই পাঁচু তাহাকে চিনিতে পারিল।

সে পাঁচুর পূর্ব্বের আশ্রয় ও অবলম্বন। পাঁচুর কান্না আসিল, কিন্তু ভাবিল যাহাহউক ঠকা হইবে না।

বুট কাছে আসিয়া সজোরে পাঁচুর গায়ে ধাক্কা দিল। পাঁচু দুই তিনটা উলট খাইয়া পড়িয়া গিয়া বলিল "আঃ কি আরাম!"

বুট জোরের মাত্রা চড়াইয়া, আর একবার পাশের দিকে ধাক্কা দিল। পাঁচু শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া, দুটা ডিগবাজী খাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। বুটের ভিতর হইতে পা বলিল "কেয়া কায়দা!"

বুট বলিল "বা!—তোমার ত ব্যায়াম কৌশল খুব অভ্যস্ত দেখিতেছি।

পাঁচু হাসিয়া বলিল "বলেন কি হুজুর আর্য্য ব্যায়াম শাস্ত্রটা—যাক! তুমি ম্লেচ্ছ তোমার সঙ্গে কি শাস্ত্র কথা কহিব।

বুট। ভাল! ভাল! এখন তোমার সেই শাস্ত্র জ্ঞানের কিছু পরিচয় দাও দেখি। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচুর পার্শ্বে আবার সজোরে আঘাত আরম্ভ হইল। পাঁচু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আছাড় খাইয়া পড়ে, চোখে মুখে ধুলাকাদা ঢুকিয়া যায়, নিশ্বাস বন্ধ হইবার মত হয়। বুটের ভিতর হইতে বাবু চরণ বলে "ক্যা খুব"। সেইটা সবচেয়ে পাঁচুর বেশী লাগে।

তখন পথের উপর একটা জনতা হইয়া দাঁড়াইল। দলেদলে পা আসিয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সকলেই হাসে, মজাদেখে আর চরণ বাবুর কথার অনুকরণ করিয়া বলে "ক্যাখুব।" বুটও ছাড়ে না।

পথের ধারে একটা জুতার দোকানের পাশে একটা শৈবালাচ্ছন্ন দুর্গন্ধ পঙ্কিল জলময় পুষ্করণী ছিল। যখন কণ্ঠাগত প্রাণ, তখন পাঁচু নিরূপায় হইয়া শূন্যে একটা বড় রকম ডিগবাজী খাইয়া তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পাঁচুর পতনে জলে আন্দোলন হইল। ভেকেরা ডেঙায় লাফাইয়া উঠিল—মাছেরা ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটী করিতে লাগিল। তখন প্রায় কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত। কিন্তু পাঁচু ভাবিল হায় হায়! আমার হতভাগ্য স্বজাতিগণ আমায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই, তাই আজ আমার এত অসম্মান! অধম তীর্য্যক জাতীয় মৎস্য ভেকগণের যে বুদ্ধি আছে শ্রেষ্ঠ জীবাভিমানী বিনামাকুলের সেটুকুও নাই। ধন্যোহং! মরিবার পূর্ব্বেও আমার অদৃষ্টে এতখানি সম্মান লেখা ছিল। পাঁচু গম্ভীরস্বরে মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া ত্রস্ত ও পলায়নপর ভেক ও মৎস্যগণকে অভয় দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শুধু জলের ভিতর "বুড় বুড়" করিয়া একথা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে জলের উপর গোটাকতক বুদ্বুদ ভাসিয়া উঠিল।—চারিপাশের ছিদ্র দিয়া পাঁচুর শরীরের ভিতর তখন জল ঢুকিতে ছিল ও তাহার ভারে পাঁচু তলার দিকে নামিতে ছিল।

পাশ দিয়া একটা বড় মাছ ছুটিয়া যাইতেছিল। তাহার লম্বা ল্যাজটা বেগে আছড়াইয়া পাঁচুর গায়ে লাগিল। তলায় পেঁছিতে যে টুকু বাকী ছিল এইবার তাহা হইল।

পাঁকের উপর গোটা কতক বড় মাছ মজলিস করিয়া বসিয়া ছিল। পাঁচুকে দেখিয়া তাহারা সভা ভাঙ্গিয়া দিল। জলে ঢেউ উঠিল। পাঁচু ভাসিয়া কতক গুলা জলজ গুল্মের মূলের ভিতর

গিয়া বদ্ধ হইল। নড়িবার ফিরিবার ভাসিবার স্বাধীনতা টুকুও শেষ হইল। মাছেরা ছুটে, জল কাঁপে। তলা হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প ও পাঁক উঠিয়া পাঁচুর চারি দিক ঘেরিতে লাগিল। পাঁচুর প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলায়—কিন্তু সে শক্তি নাই। তখন পাঁচু যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে। তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। ঘরের ভিতর খুব অন্ধকার। পাঁচুর ভ্রম হইল সে সত্যই বুঝি পুকুরের তলদেশে গুল্মের মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ক্রমে অল্পে অল্পে ভ্রম দূর হইল—একে একে বৈকালের সবকথা মনে পড়িতে লাগিল। যখন জাগরণের কাছ হইতে স্বপ্ন অনেকটা দূরে সরিয়া গেল তখন পাঁচু ভাবিল ভগবান্ সত্যই আছেন। আর তিনি সবিতারূপে লোক হিতার্থ, যে শুধু গাছ চিনিয়া তলা খুঁড়িবার সুবুদ্ধি প্রেরণ করেন, তাহা নহে মধ্যে মধ্যে স্বপ্নও প্রেরণ করিয়া থাকেন।

উঠিয়া পড়িয়া পাঁচু প্রায় এক সপ্তাহের ভিতর একটা মাষ্টারি যোগাড় করিল। এবং কলেজ খুলিবা মাত্র আবার ভর্ত্তি হইল।

শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত।

রামসিংহ কুকা।

A wake ! arise ! or be for ever fallen !
They heard, and were abash'd, and up they sprung
—*Milton.*

They died a bloody death * * * *
The Warrior's Wife.

[১]

বেশী দিনের কথা নয়—সিপাহী-বিদ্রোহের অনেক দিন পরে, পঞ্জাবে একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় ওয়াটার্লু চিলিয়ান্‌ওয়ালার তুলনায় তুচ্ছ হইলেও তাহা একটী শোণিতময়ী কাহিনী!

শিখ-শাসন-কালে পঞ্জাবে গো হত্যার নাম ছিল না। গোহত্যাকারীকে জীবন্ত শূকরের সহিত জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। একবার মুসলমানেরা অমৃতসরের "গুরু-দরবারে" * গো হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিল, শিখগণ মুসলমান-রক্তে গো-রক্ত ধুইয়া প্রতিশোধের প্রতিশোধ লইয়াছিল! আর একবার এক

* এই স্থানে গুরুগোবিন্দ সিংহের তরবারি আছে। শিখগণ উক্ত তরবারির পূজা করিয়া থাকে।

জন মুসলমান গো-পীড়ন অপরাধে কুক্কুর-দ্বারা ভক্ষিত হয়। সেই অবধি পঞ্জাবে একটী নূতন শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। কোন জোর জুলুমের কথা শুনিলেই লোকে তাহাকে "শিখ্‌খেশাই" নামে অভিহিত করে।

[২]

তাহার পর পঞ্জাব-কেশরীর সঙ্গে রাজলক্ষ্মীও দেশ ছাড়িলেন। অসহায় শিখ দ্বিতীয় ওয়াটার্লুর অবতারণা করিয়া তাঁহার অনুগামী হইল; জয়লক্ষ্মী চির-দিনের জন্য ইংরাজের অঙ্কশায়িনী হই-লেন—রণজিতের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল! †

শিখগণ নিরস্ত্র হইয়া বহুকাল উদ্দেশ্য হীন জীবন অতিবাহিত করিল। সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার নিষেধ, শিখ-হস্তে অস্ত্র দেখিলে ইংরাজ সশঙ্কিত, তৎক্ষণাৎ অস্ত্রত্যাগের আজ্ঞা প্রচার, ইত্যাদি নানা কারণে শিখগণ নিরাশ-ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। মস্তক-হীন দেহের আর কি আশা থাকিতে পারে? কিন্তু তখনও পুণ্যভূমি পঞ্চনদ গো-রক্তে কলঙ্কিত হয় নাই, তখনও শিখের নামে যবনের হৃদয় কাঁপিত!

তাহার পর ১৮৫৭ সালের শোণিত-ময়ী বিভীষিকা!! পাটনায় কুমার সিংহ, কানপুরে ব্রিটীশ-ত্রাস নানা ছিন্ন ভিন্ন ইংরাজদেহ নৌকা বোঝাই করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিল। উপরে লিখিয়া দিল—"যে কেহ হিন্দু এই নৌকা দেখিবে তীরে লাগিতে দিবে না!" কত নৌকা পঞ্চনদে ভাসিয়া আসিল,—মিয়ান্‌মীর ও গুরুদাসপুরের 'পুরবিয়া' সৈন্য বিদ্রোহী হইল! ইংরাজ তখন নিরাশ হইয়া শিখের আশ্রয় লইল। এদিকে রাম ওদিকে রাবণ, এক দিকে তো মরিতে হইবে—ইংরাজ শিখের আশ্রয় লইল। ইংরাজ চিরকৌশলী। তাহারা অনেকে শিখ-গুরুর প্রসাদ খাইয়া শিখ-বেশে সজ্জিত হইল; এক হস্তে তরবারি ও অন্য হস্তে শিখের ধর্ম্ম-গ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' লইয়া গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে শিখের সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিল। বহুদিবসের পর তর-বারির সাক্ষাৎ পাইয়া শিখ-হৃদয় নাচিয়া উঠিল; রক্তাশী বিদ্রোহীর রক্ত-পিপাসা মিটিল, শিখ-করবাল-মুখে তাহারা শৃগাল-ভোজ্যে পরিণত হইল!! সেই অবধি ইংরাজ-সৈন্যে শিখগণ প্রবেশাধি-কার পাইল।

৫৭ সালের শোণিত-রেখা ভারতের হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল,—দিন যেরূপে কাটিতেছিল কাটিতে লাগিল। বাঙ্গালী-গণ দলে দলে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া এদেশে আসিতে লাগিল। আজ কাল যেরূপ লাহোর তখন সেরূপ অমৃতসর বাঙ্গালী-দের হেড্‌ কোয়ার্টার্স্‌ ছিল, সুতরাং বলা বাহুল্য, অমৃতসরে তখন বিস্তর বাঙ্গালী। আমার পিতা, পিতামহী, জ্যেঠা, খুড়া, পিসি, পিস্‌তুতভাই—এক কথায়, সকলেই অমৃতসরে ছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখেই আমার এই প্রবন্ধের ঘটনাটী সংঘটিত হয়।

† ভারতবর্ষের মানচিত্রের একস্থান লালবর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া রণজিৎ জনৈক পারিষদকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ঐ স্থান ইংরেজাধিকৃত শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "সবলাল হো যায়গা!" অর্থাৎ "সবলাল হইয়া যাইবে"। ইহাই রণজিতের ভবিষ্যদ্বাণী।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর অনেক বৎসর কাটিল। মুসলমানগণ 'শিখ্‌খেশাই' ভুলে নাই, তাহারা ভাবিল, যখন শিখেরা ইংরাজের অধীনে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে তখন উহাদের তেজোদ্যম গিয়াছে, আর উহারা ইংরাজ-শাসনকে উপেক্ষা করিতে সাহস করিবে না। এই অবসরে তাহারা 'শিখ্‌খেশাই'য়ের প্রতিশোধ স্বরূপ স্থানে স্থানে গো-হত্যা আরম্ভ করিল। শিখ-তীর্থ অমৃতসরে গোহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল! শিখের হৃদয়ে আঘাত লাগিল, তাহারা গ্রামে গ্রামে ঐ কথার আন্দোলন করিতে লাগিল। মাথা নাই, কি করিবে? রণজিৎ নাই, শের নাই, আফগান-ভীতি ললুয়া * নাই—কাহার নিকট হৃদয়ের ব্যথা জানাইবে? তাহারা নীরবে সকল সহ্য করিল। কিন্তু শার্দ্দুলের আস্ফালন সিংহ কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? গো-হত্যার বাড়াবাড়ি দেখিয়া তাহার নিবারণের উপায়োদ্ভাবন-মানসে অমৃতসরের ভদ্র শিখগণ এক গুপ্ত-সভা আহ্বান করিল।

[৩]

গভীর নিশীথে, জনহীন প্রান্তরে, নক্ষত্র-খচিত আকাশ-তলে বসিয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, যে কোন প্রকারেই হউক এই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে হইবে।

দূরে অমৃতসর নগরী সুপ্ত; বৃহন্নগরী মধ্যাস্থিত সুরম্য হর্ম্মরাজিতে চেতনার একটী ক্ষীণ স্পন্দও নাই, যেন সকলেই স্তব্ধহৃদয়ে একটী শোণিতময়ী বিভীষিকার প্রতীক্ষা করিতেছে! দূরে—নিকটে, বৃক্ষপল্লবে, অনন্ত শূন্যে সমীরণ সুপ্ত,—প্রকৃতি স্থির, নিস্পন্দ; কি যেন এক মলিনভাবে সকলই আচ্ছন্ন, যেন সেই মলিনতা দূর নক্ষত্রমণ্ডলীকেও স্পর্শ করিয়াছে! সেই বিভীষিকাময়ী রজনীতে, দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তরের বুকে দাঁড়াইয়া সভাপতি প্রতিজ্ঞা করিলেন—"শোণিতে শোণিতের প্রতিশোধ লইব!" সকলে সমস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিল—"শোণিতে শোণিতের প্রতিশোধ লইব!!"

দূরে শৃগাল প্রহর ডাকিল।

সভাপতি বলিলেন—"ভ্রাতৃগণ! আর ঘুমাইও না! উঠ, আমাদের জন্মভূমি গো-রক্তে রঞ্জিত হইল, একবার চাহিয়া দেখ! জীবনের মায়া ত্যাগ করিতে পারে এরূপ শিখ কি আমাদের মধ্যে একজনও নাই? শিখ কি এতই নির্বীর্য্য হইয়াছে? রণজিতের চিতাভস্মের একটী সামান্য পরমাণুও কি পঞ্চনদে নাই?"

গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল—"আছে!" সকলে চমকিয়া দেখিল—এক অশীতিপর বৃদ্ধ।

সভাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

"আমার নাম রামসিংহ। আমি কুকা সম্প্রদায় ভুক্ত।"

---

* হরিসিংহ ললুয়া। বঙ্গদেশে যেরূপ "বর্গী" আফগানিস্থানে সেইরূপ ললুয়ার নামে আফগান শিশু নিদ্রা যায়। হরিসিংহ ললুয়া আফগানগণের কিরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন, সুতরাং সে বিষয় অধিক বলা বাহুল্য। যে হরিসিংহের নামে দুর্দ্দান্ত পাঠানের হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠে সে হরিসিংহ যে কিরূপ লোক ছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

"আপনি স্বেচ্ছায় এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইতেছেন ?"

"শিখ অনিচ্ছায় মরে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি কেবল মাত্র বিংশতি জন অনুচর লইয়া কার্য্য সিদ্ধ করিব।"

"কুড়িজন মাত্র লইয়া আপনি কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন ? তাহারা সংখ্যায় অন্যূন দুই শত।"

"না হয় মরিব! সিংহ এত নির্বীর্য্য হয় নাই যে দুই শত শার্দ্দুল দেখিয়া ভীত হইবে।"

সকলে গর্জ্জিয়া উঠিল!

সভাপতি অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"এখন অস্ত্র ?"

সকলের মুখ বিমর্ষ হইল,—মুখের হর্ষ-ভাতি প্রভাত-শশাঙ্কের ন্যায় মলিন হইল!

রামসিংহ কুকা গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"তাহার উপায়ও করিয়াছি। কতিপয় সিপাহীর নিকট হইতে কতকগুলি তরবারি সংগ্রহ করিয়াছি।"

সকলের মুখে লুপ্ত হর্ষ-রেখা পুনর্ব্বার ফুটিয়া উঠিল! সেই নক্ষত্রালোকিত রজনীতে নৈশ ভীষণতার বুক ভেদিয়া শব্দ হইল—'সত্য শ্রী অকাল!!" *

দূরে—প্রান্তর-প্রান্ত-স্থিত কোন জটাবহুল বটবৃক্ষ হইতে পেচক তাহার প্রতিধ্বনি করিল!!

তাহার পর রামসিংহ প্রস্তুত হইলেন। বিংশতি জনের অধিক অনুচর লইলেন না। সকলেই স্বসম্প্রদায়ভুক্ত; অধিকাংশ তাঁহার আত্মীয়—ভ্রাতা, পুত্র, ভ্রাতষ্পুত্র। সুন্দরসিংহ নামে তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্রও অসি গ্রহণ করিল।

তাহার পর—সেই স্তব্ধ রজনীতে, দিগন্তমুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহারা জগতের নিকট শেষ বিদায় লইল! দূর শূন্যে, অসীম নক্ষত্রমণ্ডলীর কোলে, কম্পিত ছায়াপথের মধ্য দিয়া রণজিতের আত্মা তাহারা দেখিল কি না কে বলিতে পারে ?

[৪]

তাহার পর রাত্রিশেষে বিশালনগরী অমৃতসরের এক অৰ্দ্ধ-নিভৃত, অৰ্দ্ধ-প্রকাশিত স্থানে প্রায় দুই শত মুসলমান— যাক্, সে দৃশ্য আঁকিতে হিন্দুর লেখনী অক্ষম। তাহা হিন্দুর হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!!!

নিকটে দুইজন মুসলমান শান্তিরক্ষক সশস্ত্র হইয়া 'শান্তিরক্ষা' করিতেছিল। সেই 'গোরক্ত-প্লাবিত' রজনীতে, অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে তাহারা দেখিল, অদূরে কতকগুলি দীর্ঘমূর্ত্তি দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে! একজন হাঁকিল—"হুকমদার"? †

গম্ভীরস্বরে উত্তর হইল—"রামসিংহ কুকা!" বলিতে বলিতে শিখগণ নিকটস্থ হইল। প্রহরী অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিল—"পিছে রও!" মুহূর্ত্তের মধ্যে রামসিংহের তরবারি আকাশে উত্থিত হইল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সিপাহীর মস্তক ধরাবলুণ্ঠিত হইল! তাহার পর শিখগণ

* ইংরাজের যেমন "Hip hip hurrah" মুসলমানের যেমন "ইয়া অলি" 'ইয়া মহম্মদ' বা "দীন দীন" শিখেরও তেমনি "সত্য শ্রী অকাল।" যুদ্ধকালে ইহা বড় ভীষণ শুনায়। শুনিয়াছি, পাঠানেরা এই "সত্য শ্রী অকাল" শুনিলেই কাঁপিত।

† Who comes there ? এর পিতৃশ্রাদ্ধ।

বিনা বাক্যব্যয়ে গোহত্যাকারীদিগকে আক্রমণ করিল। শত চেষ্টাতেও তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, দীর্ঘ তরবারির প্রত্যেক আঘাতে তিনজন চারিজন করিয়া মুসলমান পড়িতে লাগিল! দেখিতে দেখিতে প্রায় দেড়শত মুসলমান শিখহস্তে নিহত হইল!!! রামসিংহ ক্লান্ত অনুচরগণ সহ রক্তাক্ত কলেবরে গুরুদরবারাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক পিঙ্গলমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

[৫]

প্রভাতে উঠিয়া সকলে মুসলমানের পরিণাম দেখিল। হিন্দুমহলে আনন্দের রোল উঠিল। এমন কি, শুনিয়াছি এই সংবাদ প্রচারিত হইলে স্ত্রীলোকেরা মনের উল্লাসে শঙ্খধ্বনি করিয়াছিল।

সাহেবমহলে শঙ্কার ছায়া পড়িল; কারণ সোবাওঁয়ের শোণিত-লহরী বা বিদ্রোহের বিভীষিকা তাহারা তখনও ভুলে নাই। লাহোরে 'তার' গেল। দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই মিয়ানমীরের পাঠান ও গোরাসৈন্যে নগর ছাইয়া ফেলিল। স্থানে স্থানে তোপখানা পড়িল। প্রজা-বিদ্রোহের আশঙ্কা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল।

অমৃতসরে তখন শিখসৈনিক ২০।২৫ জনের অধিক ছিল না; সেই ২০।২৫ জনকেও নিদ্রিতাবস্থায় দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছিল।

তাহার পর হত্যাকারীগণের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। মুসলমানগণের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল তাহারা রামসিংহ কুকার নাম করিল। রামসিংহকে ধরিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে সিপাহী ছুটিল।

* * *

অমৃতসরের ‡ পুণ্যসলিলে রামসিংহ ও সুন্দরসিংহ স্নান বা শোণিত প্রক্ষালন করিতেছিলেন এমন সময়ে অন্যূন দুই শত পাঠান সিপাহী আসিয়া তাহাদিগকে ঘেরাও করিল। রামসিংহের নিকট তখন তরবারি ছিল না, সুতরাং বলপ্রয়োগ নিষ্ফল ভাবিয়া বলিলেন—"অত্যাচারীর দণ্ড দিয়াছি তজ্জন্য ভীত নহি, শিখ মারিয়া মরিতে জানে। চল যাইতেছি, কিন্তু সাবধান, আমাদের স্পর্শ করিও না! হরিসিংহ নলুয়ার নাম স্মরণ করিয়া আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকিও! আফগানিস্থানে শোণিত আছে; শিখ এখনও মরে নাই!!"

রামসিংহ ও সুন্দরসিংহ সিংহের ন্যায় বক্ষ স্ফীত করিয়া অগ্রসর হইলেন; পাঠানেরা বিনা বাক্যব্যয়ে পশ্চাদনুবর্ত্তী হইল।

রামসিংহ ধৃত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার অনুচরবর্গ স্বেচ্ছায় আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল।

* * *

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা শিখগণকে স-সর্দ্দার তোপে উড়াইয়া দিবার আদেশ হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অমৃতসরের সেই বিস্তৃত প্রান্তরে—যেখানে, সেই প্রশান্ত রজনীতে অনন্ত প্রসারিত আকাশ-তলে বসিয়া, তাহারা জগতের নিকট শেষ বিদায় লইয়াছিল—সেই তৃণাবরণ শোভিত দূর-মুক্ত প্রান্তরে ইংরাজের

‡ এই পুষ্করিণীর বক্ষে 'গুরুদরবার' শোভিত এবং ইহার নামানুসারেই নগরীর নাম 'অমৃতসর' হইয়াছে।

তোপখানা পড়িল। একটি ছাড়া প্রায় সকলগুলির মুখই অমৃতসরের দিকে—সেই একটী যবন-হন্তা শিখের জন্য। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য সৈন্য, ভরা বন্দুক, খোলা তলোয়ার—সুতরাং বিদ্রোহের আশঙ্কা বহুদূরে। সন্ধ্যার বহুপূর্ব্ব হইতে দর্শকমণ্ডলীর সমাগম হইতে লাগিল—বলা বাহুল্য সকলেই মুসলমান।

সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া রামসিংহ, সুন্দরসিংহ ও অন্যান্য শিখগণ বধ্যস্থানে আনীত হইলেন। শিখের নয়নে উদ্বেগের একটা ক্ষীণ স্পন্দও নাই,—তাহা হেমন্তের হিম আকাশের ন্যায় স্থির—প্রশান্ত!

বৃদ্ধ রামসিংহের পলিতকেশ ও বালক সুন্দরসিংহের শ্মশ্রুহীন কোমল মুখ খানি দেখিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল!

তাহার পর—সৈন্য ছত্রবদ্ধ হইল, বন্দুকে সঙ্গীন চড়িল, অসি কোষমুক্ত হইল—তোপে বারুদ পোরা হইল—গোলন্দাজ বাতি হাতে দাঁড়াইল। কাপ্তেন সাহেব শিখগণকে নিয়মিত পিছমোড়া করিয়া বাঁধিবার আজ্ঞা দিলেন। শিখগণ গর্জ্জিয়া উঠিল! রামসিংহ হাসিয়া বলিলেন—"ইংলণ্ডবাসীগণ কি মৃত্যুকে এতই ভয় করে যে, সে দেশে হাত পা বাঁধিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে? ভারতসন্তান এখনও এত নির্বীর্য্য হয় নাই যে, মৃত্যুকে ভয় করে। শিখ মারিয়া মরিতে ভীত নহে। আমরা মারিয়াছি এখন মরিব। বাঁধিতে হইবে না,—একজনও পশ্চাৎপদ হইবে না! চিলিয়ান্‌ওয়ালা ভুলিয়াছ?"

বাঁধা হইল না। শিখগণ গুরুগোবিন্দের নাম স্মরণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইল। সে দৃশ্য দেখিয়া অনেকের মরিতে সাধ হয়! তাহার পর—কে আগে মরিবে? সকলেই আগে মরিতে প্রস্তুত—যেন ইহা অপেক্ষা সুখের মরণ আর নাই! সকলেই কহিল—"আমি আগে যাইব।"

রামসিংহ কহিলেন "তাহা হইবে না—আমি আগে যাইব।"

সকলে সমস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল—"কি? আমরা বিংশতিজন দাঁড়াইয়া অশীতিপর বৃদ্ধের মৃত্যু দেখিব? তাহা হইবে না!"

একজন শিখ গিয়া কামানের মুখে বুক দিল,—গম্ভীরস্বরে বলিল "ওয়াহ গুরু কি ফতেঃ!" মাথার উপর চিল ঘুরিতে লাগিল!

বজ্রনির্ঘোষে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, শিখের দেহ পরমাণুতে পরিণত হইল!! দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল—"সত্য শ্রী অকাল!!" আকাশে কাক চিল উড়িতে লাগিল!!!

তাহার পর একে একে সকলেই জীবন বিসর্জ্জন করিল—রহিল কেবল সুন্দরসিংহ ও রামসিংহ—বালক ও বৃদ্ধ! রামসিংহ গম্ভীর স্বরে বলিল—"সুন্দরসিংহ! তোমার পিতার একবার পুত্রের মৃত্যু দেখিতে সাধ হইয়াছে; যাও পিতৃসাধ পূরণ কর! একদণ্ডের মধ্যেই পরলোকে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া পুত্র অগ্রসর হইল। গুরুগোবিন্দের নামোচ্চারণ করিয়া কামানের মুখে বুক দিল। গোলন্দাজ বাতি ফেলিয়া বলিল "আমি ইংলণ্ড হইতে শিশু হত্যা করিবার জন্য আসি নাই।"

একজন পাঠান সিপাহী সেই বাতি কুড়াইয়া বলিল "তুমি ইংলণ্ড হইতে যে জন্য আইস নাই। আমি আফগানিস্থান হইতে সেই জন্য আসিয়াছি!" এই বলিয়া পাঠান বারুদে আগুন দিল; কড়্‌কড়্‌ রবে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, পিতার সম্মুখে পুত্রের দেহ শতধা ছিন্ন হইল!

রামসিংহের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন "সত্য শ্রী আকাশ!"

সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দেখিয়া কত ইংরাজের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, কত নিষ্ঠুর পাঠান কাঁদিয়াছিল; এমন কি সেই দিনই চারিজন পাঠান ইংরাজের কর্ম্ম ত্যাগ করিল।

তাহার পর বৃদ্ধ রামসিংহ কামান মুখে বুক দিলেন—অনেক দশক প্রান্তর ত্যাগ করিল।

রামসিংহ বলিলেন "ইংরাজ! ইংলণ্ডেশ্বরীকে চতুর্দ্দশবর্ষীয় শিখ-বালকের শোণিত উপহার দিয়া বলিও যে হিন্দুস্থানে এখনও বীর আছে; পঞ্চনদ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, হইবেও না। যতদিন না সোব্রাওঁ, মুদ্‌কি, ফিরোজপুর, গুজরাট ও চিলিয়ান্‌ওয়ালা পঞ্চনদ প্লাবিত হইবে, যত দিন না রণজিতের নাম পঞ্জাববাসীর স্মৃতিভ্রষ্ট হইবে ততদিন পঞ্জাব বীরশূন্য হইবে না! ভাবিও না যে পঞ্জাব তোমাদের অসির অধীন হইয়াছে; পঞ্জাব তোমাদের কৌশলের অধীন হইয়াছে! কতকগুলি অসহায় সিপাহীর নিকট হইতে অন্যায় যুদ্ধে একটী অরাজক দেশ লইয়া গর্ব্বিত হইও না! রণজিতের কথা বলি না, শের সিংহের ন্যায় একজনও জীবিত থাকিলে তোমাদের গর্ব্ব কোথায় থাকিত দেখিতাম! যাহা হউক, একটী অনুরোধ—চিলিয়ান্‌ওয়ালার অসহায় সিপাহীর বীরত্ব ভুলিয়া শিখের মনে আঘাত দিও না—ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন।"

কড়্‌ কড়্‌ রবে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল; বৃদ্ধের লোলিত মাংস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দর্শকমণ্ডলীর মাঝে ছড়াইয়া পড়িল!!! "সত্য শ্রী অকাল" বলিবার কেহই রহিল না!

সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে অস্তমিত হইলেন। আকাশে চাঁদ যেমন হাসে তেমনিই হাসিল, তারা যেমন ফুটে তেমনিই ফুটিল, বাতাস যেমন বহে তেমনিই বহিল; শুধু—সেই চন্দ্র-কর-সংলগ্ন বিস্তৃত প্রান্তরে বিভীষিকার বিকট হাসি ফুটিয়া উঠিল!!

* * * *

তাহার পর—সেই অবধি পঞ্জাবে গোহত্যা নাই। নাই কেন—আছে, তবে প্রকাশ্যভাবে লোকের সম্মুখে নাই। প্রত্যেক লোকালয় হইতে কয়েক মাইল দূরে বনের মধ্যে 'হত্যা' করিয়া তাহা রাত্রের মধ্যেই বিলি করা হয়। তাহাও অতি গোপনে—কেহ জানিতে পারে না।

তাহার পর? তাহার পর, যতদিন পঞ্জাবে শিখের ও হিন্দুর নাম থাকিবে রামসিংহের নামও কেহ বিস্মৃত হইবে না! *

* বলা বাহুল্য, ইহা একটী সত্য ঘটনা। *

শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

গৌরী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তার পর রাত্রিতে যেরূপ হইয়া থাকে, দস্তুর মত সবই হইল। কাপড়ের মশাল জ্বালাইয়া, রঙমশাল পোড়াইতে পোড়াইতে, সানাই ঢোল বাজাইতে বাজাইতে বরযাত্রীসহ বর আসিয়া উপস্থিত হইল। খালি গায়ে, খালি পায়ে, গরদের জোড় পরিয়া, কোমরে তসরের নামাবলি জড়াইয়া, উপবাসক্লিষ্ট, শুষ্ক মুখে, চোক-ভরা আনন্দ, গাল-ভরা হাসি লইয়া পশুপতি সাধ্যমত আদর অভ্যর্থনা করিয়া বরসহ বরযাত্রীদের ভিতরে লইয়া আসিলেন। পাড়ার দু' একজন মাতব্বর দলের লোক ও পশুপতির আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে অনেকেই এ কাজে তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিল। শাঁক বাজিল— স্ত্রীকণ্ঠ-নিঃসৃত মঙ্গল উলুধ্বনি উঠিল—বর আসরে বসিল—বরের ও বরযাত্রীদের গলার জুঁইএর মালার গন্ধভারে পাল-চাপা বদ্ধবায়ু আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল—বহির্ব্বাটীর উঠানের দিকে জানালায়, ঝাঁকে ঝাঁকে চঞ্চল কৌতূহলপূর্ণ চক্ষু আসিয়া সারি দিল, সঙ্গে সঙ্গে ফিস ফিস কথার লঘু বৃষ্টি আরম্ভ হইল; সে বৃষ্টিতে ভিজিল কে জানি না—আর সেই মালার গন্ধ, সানাইএর হাসি কান্না, মিলন-বিরহ-মাখা রাগিণী,—ও অন্তঃপুররুদ্ধ চিরগুপ্ত রহস্যের, অচল কঠিন বিকারশূন্য, ইষ্টক আবরণের রন্ধ্রপথে, সহসা উজ্জ্বল, চঞ্চল, লীলাময়, ক্রীড়াশীল, উচ্ছ্বসিত রূপতরঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিভঙ্গ দেখিয়া কোন অনুভাবপ্রবণ হৃদয়ে কবিতার সৃষ্টি হইয়াছিল কি না, কিম্বা কোন সাহিত্যজীবন সাময়িকপত্রে বরের বন্ধুবর্গের মধ্যে কাহারও স্বাক্ষরিত "সুখস্মৃতি" বা "আজিও জাগিছে মনে সে সুখযামিনী" উপাধি-শীর্ষক কোন কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। তার পর ছেলেরা বরকে ও সমবয়স্ক বরযাত্রীদের ধরিল—বয়স্কেরা হুঁকা ধরিল—পাড়ার যুবকেরা গ্রামভাটীর জন্য বরকর্ত্তাকে ধরিল। কসা মাজা, কঠোর পরীক্ষা সকলেরই উপর রীতিমত চলিতে লাগিল। বালকেরা পরস্পরের বুদ্ধির ভিতর কঠিন প্রশ্নের অস্ত্র চালাইল—বর্ষীয়ানেরা হুকার ভিতর ছিঁচকা চালাইল—ভাঁটী পাওনাদারেরা, রামনিধি চাটুর্য্যে মহাশয়ের গরদের চায়নাকোটের গেলাপ-ঢাকা বুকের ভিতর, পাঁজরার বেড়ার আড়ালে লুক্কায়িত তহবিল লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ বাক্য শলাকা চালাইল। ফল কি হইল, ঠিক জানি না। তবে শুনিয়াছি, সাটিন, গরনেট, ঢাকাই চাদর মোড়া অনেক গুলি সুবুদ্ধির চারি পাশে, অনেক ছিদ্র বাহির হইয়া পড়িয়াছিল—অনেক গুলি শস্যশূন্য নারিকেল মালা, আত্ম পরিচয় ছলে, অসাধারণ বাগ্মিতা দেখাইয়া গুণগ্রাহী পরীক্ষকদের সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল এবং পুরস্কার স্বরূপ সেই রাত্রিতেই পরীক্ষকগণেরই গৃহ

"বৈঠকে" উন্নীত ও সম্ভ্রমের আসন প্রাপ্ত হইয়া, অনেক দিন পর্য্যন্ত বাষ্প ও শব্দময়ী ভাষায় নারিকেল বংশের লুপ্ত পূর্ব্ব গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছিল ও সঙ্গে সঙ্গে সরল, সুউচ্চ, অভ্রস্পর্শী মহিমা শিখর হইতে নিম্নচারী অধম মানবসমাজ মধ্যে পতিত হইয়া, কিরূপে উহারা হীনতা প্রাপ্ত হইয়া অবয়বহীন, মুখসর্ব্বস্ব, শব্দমাত্রসার এক অদ্ভুত জাতিতে পরিণত হইয়াছে, সেই দুঃখ-কাহিনী ও কীর্ত্তন করিয়াছিল। কিন্তু ভাটী পাওনাদারগণের পরীক্ষার ফল কি রূপ দাঁড়াইয়াছিল—উহাদের তীক্ষ্ণ বাক্য-শলাকা চাতুর্য্যে মহাশয়ের টাকার থলি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, উহার গাত্রে ছিদ্র কাটিতে পারিয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ আছে। কেহ কেহ বলে, পশুপতি স্বয়ং কি কৌশলে মুখ ভোঁতা করিয়া দিয়া উহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল।

লগ্ন উপস্থিত হইল। সকলের অনুমতি লইয়া পশুপতি কন্যা পাত্রস্থ করিবার জন্য বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। ভিতরে যাইবার সময় বরের বোধ হইতেছিল, বাল্যকালে শ্রুত উপকথার রাজপুত্র, সোণার কাটী, রূপার কাটীর রহস্যাবৃত জীবনমরণময়ী রাজকন্যার মায়াপুরীর মধ্যে এইরূপ একটা দ্বার দিয়া বোধ হয় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তখন সানাই থামিয়া গিয়াছে—অর্দ্ধ-স্ফুত জুঁইএর মালার গৌরব, সৌরভ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে—অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে সে উজ্জ্বল, চঞ্চল লহরী উজানে ফিরিয়া গিয়াছে—বিবাহ রাত্রির সমস্ত কবিত্ব বরের সহিত অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছে। বহির্ব্বাটীতে পড়িয়াছিল, কতকগুলা বুভুক্ষু উদর ও নিদ্রা-কাতর চক্ষু।

কন্যা পাত্রস্থ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া পশুপতি দেখিলেন বাহিরে জৃম্ভণ ও তুড়ির কিছু বেশী রকম ঘটা। অবস্থা বুঝিয়া একজন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়কে ডাকিয়া আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন।

যখন সুরেশচন্দ্র অন্তঃপুরের "রূপ-কথার" দেশে বসিয়া, রূপ ও কথার বিপদের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন, তখন বহির্ব্বাটীতে অনেক গুলি শূন্য উদর, লুচি কচুরি মিষ্টান্ন প্রভৃতি দুর্ভোগ্য দ্রব্যে বোঝাই হইতেছিল।

অনেকক্ষণ ভোর হইয়াছে। আবার সানাই বাজিতেছে—এখন বড় করুণ শুনাইতেছিল। বাড়ীর ভিতরে বাসি বিযের তাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আর খানিক পরেই বর কন্যা বিদায় করিতে হইবে। পশুপতি সকাল হইতে বড় অন্যমনস্ক। বরযাত্রীদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহ রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া না গিয়া পশুপতির চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাদের খাতির যত্নের যে টুকু বাকী ছিল, তাহার যাহাতে কোন ত্রুটী না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। বাড়ীর ভিতর হইতেও মাঝে মাঝে ডাক আসিতেছে। কিন্তু সেই সকল কাণ্ডের ভিতর হইতেও পশুপতি ছোট ছোট অবসর করিয়া লইতেছিলেন। তাহা শুধু নিভৃতে একাকী উপভোগ করিবার জন্য। তাই কখন খিড়কীর পুকুর ধারে—কখন বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার পর পারে, সানের

পুকুরের চাতালের বেদীর উপর,—কখন ভিয়ান ঘরের পাশের ছোট চালার দাওয়ায়, পশুপতিকে দেখা যাইতেছিল। বুকের ভিতর হইতে একটা রুদ্ধ, প্রবল তরঙ্গ মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হইয়া চোখের বেলা ভিজাইয়া দিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। কেবল মনে হইতেছিল, আর খানিক পরে গৌরী, এই বুক খানা এই গৃহের আজন্মপরিচিত স্নেহনীড়—এত বড় গ্রাম খানা খালি করিয়া চলিয়া যাইবে। হৃদয়ের মাতৃভূমি হইতে "নিগূঢ় জীবনরস" পান করিয়া, বুকের প্রত্যেক পঞ্জর বেষ্টন করিয়া, সংসারের সকল বাধা বিঘ্ন, ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের মাঝ হইতে, স্নেহের গূঢ়প্রোথিত, অটল আশ্রয়দণ্ডে নির্ভর করিয়া যে ক্ষুদ্র কোমল লতা, এতদিন ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত, পল্লবিত, মুকুলিত হইয়া সমস্ত গৃহময় আপনার স্নিগ্ধ শ্যামল, সম্পদ বিস্তার করিযাছিল, আজ স্বহস্তে তাহাকে উন্মূলিত করিয়া অন্যের গৃহপ্রাঙ্গণে রোপণ করিতে হইবে! তা কি পারা যায়! কিন্তু সে বিচার—প্রস্তুত হইবার জন্য সে অবসর আর কোথায়! বুকের প্রত্যেক পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাক—সকল শিরা ছিঁড়িয়া যাক—তোমাকে এই মহাকর্ত্তব্য সাধিতে হইবে। সাধিতে ত হইবে!—কিন্তু হৃদয়ের যে ভূমির মাঝখানে সেই সঞ্জীবনী লতার মূল প্রোথিত ছিল, সেই-খানে যে একটা শূন্য অন্ধকার গহ্বর চিরদিন মুখ বিস্তার করিয়া হা হা করিয়া কাঁদিতে থাকিবে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য কি রহিল!

পশুপতির মনে হইতেছিল, এতদিন যেন সংসারের কাযকর্ম্ম, কতকটা অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়া গৌরী আপনি বড় হইয়াছে। এতদিন যেন তাহাকে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। যে স্নেহে তাহার ন্যায্য অধিকার যেন এতদিন তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাই আজ বিদায়ের পূর্ব্বে শেষমুহূর্ত্তে হৃদয়ের গোপন ভাণ্ডারে সঞ্চিত সমস্ত অপরাধী স্নেহ বুকের সকল কবাট খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গৌরীর সেই করুণ মুখ-খানি ঘিরিয়া কাঁদিয়া মরিতে চায়! পশুপতির বোধ হইতেছিল, যেন বিগত রাত্রির মধ্যে ক্ষুদ্র শিশুগৌরী সহসা বাড়িয়া উঠিয়াছে—আর আজ না বলিয়া কহিয়া একেবারে বধূবেশে বিদায় লইবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পশু-পতির বুকের ভিতর হইতে কে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভিতর হইতে ডাক আসিল—যাত্রার সময় উপস্থিত। পশুপতি গিয়া দেখিলেন নব জামাতা, বধূবেশা, অশ্রুময়ী গৌরীর হাত ধরিয়া রহিয়াছে। কনকাঞ্জলি করিয়া আশীর্ব্বাদের সময় বর কন্যার হাত একত্র করিয়া বলিতে হইবে—"আজ হইতে আমার গৌরীকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম—উহার সকল ভার আজ হইতে তোমার। উহার সকল অপরাধ, লজ্জা তোমায় ঢাকিয়া লইতে হইবে।" পশুপতি দুই তিনবার বৃথা চেষ্টা করিল। উচ্ছ্বসিত আবেগ কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল—শেষে গৃহপূর্ণ স্ত্রীলোকের মাঝখানে গৌরীর হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায়, অবোধ শিশুর ন্যায়, কাঁদিয়া ফেলিল। মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না—"গৌরীকে একেবারে দিলাম।"

তার পর আবার সানাই ঢোল বাজাইতে বাজাইতে কনে লইয়া বর চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বর কনে ঘরে পৌঁছিল। কনের মুখ দেখিয়া শ্বাশুড়ী মুখ বাঁকাইলেন। বরণডালায় আর হাত দিলেন না। চোকে আঁচল তুলিয়া বলিলেন "আমার সোনার চাঁদের ঐ কালপেঁচা বৌ!"

পাড়ার ভিতর যাঁহারা কর্ত্তাদের সম্বন্ধে শ্যালিকা বা শালাজ—যুবকদের সরকারী পিশি বা খুড়ী ও নূতন জামাতৃকুলের দিদিশ্বাশুড়ী সম্পর্কীয় ছিলেন এবং এই ত্রিবন্ধনের গ্রন্থিতে যাঁহাদের প্রৌঢ়জীবন পৃথিবীর সহিত খুব দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়াছিল—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চাটুর্য্যে গৃহিণীকে কতকটা স্নেহ চক্ষে দেখিতেন। বিনা সুদে কখন কখন দু'এক টাকা ঋণ পাইতেন এবং সুবিধা পাইলেই এই উপকারের প্রতিদানও করিতেন। হয় ত চাটুর্য্যে মহাশয়ের মাচা, সগর-গৃহিণীর ন্যায় পুণ্যবতী লাউ বা কুমড়া লতার অসংখ্য সন্তান সন্ততি ভারে যখন ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাঁহারা ক্ষীণ, দুর্ব্বল কঞ্চি বা বংশ-খণ্ডমাত্রসার মাচা সম্বন্ধে কোন আশু দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বুঝিয়া, অর্দ্ধেকের উপর ভার আপনারা বিভাগ করিয়া লইয়া সে সম্ভাবিত অপায় দূর করিতেন। প্রত্যুপকারের সকল প্রণালীর আমি হিসাব রাখি না; একটা মনে পড়িল—বলিয়াছি।

আজ তাঁহাদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের অঞ্চল যে শুধু স্কন্ধের শোভাই বাড়াইয়াছিল এমন নহে। নববধূর কাল রঙ দেখিয়া আদরের সুরেশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটা শঙ্কা তাঁহাদের মনে উদয় হইল। অঞ্চল স্থানভ্রষ্ট হইল—কারুণ্য-রসে কণ্ঠস্বর ভিজিয়া উঠিল। সকলেই অবশ্য সমস্বরে নহে—বলিলেন "সোনার চাঁদ সুরেশের অযোগ্য। মেয়ে দেখবার সময় ননদাই চোক দুটা কোথা রেখে গিয়েছিলেন?"

কাছে আর একজন ছিল। সেও এক নববিবাহিতা কন্যার মাতা। সে চাটুর্য্যে গৃহিণীকে উল্লেখ করিয়া বলিল "দেখ্! ঠাকুরঝি, শুভকর্ম্মের দিন আর চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করিসনি। একি কথা! বৌ বেটা এসে দাঁড়িয়ে রইল, আর তুই বরণডালা ফেলে কাঁদতে বসলি? কাল হ'ক কুৎসিত হ'ক ফেলবার ত নয়, নিয়ে ঘর কর্ত্তে হবে। নে এখন ওঠ—লোকে যে ছি! ছি! করবে!"

সেই সময় স্বয়ং চাটুর্য্যে মহাশয় এক-বার অন্দরে আসিলেন। তিনি গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "কাণ্ডটা কি?"

কর্ত্তাকে দেখিয়া গৃহিণীর অবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সহসা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি চোখ হইতে আঁচল নামাইয়া কতকটা ভর্ৎসনার স্বরে বলি-লেন, "দেখে শুনে শেষে তুমি ঐ মেয়ে বৌ ক'রে ঘরে আনিলে! কেন, বাছা তোমার কাছে কি দোষ করেছিল?"

বেলা হইয়া গিয়াছিল। তখনও স্নান আহার কিছুই হয় নাই। সুতরাং

কর্ত্তার মেজাজটা বড় ভাল ছিল না। মোট কথা, মেয়ে তাঁহার নিজের খুব পছন্দ হয়েছিল। অন্য সময় হইলে কি বলিতেন জানি না—কিন্তু তিনি উত্তরে বলিলেন, "আমার বাবা তোমাকে কি দেখে ঘরে এনেছিলেন? আর সেটা যে আমার কোন বিশেষ দোষের দণ্ড হইয়াছিল, তাও আমার বোধ হয় নাই।"

আবার চোখে আঁচল উঠিল। গৃহিনী মুখ ঢাকিলেন—কথার উত্তর দিলেন না। বুঝিলেন জবাব নাই।

কর্ত্তাও অনেকক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু এরূপভাবে বেশীক্ষণ থাকিবার সময় নয়—বর কনে ছাঁদলা-তলায় দাঁড়াইয়া। কর্ত্তা বুঝিলেন, গৃহিণীর সহজে মুখ ফুটিবে না। অগত্যা তাঁহাকেই কথা কহিতে হইল। তিনি বলিলেন, "এখন যাও! বর কনে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া লও। এর পর অন্য ব্যবস্থা ক'র।"

গৃহিণী অচল—বাক্যহীন। কর্ত্তার পূর্ব্বের কথাটায় বড় বিষ ছিল। গৃহিণী তখন একটা জ্বালা বোধ করিতেছিলেন।

কর্ত্তা আবার বলিলেন, "কনে কাল কি সুন্দর, সেপরিচয়ে তোমার দরকার কি? যদি কুৎসিত হয়, সে দুঃখ যাহার করিবার সে করিবে। রূপের সম্পর্ক ত তোমার সঙ্গে নয়?"

গৃহিণীর তবু কথা নাই। মেয়ে দূরে দাঁড়াইয়া বুড়া বুড়ীর রঙ্গ দেখিতেছিল। বাপ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যা মা মেনা! তুই বরণ ক'রগে যা!" মেয়ের নাম মৃণালিনী। কর্ত্তা বাহিরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি কাযটা ভাল করিলেন না।

এত লোকের সম্মুখে অপমান! গৃহিণীর সেটা মর্ম্মান্তিক লাগিল। ভাল, এত অপমান—কিন্তু কি দোষে? বউ কাল, কুৎসিত, আর তিনি ছেলের মা—ঘরের গৃহিণী; সে কথাটা কি তাঁর মুখ ফুটিয়া বলিবারও অধিকার নাই। ছি, ছি, বিনা দোষে স্বামী হইয়া এক বাড়ী লোকের সামনে—গৃহিণীর চোকের জল আর আটক মানিল না। পাড়ার পিশি ও খুড়ীদলের পূর্ব্বগৃহীত ঋণ পরিশোধের একটা মস্ত অবসর জুটিয়া গেল। গৃহিণীর চারিপাশে রাশি রাশি নিশ্বাস ও সান্ত্বনা-বাক্য স্তূপীকৃত হইতে লাগিল।

বর কনের বরণ হইয়া গেল। সেটা কন্যা মৃণালিনী মা'র হইয়া সারিয়া লইল।

যখন শোকবেগ অনেকটা কমিয়া আসিল, তখন গৃহিণী ভাবিয়া দেখিলেন, সব দোষ নব বধূর। তাহার সঙ্গে যদি সুরেশের বিবাহ না হইত, তাহা হইলে ত এতটা হইত না। আবার কর্ত্তা তাহার পক্ষ হইয়াই ত আজ গৃহিণীকে দশের মাঝে অপমান করিয়াছেন। সেটা বউএর দোষ নয় ত কাহার? স্বরচিত ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি ও তর্ক দ্বারা অনেকক্ষণ বিচার করিয়া গৃহিণী শেষ দেখিলেন, একটী কাল, কুৎসিতা বালিকা ভিন্ন, প্রকৃত অপরাধী আর কেহই হইতে পারে না। সব কথার ভিতর হইতে যে কথাটা বড় হইয়া উঠিয়াছিল, সেটা এই। তিনি আজ ত্রিশ বৎসরের গৃহিণী; কর্ত্তার সহিত এত বৎসরের একটা এত বড় সম্বন্ধ—আর ঐ চেলিমোড়া এতটুকু মেয়ে, আজ এক ঘণ্টাও বাড়ীতে পা দেয় নাই—ও আজ ঘরে আসিয়াই

কর্ত্তার এত আপনার হইল যে, উহার হইয়া কর্ত্তা তাঁহাকে এত বড় কথা শুনাইয়া দিলেন! গৃহিণী কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না যে, গৌরী একটী ভীতা, সঙ্কুচিতা, নিরপরাধিনী বালিকা বধূমাত্র। তাহার গাত্রবর্ণ বা শ্বশুরের পক্ষপাতিত্ব, কিছুতেই তাহার নিজের কৃতিত্ব নাই।

গৌরী একটা অভিশাপ সঙ্গে করিয়া শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করিল। গৃহিণী ভাবিলেন, বধূ কুৎসিত আবার শ্বশুরের প্রিয়। শেষটাই সব চেয়ে বড় অপরাধ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনেকের মুখে শুনা যায়, এ গ্রামে রামনিধি চাটুর্য্যে মহাশয়ের আদি নিবাস নহে। তাঁহার পিতামহ এইখানে বাস উঠাইয়া আনেন। কেন? কেহ বলিতে পারে না! কেহ কেহ অনুমান করেন, বর্গীর ভয়ে।

তা যে গ্রামেই পূর্ব্ব বসতি হউক, তাঁহাদের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির আরম্ভ এই গ্রামেই। এবং তাঁহার পিতামহ নরহরি চট্টোপাধ্যায়ই তাহার সূত্রপাত করেন। সে অনেক দিনের কথা। তখনও ইংরাজ পাকা হইয়া ভারতে বসে নাই। তখনও সোনার মাটী শুদ্ধ লঙ্কা ভাগীরথী-তীরে উঠিয়া আসিয়া কলিকাতা নাম ধারণ করে নাই। তখন কলিকাতার অন্ত মূর্ত্তি ছিল—একখানা বড় জমীদারীর মূল্যে কলিকাতার এক কাঠা জমি বিক্রয় হইত না। তখন পল্লিগ্রাম—এখনও কবিতায় বা নভেলে যে পল্লীগ্রামের বর্ণনা দেখিতে পাই—সেইরূপ পল্লীগ্রাম বজায় ছিল—গ্রামে মানুষ ছিল—গোলায় ধান ছিল—পুকুরে মাছ ছিল—লোকে দু'বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পাইত। প্রাণ-খোলা হাসি গল্প তখনও দেশ-ছাড়া হয় নাই। তখন ব্রাহ্মণে শাস্ত্র পড়িত—বৈদ্য নিদান পড়িত—শূদ্রে কৃষি বা ব্যবসা করিত—তাঁতি তাঁত বুনিত। ম্যাঞ্চেষ্টরের নাম তখনও কেহ বড় শুনে নাই,—ভূগোলে ইংরাজীপড়া ছেলেরা নামটা পড়িত মাত্র। তখন লোকে বুঝিত জমী লক্ষ্মী। জমী সকলেরই কিছু কিছু ছিল—লক্ষ্মীছাড়ার সংখ্যা বড় কম ছিল। তখন গ্রামের লোক গ্রামে থাকিত। দেশের দশ বিঘা ভদ্রাসন বেচিয়া কলিকাতাব নর্দ্দমার পাশে আধ কাঠার উপর ত্রিতল বাটী তুলিবার কথা মনে হইত না—আর আপনার অধিকৃত পক্ক-শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্রেব মাঝে উচ্চ ভূমিখণ্ড ও মুক্ত বাতাস অপেক্ষা, বেতের চেয়ার ও পাখার হাওয়া যে বেশী সম্ভ্রম ও স্বাস্থ্যজনক, এ কথা কিছুতেই বুঝিত না। তখন ছোট মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীর সুখ সম্পদ সম্বন্ধে কল্পনা "আলনায় কাপড় দল মল করে, মেঝে ঘটী বাটী ঝকমক করে"—র বেশী দূর যাইত না। তখন গোয়ালে গরু, মরায়ে ধান, পুকুরে মাছ, বাগানে ফল, আর বাক্সে সোনা রূপা থাকিত। উহার বেশীও লোকে চাহিত না। এখনকার মত ছাপ-মারা কাগজে সিন্দুক পেটারা বোঝাই হইত না। সেইটাই বড় সুখের ছিল।

সেই সময়ে নরহরি চাটুর্য্যে এই গ্রামে বাস উঠাইয়া আনেন। বাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে পিতৃপিতামহ-দত্ত সংস্কার গুলিও লইয়া আসিলেন।

তিনি গ্রামে আসিয়া জমী কিনিলেন—চাষ আরম্ভ করিলেন—পৌষের শেষে মরাইয়ে ধান পুরিলেন। তখন এই সময়ে গ্রামে গ্রামে নবান্নের উৎসবের ঘটা পড়িয়া যাইত। এখন আর তা হয় না।

তার পর দিন কাল বদলাইতে লাগিল। ইংরাজ আমেরিকায় দাস ব্যবসা তুলিয়া দিয়া, ভারতে তাহার নূতন সংস্কার করিলেন। লোকে জমী লক্ষ্মী, সে কথা ভুলিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজ সোনার ফাঁস হাতে করিয়া 'আয়' বলিয়া ডাকিলেন—বাঙ্গালী ভুলিয়া গেল। হারভ্রমে ফাঁস গলায় পরিয়া সোনার ধান্য পূর্ণ পৈতৃক ক্ষেতের উপর আহ্লাদে নাচিতে লাগিল,—লক্ষ্মী পদতলে পিষিয়া গেলেন। ইংরাজ বাঙ্গালীকে খোঁটায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া ক্ষেতের উপর হইতে বেশ করিয়া ঝাঁটাইয়া সব ধান গুলি কুড়াইয়া আপনাদের জাহাজে তুলিল। আব বাঙ্গালী খোঁটার উপর সম্মুখের দুই পা তুলিয়া, আনন্দে মাথা নাড়িয়া ইংরাজের তুড়ির তালে তালে নাচিতে লাগিল। শেষে অতিরিক্ত মাত্রায় কুর্দ্দনের পরিশ্রমের পর যখন ক্ষুধা বোধ হইল, তখন একবার ক্ষেতের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল মাঠে ধান নাই—কতকগুলা শুষ্ক খড় পড়িয়া রহিয়াছে। পরিতোষ সহকারে বাঙ্গালী তাহাই লেহন করিতে লাগিল। গিলিবার যো নাই—গলায় বাধে।

সেই সময় বাঙ্গালী প্রথম চাকুরী করিতে আরম্ভ করিল। হাল ছাড়িয়া কলম ধরিল। সেই সময় হইতে লোকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, "বাপু দারোগা হও।" সেই সময়ে যে বিশ ত্রিশ টাকা মাহিনা পাইত, গ্রামের লোক তাহার হাত দেখিতে আসিত; সবিস্ময়ে বলিত, "ওরে বাপু! তোর এই হাত সাহেবে ছুঁয়ে প্রতি মাসের শেষে টাকা গুনে দেয়?" তাহার পর বাঙ্গালী দারোগার উপর হাকিম হাকিমের উপর আদালতের জজ হইয়াছে—আরও বড় পদ পাইতেছে। কিন্তু সে শুধু পায়ের নীচে খোঁটা বাড়িয়াছে। যে ধান বাঙ্গালী পা দিয়া মাড়াইয়াছিল, তাহা আর দেশে ফিরিয়া আসিল না।

নরহরি গোলায় ধান রাখিয়া মরিয়া গেলেন। ছেলে ধানের বদলে দারোগাগিরি কিনিল। নাকের বদলে খুর মিলিল। খুর হাতে লইয়াই তিনি আগে আপনার কান দুটা কাটিয়া ফেলিলেন। এবং 'ছিন্নকর্ণনাস' হইয়াই গ্রামের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথের ধারে হাতের কাছে সকেশ মাথা পাইলেই, তাহাদের উপর খুরের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষার নেশা যখন খুব জমিয়া গেল, তখন সেই মত্ত অবস্থায় অবশ্য ভ্রমক্রমে দু'একটা মাংসমেদময় কণ্ঠ ছিন্ন করিয়া ফেলেন। যখন অজস্র রুধিরস্রাব হইতে লাগিল, তখন তিনি খুর মুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। হাত পাতিয়া সব রুধির অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া লইলেন। মাটিতে এক ফোঁটা পড়িতে দিলেন না। সুতরাং কোন গোলযোগ হইল না। আর খুর ফেলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাহা হইতে ইস্পাতটুকু আলাদা করিয়া কাছে রাখিয়া দিলেন। কিছু দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

রামনিধি চাটুর্য্যে মহাশয় পিতার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেই ইস্পাতটুকু প্রাপ্ত হন।

বিষয় হাতে পাইয়া চাটুর্য্যে মহাশয় একটা সংকল্প স্থির করিলেন। যে সব সাহেবের কাছে বাপ কাজ করিতেন—তাঁহারা খবর লইয়া জানিলেন—মৃতের এক পুত্র আছে। উপযাচক হইয়া তাঁহারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখনকার সাহেবেরা এরূপ করিতেন, এবং ইহা একটা মস্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন। এখন সে বংশের সাহেব আর ভারতবর্ষে আসে না। যাহা হউক, সাহেব ডাকিয়া পাঠাইলেন—চাটুর্য্যে মহাশয় গিয়া সেলাম করিলেন। কিন্তু চাকুরী গ্রহণ করিলেন না। বলিলেন, "হুজুর যখন আমার বাপের মনিব, তখন আমারও মনিব। আপনার অনুগ্রহ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তবে আপনাদেরই কৃপায় বাপ কিছু জমীজারাত রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। চাকরী স্বীকার করিলে বে-বন্দোবস্তে নষ্ট হইয়া যাইবে। নতুবা এতটা অনুগ্রহ হাতে পাইয়া ত্যাগ করিবার অন্য কোন কারণ নাই।" সাহেব বুঝিলেন—আর বড় পীড়াপীড়ি করিলেন না।

বাপ দারোগাগিরি করিয়া নগদ টাকা করিয়াছিলেন। পিতামহ জমী রাখিয়া গিয়াছিলেন। চাটুর্য্যে মহাশয় জমীর একটা হিসাব তৈয়ার করিলেন। পিতামহের ন্যায় মৌরশ দেওয়া একেবারে বন্ধ করিলেন। যে সকল ঠিকা প্রজা ছিল, তাহাদের খাজনা কিছু কিছু বাড়াইয়া দিলেন; যে রাজী হইল, সে রহিল—যে অস্বীকার করিল, তাহার জমী নূতন করিয়া বিলি করিলেন। কতকগুলা জমী বেবন্দোবস্তে ছিল। তিনি সেইখানে বাঁশের আওলাত করিলেন। দু একটা ফলের গাছের আওলাত সুদ্ধ জমী অল্প খাজনায় বিলি ছিল। তিনি প্রজা তাড়াইয়া সে গুলা খাস করিয়া লইলেন। নিজে দাঁড়াইয়া, জন খাটাইয়া, নূতন গাছ বসাইয়া, তাহাতে রীতিমত ফলের বাগান করিলেন। যখন গাছ ফলবান হইল—তখন সংসারের খরচের জন্য দু'পাঁচটা গাছ রাখিয়া দিয়া, বাকী সমস্ত গাছ জমা ধরাইয়া দিলেন। পুকুর জেলেকে বিলি করিলেন। তলায় ফাঁকা জমীতে বেগুণের চাষ করিলেন। পাঁচ বৎসর পরে হিসাব করিয়া দেখিলেন, বাপ বর্ত্তমানে জমীর যে আয় ছিল, এখন তাহার দ্বিগুণ আয় দাঁড়াইয়াছে।

তার পর নগদ টাকা। সে জন্য বড় ভাবিতে হইল না। তিনি টাকায় কোম্পানির কাগজ কিনিলেন না। কাগজের উপর বড় বিশ্বাস ছিল না। তিনি ঐ টাকায় দেশে তেজারতী আরম্ভ করিলেন। অনেক টাকা চোটায় খাটাইলেন—তাহাতে সুবিধা বেশী। হাতের কাছে কতক টাকা রাখিলেন বটে, কিন্তু সে সামান্য। প্রথম পাঁচ সাত বৎসর তাঁহাকে খাটিতে হইল। দশ বৎসর পরে তিনি বৈঠকখানায় তাকিয়া হেলান দিয়া, আলবোলায় তামাক খাইতে লাগিলেন। আর লোকে পথ হাঁটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে টাকা রাখিয়া দিয়া যাইতে লাগিল। জমীর আয় ও টাকার সুদে সংসার চলিয়া

গিয়া, সরকারী খাজনা সরবরাহ করিয়া নগদ টাকা জমিতে লাগিল। তখন তিনি গ্রামের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

এই দশ বৎসরের ভিতর তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা হইল। পুত্র—সুরেশ-চন্দ্র। কন্যা—মৃণালিনী। যখন কন্যা বিবাহযোগ্যা হইল, তখন তিনি কতকটা চিন্তিত হইলেন। বেশী দূরে মেয়ের শ্বশুর-ঘর হয়, সে ইচ্ছা তাঁর ছিল না। নিকট হইতে দু'একটী পাত্রের সন্ধান আসে, কিন্তু তাহারা সকলেই গৃহস্থ ঘরের। তখন রামনিধি চাটুর্য্যে মহাশয় গ্রামের মধ্যে একজন বড়লোক—সুতরাং বড় ঘরের সহিত কুটুম্বিতা করিয়া কিছু দিন পরে বনিয়াদি নামটা জাহির করিতে পারেন, ভিতরে ভিতরে এরূপ সংকল্প ছিল। সেই সময় রায়-নার হরসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের ছেলের কথা তাঁহার কাণে উঠিল। মুখো-পাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমান অঞ্চলের এক-জন বিশিষ্ট তালুকদার। চাটুর্য্যে মহা-শয় একেবারে মতলব আঁটিয়া ফেলিলেন।

তিনি নিজেই রায়নায় গিয়া মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বিষয়ী লোক—টাকা লইয়া নাড়াচাড়া করেন। চাটুর্য্যে মহাশয়ের পরিচয় পাইয়া খুব খাতির যত্ন করিলেন। বুঝিলেন, একটা বড় মাছ আসিয়াছে। তিনি টোপ বড় করিলেন—সুতার বহরও বাড়াইলেন, খেলাইবার সুবিধা হইবে। শেষে অনেক মিষ্ট কথা, অনুনয় বিনয় ও যথেষ্ট টাকা আদায় করিয়া লইয়া, মুখো-পাধ্যায় মহাশয় ছেলের বিবাহ দিলেন। বিবাহের চারি বৎসর পরে তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।

বাপ যে বুদ্ধি লইয়া কারবার করি-তেন, ছেলে তাহার বড় অল্পাংশেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। সেটা কতকটা বাপের দোষ। ছেলে খাইত, ঘুমাইত, মাছ ধরিত, গান করিত। মুখুর্য্যে মহা-শয়ের সে দিকে দৃষ্টি বড় খাট ছিল। তিনি ভাবিতেন, আমার বিষয় আছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আর একটা কথা ভাবিতে ভুল হইত—বিষয়ের সঙ্গে বিষয়বুদ্ধিও কিছু থাকা প্রয়োজন। কর্ত্তা সংসার হইতে ছুটী লইলেন; কিন্তু বাপাজীবনের খেলিবার ছুটীরও শেষ হইল। সহসা বুঝিতে পারিল যে, সংসারটা ছিপের সুতার মুখে বাঁধা নাই যে, হুইলের কলে তাহা চলিবে। সেটা চালাইতে গেলে আরও কিছু বুদ্ধির প্রয়োজন। কিন্তু তাহার বুদ্ধি হুইলের কলের বাহিরে যাইতে পারিত না। দু একজন নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতি সে কথাটা বুঝিয়াছিল। তাহারা সময় বুঝিয়া কাছে সরিয়া আসিল। হরিশ্চন্দ্র আপ্যা-য়িত হইয়া তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিল। বলিল,"দাদা! তোমরা এলে,—বাঁচলাম। বাবা কি বোঝাই ঘাড়ে দিয়া গিয়াছেন।" তাহারাও বলিল, "বটে ত! তাঁর বড় অন্যায়! ভাই! তা তোমার কোন চিন্তা নাই। আমরা সব করিয়া লইব।" হরিশ হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, আ! বাঁচলাম! তার পর বৎসরের ভিতরই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত বিষয় ও টাকার বোঝা জ্ঞাতিরা অনেকটা হাল্কা করিয়া দিল।

তিন বৎসরের শেষে হরিশ্চন্দ্র বুঝিল, সে ঠকিয়াছে। আক্রোশে জ্ঞাতিদের

সঙ্গে একটা মামলা বাধাইল। তাহাতে বিষয় আরও হাল্কা হইয়া পড়িল। উপযুক্ত পরামর্শদাতা কেহই ছিল না। শ্বশুর রামনিধি চাটুর্য্যে মহাশয় বড় মনোযোগ দিলেন না—কারণ পূর্ব্বে তাঁহার পরামর্শ একবার অগ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু এ অভিমানের ফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। একদিন জামাতা বাপাজীবন, স্ত্রী ও একটী দুই বৎসরের বালকের হাত ধরিয়া চিরদিনের জন্য বাস করিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মকর্দ্দমার পরও যে বিষয় বাকী ছিল, তাহা জ্ঞাতিদের নিকট আধাদরে বিকাইয়াছিলেন। জ্ঞাতিদের উপর শোধটা তুলিয়াছিলেন ভাল!

চাটুর্য্যে মহাশয় প্রথমে মুখ ভারী করিলেন বটে, কিন্তু শেষ বুঝিলেন, আর অন্য উপায় নাই। তিনি বিষয়-বেচা টাকায় জামাতাকে কতকটা জমী কিনিয়া দিলেন—কতক টাকা সুদে খাটাইয়া দিলেন—জামাতার সংসারের সব ভারটা যাহাতে তাঁর ঘাড়ে না পড়ে। কিন্তু বাপাজীবনের ছিপগতবুদ্ধি তখনও পূর্ণমাত্রায় বজায় রহিয়াছে। তিনি টাকার সহিত আপনার সমস্ত ভার ও দায়িত্ব শ্বশুরের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। তিনি এখন পথের ধারে টুল পাতিয়া বসিয়া দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া দন্তধাবন করেন—স্নানের সময় প্রত্যহ বেলের আঠা দিয়া পৈতা মাজেন ও এই কাজে যথেষ্ট সময় ও ধৈর্য্য খরচ করেন—দুপুরে পাড়ার ঠান্‌দিদিদের সহিত অন্দরে তাস খেলেন, কোন দিন বা খিড়কির পুকুরে ছিপ ফেলেন। সন্তান-পালনকার্য্যে স্ত্রীকে যথেষ্ট সহায়তাও করিয়া থাকেন। বাড়ী হইতে কিছু দূরে 'চানকার' কাছে একটা সেক্‌রার দোকান ছিল। সেইখানে হরিশ্চন্দ্রের বৈকালিক মজলিস বসিত। সন্ধ্যার পর ঢোলের শব্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিকৃতকণ্ঠে "তারা দিলে না দিলে না দিন" বা অব্যবহিত পরেই "এস এস প্রাণ বঁধু প্রেম নিমন্ত্রণ" ইত্যাদি সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিত। পাড়ার যুবতীরা সহজে চানকায় স্নান, বা গা ধুইতে যাইত না। পাড়ার পুরুষ মহলের অনেকেরই হরিশ্চন্দ্র প্রমুখ মজলিস সম্বন্ধে বড় মন্দ ধারণা ছিল। তবে হরিশ, চাটুর্য্যে মহাশয়ের জামাতা বলিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস করিত না!

সুরেশচন্দ্র কলিকাতায় এফ্-এ পড়িতেছিলেন। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ক্রমশঃ—

একটি উপদেশ।

জঠরানল প্রদীপ্ত হইলে ভোজন করিতে হয়। শরীরের অবসাদ হইলে নিদ্রায় অভিভূত হইতে হয়। স্ত্রী-সংসর্গের ইচ্ছা হইলে স্ত্রীতে উপগত হইতে হয়। এইরূপ কতকগুলি কার্য্যে প্রাণীমাত্রেরই অবস্থানুসারে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। এরূপ প্রবৃত্তি কাহার উপদেশ অথবা নিয়োগ সাপেক্ষ নহে। এই জন্য কোন শাস্ত্রকার ইহাতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য কোন কথাই বলেন নাই। জীবমাত্রেরই এইরূপ স্বভাব বলিয়া ইহাকে পশুবৃত্তি বলিলে কোন দোষ হয় না। তবে কি মনুষ্য এই পশুবৃত্তির অধীন? না ইহাতে কোন বিশেষত্ব আছে যাহাতে পশুবৃত্তি হইতে মানব প্রকৃতিকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে? অবশ্যই কিছু না কিছু প্রভেদ আছে নতুবা পশুত্বে আর মনুষ্যত্বে প্রভেদ কৈ রহিল। পশু ভক্ষ্য দেখিলেই ভোজন করে। আঘ্রাণ দ্বারা ভক্ষ্যাভক্ষ্য স্থির করে। যখন ইচ্ছা তখনই নিদ্রাভিভূত হয়। স্ত্রীপশু দেখিলেই যথা তথা এবং যখন তখন মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যও যদি ঐরূপ ব্যবহার করে, তাহা হইলে কি বলিয়া তাহাকে পশু না বলিয়া মনুষ্য বলিব। পশুদিগের স্বভাবতঃ যখন যাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে তখন তাহাই করে সেইরূপ মনুষ্য যদি রসনা দ্বারা ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণ করে অর্থাৎ যাহার যাহা রুচিকর তাহাই যদি তাহার আহার্য্য হয় ও নিদ্রা যাইবার যদি কালাকাল না থাকে, স্ত্রীজাতি হইলেই যদি অন্য কোন বিচার না করিয়া তাহাকে ভার্য্যার্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যে আর পশুতে প্রভেদ রহিল কোথায়? কাজেই দেখা যাইতেছে যিনি যতই আপন আপন প্রবৃত্তির অনুগামী হন তাহার ততই পশুত্ব প্রাপ্তির জন্য অধোগতি হইতে থাকে। যিনি যত নিবৃত্তি মার্গানুসারী তিনি ততই মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারেন। নিবৃত্তিই মনুষ্য ধর্ম্মের লক্ষণ। প্রবৃত্তি নিরোধই প্রকৃত মনুষ্যত্বে উন্নতি হইবার একমাত্র পন্থা। ইহার বিপরীত পথ ধরিলে নিশ্চয়ই অধোগতি হইবে। মনুষ্য যে গুণে গঠিত অর্থাৎ রজ ও তমোগুণের মধ্যে যে গুণটী প্রবল থাকিলে যাহার যেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ জন্মিতে পারে সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য ঋষিগণ তাহার বিচার করিয়া যতদূর ঐ সকল প্রবৃত্তির নিরোধ করা যাইতে পারে তদনুসারে বিবিধ কার্য্যের নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে কৃতবিদ্যগণের আর্য্য-ঋষিদিগের আদিষ্ট বিধি ব্যবস্থার উপর আস্থা নাই। তাঁহাদিগের মতে ভক্ষ্যাভক্ষ্য আবার কি? যাহা রুচিকর তাহাই ভক্ষ্য। ভোজনের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? ম্লেচ্ছদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিলে ধর্ম্ম হানি হইবে কেন? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে ইহা নিতান্ত প্রলাপ বাক্য ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহাদের ধর্ম্মজ্ঞান কি তাহা অবশ্য নিশ্চয় করা বড়ই সুকঠিন। বাহ্যতঃ এইরূপ বুঝা যায় যে যিনি

পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং কালে ভদ্রে তাঁহার নিকট প্রার্থনাদিরূপ তাঁহার উপাসনা করেন তিনিই ধার্ম্মিক। ইহার উপর যিনি যথাসাধ্য শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন তিনি ত ঋষি। ইহাই যদি তাহাদের মতে ধর্ম্মের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে সকল দ্রব্য ভোজন অথবা বহুসেবন দ্বারা শীঘ্রই হউক অথবা কালবিলম্বেই হউক শরীরের অথবা মনের এমন অবস্থা উৎপাদন করে যাহাতে উপাসনাদি ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত হয়, সেই সকল দ্রব্য অবশ্যই অধোগতির কারণ, পাপজনক, অথবা ধর্ম্মকার্য্যের হানিকর। মনে করুন সুরাপান করা পাপজনক। সুরাপায়ী নরকে পতিত হয়। ইহা বলিবার কারণ কি? পৃথিবীতে যত জাতি অথবা যত সম্প্রদায় আছে সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করে, এমন কি যে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে সুরাপান একরূপ কৌলিক আচার বলিলেও চলে তাঁহাদিগের মধ্যে বিবেচক ব্যক্তিগণ সুরাপানের বহুল নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। পৃথিবীর মধ্যে নিতান্ত অসভ্য পশুভাবাপন্ন লোকের মধ্যে ইহা আদৃত হইতে পারে কিন্তু একটু বিবেচনা শক্তি যাঁহাদিগের আছে তাঁহারা একবাক্যে সমস্বরে সুরাপান ত্যজ্য বলিয়া স্বীকার করেন। সুরাপানে অনতিকাল বিলম্বে মনুষ্যকে উন্মাদের স্থায় করিয়া তুলে। শিষ্টাচার ঈশ্বরজ্ঞান ইত্যাদি কোথায় দূরীভূত হইয়া যায়। এরূপ ভাবান্তর করিবার নিদান কি? সুরাই ইহার কারণ। এইরূপ একটী কেন শত সহস্র প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিরূপণ করা যাইতে পারে যে যে সকল দ্রব্য আমরা ভোজনে পরিধানে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার দোষ গুণ সকলই আমাদিগের শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। বিষ ভক্ষণে প্রাণ পর্য্যন্ত দেহ হইতে বিযুক্ত হয়। দুগ্ধপানে দেহের কান্তি, বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ঘৃত ভোজনে মেধ বৃদ্ধি হয়। এইরূপ সকল দ্রব্যেরই ভাল মন্দ ফল এই শরীরকেই আজই হউক আর দশদিন পরেই হউক অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। শরীরে ও মনে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে শরীরের অবস্থান্তরে মনেরও অবস্থান্তর হয়। চারিদিকে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই ইহার রাশি রাশি প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু-সন্তান হিন্দু-পরিবারবর্গের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া অপগণ্ড শিশুকাল হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজ প্রচলিত আচার ব্যবহার দ্বারা গঠিত হইয়া বিলাত গমন করিলেন; ২।৩ বৎসর ইংলণ্ড দেশে বাস করিয়া তদ্দেশবাসীদিগের সংসর্গে তদ্দেশীয় পরিচ্ছদ ধারণে এবং ভক্ষ্য ভোজনে অভ্যস্ত হইয়া যখন হিন্দু-রাজ্যে প্রত্যাগত হন তখন তাঁহার মনের গতি কি পূর্ব্ববৎ থাকে? কখনই নহে। এখন ভাবিয়া দেখুন দেখি এতকাল ধরিয়া যে পদার্থে তাঁহার দেহ ও মন গঠিত হইয়াছিল কি এমন শক্তি প্রভাবে তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত মন, বুদ্ধি, বিবেচনা সমস্ত লুপ্ত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিল। এরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যই কোন অভিনব শক্তি দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। কোন্ পদার্থের এরূপ অপরিসীম শক্তি? অবশ্যই বলিতে

হইবে, প্রথমতঃ সমুদ্রে অর্ণবপোতে দীর্ঘকাল বাস করিবার কালে হিন্দুর বিরুদ্ধাচারে মন অক্ষুব্ধ হইতে অভ্যাস করিয়াছে, পরে গন্তব্য দেশবাসীদিগের সঙ্গে আহার ব্যবহারাদিরূপ ঘনিষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা ২।৩ বৎসরের মধ্যে তদ্দেশীয় হাব-ভাব সমস্তই মনে সংক্রামিত হইয়া থাকে এই জন্য মনু বলিয়াছেন।

সঃ সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদ্যৌনান্নতু যানাসনাশনাৎ। ১৮১।১১

তথাপি পরাশরঃ।

আসনাচ্ছয়নাদযানাং সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥ ১২।৯২

এক্ষণে অকপটচিত্তে বলিতে হইলে ইহা স্বীকার কবিতে হয যে ভোজনাদি-রূপ আচাব ব্যবহার দ্বাবা মন আক্রান্ত হইয়া ভাবান্তরিত হয় ইহা সত্য। উপরে যে উদাহরণ দেওযা হইয়াছে ইহাতে যে ফল আমবা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা কি ঋষিবাক্যগুলিকে অকাট্যরূপে সপ্রমাণ করিতেছে না। গুণাগুণে মন ও শবীব উভয়ই ভাবান্তরিত হইয়া থাকে। জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যে কেবল গুণেরই আধার দোষেব লেশমাত্র নাই। পাত্র বিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে অমৃত বিষবৎ এবং বিষও অমৃতবৎ কার্য্য করে। ঘোর সান্নিপাতিক জ্বরাক্রান্ত দেহে কালসর্পের বিষ প্রাণ দান কবে আবার সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করিলে প্রাণ বিয়োগ হইয়া যায়। সহজ জ্ঞান ও রসনা এ সৃষ্টি বৈচিত্রের কিছুই বুঝে না। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে ভোজ্য পদার্থের প্রত্যেকের গুণাগুণে মন ও শরীর উভয়ই ভাবান্তরিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে পদার্থ অল্প অথবা বহুসেবায় মনকে বিপথগামী এবং শরীরের অসুস্থতা উৎপাদন করে তাহা অবশ্যই পাপজনক এক্ষণে কৃতবিদ্য মহা-শযেরা একটু তলাইয়া দেখুন দেখি, পান ভোজনের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে কি না, বলুন দেখি, যে ঋষিবাক্যকে স্মিতমুখে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাকে এখন অবনত মস্তকে সত্য সত্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় কি না? সহজ জ্ঞান দ্বারা হিতাহিত বিবেচনা এবং রসনা দ্বাব৷ ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণ করিতে গেলে শীঘ্রই মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়। তবে কেবল রাজশাসনের বলে মানুষ হইয়া বেড়াইতে হয়। শিশুকালে কোন দ্রব্য অল্প অধিক ভোজন করিলে অকালে বার্দ্ধক্য উৎপন্ন করে অথবা যৌবনে কিরূপ আচরণ করিলে প্রৌঢ়াবস্থায় কিরূপ অচিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইতে হয, ইহলোকে কোন্ কার্য্যের কিরূপ ফল পবলোকে ভোগ করিতে হয় ইহা কি সহজজ্ঞান দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না বিষয় বুদ্ধিতে চতুর চূড়ামণি হইলে বুঝিতে পারিবে। যাঁহারা কঠোর তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন সেই সকল আত্মজ্ঞ মহাপুরুষেরাই এ সকল বিষয়ের তত্বজ্ঞ। আমাদিগের এ সকল প্রশ্নে বাঙ্নিষ্পত্তি করাই অমার্জনীয় মূঢ়তা ভিন্ন আব কিছুই নহে। আমরা ঘোর পাপী তাই এত সাহসী, নিজের হিতা-হিত বোধ শূন্য সেই জন্যই কেবল ঐ সকল ত্রিকালজ্ঞ ঋষি প্রবরদিগের উপ-দেশে অবহেলা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ মত সংস্থাপনের চেষ্টা করি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে যে সকল কার্য্যে প্রাণীদিগের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি জন্মে তাহা সম্পাদনার্থ প্রবৃত্তিদায়ক বিধি শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। কারণ বিধি উল্লঙ্ঘন করা পাতকজনক। বিধি উক্ত হইলে সাধুজনকে তাহা সম্পাদন করিতে বাধ্য করা হয় কিন্তু যতদূর সম্ভব প্রবৃত্তি অনুযায়ীক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত রাখাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সুতরাং এরূপ স্থলে যাহা অকরণীয় তাহাই শাস্ত্রে বলিয়া দিয়াছেন। যেমন অন্যস্থলে বিধি উল্লঙ্ঘনে পাতক জন্মে তেমনি পরিসংখ্যাস্থলে নিষেধ না মানিলে পাপগ্রস্থ হইতে হয়। যথা শাস্ত্র বলিয়াছেন যে দ্বিজাতি গুরুগৃহে পাঠ সমাপনান্তে কোন আশ্রম অবলম্বন করিবেন তাহা স্থির করিবেন। পুত্রকামী দ্বিজ সমাবর্ত্তনান্তর লক্ষণাক্রান্তা স্বজাতিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। এস্থলে উপনয়নান্তর গুরুগৃহে বাস এবং বেদ অধ্যয়ন করা দ্বিজাতির পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। তদনন্তর বানপ্রস্থ, যতি, গৃহস্থ ইত্যাদি আশ্রমের মধ্যে যাহার যে আশ্রমে প্রবৃত্তি হয় তিনি সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেন। অনাশ্রমী পুরুষ স্বেচ্ছাচারী কোন আশ্রমের নিয়মাধীন নহেন এই জন্য "অনাশ্রমী তিষ্ঠেৎ" বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন সুতরাং কোন একটী আশ্রম অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি গৃহাশ্রম অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতেই হইবেক। অকৃতদার ব্যক্তি গৃহী বলিয়া পরিচিত নহে। এক্ষণে দেখুন বিবাহ ব্যবস্থা দ্বারা সদৃচ্ছা স্ত্রী-সংগ্রহ নিবারিত হইল। যে ব্যক্তি বিবাহ ব্যবস্থা না মানিয়া ইচ্ছামত স্ত্রী-সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে। শিষ্টাচারী ব্যক্তিগণ অবশ্যই এমন লোককে পশুবৎ জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। (১) দারপরিগ্রহের ব্যবস্থায় অনেকে বলিয়া থাকেন যে সাবধানি শিষ্টাচারী পুরুষ অকৃতদার হইয়া সমাজ মধ্যে *থাকিতে দোষ কি? যাঁহারা "ব্যাচিলার"* হইয়া থাকিতে আনন্দ বোধ করেন তাহাদিগের এই মত কিন্তু তাঁহাদিগের দূরদৃষ্টি একেবারেই নাই! ইহাঁরা মনে করেন যে সাধুত্ব ও অসাধুত্ব লোকের ইচ্ছাধীন। মনে করিলেই ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায় এবং মনে করিলেই চোর ডাকাইত হইতে পারা যায়। ভদ্রলোকে যে নিশীথকালে পরের ঘরে সিঁদ দিতে যান না সে কেবল মনে করেন না বলিয়া। অনেক কার্য্য লোকে মনে করিলেও করে না। আবার মনে না করিলেও কার্য্য করিয়া থাকে। কাহার হয়ত সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু অর্থের অভাব জন্য কার্য্য করিতে পারে না। কাহার হয়ত চুরি করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল কিন্তু রাজশাসনের কঠোরতা নিবন্ধন অথবা সুবিধা সুযোগ হয় না বলিয়া চুরি করিতে পারে না। কাহার বা ইচ্ছা দেবতা ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা সেবা করি, অর্থ থাকিলে সর্ব্বদা দরিদ্রের অভাব মোচন করি কিন্তু কি করে ধন নাই কাজেই ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে না। ইচ্ছাত সম্পূর্ণ আছে তবে হয় না কেন? চোর যখন দণ্ড ভোগ করে তখন শতবার "আর এমন কাজ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াও নিবৃত্ত

হইতে পারে না কেন! ইচ্ছা করা আর না করা ইহা কি কেবল মনের কার্য্য? যদি তাহাই হয় তবে সকলের মন সাধু হয় না কেন! বাস্তবিক মন প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়, আবার প্রবৃত্তি সত্ব রজঃ তমোগুণ সাপেক্ষ। মনুষ্য এই তিনটি গুণের আধার। সুতরাং সকলের কার্য্যেই এই ত্রিগুণের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য যে বীজে উৎপন্ন হয়, তাহাতে যে গুণ যে পরিমাণে নিহিত থাকে সে সেইরূপ গুণান্বিত হয়; তাহার প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, সঙ্কল্প, সর্ব্বশেষে কার্য্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। সেই জন্য যাহার তমোগুণ প্রবল তিনি যদি বলেন আমি ইচ্ছা করিলে পরম তপস্বীর ন্যায় কালযাপন করিতে পারি, সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করিয়া থাকিতে পারি তাহা হইলে বলিতে পারি যে উঁহার সকল কথাই মিথ্যা। ইন্দ্রিয় জয় করা দূরের কথা সে চেষ্টাই হইবে না বরং ইন্দ্রিয়ের দাসানুদাস হইয়া চলিতে হইবে। স্বার্থ সাধনের জন্য, অন্যের বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে লোকের নিকট বাক্য অথবা ভাবে ইন্দ্রিয়জয়ী সাধুর ন্যায় ভান করিতে পারে কিন্তু তাহা কতক্ষণ থাকে! অল্পকালের মধ্যে দেখা যায় যে তিনি ইন্দ্রিয়গণের রাজা নহেন বরং নিতান্ত অনুগত প্রজামাত্র। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক লোক কিরূপ তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যথা—

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকার: কর্ত্তা সাত্বিক উচ্যতে॥
রাগীকর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

যিনি আশক্তি শূন্য, গর্ব্বরহিত, কার্য্য সিদ্ধ অথবা হানিতে হর্ষ বিষাদ শূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন, তিনিই সাত্বিক গুণশালী।

যিনি বিষয়াসক্ত, কর্ম্মফল প্রার্থীচ্ছু, অন্যায় লাভেচ্ছু, পরপীড়নেচ্ছু, অশুচি, হর্ষশোক পরতন্ত্র, তিনি রজঃগুণশালী।

যিনি কার্য্য বৈকল্য নিবারণে অযত্নশীল, বিবেক শূন্য, অহঙ্কার যুক্ত, নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অনবহিত চিত্ত, পরাপমাণী, অতৃপ্তচিত্ত ও দীর্ঘসূত্রী তিনি তমঃগুণ বিশিষ্ট।

এই তিনটী শোকে সত্ব, রজ, ও তমোগুণের পরিচয় অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু বিস্তারিত রূপে বিশদ করিবার জন্য মহাত্মা ব্যাসদেব যাহা বলিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

সকলেরই দেহ ত্রিগুণাত্মক হইলেও শ্রেষ্ঠগুণটী প্রায় নির্জিব ভাবেই আছেন। এগুণটী উদ্দীপ্ত হয় এরূপ আচরণ আর নাই সুতরাং অপর দুইটী গুণের লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও আবার এক জনের সহস্র কার্য্যের মধ্যে নয়শত নিরানব্বুইটী তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কারণ অধুনা, তমোগুণেরই বাহুল্য। সুতরাং এমত লোক সমাজ মধ্যে অকৃতদার হইয়া বাস করিলে অন্যের শয্যাকণ্টক হইবেন না ইহা কে বিশ্বাস করিবে? অন্যের কথা দূরে থাকুক উর্দ্ধরেতা সিদ্ধ তাপসগণের মধ্যেও কেহ কেহ স্ত্রীসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং "ব্যাচিলার"

হইয়া গৃহস্থাশ্রমীর মধ্যে বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যুগান্তরে, যখন ধর্ম্ম, বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা প্রবল ছিল, তখন সত্ত্বগুণশালীর যখন পদস্খলন হইয়াছে তখন কিনা অধর্ম্ম প্রবল, কলিতে ঘোর তামসিক লোক হইয়া ইন্দ্রিয় জয় পূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিবেন ইহা কি বাতুলের কথা নহে? এরূপ কথার বক্তা ঘোর দাম্ভিক ও প্রতারক এবং বিশ্বাস কর্ত্তা নিতান্ত বিবেক শূন্য।

সর্ব্বভূতের হিতকর পরম পবিত্র সত্ত্বগুণের লক্ষণ এই ঃ—আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্যতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, মমতা, সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অতন্দ্রিতা, অনুশমতা, অসংমোহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অক্রূরতা, হর্ষ, তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধু ব্যবহার, শান্তি কার্য্যে সরলতা, বিশুদ্ধ বুদ্ধি, পাপ হর্ষ নিবৃত্তি, ঔদাসিন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মমত্ব, ফলকামনা পরিত্যাগ ও নিত্য-ধর্ম্মের অনুশীলন এই সমস্ত কার্য্য সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হয়।”

আশ্বমেধিকপর্ব্বং অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায় ৩৮ তম অধ্যায়।

রজোগুণের লক্ষণঃ—

“সন্তাপ, রূপদর্শন, আবাস, সুখ, দুঃখ, শীতগ্রীষ্মের অনুভব ঐশ্বর্য্য, নিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, রতিক্ষমা, বল, শৌর্য্য, মদ, রোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, খলতা, অতিমমতা, পরিবার পোষা, বধ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়, বিক্রয়, ভেদ, ছেদ, ও বিদারণের চেষ্টা, মর্ম্মপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, আক্রোশ, পরচ্ছিদ্রানুসরণ, ইহলোক ও পরলোকের চিন্তা, মাৎসর্য্য, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, লাভ প্রত্যাশায় দান, বিধবাহরণ, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ, আক্রমণ, পরিচর্য্যা, আজ্ঞাপালন সেবা, বিষয়তৃষ্ণা, পরাশ্রয় গ্রহণ, ব্যবহার, রচনাকৌশল, নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ, স্বীকার, স্ত্রীপুরুষ দ্রব্য ও গৃহের সংস্কার, সন্তাপ, অবিশ্বাস, ব্রত, নিয়ম, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি ফলজনক কার্য্য, স্বাহাকার, নমস্কার, স্বধাকার, বষট্কার, যাজনা, অধ্যাপন, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মাঙ্গল্যকর্ম্ম, বিষয়াভিলাষ, অনিষ্টাচরণ, মায়া, প্রবঞ্চনা, গৌরব, চৌর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, রাত্রিজাগরণ, দম্ভ, দর্প, অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রমোদ, অক্ষক্রীড়া, অখ্যাতি, স্ত্রৈণতা, এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্তি, এই সমুদায় রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।”

৩৭ তম অধ্যায়।

তমোগুণের লক্ষণঃ—

“মোহ অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিততা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্য দূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসৎ বিবেক রাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্টধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথাচিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নিচকর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর, কার্য্যের

অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান, ও অতিথি প্রভৃতিরে দান না করিয়া ভোজন এই গুলি তমোগুণের কার্য্য।”

৩৬ তম অধ্যায়।

এই গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। জীবের জন্মান্তরীণ সদসদ্ কার্য্যের তারতম্যানুসারে এই গুণত্রয়ের তারতম্য জীবদেহে পরিলক্ষিত হয়। যেমন মনুষ্যগণ আপন আপন অবস্থানুসারে স্ব স্ব বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে সেইরূপ জীবের পূর্ব্বজন্মার্জিত পাপপুণ্যানুসারে ঐ গুণত্রয়ের তারতম্য হইয়া মাতৃগর্ভে দেহ গঠিত হয়। সুতরাং যাহার দেহে যে গুণের আধিক্য তাহার প্রবৃত্তি, সঙ্কল্প কার্য্য অধিকাংশ তদনুযায়ী হইয়া থাকে। রাজা যেরূপ দণ্ড দ্বারা দোষ প্রশমিত করেন সেইরূপ অধোগতির নিদান স্বরূপ তমোগুণাদির কার্য্য প্রশমিত করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ উপদেশ ও পন্থা প্রদশন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। সাত্বিক গুণসম্পন্ন সাধুস্বভাবলোকদিগের জন্য তাঁহারা ভাবিত নহেন। রজোতমোগুণবিশিষ্ট বিলাসী ও ভোগেচ্ছুদিগের সদ্গতির জন্য তাঁহাদিগের এত চিন্তা। সাত্বিক লোকেরা চক্ষুস্মান এবং বিবেক বিশিষ্ট স্বভাবতই তাঁহাদিগের অসৎপথে গতি হয় না। রজো ও তমোগুণবিশিষ্ট লোক মোহান্ধ হিতাহিত বিবেক ভ্রষ্ট সুতরাং তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া পথ দেখাইতে হয় কোন কোন স্থলে দণ্ড প্রয়োগ দ্বারা বলপূর্ব্বক সৎপথে রাখিতে হয়। বিবাহ দ্বারা স্ত্রীলাভ করিয়াও নিষ্কৃতি কোথায়? কামান্ধ পুরুষ স্ত্রীর দাস হইয়া পড়ে। কত প্রকারে উপভোগ করিয়া মনের তৃপ্তি লাভ হইবে তাহা আবিষ্কার করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত! কিরূপ সজ্জায় সজ্জিত করিলে চক্ষের তৃপ্তিকর হয়, কিসে দণ্ড পলও বিচ্ছেদ না ঘটে এরূপ চিন্তায় অভিভূত অথবা নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িলে মনুষ্য ক্রমশঃ সকল কাজের বাহির হইয়া পড়ে কাজেই স্ত্রীসংসর্গ যাহাতে প্রয়োজন সাধনোপযোগী হয় এইরূপ নিয়মবিধি স্থাপন করিয়াছেন। পর্ব্বদিবসে পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ বাসরে, দিবাতে, সন্ধ্যা অথবা প্রত্যূষে, অসুস্থাবস্থায়, স্ত্রী সহবাস করিবে না। ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে। নির্জ্জন স্থলে স্ত্রীসহবাস করিবে। অধুনা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে যতই এই সকল নিয়ম শিথিল হইয়া পড়িতেছে ততই পুরুষ স্ত্রীজীত হইয়া পড়িতেছে এবং স্ত্রী পুরুষের স্থান অধিকার করিতেছে। স্ত্রী স্বাতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া কত কত স্বর্গতুল্য সংসার নরকে পরিণত হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষা রূপ সূত্র অবলম্বন করিয়া স্বাতন্ত্রতা প্রবেশ করিয়াছে; এক্ষণে আর হিন্দুর সে পরিবারও নাই সে সংসারও নাই। তখন যিনি পরিবারগণের মধ্যে বয়সে বুদ্ধিতে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ তিনিই সংসারের রাজা ছিলেন। স্ত্রীগণ অশীতি বর্ষা হইলেও পুরুষের অধীন ও অনুগত থাকিতেন, ভ্রাতা পুত্র ইত্যাদি সকলেই ভৃত্যের ন্যায় নায়কের আজ্ঞাবহ, পরস্পর পরস্পরের স্নেহ মমতা, শ্রদ্ধা, ভক্তিতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া যেন সকলে মিলিয়া একটী দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকিতেন। সকলেই

তৃপ্ত, সন্তোষচিত্তে আমোদ আহ্লাদে দিন যাপন করিতেন। তখন সংসার দেবপুরী ছিল, এক্ষণে তাহার কঙ্কাল মাত্র আছে কিন্তু ভিতরে হোটেল খানা। কি স্ত্রী কি পুরুষ স্ব স্ব প্রধান। যিনি কর্ত্তা তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়, অরাজক স্বেচ্ছাচারী রাজ্যের ব্যয় বহন করিবার জন্য তিনি ক্রীতদাস হইয়া আছেন। অন্ন বিক্রয় হইতেছে। কেহ কাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া যে যখন পাইতেছে ভোজন সমাপন করিয়া আপন আপন কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন। পার্শ্বস্থ কক্ষের লোক যেন কলিকাতার প্রতিবাসী। পীড়িত হইলে অর্থের সচ্ছলতা থাকিলে দাসদাসী দ্বারা সেবা শুশ্রূষা কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া লইতে হইবে নতুবা হাঁসপাতালে যাইতে হইবে। ঠিক যেন কেহ কাহার নহে। শিক্ষাগুণে ভদ্রতা, নম্রতা, স্নেহ মমতা শ্রদ্ধাভক্তি সমস্তই অন্তর হইতে মুখে আসিয়া বাক্যে পরিণত হইয়াছে। লোকের নিকট পরিচয় দিতে, বিজ্ঞ বিচক্ষণের ন্যায় আলঙ্কারিক বাক্য বিন্যাস করিয়া বর্ণন করিতে কি বালক কি স্ত্রী সকলেই সক্ষম। এই সকল অবধ্য স্ত্রীজাতি ও নির্ব্বোধ পণ্ডিতাভিমানী অজাত শ্মশ্রু ব'লকদিগের নিকট পরিণামদর্শী বৃদ্ধেরা নির্ব্বাক, নিশ্চল হইয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন আর উপায় কি, হয় কালচক্রে নিষ্পীড়িত হও, না হয় বনবাস আশ্রয় কর। যদি পূর্ব্বাকারের দুই একটী পরিবার খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিন্তু কাল মাহাত্মে আজি না হয় কালি তাহা হোটেলে পরিণত হইবে। যাহাদিগের হৃদয় অনার্য্য ভাবে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে তাঁহারা এখনও স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রী স্বাধিনতার বিষময় ফল অনুভব করিতে পারিতেছেন না কিন্তু যাঁহারা অল্প মাত্রায়ও আর্য্যসমাজের হিতেচ্ছু তাঁহাদের চক্ষে ইহা ভাবনাকর ভয়ানক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। আর্য্যবংশ ভগবানের আদি সৃষ্টি তিনি কি সত্য সত্যই মূলোৎপাটন করিবেন! ব্যাসদেবের "ম্লেচ্ছীভূত জগৎসর্ব্বং" এই ভবিষ্যৎবাণী উনবিংশ শতাব্দিতেই কি সম্পূর্ণ হইবে? কিন্তু এ বিশৃঙ্খলার কারণ পুরুষেব অন্তঃসারে হীনতা ও স্ত্রীতে অত্যন্ত আশক্তি, এই বীজ হইতে শাখা প্রশাখা রূপে নানা দিকে অনেক রূপ অশান্তিব সৃষ্টি হইয়াছে। যদি শাস্ত্রের কথা শুনিয়া একটু নিবৃত্তিব দিকে নত থাকিতেন তাহা হইলে এত জ্বালায় জ্বলিতে হইত না।

অতঃপর শাস্ত্রকারেরা খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন। প্রথমতঃ অতিভোজন নিষেধ, দিবাতে একবার ও রাত্রিতে একবারমাত্র ভোজন করাই বিধি। দিবাতে দ্বিভোজন নিষিদ্ধ। দধি ভিন্ন কোন মধুর দ্রব্য কালে অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহা ভোজন করা নিষিদ্ধ। মাহিষ দুগ্ধ ভিন্ন কোন আরণ্য পশুর দুগ্ধ পান করা নিষিদ্ধ নারিদুগ্ধ পান করা নিষিদ্ধ। মাংস ভোজন একেবারে না করিলেই ভাল। যিনি মাংস ভোজন প্রবৃত্তি এককালে সংযত করিতে না পারেন তিনি যজ্ঞে প্রোক্ষিত হইয়া যে শাস্ত্রোক্ত ভক্ষ্য পশু হনন করা হয় তাহা ভিন্ন অন্যরূপে হত পশুর মাংস ভোজন করিবেন না।

সমস্ত আরণ্য পশু প্রোক্ষিত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে ভক্ষ্য বলিয়া যেগুলি শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে তাহা শীকার লব্ধ হইলে ভক্ষণ করিতে দোষ নাই। ইহাতে এমত বিবেচনা করিবে না যে শাস্ত্রকারগণ মাংসাহার করিতে বিধি দিয়াছেন কিন্তু তাহা নহে তাঁহারা বরং ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন যে "অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম" আবার হিংসা না হইলে মাংস উৎপন্ন হয় না সুতরাং যাহারা প্রবৃত্তি মার্গানুসারী এবং রজো গুণের আধার তাহারা কোনকালে অথবা কোনমতে মাংসাহারে বিরত হইবেন না, সুতরাং কেবল তাহাদের গতি সাধ্যমত যাহাতে কুটিলতা আশ্রয় না করিতে পারে সেই জন্য মাংস ভোজনের বিবিধ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রাণাপেক্ষা জীবের আর প্রিয়তর বস্তু কিছুই নাই। বহুকষ্ট বহুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াও কোন প্রাণী দেহ হইতে প্রাণ বিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করে না সুতরাং প্রাণীর প্রাণ হরণ করা অপেক্ষা আর নিষ্ঠুরতা কি আছে? নির্ব্বিকার সর্ব্ব প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী মহর্ষিগণ কি কখন প্রাণীর প্রাণসংহারে অনুমোদন করিতে পারেন তাহা কখনই নহে। তাঁহারা বরং বলিয়াছেন যে যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অন্য সকল প্রাণীর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হয়, সেইরূপ অহিংসা ধর্ম্মে অন্য সকল ধর্ম্ম অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিদিগের যদৃচ্ছা মাংস ভোজন এবং তাহাদিগের স্বাভাবিক মোহান্ধতা জনিত অনিয়মিত মাংসাহার অথবা পীড়াকর মাংস ভোজন নিবারণ করিবার জন্য নিষেধ স্থলগুলি অতি যত্নের সহিত বলিয়া গিয়াছেন। সাত্বিক ব্রাহ্মণগণ প্রাণী হিংসেচ্ছু নহে সুতরাং যে সকল রাজসিক যজ্ঞে পশু হিংসার ব্যবস্থা আছে সেইস্থলে ব্রাহ্মণদিগের জন্য ব্রীহি ইত্যাদি দ্রব্য পশুরূপে কল্পিত হইয়াছে; তদনুসারে ইহযুগে দুর্গোৎসবাদি শক্তি পূজায় অনেক গৃহে পশুস্থলে মাসভক্ত বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে ইহাকে সাত্তিক পূজা বলে। অতএব শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে মাংসাহাব না করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ নিবৃত্তিকল্পে সমধিক উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়, যাঁহারা রাজসিক ও তামসিক গুণের আধার তাঁহারা যদি স্ব স্ব প্রবৃত্তি দ্বারা একান্ত পরিচালিত হইয়া মৎস্য মাংসাদি ভোজনে প্রতিনিবৃত্ত না হইতে পারেন তবে শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধ মানিয়া যজ্ঞে নিহত অথবা শীকার লব্ধ ভক্ষ্য মাংস ভোজন করিলে তাহাতে দোষ নাই। এই কথাই মনু মহাত্মা নিজ সংহিতায় বলিয়াছেন যথা—

ন মাংস ভক্ষণে দোষ ন মদ্য নচমৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেসা ভুতানাং নিবৃত্তিস্তু মহফলা॥

যাঁহাদের তামসিক প্রবৃত্তি তাঁহারাই শাস্ত্রে অনিচ্ছা প্রদর্শন অথবা অর্থ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকেন। এই স্বেচ্ছাচারী পুরুষ মহাত্মাদিগের উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অবৈধ পান ভোজনে উন্মত্ত হন ইহাতে ফল এই হয় যে তাঁহারা নিজের আয়ুঃক্ষয় এবং শরীরে বিবিধ প্রকার অচিকিৎস্য রোগ উৎপাদন করেন অবশেষে অকালে কালকবলে পতিত হন। মহামতি ব্যাসদেব মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত অনুগীত পর্ব্বাধ্যায়ে কাশ্যপ

ও মহাত্মা সিদ্ধ প্রশ্নোত্তরে কিরূপ বলিয়াছেন দেখুন।

মহাত্মাসিদ্ধ মহর্ষি কাশ্যপকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন মহর্ষে! জীব দেহ আশ্রয় করিয়া যে সমুদয় আয়ুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই সমুদয় কার্য্যের ক্ষয় হইলেই তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়। তখন সে বিপরীত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিরন্তর অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে। স্বীয় শরীরের অবস্থা বল ও কাল পরিজ্ঞাত হইয়াও অধিক পরিমাণে অহিতকর ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। কোন দিন অতিভোজন ও কোনদিন একেবারে ভোজন পরিত্যাগ করে। কখন অপেয় পান এবং অপরিমিত দুষ্ট অন্ন, আমিস ও পরস্পর বিরোধী গুরুতর বস্তু সমুদয় ভোজনে আশক্ত হয়। কোনদিন ভুক্ত বস্তু জীর্ণ না হইতে হইতেই ভোজন করে। কোন দিন দিবসে নিদ্রিত হয় কোনদিন কঠিন পরিশ্রম ও বারংবার স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে। কোনদিন অনবরত বিষয় কর্ম্ম সম্পাদন বাসনায় মলমূত্রাদির বেগ ধারণে প্রবৃত্ত হয় এবং কোনদিন অসময়ে ভোজন করিয়া শরীরস্থ বায়ু পিত্তাদি প্রকুপিত করে। জীব এইরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ প্রাণনাশক রোগ আসিয়া উহারে আক্রমণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ আয়ুঃক্ষয় হইলে কুপথ্য সেবনাদি অত্যাচার না করিয়াও বুদ্ধিভ্রংশ নিবন্ধন উদ্বন্ধনাদি দ্বারা দেহ ত্যাগ করে।"

এইরূপ অপেয়পান, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অনিয়মিত স্ত্রীসহবাস, অকালে নিদ্রা এবং অতি ভোজনাদিরূপ অত্যাচারে যদি মনুষ্য অসুস্থদেহ অকালে জরাক্রান্ত, প্রাণনাশক রোগাভিভূত, হীনায়ু হয় তাহা হইলে তাহার কিরূপে ধর্ম্মোপার্জ্জন করা হইবে? ইহারা ধর্ম্মাচরণের সম্পূর্ণরূপে ব্যাঘাতকারী ধর্ম্মাচরণ না করিলে ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াপড়ে সুতরাং যদ্দ্বারা দুরবস্থাপন্ন হইতে হয় তাহাকে কি কাহার যত্নের সহিত পরিহার করা কর্ত্তব্য নহে? যদ্দ্বারা শ্রেয়ঃ সাধনের ব্যাঘাত উৎপন্ন হয় তাহা কি অধর্ম্মজনক নহে? এসকল অবৈধ আচরণ অহিতকর তাহার ত সন্দেহ নাই। অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া যদি ধার্ম্মিকের লক্ষণ হয় তাহা হইলে স্বকীয় দেহের হিতাকাঙ্ক্ষী না হওয়া কি দুরাত্মার লক্ষণ নহে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আপনার দেহ নাশ করিতে পারে সে আত্মঘাতী। আত্মঘাতী পুরুষ পাপাত্মা, দুরাত্মা, সকলই হইতে পারে। অতএব যে আচরণ আত্মার উন্নতিরোধক, প্রাণের ধ্বংশকারী, এবং দেহের অসীম কষ্টদায়ক কোন প্রাণে কেমন করিয়া বলিব যে তাহা পাপজনক নহে। হিন্দু, যবন, খৃষ্টিয়ান, ইত্যাদি যে কোন সম্প্রদায়ের লোক হউক না কেন কেহই অনিষ্টের চেষ্টা করে না সকলেই কিসে ইষ্ট সিদ্ধ হয় ইহাই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে, কেবল বুদ্ধির মালিন্য নিবন্ধন প্রকৃত উপায় নিরূপণ করিতে অসমর্থ হয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সহজজ্ঞান অথবা ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তিকর হইলেই যাহারা হিতকর বলিয়া বিবেচনা করেন তাহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী ও অবিবেকী কারণ প্রবৃত্তি

সকলের একরূপ নহে। সত্ত্ব, রজ, তমো-গুণের মধ্যে যাহার যেটী প্রবল তাহার সেইরূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ প্রকৃতি সাধুদিগের প্রবৃত্তি অনুসরণীয় ও হিতজনক, রজ ও তমোগুণ প্রাকৃতিক লোকদিগের প্রবৃত্তি ভাল নহে, ইহা কখনই সদাচরণের আদর্শস্থল হইতে পারে না। কাযে কাযেই সেই আত্মজ্ঞ সাধুদিগের আচরণ অথবা উপদেশই একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইন্দ্রিয়াদি সকলই ঐ প্রবৃত্তিরই অনুগত ভৃত্য সুতরাং ইহাদের হস্তে ধর্ম্মাধর্ম্মের ভারার্পণ করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে ঐ তিনটির একটীরও স্থিরতা নাই। ইহারা প্রত্যেক মনুষ্যের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। আবার একজনের নিকট সকল কালে সমান থাকেন না। বাল, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য অবস্থায় ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা দেন। যে কার্য্য যৌবন কালে ভাল লাগিয়াছে তাহা প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধাবস্থায় নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বুঝা যায়, ইহার সহস্র সহস্র প্রমান পাওয়া যায়। আহার ও কার্য্যগত রুচি একইরূপ, ইহারা ক্ষণস্থায়ী ও বায়ুর গতির ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল অস্থায়ী, অনির্দ্দিষ্ট শক্তির উপর হিতাহিত নিরূপন করিবার ভার দেওয়া কি বাতুলের কার্য্য নয়। যে হিতাহিত বিবেচনার কিঞ্চিন্মাত্র ক্রটী হইলে প্রাণ, দেহ, সকলই বিপন্ন হইবে এমত গুরুতর কার্য্যের ভার কি না একটা অস্থায়ী স্বভাব সম্পন্ন বহুতররূপ পরিগ্রহশীল শক্তির হস্তে অর্পিত, ইহা যদি মনুষ্যত্ব হয় তবে পশুত্বের সঙ্গে প্রভেদ রহিল কোথায়? সেই জন্য পুনরায় বলি যে সকল মহাত্মার আত্মা নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ, সৃষ্টিকাল হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যাহা অচল ও অটল সত্ত্বগুণের আধার সেই সকল আত্মায় যাহা মানবের হিতকর বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, নির্ভয়ে তাহাকেই অবলম্বন কর সত্য সত্যই শুভফল প্রাপ্ত হইবে। প্রকৃত পণ্ডিত না হইয়া পণ্ডিত্তাভিমান পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাদের শিষ্য হইয়া অবিচারিত চিত্তে আজ্ঞাধীন ভৃত্যের ন্যায় তাঁহাদেরই আজ্ঞা প্রতি পালন কর কখনই কষ্ট পাইবেনা।

শরীর পীড়াগ্রস্থ হইলে যেমন রসনা বিকৃত হইয়া অহিতকর কুপথ্যে রুচি হয়, তখন সে রুচির উপর নির্ভর করিলে কদাচ রোগ মুক্ত হয় না বরং শরীরের ধ্বংশ অচীরে উৎপাদন করে। এরূপ স্থানে বিবেচক চিকিৎসকের হস্তে পথ্যাপথ্যের ভার অর্পণ করা শুভাকাঙ্ক্ষী লোকের কর্ত্তব্য এবং তাঁহারই আজ্ঞাবহ হওয়া উচিত। সেইরূপ বিকৃত বুদ্ধি ও মনে যাহা সুপথ্য বলিয়া নিরূপিত হয় তাহা কদাচ সুপথ্য হইতে পারে না বরং যে সকল পথ্যের সেবনে অধোগতি অবশ্যম্ভাবি সে স্থলে নির্ব্বিকার শুদ্ধাত্মা তাপসগণ যাহা ব্যবস্থা করেন তাহারই অনুসরণ একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা ঘোর

বিষয়াশক্ত আত্মহীন হইয়া পড়িয়াছি এক্ষণে যাহা ভাল বলিয়া বুঝি তাহা কেবল বিকারগ্রস্থ লোকের প্রলাপ মাত্র। এ অবস্থায় শাস্ত্রকারগণই প্রকৃত চিকিৎসক তাঁহাদের উপদেশ অবলম্বন ভিন্ন আর রক্ষার উপায় নাই। বিকৃত বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে শীঘ্রই পতন হইবে তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি বাঁচিতে চাও তবে যাও আর্য্যবংশীয় মহাপুরুষদিগের অমৃতময় ব্যবস্থা অবনত মস্তকে গ্রহণ কর এবং তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন কর নতুবা কখনই মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবে না নিশ্চয়ই পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দানিয়াড়ী।

রাসমালা।

ঘোরতর যুদ্ধ।

"বিরহবিধুরা বনিতা যেমন স্বামীর আগমন প্রতিক্ষা করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাল যাপন করে, সোরযোধগণ প্রভাতের প্রতীক্ষায় সেইরূপ উদ্বেগের সহিত নিশাকাল অতিবাহিত করিতে লাগিল। মহাভারতের অতুল নীতিগাথায় তাহারা অবগত হইয়াছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ হইলে স্বর্গীয় বিদ্যাধরী লাভ করিতে পারা যায়। আজি এই ধূলিময় অসার সংসার পরিত্যাগ করিয়া তাহারা সেই দেবগণের আবাস স্থল পবিত্র অমরপুরী প্রাপ্ত হইবার আশয়ে সানন্দে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ধাবমান হইল। রজনী প্রভাত হইবা মাত্র মহারাজ জয়শেখরের আবাহনে সমস্ত সৌরযোধ যুদ্ধার্থ নিত্য প্রস্তুত হয়; যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পার্থিব গৌরবের সহিত স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিবে, এ আশা তাহাদিগের নাই; তাহারা সমরক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিয়া দিব্যাঙ্গনাগণের পরিণয়-মালিকা লাভ করিবে, ইহাই তাহাদিগের একমাত্র আশা—একমাত্র বাসনা। বীরগণের এই দৃঢ় সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া অপ্সরোগণ বিবাহার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। যোদ্ধৃবর্গ যখন অঙ্গে চর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্র পরিধান করে, বিদ্যাধরীগণ সেই সময়ে বিবাহোচিত সুন্দর বসনভূষণে সজ্জিত হয়; যখন যোধগণ অস্ত্রশস্ত্র বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করে, অপ্সরোগণ তখন বিবাহ মালা করে ধরিয়া উৎফুল্ল চিত্তে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে থাকে; যোধগণ যখন স্ব স্ব তুরঙ্গের রশ্মি আকর্ষণ করে, দিব্যাঙ্গনাকুল তখন আপনাদিগের পুষ্পরথ তাহাদিগের অভিমুখে চালিত করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে থাকে।"

যুদ্ধবিগ্রহ এইরূপ দিন দিন ঘোরতর হইয়া উঠিল। এই প্রচণ্ড বিপ্লবের ভীষণ শব্দ রাজান্তঃপুরে রূপসুন্দরীর শ্রুতিগোচর হইল। সহসা তাঁহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, তাঁহার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত

হইল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য চারিদিক শূন্যময় দেখিলেন। তিনি বীরপত্নী—বীরাঙ্গনা। কতবার স্বহস্তে স্বামীকে সমরসাজে সজ্জিত করিয়া হাস্যোৎফুল্ল বদনে বিদায় দিয়াছেন, কতবার শত্রু-পরিবেষ্টিত শিবির মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া রণশ্রান্ত পতির শুশ্রূষা করিয়াছেন, আজি তাঁহার তবে এরূপ চিত্তবিকার কেন হইল? কেন রণভেরির প্রচণ্ড রোল তাঁহার কর্ণে প্রলয় মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতেছে? কেন তিনি যুদ্ধেব চিন্তায় ভীত হইতেছেন? রূপসুন্দরী কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না। মনে মনে নানা প্রমাদ গণিয়া তিনি প্রাণপতিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন এবং জযশেখব উপস্থিত হইলে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কাতব বচনে বলিলেন, "স্বামিন্! এদাসীর প্রার্থনা রাখুন,—আজি বড়ই অমঙ্গল দেখিতেছি—এসমস্ত দুঃক্ষণ দূর না হইলে আপনি যুদ্ধে যাইবেন না।" প্রিয়তমা বনিতাব প্রার্থনায় জয়শেখবের মুখে হাস্য উদিত হইল; তিনি মহিষীব অশ্রুপ্লাবিত কপোলদেশ চুম্বন করিয়া প্রেমসিক্ত বচনে উত্তব কবিলেন, "মহিষি! আজি তুমি কি বালিকা হইলে? তুমি কি জাননা যে, বিবাহ ও যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের নাম ব্যতীত আর কিছুই সুলক্ষণ নাই?" পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া তিনি অচিরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

ঊষার রক্তিম রাগে পূর্ব্বদিক রঞ্জিত হইবামাত্র উভয় পক্ষে রণদামামা বাজিয়া উঠিল। অমনি সৈন্য ও সামন্তগণ বিকট রণরবে যুদ্ধস্থল প্রতিধ্বনিত করিয়া জীবনমরণের কঠোর সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইল। প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীসমূহ প্রচণ্ড বাত্যাতাড়িত জলদবৎ পরস্পরের বিরুদ্ধে ধাবমান হইল। তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্রাদি বিদ্যুদ্বৎ দীপ্তি পাইতে লাগিল, তাহাদের বজ্রধ্বনিবৎ পদতাড়ননাদে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! হৃদয়োন্মাদিত রণবাদ্যসমূহ অবিরত বাজিতে লাগিল। সেই উত্তেজক রবে এমন কি ভীরুগণও উন্মাদিত হইয়া উঠিল। বর্ষার ধারাপতনের ন্যায় তীক্ষ্ণ শরনিকর অবিরলধারে বর্ষিত হইতে লাগিল; কেহ খড়্গ, কেহ গদা, কেহ শূল, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ নারাচ লইয়া নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীব সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল; হস্তী হস্তীর বিরুদ্ধে ধাবিত হইল, তুরঙ্গ তুরঙ্গকে আক্রমণ করিল, রথচালক রথচালকের সম্মুখীন হইতে লাগিল। নরশোণিতে রণস্থল প্লাবিত হইল; পতিত বীরগণের শবদেহ সমূহ তাহাতে অসংখ্য জলজন্তুর ন্যায় ভাসিতে লাগিল! যুদ্ধরোলের প্রচণ্ডতার সহিত যোধগণের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কবিগণ হীনোৎসাহ সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিয়া গাহিতে লাগিল,—ধন্য! ধন্য! বীবপুত্রগণ! এরূপ পবিত্র রণতীর্থে আর কখনও স্নান করিতে পাইবে না;—এই সুযোগে বিপুল অক্ষয় যশ লাভ কর, স্বর্গ লাভ কর, দেবনরকুলের নিকট যশস্বী হও,—ইহ ও পরলোকে অমর হইতে চেষ্টা কর। ঐ দেখ—ঐ দেখ—বিদ্যাধরীগণ মন্দারমালিকা হস্তে পুষ্পরথে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন; হর—হর! মহাদেব!"

সৌর ও শোলাঙ্কির প্রচণ্ড যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল।

ভয়াবহ সমরকল্লোল আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া দেবতাগণের চিত্তাকর্ষণ করিল। তাঁহারা বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, আবার কি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপ্সরগণ নৃত্য করিতে লাগিল;—কিন্নরীগণ উন্মত্তের ন্যায় গান করিতে লাগিল, বিদ্যাধরীগণ বিবিধ প্রকার বাদ্য বাজাইতে লাগিল; নাগকুল বিষম ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল! রণভৈরব ভূতপ্রেত ও পিশাচদলে পরিবেষ্টিত হইয়া শোনিতাক্ত নরকপালমালা ধারণ পূর্ব্বক তাণ্ডব নৃত্যকরিতে লাগিলেন;—শতশত কবন্ধ ও রাক্ষস অবিরলধারে রুধির পান করিতে লাগিল।

শোলাঙ্কিরাজের অন্যতম প্রধান সামন্ত ভূত ভূতনাথেরন্যায় যে স্থলে যুদ্ধ করিতে ছিলেন, বীরবর শূরপাল সেই দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার আক্রমণে দলিত ও বিত্রাসিত হইয়া ভূত সদলে পশ্চাদপসৃত হইলেন। দূরে থাকিয়া রাজা ভূবর তাহা দেখিলেন; অমনি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি তদ্দিকে ধাবিত হইলেন এবং সেই পলায়মান সৈন্যদিগকে পুনরুত্তেজিত করিয়া বলিলেন, "যে নরাধম রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলাইবে, আমি স্বহস্তে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব, ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে ভয়!" তখনই তাহারা উৎকট রণরব ত্যাগ করিয়া সেনাপতি ভট্টের সহিত শত্রুসেনার উপরিভাগে শার্দ্দুলবিক্রমে পতিত হইল। ভট্টের জীবনে মমতা নাই, শত্রুনিক্ষিপ্ত অবিরল শরজালের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই; স্বীয় রণতুরঙ্গকে শত্রুসেনাব্যূহের মধ্যে তাড়িত করিয়া শানিত তরবারাঘাতে তিনি শত শত সৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন; অবশেষে সৌরযোধগণের শরজালে বিদ্ধ হইয়া শূরপালের হস্তে নিহত হইলেন! ভট্টবীর প্রাণত্যাগ করিয়াও স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিয়া গেলেন। সৌররাজা জয়শেখর দুর্গের পশ্চিম প্রান্তে যুদ্ধ করিতেছিলেন, ভট্ট তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সেইস্থল অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে তদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন; জয়শেখরের সৈন্যগণ প্রাণপণে দুর্গের সেই পশ্চিম প্রান্ত রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কোন উদ্যমই সফল হয় নাই; ভট্ট পতিত হইবা মাত্র তাঁহার উন্মত্ত সৈন্যগণ জয়শেখরকে তাড়িত করিয়া অচিরে সেই প্রদেশ অধিকার করিয়া লইল। অবিলম্বে তৎসম্মুখস্থ দুর্গপ্রাকার বিভগ্ন হইলে তথায় একটী বৃহৎ রন্ধ্র প্রস্তুত হইল।

জয়শেখরের সেনাবল ক্রমে ক্ষয়িত হইয়া আসিল। তাঁহার প্রধান প্রধান সেনাগণ রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহার বিশাল বাহিনীর প্রায় সমস্তই পতিত হইয়াছে। এখন আর দুর্গ রক্ষার আশা নাই। তিনি সেই রন্ধ্র দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন,—দেখিলেন প্রচণ্ড গিরিনদের ন্যায় শত্রুসেনা ভীষণবেগে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তখন তিনি শূরপালকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আর দুর্গ রক্ষার উপায় নাই। পঞ্চসরের প্রধান প্রধান বীরগণ স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তোমার সসত্ত্বা ভগিনী রূপসুন্দরীকে লইয়া নিরাপদস্থলে রাখিয়া আইস;

নতুবা বংশরক্ষা হইবে না।" শূরপাল সবিনয়ে উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! এ বিপদের সময় আপনাকে একাকী রাখিয়া আমি কেমন করিয়া যাইব?" জয়শেখর ধীর নম্রবচনে পুনর্ব্বার বলিলেন, "বীর! তজ্জন্য তোমার চিন্তা নাই; তুমি আমার চির হিতকারী, তাহা আমি জানি; কিন্তু এ সঙ্কটে বংশ রক্ষা না করিলে পিতৃলোক কিসে সান্ত্বনা পাইবেন? কে তাঁহাদিগকে জলগণ্ডূষ দিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবে? পুত্রহীন হইয়া আমিই বা কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিব? হায়, ভ্রাতঃ! তাহা হইলে আমার বংশ বিলুপ্ত হইবে; শত্রুগণ নিষ্কণ্টকে আমার বক্ষের উপর পদাঘাত করিয়া পঞ্চসর ভোগ করিতে থাকিবে।"

শূর আর দ্বিধা ভাবিলেন না; রাজার নিকট বিদায় লইয়া তিনি স্বীয় ভগিনীর সহিত গোপনে দুর্গ ত্যাগ করিলেন এবং গভীর অরণ্যানীর অভিমুখে ধাবমান হইলেন। রূপসুন্দরী এতক্ষণ প্রকৃত বিষয় বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু যখন পলায়নের যথার্থ কারণ তাঁহার বিদিত হইল; তখন তিনি আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে চাহিলেন না; ভ্রাতাকে অনুনয় করিয়া বলিলেন "আমি স্বামীর চরণতলে চিতানলে প্রাণত্যাগ করিব।" শূরপাল তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন এবং রাজার অনুরোধ জানাইয়া পরিশেষে অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা একটী বিজন বনমধ্যে প্রবেশ করিলে শূরপাল ভগিনীকে তথায় ত্যাগ করিয়া সত্বরপদে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

ভুবরের কঠোর উদ্যম ক্রমে সফল হইবার উপক্রম হইয়া আসিল; সৌর-রাজের প্রধান প্রধান সেনানী ও সামন্তগণ রণস্থলে প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল; ভুবর দেখিলেন, পঞ্চাসর রক্ষার আর উপায় নাই। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। এইবার তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জয়শেখরের উন্নত মস্তক অবনত হইল, তাহার "সার্ব্বভৌম" "রাজচক্রবর্ত্তী" উপাধি সর্ব্বতোভাবে অব্যর্থ হইল। গুর্জ্জরের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া তিনি জয়শেখরের নিকট দূত প্রেরণ পূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন "যদি সৌর-রাজ দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক পৃষ্ঠবদ্ধ হস্তে অবনত মস্তকে ভুবরের চরণে আত্ম সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তিনি স্বরাজ্যের আধিপত্যেই অধিরূঢ় থাকিতে পারিবেন, নতুবা তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।" এই অযৌক্তিক প্রস্তাব সদম্ভে উপেক্ষা করিয়া মহারাজ জয়শেখর উত্তর করিলেন, যদি এরূপ জঘন্য হীনতা স্বীকার করিয়া জীবন ও সিংহাসন রক্ষা করিতে হয়, তবে সেই তুচ্ছ জীবন, সেই অকিঞ্চিৎকর রাজাসনে প্রয়োজন? আমি রাজপুত; পবিত্র সৌর-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; স্বদেশের রক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া অনন্ত সুখের নিলয় স্বর্গরাজ্য লাভ করিব?—তবে তুচ্ছ গুর্জ্জর রাজ্যে আমার প্রয়োজন কি? গুর্জ্জর কি স্বর্গের সমতুল্য? সৌররাজ্য শোলাঙ্কির হস্তে পতিত হইবে, হউক, কিন্তু সৌর-কুলের শেষ ধুরন্ধর আজি স্বদেশ রক্ষার্থ যে বীরত্ব রাখিয়া যাইবে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহা কবিগণ কর্ত্তৃক গীত হইবে।"

বীরশেখর জয়শেখর বীরের ন্যায়ই উত্তর করিলেন; নির্ভীক হৃদয়ের এই অদম্য উচ্ছ্বাসে হয়ত কোন বীরের হৃদয় পরম প্রীত হইত; কিন্তু ভূবরের ক্রোধানল দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিল; জয়শেখরের ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শাস্তি দিবার মানসে তিনি সমরানল ঘোরতররূপে প্রজ্জলিত করিলেন; জয়শেখর তাহাতে অনুমাত্রও ভীত হইলেন না, বরং তাঁহার সাহস ও উৎসাহ প্রচণ্ডরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তাঁহার সহায় সম্বল প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে; যে কতিপয় মাত্র সৈনিক অবশিষ্ট আছে, তাহারা তাঁহার সহিত প্রাণত্যাগ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প। মহারাজ জয়শেখর সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে চরম সাহসে নির্ভর করিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই অবশিষ্ট কতিপয় সৈনিক পুরুষ বিশাল শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে রণস্থলে পতিত হইল। এই হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য সৌর-রাজ জয়শেখর স্বচক্ষে দেখিলেন; তৎকালে যেদিকে নিরীক্ষণ করিলেন সেইদিকেই অগণ্য শত্রুমুণ্ড দেখিতে পাইলেন;—সেইদিক হইতেই অসংখ্য শোলাঙ্কি সৈন্য উন্মুক্ত অসি হস্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইতেছে; তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও ভীত বা নিরুৎসাহ হইলেন না। বিপদের গুরুত্বের সহিত তাঁহার সাহস ও উৎসাহ চরম সীমায় উন্নত হইল; হৃদয়োন্মাদী রণবাদ্যের গম্ভীর রোলে যেন নৃত্য করিতে করিতে তিনি মদমত্ত কেশরীর ন্যায় ভীষণ বেগে শত্রুসেনার উপর আপতিত হইলেন এবং দুই হস্তে তাহাদিগকে তৃণবৎ কর্ত্তণ করিয়া অবশেষে অনন্ত শস্ত্রশয্যায় শয়ন করিলেন! এই সময়ে সহসা আকাশ-মণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, সূর্য্যদেব কাঁপিতে কাঁপিতে অকস্মাৎ তিমিরগর্ত্তে বিলীন হইলেন, যেন স্বীয় বংশধরের নিদারুণ অধঃপতন দেখিতে না পারিয়া তিনি ইহজগৎ হইতে বিদায় লইলেন; দিক্‌চয় ঘোর দর্শন হইয়া উঠিল; পৃথিবী ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল; নদীর জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া নগর গ্রাম গ্রাস করিবার উপক্রম করিল; বায়ু প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনলকণা বর্ষণ করিতে লাগিল; উল্কাবৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল; যোগীগণের হোমকুণ্ড হইতে এক প্রকার গভীর ধূম উদ্গত হইতে লাগিল;—স্বর্গ মর্ত্তে শত শত দুর্লক্ষণ মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল; সেই সমস্ত অলক্ষণ দর্শনে মহাবীরনিপাত ভাবিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক বিষম শোকে অভিভূত হইল। তখনই উন্মত্ত শোলাঙ্কিসৈন্যগণ গগণবিদারী রবে ভয়াবহ জয়নাদ করিয়া উঠিল এবং সৌররাজের শবদেহ পদতলে দলিত করিয়া অপ্রতিহত বেগে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

২২। বৈশম্পায়নোক্ত লক্ষ শ্লোক।

পূর্ব্বে (১২শ পরিচ্ছেদে) বলাগিয়াছে যে, পর্ব্বসংগ্রহনির্দ্দিষ্ট শ্লোক সংখ্যার সহিত প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক সংখ্যার মিল নাই। তাহার উত্তরে আমরা দেখিতেছি যে সম্ভবতঃ ব্যাসদেব পর্ব্বসংগ্রহ রচিত হইবার পর আর একবার মহাভারতের সংস্করণ করিয়াছিলেন। এখনও আমাদের আর একটী সংশয় আছে। কি পর্ব্বসংগ্রহোক্ত সংখ্যার সহিত, কি প্রচলিত সংখ্যার সহিত বৈশম্পায়নোক্ত লক্ষশ্লোকের কথা মিলিতেছে না কেন? ইহার সামঞ্জস্য কিরূপে করিবে?

এইবারে তবে শ্লোক সংখ্যা গণিয়া দেখা যাউক। পর্ব্বসংগ্রহোক্ত শ্লোক-সংখ্যার সমষ্টি করিলে আমরা পাই ৮৪৮৩৬। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রচলিত মহাভারতের অষ্টাদশপর্ব্বে ৯১০১৬ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় (১)। কোনরূপেই একলক্ষ শ্লোক গণিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সৌতি নিজে পর্ব্বসংগ্রহে শ্লোক-সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ তিনিই বলিতেছেন যে বৈশম্পায়ন ব্যাসদেবের অনুজ্ঞায় লক্ষশ্লোক মহাভারত বলিয়াছেন। ইহার মীমাংসা কি? দেখা যাউক।

বৈশম্পায়ন নিজেও তাঁহার বক্তব্য ভারতসংহিতার বিষয় বলিয়াছেন "ইদং শতসহস্রংহি শ্লোকানাং পুণ্যকর্ম্মণাং" ॥ (আদি, ৬২ অ, ১৪)। অর্থাৎ এই শ্লোক সকলের শতসহস্র (বিশিষ্ট মহাভারত কীর্ত্তন করিয়াছেন)। এখন দেখিতে হইবে বৈশম্পায়নের এই কথার প্রকৃত অর্থ কি? ইহাতে কি এমনটী বুঝায় যে ব্যাসদেব গোণাগুন্তি করিয়া লক্ষশ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, না লক্ষকল্প (ঈষদূন লক্ষ) শ্লোক করিয়াছিলেন? পর্ব্বসংগ্রহোক্ত ৮৪৮৩৬ শোকসংখ্যা হইতে ৪৮৩৬ বাদ দিয়া ৮০০০০ শ্লোক থাকিলেও যদি বলা যায় "ইদং শতসহস্রংহি শ্লোকানাং", তাহা হইলে কি বড় অন্যায় কর্ম্ম করা হয়? এখানে শ্লোকের রচনা-প্রণালী দেখিয়া ভাব বুঝিতে হইবে। "ইদং শতসহস্রংহি শ্লোকানাং"· ইহার চলিত বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে হইলে "এই লাখ খানেক শ্লোক" এইরূপ করিতে হইবে। পূর্ব্বেও দেখাইয়াছি যে "অধ্যর্দ্ধশত" শব্দের অর্থে "শ' দেড়েক" (৮ম পরিচ্ছেদ দেখ) এবং "চতুর্ব্বিংশতি সহস্রীং" শব্দের অর্থে "হাজার চব্বিশ" (গোণাগুন্তি চব্বিশ হাজার নয়—১৫শ পরিচ্ছেদ দেখ) এইরূপ ধরিলে অর্থের সুসঙ্গতি হয়। এখানেও দেখিতেছি শত সহস্রং" অর্থে ঠিক "লক্ষ" না ধরিয়া "লাকখানেক" ধরিলেই সহজে বিরোধ-ভঞ্জন হইয়া যাইতেছে এবং এরূপ অর্থ না ধরিবার পক্ষে তেমন বিশেষ যুক্তিপূর্ণ হেতু দেখিতেছি না।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—:*:—

(১) বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণচরিত্র" পৃঃ ৫৩ দেখ। আমি বর্দ্ধমান রাজবাটির সংস্করণ দেখিয়া দু একটী পর্ব্ব গণিয়াছিলাম তাহাতে বঙ্কিম বাবুর গণনার সহিত কিছু অমিল হইল। তাই সুবিধার্থে আমি বঙ্কিম বাবুর গণনাই স্বীকার করিলাম।

হিন্দু মহিলা।

অহল্যা।

হিন্দু পুরাণকার হিন্দুমহিলাকে যেরূপ স্বর্গীয় গুণগৌরবে মণ্ডিত করিয়া জগতের নারী সমাজে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ আবার নিবিড় কলঙ্কপঙ্কে বিলেপিত করিয়া মহাতলের নিম্নতম নিরয় কূপে নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। হিন্দুর সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও চিন্তা এবং অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী ও রাধা—দুইটী ললনা-সম্প্রদায়ের মধ্যে কত পার্থক্য? যেন স্বর্গ ও নরক! সীতা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিলে সকলেই সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া সেই সতীর চরণে ভক্তিকুসুম অর্পণ করে, এবং অহল্যা প্রভৃতির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে। কারণ কি?—না, হিন্দুশাস্ত্রে সীতা প্রভৃতি সতী এবং অহল্যা প্রমুখ রমণীগণ অসতী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই বৃত্তান্তের সারবত্তা ক্রমে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, সেই জন্য অদ্য অহল্যার চরিত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। অহল্যার প্রতি যদি কাহারও অমানুষিক ঘৃণা থাকে, তিনি যেন কিছু ক্ষণের জন্য তাহা সম্বরণ করিয়া আমার মন্তব্যের যুক্তাযুক্ততা বিচার করিয়া দেখেন ইহাই আমার অনুরোধ। অহল্যা অসতী সুতরাং এরূপ মহিলার চরিত্রালোচনায় কোনরূপ সুফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই বলিয়া যদি তিনি আপত্তি করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, সতীর স্বর্গীয় চরিত্রের আলোচনায় যেরূপ সুফল পাওয়া যায়, অসতীর কলঙ্কিত জীবনের বিশ্লেষণে সেইরূপ সুফলই পাওয়া যাইতে পারে; একটীতে কেবল পুণ্যের সুরভি যশোগৌরব, অপরটীতে পাপের ভয়াবহ প্রায়শ্চিত্ত এবং সেই সঙ্গে পাপভীত পর্য্যাকুল প্রাণের পুণ্যার্জ্জনে প্রবণতা-বৃদ্ধি। মন্দ না দেখিলে, মন্দের ধারণা, মনোমধ্যে ঘৃণার মেঘ বিস্তার না করিলে কেহই কখন ভাল দেখিতে ভালবাসে না,—পুণ্যের বিমল আতপলীলায় আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হয় না। ভালমন্দ ও পুণ্যপাপ মানবসমাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া আপেক্ষিক গুণদোষের মিশ্র সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অতিমানুষ চরিত্রের সম্মুখে দশাননের দানব চরিত স্থাপিত না হইলে কে রামের উৎকর্ষ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত? সেইজন্য বলিতেছি, যদি অহল্যাকে কেহ পাপকলুষিত বলিয়া ঘৃণা করেন, তথাপি ইহাঁর চরিত্রালোচনা করিলে সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

অহল্যার প্রধান আপরাধ এই যে, তিনি গৌতম রূপী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও তাঁহাকে স্বীয় অমূল্য ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছিলেন। আদি কবি ভগবান্ বাল্মীকি বলিয়াছেন,

"মুনিবেশং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতুহলাৎ॥"

প্রসিদ্ধ টীকাকার রামানুজ বলিতেছেন,

"দেবরাজকুতুহলাৎ—স মামভিলষতি ইতি কৌতুকাৎ দিব্যরতিকৌতুকাচ্চ ইত্যর্থঃ। দুর্মেধা অহল্যা তেন সহ রত্যর্থং মতিং চকার ইত্যন্বয়ঃ।১৯।

এজন্য অহল্যার উপর স্বেচ্ছাকৃত ব্যভিচার-দোষ পড়িতেছে। কবিগুরু বাল্মীকির এইরূপ বিবরণের উপর পরবর্ত্তী কবি ও পুরাণকারগণ নানা নিবিড় কলঙ্কালঙ্কার আরোপিত করিয়া অহল্যা চরিত একটা জঘন্য ঘৃণাকারজনক ব্যাপার-রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। এরূপ ভয়াবহ কলঙ্কারোপ ন্যায়সঙ্গত কি না, এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা যাইবে। এরূপ করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, অহল্যা কে?

অহল্যা মহর্ষি গৌতমের ধর্ম্মপত্নী, এ কথা হিন্দুমাত্রই অবগত আছেন; কিন্তু তিনি কাহার কন্যা, তাঁহার নাম অহল্যা হইল কেন, কিরূপে তাঁহার নামে কলঙ্ক ঘটিল, এই সকল বিষয় জানা আবশ্যক; এইজন্য সঙ্ক্ষেপে তাহা বলিতেছি। বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে এ সম্বন্ধে একটা বিচিত্র বিবরণ আছে। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিতেছেন,—

অমরেন্দ্র ময়া বুদ্ধ্যা প্রজাঃ সৃষ্টাস্তথা প্রভো।
একবর্ণাঃ সমভাষা একরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২৯॥
তাসাং নাস্তি বিশেষো হি দর্শনে লক্ষণেঽপি বা।
ততোঽহমেকাগ্রমনাস্তাঃ প্রজাঃ সমচিন্তয়ম্॥২০॥
সোঽহস্তাসাং বিশেষার্থং স্ত্রিয়মেকাং বিনির্ম্মমে।
যদ্‌যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তত্তদুদ্ধৃতম্॥২১॥
ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্ম্মিতা।"

অর্থাৎ আমি বুদ্ধি দ্বারা প্রজা সকল সৃষ্টি করিলাম। তাহাদের সকলেরই বর্ণ, বয়স ও বচন সমান হইল, কি লক্ষণে, কি দর্শনে, কিছুতেই কোন প্রকার প্রভেদ রহিল না। তখন আমি একাগ্রমনা হইয়া প্রজাদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য সাধন করিবার নিমিত্ত প্রজাবর্গের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ উদ্ধৃত করিয়া একটী রমণী সৃষ্টি করিলাম। ইহাতে রূপগুণে অহল্যা অর্থাৎ অনিন্দনীয় ললনা সৃষ্ট হইল। বিশিষ্ট বিশিষ্ট অঙ্গ হইতে অহল্যা সৃষ্ট হইলেন। ভাল, তাঁহার নাম অহল্যা হইল কেন?

ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

হলং নামেহ বৈরূপ্যং হলাং তৎপ্রভবং ভবেৎ।
যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।
অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্ত্তিতম্॥২৩॥

অর্থাৎ হল শব্দের অর্থ বিরূপতা; তাহা হইতে যাহার জন্ম, তাহার নাম হল্য; যে রমণীর হল্য অর্থাৎ বিরূপতা নাই, সেই অহল্যা বলিয়া অভিহিত হয়; সেইজন্য আমি সেই রমণীর নাম অহল্যা রাখিলাম। এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যে রমণী অনিন্দিতরূপলাবণ্যবতী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, তিনিই অহল্যা। কিন্তু এই অহল্যা গৌতমের অহল্যা কি না, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ হইতে পারে, সেইজন্য ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

নির্ম্মিতায়াঞ্চ দেবেন্দ্র তস্যাং নার্য্যাং সুরর্ষভ।
ভবিষ্যতীতি কস্যৈষা মম চিন্তা ততোঽভবৎ॥২৪॥
ত্বন্তু শক্র তদা নারীং জানীষে মনসা প্রভো।
স্থানাধিকতয়া পত্নী মমৈষেতি পুরন্দর॥ ২৫॥
সা ময়া ন্যাসভূতা তু গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ন্যস্তা বহূনি বর্ষাণি তেন নির্যাতিতা চ হ॥ ২৬॥

ততস্তস্ত্ব পরিজ্ঞায় মহাস্থৈর্য্যং মহামুনেঃ।
জ্ঞাত্বা তপসি সিদ্ধিঞ্চ পত্ন্যর্থং স্পর্শিতা তদা ॥২৭॥

সেই নারী নির্ম্মিতা হইলে আমার মনোমধ্যে এই চিন্তার উদয় হইল যে, 'ইনি কাহার ভার্য্যা হইবেন?' অনন্তর আমি ন্যাসরূপে মহর্ষি গৌতমের হস্তে সমর্পণ করিলাম; তিনি বহু বৎসর রাখিয়া আমার কাছে প্রত্যর্পণ করিলেন। পরিশেষে মহামুনি গৌতমের জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও তপঃসিদ্ধির পরিচয় পাইয়া অহল্যাকে তাঁহারই হস্তে ভার্য্যারূপে অর্পণ করিলাম।

এই পর্য্যন্ত পিতামহের মুখে অহল্যা-সম্বন্ধে অনেক পরিচয় পাওয়া গেল; কিন্তু আসল কথা এখনও বাকী রহিয়াছে। সে কথা ব্রহ্মারই মুখে শুনিতে হইবে। ব্রহ্মা বলিলেন,—

ত্বং "ক্রুদ্ধস্ত্বিহ কামাত্মা গত্বা তস্যাশ্রমং মুনেঃ।
দৃষ্টবাংশ্চ তদা তাং স্ত্রীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥২৯॥
সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্ত্তেন সমন্যুনা।"

"পরন্তু তুমি কামপরতন্ত্র সুতরাং কুপিত হইয়া তখন সেই মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক অনলশিখার ন্যায় প্রদীপ্তা সেই স্ত্রীকে নয়নগোচর করিলে। শক্র! তুমি কামার্ত্ত হইয়া তাহাকে বলাৎকার করিলে।" * এস্থলে ইন্দ্রের অহল্যাহরণ সম্বন্ধে আর কোন কথাই বলিব না; সে বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে; তবে পাঠকদিগকে কেবল এইমাত্র অনুরোধ করিতেছি যে, ব্রহ্মার শেষ কথাটী অর্থাৎ "সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্ত্তেন সমন্যুনা" এই শ্লোকার্দ্ধ যেন তাঁহারা স্মরণ রাখেন। যাহা হউক, এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মার সৃষ্টা এই অহল্যাই গৌতমের পত্নী অহল্যা। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? ব্রহ্মার বিবরণ পাঠ করিলে সহসা মনোমধ্যে ধারণা হয় যে, অহল্যা তৎকর্ত্তৃক সৃষ্টা আদি রমণী, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এ সম্বন্ধে আদিকাণ্ডে আমরা এরূপ কোন অদ্ভুত বিবরণ দেখিতে পাই না। ফলতঃ অহল্যা কে? কাহার কন্যা? তাহার নির্ণয় করিতে হইবে।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশে মুদ্‌গলের বংশ বিবরণের সহিত এ সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে:—

"মুদগলাচ্চ মৌদ্‌গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজা তযো বভূবুঃ। মুদগলাদ্ ভবাশ্ব ভবাশ্বাদ্ দিবোদাসোঽহল্যা চ মিথুনমভূৎ। শারদ্বতোঽহল্যায়াং শতানন্দোঽভবৎ।"

অর্থাৎ মুদ্‌গল হইতে মৌদ্‌গল্য ব্রাহ্মণগণ উদ্ভূত হয়েন, উহাঁরা ক্ষত্রিয়-কুলোৎপন্ন। সেই মুদ্‌গলের পুত্র ভবাশ্ব; ভবাশ্ব হইতে দিবোদাস ও অহল্যা যমজ জন্ম গ্রহণ করেন। অহল্যার গর্ভে শারদ্বতেব ঔরসে শতানন্দের জন্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়:—

"মিথুনং মুদ্‌গলাদ্ তাম্যাদ্ দিবোদাসঃ পুমানভূৎ। অহল্যা কন্যকা যস্যাঃ সতানন্দস্তু গোতমাৎ।"

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অহল্যা মুদ্‌গল গোত্রে উদ্ভূত হইয়াছিলেন; ইনি ভবাশ্বের কন্যা এবং দিবোদাসের ভগিনী। গৌতমের সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। শতানন্দ ইহাঁদের পুত্র।

* বর্দ্ধমানরাজপ্রচারিত বঙ্গানুবাদ।

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত হইতে যাহা উদ্ধৃত হইল, রামায়ণের সহিত তাহার বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। বিচার করিতে গেলে রামায়ণের অহল্যা যে, গৌতমপত্নী অহল্যা নহেন তাহাই সহজে প্রতিপন্ন হয়। রামায়ণের উত্তরা কাণ্ডে অনেকগুলি আষাঢ়ে গল্প আছে, পূর্ব্বোক্ত অহল্যা বিবরণ তাহার অন্যতম। এই সকল কারণে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের বৃত্তান্ত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অহল্যার পিতৃকুলের পরিচয় পাওয়া গেল, অতঃপর তাঁহার জীবনীর আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাদলের স্বপন।

দয়া ক'রে হোক, ঘৃণা ক'রে হোক,
এ জীবনে কভু চাবে না মুখ,
দেখি ! তোমার লাগিয়ে, এমনি করিয়ে,
জনম জনম রোদন ও সুখ।
আজি ঝরঝার বায়ু, হুহু করে প্রাণ,
আছি মেঘেলার মত পড়িয়ে,
মনে হয় যেন, লাজে বাধ বাধ,
কোণে এসে আছ দাঁড়ায়ে।
যেন এলোচুল ব'য়ে, ঝরে যায় জল,
নয়নে নীহার গাঁথিয়া,
যেন অধরে মাখান, হাসিটির রেখা
ক্ষীণ হয়ে গেছে ভিজিয়া !
আমি পিছু চেয়ে উঠি, তুমি যেন ছুটি,
আন কোণে যাও পলায়ে,
শুধু আধেক দরশ, আধেক পরশ,
আসে পাশে মোর ঢালিয়ে !
আজি অলস বাদলে, আঁধার বিরলে,
বসে আছি মুদি নয়নে,
তোমা অশরিরী রূপ, আসে দলে দলে,
ঘেরিয়া আমারে স্বপনে,

গান।

মিশ্রকল্যাণ—একতাল।

তুমি আছ তাই বেঁচে আছি সখা !
আঁধার কুটীরে উঁকিটী পড়ে না,
ক্ষুদ্র আপনারে বাঁধা দিতে চাই,
অসীম সাধের মনে তা ধরে না !
এই বাসনার বাসা, পরের হৃদয়ে,
কোথা পাব আমি বাঁধিতে ;
বঁধু পরের বুকের সাধের সাপিনী
কে বল পুষিবে বুকেতে !
আমি প'ড়োবাড়ী যেন, প্রেতাবাস যেন,
জাগে বিভীষিকা শুয়ে চরণে,
এই প্রাণের জানালা, নিশি দিন খোলা,
কেহ নাহি ঘেঁসে ভ্রমণে !
দুখ দেছ সখা !—তুমিত দিয়েছ,
দুখ দেওয়া সে কি দেওয়া নয় ?
আজ দুখ কোলে করি, ঝরে আঁখি বারি,
ভাবি—আমারে তোমারও মনে হয় !

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদ।

গ্রহণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গ্রহণী প্রভৃতি জটিল রোগ সমুদায়ে আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অক্ষুণ্ণ প্রভাব বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আয়ুর্ব্বেদ মতে তৈল প্রয়োগে অধিকাংশ ব্যাধি প্রতিকৃত হইয়া থাকে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি পাশ্চাত্য চিকিৎসার বিপুল আড়ম্বর যেখানে বিফল হইয়াছে, একমাত্র তৈল মর্দ্দনে সেই ব্যাধি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। পাঠকগণকে আজ আমরা গ্রহণী রোগোক্ত সেই মহোপকারক তৈলের বিষয় কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিব। যখন ব্যাধির আমদোষের নিবৃত্তি ও পক্বতা উপস্থিত হয়, অপেক্ষাকৃত বায়ুর প্রকোপ অধিক হয়, তখনই তৈল প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। চিকিৎসক মাত্রেরই এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, নচেৎ অযথা অপযশঃ ভোগ করিতে হয়।

তুলার্দ্ধং শুষ্কবিল্বস্য তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থমারণালং তথৈব চ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থং তথৈব চ॥
ধাতকী বিল্ব কুষ্ঠঞ্চ শঠী রাস্না পুনর্নবা।
ত্রিকটুঃ পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী॥
দেবদারু বচা কুষ্ঠং মোচকং কটুরোহিণী।
তেজপত্রাজমোদে চ জীবনীয়গণস্তথা॥
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ পাচযেন্ মৃদুনাগ্নিনা।
এতদ্ধি বিল্বতৈলাখ্যং মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে॥
গ্রহণীং বিবিধং হন্তি অতীসারমরোচকম্।
সংগ্রহগ্রহণী হন্তি অর্শসামপি নাশনম॥
শ্লীপদং বিবিধং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশযেৎ।
কফবাতোদ্ভবং শোথং জ্বরমাশু ব্যপোহতি॥
কাসং শ্বাসঞ্চ গুল্মঞ্চ পাণ্ডুরোগবিনাশনম।
মক্কল্লশূলং বমনং সূতিকাতঙ্কনাশনম্॥
মূঢ়গর্ভে চ দাতব্যং মূঢ়বাতানুলোমনম্।
শিরোরোগহরঞ্চৈব স্ত্রীণাং পর্দানিসূদনম্॥
বন্ধ্যা দুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ।
তেঽপি তত্তাকৃণাশুক্রাঢ্যা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমেব চ।
বিল্বতৈলমিতিখ্যাতমাত্রেয়েণ বিনির্ম্মিতম্॥

বিল্বতৈল—তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ বেলশুঠ ৬।০ সের, মিলিত দশমূল ৬।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস ৪ সের, কাজি ৪ সের ও দুগ্ধ ৪ সের। উল্লিখিত দুইটী কাথ পাক শেষ করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্কদ্রব্য—ধাইফুল, বেলশুঠ, কুড়, শঠী, রাস্না, পুনর্নবা, ত্রিকটু, পিপুলমূল চিতামূল, গজপিপ্পলী, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কট্‌কী, তেজপত্র, বনযমানী জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি প্রত্যেক ৪ তোলা। তৈল পাকোক্ত প্রণালীতে পাক সমাধা করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে অগ্নিমান্দ্য,

নানাবিধ গ্রহণী, অতীসার, অরুচি, সংগ্রহ গ্রহণী, অর্শ, শ্লীপদ, অন্ত্রবৃদ্ধি, শোথ, জ্বর, কাস, শ্বাস, গুল্ম, পাণ্ডু, মকল্লশূল, বমি, সূতিকাদোষ, মূঢ়গর্ভ, মূঢ়বাত, শিরোরোগ, সমস্ত স্ত্রীরোগ, রজোদুষ্টি ও রেতোদুষ্টি প্রভৃ'ত ব্যাধি প্রশমিত হয়।

গ্রহণীমিহির তৈল—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ কুড়চীছাল ১২॥০ সের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অথবা ধনে ১২॥০ সের জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের অথবা তক্র ১৬ সের। দোষ দূষ্য বিবেচনা করিয়া এই তিনটীর কোন একটী কাথের সহিত কাথ পাক করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্কদ্রব্য—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরিতকী, বেণারমূল, মুতা, বালা, মোচরস, রসোত, বেলশুঁঠ, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বব, পদ্মকেশব, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, তগরপাদুকা, কট্‌কী, জটামাংসী, দারুচিনি, কেশুরিয়া, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, কদম্বছাল, কুড়চিছাল, যমানী, ও জীরা প্রত্যেক ২ তোলা, পূর্ব্ববৎ মৃদু অগ্নিতে পাক শেষ করিয়া ছাকিয়া লইবে। এই গ্রহণীমিহির তৈল মর্দ্দনে বলিপলিতাদি নষ্ট হইয়া দেহ কান্তিবিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। সকল প্রকার অতীসার, গ্রহণী, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, শ্বাস, বমি, ভ্রমি, উপদ্রব সমন্বিত কোষ্ঠগত যাবতীয় রোগ, অর্শ, কামলা, মেহ, শোথ ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শূল প্রভৃতি পীড়া আরোগ্য হয়।

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের পূর্ব্বোক্ত কাথত্রয় অর্থাৎ কুড়চিছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের ধনে ১২॥০ সের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং ১৬ সের তক্রের সহিত যথাবিধি কাথ পাক শেষ করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরিতকী, লবঙ্গ, বালা, পানিফল, রসোত, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, পদ্মকেশর, তগবপাদুকা, শবমূল, ভৃঙ্গবাজ, কেশুরিযা, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, ও কদম্বছাল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈলে গ্রহণী সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া ও অন্যান্য পীড়া আরোগ্য হয়। গ্রহণী অধিকারোক্ত তৈল সমুদায়ের মধ্যে ইহাই প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। ইহাব অবশ্যম্ভাবী সুফল আমরা বহু বহু স্থলে প্রত্যক্ষ করিযাছি, ফলতঃ ইহার ন্যায় ঔষধ অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।

দাড়িমাদ্য তৈল—মূর্চ্ছিত তিল তৈল ১৬ সের। কাথার্থ দাড়িমের খোলা ৮ সেব, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বালা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ধনে ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কুড়্‌চি ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ও তক্র (ঘোল) ৮ সের। এই সমুদায়ের সহিত পৃথক পৃথক্ পাক সমাধা করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্ক দ্রব্য—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, চই, জীরা, সৈন্ধব, গুড় ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মৌরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, যমানী, বন যমানী, বালা, কাঁচড়াদাম, আতইচ, থুলকুড়ি, পানিফল পত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল জামছাল, শালপানি, চাকুলে, বরাক্রান্তা ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মোচরস,

তালমূলী, কুড়চিছাল, বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদির কাষ্ঠ, গুলঞ্চ ও শিমুলছাল প্রত্যেক ৪ পল অর্থাৎ ৩২ তোলা। এই কল্ক দ্রব্য তণ্ডুল জলে পেষণ করিয়া তৈলে প্রদান করিবে ও যথাবিধি গন্ধ পাকাদি দ্বারা পাক সমাধা করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে দুর্ব্বার গ্রহণী, বিংশতি প্রকার প্রমেহ ও ষড়্‌বিধ অর্শ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

অতঃপর গ্রহণী রোগোক্ত ঘৃত পাকের বিষয় লিখিত হইতেছে। যে ঘৃত *গ্রহণী রোগে বিষবদনিষ্টকর*, আয়ুর্ব্বেদ মহিমায় অপরাপর দ্রব্যের সহিত পরিপক্ক হইয়া সেই ঘৃত আবার অমৃত সদৃশ হইয়া থাকে। ফলতঃ আয়ুর্ব্বেদের অসীম মহিমা ও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য গণের প্রগাঢ় বুদ্ধিবৃত্তি চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয় এবং প্রতিছত্রে পাশ্চাত্য চিকিৎসার নিকৃষ্টতা অন্তরে সমুদিত হয়। হিতাহিতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আয়ুর্ব্বেদের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞানে অক্ষম হইয়াই সময় সময় বৃথা নিন্দা করেন। আমরা অনেক সময় শুনিতে পাই যে, আয়ুর্ব্বেদে জ্বর বিকারের ভাল চিকিৎসা নাই, কলেরা রোগ নাই, রোগীকে আহার না দিয়া মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন, দুধ খাইতে দেন না, উষ্ণ জল খাইতে দেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনার ভাল মন্দ বিচার করিতে যে ব্যক্তি অক্ষম, সকলেই বোধ হয় তাহাকে মূর্খ ও পাগল বলিয়া থাকেন, আমরাও অযথা দোষারোপী ঐ সমুদায় ব্যক্তিকে মূর্খ হইতেও মূর্খ বলিতে ইচ্ছা করি। প্রকৃতপক্ষে বিবেচনার অভাবেই এত কষ্ট, এত রোগের যন্ত্রণা আমরা ভোগ করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে প্লীহা যকৃতের এত প্রাদুর্ভাব কেহ দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক আমরা বিফল আড়ম্বরে গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বলিয়া বলিতে হইল।

মরিচাদ্য ঘৃত—গব্য ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ দশমূল মিলিত ৬।॰ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের, ক্বাথ পাক করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্ক দ্রব্য যথা—মরিচ, পিপুল মূল, শুঁঠ, পিপুল, ভেলার মুটী, যমানী, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, *হিঙ্গু, সচল, বিট, সৈন্ধব ও করকচ লবণ*, চই, যবক্ষার, চিতামূল, ও বচ ইহাদের প্রত্যেক অর্দ্ধ পল। যথাবিধি পাক শেষ করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ।॰ বা ॥॰ আনা। এই ঘৃত পানে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, বিষ্টম্ভ, দৌর্ব্বল্য, প্লীহা, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, ভগন্দর, অর্শঃ এবং কফজ, বাতজ ও ক্রিমিজ বিবিধ ব্যাধি আরোগ্য হয়।

মহাষট্‌পলক ঘৃত—ঘৃত ৪ সের। দশমূলের ক্বাথ ৪ সের (দশমূল ৩৵॰ পোয়া, জল ১৬ সের শেষ ৪ সের) আদার রস ৪ সের, চুক্র ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ৪ সের, কাঁজি ৪ সের এই সমুদায়ের সহিত ক্বাথ পাক করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্কার্থ সচল লবণ, মিলিত পঞ্চ কোল, (পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, চিতা ও চই) সৈন্ধব লবণ, হবুষ, বিট্‌লবণ, বনযমানী, যবক্ষার, হিঙ্গু, জীরা, পাঙ্গালবণ, কৃষ্ণ জীরা ও যমানী প্রত্যেক ৪ তোলা। যথাবিধানে পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে, মাত্রা ।॰ হইতে ॥॰ তোলা পর্য্যন্ত। অন্নের সহিত অথবা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহাতে ক্রিমি,

প্লীহা, উদর, অজীর্ণ, গ্রহণী, প্রবাহিকা (আমাশয়), জ্বর, কুষ্ঠ ও অন্যান্য অগ্নিমান্দ্য জনিত বিবিধ পীড়া প্রতিকৃত হয়।

চাঙ্গেরী ঘৃত—ঘৃত ৪সের, আমরুলের রস ১৬ সের ও দধির মাত ১৬ সের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথ পাক করিবে। অনন্তর শুঁঠ, পিপুল মূল, চিতা মূল, গজপিপ্পলী, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী মিলিত ১ সেরের সহিত কল্ক পাক বিধি অনুসারে কল্ক পাক করিবে ও ছাকিয়া লইবে। মাত্রা।০ হইতে ।৷০ তোলা। এই ঘৃত বাতশ্লেষ্মঘ্ন। ইহা পানে অর্শ, গ্রহণী, প্রবাহিকা (আমাশয়) মূত্রকৃচ্ছ্র, গুদভ্রংশ ও আনাহ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

তক্রারিষ্ট—যমানী, আমলা, হরিতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট ও ঔদ্ভিদ লবণ প্রত্যেক ১ পল একত্র চূর্ণিত করিয়া ৮ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৪ দিন রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। ইহার নাম তক্রারিষ্ট। তক্রারিষ্ট সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং গ্রহণী, শোথ ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

অতঃপর পর্পটীর বিষয় লিখিত হইতেছে, কারণ গ্রহণী প্রভৃতি রোগে পর্পটী একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগের কঠিন অবস্থায় চিকিৎসক মাত্রকেই পর্পটীর আশ্রয় লইতে হইয়া থাকে। শোধিত ("রস বিজ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধে পারদের বিস্তারিত শোধন প্রণালী লিখিত হইল) পারদ ও শোধিত গন্ধকের পরিমাণ সমান। দুইটী বস্তু মিশ্রিত করিয়া যাবৎ নিশ্চন্দ্র অর্থাৎ পারদ কণা অদৃশ্য না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। চূর্ণ কজ্জল সদৃশ হইলে লৌহ পাত্রে নির্ধূম কুল কাষ্ঠের অগ্নিতে গলাইয়া তরল করিবে। পরে একটী গোময় পিণ্ডের উপর একখানি কচি কলার পাতা পাতিয়া তাহার উপর দ্রবীভূত কজ্জলী ঢালিবে ও অপর একটী গোময় পিণ্ড কচি কলার পাতা দ্বারা আবৃত করিয়া উহা দ্বারা চাপিয়া চটী প্রস্তুত করিবে। দ্রবীভূত কজ্জলীর যে অংশ লৌহ পাত্রে লাগিয়া থাকিবে অর্থাৎ জমিয়া যাইবে উহা গ্রহণ করিবে না, ফেলিয়া দিবে। পর্পটী ময়ূর পুচ্ছের চান্দ্রিকা সদৃশ চিক্কণ হইলে সুপ্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। পর্পটী প্রথম দিবসে ১ বা ২ রতি মাত্রায় সেবন করিবে। অনন্তর প্রত্যহ ১ বা অর্দ্ধ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত হইলে পুনরায় ১ বা অর্দ্ধ রতি করিয়া কমাইয়া ২ রতি করিবে। ১০ রতির অধিক মাত্রায় পর্পটী ব্যবহার অনুচিত। ২১ দিন পর্য্যন্ত পর্পটী সেবনের নিয়ম।

পর্পটী সেবন কালে বায়ু বা রৌদ্র সেবা, ক্রোধ, চিন্তা, আহারসময়ের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান ও অধিক বাক্য কথন প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। ঘৃত সৈন্ধব এবং জীরা ও ধনে বাটনা দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন, শালি তণ্ডুলের অন্ন, কাল বেগুন, নিমুখী শাক, বাস্তুক শাক, উত্তম মুগ, পটোল, আদা, কাকমাচী শাক, লাবাদি পক্ষীর মাংস, রোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য এবং জলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ আহার করা কর্ত্তব্য। কলা, নিম্বাদি তিক্ত বস্তু, উষ্ণ অন্ন, বরাহ

ও জলচর পক্ষীর মাংস, অম্ল, দধি, শাক ও গড়ক মৎস্য নিষিদ্ধ। ক্ষুধা উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ আহার করিবে। কদাচ ক্ষুধার বেগ ধারণ করিবে না। ভোজন সময়ের ব্যতিক্রম জন্য যদি কখন ও ভেদ বা বমন উপস্থিত হয়, তবে ডাবের জল বা দুগ্ধ পান করিবে। পর্পটী সেবনে উপকার যেরূপ, অপকার ও সেইরূপ। উল্লিখিত অবিহিত বিষয় আচরণ করিলে কিংবা বিহিত বিষয় আচরণ না করিলে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হয়।

অর্শোরোগং গ্রহণীং সামাং শূলাতিসারৌ চ।
কামলপাণ্ডুব্যাধিং প্লীহানঞ্চাতিদারুণং হন্তি॥
গুল্মজলোদরভস্মকরোগং হন্ত্যামবাতাংশ্চ।
অষ্টাদশৈব কুষ্ঠান্যশেষশো থাদি রোগাংশ্চ॥
ইয়মম্লপিত্তশমনী ত্রিদোষদমনী ক্ষুধাতিকমনীয়া।
অগ্নিং নিমগ্নমুদরে জ্বালাজটিলং করোত্যাশু॥
রসগন্ধকপপটিকাত্মপবায্যব্যা ধনংঘাতম্।
বলিপলিতশূন্যং পুরুষং দীর্ঘায়ুষং কুরুতে॥
ব্যাধিপ্রভাবহরণাদপমৃত্যুত্রাসনাশকরণাচ্চ।
মর্ত্ত্যানামমৃতঘটী রসগন্ধকপর্পটী জয়তি॥

পর্পটী সেবনে অর্শঃ, নানাবিধ গ্রহণী, শূল, অতিসার, কামলা, পাণ্ডু, অতিবৃদ্ধ প্লীহা, গুল্ম, জলোদর, ভস্মক, আমবাত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, অশেষবিধ শোথ ও অম্লপিত্তাদি ব্যাধি আরোগ্য হয়। পর্পটী সেবনে ত্রিদোষের শমতা হয় এবং মনুষ্যকে বলিপলিতাদি শূন্য ও দীর্ঘায়ুঃ করে।

এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার পর্পটী সেবনের নিয়ম এই যে, রোগীকে কিঞ্চিৎ পরিস্কৃত চিনি বা মিছরির সহিত কেবল মাত্র দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য দেওয়া হয়। লবণ জল প্রভৃতি অপর দ্রব্য সমুদয় নিষিদ্ধ। অসহ্য তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে দুগ্ধ বা ডাবের জল পান করিতে দেওয়া হয়। শৌচাদি ক্রিয়ায় অত্যল্প বা উষ্ণ জল ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। পর্পটী সেবন কালে বিশেষ সাবধান হইতে হয়, যদি কোন রূপে লবণ জল বা অপর কোন কুপথ্য সেবন ঘটে, তবে উপকারের বিনিময়ে বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়।

লৌহপর্পটী— শোধিত পারদ ২তোলা ও শোধিত গন্ধক ২ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা জারিত লৌহ মিশ্রিত করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া কোন লৌহ পাত্রে ঘৃত মাখাইয়া কজ্জলী স্থাপন করিবে ও মৃদু অগ্নি সন্তাপে গলাইয়া উল্লিখিত নিয়মে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। উত্তম চূর্ণ করিয়া ইহার ১ রতি হইতে সেবন আরম্ভ করিবে, প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। ১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া পুনরায় ১ রতি করিয়া মাত্রা হ্রাস করিবে। এক বা দুই সপ্তাহ কিম্বা আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান শীতল জল অথবা ধনে ও জীরার কাথ। ইহার নাম লৌহপর্পটী। এই লৌহপর্পটী সেবনে সূতিকা, জ্বর, অতি দুস্তর গ্রহণী, আম ও শূলযুক্ত অতিসার, পাণ্ডু, কামলা, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, ভস্মক (অতিক্ষুধা), আমবাত, উদাবর্ত্ত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ ও নানাবিধ বিষদোষ নষ্ট হয়। এই মহৌষধ সেবনে মনুষ্য বলিপলিতাদি বর্জ্জিত, দেহ সুন্দর কান্তি, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় এবং শত বৎসর পরমায়ু লাভ করে। ঔষধ সেবনকালে বিদাহি ও শাকপ্রভৃতি অভিষ্যন্দি দ্রব্য ভোজন, চিন্তা ও স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

স্বর্ণপর্পটী—পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর উহার সহিত গন্ধক ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহ পাত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে উল্লিখিত নিয়মে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ১ রতি হইতে সেবন আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি ও হ্রাস করিবে। ব্যাধি অনুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিতে হয়, কেবল মধু দিয়া মাড়িয়া দুগ্ধসহ ও সেবন করা যায়। ইহা সেবনে বিবিধ গ্রহণী, জ্বর, শূল, প্লীহা, শোথ ও উদর প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। বিজয় পর্পটী ও পঞ্চামৃত পর্পটী প্রভৃতিও এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত ও সেবন করিতে হয়।

রসবিজ্ঞান।

পারদশোধন বিধি।

ইষ্টকারজনীচূর্ণৈঃ ষোড়শাংশৈ বসস্তু চ।
মর্দ্দয়েৎ সপ্তধা খল্লে জম্বীবোত্থদ্রবৈর্দিনম্॥
কাঞ্জিকৈঃ ক্ষালয়েৎ সূতং নানাদোষোপশান্তয়ে।
বিশালাঙ্কোঠচূর্ণেন বঙ্গদোষং নিবারয়েৎ॥
রাজবৃক্ষো মলং হন্তি চিত্রকো বহ্নিদূষণম্।
চাঞ্চল্যং কৃষ্ণধুস্তূরাস্ত্রিফলা বিষনাশিনী॥
কটুত্রয়ং গিরিং হন্তি চাসহ্যাগ্নিং ত্রিকণ্টকঃ।
প্রতিদোষং কলাংশেন তত্তচ্চূর্ণং সকন্যকম্॥
সুবস্ত্রচ্ছানিতং সূতং খল্লে কৃত্বা যথাক্রমম্।
প্রত্যেকং প্রত্যহং যত্নাৎ সপ্তবারং বিমর্দ্দয়েৎ॥
উদ্ধৃত্যোষ্ণারনালেন মৃৎপাত্রে ক্ষালয়েৎ সুধীঃ।
সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতম্॥

রসায়নার্থী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ইহা রসিত (আস্বাদিত) হয় বলিয়া ইহার নাম রস। রস অর্থাৎ পারদ ও এক প্রকার ধাতুবিশেষ। উৎপত্তিস্থান ভেদে পারদ শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারি প্রকার হইয়া থাকে। ঐ চারি প্রকার পারদ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্বেত-পারদ রোগ বিনাশে, লোহিত-পারদ রসায়ন বিষয়ে, পীত-পারদ ধাতু ভেদে ও কৃষ্ণ-পারদ আকাশ গতি বিষয়ে উপযোগী। রসধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য্য, রস, সূত ও শিবের যাবতীয় নাম পারদের পর্য্যায়। পারদ কষায়াদি ষড়্‌রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, যোগবাহী, অতিশয় বৃষ্য, চক্ষুর বলপ্রদ, সর্ব্বব্যাধিনাশক ও বিশেষতঃ কুষ্ঠঘ্ন।

অন্তঃসুনীলো বহিকজ্জ্বলো যো,
মধ্যাহ্নসূর্য্যপ্রতিমপ্রকাশঃ।
শস্তোঽথ ধূম্রঃ পবিপাণ্ডরশ্চ;
চিত্রো ন যোজ্যো রসকর্ম্মসিদ্ধৌ॥

যে পারদের অন্তর্ভাগে সুন্দর নীল আভা দৃষ্ট হয়, যাহার বাহ্যাংশ উজ্জ্বল ও যাহা মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট তাহাই ব্যবহার্য্য। যাহা ধূম, পাণ্ডু বা বিচিত্রবর্ণ তাহা পরিত্যজ্য।

স্বভাবতঃ পারদে নাগ, বঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি ও অসহ্যাগ্নি নামক ৮টী দোষ এবং পর্পটী, পাটনী, ভেদী, দ্রাবী, মলকরী, অন্ধকরী ও ধাঙ্ক্ষী নামক সাতটী কঞ্চুক বিদ্যমান থাকে। নাগদোষ দ্বারা জড়তা ও গণ্ডরোগ, বঙ্গদোষ দ্বারা কুষ্ঠ, মলদোষ দ্বারা জাড্য, বহ্নিদোষ দ্বারা দাহ, চাঞ্চল্যদোষ দ্বারা বীজনাশ, বিষদোষ দ্বারা মৃত্যু, গিরিদোষ দ্বারা স্ফোটক ও অসহ্যাগ্নিদোষ দ্বারা মোহ জন্মিয়া থাকে। পারদের উল্লিখিত দোষ সমুদায় সংশোধন না

করিয়া কোন কার্য্যেই ব্যবহার করা উচিত নহে।

যে পরিমাণ পারদ শোধন করিতে হয়, তাহার ষোড়শাংশ পরিমিত ইষ্টকচূর্ণ ও হরিদ্রাচূর্ণ উহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং কিঞ্চিৎ ঘৃতকুমারীর রস ও গোঁড়ালেবুর রস সংযুক্ত করিয়া উত্তমরূপ মর্দ্দন করিবে। এইরূপ সাতবার মর্দ্দন করিয়া কাঁজি দ্বারা প্রক্ষালন কবিবে। উল্লিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা পারদের নাগ অর্থাৎ সীসক মিশ্রণদোষ অপসারিত হয়। দোষ অপনয়নার্থ যে যে চূর্ণের সহিত পারদ মর্দ্দন করিতে হয়, ঐ সমুদায় চূর্ণ অর্থাৎ প্রত্যেক চূর্ণের পরিমাণ পাবদের ষোড়শাংশ। মর্দ্দনকালে সকল চূর্ণের সহিতই কিঞ্চিৎ ঘৃতকুমারীর রস মিশ্রিত করিতে হয়। রাখাল শসা ও ধল আকড়ার মূলের চূর্ণের সহিত মর্দ্দনে বঙ্গদোষ, সোঁদালমূলচূর্ণ দ্বারা মলদোষ, চিতামূলচূর্ণ দ্বারা বহ্নিদোষ, কৃষ্ণধুস্তুর দ্বারা চাঞ্চল্যদোষ, ত্রিফলা দ্বারা বিষদোষ, ত্রিকটু দ্বারা গিরিদোষ ও গোক্ষুর দ্বারা অসহ্যাগ্নিদোষ অপসারিত হয়। প্রতিদিন ৭ বার মর্দ্দন করিবে, এইরূপ ৮ দিন মর্দ্দন করিয়া নবম দিবসে ছাঁকিয়া উষ্ণ কাঁজিতে প্রক্ষালন করিয়া লইবে। ইষ্টকাদি চূর্ণ দ্বারা নাগাদি অষ্টদোষ ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা সপ্তকঞ্চুক দূরীকৃত হয়।

অন্ততঃ পারদের প্রধান দোষ নিবারণের জন্ত নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি ইহার অন্যথা অর্থাৎ দোষসংশোধন না করিয়া পারদ ব্যবহার করেন, তিনি একরূপ রোগীর প্রকৃত শত্রু। রোগীর হিতাহিতের দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই, স্বার্থসিদ্ধিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ সকল মূর্খ চিকিৎসকের জানা উচিত যে, রোগীর উপকার না হইলে ভবিষ্যতে অবশ্যই তাহার স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

ঘৃতকুমারীর দ্বারা মলদোষ, ত্রিফলা দ্বারা অগ্নিদোষ ও চিতার দ্বারা বিষদোষ অপনীত হয়, অতএব অন্ততঃ ঐ সমুদায় চূর্ণের প্রত্যেক দ্বারা ৭ বার পারদকে মর্দ্দন করিয়া প্রধান দোষ অপনয়ন করা উচিত; সংক্ষেপতঃ ঘৃতকুমারী, চিতামূল, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা ইহাদের প্রত্যেকের কাথের সহিত ৩ দিন মর্দ্দন করিলে পারদ সর্ব্বদোষ বিনির্ম্মুক্ত হয়। কেবল রসুনের রসের সহিত মর্দ্দনেও পারদ নির্দ্দোষ হয়।

মূর্চ্ছন।

যে প্রক্রিয়া দ্বারা পারদের নিশ্চয় ব্যাধিঘাতিনী শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মূর্চ্ছনা। ত্রিকটু, ত্রিফলা, বন্ধ্যাকর্কোটকী, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের কাথ এবং চিতা, মেষলোম, হরিদ্রা, যবক্ষার, ঘৃতকুমারীররস, আকন্দপত্ররস ও ধূস্তূরপত্ররস ইহাদের প্রত্যেকের সহিত ৭ বার মর্দ্দন করিলে, পারদের কঞ্চুক সমূহ দূরীভূত হয়। ইহার নাম মূর্চ্ছনা। মূর্চ্ছিত রস বা পারদ বলিলে এইরূপ পারদ বুঝিতে হইবে। অতঃপর পর্পটিতে যেরূপ পারদ ব্যবহৃত হয় তাহা লিখিত হইতেছে।

পর্পটী ক্রিয়ার প্রথমে উল্লিখিত নিয়মে পারদের মলদোষ, বহ্নিদোষ ও বিষদোষ নিবারণ করিতে হয়। দ্বিতীয়

অর্থাৎ ঘৃতকুমারীরস, ত্রিফলা চূর্ণ ও চিতা পাতার রসে ইহা মর্দ্দন করা হইয়া থাকে। অতঃপর যথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, এরণ্ডপত্র, আর্দ্রক ও কাকমাচী পত্ররসে ক্রমাগত মর্দ্দন করিতে হয়। একটী রস মর্দ্দন করিতে করিতে শুষ্ক হইয়া গেলে অপর রসের সহিত মর্দ্দন করিতে হয়। এইরূপ পারদই পর্পটী ক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য। যে গন্ধক শুকপুচ্ছের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতের ন্যায় দীপ্তিশালী, চিক্কণ, কঠিণ ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও পর্পটী ক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য। প্রথমতঃ গন্ধক খণ্ড খণ্ড করিয়া তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজ রসে ৭বার ভাবনা দিয়া এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধূলিবৎ চূর্ণ করিতে হয়। পরে ঐ গন্ধক লৌহ পাত্রে স্থাপন করিয়া নির্ধূম কুল কাষ্ঠাগ্নিতে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে নিক্ষেপ করিতে হয়। কঠিনীভূত ঐ গন্ধক চূর্ণ করিয়া উক্তরূপ পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী এবং পর্পটী ক্রিয়ায় ব্যবহার করিবে।

জনপদোদ্ধংসনীয়াধ্যায়।

অথাতো জনপদোদ্ধংসনীয়ং বিমানং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হ স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।

ভগবান্ আত্রেয় মহর্ষি কহিলেন, আমরা অতঃপর জনপদোধ্বংসনীয় অধ্যায় বর্ণনা করিব।

জনপদমণ্ডলে পাঞ্চালক্ষেত্রে দ্বিজাতিবরাধ্যুষিতে কাম্পিল্যরাজধান্যাং ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়োঽন্তেবাসিগণপরিবৃতঃ পশ্চিমে ঘর্ম্মমাসে গঙ্গাতীরে বনবিচারমনুবিচরন্ শিষ্যমগ্নিবেশ মব্রবীৎ।

জল, বায়ু, দেশ ও কাল প্রভৃতি দূষিত হইয়া যে, একদা মনুষ্য সমুদায়কে পীড়িত বা কালভবনে প্রেরিত করে, উহার বিস্তারিত বিবরণ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। আজ কাল এইরূপ দুর্ব্বিপাক প্রায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। সেই জন্য আজ আমরা এই অধ্যায়টী পাঠক বর্গকে জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান কাল সুলভ ম্যালেরিয়া ও কলেরা ইহারই অন্তর্ভূত।

ব্রাহ্মণমণ্ডলী বিরাজিত পাঞ্চাল রাজধানী কাম্পিল্য নগরে শিষ্যগণ পরিবৃত অত্রিনন্দন ভগবান্ পুনর্ব্বসু গ্রীষ্ম কালের শেষভাগে একদিন গঙ্গাতীরস্থ বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে প্রিয়শিষ্য অগ্নিবেশকে কহিলেন।

দৃশ্যন্তে হি খলু সৌম্য! নক্ষত্র গ্রহ চন্দ্র সূর্য্যা [illegible]নিলানাং দিশাঞ্চ প্রকৃতীভূতা ঋতুবৈকারিকা ভাবা অচিরাদিতো ভূরপি চ ন যথাবদ্রস বীর্য্য বিপাক প্রভাবমোষধীনাং প্রতি বিধাস্যতি। তদ্বিয়োগাচ্চাতঙ্কপ্রায়তা নিয়তা। তস্মাৎ প্রাক্ উদ্ধংসাৎ প্রাক্ চ ভূমের্বিরসীভাবাদুদ্ধরত সৌম্য! ভৈষজ্যানি! যাবন্নোপহত রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাবানি। বয়ং চৈষাং রসবীর্য্য বিপাক প্রভাবান্ উপযোক্ষ্যামহে।

হে বৎস অগ্নিবেশ! কালক্রমে নক্ষত্র, গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি ও দিক্ সকলের স্বাভাবিক ঋতু পরিবর্ত্তনজাত বৈকারিক ভাব দৃষ্ট হইতেছে। অতএব অবিলম্বেই ভূমির গুণের ব্যতিক্রম ঘটিবে, সুতরাং ঔষধি সকলের যথোচিত, রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব উৎপন্ন হইবে না। এই কারণে দেশমধ্যে পীড়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া জনপদ সকল বিধ্বস্ত প্রায় হইয়া যাইবে! এই ভয়াবহ

দুর্ঘটনার নাম জনপদোদ্ধ্বংসন। এই জনপদোদ্ধ্বংসনের পূর্ব্বে এবং ভূমির বিকৃত রসোৎপত্তির পূর্ব্বে উদ্ভিজ্জ সমুদায় উদ্ধৃত করিয়া রাখা উচিত, কারণ ঐ উদ্ধ্বংসনে ভূমির বৈরস্যোৎপত্তি নিবন্ধন উদ্ভিজ্জেরও রসাদি বিরত হইয়া যাইবে এবং উহারা রোগ নিবারণাদি কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে অনুপযোগী হইয়া পড়িবে, সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত ঔষধ সমস্তের রস বীর্য্যাদি আমাদের দেহরক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে, আমরা উদ্ধংসন সময়ে ঐ সমুদায় উদ্ভিজ্জের উপযোগ করিয়া জনপদোদ্ধংসকর বিকার হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহত থাকিতে পারিব।

এবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ। উদ্ধৃতানি খলু ভগবন্! ভৈষজ্যানি সম্যগ্ বিহিতানি চ সম্যগ্বিচাবচাবিতানি। অপিতু খলু জনপদোদ্ধংসনমেকেন ব্যাধিনা যুগপদসমানপ্রকৃত্যাহার দেহ বল সাত্ম্য সত্ত্ব বয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাদ্ ভবতীতি।

অতঃপর অগ্নিবেশ আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতি, আহার, দেহ, বল, সাত্ম্য, সত্ত্ব ও বয়স ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু জনপদোদ্ধংসকালে কিনিমিত্ত সকলেই একরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ। এব মসামান্যানামেভিরপ্যগ্নিবেশপ্রকৃত্যাদিভি র্ভাবৈ র্মনুষ্যাণাং যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যা স্তদ্বৈগুণ্যাৎ সমানকালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োঽভি নির্ব্বর্ত্তমানা জনপদমুদ্ধংসয়ন্তি। তে তু খল্বিমে ভাবাঃ সামান্যা জনপদেষু ভবন্তি। তদ্ যথা, বায়ুরুদকং দেশঃ কাল ইতি।

মহর্ষি অগ্নিবেশ উত্তর করিলেন, বৎস! যদিও মনুষ্য সকল ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন, তথাপি কতকগুলি ভাব সকলের পক্ষেই সাধারণ ও অপরিহার্য্য। ঐ সাধারণ ভাবের বৈগুণ্যহেতু সকলেই যুগপৎ একরূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং নিয়ত লোক ক্ষয় হওয়াতে জনপদ লোক শূন্য হইয়া পড়ে, এইজন্য ইহাকে জনপদোদ্ধংস বলা যায়। বায়ু, উদক, দেশ ও কাল এই চারিটী সাধারণ ভাব সকলেরই ভোগ্য এবং অপরিহার্য্য। এই চারিটী প্রকৃতি বিপর্য্যয় দ্বারা সকলে সমানরূপে আক্রান্ত ও সমান বিপদাপন্ন হয়। জনপদান্তর আশ্রয় না করিলে বিপদের আক্রমণ হইতে কোন মতেই নিস্তার পাওয়া যায় না।

তত্র বাতমেবং বিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ তদ্ যথা--ঋতু বিষমমতি স্তিমিতমতিচলমতি পরুষমতিশীতমত্যুষ্ণমতিরূক্ষমত্যভিষ্যন্দিন মতিভৈরবারাবমতিপ্রতিহতপরস্পরগতিমতিকুণ্ডলিনমসাত্ম্যগন্ধবাষ্প সিকতাপাংশুধূমোপহতমিতি।

জনপদোদ্ধংসকালে বায়ুর প্রকৃতি ভিন্নরূপ হইয়া উঠে, যথা—ঋতুবিষম অর্থাৎ যে ঋতুতে বায়ুর যেরূপ প্রকৃতি হওয়া প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহা না হইয়া বিপরীত হয়। বায়ু অতিশয় স্থির, অতি বেগশালী, অতি কর্কশ, অতি শীতল, অতি উষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি অভিষ্যন্দী, অতি ভীষণ রবকারী, ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখ প্রবাহ সকলের পরস্পর প্রতীঘাতে কুণ্ডলাকারে ভ্রমণকারী, অপ্রিয় গন্ধযুক্ত এবং বাষ্প বালুকা, ধূলি ও ধূম দ্বারা উপহত হয়।

উদকন্তু খলু অত্যর্থ বিকৃত গন্ধবর্ণ রসস্পর্শবৎ ক্লেদবহুল মপক্রান্তজলচরবিহঙ্গমুপক্ষীণ জলাশয়মপ্রীতিকরমপগতগুণং বিদ্যাৎ।

জল এইরূপ স্বভাব সম্পন্ন হইয়া জনপদবাসীদিগের পীড়াজনক হয় যথা—অতিশয় বিকৃত গন্ধ, বর্ণ, রস এবং স্পর্শযুক্ত, অতিশয় ক্লেদবিশিষ্ট, মৎস্য, কচ্ছপ ও কুম্ভীর এবং হংস সারসাদিপক্ষিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। জলাশয় শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে, জলপানে তৃপ্তি জন্মে না, জলের শৈত্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণের হ্রাস হইয়া যায়। এবংবিধ জল জনপদোদ্ধংসের প্রধান কারণ।

দেশং পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতি বর্ণ গন্ধ রস স্পর্শ ক্লেদবহুলমুপসৃষ্টং সরীসৃপ ব্যাল মশক শলভ মক্ষিকা মূষিকোলূক শ্মশানিক শকুনি জম্বুকাদিভিস্তৃণোলূপোপবনবন্তং প্রতানাদিবহুলং অপূর্ব্ববদপতিতং শুষ্কনষ্টশস্যং ধূম্রপবনং প্রধ্মাত পতত্রিগণমুৎক্রুষ্টশ্বগণমুদ্‌ভ্রান্ত ব্যথিত বিবিধমৃগ পক্ষিসঙ্ঘ মুৎসৃষ্ট নষ্ট ধর্ম্ম সত্য লজ্জাচার গুণ জনপদং শশ্বৎক্ষুভিতোদীর্ণসলিলাশয়ং প্রততোল্কাপাতনির্ঘাতভূমিকম্পং অতিভয়ারাবরূপং রূক্ষ তাম্রারুণ সিতাভ্রজাল সংবৃতার্ক চন্দ্রতারকমভীক্ষ্ণং সসম্ভ্রমোদ্বেগমিব সত্রাসরুদিতমিব সতমস্কমিব গুহ্যকাচরিতমিবাক্রন্দিতশব্দবহুলঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ।

জনপদোদ্ধংসন সময়ে দেশের স্বভাব এইরূপ হয়, যথা—প্রকৃত বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শবিবর্জ্জিত, ক্লেদবহুল, সরীসৃপ, ব্যাল, মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা, মূষিক, পেচক, শ্মশানচারী পক্ষী ও শৃগালাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত, উলু প্রভৃতি তৃণ পরিপূর্ণ ও নানাবিধ কুৎসিত বন্য লতা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। এই বিকৃত ভাবাপন্ন দেশে শস্য ও বৃক্ষ সমস্ত শুষ্ক ও নষ্ট হইয়া যায়, নিয়ত ধূম্রবর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, পেচকাদি নিশাচর পক্ষী ও কুক্কুরগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকে, মৃগগণ উদ্‌ভ্রান্ত ও ব্যথিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, মনুষ্যগণ ধর্ম্ম, সত্য ব্যবহার, লজ্জা ও সদাচার পরিভ্রষ্ট হয়, নিরন্তর উল্কাপাত ও ভূমিকম্প হয় এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণ তাম্র, কৃষ্ণ বা অন্যবিধ বিকৃত বর্ণবিশিষ্ট হয়।

কালন্তু খলু যথর্ত্তুলিঙ্গাদ্‌বিপরীতলিঙ্গমতিলিঙ্গং হীনলিঙ্গঞ্চাহিতং ব্যবস্যেৎ।

এই সময়ে কালের অবস্থা এইরূপ হয় যথা—যে ঋতুতে কালের যেরূপ স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ তাহার বিপরীত, অতিরিক্ত বা হীনলক্ষণাক্রান্ত শীত গ্রীষ্মাদি ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। জনপদোদ্ধংসকালে উল্লিখিতরূপ ও এবংবিধ অন্যান্য রূপ দুর্লক্ষণ সমুদয় দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ এই চারি প্রকার জল, বায়ু, দেশ এবং কালকে জনপদোদ্ধংসের কারণ বলিয়াছেন এবং ইহার অন্যথাভূত লক্ষণ সমুদয়কে জনপদের মঙ্গলজনক বলিয়াছেন।

দেশ, কাল, বায়ু ও জল উল্লিখিত রূপ বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইলে বিধিপূর্ব্বক রসায়ন ঔষধ সেবন, পূর্ব্বোদ্ধৃত ঔষধ সেবন, পথ্য সেবা, অপথ্য ত্যাগ ও অন্তঃকরণ হইতে সর্ব্বতোভাবে ভয় দূর করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ সময়ে সত্য বাক্য, ধর্ম্মপরায়ণ, জীবগণে দয়াপরবশ, দান, বলি, দেবার্চ্চন, সদাচারানুষ্ঠান, শান্তি অবলম্বন এবং আত্মচেষ্টা সর্ব্বথা হিতজনক। এই সময়ে ঐ ভয়ঙ্কর দেশ পরিত্যাগ করিয়া বিঘ্নশূন্য, কল্যাণপ্রদ জনপদান্তর আশ্রয় করিলে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারা যায়। ব্রহ্মচর্য্যা অবলম্বন, ব্রহ্মচারীদিগের শুশ্রূষা, ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা

ও ধার্ম্মিকদিগের সঙ্গ দ্বারা ঐ ভয়ঙ্কর মারীভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যাহাদের মৃত্যু অনিয়ত, এই সমুদয় উপায় দ্বারা তাহাদেরই জীবন রক্ষা হয়। মৃত্যুর প্রকৃত সময় উপস্থিত হইলে কোন মতেই রক্ষা পাওয়া যায় না।

ইত্যেবং বাদিনং ভগবন্তমাত্রেয় মগ্নিবেশ উবাচ। কিন্নু খলু ভগবন্। নিযত কাল প্রমাণমায়ুঃ সর্ব্বং নবেতি? ভগবান্ উবাচ ইহাগ্নিবেশ। ভূতানামায়ুর্যুক্তিমপেক্ষতে।

ভগবান্ আত্রেয় কর্ত্তৃক এই কথা উক্ত হইলে অগ্নিবেশ কহিলেন, হে ভগবন্! জীবের আয়ুর কাল ও পরিমাণ কি কোন একটী সীমাবদ্ধ? কৃপা করিয়া আমায় উপদেশ প্রদান করুন। মহর্ষি কহিলেন, বৎস! দৈব এবং পুরুষকারে আয়ুর বলাবল অবস্থিত। আয়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা বা পরিমাণ নাই।

দৈবে পুরুষকারে চ স্থিতং হ্যস্যবলাবলম্।
দৈব মাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পৌর্ব্বদেহিকম্॥
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্।
বলাবল বিশেষোঽস্তি তযোরপিচ কর্ম্মণোঃ॥
দৃষ্টং হি ত্রিবিধং কর্ম্ম হীনং মধ্যমমুত্তমম্।
তয়োরুদারয়োর্যুক্তি দীর্ঘস্য সুখস্য চ॥
নিয়তস্যায়ুষো হেতুর্বিপরীতস্য চেতরা।
মধ্যমা মধ্যমস্যেষ্টা কারণং শৃণু চাপরম্॥
দৈবং পুরুষকারেণ দুর্ব্বলং হ্যপহন্যতে।
দেবেন চেতরৎ কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে॥
দৃষ্ট্বা যদেকে মন্যন্তে নিয়তং মানমায়ুষঃ।
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কালে বিপাকে নিযতং মহৎ॥
কিঞ্চিন্ন কালনিয়তং প্রত্যয়ৈঃ প্রতিবোধ্যতে॥

দৈব ও পুরুষকার এতদুভয়ই আত্মকৃত কর্ম্ম। পূর্ব্বদেহে কৃত আত্মকর্ম্মের নাম দৈব এবং বর্ত্তমান দেহকৃত আত্মকর্ম্মের নাম পুরুষকার। দৈব এবং পুরুষকার উভয়েই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। দৈব যদি দুর্ব্বল ও পুরুষকার যদি প্রবল হয়, তবে পুরুষকার দ্বারা দৈব উপহত হইয়া থাকে। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র পুরুষকার দ্বারা দৈবশক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবলতর দৈব দ্বারা দুর্ব্বল পুরুষকার পরাভূত হইয়া থাকে। অনেকস্থলে বহু চেষ্টা করিয়াও কোন রোগীকে রক্ষা করিতে পারা যায় না। আর চিকিৎসা করিতে করিতে অতি কঠিন পীড়ারও শান্তি হয়, ইহা দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করেন, আয়ুর একরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, যাহার পূর্ব্বে কখনই মৃত্যু হইতে পারে না এবং যাহা শেষ হইলে এক মুহূর্ত্তও মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে না। আবার কঠিন পীড়া আরোগ্য হইতে দেখিয়া অনেকে মনে করেন, আয়ুঃ সত্ত্বেও লোক মরিতে পারে। ফলতঃ চিকিৎসাই জীবনের কারণ ও তাহার অভাবই মৃত্যুর কারণ। এই দুই প্রকার সিদ্ধান্তেই দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রকৃত মীমাংসা প্রবল পুরুষকার দ্বারা দুর্ব্বল দৈব দ্বারা দুর্ব্বল পুরুষকার পরাভূত হইয়া থাকে। সেই জন্যই সুচিকিৎসা দ্বারা কেহ কেহ রক্ষা পায় না, আবার বিনা চিকিৎসায়ও কঠিন পীড়া হইতে কেহ কেহ পরিত্রাণ পাইয়া থাকে।

যাঁহারা পুরুষকারের শক্তি কিছুমাত্র স্বীকার করেন না, কেবল দৈবশক্তিকেই বলবতী মনে করেন, তাঁহাদের মতও সমীচীন নহে। কারণ যদি দৈবশক্তিই একান্ত বলবতী হইত অর্থাৎ আয়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইত, তবে লোকে আয়ুষ্কামী হইয়া মন্ত্র,

ঔষধি, মণি রত্ন ধারণ, মঙ্গলকর্ম্ম, বলি, উপহার, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণাম ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিত না। প্রচণ্ড গো, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ও মহিষ প্রভৃতিকেও ভয়ঙ্কর বাত্যাকে পরিহার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিত না। প্রপাত, পর্ব্বত, দুর্গম কান্তার ও বিষম জলপ্রবাহ সমস্তকে পরিহার করিতে হইত না। প্রমত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, চপল, মোহাক্রান্ত ও লোভী ব্যক্তিদিগকে, শত্রুগণকে, প্রবৃদ্ধ অগ্নিকে ও বিষধর সর্পাদিকে ভয় করিতে হইত না। স্বভাবতঃ প্রাণীদিগের মনে অকাল মৃত্যুর ভয় উপস্থিত হইত না। মহর্ষিগণের রসায়ন প্রয়োগ বর্ণন বিফল হইত। ইন্দ্রকে ত্রাসযুক্ত হইয়া শত্রু বধার্থ বজ্র নিক্ষেপ করিতে হইত না। ব্যাধিত দেব ঋষিগণের ব্যাধিশান্তির নিমিত্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ঔষধ সংগ্রহ কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না। পরমর্ষিগণ তপস্যা দ্বারা প্রচুর আয়ুঃ লাভ করিতে পারিতেন না। এইরূপ শত সহস্র যুক্তি আছে, যাহা দ্বারা আয়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। আর জগতে ঈদৃশ লোক নাই, যিনি আয়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা স্বীকার করিয়া সকল সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক থাকিতে পারেন। কোন প্রাণ সংশয়কর বিপদের উপক্রমে অবশ্য তাঁহাকেও ব্যাকুল হইয়া প্রতিকারার্থ উপায়ান্বেষণে উদ্যত হইতে হইবে এবং নিজের বা প্রিয়তম ব্যক্তির কঠিন পীড়া উপস্থিত হইলে অবশ্যই তাহাকে চিকিৎসকের শরণাগত হইতে হইবে। যদি কাহারও এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিত যে নিয়মিতকাল ব্যতীত কথনই বিপদ উপস্থিত হয় না তবে তাহারা উপস্থিত বিপদে প্রতিকারার্থ যত্নবান্ হইতেন না। সামান্যতঃ স্থির করিতে হইবে ও আমাদের (আত্রেয়াদি) ঋষির মত যে হিতোপচার মূলক জীবন ও তদ্বিপরীত মৃত্যু।

অতঃপর অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কাল মৃত্যু ও অকাল মৃত্যুর বিষয় যদি কৃপা করিয়া উপদেশ দেন, তাহা হইলে সমস্ত সংশয় দূর হয়। মহর্ষি কহিলেন বৎস! যেমন শকট (গাড়ি) সমাযুক্ত অক্ষ (ধুর) প্রকৃত অক্ষগুণযুক্ত ও আবশ্যকীয় অপর সমুদয় গুণযুক্ত ও নিয়মিতরূপে বহমান হইয়া ক্রমশঃ উপযুক্তরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহোপগত আয়ুঃ প্রকৃতরূপে উপচর্য্যমাণ হইয়া ক্রমশঃ যথা প্রমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ মৃত্যুকে কালমৃত্যু বলা যায়। আবার ঐ অক্ষই অধিক ভারসহন, বিষম পথ গমন, অপথ গমন, অক্ষচক্রভঙ্গ, বাহ্য বাহক দোষ, অনির্ম্মোচন, বিপর্য্যাস ও উপাঙ্গ রাহিত্যাদি কারণে অসময়েই অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আয়ুঃ ও অযথা বল সহকারে ক্রিয়া করণ, অতিবিরুদ্ধ ভোজন, বিষম ভাবে শরীর ন্যাস, অতি মৈথুন, অসৎসঙ্গ, উপস্থিত বেগ রোধ, ধারণীয় বেগের (কাম ক্রোধাদির) অসংযম, মারাত্মক জীবের আক্রমণ, অগ্ন্যভিভব, অভিঘাত ও আহার পরিত্যাগ প্রভৃতি কারণে কালমৃত্যুর সীমার পূর্ব্বেই অবসান প্রাপ্ত হয়। এই মৃত্যুর নাম অকাল মৃত্যু। উপযুক্ত সময়ে সাবধান হইলে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া

যাইতে পারে, কাল মৃত্যু অনিবার্য্য। যে ব্যক্তি যেরূপ দেহ প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তাহার সেই দেহ যতদিন পর্য্যন্ত সংসারের স্বাভাবিক সুখ দুঃখ ভোগ করিবার যোগ্য থাকে, তাবৎকাল তাহার পরমায়ু। অতএব প্রত্যেক জীবের পরমায়ুর ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। জীবদেহ সংসার সাগরে নিরন্তর প্রবমান থাকিয়া ক্রমশঃ শিথিল, ক্লিন্ন ও বিশীর্ণ হইয়া যথা সময়ে লয় প্রাপ্ত হয়। যে দেহ যতদিন পর্য্যন্ত সংসারতরঙ্গ সহ্য করিবার উপযুক্ত, তাহা ততদিন পর্য্যন্ত ভ্রামিত ও স্পন্দিত থাকিয়া পরিশেষে বিলীন হইয়া যায়। পরন্তু বিপদ্ বাত্যা উত্থিত হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ছিন্ন ভিন্ন ও মগ্ন হইয়া যায়। দেহ বা অপর কোন উৎপত্তিমান্ পদার্থকে চিরকাল অবিকৃত ও অবস্থিত রাখার উপায় জগতে নাই।

ভৈষজ্য-বিজ্ঞান।

১। হরিতকীচূর্ণ গুড়ের সহিত প্রতিদিবস সেবন করিলে অর্শোরোগ আরোগ্য হয়।

২। ঘোষাফলের চূর্ণ গুড়ের জলে পাক করিয়া বর্ত্তি করিবে। ঐ বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রদান করিলে শুষ্ক অর্শঃ প্রশমিত হয়। ঘোষালতার মূল পেষণ করিয়া বলিতে প্রদান করিলে রক্তার্শের শান্তি হয়। ঘোষাফলের চূর্ণ বলিতে ঘর্ষণ করিলে অথবা কিঞ্চিৎ হরিদ্রাচূর্ণ সিজের আটায় মাখিয়া প্রদান করিলে উহা পতিত হইয়া যায়।

৩। গুড় (পুরাতন), তিল, শোধিত ভেলা ও হরিতকী প্রত্যেক বিবেচনা মতে ২ হইতে ৪ রতি, মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শঃ, শ্বাস, কাস, প্লীহা, পাণ্ডু ও জ্বর প্রশমিত হয়। অর্শোরোগে যোয়ান ও বিটলবণ সংযুক্ত তক্র একান্ত হিতজনক।

৪। গাঁদাফুলের অর্দ্ধতোলা পাতা বাটিয়া ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে অর্শের রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

৫। বিল্বপত্রের রস অর্দ্ধ তোলা ও মরিচ চূর্ণ ৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে একদোষজ ত্রিদোষজ ও দ্বিদোষজ শোথ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অর্শঃ ও কামলার শান্তি হয়। কুলথকলায় ও শুঁঠ গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ঐ গোমূত্রে বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিলে কফজনিত শোথের শান্তি হয়।

পুরাতন মাণকচুর খোলা ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণের অর্দ্ধ বা এক তোলা, দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে উদরাময়, জ্বর, প্লীহা ও সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গাশ্রিত শোথ প্রশমিত হয়।

৬। কচি দূর্ব্বার রস ১ তোলা ও চিনি ।৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তাতিসার আরোগ্য হয়। হরিদ্রা পাতার রস ১ তোলা ও চূণের জল ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবনে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়। ডালিমের কচি পাতা ॥০ তোলা, তেঁতুলের কচিপাতা ॥০ তোলা কালজামের কচিপাতা ॥০ তোলা, দাড়িমের কুঁড়ি একটা ও জীরে ভাজা ।০ আনা একত্র বাঁটিয়া অর্দ্ধপোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আমরক্তাতিসার

প্রশমিত হয়। আমআদার রস এক ছটাক একটু সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তামাশয় নিবৃত্ত হয়।

একটী পাতিলেবুর ভিতরে খোল করিয়া ৭ রতি আফিঙ পুরিয়া গোময় দ্বারা লেপন ও শুষ্ক করিবে, অনন্তর বিলঘুঁটের অগ্নিতে পোড়াইয়া উপরের দগ্ধ গোময় ফেলিয়া দিবে এবং খলে পেষণ করিয়া ১৪ টী বটী করিবে, ইহার অর্দ্ধ বা একটী বটী ছাগদুগ্ধ বা জলসহ সেবনে রক্তামাশয় নিশ্চয় প্রশমিত হয়।

এমারল্‌ডে "মান"।

সেই "নিতুই নব" রাধাকৃষ্ণ প্রেম-লীলা "মানে" অতি উজ্জলরূপে বিকশিত হইয়াছে "মান" একখানি আধ্যাত্মিকতায় উত্তেজিত প্রবাহ পূর্ণ সঙ্গীতনাট্য। মানের গানে হৃদয়ে আঘাত লাগে প্রাণের ভিতরের ভিতর দিয়া কি একটী পবিত্র প্রেমস্রোত বহিয়া যায়, মানের গান "কাণের ভিতর দিয়া" মরমে প্রবেশ করিলে সত্যই প্রাণে এক উন্মাদিনী শক্তি উৎসারিত করিয়া দেয়। মানের অভিনয়ে আমরা প্রাচীন মহাজনদিগের তানলয় সঙ্গত, পীযূষ পূরিত কাকলী কুজিত ভ্রমর গুঞ্জনবৎ অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিতে পাই।

মান সংকলন করিয়াছেন বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ বসু। তিনি নিজে সমালোচক ও সমজদার লোক; বৈকুণ্ঠ বাবু ইহার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে "মানের" মান রক্ষা হইয়াছে। তিনি প্রাচীনের স্মৃতিকে প্রাণের ভিতর আনাইয়া দিয়াছেন। আমাদের ভাষার আদিকবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে আনাইয়াছেন, নাট্য মঞ্চে প্রেমের স্রোত বহাইয়াছেন।

সংকলন কালে বৈকুণ্ঠ বাবুকে একটু পরিশ্রম ও বিবেচনা শক্তি দেখাইতে হইয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে বাঙ্গলার আবাল বৃদ্ধ বনিতা জানিত কিন্তু শত বৎসর পরে আমরা সেই অমর কবিদিগের পীযূষ পূরিত প্রেমভাবোচ্ছাসিত সঙ্গীত রাশি যাহার কথায় কথায় ছত্রে ছত্রে শব্দে শব্দে স্তরে স্তরে প্রেম পোরা তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। মানের মহাজন পদাবলীই মেরুদণ্ড স্বরূপে গৃহীত বৈকুণ্ঠ বাবু মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত সংযোজন করিয়া দিয়া তাহাকে অতি সুন্দর মুর্ত্তিতে সাধারণের সমক্ষে ধরিয়াছেন।

অভিনয়ের আগা গোড়াই সঙ্গীত, সেই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাসের পদাবলী যাহা বাঙ্গলায় ঘরে ঘরে কৃষ্ণ প্রেম উচ্ছসিত করিয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা, বৃন্দা ও ললিতার অভিনয় বেশ হইয়াছে। সঙ্গীত গুলি যেরূপ ভাবপূর্ণ, গীত হইয়াছেও সেইরূপ সুন্দর সুরে। পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ

করিয়া—শৈব নাপিতাণী বিদেশিনী বৈদ্য ও যোগী বেশের অভিনয় বেশ মধুরত্বে পূর্ণ হইয়াছিল। রাধিকার সঙ্গীতগুলি সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। ললিতা ও বৃন্দা বিশেষ সুসঙ্গত ভাবে অভিনয় করিয়া আমাদের মনে সন্তোষোৎপাদন করিয়াছিল। কোন নাট্যশালায় অনেকদিন বৈষ্ণবভক্তগণ কৃষ্ণলীলার সহিত গীতি-নাট্যের অভিনয় ভগবল্লীলার সুন্দর ও যথার্থ ভাবময় অভিনয় দেখিতে নাপাইয়া বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আছেন, আজ তাঁহাদের সে খেদ মিটিল, এমারল্ডের "মান" সেই ভক্তি গ্রন্থানুসারে সেই জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন, সেই হলাদিণী শক্তির সঙ্গীত, পরমপুরুষের অবিচ্ছিন্নতা; সেই প্রকৃতির সহিত পুরুষের নিত্য সম্পর্ক তত্ত্বের অপূর্ব্বরহস্যোদ্ভেদ্ কারিণী গাঁথায় মান মালা গাথা কাব্যামোদীগণের দেখিবার ও শুনিবার জিনাস।

তার পর অপেরার প্রধান অলঙ্কার তিনটি, দৃশ্যপটাদি, সাজ সজ্জাদি, ও নৃত্য গীতাদি। এসকল বিষয়েই 'মান' সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

প্রাচীন কবিদিগকে যাঁহারা পুনর্জ্জীবিত দেখিতে চান প্রকৃতি পুরুষের গুহ্য-রহস্যময়, প্রেম লীলার—আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ডুবিয়া যাঁহারা একটু পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতে চান তাঁহারা একবার মানের অভিনয় দেখিয়া আসুন।

কবিকল্পলতা।

ইহা একখানি প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্র। ইহাতে একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর প্রভৃতি সাধারণ শব্দের পর্য্যায়, ছন্দঃপ্রকরণ, অনুপ্রাস, উদ্দিষ্টবর্ণন, প্রকীর্ণাংশ, একাদি সংখ্যা-বাচক শব্দের পর্য্যায়, রূঢ়ি ও যৌগিক মিশ্র শব্দ, রাজদর্শন, গঙ্গান্তবাদি, অদ্ভুত, চিত্রকাব্য, সাদৃশ্য, রূপকাদি অলঙ্কার, সমস্যাপূরণ ও সমস্যা প্রভৃতি কয়টী বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত আছে। ইহার সাহায্যে অল্পায়াসে কবিতা প্রস্তুত ও সমস্যাপূরণ করিতে পারা যায়।

মূল্য ... ১৲ এক টাকা।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

২য় খণ্ড। | ১৩০১ সাল—পৌষ। | ৪র্থ সংখ্যা।

কৃষ্টফার কলম্বস্।

মহামতি ইমারসন একবার মনোদুঃখে বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর লোক আর কত কাল অকৃতজ্ঞ ও অনুদার থাকিবে? কলম্বস কত কষ্টে নূতন জগৎ আবিষ্কার করিলেন, আর দেখ নাম জাহির হইয়া গেল এক চোরের! হে মহাকাল! তুমি কি ইহার বিচার করিবে না?" সেই চোরের নাম আমেরিগো ভেচ্‌পুচী! এই আমেরিগো ভেচ্‌পুচীর নাম হইতে নূতন জগৎ "আমেরিকা"—এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাকাল ইমারসনের সেই হৃদয়ের প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তাই এবার সেই চোর ধরা পড়িয়াছে। সেই চোরের নাম যাহাতে আর উচ্চারণ করিতে না হয়, নব জগতের অধিবাসিগণ তাহার জন্য ঘোর আন্দোলন করিতেছেন। জগতের মানচিত্র হইতে আমেরিকা নাম বিলুপ্ত হইয়া যাহাতে কলম্বিয়া এই নাম প্রচলিত হয়, সিকাগো মহাপ্রদর্শিনীতে তাহার প্রস্তাব হইয়াছে।

নব জগতের আবিষ্কর্তা এই কলম্বস ১৪৩৭ খৃঃ অব্দে (কাহারও মতে ১৪৩৬) ইটালীর অন্তঃপাতী জেনোয়া নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ডোমিনিকো কলম্বস। পশম পরিষ্কার করা ইঁহার ব্যবসায় ছিল। এই ব্যবসায়ের দ্বারা তিনি যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তদ্বারা অতি কষ্টে পরিবারের দিনপাত হইত। লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টি না থাকিলেও, কলম্বসের বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া জনসমাজে আদৃত ছিল। বারথলোময় ও ডিগো নামে কলম্বসের দুই সহোদর ও এক সহোদরা ছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ও উত্তরকালে সহায় জন্য কলম্বসের মহৎ কার্য্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। জেনোয়া নিবাসী জনৈক শিল্পী কলম্বসের সহোদরার পাণিগ্রহণ করেন। পিতা ডোমিনিকো বাল্যকালে পুত্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অধ্যয়নার্থ কলম্বসকে পাভিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কলম্বস কয়েক বৎসর মনযোগের সহিত ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূগোল, খগোল ও নৌবিদ্যার অনুশীলন করেন।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কলম্বস বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। জীবনসংগ্রাম হইতে আপনাকে এবং পরিবারবর্গকে রক্ষা কবিবার জন্য কোন জাহাজে সামান্য মাল্লাব কাজে নিযুক্ত হন। কলম্বস বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাব পাঠানুরাগ কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হইল না। সময় ও সুযোগ পাইলেই তিনি ভূগোল ও নৌ-বিদ্যা মনোযোগেব সহিত অনুশীলন করিতেন। অটল অধ্যবসায়বলে কলম্বস অল্পদিনের মধ্যে সেই অর্ণবযানের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। ইহাব কয়েক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৭০ খৃঃ অব্দে কলম্বস পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে কোন কার্য্যোপলক্ষে গমন করেন ও ডোনাফীলিপাডি পলেস্ত্রীলোনাম্নী এক গুণবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ফিলিপার পিতা একজন ইটালীবাসী নাবিক। পর্ত্তুগালেব যুবরাজ হেনরীর অধীনে ইনি নাবিকেব কার্য্য করিতেন। নূতন দেশ ও দ্বীপ আবিষ্কারের জন্য ইনি অনেক বাব জলযাত্রা করেন এবং তজ্জন্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ও মানচিত্র সংগ্রহ করেন। কলম্বস স্বীয় সহধর্ম্মিণীর নিকট এই সকল প্রাপ্ত হইলেন।

তদ্ব্যতীত কলম্বস পর্ত্তুগালবাসী নাবিকগণের নিকট অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পর্ত্তুগীজগণ ইতিপূর্ব্বে আফ্রিকার অন্তর্গত গিনি প্রদেশে বাণিজ্যার্থ গতায়াত করিতেন। এই সকল নাবিকের মুখে কলম্বস শুনিলেন, আটলাণ্টিক মহাসাগরের অন্তর্গত মেডিরা, কেনেরী ও কেপভার্ব দ্বীপ ব্যতীত ইহার পশ্চিমে আর কোন দ্বীপ বা দেশ নাই। আরও শুনিলেন যে, আফ্রিকার দক্ষিণস্থ উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ ব্যতিত ভারতবর্ষে আগমনের আর কোন সুগম পন্থা নাই। তৎকালে অধিকাংশ য়ুরোপবাসীর ধারণা ছিল, আট্‌লাণ্টিক পাবাবারেব পরপারে কোন দেশ নাই; কেবল অসীম জলরাশি অনন্ত বিস্তৃত হইয়া, অনন্তদেবের অনন্তত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আবার কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতেন যে, আটলাণ্টিকের পরপারে যদি কোন দ্বীপ বা দেশ থাকে, তবে তাহা জাপান, ভাবতবর্ষ এবং এসিয়া মহাদেশের অন্যান্য বিভাগ। কেবল একমাত্র কলম্বসের মনে ধারনা হইয়াছিল যে, আটলাণ্টিকের পরপারেও কোন না কোন দ্বীপ বা দেশ আছেই আছে। অনেকে টলেমী ও আরবীয় ভৌগলিকগণের পৃথিবীব গোলত্ব বিষয়ক মত অগ্রাহ্য কবিয়াছিলেন কিন্তু কলম্বস টলেমীর উক্ত মতানুসারেই ভূমণ্ডলের এক খানি মানচিত্র অঙ্কিত করিলেন। তাহাতে দেখিলেন, ভূমণ্ডলকে দুইটী গোলকার্দ্ধে বিভক্ত করিলে এতাবৎকাল আবিষ্কৃত সমস্ত স্থলভাগই পূর্ব্বদিকস্থ গোলকার্দ্ধের অন্তর্নিবিষ্ট হয়, পশ্চিম দিকস্থ গোলকার্দ্ধে আদৌ স্থল ভাগ থাকে নাই; ইহা তিনি অতি অসার ও অযৌক্তিক বলিয়াই ভাবিলেন। পরন্তু, এই বিভাগে

পূর্ব্ব গোলকার্দ্ধের আবিষ্কৃত স্থলভাগের প্রকৃতি বিশিষ্ট এক বিশাল মহাদেশ বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাঁহার মনে কেমন একটী বিশ্বাস জন্মিল।

পশ্চিম গোলকস্থ নূতন মহাদেশের অস্তিত্ব বিষয়ে কলম্বসের সিদ্ধান্ত পরিশেষে সত্যে পরিণত হইল। কিন্তু তিনি যে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই নূতন মহাদেশ আসিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা সত্য হয় নাই। এই ভ্রান্ত মতের বশবর্ত্তী হইয়া কলম্বস প্রথম আবিষ্কৃত সাগরীয় দ্বীপব্যূহকে "পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

কলম্বসের নূতন মহাদেশের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস দৃঢ় হইবার আর কয়েকটি কারণ ছিল। লিসবন নগর হইতে একবার তিনি পর্ত্তুগীজ বণিকদিগের সহিত আজোর দ্বীপে গমন করেন। এই দ্বীপে অবস্থানকালে এক দিন কলম্বস দেখিলেন, আজোর দ্বীপের সৈকত ভূমিতে এমন অনেক নূতন নূতন বৃক্ষশাখা, লতা প্রভৃতি আটলাণ্টিকের পূর্ব্বাভিমুখীন স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে যে, সেই সকল বৃক্ষশাখা ও লতা ঐ দ্বীপে জন্মায় না। তদ্ব্যতীত আজোর দ্বীপের বেলাভূমিতে দুইটী মৃত নরদেহ আবদ্ধ এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা ভাসিয়া আসিতে তিনি দেখিয়াছিলেন। উক্ত নরদেহের আকৃতির সহিত সেই দ্বীপের অধিবাসী অথবা প্রাচীন মহাদেশের কোন লোকের আকৃতির সৌসাদৃশ্য নাই। ইহাতে কলম্বস সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সেই নূতন মহাদেশে তাম্রবর্ণ কোন বর্ব্বর জাতির বাস আছে।

কলম্বস নূতন জগৎ আবিষ্কার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু কৃতসঙ্কল্প হইলে কি হইবে, কলম্বসের এমন অর্থবল নাই, যদ্দ্বারা এই বৃহৎ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন। কলম্বস হতাশ হইলেন না। তিনি আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, কোন রাজশক্তির সহায়তা পাইলে অনায়াসে এই মহৎকার্য্য সংসাধিত হইতে পারে। কলম্বসের জন্মভূমি—ইটালী তৎকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কলম্বস পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক রাজার শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহার প্রার্থনা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন।

স্বদেশীয় কোন রাজশক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন না দেখিয়া অগত্যা পর্ত্তুগালের অধীশ্বর অদ্বিতীয় জনের নিকট স্বাভিলাষ প্রকাশ করিলেন। পর্ত্তুগালের রাজা এই ইতালীয় নাবিকের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন বটে, কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন ও কুটীলমতি সভাসদ্‌গণের কুমন্ত্রণার হাত এড়াইতে সমর্থ হইলেন না। সভাসদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই কলম্বসকে উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ কলম্বসের বিকৃত মস্তিষ্কের চিকিৎসার্থ রাজাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কলম্বস ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননা করিতেছে—মনে করিয়া অনেক কূপমণ্ডুক ধর্ম্মযাজক এই ইতালীয় নাবিকের প্রতি যথেষ্ট উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। সেণ্টপল্ প্রমুখ যিশুর দ্বাদশ-শিষ্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে খৃষ্টীয় সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, আটলাণ্টিকের পর-

পারে যদি কোন দেশ থাকে, বাইবেল গ্রন্থে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত। যখন তাহা নাই, তখন কলম্বসের প্রস্তাব—বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অথবা কলম্বস বাইবেলের এই মহাসত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নাস্তিকবাদ প্রচারে উদ্যত হইয়াছে; কলম্বসের কঠোর শাস্তি বাঞ্ছনীয়—এই বলিয়া রাজাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। কলম্বসের প্রস্তাব যতই দেশ মধ্যে রাষ্ট্র হইতে লাগিল, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোক সকল দলে দলে কলম্বসকে দেখিবার জন্য সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের বিশ্বাস—আটলাণ্টিকের পূর্ব্ব বেলাভূমি হইতে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিলে সমগ্র জলরাশি এক দুর্দ্দান্ত দৈত্যের অধিকৃত। স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সাগরবক্ষে অসংখ্য দানব প্রহরী নিয়োজিত। তাহাদের নিঃশ্বাসে মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝটিকা সমুত্থাপিত হইয়া অনধিকার প্রবিষ্ট অর্ণবযান সকলকে আটলাণ্টিকের অতলস্পর্শ ভীষণ আবর্ত্তে নিমজ্জিত করিয়া দেয়। এই জন্য কোন নাবিক সেই ভয়াবহ দৈত্যের অধিকারের সীমামার্গ উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয় না। ইহাদিগের বিশ্বাস—এই নিবীড় নীলাম্বুবক্ষে নীলাকাশে ছায়া পথের ন্যায় এক দিগন্ত প্রসারী জলপথ অবস্থিত। এইটি সেই দানবের সীমামার্গ। সুনিপুন নাবিক ব্যতীত কেহই এই সীমামার্গ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় না। যখন কোন জলযান সন্নিহিত হয়, তখন এক দানব প্রহরী সেই সীমামার্গে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে থাকে, "Thus far shalt thou go and no further"—"খবর দার, ঐ পর্য্যন্ত, আর অগ্রসর হইও না।"

এইরূপ ভয়সঙ্কুল আবর্ত্তময় পশ্চিম পয়োধির পরপারে এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশ আবিষ্কার করিবার জন্য এক ইতালীয় নাবিক রাজার নিকট সাহায্যপ্রার্থী; না জানি সেই নাবিক কেমন মহাবীর, এই ভাবিয়া জনপদবর্গ কলম্বসকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া সমবেত হইতে লাগিল। যে সকল যুক্তিবলে কলম্বস সেই অনাবিষ্কৃত মহাদেশের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, রাজার সভাসদ্‌গণের মধ্যে কয়েকজন তাই লইয়া তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন। অবশেষে আটলাণ্টিকের পরপারে দেশ থাকা অসম্ভব নহে, ইহাই সাব্যস্ত হইল। এই কয়েক ব্যক্তি গোপনে গোপনে এক খানি অর্ণবযান সুসজ্জিত করিয়া কয়েক জন নাবিককে সেই দেশ আবিষ্কারার্থ প্রেরণ করিলেন। এই অর্ণবযান আজোর দ্বীপ অতিক্রম করিয়া আরও পশ্চিমে আসিয়া উপনীত হইলে প্রবল কুজ্ঝটিকায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন হওয়ায় নাবিক আর অগ্রসর হইতে সাহসী না হইয়া অগত্যা সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইল। এই অর্ণবযানের অধ্যক্ষের কথায় পর্ত্তুগালের অধীশ্বর দ্বিতীয় জনের যাহা কিছু উৎসাহ ও অধ্যবসায় ছিল, তাহাও লোপ পাইল। তৎসঙ্গে কলম্বসের সকল আশা ভরসা লয় প্রাপ্ত হইল।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পূর্ব্বে কলম্বসের সহধর্ম্মিণী ফিলিপা পরলোক গমন করেন। লিসবন নগরে অবস্থান

কালে কলম্বস কিছু ঋণ করিয়াছিলেন। উত্তমর্ণগণ কলম্বসের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি নীলামে বিক্রয় করিয়া লইবার জন্য আটক করিল। তিনি যে সকল মান-চিত্র অঙ্কিত এবং সামুদ্রিক যন্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও উত্তমর্ণগণের হস্তগত হইল। কলম্বস কঠোর কারা-বাস হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সপ্তবর্ষ বয়স্ক পুত্র ডিগোকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে নিশীথকালে লিসবন নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কপর্দ্দক-শূন্য হস্তে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করি-লেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রান্তিতে মৃতবৎ হইয়া পালসবন্দরের সমীপবর্ত্তী এক ধর্ম্মশালায় তিনি আতিথ্য স্বীকার করি-লেন। এই ধর্ম্মশালায় কয়েক জন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। জুয়ান পীরেজ্ নামে জনৈক উদাসীন ইহাঁদিগের ধর্ম্ম-গুরু এবং রক্ষক। এই সদাশয় অতিথি-পরায়ণ পীরেজ কলম্বস এবং তাঁহার পুত্রকে অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন। পিতা-পুত্রের ক্ষুৎপিপাসা দূর করিবার জন্য অন্নপানীয় ও ক্লান্তি অপনোদন জন্য শয্যা প্রস্তুত হইল। সন্ন্যাসীদল আগ্রহের সহিত ইহাঁদিগের সেবায় নিয়োজিত হইলেন। শ্রান্তিদূর হইলে কথা প্রসঙ্গে এই ইতালীয় নাবিকের উচ্চাভিলাষ বিজ্ঞাপিত হইল। উদাসীন পিরেজ প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে কলম্বসের হৃদ-য়ের উচ্চভাব এবং অতীত জীবনী-কাহিনী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কলম্বসের মনোভাব অবগত হইয়া উদাসীন পিরেজ উৎসাহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন, কলম্বসের এই মহৎ কার্য্যে তিনি যথাসাধ্য সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন। এই উদাসীন জুয়ান পীরেজ্ স্পেনের রাজ্ঞী ইজাবেলের দীক্ষা-গুরু এবং পুরোহিত। কলম্বসের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া ইজাবেলের বর্ত্তমান পুরোহিত ফার্ণা-ন্দোদি তালাবীরাকে এক খানি পত্র লিখিলেন। কলম্বসকেও তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। স্পেনের রাজা তৎকালে সস্ত্রীক কর্ডোভা নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। কলম্বস যারপর নাই উৎসাহিত হইয়া কর্ডোভা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুত্র ডিগো মহাত্মা পীরেজের আশ্রয়ে রহিল। এই সময়ে স্পেনের সহিত মুরদিগের সমর সংঘটিত হয়। ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেল, এই দুর্দ্ধর্ষ মুরদিগকে সেস্থান হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য, কার্থেজ নগরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তালাবীরাকে পীরে-জের পত্র প্রদত্ত হইল। তিনি পত্র পাঠ করিলেন, কিন্তু নিঃস্ব কলম্বসের হীনবেশ দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন না। বরং কলম্বসের এই "চাট্‌গেঁয়েভাব" দেখিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। কলম্বসের জন্য রাজা ও রাণীকে অনুরোধ করা দূরে থাকুক, এ সংবাদ তাঁহাদিগের কর্ণগোচরও করিলেন না। সুতরাং কল-ম্বসের অরণ্যে রোদন সার হইল। দেখিতে দেখিতে ১৪৮৬ খৃঃ অব্দের বসন্ত কাল অবসান হইল। বসন্ত সমাগমে কলম্বসের হৃদয় কাননে যে আশার কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহা নিদা-ঘের প্রখর তপন-তাপে ম্লান হইতে লাগিল। এই সময় হইতে দুই বৎসর কাল কলম্বস কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে চক্ষের

জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। দগ্ধ উদরের দায়ে কলম্বসকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমাদের দেশে ভিক্ষা যেমন অনায়াসলব্ধ, স্পেনদেশে কিন্তু সেরূপ নহে। গৃহাগত ভিক্ষার্থীকে বিমুখ করা—ভারতবাসী মহাপাপ বলিয়া মনে করে, কিন্তু স্পেন প্রমুখ পাশ্চাত্যদেশে ভিক্ষা দেওয়াকে মহাপাপ জ্ঞান করে। ঐতিহাসিক পণ্ডিত ওভিজ বলেন, কলম্বস ভিক্ষার্থে যে যে দ্বারে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান হইতেই বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সে সকলদেশে তৎকালে যে সকল ধর্ম্মযাজক মহাত্মা যীশুর প্রেমমন্ত্র প্রচার করিতেছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত কলম্বসকে আশ্রয় দেন নাই, অন্য পরে কা কথা! একদিন কলম্বস ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, মহাত্মা পিরেজের সুপারিশ পত্র লইয়া, অতি হীনবেশে এক ধর্ম্মযাজকের গৃহে ভিক্ষার্থী হইয়া উপনীত হন। ধর্ম্মযাজক পত্রপাঠ করিয়া বলিলেন—"এই অজ্ঞাত নামা পিরেজকে আমি চিনি না, এখানে কিছু হইবে না বাপু, অন্যত্র দেখ।" কাজে কাজেই কলম্বস আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

এই রূপে কিছুকাল অতীত হইল। অবশেষে কলম্বস মানচিত্র অঙ্কন এবং খোদকের কার্য্য করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন ও তদ্দারা কোন রকমে অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে কলম্বস কর্ডোভা নগরে, ডোনা নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই গুণবতী রমণীর স্নেহে, কলম্বসের মনোবেদনা কথঞ্চিৎ উপশমিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে, কলম্বসের এই পত্নীর গর্ভে ফার্ণাণ্ডো নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। কার্য্যগতিকে টলেডো নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজক মেণ্ডোজার(Mendoza) সহিত কলম্বসের আলাপ হয়। এই ধর্ম্মযাজক মেণ্ডোজা, একদিন কলম্বসকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় গমন করেন এবং রাজা ও রাণীর সহিত আলাপ করিয়া দেন। এই সময়ে কলম্বস বলিয়াছিলেন—"এক্ষণে আমি আর অসার নহি; আমি এক্ষণে বিশ্বশিল্পীর হস্তের ক্রিয়াশীল যন্ত্র; তিনি ইহার দ্বারা একটী মহৎ কার্য্য সংসাধিত করিবেন, এই জন্য ইহা নির্ব্বাচিত হইয়াছে।" ফার্ডিনাণ্ড, কলম্বসের প্রস্তাবে সমধিক উৎসাহিত না হইলেও, ইজাবেলা উৎসাহিতা হইয়াছিলেন। কলম্বসের দ্বারা মহান্ পরমেশ্বর যে এক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন, স্পেনের অধীশ্বরী ইজাবেলা তাহার কতক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইজাবেলা এই ইতালীয় নাবিকের যথেষ্ট সমাদর ও সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং কলম্বসের প্রস্তাব সংসাধিত হইতে পারে কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন—এই কথা বলিয়া রাণী তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। পণ্ডিত মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া, রাণী ইজাবেলা এক মন্ত্রণাসভা সংগঠন করিলেন। কলম্বসের প্রস্তাব আলোচনা করিবার ভার এই সভায় অর্পিত হইল। অধিকাংশ সভ্যের মতে স্থির হইল, এরূপ কার্য্যে রাণীর হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। কারণ, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করা হয়। পৃথিবী যদি গোলাকার

হয়, তবে কলম্বসের মতে পশ্চিম গোলকার্দ্ধে দেশ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে পৃথিবী যখন গোলাকার নয়, তখন কলম্বসের কাল্পনিক মতের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা বাতুলতা মাত্র। অতএব এরূপ অধর্ম্মজনক কার্য্যে রাণী ইজাবেলার হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নয়। ডিগো ডি ডীজা নামক জনৈক সভাসদ কলম্বসের মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই বিষয়ে কোন প্রকার স্থির মীমাংসা না হওয়ায় কলম্বসের প্রস্তাব স্থগিত রহিল। কলম্বস আবার আশা ও নিরাশার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। যাহা হউক, কলম্বস রাণী ইজাবেলার সহৃদয়তার সুশীতল ছায়া লাভে বঞ্চিত হইলেন না। রাণীর আদেশে কলম্বসের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজা ও রাণী দরবার উপলক্ষে যে যে স্থানে যখন অবস্থান করিতেন, কলম্বসকেও সেই সেই স্থানে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে প্রধূমিত মুরীয় সংগ্রামের শেষ শিখা অন্তর্হিত হইল। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিনে মহা সমারোহে ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলা, সদলবলে গ্রাণেডা নগরে সমাগত হইলেন। রাজ্য মধ্যে পূর্ণ শান্তির অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। পুনর্ব্বার কলম্বসের প্রস্তাব লইয়া রাজসভায় আলোচনা ও বাক্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। সভাসদ্‌গণ সকলেই কলম্বসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। কাজে কাজেই রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড কলম্বসের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড কলম্বসকে নৈরাশ সাগরে ভাসাইলেন বটে কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে যে এক প্রবল নারীশক্তি কার্য্য করিতেছে, রাজা তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। রাণী ইজাবেলার আগ্রহাতিশয় সন্দর্শন করিয়া ফার্ডিন্যাণ্ড অগত্যা কয়েকখানি অর্ণবযান নবজগৎ আবিষ্কারের জন্য প্রেরণ করিবেন—এই বলিয়া কলম্বসকে আশ্বস্ত করিলেন। কলম্বস কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, তিনিও তত ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন। কলম্বসের আশা কবে ফলবতী হইবে, তাহা বিধাতাই জানেন। দেখিতে দেখিতে বহুদিন অতীত হইয়া গেল, রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড আর কোন কথা উল্লেখ করিলেন না। কলম্বস ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে রাজবাটী পরিত্যাগ করিলেন এবং পুনর্ব্বার পালস বন্দরে উদাসীন পিরেজের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। এবার মহাত্মা পিরেজ স্বয়ং স্বীয় শিষ্যা রাজ্ঞী ইজাবেলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; ফল ফলিল। রাজ্ঞী ইজাবেলা স্বয়ং এই মহৎ কার্য্যে উদ্যোগিনী হইবেন বলিয়া স্বীকৃতা হইলেন।

কিন্তু এবার এক নব অন্তরায় সমুপস্থিত হইল। কলম্বস বলিলেন, যে নবজগৎ আবিষ্কার করিতে যাইতেছি, তাহা স্পেন রাজ্যভুক্ত হইবে বটে, কিন্তু আমি তথায় স্পেনের রাজপ্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিব। এবং সেই রাজ্য হইতে যাহা কিছু রাজস্ব লব্ধ হইবে, আমি তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিব। প্রথমতঃ ফার্ডিন্যাণ্ডের রাজদরবার কলম্বসের এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। অবশেষে

কলম্বস রাজশক্তির সহায়তার আশা জলাঞ্জলি দিয়া ফ্রান্সের অভিমুখে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা বারথলোমিয় ফ্রান্সের রাজধানী পারীনগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। কলম্বস ফ্রান্সের রাজশক্তির শরণাপন্ন হইবার জন্য ফ্রান্স অভিমুখে প্রস্থান করিলেন দেখিয়া রাজ্ঞী ইজাবেলা এক খানি পত্র লিখিয়া কলম্বসের নিকট এক জন দূত পাঠাইলেন। দূত সেই পত্র খানি পথিমধ্যে কলম্বসের হস্তে প্রদান করিল। কলম্বস পত্র পাঠ করিয়া আবার ইজাবেলার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। ১৪৯২ খৃঃ অব্দের ১৭ই এপ্রেল এই নগরে ফার্ডিন্যাণ্ড, ইজাবেলা ও কলম্বসের মধ্যে একখানি সম্মতি পত্র (Agreement) লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়। তাহাতে এই কয়েকটি কথার উল্লেখ ছিল;—কলম্বস আটলাণ্টিক মহাসাগরের অন্তর্নিবিষ্ট সমস্ত অর্ণবযানের অধ্যক্ষের কাজে বরিত হইবেন। কাসটাইল নগরের সর্ব্বোচ্চ পোতাধ্যক্ষের সমস্ত অধিকার, উপাধি ও সম্মান লাভ করিবেন। আবিষ্কৃত দেশ সমূহের শাসনকর্ত্তা হইবেন। নবাবিষ্কৃত দেশে যে সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য, মণিমাণিক্য প্রবালাদি এবং অপরাপর পণ্য দ্রব্য যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবেন, কলম্বস তাহার এক দশমাংশ গ্রহণ করিবেন। স্পেনে যে যে বিভাগের অধিবাসিবর্গ সেই নবাবিষ্কৃত দেশসমূহে বাণিজ্যার্থ গতায়াত করিবে, তাহাদিগের জন্য সেই সেই বিভাগে কলম্বস বিচারক নিয়োজিত করিতে পারিবেন। এইবার এবং অন্য অন্য বারে সমুদ্র যাত্রার জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইবে, কলম্বস তাহার দুই আনা রকম প্রদান করিবেন। পালস বন্দরে তিন খানি অর্ণবযান সুসজ্জিত হইল। কিন্তু এবারেও অপর একটী অন্তরায় দেখা দিল। কেহই কলম্বসের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত নহে। পালস বন্দরে সুপ্রসিদ্ধ পিনজন পরিবারের বাস। মার্টিন আলঞ্জো পিনজন, এবং ভিন্‌সেণ্ট ইয়ানেজ পিনজন নামে দুই সহোদর, কলম্বসের সহযাত্রী হইতে স্বীকৃত হইলেন। কলম্বস স্বয়ং সাণ্টা মেরিয়া (Santa Maria) নামক পোতের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন এবং পিণ্টা (Pinta) ও হীনা নামক অর্ণবযানের ভার, আলঞ্জো (Alonzo) এবং ইয়ানিজ পিনজনের (Yanez Pinzon) উপর অর্পিত হইল। অনেক গোলযোগের পর, অপরাপর লোকও সংগৃহীত হইল। তিনখানি অর্ণবযানে সর্ব্বসমেত ১২০ জন লোক প্রেরিত হইয়াছিল।

১৪৯২ খৃঃ অব্দের ৩রা আগষ্ট, পালস বন্দরে, কলম্বস এবং তদনুযাত্রী দলের বিদায়ের দিন। পালস বন্দর লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলে অশ্রুপূর্ণ লোচনে পোতের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে অর্ণবযান দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়া গেল। সকলে ক্ষুণ্ণ মনে আত্মীয়বর্গের নিকট চির বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল। এদিকে নাবিক দল, জীবনের আশা জলাঞ্জলি দিয়া স্ব স্ব জন্মভূমির নিকট—তাহাদিগকে আটলাণ্টিকের ভীষণ আবর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে স্থির করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিল।” স্পষ্ট স্বরেই কহিল “বিকৃত-মস্তিষ্ক

জনৈক ইতালীয় নাবিকের কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া, এবং স্বীয় দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের জন্য, রাজ্ঞী ইজাবেল এতগুলি মহাপ্রাণীর নিধন সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন; আমরা দুর্ব্বল প্রজা, দুর্ব্বলের উপর সবলের এই যে অত্যাচার, ইহার কি কোন প্রতীকার হইবে না! হে ভগবান্! তুমি যদি যথার্থ ন্যায়বান্ ও দয়ালু হও, তবে ইহার বিচার করিও। আমরা অদ্য স্ত্রী-পুত্র, পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন—সকলকে পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলাম।

দেখিতে দেখিতে অর্ণবযান, কেনেরী দ্বীপ অতিক্রম করিল। এতক্ষণ নাবিকদল কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু যখন টেনেরীফ শৃঙ্গ তাহাদিগের নয়ন পথে পতিত হইল, তখন তাহারা একে বারে অধীর হইয়া পড়িল। তাহাদিগের বিশ্বাস—এই টেনেরীফের পশ্চিমে আর স্থল ভাগ নাই। মৃত্তিকা দর্শন আর তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিবে না। ক্রমশঃ অর্ণবযান পশ্চিম আটলাণ্টিকের বিশাল বক্ষে ভাসিতে লাগিল। চারি দিকে দিগন্তপ্রসার জলরাশি ব্যতীত আর কিছুই নয়ন পথে পতিত হয় না। আট্‌লাণ্টিকের উত্তাল তরঙ্গে জাহাজ একবার উঠিতে একবার পড়িতে লাগিল। অর্ণবযানের আন্দোলনে নাবিকদলের মধ্যে, প্রথম প্রথম বিবমিষা অতিশয় প্রবল হইয়া পড়িল। কলম্বস্ পূর্ব্বে জানিতেন নাবিকদলের মধ্যে নানা প্রকার সামুদ্রিক রোগ দেখা দিবে। সেই জন্য নানা প্রকার ঔষধ সঙ্গে লইয়াছিলেন। ঔষধের দ্বারা তাহাদিগের বমনেচ্ছা দূর হইল। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই সামুদ্রিক আব-হাওয়া তাহাদিগের সহ্য হইয়া গেল। নব-জগৎ তাহাদিগের নয়ন পথে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত কলম্বস্ বিষম সঙ্কটে কালযাপন করিয়াছিলেন। নিরতিশয় ভীত নাবিকদল পূর্ব্বাভিমুখে জাহাজের গতি ফিরাইবার জন্য কলম্বস্‌কে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু যখন দেখিল,—কলম্বস্ গতি ফিরাইতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন সকলে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ—

অভাগিনীর আত্মকথা।

১ম খণ্ড ৬৬৪ পৃষ্ঠার পর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী-সেনা।

সন্ন্যাসী-সেনা কি, পূর্ব্বে তাহা কখনও শুনি নাই। দিদির সঙ্গে অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। সেই জন্য মনে করিলাম যে, হয়ত তিনি তাহা জানেন না; কিন্তু আহারাদির পর তিনি বলিলেন, "আজ আব একটা নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইবে,—সন্ন্যাসী-সেনা কখনও দেখ নাই; আজি তাহা দেখিবে।"

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম "দিদি! সন্ন্যাসী-সেনা কি?"

দিদি। "মায়ের এক সহস্র ভক্ত আছেন, তাঁহারাই সন্ন্যাসী।"

"তাঁহারা কি করেন?"

"দেশে দেশে মায়ের মহিমা প্রচার করিয়া বেড়ান।"

"তাঁহাদিগকে সেনা বলা হয় কেন?"

"মায়ের চরণে তাঁহারা সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন; এই জন্য তাঁহারা সন্ন্যাসী। মায়ের জন্য তাঁহারা জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, এই জন্যই তাঁহারা সৈন্য।"

"তাঁহাদের কি রকম পোষাক?"

"গেরুয়া বসন।"

"সৈন্য হইলে অস্ত্র আবশ্যক, তাঁহাদের কিরূপ অস্ত্র?"

"ত্রিশূল।"

"রূপার না লোহার?"

"লোহার।"

"তবে আমি রূপার ত্রিশূল পাইলাম কেন?"

"উপযুক্ত হইলে সোণার ত্রিশূল পাইবে" বলিয়া নিজের সোণার ত্রিশূল বাহির করিলেন, বলিলেন, "এই দেখ আমার সোণার ত্রিশূল; তুমিও এই সোণাব ত্রিশূল পাইতে চেষ্টা কর।"

"বাবার কিসের ত্রিশূল?"

"সোণার ত্রিশূল ও সোণার চক্র।"

শুনিয়া একটু আনন্দ হইল, ভাবিলাম "বাবা এই অল্প সময়ের মধ্যে এত উপযুক্ত হইয়াছেন?" প্রকাশ্যে বলিলাম "এই ত্রিশূল কিসের জন্য?"

"সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য।"

"কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ত ঈশ্বরের কাজ?"

"হাঁ। ঈশ্বর অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন; আমরা ক্ষুদ্র মানব, আমাদের ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে যতটুকু পারি, ঈশ্বরের কাজের অনুকরণ করি।"

"তবু বুঝিতে পারিলাম না। খুলিয়া বল।"

"সন্ন্যাসধর্ম্মে নূতন ব্যক্তিকে দীক্ষিত করা—সৃষ্টি, তাহা রক্ষা—স্থিতি এবং সন্ন্যাসীদিগের শত্রু-নিপাতই—সংহার।"

যত শুনিতে লাগিলাম, ততই সন্দেহ বাড়িতে লাগিল, কিন্তু এখন সকল কথা জানিয়া লইতে হইবে; সেইজন্য জিজ্ঞাসা করিলাম; "আমাদের আবার শত্রু কে?"

"শত্রু আছে। এজগতে সাধুলোকেরই অনেক শত্রু, সৎকার্য্যে বহু বিঘ্ন। শত্রু আছে, পরে জানিতে পারিবে।"

"দিদি! আবার সেই কথা, আমাকে আর অন্ধকারে রাখিওনা।"

"একদিনে সকল কথা বলিলে ভয় পাইবে, সেইজন্য বলিতেছি ক্রমে জানিতে পারিবে।"

"দিদি, তুমি বলিলে, মায়ের এক হাজার ভক্ত আছেন, তাঁহারাই সন্ন্যাসী; এত লোক কোথায় থাকে?"

"এই আশ্রমের ভিতর; ইহাতে দশ হাজার সন্ন্যাসীর সমাবেশ হয়।"

শুনিয়া চমকিত হইলাম, ভাবিলাম "এত সন্ন্যাসী কিসের জন্য?"

দিদি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "দশ সহস্র সন্ন্যাসী নহিলে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।"

"কি কার্য্য?"

"মায়ের কার্য্য।"

"কি তাহা?"

"ব্রত-উদ্‌যাপন।"

"কি ব্রত?"

"অনন্ত ব্রত।"

"অনন্ত ব্রতের সহিত মায়ের কি সংস্রব?"

"মা ছাড়া বাবা হইতে পারেন না। যিনি পিতা তিনি আবার পুত্ররূপে মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এইজন্য রমণী জননী; এইজন্য আদ্যা-শক্তি মহামায়া আদি পুরুষ মহাদেবকে গর্ভে ধারণ করিয়া পরে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট; প্রকৃতিই—চেষ্টা, শক্তি—চৈতন্য। শক্তি-রূপা জননীর কাছে শক্তি লইয়া অনন্ত দেবের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।"

এই সকল কথায় ক্রমে অপরাহ্ন হইয়া আসিল। দিদি বলিলেন "আর বিলম্ব করিলে চলিবে না; সন্ন্যাসীসেনা ক্রমে ক্রমে জড় হইতেছে; চল আমরা দেখিতে যাই।"

দিদির সঙ্গে চলিলাম। তিনি নিজের সোণার ত্রিশূল লইলেন, আমার ত্রিশূল আমার সঙ্গে রহিল। এবার আমরা অট্টালিকার পশ্চাদ্দিকে যাইলাম। সেই দিকে একটী প্রকাণ্ড ময়দান। সেই ময়দানে সন্ন্যাসী-সেনা জড় হইতে-ছিল। অট্টালিকার দুই তিন রশি দূরে আর একটী অট্টালিকা;—সেটী কিন্তু বাড়ীর মত নহে। খুব লম্বা, কিন্তু অর্দ্ধচন্দ্রাকার, দোতলার বেশী উঁচু নহে। ছাদে উঠিবার তিনটী সিঁড়ি, সকলগুলিই বাটীর পশ্চাৎদিকে; সকল সিঁড়িরই দরজা চাবি বন্ধ। দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সেটী সন্ন্যাসী-দিগের বারিক। প্রধান সেনানী ভিন্ন আর কেহই সেই ছাদে উঠিতে পারে না।

আমরা বারিকের কাছে আসিলে বাবা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দিদি সিঁড়ির চাবি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন "আমি এখন চলিলাম, একটু পরে দেখিতে পাইবে।" বলিয়া দ্রুত-পদে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মুখপানে

চাহিয়া দেখিলাম, তাহা স্থির ও গম্ভীর। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "দিদি কোথা গেলেন?"

বাবা বলিলেন "উনিই সমস্ত সেনার নায়িকা।"

"আমি বুঝিতে পারিলাম না, নায়িকা কি?"

"উহাঁরই হস্তে সমস্ত সেনা পরিচালনের ভার।"

আমি বিস্মিত হইলাম, "সে কি! স্ত্রীলোক এত বড় সেনা দলের কর্ত্তা! কি করে দিদি চালান?"

"দেখিতে পাইবে, ছাদে উঠিলেই সমস্ত দেখিবে।"

"বাবা! দিদি তবে সামান্যা নহেন!"

"না! উনি সাক্ষাৎ ভগবতী শক্তিরূপিণী। উহাঁর তুল্যা আর দুইটী রমণী পাইলে আমরা ত্রিভুবন মাতাইয়া তুলি।" বলিয়া বাবা অসম্পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন।

সে দৃষ্টির ভাব আমি বুঝিতে পারিলাম। মনে গৌরব ও হীনতা মিশিয়া একটী অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। গৌরব এই জন্য যে, দিদি অত বড় লোক হইয়াও যখন আমাকে এত যত্ন করিতেছেন এবং আমি যখন প্রথম হইতেই রূপার ত্রিশূল পাইয়াছি তখন চেষ্টা করিলে শীঘ্র হয়ত দিদির মত হইতে পারিব। হীনতা এই জন্য যে, দিদি ও আমি—আকাশ পাতাল তফাৎ। অত উদ্যম, অত উৎসাহ, অত একাগ্রতা কি আমার জীবনে কখনও হইবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাবার সঙ্গে সঙ্গে ছাদে গিয়া উঠিলাম। এত দিনের পর অনন্ত আকাশ একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। এত দিন যেন পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিলাম। দিদির অনুগ্রহে সময়ে সময়ে ঘরের বাহিরে আসিতাম বটে, কিন্তু বাটীর উপরে, চারিদিকে কি দৃশ্য আছে, তাহা তখন দেখিতে পাইনাই। সর্ব্বদাই মনে হইত, যেন আমরা কুয়ার বেঙ। আজ বিস্তৃত ছাদের উপর উঠিয়া প্রাণ ভরিয়া একবার চারিদিক দেখিয়া লইলাম। ছাদে উঠিবার পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল যে, বাড়ীটী অর্দ্ধচন্দ্রের মত, কিন্তু ছাদে উঠিয়া দেখিলাম সমস্ত বারিকটী যেন একটী প্রকাণ্ড অষ্টদল পদ্ম। বাড়ীর চারিদিকে নবনিবিড় মহাবন। অসংখ্য বাঘভালুকের আবাস। সুতরাং সে বনের মধ্যে হঠাৎ কেহই প্রবেশ করিতে সাহস করে না; করিলে প্রথমে ব্যাঘ্র পরে সন্ন্যাসীদিগের হাতে পড়ে। সন্ন্যাসীরা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া গ্রেপ্তার করিয়া রাখে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাকে সন্ন্যাসী করিবার চেষ্টা করে।

অষ্টদলের মাঝখানে বীজকোষের মত গোল অনেকটা খোলা জায়গা। সেটীও সামান্য প্রশস্ত নয়! দশ হাজার সৈন্য তাহার মধ্যে কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে। সৈন্যদিগের দিকে দৃষ্টি পড়িবা মাত্র বাবা নিজের ত্রিশূল ও চক্র উদ্যত করিয়া "ব্যোম্ কালী" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গোধূলির প্রাক্কালীন সূর্য্যের অনুগ্র কিরণে সোণার চক্র ও ত্রিশূল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর থামিতে না থামিতে নীচে দশ হাজার সন্ন্যাসীর সেইরূপ প্রচণ্ডস্বরে "ব্যোম্ কালী" রব প্রতিধ্বনিত হইল।

প্রতিধ্বনি ব'রিকের আট হাজার গৃহ কাঁপাইয়া নিবিড় মহাবনে নিমগ্ন হইল।

বাবা বলিলেন "মা! ঐ দেখ সন্ন্যাসী-সেনা, মাথায় জটাভার, গলে রুদ্রাক্ষ-মালা, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; হাতে ভীম ত্রিশূল। ত্রিশূলের তিনটী তীক্ষ্ণ ফলকের নীচেই নীল ধ্বজা; দেখ, দেখ, নীল ধ্বজার উপর ত্রিশূলের ফলকগুলি সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, যেন নিবিড় নীল মেঘের উপর কোটী কোটী বিদ্যুৎ খেলা করিতেছে।"

বাবার কথা শেষ হইতে না হইতে বিকট তূর্য্য ধ্বনি শুনিতে পাইলাম; অমনি সন্ন্যাসীগণ "ব্যোম কালী" বলিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহাদের হাতের ত্রিশূলগুলির শিখা যেন গগন স্পর্শ করিল। কে সেই তূর্য্যধ্বনি করিল, যেমন দেখিতে যাইব, অমনি এক অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি অশ্বারোহণে সেই রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইল। তাহার চুল আলুলায়িত, মাথার সম্মুখে মুকুটের ন্যায় সোণার কি একটী পরা ছিল; গলা, বাহু ও প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ ও তুলসী মালা, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, পরিধানে রক্তাম্বর। তাঁহার প্রকাণ্ড অশ্বটী তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া ঈষৎ নম্রমুখে যেন ধীরে ধীরে নাচিতেছিল। তাঁহার পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড তূণ, বাম স্কন্ধে প্রকাণ্ড ধনু এবং বাম হস্তে ভীম ত্রিশূল; দক্ষিণ হস্তে ছুরি। তাঁহার ভীম গম্ভীর মুখমণ্ডলের সম্মুখে সূর্য্যের তেজ যেন মলিন হইয়া পড়িল; তিনি রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইবা মাত্র সন্ন্যাসীরা ত্রিশূল ও মস্তক নমিত করিয়া আবার তখনই উদ্যত করিল; আবার তখনই তূর্য্যধ্বনি হইল; অমনি চারিদিক হইতে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। সেই বাজনার তালে তালে তাঁহার ঘোড়াটী নাচিতে লাগিল। একি দেবী দুর্গা দেবসেনার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ভক্তিভরে হৃদয় আপ্লুত হইল, সেই ছাদ হইতে প্রণাম করিলাম, বলিলাম "দিদি! তোমারই জন্ম সার্থক, রমণী যে শক্তিরূপিণী, আজ আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম।" বলিতে বলিতে দুটী চক্ষু জলে আচ্ছন্ন হইল; আমি ভক্তি ও আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলাম।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী-সেনা নাচিতে লাগিল, নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া, কখন চক্রাকারে, কখনও নদী স্রোতের ন্যায়, তর তর বেগে নাচিতে নাচিতে ছুটিল; এই পশ্চাৎ, এই সম্মুখ এই পার্শ্ব; কখন শুইয়া, কখন বসিয়া, কখন হাঁটু গাড়িয়া। কতবার কতরকম দেখিলাম, মনে নাই। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ নিমেষ মধ্যে সমস্ত সৈন্য কোথায় অদৃশ্য হইল; আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, সেই বিস্তৃত রঙ্গভূমি খালি পড়িয়া রহিল। মাথা ঘুরিয়া গেল; মনের মধ্যে ঝড়ের মত কত চিন্তা মুহুর্মুহু আঘাত করিতে লাগিল। বিস্ময়ে কৌতূহলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা।

সে দিন সেই সন্ন্যাসি সেনা দেখিয়া মনের মধ্যে কি যে একটা গভীর ভাবের উদয় হইল, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। শূন্য মনে কত কি ভাবিলাম; তন্মধ্যে প্রধান চিন্তা এই যে, এসব কিসের জন্য? এই ঘরবাড়ী, সৈন্য সামন্ত এত আড়ম্বর, আয়োজনের উদ্দেশ্য কি? উহারা কি করিবে? ফলকথা এই চিন্তাই উঠিতে লাগিল! বাবার সঙ্গে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম; সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিলাম, কেন না আমারই সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে হইবে। আসিয়া দেখিলাম দিদি সন্ধ্যার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মনের আবেগে তাঁহার চরণ ধূলি না লইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহাতে দিদি সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হইলেন, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু একটু যেন সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন ভগিনি! আমি সামান্যা স্ত্রীলোক; আমি তোমার প্রণম্যা নহি; যিনি জগতের বন্দনীয়, সেই ভগবতী আদ্যাশক্তিরই পূজা করিবে।"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার গুরু, দিদি ও রক্ষাকর্ত্রী; তোমার পদধূলি লইব না কাহার লইব? অধিরাজ বলিয়াছেন, কৃতজ্ঞ হইবে; কৃতজ্ঞতা না থাকিলে মানুষ পশুর সমান।" দিদি আর কিছুই বলিলেন না; সন্ধ্যায় নিমগ্ন হইলেন। আমিও তাঁহার দেখা দেখি সন্ধ্যায় বসিলাম; কিন্তু তাঁহার একাগ্রতা দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। সেই দিনকার একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি; তাহাতেই বুঝিতে পারিবে। আমি সন্ধ্যায় বসিলে ঘরের মধ্যে একটা কিরকম ফোঁস ফোঁস শব্দ হইল; আমি চমকিয়া দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ চক্র তুলিয়া আলোর সম্মুখে দুলিতেছে; আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সাপটা তাহার পরেই একটু পাশ পানে গেল এবং দিদির আসনে উঠিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে উঠিল; দিদির সাড়া শব্দ নাই—তিনি নিস্পন্দ। সাপটা ক্রমে তাঁহার কাঁধে চড়িল, দেখিতে দেখিতে কাল চুলের মধ্যে মিশিয়া গেল; আমার চীৎকার শুনিয়া একটা দাসী ছুটিয়া আসিল; আমি সভয়ে দিদির মাথায় সাপ ঈঙ্গিতে দেখাইয়া দিলাম। দাসী একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে দিন আমার আর সন্ধ্যাহ্নিক হইল না। সাপটা দিদির মাথার উপর ফণা তুলিয়া একবার শূন্যে মাথা দোলাইল; তাহার পর যেন দুঃখিত হইয়া নম্রমুখে নামিয়া চলিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

আমি ভাবিলাম, দিদি তবে সামান্যা নহেন। হায়, আগে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই; যে দিন তাঁহাকে প্রথম দেখিলাম সেই দিনের সেই ভুবনমোহিনী রূপ মাধুরি দেখিয়া আমার মনে কত সন্দেহ হইয়াছিল; তাহার

পর সেই সকল ভাবনার বিষয় আন্দোলন করিয়া মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিলাম। হায়! যদি সেই প্রথম দিন হইতে দিদিকে চিনিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার আর এত দুর্দ্দশা হইত না। কিন্তু কি করিয়াই বা চিনিব? সকল বিষয়েরই এক একটা উপযুক্ত কাল আছে, অধিকার আছে। আমার তখন সেই অধিকার জন্মে নাই, সেই কালও উপস্থিত হয় নাই, শত চেষ্টা করিলেও শত লোকে চিনাইয়া দিলেও তাঁহাকে চিনিতে পারিতাম না।

সাপটা চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ পরে দিদির সন্ধ্যাহ্নিক শেষ হইল; তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার মুখটা এরূপ দেখিতেছি কেন? যেন কি একটা ভয়ে বিহ্বল রহিয়াছ। কেন? কি হইয়াছে?"

আমি বলিলাম "দিদি! সাধে তোমার পায়ের ধূলা নিতে ইচ্ছা হয়? তুমি কি কিছুই জানিতে পার নাই?"

"কৈ? কিছুই ত জানি না! কেন কি হইয়াছে?"

"ও বাবা! একটা প্রকাণ্ড সাপ তোমার গায়ে মাথায় উঠিল, তাহা তুমি কিছুই বুঝিতে পারিলে না?"

দিদি হাসিয়া বলিলেন ওঠা দংশন করিলেও জানিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। ভগিনি! মায়ের কাজ করিতে গেলে কত বিষধরের মুখের ভিতর হাত দিতে হইবে!"

. আমি বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সন্ধ্যাহ্নিকের পর দুই চারিটী ফল আহার করিলাম। দিদি সে রাত্রে কিছুই খাইতে চাহিলেন না; রাত্রে প্রায়ই তিনি কিছু খান না, সেই দিনান্তে অপরাহ্নে একবার হবিষ্য, তাহাতেই অঙ্গের লাবণ্য কত! জল খাবার পর দুইজনে একত্রে শয়ন করিলাম। এখন আর আমাদের সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যা নাই; আমরা সেই দোতালা ঘরে থাকি না; নীচে মাটীর ঘরে শয়ন করি। দুই-জনে দুইখানি কম্বল পাতিয়া বিনা বালি-সেই শুইয়া থাকি। প্রথম প্রথম আমার একটু কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু দিদির অম্লান বদন ও গভীর নিদ্রা দেখিয়া আমার সে কষ্টটুকু ক্রমে দূর হইল। উভয়ে শয়ন করিলে আমি দিদিকে বলিলাম দিদি! তোমার জোড়া ত আর জগতে দেখিতে পাইনা। তোমাকে আসল ধবল সুকোমল পালঙ্কে শয়ন করিতে দেখিয়াছি, কোন বিকার দেখি নাই, এখন এই কঠোর কম্বলে দারুণ গ্রীষ্মের সময় বিনা বালিসে সুখে ঘুমা-ইতে দেখিয়াছি, এমন সোণার অভ্যাস ত কখনও কোথাও দেখি নাই।"

দিদি বলিলেন "ভগিনি! অভ্যাস মানুষের আয়ত্ত; মুনিরা যে অনাহারে শত শত বৎসর থাকেন তাহাও অভ্যাস। একাগ্রতা না থাকিলে অভ্যাস হয় না। একাগ্রতা থাকিলে মানুষ দেবতা হইতে পারে। একাগ্রতার বলে রাজা বিশ্বা-মিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, দেবতাদিগকে অবহেলা করিয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন; একাগ্রতা ছিল বলিয়া শ্রীরাম হরধনু ভাঙ্গিয়া ছিলেন, অর্জ্জুন লক্ষ ভেদ করিয়াছিলেন। একাগ্রতা বলে মানুষ পাষাণ ভেদ করিতে পারে, বিদ্যু-তের ন্যায়, মেঘের কোলেও নৃত্য করিতে পারে। সেই জন্য আগে একাগ্রতা,

তাহার পর সাধনা। একাগ্রতা না থাকিলে সাধনা হয় না। একাগ্রতাই প্রধান ও প্রথম শিক্ষা। যদি মায়ের সন্তান হইবে, তুমি আগে চিত্ত স্থির করিতে শিখ; নতুবা সব পণ্ড হইবে।”

চিত্তস্থির করিবার অনেক উপায় বাবা ও দিদি আমাকে বলিয়াছিলেন; চিত্তস্থির করিতে না পারিলে সন্ন্যাসী সেনায় স্থান পাইবে না, তাহাও একরূপ স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। দীক্ষার দিন হইতে আমি সেই সকল উপায় শিক্ষা করিতে লাগিলাম; প্রথম প্রথম বেশ মনঃসংযোগ হইল। তাঁহারা যাহা কিছু শিখাইলেন, আগ্রহের সহিত শিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দিদির ক্ষমতার কথা কি বলিব! তিনি মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি। তিনি যখন গম্ভীরভাবে গীতার কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিতেন, তখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ কমলা বলিয়া জ্ঞান হইত। আমি শৈশব হইতে কিছুই লেখা পড়া শিখি নাই, তথাপি দিদির গীতা ব্যাখ্যা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতাম। ভগবানের এক একটী কথা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, সহজ দৃষ্টান্ত ও উপায় দ্বারা ব্যাখ্যা করিতেন; এই সকল কাজ এত সরল ও বিশদ যে, একজন চাষাও অনায়াসে বুঝিতে পারিত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সাধনা।

দিদি বলিলেন অগ্রে দীক্ষা, তাহার পর শিক্ষা; শিক্ষার পর সাধনা। সাধনা না হইলে সিদ্ধি হয় না। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে আমাকে যোগের অঙ্গ ও প্রকরণ শিখাইতেন; দিবাভাগে গীতার সহিত মিলাইয়া সেই গুলি বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপে সাধনা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চার বৎসর অতীত হইয়া গেল। আমার বোধ হইল যেন আমি জগতের আর এক প্রান্তে আসিয়া বসিয়াছি; সেখানে সকলেই যোগী; সেখানে শোক তাপ নাই, জ্বালা যন্ত্রণা নাই; বৈধব্য নাই, বন্ধুবিয়োগ নাই। যেন সকলেই চিরসুখে বিরাজ করিতেছে। সকলেই মায়ের সেবায় নিযুক্ত, সকলেই অনন্ত মহাদেবের পূজায় নীরত। এক দিন দিদি বলিলেন ভগিনি! তুমি অনন্ত মহাদেবের ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছ। এক দিনে এক বৎসরে এ ব্রত উদ্‌যাপন হয় না। যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; লোকে যাঁহাকে চতুর্দ্দশ ভুবনের স্থষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানে; চতুর্দ্দশ কোটি যুগেও তাঁহার মহিমা জানিতে পারা যায় না; কিন্তু মানুষের পরমায়ু নিতান্ত কম। সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে পরকালের কাজ করিতে হইবে; এই জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা ন্যূনকল্পে চতুর্দ্দশ বৎসর নিয়ম করিয়াছেন। তোমাকে এই চতুর্দ্দশ বৎসর মধ্যেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "দিদি! চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া ব্রত করিতে হয় কেন? দশ বৎসর কি বার বৎসর ব্রত উদ্‌যাপনে কি হয় না?

দিদি বলিলেন, ইহার বিশেষ কারণ আছে;—চৌদ্দটী বিষয় লইয়া আমাদিগকে জগতে আসিতে হইয়াছে। সেই চৌদ্দটী—ইন্দ্রিয়। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ ও বাক্ এবং পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশটী ইন্দ্রিয়। আবার দেখ মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই চারিটী অন্তরিন্দ্রিয়। কেহ কেহ বলেন অন্তঃকরণই একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয়; কিন্তু সাধকদিগের সুবিধার নিমিত্ত ইহার ব্যক্তি ভেদে উক্ত চারি প্রকার ভিন্নতা সাধিত হইয়াছে। পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চতন্মাত্রা উক্ত দশ ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র নহে। ভগিনি! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এবং পূর্ব্বোক্ত দশটী ইন্দ্রিয় লইয়া সর্ব্ব সমেত চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় হইতেছে। এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় হইতেই সংসার। জীব যতক্ষণ এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত থাকিবে, তত দিন তাহার সংসার বন্ধন যাইবে না; তত দিন তাহাকে মায়ের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে; তত দিন সে অনন্তদেবের নিকট যাইতে পারিবে না। সুতরাং এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় জয় করাই প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাই অনন্ত ব্রত; এক এক বৎসরে এক একটী ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে, এই জন্য অনন্ত ব্রত চতুর্দ্দশবর্ষ সাধ্য।"

যে দিন ব্রতে দীক্ষিত হই; সেই দিন দিদি অনন্ত ব্রতের ঐ সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; তাহার পর মাঝে মাঝে প্রায়ই এই কথা বলিতেন। এই দিন তিনি বলিলেন "ভগিনি! দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যোগমার্গে কতদূর অগ্রসর হইলে, তোমার ব্রত কতদূর শেষ হইল, কয়টী ইন্দ্রিয় তুমি জয় করিলে, তাহার পরীক্ষা হইবে। বার বৎসরে অন্ততঃ বারটী ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছ; এরূপ আশা করা অন্যায় নহে। অধিরাজ স্বয়ং তোমাকে পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষা দিতে ভয় খাইও না। তুমি জানিও যে, এই জগৎই পরীক্ষা স্থল। আমাদিগকে শৈশব হইতে চিরদিনই প্রতিমুহূর্ত্তে পরীক্ষা দিতে হইতেছে যিনি পরীক্ষক, তিনি সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা সকলের কাছে বসিয়াছেন; অন্তঃকরণের গূঢ় অংশ চিরিয়া সকলই পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার কাছে কিছুই গোপন করিতে পারা যায় না। যাহাহউক তোমার পরীক্ষা হইবে। আমরা কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে গমন করিতেছি।"

দিদি স্থানান্তরে গমন করিতেছেন শুনিয়া আমি একটু বিস্মিত ও ভীত হইলাম; বলিলাম "সেকি, দিদি! আমি একাকী থাকিব?"

"দিদি। এজগতে একাকী কেহই নহে। পুরুষ প্রকৃতি সকলেরই দেহে একত্রে বাস করিতেছেন। তোমার এজ্ঞান এখনও হইল না কেন?"

দিদির মৃদু ভর্ৎসনায় আমি অপ্রস্তুত হইলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা কে কে?"

"তোমার পিতা ও আমি।"

কেশব! তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দীক্ষার দিন অধিরাজ স্বয়ং বলিয়াছিলেন, ভয় ত্যাগ করিতে হইবে। পর বৎসরে আমি সকল ভয় ত্যাগ করিয়াছিলাম; এমন কি আমাকে যদি বাঘের মুখে

যাইতে বলিত. আমি তাহাতে ভয় পাইতাম না; কিন্তু দিদি ও বাবা আমার দুইটী প্রধান সহায়। সামান্য দরকার হইলেই যখন তখন তাঁহাদিগেরই নিকট যাইতাম; তাঁহারা আমাকে ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য যাইতেছেন, একথা শুনিয়া আমার মন খারাপ হইল। আমি একটু বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইলাম।

দিদি আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "আমাদের জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। এখনও তোমার ব্রতের দুই বৎসর বাকি রহিয়াছে, সেই জন্য তুমি মমতা বিসর্জ্জন করিতে পার নাই। এখনও তোমার অহঙ্কার রহিয়াছে। এই অহঙ্কারই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের মূলাধার। ইহাকে ধ্বংস করিতে না পারিলে কেহই সিদ্ধ হইতে পারে না। অহঙ্কার আছে বলিয়া তুমি আমাদের জন্য ভাবিতেছ। তাহার কারণ আমাদের কাছে তোমার প্রয়োজন সাধন হয়। আমরা গেলে হয়ত তোমার সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না, সেই ভাবনায় তুমি দুঃখিত হইতেছ এবং আমাদিগকে রাখিতে চেষ্টা করিতেছ। আমরা এতদিন তোমাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তোমার প্রয়োজন সাধক হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন যখন দেখিতেছি যে, দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে, তখন তুমি স্বাধীন হইতে পারিবে। মানুষ যত স্বাধীন হইবে, ততই নিরহঙ্কার ও নির্ম্মল হইতে পারিবে। স্বাধীন না হইলে মুক্তি পাইতে পারে না। তুমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছ; আর যাহা কিছু বাকি আছে, গুরু বিনা তুমি নিজে তাহা শিখিতে পারিবে। আমার শিক্ষা হইয়া গিয়াছে; এখন যাহা বাকি আছে, দুই বৎসরে তুমি একাকী তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে।"

আমি আরও অপ্রস্তুত হইলাম; ওসম্বন্ধে আর কিছুই না বলিয়া কেবল তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম।

দিদি বলিলেন, "আমরা তীর্থপর্য্যটনে যাইতেছি।" "দিদি! তুমি ত বলিয়াছিলে যে, সিদ্ধ হইলে তীর্থপর্য্যটন আবশ্যক হয় না; তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ তবে কেন তীর্থে যাইতেছ।"

"আমাদের সাধনা শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারি নাই; যে দিন মায়ের কাজ সম্পন্ন করিতে পারিব, সেই দিন সিদ্ধ হইব।

"কতদিনে তাহা হইবে?"

"তাহা বলিতে পারি না। তোমার ব্রত উদ্‌যাপন হইলে আমাদের অনেকটা আশা হয়।"

"তোমরা তীর্থে যাইতেছ কেন?"

আমাদেব সন্ন্যাসীগণ ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ করিতেছেন, অনেকে দূর পর্ব্বত কন্দরে ও গহন কাননে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকে একত্রিত করিতে হইবে। সেই জন্য সকলের তীর্থ ভ্রমণ করা আবশ্যক।"

"তোমরা কতদিনে ফিরিবে?"

"তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই; তবে তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের সময় আমরা নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকিব।"

আমার মন আশ্বাসে একটু দৃঢ় হইল; ভাবিলাম দুই বৎসরের মধ্যে কি সাধনা শেষ করিতে পারিব না?

ক্রমশঃ—

সেকালের বড়লোক।

(১) মহারাজ নবকৃষ্ণ।

বাঙ্গালার অমর কবি, স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালীর ইতিহাস ত নাই-ই। কিন্তু বাঙ্গালা-দেশের ও বাঙ্গালীর এক খানি খাঁটি ইতিহাস হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সিংহ হস্ত চিত্রিত মনুষ্য মূর্ত্তির মত অনেক ঘটনা বিবৃত ও অপ্রাকৃত হইয়া এত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে—যে তাহাতে বাঙ্গালীর খাঁটি ইতিহাস জন্মাইতে পারে না। বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস লিখিতে হইলে বাঙ্গালী জাতিকে কেন্দ্রগত করিতে হইবে—বাঙ্গলার আদি, মধ্য ও বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালীর চিত্র, বিস্মৃতির ধূমময় আবরণী হইতে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করিতে হইবে। ইহাতে বিস্তর স্বাধীন চিন্তা, পরিশ্রম, অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির প্রয়োজন। খুঁজিয়া পাতিয়া, বিচার করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, প্রকৃত ঘটনা সন্ধানোদ্দেশে জীবনপাত করিলে তবে হয়ত বহুকাল ব্যাপী পরিশ্রমের পর সিদ্ধিলাভ হইতে পারে।"

সেই জন্যই বঙ্গদর্শনে খাঁটি বাঙ্গালার ইতিহাসের জন্মপ্রদান জন্য একটু চেষ্টা করা হইয়াছিল। "ভারতকলঙ্ক" ও "বাঙ্গালির বাহুবল" নামক দুইটি প্রবন্ধ স্বয়ং বঙ্কিম চন্দ্রের পবিত্র লেখনী প্রসূত। তার পর "বাঙ্গালীর উৎপত্তি"ও অনেক দিন চলে। বঙ্গদর্শনের চেষ্টা জানি না কোন অভিশাপে ব্যর্থ হইয়া যায়। তার পর পুনরায় এক চেষ্টা হয় নবজীবনের আমলে। অক্ষয় বাবু বঙ্গদর্শনের লোক, তাঁহার কাগজে কাজেই এই উদ্দেশ্যে—দুই একটী প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়া আবার কাগজের অস্তিত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই চেষ্টা থামিয়া যায়। *

বাঙ্গালী ইতিহাস লেখে—ইংরাজের লিখিত বিবরণ হইতে। ইংরাজ কিন্তু ফরাশীর লিখিত ইংলণ্ড ইতিহাসের অনুকরণ করে না। জাতীয় ভাব জাতীয় প্রকৃতি ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অনুবাদ, অনুকরণ অপেক্ষা স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন গবেষণা সম্যক ফলপ্রদ। ইংরাজের কথা ধ্রুব সত্য মানিয়া আমরা চলিয়া আসিতেছি—তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন—তাহাই আমরা বিশ্বস্ত চিত্তে অনুবাদরূপ মহা যন্ত্রের মধ্যে পিশিয়া এক খিচুড়ী পাকাইতেছি কাজেই ইতিহাসও সেইরূপ দাঁড়াইতেছে। †

---

* "জগৎ শেঠদিগের ইতিহাস", "কাশিমবাজারের রাজবংশের ইতিহাস", দিল্লীর ভগ্নাবস্থায় "রাজা রতন রায়ের ইতিহাস" এই উদ্দেশ্যে লিখিত হয়। অন্ততঃ আমাদের ত এইরূপ ধারণা। নববিভাকর ও সাধারণীতেও—সেই সময়ে "বীরভূম, বর্দ্ধমান ও কলিকাতার ঠাকুর বংশ" প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। সঃ সং

† সুখের বিষয় আজকাল এই প্রকার লেখকের সংখ্যা অনেক অল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিহাস বিষয়ে লেখকও কম এবং তাঁহাদের অনেক প্রবন্ধ আজকাল পরিশ্রমের ফল। কিন্তু যোগ্য পাত্রে উৎসাহ দানের অভাবে অনেক প্রতিভাশালী লেখককে ভগ্ন মনোরথ হইতে হইতেছে। সমীরণ সম্পাদক।

অপক্ক-জিনিস গলাধঃকরণ করিলেই তাহাতে উদ্গীরণ সম্ভাবনা খুব। আমরা যাহা কিছু গলাধঃকরণ করিতেছি তাহার সবই কাঁচা মাল। পরিণামও সেইরূপ দাঁড়াইতেছে।

অনেকে ঐতিহাসিক প্রবন্ধের জন্য পরিশ্রম করেন কিন্তু তাঁহাদের পরিশ্রমের সার্থকতা হয় না—দুইটী কারণে। এক তাঁহাদের লিখিবার প্রণালী—লোকের সহিষ্ণুতার উপর অন্যায় পীড়ন করে। ঘটনা শ্রেণীবদ্ধ করণ (arrangement of facts) ও সমস্ত জটিল বিষয় আলোড়ন ও বিশ্লেষণ প্রণালী (Analysis and synthesis) ততদূর সাধারণের বোধগম্য হয় না বলিয়া তাহারা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ—বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকাদি আজ কাল অনর্থক গল্পে ও অসার মস্তিষ্ক কণ্ডুয়নে—মনোহর উপন্যাসে প্রায় অর্দ্ধেকের উপর স্থান অধিকার করিয়া পাঠকের রুচি পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা নিতান্ত Literary গোছের প্রবন্ধ পড়িতে চান—তাঁহারাই একটু আধটু ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পাতা উল্‌টাইয়া থাকেন।

যাই হ'ক যে কর্ম্মফলেই হউক—যে অভিশাপবশেই হউক—বা যাহাদের দোষেই হউক, বাঙ্গালায় যে দিন দিন ইতিহাস চর্চ্চা কমিয়া যাইতেছে, সে আলোচনা আমরা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিব।

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ দুই প্রকারের হইতে পারে। এক খাঁটি বাঙ্গালীর কার্য্যকলাপের সুশৃঙ্খলারূপে শ্রেণীবদ্ধ বিবরণ ও অপর পক্ষে বাঙ্গালা দেশ অনেক দিন হইতে পরাধীন বলিয়া জেতৃশ্রেণীর প্রধান প্রধান লোকদিগের জীবন-বৃত্তান্ত। বাঙ্গালী অবশ্য Blenheim বা Waterlooর ন্যায় কোন মহাযুদ্ধ ব্যাপারে যশস্বী হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের তৎকালীন জীবন রাজনৈতিক সংঘর্ষণে যতটুকু আলোড়িত হইয়াছিল, তাহার উপযুক্ত বিবরণই বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। মুসলমান বা ইংরাজ জেতাগণ বেশী চতুর লোক; তাঁহারা ইতিহাস লিখিতে গিয়া নিজেদের বিবরণ বেশী করিয়া লিখিয়াছেন কিন্তু যাহাদের দেশের ইতিহাস লিখিয়াছেন—যাহাদের লইয়া কার্য্য করিয়াছেন তাহাদের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই বা তাহাদের অসন্তোষকর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া সরিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজাধিকৃত বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদে যে সকল বাঙ্গালী বাঙ্গালার শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন—তাঁহাদের লইয়াই আমরা আপাততঃ কার্য্য আরম্ভ করিব। তৎপূর্ব্বের বিষয় ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন। তাহা আলোকে পরিস্ফুট করিতে গেলে বিশেষ পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির প্রয়োজন। কিন্তু তাহাও আবার সময় ও সুযোগ সাপেক্ষ।

ইংরাজী আমলের প্রথমে যে সকল বাঙ্গালী বাঙ্গলার মধ্যে রাজনৈতিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া—প্রধানত্ব লাভ করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু হায়! নন্দকুমারের প্রকৃত ইতিবৃত্ত অনেক বাঙ্গালী পাঠক আজও জানেন না। মেকলে প্রভৃতির কুৎসাজনক, অসূয়া-পরিপূর্ণ

কথায়—আজও নন্দকুমারের প্রতি তাঁহাদের ঘোরতর বিতৃষ্ণা। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলে—যে সকল পদস্থ ইংরাজ—এমন কি গবর্ণর সাহেবেরা পর্য্যন্ত যে সমস্ত লোকধর্ম্মাচার বিরুদ্ধ—নীতিবিগর্হিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে ইতিহাসে তাঁহাদের নাম কলঙ্কের ঘোর কৃষ্ণ—অক্ষরে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যদিও ইংরাজ নিজে কলম ধরিয়া তাঁহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তথাপি তাঁহাদের পাপের ও দুষ্কর্ম্মের গুরুত্ব এতদূর অধিক যে, সমস্ত বাদ সাদ্ দিয়া এখনও যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যথেষ্ট প্রমাণ পরিস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান। এই সব লেখকই আবার নন্দকুমারকে—"জালিয়াত" "মিথ্যাবাদী" ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। নন্দকুমারের ইতিবৃত্ত স্থানান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে * সুতরাং তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণের আমল হইতে আরম্ভ করিব। ইচ্ছাত সম্পূর্ণই রহিল—যে, রাজা সেতাব রায়, রাজা রাজবল্লভ, নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা মহেন্দ্র সিংহ, রাজা রায় দুর্লভ, উমিচাঁদ বাবু গোবিন্দরাম মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন বাঙ্গালার ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্রগণের পরিস্ফুট চিত্র পাঠকবর্গকে ক্রমে ক্রমে দেখাইব।

মহারাজ নবকৃষ্ণ—অন্ধকূপ-হত্যা-প্রসিদ্ধ তৎকালীন কলিকাতা দুর্গাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের সমকালবর্ত্তী। যখন সেরাজ উদ্দৌলা বাঙ্গলার নবাব, তখন নবকৃষ্ণ মুন্সী বাঙ্গলার ঐতিহাসিক কার্য্য ক্ষেত্রে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন। যখন ক্লাইব পলাশী জয় (?) করেন তখন নবকৃষ্ণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। যখন মীরজাফর বাঙ্গালার সিংহাসনে, তখন নবকৃষ্ণ দেশের মধ্যে একজন বড় লোক। নবকৃষ্ণের জীবনীতে ইতিহাসের কথা ছাড়া মানব জীবনের বিচিত্রময় ঘটনাবলীপূর্ণ শিক্ষার কথা অনেক আছে। তাহারই জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। তবে পাঠকগণকে একটী কথা বলিয়া রাখি—আমরা এই প্রবন্ধে "প্রত্নতত্ত্বের" একটা মহা আস্ফালন করিতে চাহি না।

নবকৃষ্ণ—দেব বংশোদ্ভব মৌলিক কায়স্থ। চিত্রপুরে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস। শ্রীহরি দেব হইতে ইহাঁদের বংশ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীহরি মুরশীদাবাদ জেলায় "কানসোনা" নামক স্থানে বাস করিতেন। শ্রীহরিদেব হইতে নবকৃষ্ণ বিংশ পুরুষ নিম্নে। পীতাম্বর দেব শ্রীহরি হইতে ছয় পুরুষ নিম্নে। ইনি "ধান্য পীতাম্বর" বলিয়া তৎকালীন বাঙ্গালীর মধ্যে পরিচিত ছিলেন। পীতাম্বর মোগল সরকারে কোন গৌরবান্বিত কার্য্যে নিযুক্ত

* ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখক বাবু হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ভারতী পত্রিকায় এক বৎসর ধরিয়া নন্দকুমারের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ সম্পূর্ণ মৌলিক ও তাহাতে সেই নবীন লেখকের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি, গবেষণা ও তীক্ষ্ণদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গদর্শনে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয় নন্দকুমার সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। হরিসাধন বাবুর প্রবন্ধ সম্পূর্ণ বিশদ ও এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। আমরা আমাদের পাঠক বর্গকে সেই প্রবন্ধ পড়িতে অনুরোধ করি।

সমীরণ সম্পাদক।

ছিলেন। এই কার্য্যের জন্যই তিনি "খাঁ বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। * তাঁহার পুত্রগণের নাম পাওয়া যায় না কিন্তু চারিটী পৌত্রের নাম পাওয়া যায়। এই চারি জন (শিবদাস, নিত্যানন্দ, চতুর্ভুজ ও শ্রীনাথ) যথাক্রমে মালাই, সৌদাপুর, তাল গ্রাম ও ধুলীপাড়া পরগণায় স্বস্ব বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন। ইহাঁদের সকলেরই "রায়" উপাধি ছিল। বিদ্যাধর-নিত্যানন্দ হইতে নবম পুরুষ— ইনি—সর্ব্ব প্রথমে নাজরায় পরে মুড়াগাছা পরগণার "নাটাদা" গ্রামে উঠিয়া আসেন। তাঁহার পৌত্র দেবীদাস এই পরগণার "কানন গুঁই" ছিলেন। দেবীদাস এই চাকরির জন্য "মজুমদার" আখ্যা প্রাপ্ত হন।

দেবীদাসের ছয় পুত্র। ইহার মধ্যে পঞ্চম পুত্র রাজেশ্বর বাবু কামারপুলে ও ষষ্ঠ পুত্র রুক্মিণীকান্ত পঞ্চগ্রামে বসবাস করেন। এই সময়ে মহাবৎ জঙ্গ বাঙ্গলার নবাব। রুক্মিণীকান্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহস্রাক্ষের সহিত নবাব সরকারে উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করেন। নবাব সহস্রাক্ষকে পিতৃপদে ও রুক্মিণীকান্তকে "ব্যবহার্ত্তা" উপাধি দিয়া মুড়াগাছা পরগণার নাবালক জমীদার কেশবরাম রায় চৌধুরীর বিষয়ের তত্ত্বাবধারকের পদ দেন।

রুক্মিণীকান্তের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর নবাব কর্ত্তৃক পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রামেশ্বর বড় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাহার তত্ত্বাবধারণে মুড়াগাছা পরগণার আয় বাড়িয়া উঠে। নবাবকে সেই বেশী আয় দেখাইলে তিনি সরকারী রাজস্বের পরিমান বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই ঘটনায় কেশবরামের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। সেই মনোমালিন্য এত দূর বাড়িয়া উঠে যে, কেশবরাম সাবালক হইয়াই রামেশ্বরকে নিজ বাটীতে কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন।

পিতার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া রামেশ্বরের পুত্র রামচরণ নবাবকে সমস্ত ঘটনা বলিবার জন্য মুরশীদাবাদ যাত্রা করেন। তখন অরাজকের কাল। যার লাঠী আছে তাহারই বল। সকল কথা নবাবের কাণে না উঠিলে দেশে তখন অত্যাচার অবিচারের প্রতিরোধ হইত না। যাই হউক, মুরশীদাবাদ পৌছিয়া বিশেষ কৌশলাবম্বনে রামচরণ নবাবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যদিও কেশবরাম এখন সাবালক হইয়াছেন— তথাপি তাঁহার হাতে জমীদারী পড়িলে তিনি আরও ৫০০০০৲ টাকা বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন।

আয় বৃদ্ধির সঙ্গে নবাবের রাজস্বের খুব নিকট সম্বন্ধ। ভাবিয়া চিন্তিয়া নবাব রামচরণকে মুড়াগাছার "আওদাদার" বা কমিশনার করিয়া পাঠাইলেন। রামচরণ মুড়াগাছায় ফিরিলেন। এখন তিনি

* "ধান্য পীতাম্বর" আখ্যা হইবার কারণ এই পীতাম্বর সেই সময়ে একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তিনি দেশের সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটক ও কুলীনদিগকে একত্রিত করিয়া "একজাই" করিয়াছিলেন। এরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, ঘটক ও কুলীনদের যাতায়াতের পথে একটী নদী পড়াতে—গমনাগমন সৌকার্য্যার্থে পীতাম্বর তাহার কিয়দংশ ধান্য দিয়া বোঝাই করিয়াছেন। ইহা হইতেই তিনি "ধান্য পীতাম্বর" আখ্যা প্রাপ্ত হন।

নবাবের কর্ম্মচারী—কাজেই কেশব রাম অভয় পাইলেন। রামচরণ সর্ব্ব প্রথমেই পিতাকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিলেন।

মুড়াগাছায় কিয়ৎকাল কার্য্য করিয়া রামচরণ রায়, কলিকাতায় উঠিয়া আসিলেন। গোবিন্দপুরে * খানিক জমী কিনিয়া তিনি বসতবাটী প্রস্তুত করিলেন। পরিবারবর্গকে কলিকাতায় রাখিয়া পুনরায় নবাব সরকারে চাকরীর প্রত্যাশায় গমন করেন। মুড়াগাছায় চাকরী করিবার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—পিতাকে উদ্ধার করা, তাহা তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন সুতরাং অন্যত্র কার্য্যের জন্য নবাবের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিলে—নবাব তাহাকে হিজলী, তমলুক ও মহিষাদলের নিমক মহলের দেওয়ানী প্রদান করিলেন। নিমকের চাকরীতে, বিশেষতঃ নবাবী আমলে—রামচরণ দেব যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি করিলেন।

এই সময়ে আর একটী ঘটনা ঘটিল। তাহাতে রামচরণ আরও গৌরবান্বিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনি নবাব সরকারের চিহ্নিত লোক। আরকটের নবাবের ভ্রাতা মনিরুদ্দিন খাঁ দাক্ষিণাত্য হইতে ভ্রাতার ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া এই সময়ে মুরশীদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব মহাবত জঙ্গ (আলিবর্দ্দি খাঁ) মনিরুদ্দিন খাঁকে কটকের সুবাদারি ও রামচরণকে তাহার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া কটকে পাঠাইলেন। কটকে তখন বর্গীর হাঙ্গামা বড় বাড়িয়াছে। সঙ্গে নবাবের সৈন্যদল চলিল। সুবাদারি বড় সহজ সুবাদারি নহে, যুদ্ধ করিতে যাওয়া। রামচরণ পথে যে কোন হাঙ্গামা ঘটিতে পারে এরূপ আদৌ ভাবেন নাই। তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া সুবাদারের সঙ্গে মেদিনীপুর অতিক্রম করিলেন।

পথে মহা বিপত্তি ঘটিল। মেদিনীপুর ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর না হইতে হইতেই—পথিপার্শ্বস্থ গভীর বনমধ্য হইতে ৪।৫ শত পিণ্ডারী সেনা তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক সেনাদল পশ্চাতে। সঙ্গে সামান্য কয়েক শত মাত্র। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সুবাদার ও তাঁহার দেওয়ান সেই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়াও যুঝিতে লাগিলেন। নবাবের নামে কলঙ্ক ঘটিল না বটে কিন্তু সেই যুদ্ধে রামচরণ ও মনিরুদ্দিন জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

রামচরণের তিন শিশু পুত্র বর্ত্তমান। তাঁহার বিধবা একে স্বামী শোকে মুহ্যমানা, তাহাতে আবার তিন নাবালক পুত্রের ভার তাঁহার উপর নগদ টাকা কড়ি ও ধনরত্নাদি যাহা কিছু সবই তাঁহার হস্ত বহির্ভূত। খোজাওয়াজিদ্ সেই সময়ের একজন মহাধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। রামচরণ যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যান। যখন মানুষের দুর্ভাগ্য

* আজকাল যেখানে—ইংরাজের বিজয় স্তম্ভ স্বরূপ ফোর্ট উইলিয়াম—বর্ত্তমান, প্রাচীন কলিকাতার সেই স্থানকে গোবিন্দপুর বলিত। গোবিন্দপুরে, সুতনুটীতে (হাটখোলা অঞ্চল) সেই সময়ে লোক জনের বেশী বসবাস ছিল। তত্রাচ এই দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ভিন্ন—আর কিছুই বোধ হইত না। এখন যাহা প্রাসাদময়ী চৌরঙ্গি তখন—এইখানে বাঘ্ ডাকিত বাঘের ভয়ে চোর ডাকাতের ভয়ে লোকে বাটীর বাহির হইত না।

ঘটিতে আরম্ভ হয় তখন আর কোন প্রকারেই তাহার গতিবোধ করা যায় না। ঘটনা ক্রমে খোজা সাহেবও এই সময়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আর উদ্ধার হইল না—দেওয়ান রামচরণের বিধবা তিনটী শিশু পুত্র ও সামান্য বিষয় সম্পত্তি লইয়া মহা ফাঁপরে পড়িলেন।

দেওয়ান পত্নী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। সেকালের মেয়েরা লেখা পড়া জানিতেন না বটে কিন্তু সেই আক্ষরিক মূর্খতা সত্বেও তাঁহারা যে প্রকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন আজ কাল অনেক শিক্ষিত পুরুষের মধ্যেও তাহার কণামাত্র বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় না। গোবিন্দ পুরে রাম-চরণ যে বাটী তৈয়ারি করিয়াছিলেন তাহা নদীগর্ভজাত হইয়া গিয়াছে। আলয়হীনা বিধবা এই সময়ে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সামান্য বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল, বুঝিয়া সুঝিয়া চালাইয়া তাহা হইতে তিনটী পুত্রের জীবিকা ও শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

বিধবার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম রামসুন্দর মধ্যম মাণিক্য চন্দ্র, কনিষ্ঠ নবকৃষ্ণ। সুখের, সৌভাগ্যের উচ্চ শিখর হইতে সকলেই দুঃখের মহাগর্ত্তে পতিত হইয়াছেন। কটক মহাপ্রদে-শের দেওয়ানের পুত্র ও বিধবা বিধাতার চক্রে তখন সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য লালায়িত। যাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা অগণ্য ধন দান পুস্করিণী খনন, ব্রাহ্মণ রক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন তাঁহার বংশধরেরা কিনা, আজ সামান্য আশ্রয় অভাবে আকুলিত। কিন্তু সুখ দুঃখ প্রাকৃতিক নিয়মে শীত গ্রীষ্মের ন্যায় চলিতেছে। এই নিয়ম বিশ্বাসেই বিধবা সন্তানগুলির মুখ চাহিয়া ভবিষ্যত আশায় বুক বাঁধিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ—

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

৬। তাড়িৎ চৌম্বক।

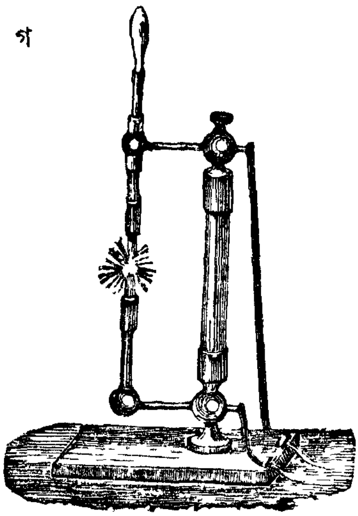
বণ্টা (পূর্ব্বানুবৃত্তি)। এই সকল পরীক্ষাতে, যাহা আজকাল মনে করিলেই অনায়াসে করা যাইতে পারে এবং বাস্তবিক আর এক আকারে যাহা এখন হইয়াই থাকে, তড়িৎ, স্তম্ভের মধ্যে নিয়ত উৎপন্ন ও প্রকাশিত হইয়া তাহা অবিরত এবং একক্ষণের মধ্যেই ঘেরের সমুদয় তাবে এবং পরিচালক পদার্থে ব্যাপ্ত হয়। ইহাকে সচরাচর তড়িৎস্রোত বলে; কিন্তু এই নামটা সংগত নহে, হঠাৎ মনে হয় যে, শিরার মধ্যে যেমন রক্ত সঞ্চলন করে বা "দীপমরুৎ" (lighting gas) যেমন নলের ভিতর দিয়া চলিয়া তাহার ঠোঁটে উঠিয়া জ্বলিতে থাকে, তড়িৎস্রোতও বুঝি সেইরূপ করিয়া এক স্থান হইতে আর এক স্থানে চলিয়া যায়। বাস্তবিক ভারবান্ পদার্থের গতির সহিত ভারহীন পদার্থের (বা শক্তির) গতির তুলনাই হয় না।

এখন স্তম্ভের আকারের অনেক ভিন্নতা হইয়াছে। এখন যে সকল আকার চলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক প্রকার এই ঃ—ইহাতে কেবল দশ থাক্ দস্তা এবং কয়লা আছে; এই উভয় উপকরণের প্রত্যেকটাই একটী একটী কাচপাত্রের মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে; তন্মধ্যে দস্তাটী দশমভাগ গন্ধকদ্রাবক বিশিষ্ট জলে এবং কয়লাটী আজোটিক দ্রাবকে ডোবান আছে। এই উভয় প্রকার তরল পদার্থে একটী ব্যবধান দ্বারা ব্যবহিত আছে; সে ব্যবধানটী আর কিছু নহে, কেবল বিবরাণুময় আধপোড়া মাটির পাত্র, যাহার সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা উভয় তরল পদার্থের পরস্পরের মধ্যে যোগও থাকে অথচ তাহারা মিশিতে পারে না। এক থাকের দস্তা তাহার পরের থাকের কয়লার সহিত একখণ্ড তামার পাতের দ্বারা সংসক্ত থাকে; এমতে প্রথম থাকের কয়লা এবং শেষ থাকের দস্তা দ্বারা স্তম্ভের দুই কেন্দ্র প্রস্তুত হয়, যাহাতে বাহিরের ঘের আসিয়া শেষ হওয়া উচিত।

স্তম্ভক্রিয়ার স্থায়িত্বভাব উহার একটী পরম লক্ষণ। ইহা সুন্দররূপে বুঝাইতে হইলে ঐ দশথাক্ স্তম্ভের স্রোতকে যদি প্লাটিন তারের ভিতর দিয়া চালান যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, প্রথম ঐ তারটা একটু গরম হইল, ক্রমে তাহা কালো লাল, কালো-লাল হইতে রক্তবর্ণ লাল, তাহা হইতে আবার লাল শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া সেই অবস্থাতেই অবস্থিতি করে। যদি উত্তাপ এত অধিক না হয় যে তার প্রজ্বলিত এবং গলিত না হইতে পারে, তবে তারটাকে উপযুক্তরূপে লম্বা করিলেই ঐরূপ অবস্থা সহজেই নিবারণ করা যাইতে পারে।

নিম্নতর কৌতুকাবহ পরীক্ষাও উহার স্থায়িত্বভাবকে সপ্রমাণ করিতেছে। এই

ক্ষুদ্র যন্ত্রটীতে একটী অপরিচালক কাচের বাঁট রহিয়াছে; তাহার উপর নীচে ধাতু দ্বারা মোড়ান। ঐ ধাতুদ্বয়ের মধ্য দিয়া দুইটা ধাতুর শলাকাতে দুইটা কয়লা কাঠি বসান আছে এবং স্তম্ভের দুই কেন্দ্র দুই ধাতুময়ী শলাকার পিছনে



লাগান আছে। যেই কাচের হাতল "গ" দ্বারা উপরকার কয়লা কাঠিকে নীচের কয়লার সঙ্গে স্পর্শ করানো যায়, অমনি অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠে এবং যতক্ষণ স্তম্ভ হইতে স্রোত আসিতে থাকে, ততক্ষণই এইরূপ জ্বলে; যখন কেহ ঘের খুলিয়া দেয় তখনই থামে, আবার ঘের বন্ধ করিলেই আলো পূর্ব্বের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে।

এইরূপ ৫০ বা ১০০ থাক স্তম্ভ দ্বারা ক্ষণেকের মধ্যে বহু গ্রাম (gram) রৌপ্য স্বর্ণ বা প্লাটিন গলান যায়; লৌহ এবং ইস্পাত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে যেমন দগ্ধ হয় এবং চতুর্দ্দিকে স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে। সেইরূপ ইহা দ্বারাও দগ্ধ হয় এইরূপ পরীক্ষা করিতে গেলে নীচেকার কয়লাকে, যাহার উপরে ধাতুটী রাখিতে হয়, একটু প্রশস্ত করিতে হয় এবং তাহাতে একটু গর্ত্ত করিয়া লইতে হয়। যেমন

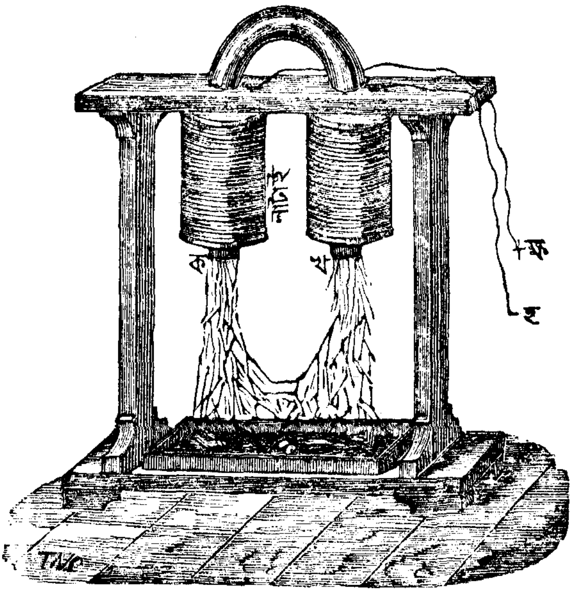


অয়রষ্টেড। অয়রষ্টেড সপ্রমাণ করিয়াছেন যে স্তম্ভের স্রোত যদি তারের মধ্যে অথবা সাধারণতঃ কোন পরিচালক পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে উহা চৌম্বকের উপর অত্যন্ত গুণপ্রকাশ করে; ঐ পরিচালক বস্তু চুম্বকের যতই নিকটবর্ত্তী হয়, তত অধিক বলে উহাকে আকর্ষণ করে বা বিকর্ষণ করে, অথবা উহাকে নির্দ্দিষ্টরূপে চালনা করে।

এই আবিষ্ক্রিয়ার সময়, বিজ্ঞানের এই অংশ, যাহার বিষয় আমরা বলিতেছি তাড়িত চৌম্বক নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেন না এই নাম দ্বারা তাড়িত ও চৌম্বক এতদুভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়াসম্বন্ধ নির্দ্দেশিত হয়।

আমরা ঐ পারস্পরিক ক্রিয়াকে দুইটী পরীক্ষা দ্বারা সাধারণরূপে এক প্রকার বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

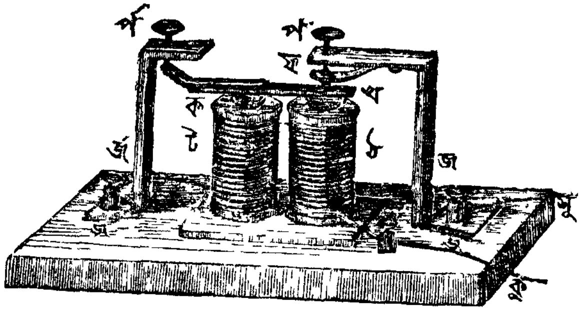
এই একটী তাড়িতচুম্বক ধাতু (ঘ); ইহা ঘোড়ার পায়ে যেরূপ ক্ষুর বসায়, সেইরূপ বক্রাকার নীরেট লৌহচোঙা;



তাহার পরে প্রায় এক মিলিমেটর মোটা এবং বহু সেণ্টিমেটর লম্বা তামার তারকে, 'গোটা'য় যেমন স্থতা জড়ায় সেইরূপ সূক্ষ্ম রেশমের দ্বারা জড়াইয়া, সেই রেশম-জড়ানো তারের দ্বারা, স্থতার নলীতে যেরূপ স্থতা জড়ান যায়, নীরেট চোঙার প্রতি বাঁট সেইরূপ জড়াইতে হইবে। এইরূপ জড়ানো চোঙাকে তাড়িতচুম্বক ধাতুর লাটাই বলে। এই দুই তারের শেষ সীমাদ্বয়ের (হ ও ক্ষ) কাছে রেশম জড়ান নাই, খোলা রহিয়াছে; ঐ দুই স্থান স্তম্ভের দুই কেন্দ্রের সহিত যোগ করিতে হইবে। যেই স্রোত বহিতে থাকে, অমনি ক্ষুরাকার লৌহটা বলবান চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়; অমনি ইহা পিরেক, খণ্ডলৌহ আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহারাও আবার অপরাপরকে এইরূপ আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখে, তাহারাও আবার অপরকে ধরিয়া রাখে। এইরূপে একটী শিকলির মতন প্রস্তুত হয়, সেই শিকলির প্রথম কড়া যেন তাড়িত চুম্বক ধাতুর দুই কেন্দ্র ক ও খ তে লাগিয়া আছে। যেই মাত্র কেহ ঘের খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া দেয়, অমনি স্রোত বন্ধ হয়; যেই স্রোত বন্ধ হয়, সেই ক্ষণেই অমনি যেন সকল আকর্ষণী শক্তি আকাশে মিলাইয়া যায়, লৌহখণ্ড সকল পৃথক পৃথক হইয়া নিম্নে পড়িয়া যায়, ভারের আজ্ঞা ব্যতীত আর কাহারো কথা এখন গ্রাহ্য করে না। এইরূপে তাড়িত চুম্বক ধাতু ঘের বন্ধন বা খোলা অনুসারে আপনার শক্তি পায় বা হারায়, এবং এইরূপে একবার প্রবল আকর্ষণ, আর একবার সম্যক উদাসীনত পুনঃ

পুনঃ অতি সত্বর বিধান করা যাইতে পারে, যাহা পরের পরীক্ষাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এইটী আর একটী তাড়িতচুম্বক ধাতুর যন্ত্র কিন্তু পূর্ব্বের অপেক্ষা ছোট এবং বার্ত্তাবহে যেরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, ইহা ঠিক সেই প্রকার। ক খ রূপ লাগবাঁটটা, যাহাকে এখানে তাড়িতচুম্বক ধাতুর পতর বলা যায়, ছট্‌কার মতন সচল ও ঢুল্যমান ভাবে রহিয়াছে। প ও র্প রূপ পাকদণ্ড বা ঘূর্ণিকা উহার গতির সীমা করিয়া দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পতরের



স্থিতিস্থাপকতা উহাকে ঘূর্ণিকা প তে অথবা ভাল কথা, ফ রূপ ছট্‌কাতে ঠেকাইয়া রাখে; এই ছটকাকে প রূপ ঘূর্ণিকা ঘুবাইযা ইচ্ছামত অধিক বা কম উঠান নামান যাইতে পারে, কিন্তু যখন তাড়িত চুম্বক ধাতু কখ পতবকে আকর্ষণ করে, উহা আপনার স্থান ছাড়িযা আকর্ষণকারী কেন্দ্রদ্বয়েব প্রতি অবনত হয়। এখন, এই তাড়িতচুম্বক যন্ত্রকে এমন প্রস্তুত করা গিয়াছে, যাহাতে উহার ঘের আপনা হইতেই বদ্ধ হয় এবং আপনা হইতেই খোলে; অর্থাৎ, তাড়িত চুম্বক যন্ত্রের তারের একটা শেষ সীমা "সু" তে আসিয়াছে, আর একটা সীমা জ পায়াতে লাগান আছে। ঐ সমস্ত কাণ্ডটী ধাতু নির্ম্মিত, সুতরাং স্রোতকে আপনা হইতে পতরে পরিচালন করে; আবার পতর ফ ছটকাকে ছুঁইয়া থাকাতে পতর হইতে ঐ স্রোত ফ ছটকাতে যায় এবং ছটকা হইতে ঐ স্রোত ধাতু নির্ম্মিত র্জ কাণ্ডেব নীচে 'কু' তাবে আইসে। এমতে, সু আর কুকে স্তম্ভের কেন্দ্রদ্বয়ের সঙ্গে যোগ করিলেই ঘের জোড়া হইল এবং স্রোত চলিল। কিন্তু যেই ক্ষণ পতবটা ট ঠ তাড়িত চুম্বকের দ্বাবা আকৃষ্ট হইল, অমনি পতরটা ফ ছটকা হইতে ছাড়িয়া আসিল এবং ঘেরটী ভাঙ্গিয়া গেল; অমনি তাড়িত চুম্বক ধাতুর আকর্ষণী শক্তি নষ্ট হইল, পতরও তৎক্ষণাৎ আপনার স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা ছটাকাতে পুনরুত্থিত হইয়া ঘের বদ্ধ করিল; তাহাতে আবার আকৃষ্ট হইল, আবার বিচ্ছেদ হইল, এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল। অতএব পতর একটু অবকাশ পায় না, এমন একটু স্থান পায় না

যেখানে একটু বিশ্রাম করে। এইরূপ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট আকর্ষণী শক্তির আয়ত্তগত হইয়া উহার গতি অত্যন্ত সত্বরতা প্রাপ্ত হয়; উহা দ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহার তীব্রতা কখন কখন প্রতিমুহূর্ত্তে বহুসহস্র কম্পনের সমান হয়।

যাহা বলা গেল তাহা স্তম্ভের, তড়িৎ স্রোতের এবং তাড়িৎ চৌম্বকের প্রথম ভাব উদ্দীপন করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা এখন ঈষৎ বুঝিতে পারিবে যে কেমন সহজে এই নূতন আবিষ্কৃত শক্তিকে নানা প্রকার কার্য্যে লাগান গিয়াছে; বিশেষতঃ ইহা দ্বারা কেমন সেই আশ্চর্য্য যন্ত্র লাভ হইয়াছে, যাহা দ্বারা আমাদের চিন্তাস্রোত বার্ত্তাবহের তারে শত শত যোজন দূরে সঞ্চালিত হয়—এমনি দ্রুত সঞ্চালিত হয় যে কোন ঘরের ভিতর কতক পা দূরে কথার শব্দ প্রচার হইতে যতটুকু বিলম্ব তাহাতেও ততটুকুই বিলম্ব হয়।

৭। আনবিক ক্রিয়া।

দ্রব্যের অণু বুঝাইয়া দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। অণু যদি মনের অধ্যাহার্য্য বিষয় হইত, তাহা হইলে যেমন চতুষ্কোণ, গোল অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রতত্ত্বের আকারকে ব্যাখ্যা করা যায়, সেইরূপ ইহাকেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারিত। কিন্তু অণু বাস্তব পদার্থ; উহাকে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উহা যে কি, তাহা আগে জানা এবং তাহাই বলা আবশ্যক। কিন্তু ঐ বাস্তব পদার্থটী এমনি ছোট যে, না আমরা তাহাকে ছুঁইতে পারি, না দেখিতে পারি, না কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি। এমন বাস্তব পদার্থ, যাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় না বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; যাহার আকার অজ্ঞাত, যাহার পরিমাণ অজ্ঞাত, যাহার অস্তিত্বের প্রকার অজ্ঞাত, তাহাকে কিরূপে ব্যাখ্যা করা যাইবে? অতএব ক্ষেত্রতত্ত্বের মতন করিয়া অণুর ব্যাখ্যা আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে, কেননা উহাতো অধ্যাহার্য্য নহে; ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয় তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে, যেহেতু উহাকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারি না। তবে, যখন আমাদের কোন মনের ভাব ঠিকঠাক ব্যক্ত করিতে হইবে, আমরা কি অণু কথা একেবারেই ব্যবহার করিতে পারিব না—অণু কথাটাকে কি আমাদের ভাষা হইতে একেবারেই বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে? তাহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। পদার্থবিজ্ঞান অধ্যাহার্য্য বিজ্ঞানের সমান নহে—এই দুই বিষয় এক পথে চলে না; আর বাস্তব পদার্থকে যে স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ দেখিতে পারে, তাহাকে যে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করিতে পারে, আমাদের মনের এমনও শক্তি নাই; তাহা এমন এক সুড়ঙ্গী দিয়া সহসা পলাইয়া যায় যে, সে পথ আমরা দেখিতেও পাই না, তাহাতে প্রবেশ করিতেও পারি না; অতএব বিজ্ঞান দ্বারা কিছু সমস্তটা জানা যায় না, কতকটা জানা যায় মাত্র।

এখন তবে আমরা অণুতে এবং আণবিক ক্রিয়াতে ফিরিয়া যাই। যখন

আমরা বালুকা রেণু বা হীরক বা অন্য কোন পদার্থকে একটা 'খলে' পিষিতে থাকি, তাহাদের অংশ নিরন্তর অধিকই হইতে থাকে। এইরূপ হইতে হইতে যদি আমরা অবশেষে এমন অংশে আসি যাহারা সমান ভাবে থাকে, যাহারা অবিভাজ্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা হইলে যে সকল পদার্থ হইতে আমরা এরূপ ফল পাইলাম, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, তাহাদের বিভাজ্যতার সীমা আছে; যে, তাহাদের শেষ অণু দেখা দিয়াছে; সেই অণুদের এই আয়তন, এই আকার, তাহাদিগকে দেখিতে এইরূপ, তাহাদের গুণ এই, সেই গুণ হয়তো আবার অণুরাশির অথবা সেই দ্রব্যের গুণ হইতে ভিন্ন। কিন্তু কেহই এপ্রকার অণু দেখিতে পায় না। এমন কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ নাই যাহা বিভাজ্য নহে; অথবা আমরা এমন কিছুই দেখিতে পাই না, যাহা রাশি বা সমষ্টি নহে, যাহা পৃথক্ পৃথক্ অংশের একত্রীকরণ নহে। কিন্তু তথাপি আমরা বুঝিতে পারি যে, যত সূক্ষ্ম অংশ আমাদের চক্ষুর গোচর হইতে পারে, তাহারো পরে এমন সুসূক্ষ্ম অংশ আছে যাহাকে ইন্দ্রিয় ধরিতে পারে না। তাহাদের ঘেঁসাঘেঁসি অবস্থিতি দ্বারা, তাহাদের শ্রেণীপূর্ব্বক সন্নিবেশ দ্বারা, তাহাদেরই যোগে চক্ষুর গোচর অংশ সকল প্রস্তুত হয়। ঐ যে চক্ষুগোচর অংশের নির্ম্মাণকারী আদিম অংশ সকল, উহারাই বস্তুর অণু।

ইহা যদি ঠিক হইল, তবে এখন অণুকে দুই রকমে দেখা যাইতে পারে। প্রথম, একটা অণুকে সম্পূর্ণ সবর্ণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; সে যে স্থানটুকু ব্যাপিয়া আছে, সেই স্থানের সকল অংশেতেই সে আপনার সদৃশভাবে ব্যাপিয়া আছে। যথা, যদি অণু ঘন চতুর্ভুজ হয়, আমরা সেই ঘনচতুর্ভুজকে সম্পূর্ণ নিবেট ও কঠিন মনে করিয়া লইতে পারি; তাহার মধ্যে কোন ফাঁক নাই, ফাটাফুটি নাই, তাহার বরাবরত্বের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই বা এমন কোন দৈব ঘটনা নাই, যাহাতে করিয়া তাহার এক অংশকে অপরাংশ হইতে প্রভেদ করা যাইতে পারে। এইরূপ অণুকে পরমাণু বলে—হয়তো ইহা বিভাজ্য, হয়তো বিভাজ্য নহে; হয়তো ইহা বিকার্য্য, হয়তো বিকার্য্য নহে।

দ্বিতীয়ত, আমরা অণুকে সদৃশ বা বিসদৃশ অংশের, একপ্রকার অথবা ভিন্ন প্রকার পরমাণুর সমষ্টি মনে করিতে পারি। এরূপ হইলে কিন্তু সমস্ত অণুটা আর একাত্মক বা সমানাত্মক (homogeneous) হইল না; তাহা যতটা স্থান ব্যাপিয়া আছে, সেই স্থানের তাবৎ অংশে তাহা এক-সমান হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহা একটা সংগত পদার্থ হইল, তাহার বরাবত্বের বিচ্ছেদ আছে এবং তাহার সন্নিবেশের একটী প্রণালী আছে—তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, স্থায়ীই হউক বা পরিবর্ত্তনশীলই হউক।

এই দ্বিতীয় প্রকারকেই আমরা অণুর প্রকৃতি বলিয়া গ্রহণ করিলাম, যেহেতু ঘটনারাশির সঙ্গে এই ভাবের বেশ্ মিল পাওয়া যায়। ক্রমশঃ—

রাসমালা।

ঘোরতর যুদ্ধ।

পঞ্চাসর ভূবরের হস্তে পতিত হইল;—কিন্তু বিজয়ী শোলাঙ্কি রাজ তখনও নগর সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিলেন না। দ্বারপাল ও সভাপালগণ প্রাণপণে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণের প্রবেশ রোধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের কোন চেষ্টা সফল হইল না, অগণ্য শোলাঙ্কি সৈন্যের নিকট কতিপয় সৌরযোধ নিপতিত হইল। তাহাদিগের মৃতদেহ পদতলে দলিত করিয়া বিজয়ী ভূবর উন্মত্তভাবে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উৎকট জয়নাদে রাজভবন প্রতিধ্বনিত করিয়া দলে দলে শত্রুগণ অন্তঃপুরের অভিমুখে ধাবিত হইল; ভূবর সকলের পুরোভাগে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিলেন;—হঠাৎ তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল; তিনি স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন;—আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিলেন না! তিনি দেখিলেন অগণ্য রমণী,—আলুলায়িতকুন্তলা,—বিকট রাক্ষসীবেশিনী—করে অর্গলদণ্ড, যষ্টি, মুদ্গর ও নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে উন্মত্তার ন্যায় দ্রুতবেগে বহির্গত হইতেছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে শত্রুগণ বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। রণোন্মাদিনী পুরস্ত্রীগণ স্ব স্ব হস্তস্থ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল এবং শত শত রণচণ্ডীর ন্যায় অবিরল আঘাত করিতে লাগিল! স্ত্রীপুরুষে অপূর্ব্ব ঘোর যুদ্ধ বাধিল; সে যুদ্ধে শোলাঙ্কি সৈন্যগণ পরাস্ত ও দলিত হইয়া নগরের বহির্দ্দেশে পলায়ন করিল। তখন সৌরবীরাঙ্গনাগণ শত শত মৃতদেহের ভিতর হইতে জয়শেখরের শোণিতাক্ত শবদেহ সংগ্রহ করিয়া লইল এবং উৎকৃষ্ট চন্দনসারে বিশাল চিতা প্রস্তুত করিয়া আপনাদিগের অধিপতির মৃতদেহ লইয়া জ্বলন্ত অনলে প্রাণত্যাগ করিল। মহারাজ জয়শেখরের অপর চারিটী পত্নীও দাসী ও সহচরী সমভিব্যাহারে স্বামীর অনুগামিনী হইল। যখন সেই সাধু নরপতির শবদেহের সহিত শত শত সাধ্বীর সজীব দেহ প্রচণ্ড চিতানলে দগ্ধ হইতে লাগিল,—যখন অনেক নাগরিক রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত পরমানন্দে সেই জ্বলন্ত চিতানল আলিঙ্গন করিল,—তখন পঞ্চাসরে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকাশিত হইল, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। রূপ—যৌবন—বীরত্ব—মহত্ব—স্বদেশানুরাগ—রাজভক্তি সকলই অনলে ভস্মীভূত হইল। রাজভক্তির পবিত্র রসে অভিসিঞ্চিত হইয়া ভারতবাসী ব্যতীত জগতের আর কোন জাতি রাজার সহিত একচিতানলে তনু ত্যাগ করিয়াছে? সেই অদ্ভুত অন্ত্যেষ্টিসৎকার ও আত্মোৎসর্গের সময়ে চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব অদ্ভুত দৃশ্যে ভূবরের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল,—

পাপচিত্তে পবিত্র প্রেমবারি উথলিয়া উঠিল। সৌররাজের অন্ত্যেষ্টিসৎকারে তিনি যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেই দিবসের জন্য তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার সমস্ত সৈনিক ও সেনানী সমরসজ্জা ত্যাগ করিয়া যথাবিধানে জয়শেখরের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন করিবার নিমিত্ত সৌরগণের সহকারী হইলেন। যে স্থলে সেই পবিত্র চিতা প্রস্তুত হইয়াছিল, ভূবর তথায় একটী শিব মন্দির স্থাপন করিয়া দেব-বিগ্রহকে "গুর্জ্জর নাথ" নামে অভিহিত করিলেন।

পঞ্চাসরের অধঃপতনে কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের অধিপতিদ্বয় বিজয়ী ভূবরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। অনন্তর শোলাঙ্কি রাজ রণশ্রান্তি দূর করিয়া নবজিত রাজ্যের পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। গুর্জ্জরের শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার আর তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু তাহার মন্ত্রিগণ যখন বলিল যে, শূরপাল যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন তিনি নিষ্কণ্টকে তথায় থাকিতে পারিবেন না; তখন ভূবর রাজ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ তথায় একজন মন্ত্রীকে স্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগত হইলেন।

শূরপাল যে আশায় উৎসাহিত হইয়া ভগিনীকে বনমধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্বরিত পদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তাহা সফল হইল না;—তিনি দুর্গ মধ্যে উপস্থিত হইতে না হইতেই জয়শেখর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শূরপালের আপাদমস্তক প্রচণ্ড তাড়িততেজে কাঁপিয়া উঠিল, শিরোরুহ সকল কণ্টকিত হইল, নয়ন দিয়া জ্বলন্ত অনলশিখা বাহির হইতে লাগিল! প্রথম মুহূর্ত্তেই তিনি রাজার অনুগমনার্থ সমর-ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া যদি প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে ভূবর নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবে; যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে; এখন ভবিষ্যতের জন্য মন্ত্রণা স্থির করা উচিত হইতেছে। বিধাতা যদি আমার ভগিনীকে একটী পুত্র সন্তান অর্পণ করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই গুর্জ্জর সিংহাসন পুনর্লাভ করিব; আমার সাহায্য ব্যতিরেকে সে গুরুতর ব্যাপার কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না।" তখনই তিনি ভগিনীর উদ্দেশে বহির্গত হইলেন; কিন্তু সেই নির্দ্দিষ্ট স্থলে তাহাকে দেখিতে না পাওয়াতে অথবা তাঁহার সম্মুখে অবনত মস্তকে উপস্থিত হইতে না পারাতে গির্ণাবের গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শুভকালের প্রতাক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে রূপ সুন্দরী সেই বন মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভিলরমণীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। সেই শবর-পত্নী তাঁহাকে উচ্চকুলোদ্ভবা স্থির করিয়া সবিনয়ে বলিল,—"ভগিনি! আমার সহিত তুমি এই বনে বাস করিবে আইস; এখানে ভাল ভাল ফল ফুল পাইবে এবং নিরাপদে বাস করিতে থাকিবে।" রাজ্ঞী তাহার প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া তৎসহ পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সুখে দুঃখে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে

তাঁহার একটী সুলক্ষণ-সম্পন্ন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। "অত্যাচারীর উৎপীড়ন হইতে গোব্রাহ্মণ রক্ষা করিতে,—পাপীর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে,—অদ্ভুত বীরত্ব ও মহত্ত্বে পবিত্র সৌরকুল উজ্জ্বলিত করিতে পবিত্র বৈশাখের পঞ্চদশ দিবসে সূর্য্যদেবের উদয়কালে গুর্জ্জরের সূর্য্য পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইলেন। সেই দিন সুনির্ম্মল নীল নভোস্থলে অরুণদেব জগৎ হাসাইয়া হাসিতে হাসিতে উদিত হইলেন, বিমল আকাশে শীতল সমীরণ বহিতে লাগিল, বিমল নদীজল মধুর কলকলে বিমল সাগরে প্রবাহিত হইল; বিমলতেজা ব্রাহ্মণগণের হোমকুণ্ড হইতে বিমল অনলশিখা উত্থিত হইতে লাগিল; বিমল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিল—জগতে মহাবীর জন্ম গ্রহণ করিলেন।"

দেখিতে দেখিতে ছয় বৎসর অতীত হইল; বনবাসী সৌররাজকুমার বনপুত্র ভিল বালকদিগের সহিত লালিত হইয়া শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন শিশু রাজকুমার তরুশাখালম্বিত স্বীয় দোলামধ্যে বসিয়া আছে, এমন সময় জনৈক জৈন সন্ন্যাসী সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেন; বালকের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও সুলক্ষণ দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান হইল, যেন কোন দেবকুমার সেই দোলামধ্যে বিরাজ করিতেছে। বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া শ্বেতাম্বর সেই শিশুর জননীকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পরিশেষে রাজপত্নী জানিতে পারিয়া উপযুক্ত সম্মানসহকারে তাঁহাদের উভয়কে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। যে নগরের ভাগ্যচক্র একদা জয়শেখরের করে চালিত হইয়াছিল, আজি তাঁহার পট্টমহিষী অনাথার ন্যায় পুত্র ক্রোড়ে করিয়া তাহার প্রকাশ্য পথে পদব্রজে চলিয়া বেড়াইতেছেন, কেহ একবার চাহিয়াও দেখিল না। রূপসুন্দরী জানিতেন না যে, জয়শেখর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে যোগীর মুখে তাহা অবগত হইয়া গভীর শোকে অভিভূত হইলেন। জৈন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বিস্তর সান্ত্বনা দিয়া তদায় শিশু পুত্রকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাজপুত্র বনমধ্যে জন্মিয়াছেন বলিয়া যোগী তাঁহার 'বনরাজ' নাম অর্পণ করিয়া সযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। বনরাজের জন্মবৃত্তান্ত তাঁহার মাতুলের গোচরিত হইল। নিবিড় পর্ব্বত প্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া অবধি শূরপাল একদিনের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকেন নাই; সুযোগক্রমে সুবিধানুসারে তিনি সেই নিভৃত প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া ভূবরের প্রতিনিধিকে উৎপীড়ন করিতেন। এক্ষণে ভগিনী ও ভাগিনেয়কে তিনি সেই নির্জ্জনস্থলে লইয়া গেলেন এবং বনরাজকে নানাবিধ অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন।

বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত নগর পঞ্চাসর দুর্দ্ধর্ষ শত্রুহস্তে পতিত হইল,—কমলার আবাসনিলয় হাস্যময় সৌরাষ্ট্র রাষ্ট্রজিৎ ভূবর কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল। সৌররাজ জয়শেখরের এই প্রচণ্ড শত্রু সম্বন্ধে নানা ভট্টগ্রন্থে নানা বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়;—কেহ ইহাঁকে দানব, কেহ দুরন্ত ম্লেচ্ছ, কেহ বা অপর কোন হিন্দু নরপতি বা প্রচণ্ড জলদস্যু বলিয়া বর্ণন

করিয়াছেন। "বংশরাজ" বা "বনরাজ চরিত" নামক একখানি ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে "সৌরাষ্ট্রের অধিপতি সৌররাজ যশোরাজের দুইটী রাজধানী ছিল,—দেববন্দর ও পত্তন সোমনাথ। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বংশরাজ জন্মগ্রহণ করেন। সৌরনরপতিগণ জলদস্যু ছিলেন,—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পণ্যপোতসমূহ লুণ্ঠন করাতে সাগর উদ্বেল হইয়া তাঁহার দেববন্দর নগর গ্রাস করিল; সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কটে বংশরাজের জননী একমাত্র সুন্দরূপা ব্যতীত আর সকলেই নিহত হইল। বরুণদেব স্বয়ং তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।" এই বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিয়া মহাত্মা টড সাহেব অনুমান করেন যে, সৌররাজের সেই ভীষণ শত্রু হয়ত জলপথে আসিয়া অকস্মাৎ পঞ্চাসর (দেববন্দর) নগর ধ্বংস করিয়াছিল।* টড সাহেবের অনুমান কত দূর সত্যমূলক, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক চিত্র অনুশীলন করিলে এক অদ্ভুত শোকাবহ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ভারতের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই লুণ্ঠন ও উৎসাদন, বিপ্লব ও বিগ্রহ এবং রাজ্যনাশ ও শোণিতপাতের লোমহর্ষণ দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে;—এক রাজ্যের ধ্বংসরাশির উপর অপর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, এক রাজবংশের চিতাভস্মের উপর অপর রাজকুলের অভ্যুত্থান, এক প্রকার শাসনবিধির পরিবর্ত্তে অপর প্রকার শাসনবিধির প্রবর্ত্তন;—এই প্রকার শোকাবহ বিপর্য্যয় ভারতের সর্ব্বত্র সংঘটিত হইতেছিল। যেন সমগ্র ভারতভূমি এক নূতন জীবনে উজ্জীবিত, যেন সমস্ত ভারতীয় রাজন্যসমাজ জীবনমরণের এক অভিনব সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত! এই সময়ে সিন্ধুদেশ হইতে এক প্রচণ্ড শত্রু আসিয়া আজমিরের অধিপতি চৌহানরাজ মাণিক পালকে সংহার করিল; বারবর বাপ্পা এই সময়ে মৌর্য্য মাননৃপতির হস্ত হইতে চিতোররাজ্য কাড়িয়া লইলেন; প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ দীর্ঘকাল শ্মশানে পরিণত থাকিয়া তুয়ার নরপতিগণ কর্ত্তৃক নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল; ধারা নগরীর অধিপতি প্রামার ভোজরাজা উত্তর দেশ হইতে আগত প্রচণ্ড আক্রমকের হস্তে পরাজিত হইয়া এই সময়ে চন্দ্রাবতী নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন; ও দিকে সুদূর পঞ্চালিকা রাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী শালথানপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া যাদব ভট্টিগণ শতদ্রুপারে ভারতীয় মরুভূমিতে উপনিবিষ্ট হয়েন; শোলাঙ্কিগণ সুরধুনীর সৈকতভূমিস্থ সুতভদ্রা হইতে বিদূরিত হইয়া সুদূর মালবার উপকূলে কল্যাণনগরে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন; এমন কি বহুদূরস্থ গলকুণ্ডের পাষাণপ্রাকারের মধ্যভাগেও সেই ভীষণ আক্রমকের বিকট ভ্রূকুটি লক্ষিত হইয়াছিল। ভারতের সেই সর্ব্বসংহারক ভীষণ শত্রু কে? কাহার অজেয় বাহুবলের প্রভাবে ভারতের সর্ব্বত্র এই ভয়াবহ কালানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল? কে ভয়ঙ্কর যমদূতের ন্যায় ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিয়া ভারতবাসীর

* রাজস্থান ১ম খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠা।

সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল? ভট্টগ্রন্থে সেই প্রচণ্ড অরাতি "উত্তরদেশীয় ঐন্দ্রজালিক" "গজলিবন্দের দানব" প্রভৃতি ঘৃণ্য আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। তবে কি সেই উত্তরদেশীয় দানবই পঞ্চাসর নগর ধ্বংস এবং সৌররাজ জয়শেখরকে নিহত করিয়াছিল? টড সাহেব বলেন যে ঠিক এই সময়ে দুর্দ্ধর্ষ কাত্তিগণ মূলতান হইতে কচ্ছ্রনরু পার হইয়া সৌরাষ্ট্রে উপনিবিষ্ট হয়; * তথায় তাহাদিগের প্রতাপ দিন দিন এত বাড়িয়া উঠে যে, প্রাচীন সৌরাষ্ট্র নাম অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া কাত্তিবারাকে স্থান দান করে। কিন্তু সৌরকুলের সেই ভীষণ শত্রু যে শোলাঙ্কিরাজ ভূবর ব্যতীত আর কেহই নহে, ইতিপূর্ব্বে তাহা সবিস্তারে প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে বনরাজের চরিত আলোচনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ক্রমশঃ—

* (2) Tod's western India, P. 155.

কৃষি।

কৃষিবিদ্যা দেশের উন্নতির ভিত্তিমূল। সভ্যতা, শাস্ত্র-জ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সমস্তই এই কৃষিকে মধ্যবিন্দুরূপে অবলম্বন করিয়া আছে। চাষারা পণ্ডিতগণের জ্ঞানদাতা, বিদ্যাশিক্ষার কারণ,—একথা শুনিতে বড় ভাল লাগে না, পরিহাস বলিয়া বিবেচনা হয় এই যা, নতুবা আমরা তাহাও বলিতে কুণ্ঠিত নহি। পেটে ভাত থাকিলে সকল বিষয়ই ভাল লাগে—এই সাধারন চলিত কথাটী অতি চমৎকার; একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই এটী যে বহুমূল্য কথা, তাহাতে আর সংশয় থাকে না। যতদিন দেশের লোক আহারের জন্য চিন্তিত না হয়, যতদিন অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, ততদিনই দেশে শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি পরিপাটী রূপে চলিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ সকলের অবস্থা বিবেচনা করিলেই একথার বিশেষ প্রমান পাওয়া যাইবে। লোকে আহারের জন্য ব্যস্ত—কেবল উদরাগ্নি শান্তি করিতেই ব্যাকুল হইলে কে অন্য চেষ্টা করিবে? প্রাণ ধারণ যখন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং আহারই যখন সেই প্রাণধারণের মূল, তখন কাজে কাজেই আহারীয় সংগ্রহ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। "অন্ন চিন্তা চমৎকার"। কবির কবিত্ব, বক্তার বক্তৃতা, নটের নাট, মন্ত্রীর মন্ত্রনা, বিজ্ঞানবিদের বিজ্ঞান, শিল্পির শিল্প—সকলই অন্নচিন্তার নিকট পরাভূত, অন্নচিন্তা প্রবল থাকিলে কিছুই করা যায় না। কুতার্কিক তর্কের দ্বারা হয়কে নয়, নয়কে হয় করিতে পারেন, আমাদের এ প্রস্তাবের বিপক্ষে অনেক তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন, আমরা তাঁহাদের সকল প্রতিবাদের উত্তর দিতে চাহিনা, একবার মাত্র তাঁহাদিগকে অন্নচিন্তায় বিব্রত দেখিলেই সমস্ত মিটিয়া যাইবে। তিনি নিজের প্রতিবাদ নিজেই করিবেন, আমাদের আর সে জন্য ক্লেশ পাইতে হইবে না।

আমাদের দেশে কৃষিই আহারীয় সংগ্রহের প্রধান উপায়। কোন কোন অসভ্য দেশের মাংসাশী অধিবাসীদিগের মধ্যে মৃগয়াই আহারীয় সংগ্রহের উপায় বলিয়া পরিগণিত হয় বটে, কিন্তু আমাদের দেশের সেরূপ অবস্থা নহে, উদ্ভিদই আমাদের দেশীয়গণের প্রাণ, শস্যই একমাত্র জীবনোপায়। দেশীয় ব্যক্তিগণ যদি অনায়াসে এই জীবনোপায় শস্য প্রাপ্ত হয়েন, অনায়াসে প্রাণধারণ ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আর চিন্তা কি? অনায়াসে নানাবিধ দেশহিতজনক কার্য্য সমাধা করিবার যথেষ্ট সময় হইল, নিশ্চিন্ত হইয়া চিন্তাশীলগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্নচিন্তায় যদি মস্তিষ্ক ক্লান্ত না হইল তাহা হইলে তাহার আরও অনেক কার্য্য করিবার ক্ষমতা রহিল।

ভারতের এখন যে অবস্থা, তাহাতে যদি বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষ না হইত—দিনের মধ্যে অষ্ট প্রহরই কেবল পরিবার পোষণ জন্য ব্যাকুল না হইতে হইত, তাহা হইলে যে কত উন্নতি হইতে পারিত, তাহা বলা যায় না। যদি দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আশা করিতে হয়, যদি ভারতের সুখ প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে সে সকল উন্নতির—সে সকল সুখের অন্তরায় অন্নচিন্তাকে দূর করিতে হইবে। সেই অন্নচিন্তা দূর করিবার একমাত্র উপায়—কৃষি, এবং সেই কৃষির কর্ত্তা কৃষক। চাষার উন্নতিই আমাদের দেশে পণ্ডিত শিল্পি ও জ্ঞানীদিগের উন্নতি ও তাহাদের অবনতিতেই আমাদের সর্ব্বনাশ। আমাদের দেশের চাষার শরীর ও মন যদি সুস্থ থাকে, বর্ষায় যদি সুবৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আমরা আর কিছুই চাহি না—তখন আমাদের উন্নতি অপ্রতিনিবার্য্য। আমাদের এখন যে কিছু শিল্পের প্রয়োজন, সে শিল্প আর কিছুই নহে, কেবল কৃষির উন্নতির জন্য শিল্প। আমরা যদি দেবমাতৃক স্থান সকলকে দৈবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিয়া নদীমাতৃক করিতে পারি, শিল্পের দ্বারা হাজা শুকা নিজের আয়ত্তে আনিতে পারি, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলও আয়ত্তে আনিতে পারিলাম। আমরা এখন দেশালাইয়ের কল চাহি না, সাবানের কল চাহি না, গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতের উপায় চাহি না; সে সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক ব্যয় করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা এখন কৃষিবিষয়ক যন্ত্র চাহি, শুষ্ক ক্ষেত্রে জল সেচনের কল চাই, অনুপযুক্ত ক্ষেত্রকে শস্যোৎপাদনের উপযোগী করিবার জন্য সার চাই, ক্ষেত্রে অপরিমিত জল জমিলে তাহা বাহির করিয়া দিয়া শস্য বাঁচাইতে চাই। যিনি এই সকল উপায়ের কোন অংশ সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন, তিনিই এই ভারতের ভাবী উন্নতির কারণ স্বরূপ চিরস্মরণীয় হইবেন। যিনি একটী আদর্শ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া কৃষকদিগকে উদাহরণ দেখাইবেন, কৃষির উন্নতির নূতন উপায় দেখাইয়া দিবেন, তিনিই দেশের প্রকৃত উন্নতির কারণ হইয়া অক্ষয় যশ লাভ করিবেন।

প্রচলিত কথায় আছে বাণিজ্যতেই লক্ষ্মীর বাস এবং কৃষি কার্য্যে তাহার অর্দ্ধেক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের বঙ্গদেশে কৃষি কার্য্যেই লক্ষ্মীর বাস। যে বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহাতে

হিন্দুজাতির অধিকার নাই। সে বাণিজ্য—মুদিখানার বা মনিহারীর দোকান নহে; যে দেশে আছি, সেইখানেই থাকিব—ভিন্নদেশে যাইব না অথচ আমার বাণিজ্য চলিতেছে—সে বাণিজ্য এবাণিজ্য নহে; তাহাতে ইহাতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।

যখন প্রবাদটী প্রচলিত হইয়াছিল তখন ভারতবর্ষে এরূপ পথের সুবিধা ছিল না, একগ্রাম হইতে এক দ্রব্য অপর গ্রামে লইয়া যাওয়া অতীব দুরূহ ছিল। এখন যেমন ইচ্ছা হইলেই দিল্লির দ্রব্য কলিকাতায়, কলিকাতার দ্রব্য দিল্লিতে আনয়ন ও প্রেরণ করা যায় তখন তাহা হইত না সুতরাং ব্যবসায়ীরা কষ্টে স্বষ্টে কোন প্রকারে এক প্রদেশের দ্রব্য অন্য প্রদেশে লইয়া যাইতে পারিলেই প্রচুর লাভ করিতে পারিত, দ্বিগুণ চতুর্গুণ করিতে পারিত। তখন এ প্রবাদ শোভা পাইয়াছে, এখন আর ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাণিজ্য করিয়া সে কথার সার্থকতা সম্পাদন করা যায় না। হিন্দুস্থানের সীমা অতিক্রম করিয়া বিদেশ গমন কি সমুদ্রযাত্রা হিন্দুর পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব—সে আশা এখন এক প্রকার দুরাশা। সুতরাং আমাদের পক্ষে কৃষিই শ্রেষ্ঠ অর্থকর; আমরা যে সকল উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারি, কৃষিই তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বঙ্গে যদি কিছু রত্ন থাকে, সে রত্ন কৃষকের ক্ষেত্রে আছে—বঙ্গে যদি অতুল সম্পত্তিলাভ হয়—তাহা এই দেশের ভূমি হইতেই হইবে। যদি বঙ্গদেশকে ধনশালী করিতে হয়, যদি বঙ্গদেশকে উন্নত করিতে হয়, ভূমির উন্নতি কর—পরিশ্রম কখনই ব্যর্থ হইবেনা, কখনই সে চেষ্টা নিষ্ফল হইবে না। ক্রমশঃ—

রাধা ও ললিতা।

গীত।

ল।—চির প্রেমাধীন তব হরি—
বাঞ্ছা কল্পতরু নাম,
এ বঞ্চনা তবে কেন গো তোমার সনে?
অথবা আমার যত সহচরীগণ,
অপরাধী বুঝি সখি ও রাজীব পায়!—
তাই হেন বিড়ম্বনা
করিলে সবার প্রেমাধিকে,
ভকতবৎসলে!
কহ সত্য—কি! হ'তে কি হ'ল?

রাধা।—(অন্য মনে)—
আহা! অনুরাগে লালসা বাড়িল
মন প্রাণ তাহাতে মাতিল,
অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়ে
রতিরঙ্গে হইনু বিভোর,—
কিন্তু, হায়!
না পুরিতে অনঙ্গ-বাসনা—
সে ত্রিভঙ্গ করিল ছলনা,
তোরা আসি করা'লি চেতনা,
হারানু চৈতন্যপূর্ণ চিদানন্দময়ে;
কে জানে কি মায়ার কৌতুকে!

ল।—কি বলিলে, সখি, মায়াধারী হরি
পরিহরি নিকুঞ্জ তোমার
অন্তর্ধ্যান আপন মায়ায়, নিকুঞ্জ-বিহারী!
অসম্ভব!
মায়াযোগে প্রীতিযোগে
কে আঁটে তোমারে!
তব মায়া জগতের বীজ,
মুগ্ধ যাহে আপনি শ্রীহরি,
যোগমায়ে, যোগমায়া তুমি,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটী
নিত্য বিমোহিত তব মায়া মন্ত্রজালে;
তবপাসে মায়ার চাতুরী।
হরি, হরি! বলিহারী তোমার মায়ায়—
আদ্যাশক্তি অদ্বিতীয়া নারী তুমি
কিবা শক্তি ধরে সে পুরুষ,
ভুলাতে তোমায়, মহামায়ে?
মহামায়া রাসবাসেশ্বরী
ভেবে দেখ—
পদে পদে প্রেমের ভিখারী—
যে হরি তোমার পায়—
গতি যার তোমার কৃপায়,
ছলিয়া তোমায়
কি উপায় মিলিবে তাহায়?
রা। (গগনে চলন্ত মেঘ দর্শনে)—
সখি, সখি ললিতা সুন্দরি!
দেখ মরি মরি—ধরি রূপ মনোহর,
আসে শ্যাম নটবর।
ল।—কৈ সই—কোথা সে নিঠুর?
রা।—বিমানে পবনে করি ভর, আসিছে মাধব!
এতদিনে এ অধীনী জনে
স্মরণে পড়েছে বুঝি;
দেখ সখি, বুঝি লাজ পেয়ে,
না পারে আসিতে,—তাই স্তম্ভিত হইয়ে
দাঁড়াইয়া রয়—লাজে বদন লুকায়!
(উন্মাদিনীর ন্যায় মেঘোদ্দেশে)—
এস, নাথ এস, রাধা এখন (ও) জীবিতা প্রাণে
চরণে বিক্রীতাজনে কি কারণে করিছ সরম?
আমি তোমা বই নাহি জানি,
চিন্তামণি! তব চরণ দুখানি—
এ দাসীর হৃদয় জুড়ান ধন!
প্রাণমন সমর্পণ করি জীবন-রতন
ও রাঙা চরণ পরে
দিছি ধরে চিরতরে তোমারে প্রাণেশ
আমার এ বুকভরা প্রেম।
কৈ এলে না—
রাধা তব মরে দেখনা নিঠুর!
নাহি জানি দয়াময়,
কি দোষ করেছি তব পায়ে
তাই নিরাশে অনাশে ফেলে
চলে যাও—দেখনা চাহিয়ে!
(ললিতার প্রতি)
সখি, ধর প্রাণেশ্বরে,
মনচোরে প্রেমডোরে বেঁধে আন;
ঐ সবে যায়—পলাইছে দ্রুত,
কেন হেন হ'ল, দেখা দিয়ে পুনঃ পলাইল
বিরহ ব্যথিতা রাধা কি দোষ করিল,
কাঁদায়ে চলিল?
ল।—সখি, তুমি উন্মাদিনী হলে,
কোথা শ্যাম তব?
গগনে নেহারি—কৃষ্ণ পয়োধর,
ভাব প্রাণেশ্বর—শ্যামনটবর—
ধন্য তব প্রেম, প্রেমময়ী রাধে।

শ্রীপাঁচকড়ি দে,
এম্ এ।

(গীত)

বেহাগ—একতালা।

না জানি স্বজনি,
কোথা হবি মোর, শ্যামনটবর—
জীবন, জীবননাথ গুণমনি॥
কি কঠিন তার সে কঠিন হৃদি,
কাঁদাইল মোরে সাধে বাদ সাধি,
তার তরে কাঁদি আমি নিরবধি
সদা আকুল পরাণী।
আবার আসিব বলে চলে গেল,
কেন সখি হায়, আর না আসিল,
অভাগিনী বল কি দোষ করিল—
সে হেতু ত্যজিল;
আশাবশে বসে আছি লো এখনো,
নয়নেব নীর ঝরে অণুক্ষণ
আশা ভেঙে গেল, সাধ না মিটিল,
কেন কাঁদে মন, না জানি।
শ্যামচাঁদ বিনে, কিবা কাজ প্রাণে,
ত্যজিব জীবন জলধি-জীবনে,
নাহি সাধ মনে আর এ মিলনে—
যাতনা মিলনে;
কোকিল কোকিলা দেখ অনিবার,
করিছে আমারে তীব তিরস্কার
গুঞ্জরি গুঞ্জরি, ভ্রমব ভ্রমরী
কহে শুন কটু বানী।
মুগ্ধ কুঞ্জ পুঞ্জে নিশা সমীবণ
দেখ সখি ধীরে, করে বিচরণ,
পুরনিমা শশী নভঃপ্রান্তে বসি
করে পরিহাস;
তার তরে যে লো, আমি পাগলিনী,
চমকিয়া উঠি শুনি মৃদুধ্বনি,
নাহি এল নাথ, হইল প্রভাত
পোহাল দেখ রজনী।

স্মৃতি ও কামনা।

আকাশ পাতাল ভাবি
তারসনে ভাবি তোরে,
তোমার মোহিনী ছবি
মানস মোহিত করে।
দুজনায় সন্ধ্যাবেলা
আকাশে সুধাংশু দেখি,
কত হাসি হাসিযাছি
আকাশে সুধাংশু দেখি
গুপ্ততটে সুপ্ত জোৎস্না
প্রবাহিনী ধীরে চলে,
লুপ্তনীল নভে নেচে
নীবদ যেতেছে চলে,
তম ঢাকা নীড়হতে
ডাকিয়া নারব পাখী,
কোথা স্বর কোথা পাখী
উভয়ে ফিরানু আঁখি,
উভযে উভযে কত
চিত্ত আত্মহাবা হয়ে
কবিয়াছি আলাপন
কথা সনে কথা দিয়ে;
কখন পাগল মনে,
উভয়ে পাগল হয়ে
তর্ক কি বিতর্ক কত
উভয়েতে গেছে বয়ে,
চাঁদ সনে কত কথা
কত কথা মনে গাঁথা
কত সুখ, কত শান্তি
কত যে প্রেমের গাথা;
কত আশা মনে উঠে
মলয়ে উঠিছে ঢেউ,
তুমি আমি বিনে বালা
অপরে বুঝে না কেউ;

কামনা যাতনা কভু
কামনা সুখের সেতু
কামনা সৌন্দর্য্যময়
কভু বা রোদন হেতু,
কামনা পলায়ে গেলে
জীবন পলায়ে যাবে,
সুখ দুঃখ দুই থাক
কামনা রাখিতে হবে,

কামনা জলধী নীরে
সারাকাল ডুবেরব,
সারাদিন সারানিশি
ভাবিব মুরতি তব ;
এই আশা আশাময়ি
আঁধার হৃদয় আলো
সুখ দুঃখ যত সহি
মিশিতে কামনা ভাল।

শ্রীপাঁচকড়ি দে, এম্ এ।

আমার পশ্চিমে চাকরি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহই হউক, আর সিপাহিরা ক্ষেপিয়াই উঠুক, আমাদের বরাত কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। এত গোলমালে কোথায় একটু কাজ কমিয়া পড়িবে, তাহা না হইয়া যে কাজ ছিল, তাহার দ্বিগুণ হইয়া পড়িল। আগে ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত খাটিলেই চলিত; কিন্তু সাহেব সপরিবারে পূর্ব্বোল্লিখিত বারাকে স্থানান্তরিত হওয়ার পর, আমার কাজ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। রোজ রোজ বাসা হইতে যাওয়া আসা অসুবিধা বুঝিয়া সাহেব আমায় তাঁহার বারাকেরই একটী অংশ পরদা দিয়া ঘেরিয়া দিলেন; এখন হইতে আপিসেই আমারবাসা হইল।

বৈশাখ মাস কি জ্যৈষ্ঠমাস হইবে, মধ্যাহ্ণ সময়—রৌদ্র যেন ঝাঁঝা করিতেছে, চোখের সম্মুখের জিনিস গুলা যেন রোদে ঠিকরিয়া পড়িতেছে। গাছের পাতা গুলি স্থির ও নিস্তব্ধ। ডালের মধ্যে পাখীগুলিও চোখ্ বুজিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। আকাশে প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড-তেজ শুভ্র তুলারাশিবৎ মেঘখণ্ড মধ্যে আগুণের কণা ছড়াইতেছে। রাস্তায় ক্বচিৎ দুই চারিটা লোক, ভারবাহী পশু বা শকটের চক্রনির্ঘোষ। আমি নির্জ্জনে মাথা গুঁজিয়া আপনার সেই পরদা ঘেরা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বসিয়া কাজ লইয়া সেই মহা মধ্যাহ্নের বিরাট নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া রহিয়াছি।

এমন সময়ে সহসা বাহিরে একটা "ধর ধর" শব্দ উঠিল। জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, একটী হিন্দুস্থানী প্রাণপণে ছুটিতেছে আর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ১০।১২ জন সিপাহী। সিপাহীদের দৌড়াইতে দেখিয়া দুই চারিজন গোলন্দাজী গোরাও সেই সঙ্গে ছুটিতেছে।

লোকটাকে ধরিতে বেশীক্ষণ লাগিল না। যখন জনতাটা বড় বাড়িয়া উঠিল, তখন নীচে নামিতে ইচ্ছা হইল। বড় বড় সাহেবরা, মেম সাহেবরা বারান্দায়

দাঁড়াইয়া। ঘটনা কি—কেহই স্থির করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু গোরা ও সিপাহীকে সেই অবস্থায়—সেই রৌদ্রে সেই প্রকার দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখিয়া তাঁহারা অবশ্য বিস্মিত হইয়াছিলেন। আমার সাহেব চাপরাসী পাঠাইয়া দিলেন। সে শুনিয়া আসিল যে, লোকটা ৫৬নং দেশী পদাতিক দলের এক জন হাবিলদারের চাকর। ধস্তাধস্তির চোটে তাহার কাপড়ের ভিতর এক খানা পত্র পাওয়া গিয়াছে। সেই পত্রে ২নং লাইট অশ্বারোহী দলের প্রধান সিপাহীকে বিদ্রোহ সম্বন্ধে উত্তেজিত করা হইয়াছে।

যাহারা সেই অপরাধীকে ধরিল তাহারা ইংরাজের বিশ্বস্ত সিপাহী। সেই জন্যই তাহাদের সেই ছাউনার গোলন্দাজদের সঙ্গে পাহারা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই লোকটার প্রতি সন্দেহ হওয়ায়, তাহারা তাহাকে পীড়াপীড়ি করে। পীড়াপীড়ির চোটে সে দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে। তার পর সিপাহীরা ও সিপাহীদের দৌড়াইতে দেখিয়া গোরারা গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

ছাউনীর এড্‌জুটেণ্ট্‌ সাহেব সেই বারাকেই ছিলেন। চাকরটীকে বন্দী করিয়া তাঁহার কাছে আনা হইল। তিনি সেই পত্রাদি দেখিয়া লোকটীকে শক্ত পাহারাবন্দী করিয়া পত্র সমেত জেনারেল হুইলারের কাছে পাঠাইলেন।

পত্রে লেখকের নাম নাই। লেখা পারসীতে, দ্বিভাষীর দ্বারা তাহার অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ। লোকটাকে বেশী পীড়াপীড়ি ও ভয় দেখানতে সে তাহার প্রভুর নাম বলিয়া দিল। তাহার প্রভু "জানমহম্মদ" উক্ত পদাতিক দলের একজন হাবিলদার। জানমহম্মদ ২নং লাইট অশ্বারোহীদলের অধ্যক্ষকে "সাহেব লোক" দিগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন। ছয় নম্বরের প্রথম সংখ্যক গোলন্দাজদল—বিলাতী গোরা। জান সাহেব লিখিয়াছিলেন—"ভাই সকল সাবধান—ফিরিঙ্গি যে তোমাদের অত কাছে গোলন্দাজ রাখিয়াছে, তাহা কেবল তোমাদের শাসনের জন্য।"

জান মহম্মদের বিরুদ্ধে প্রমাণ যথেষ্ট ছিল। অন্য সময় হইলে—হয় ত তাহার অন্য প্রকার শাস্তি হইত। কিন্তু তখন বড় সঙ্কটাপন্ন কাল। কাজেই প্রাণ দণ্ড তাহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হইলেও—তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইল। পর দিন যদিও তাহার ফাঁসির দিন ধার্য্য হইয়াছিল কিন্তু পাছে সিপাহীরা উত্তেজিত হয়—এই ভয়ে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না।

২৪এ মে আসিল। এই দিন মহারাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়ার জন্ম দিন। কিন্তু এই দিনে যে সম্মান সূচক তোপধ্বনি হয়—তাহাও করা হইল না—পাছে সিপাহীরা কোন প্রকারে রুষ্ট বা সন্দেহ করে।

এই সময়ে আর একটী নূতন ঘটনা ঘটিল। বিঠুরের নানা সাহেব সর্ব্ব প্রথম, কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিলেন। নবাবগঞ্জে ইংরাজের একটী খাজনা খানা (Treasury) ছিল। নানা সাহেব স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই খাজনা খানা রক্ষার ভার লইলেন। নানা সাহেবের উপর ইংরাজ কর্ম্মচারীদের যে বিশেষ বিশ্বাস ছিল, তাহা এই ঘটনা হইতেই বিশেষ প্রমাণ

পাওয়া যায়। তিনি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদিগের সম্মতিক্রমে ৫০০ বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া সেই খাজনা খানায় ৮॥ সাড়ে আট লক্ষ টাকার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

নানা সাহেবকে আমরা পূর্ব্বেও দুই একবার দেখিয়াছি। তিনি বিঠুরেই থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে কানপুরে সহরের মধ্যে আসিয়াও দুই চারি মাস কাটাইতেন। একবার এক নাচের মজলিসে তাঁহার সেই বীরমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। কানপুরের বিখ্যাত সওদাগর নাথুদাসের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে যে মহা জাঁকজমক হয়, সে ক্ষেত্রেও নানা সাহেবকে দেখিয়াছি। তখন কে জানিত যে, সেই সৌম্য মূর্ত্তি নানা সাহেব হইতে ভবিষ্যতে অমন বীভৎস ও নৃশংস ঘটনা সূচিত হইবে!!

নানা সাহেবের বাহ্যিক চেহারা দেখিলে তিনি যে একজন তেজস্বী পুরুষ তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার শরীর অতি সুগঠিত, চক্ষুদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত গুম্ফ ও শ্মশ্রুতে সেই উজ্জ্বল শ্যাম মুখমণ্ডল সুশোভিত। বেশ ভূষায় তাঁহার বিশেষ জাক জমক ছিলনা। সোজা সুজি হিন্দুস্থানি বড় লোকেরা যেরূপ পোষাক পরেন, তাঁহারও সেইরূপ। তবে গলায় মতির মালা, মস্তকে উষ্ণীসাকৃতি মহারাষ্ট্রীয় পাগড়ি, কটিবন্ধে বাঘনখ ও কটিতটে বিশাল তরবারি দেখিলে তাঁহাকে সহজ ভদ্র লোক না ভাবিয়া একজন বীর পুরুষ বলিয়াই প্রতীতি হইত।

প্রভাত কুসুমের মনঃপ্রাণহারী সৌন্দর্য্য দেখিয়া কে কবে ভাবিয়াছে, তাহার মধ্যে কালকীট অবস্থান করিতেছে? আমাদের ন্যায় সহজ বুদ্ধি লোক দূরে থাক, কুট বুদ্ধি উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিরা পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত রহস্যোদ্ঘাটন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

নানা সাহেবের চিত্র ইংরাজি ইতিহাসে অতি কলঙ্কিত ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। যদি সিপাহীবিদ্রোহ না হইত, তাহা হইলে হয়ত তিনি নগণ্য হইয়াই পড়িয়া থাকিতেন। তাঁহার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে পবিত্র মহারাষ্ট্রীয় শোণিত প্রবাহিত ছিল কিন্তু তিনি জীবনে যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে পিশাচের উচ্চ আসন প্রদান করা হইয়াছে। আমি নানা ও তাঁহার সঙ্গীদের সম্বন্ধে যাহা জানি এক্ষণে তাহারই সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

নানা সাহেব—শেষ পেশওয়া বাজীরাওয়ের পোষ্যপুত্র। বাজীরাও অপুত্রক ছিলেন, জীবিতাবস্থায় নানাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বাজীরাওয়ের পুত্র সন্তান হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দুই কন্যা বর্ত্তমান ছিল।

বাজীরাও নানা সাহেবকে যে কেবল পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ নহে। সদাশিও রাও বলিয়া আর এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পুত্রকেও তিনি পোষ্যরূপে পালন করেন। বাজীরাওয়ের দুই পুত্রেরা যথাক্রমে, ধুন্দুপন্ত নানা সাহেব ও সদাশিব রাও দাদা সাহেব বলিয়া কথিত হইতেন।

দাদা সাহেব যৌবনের প্রারম্ভেই ইহলোক ত্যাগ করেন। বাজীরাও তাঁহার স্থলে, নানার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালা সাহেবকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন। দাদা সাহেব অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং তিনি পোষ্যপুত্র-বধূর জন্য নানার এক ভ্রাতুষ্পুত্র—রাও সাহেবকে তাঁহার

পোষ্যপুত্র করিয়া দেন। এই পোষ্য-পুত্র সম্পর্কে রাও সাহেব পেশোয়া বাজীরাওয়ের পৌত্র ও নানা ও বালা সাহেবের ভ্রাতষ্পুত্র হইলেন।

বাজীরাওয়ের সহিত ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেকগুলি সংঘর্ষন ঘটে। পরিশেষে সন্ধি দ্বারা এই স্থির হয়, ইংরাজ কোম্পানী তাঁহাকে বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা মাসহারা দিবেন। এই সময় হইতে তাঁহার সমগ্র রাজ্য ইংরাজ শাসনাধীনে আইসে। বাজীরাও পুনা ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে বিঠুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বিঠুর কানপুর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে। বাজীরাও ৩৫ বৎসর এই বিঠুরে বাস করিয়া (১৮৫১ খৃঃ অব্দের ২৮ শে জানুয়ারি) নানা সাহেবকে তাঁহার এক মাত্র উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারণ করিয়া বিঠুরের ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার যে সমস্ত ভূসম্পত্তি ও ধন রত্নাদি ছিল তাহার দানপত্র করিয়া দিয়া পরলোক গমন করেন।

বাজীরাওয়ের মৃত্যু সংবাদ যখন তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর কর্ণে পৌছিল, তখন তিনি সরকারী কাগজে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা বাজীরাওয়ের আট লক্ষ টাকা মাসহারা বন্ধের কথা সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিলেন। নানা সাহেব এই ঘোষণা পত্র দেখিয়া মর্ম্মাহত ও সম্পূর্ণরূপে বিচালত হইয়া উঠিলেন। তিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তৎকালীন শাসনকর্ত্তার নিকট ঐ আট লক্ষ টাকার জন্য দাবী করিয়া এক প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহার উত্তর আসিল নানা সাহেব উক্ত আট লক্ষ টাকা পাইবেন না বটে কিন্তু তাঁহার নিজের সম্পত্তি স্বরূপে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কতকগুলি ভূসম্পত্তি প্রদান করিবেন।

বলাবাহুল্য নানা এই প্রস্তাবে বিশেষ প্রফুল্লিত হইলেন না। কোথায় বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা আয় আর কোথায় সামান্য ভূসম্পত্তি। তাঁহার মনের মধ্যে তখন ভীষণ অগ্নি জ্বলিতে ছিল। তিনি ১৮৫২ অব্দে ডিসেম্বর মাসে বিলাতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টার দিগের নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। একবৎসর পরে, এই দরখাস্তের উত্তর আসে যে, নানা সাহেব উক্ত আট লক্ষ টাকা পাইবেন না।

আজিমুল্লা খাঁ নামক নানার এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। এব্যক্তি ভবিষ্যতে নানার সহায়তা করিয়া ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে চিত্রিত হইয়াছেন। নানা এই আজিমুল্লাকে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে বিলাতে তাঁহার উকীল স্বরূপে প্রেরণ করেন। কিন্তু আজিমুল্লাও অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর বিফল মনোরথ হইয়া হৃদয়ে প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

আজিমুল্লা প্রথমে অতি দরিদ্র ছিলেন। ১৮৩৭—৩৮ অব্দে উত্তরপশ্চিমে এক দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষে আজিমুল্লা অন্নাভাবে পিতামাতা কর্ত্তৃক পথে পরিত্যক্ত হন। আজিমুল্লার মাতাকে একজন পাদরি সাহেব খোকাকীর লোভ দেখাইয়া আলোকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দরিদ্রা হইলেও তাঁহার মনে মুসলমান ধর্ম্মানুরাগ বিশেষ রূপে প্রবল ছিল। সুতরাং আজিমুল্লার মাতার খ্রীষ্টান হওয়া হইল না।

পেটল বলিয়া এক সাহেবের এক স্কুল ছিল। পথ পরিত্যক্ত বালক আজিম, সাহেবের সহায়তায় সেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া বিনা বেতনে পড়িতে লাগিল। ইহার উপর আবার তাহার তিন টাকা

করিয়া বৃত্তি বরাদ্দ হইল। তাহার বৃদ্ধা মাতা, এক সাহেবের বাটীতে আয়ার কাজ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। দশ বৎসর পরে আজিমুল্লা কানপুরের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এই বিদ্যালয় হইতেই আজিমুল্লার উন্নতির সূত্রপাত হইল। বিগেডিয়ার স্কট নামক একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ এই সময়ে তাঁহাকে নিজের মুন্সী রূপে গ্রহণ করেন। পরে আজিম কার্য্যদক্ষতার গুণে Hon'ble Ashburnham সাহেবের মুন্সী নিযুক্ত হন। এই খানেই আজিমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। পদমর্য্যাদার উপেক্ষা করিয়া তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিতে ও নানা প্রকারে অসৎ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন; সাহেব তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। ইহার পর আজিম নানা সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

নানা ও আজিমের সংমিশ্রনের প্রথম ফল—আজিমের বিলাত গমন। তাহার পরিণাম পাঠক জানিতে পারিয়াছেন। এখন আজিমুল্লা দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিহিংসা জর্জ্জরিত নানার প্রধান মন্ত্রনাদাতা হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাঁদের মিলনের পরিণাম কিরূপ ভয়ানক ফলসপ্রসব করিয়াছিল, পাঠক, পরে তাহার পরিচয় পাইবেন।

আমরা যে সময়ে নানাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার বয়স, ৩৫ হইতে ৪০এর মধ্যে অমন জোয়ান চেহারার হিন্দুস্থানী খুব অল্পই আমার চক্ষে পড়িয়াছে। তাঁহার গোলাকার মুখমণ্ডল, কুঞ্চিত গুম্ফ, স্থূল ও বলিষ্ঠ দেহ আজও আমার মনে পড়িতেছে। নানা এই সময়ে বিঠুরে গঙ্গাতীরে এক ক্ষুদ্র প্রাসাদে বাস করিতেন।

এই স্থানকে তিনি, দেবালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা দ্বারা, একটী ক্ষুদ্র রাজপুরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগত বহুসংখ্যক মারহাট্টা দেশ ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহার চারিদিকে বসবাস করিতেছিল।

বিঠুরের বাড়ীতে থাকিতেন বালাবাও, বাপভাট, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আজিমুল্লা ও বিশ্বস্ত সহচর—তাঁতিয়া তোপী। ইহারা কয়জনেই ভবিষ্যতে যে মহানৃশংস, লোমহর্ষক কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা শোণিতাক্ষরে ভারত ইতিহাসের কয়েকটী পৃষ্ঠায় জ্বলন্তরূপে লিখিত রহিয়াছে।

নানার মনে যাহাই থাকুক না কেন, মনে মনে তিনি যতদূর ইংরাজের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হউন না কেন, প্রকাশ্যে তিনি উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা দেখাইয়া চলিতেন। মাঝে মাঝে বড় বড় সাহেব ও মেমকে নিমন্ত্রণ করিয়া বড় বড় ভোজ দিতেন। নাচ গান, আমোদ প্রমোদের উত্তেজিত তরঙ্গস্রোতে হৃদয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে ধূমায়িত প্রতিহিংসা-অগ্নি চাপিয়া রাখিতেন। সাহেবরা নানা সাহেবের ব্যবহারে তাঁহার মনের ভিতর যে প্রতিহিংসা জাগিতেছে তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বত্র নানার সহৃদয়তা, অমায়িকতা, সামাজিকতা ও ইংরাজ-প্রিয়তা গুণের শত মুখে প্রশংসা করিয়া প্রফুল্লিত হইতেন।

ক্রমশঃ—

আয়ুর্ব্বেদ।

রাজযক্ষ্মা চিকিৎসা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

মধুতাপ্য বিড়ঙ্গাশ্ম জতু লৌহ ঘৃতাভয়াঃ
ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণ মত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনা।

যক্ষ্মারিলৌহ—স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু, হরিতকী চূর্ণ ও লৌহ এই সমুদায় ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া অবলেহ করিলে উৎকট যক্ষ্মা নিবারিত হয়। নিম্নলিখিত যোগটী প্রয়োগ করিয়া বহুস্থলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করা গিয়াছে।

বিন্ধবাসিযোগ—ত্রিকটু, শতমূলী, ত্রিফলা, বলা ও নাগবলা, প্রত্যেক ১ তোলা ও লৌহ ৯ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া লইবে। ৵০ আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহ অবলেহ করিলে অথবা সেবন করিলে উরঃক্ষত, কণ্ঠক্ষত ও কণ্ঠগত অপর রোগ, রাজযক্ষ্মা ও বাহুস্তম্ভাদি পীড়া নিশ্চয় প্রশমিত হয় ও শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ হয়, কারণ লৌহ অতিশয় রক্ত পরিষ্কারক ও বলকারক।

রাস্না তালীশ কর্পূর ভেকপর্ণী শিলাহ্বয়ৈঃ।
ত্রিক ত্রয় সমাযুক্তৈ র্লৌহো যক্ষ্মান্তকোমতঃ॥
সর্ব্বোপদ্রব সংযুক্ত মপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্।
হন্তি কাসং স্বরাঘাতং ক্ষয়কাসং ক্ষতক্ষয়ম্॥
বল বর্ণাগ্নিপুষ্টীনাং সাধনো দোষনাশনঃ।

যক্ষ্মান্তক লৌহ—রাস্না, তালীশপত্র, কর্পূর, থুলকুড়ি, শিলাজতু, ত্রিফলা (হরিতকী আমলকী ও বহেড়া) ও ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল,) প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ অর্থাৎ অন্য সকল দ্রব্য মিলাইলে যত হয়, তত পরিমাণ লৌহ, একত্র জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি প্রমাণে বটী করিবে। প্রাতে ১টী মধু দিয়া মাড়িয়া বাসকপত্র রস বা অপর কোন উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে কাস, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়কাস ও ক্ষতক্ষীণ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় এবং বল বর্ণ পুষ্টি ও পাচক অগ্নির বৃদ্ধি হয়। ইহা যক্ষ্মা রোগের সুপ্রসিদ্ধ মহৌষধ।

ত্রিকটু ত্রিফলৈলাভি র্জাতিফল লবঙ্গকৈঃ।
নবভাগান্বিতং লৌহং সমং সিন্দূরসন্নিভম্॥
ছাগী দুগ্ধেন সংপিষ্য বল্লমস্য প্রযোজয়েৎ।
মধুনা ক্ষয়রোগাংশ্চ হন্ত্যয়ং ক্ষয়কেশরী॥

ক্ষয়কেশরী—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা লৌহ ৯ তোলা, একত্র ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কণ্টকারীর কাথ ও মধু কিম্বা কেবল মধু। ইহা সেবনে ক্ষয়রোগ নিবারণ হয়।

কর্ষং শুদ্ধ রসেন্দ্রস্য স্বরসেন জয়ার্দ্রয়োঃ।
শিলায়াং ধর্ষয়েত্তাবদ্ যাবৎ পিণ্ডং ঘনং ভবেৎ॥
জলকর্ণাকাকমাচী রসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ।
সৌগন্ধিক পলং স্বচ্ছ স্বরসেন সুভাবিতম্॥

চূর্ণিতং রস সংযুক্ত মজাক্ষীর পলদ্বয়ে।
খল্লিতং ঘনপিণ্ডস্ত গুড়ীঃ স্বিন্নকলায়বৎ ॥
কৃত্বাদৌ শিবমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ।
জীর্ণান্নো ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীবমাংসবসারনঃ ॥
সর্ব্বরূপং ক্ষয়ং কাসং রক্তপিত্তমবোচকম্।
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্ত মম্লপিত্তং নিযচ্ছাত ॥

রসেন্দ্রগুড়িকা—ইষ্টক চূর্ণাদি দ্বারা শোধিত ও মর্দ্দিত রস (পারদ) ২ তোলা জয়ন্তী ও আদাব রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডবৎ গোলাকৃতি করিবে, পরে উহা জলকর্ণা ও কাকমাচীব রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজেব রসে ভাবিত নবনীতাখ্য গন্ধক চূর্ণ ৮ তোলা, ঐ পারদের সহিত মাড়িয়া কর্জ্জলী করিবে, অনন্তর ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা ঐ কজ্জলীর সহিত মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ মটরের ন্যায় গুড়িকা করিবে। অনুপান মধু ও ছাগদুগ্ধ কিম্বা বাসক পত্ররস। এই মহৌষধ সেবন করিলে, ক্ষয়, কাস, রক্তপিত্ত, অরুচি ও অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

মুক্তা শঙ্খ প্রবালানি বঙ্গঞ্চৈব সমাংশকম্।
নিম্ব ক্বাথেন সংমর্দ্দ্য ততো গজপুটে পচেৎ ॥
সর্ব্বতুল্য তুগাক্ষীরী দরদং তৎকলাংশিকম্।
এতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ পিপ্পলী মধু সংযুতম্ ॥
রক্তিদ্বয়ং প্রদাতব্যং কৃচ্ছ্ররোগ প্রশান্তয়ে।
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং যক্ষ্মাণং শ্বাস মেবচ ॥
স্বরভেদং জ্বরং মেহান্ দোষত্রয় সমুত্থিতান্।
মৃগাঙ্ক চূর্ণ মেতদ্ধি কাসরোগ কুলান্তকৃৎ ॥

মৃগাঙ্ক চূর্ণ—মুক্তা, শঙ্খ, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া নিমের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া গজ পুটে পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে সর্ব্বতুল্য বংশলোচন এবং বংশলোচনের ষোড়শাংশ শোধিত হিঙ্গুল মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ২ হইতে ৪ রতি মাত্রায় পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে কষ্ট সাধ্য ক্ষয়, কাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, স্বরভেদ, জ্বর ও মেহরোগ আশু নিবারিত হয়। ইহা কাস রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

রসভস্মত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃত তাম্রস্য ভাগৈকং শিলা তালক গন্ধকম্ ॥
প্রতিভাগদ্বয়ং তত্রাপ্যেকীকৃত্য নিধাপয়েৎ।
বরাটীঃ পূরযেত্তেন চাজাক্ষীরেণ টঙ্গনম্ ॥
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদ্ভাণ্ডেন নিরোধয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্ ॥
রসো রাজমৃগাঙ্কোহয়ং চতুর্গুঞ্জঃ ক্ষযাপহম্।
দশ পিপ্পলিকৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্মাবচৈকোন বিংশতিঃ ॥
সঘৃতৈর্দাপয়েদ্বাত পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবে ক্ষয়ে।

রাজ মৃগাঙ্করস—পারদ ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া। বড় বড় কড়ির মধ্যে পূরিবে, পরে ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কড়ি সকলের মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃদ্ভাণ্ডে স্থাপিত ও মুখে মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিবে, লেপ শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক করিবে ও শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ২ হইতে ৪ রতি পর্য্যন্ত। অনুপান ঘৃত ও মধু। পিপুল চূর্ণ মধু কিম্বা মরিচ চূর্ণ মধুর সহিতও সেবন করা যাইতে পারে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্ষয় রোগ নিবারিত হয়।

রসং বজ্রং হেম তারং নাগং লৌহঞ্চ তাম্রকম্।
তুল্যাংশং মারিতং যোজ্যং মুক্তা মাক্ষিক বিদ্রুমম্ ॥
শঙ্খঞ্চ তুল্য তুল্যাংশং সপ্তাহং চার্দ্রক দ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ তেন পূর্য্যা বরাটিকাঃ ॥
টঙ্গনং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা মুখঞ্চ বন্ধয়েৎ।
মৃদ্ভাণ্ডে তং নিরুদ্ধ্যাথ সম্যগ্ গজপুটে পচেৎ ॥
আদায় চূর্ণয়েৎ সর্ব্বং নিগুণ্ড্যাঃ সপ্ত ভাবনাঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ সপ্ত চিত্রকস্যৈকবিংশতিঃ ॥

ত্রবৈর্ভাব্যং ততঃ শোষ্যং দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
যক্ষ্মা রোগং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥
যোজয়েৎ পিপ্পলীক্ষৌদ্রৈঃ সঘৃতৈ র্মরিচৈ স্তথা।
মহারোগাষ্টকে কাসে জ্বরে শ্বাসেঽতিসারকে॥
পোট্টলী রত্নগর্ভোঽয়ং যোগবাহেন যোজয়েৎ।
বাতব্যাধ্যশ্মরী কুষ্ঠ মেহোদর ভগন্দরাঃ॥
অর্শাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

রত্নগর্ভপোট্টলিরস—রসসিন্দূর, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণ মাক্ষিক, প্রবাল ও শঙ্খ ভস্ম, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া আদার রসে ৭ দিন মাড়িয়া ও চূর্ণ করিয়া কড়ির ভিতর পুরিবে এবং কিঞ্চিৎ সোহাগা আকন্দের আঁটায় পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কড়ির মুখ রুদ্ধ করিয়া এবং মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাখিয়া ও ভাণ্ড আবৃত ও লিপ্ত করিয়া যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে এবং নিশিন্দার রসে ৭ বার ও চিতার রসে ২১-বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। ২ রতি হইতে ৪ রতি পর্য্যন্ত ইহার মাত্রা। পিপুল চূর্ণ মধু অথবা ঘৃত ও মরিচ চূর্ণের সহিত সেব্য। এই পরম কল্যাণকর মহৌষধ সেবন করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য যক্ষ্মা, অষ্টবিধ মহারোগ ও জ্বরাদি আরোগ্য হয়। এই তেজস্কর ঔষধ সেবনে শরীর সবল ও ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যাদি দূরীভূত হয়।

বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদর রোগ, ভগন্দর, অর্শঃ ও গ্রহণী এই আটটী রোগকে মহারোগ বলে।

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহ মভ্রকম্।
বিদ্রুমং মৃত বৈক্রান্তং তারং তাম্রঞ্চ বঙ্গকম্॥
কস্তুরিকা লবঙ্গঞ্চ জাতীকোষৈলবালুকম্।
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্যং প্রযত্নতঃ॥
কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্যং কেশরাজ রসেন চ।
অজাক্ষীরেণ সংভাব্যং প্রত্যেকং দিবস ত্রয়ম্॥
চতুর্গুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
নানারোগ প্রশমনং সর্ব্বোপদ্রব সংযুতম্॥
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং যক্ষ্মাণং শ্বাসমেব চ।
প্রমেহান্ বিংশতিশ্চৈব দোষত্রয় সমুত্থিতান্॥
সর্ব্বান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্কর স্তিমিরং যথা।

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র. রঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলবালুক এই সমুদয় সমভাগে একত্র মাড়িয়া ঘৃতকুমারীর রসে, কেশুরিয়ার রসে ও ছাগদুগ্ধে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

মহাচন্দনাদি তৈল—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ রক্তচন্দন, শালপানি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, মুগানী ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, মাষাণী, আমলা, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, সরল কাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভাদুলে, মূর্ব্বামূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, মৃণাল ও পদ্মমূল মিলিত ৫০ পল, শ্বেত বেড়েলা ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। ছাগ দুগ্ধ, শতমূলীর রস, লাক্ষার জল বা ক্বাথ, কাঁজি ও দধির মাত প্রত্যেক ১৬ সের। হরিণ, ছাগ ও শশক প্রত্যেকের মাংস ৮ সের ও প্রত্যেকের পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথের সহিত পৃথক্ পৃথক্ পাক করিবে। কল্কার্থ শ্বেত চন্দন, অগুরু, কাকলা, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্. মৃণাল,

হরিদ্রা, দারু, হরিদ্রা, শ্যামলতা, অনন্ত-মূল, রক্তোৎপল, তগরপাদুকা, কুড়, ত্রিফলা, পরুষ ফল, মূর্ব্বামূল, গেঁটেলা, নালুকা, দেবদারু, সরল কাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, রসোত, মুতা, শিলারস, বচ, মাঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মৌরী, জীবন্তী, পিয়ঙ্গু, শটী, এলাইচ, কুঙ্কুম, খাটাশী, পদ্মকেশর, রাস্না, জয়িত্রী, শুঁঠ ও ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা। মাঞ্জিষ্ঠা, চোরকাচকী, দেবদারু, সরল-কাষ্ঠ, ব্যাঘ্রী, বচ, গুবাকবৃক্ষের ছাল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, গন্ধতৃণ, শটী, হরি-তকী, বহেড়া, আমলা, মুতা, জটা-মাংসী, দনা, চম্পক পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, গুড়-ত্বক্, গেঁটেলা, বালা, কুড়, মরুবক পুষ্প, পিড়িংশাক, গন্ধবিরজা, বুন্দুবধোটা, নখা, নালুকা, গুল্‌ফা, এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতাপুষ্প, খাটাশী, কাকলা, অগুরু, লতাকস্তুরী, কুঙ্কুম, মৃগনাভি ও কর্পূর যথারীতি এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা গন্ধপাক শেষ করিবে। গন্ধদ্রব্যের মধ্যে কুঙ্কুম, মৃগনাভি ও কর্পূর এই কয়েকটী দ্রব্য তৈল নামাইয়া ছাকিয়া শেষে মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দনে অত্যুগ্র রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়, রক্তপিত্ত ও শ্বাস প্রভৃতি নানাবিধ বাত-পিত্ত প্রকোপ জনিত পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা অতিশয় বৃষ্য ও কান্তি পুষ্টি-জনক। ইহার সুধাময় ফল অনেকস্থলে লাভ করা গিয়াছে।

অমৃতাহ্বারিষ্ট—বিশল্যকরণীর স্বরস ও মৃতসঞ্জীবনী সুরা প্রত্যেক ১ পল (৮ তোলা) পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকা দ্বারা মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। এক সপ্তাহ পরে স্থূল বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। শীতল জলের সহিত আবশ্যকমত প্রতি প্রহরে সেবন করিবে। বিবেচনা করিয়া ৫ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত মাত্রা স্থির করিবে। ইহা সেবনে উরঃক্ষত, রক্ত-পিত্ত, ক্ষয়কাস, রক্তাতিসার, রাজযক্ষ্মা, অর্শঃ ও রক্তপ্রদরাদি প্রশমিত হয়।

দ্রাক্ষারিষ্ট—দ্রাক্ষা ৬।০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই কাথে ২৫ সের গুড় গুলিয়া তাহাতে গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিঁপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ ও আলোড়ন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে একমাস এবং মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং পরে উহা ছাঁকিয়া লইবে। দ্রাক্ষারিষ্ট পানে উরঃক্ষত, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস ও গল-রোগ সমস্ত নিবারিত ও মল শুদ্ধি হইয়া দেহের বল, বর্ণ ও কান্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। মাত্রা ১ হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।

গর্ভোৎপত্তি ক্রমঃ।

অতুল্য গোত্রস্য রজঃ ক্ষয়ান্তে
রহো বিসৃষ্টং মিথুনীকৃতস্য।
কিং স্যাচ্চতুষ্পাৎ প্রভবঞ্চ ষড়্ভ্যো
যৎ স্ত্রীষু গর্ভত্বমুপৈতি পুংসঃ ॥
শুক্রং তদস্য প্রবদান্তু ধীরাঃ
যদ্ধীয়তে গর্ভ সমুদ্ভবায়।
বায়্বগ্নি ভূম্যব্‌গুণ পাদবত্তং
ষড়্ভ্যো রসেভ্যঃ প্রভবশ্চ তস্য ॥

মহর্ষি অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! রজঃ ক্ষয় অর্থাৎ রজঃ প্রবৃত্তির তিন দিবস পরে ষোড়শ দিবসের মধ্যে

অতুল্য গোত্র মৈথুনাসক্ত পুরুষের চতুর্ভূতাত্মক ও ষড়্‌রস সমুদ্ভব যে পদার্থ স্ত্রীতে গর্ভরূপে পরিণত হয় উহা কি ? অগ্নিবেশের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান পুনর্ব্বসু বলিলেন, যে পদার্থ স্ত্রীতে সমাহিত হইয়া গর্ভ উৎপাদন করে, পণ্ডিতগণ উহাকে শুক্র বলিয়া থাকেন। ঐ শুক্রে বায়ু, অগ্নি, ভূমি ও জল এই চারিটী মহাভূতের অংশ বিদ্যমান থাকে এবং উহা মধুরাদি ষড়্‌রস হইতে উৎপন্ন।

অগ্নিবেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! কিরূপে সুখে অর্থাৎ নিরুপদ্রবে গর্ভের উৎপত্তি ও ঐ গর্ভ পরিবর্দ্ধিত হয় ও কোন কোন অবন্ধ্যা স্ত্রীই বা কি জন্য বিলম্বে গর্ভধারণ করে এবং কি জন্যই বা কোন কোন গর্ভের উৎপত্তি হইয়াও বিনাশ হয়। ভগবান্ পুনর্ব্বসু উত্তর করিলেন, বৎস! যে গর্ভের শুক্র শোণিত, আত্মা, আশয় অর্থাৎ ভ্রূণোৎপত্তি স্থান (জরায়ু ক্ষেত্র) এবং কাল এই সমুদায় দোষ বর্জ্জিত হয়, গর্ভিণীর আহার বিহার বিষয়ে যদি কোন দোষ না থাকে, তবে সেই অদুষ্ট শুক্র শোণিত সম্ভূত গর্ভ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বায়ব সম্পন্ন হইয়া যথাকালে সুখে প্রসূত হয়। আর সপ্রজা অর্থাৎ অবন্ধ্যা স্ত্রী ও যোনি বা জরায়ুর দোষ, মানসিক বিবিধ অশান্তি বা ক্লেশ, শুক্র বা শোণিত দুষ্টি, আহার বিহারাদির অত্যাচার, অকাল যোগ কিম্বা ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা দৈহিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কারণে কাল বিলম্বে গর্ভ ধারণ করে। গর্ভস্রাবের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, উহার মধ্যে একটী রহস্য আছে, শ্রবণ কর। রুক্ষান্ন পানাদি দ্বারা গর্ভাশয়স্থ বায়ু প্রকুপিত হইয়া কোন কোন স্ত্রীর ঋতু শোণিত নিরোধ করে ও নিঃসৃত হইতে দেয় না, এবং অবিকল গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ করে। অজ্ঞ ব্যক্তি সকল উহাকে প্রকৃত গর্ভ বলিয়া মনে করে, কিন্তু কিছু দিন পরে ঐ শোণিত সঞ্চিত হওয়াতে যখন অধিক হয়, তখন রক্তস্রাব হইতে থাকে কিম্বা অধিক সঞ্চিত না হইলেও অগ্নি বা সূর্য্যাতাপ, অধিক শ্রম, ক্রোধ, শোক, কোন পীড়া, অথবা উষ্ণ অন্নপান দ্বারা যখন পরিস্রুত হইতে থাকে, তখন উহা দেখিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সকল মনে করে যে, ইহা ভৌতিক ব্যাপার। অর্থাৎ পিশাচ আদি কর্ত্তৃক গর্ভ অপহৃত হইয়াছে। বাস্তবিক ওরূপ কল্পনা অলীক, যদি পিশাচাদি কর্ত্তৃক ঐরূপ গর্ভ হরণ যুক্তিসঙ্গত হইত, তবে পিশাচেরা গর্ভ ত্যাগ করিয়া জননীর ওজঃ কেন অপহরণ করে না ? যেহেতু ওজোধাতুর অপহরণই রাত্রিচরদিগের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। ফলতঃ এইরূপ ব্যাপারকে ভৌতিক মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

অগ্নিবেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! কি জন্য কন্যা, কি জন্য পুত্র, কি জন্য যমজ, কিজন্য যমজের একটী পুত্র ও অপরটী কন্যা, কি জন্য এককালে বহু সন্তান, কি জন্য বিলম্বে প্রসব এবং কি জন্যই বা যমজ সন্তান দুইটীর মধ্যে একটী হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও অপর ক্ষীণাঙ্গ হয় ?

আত্রেয় কহিলেন যদি বীজ অর্থাৎ মিলিত শুক্র শোণিতে রক্তের ভাগ অধিক হয়, তবে কন্যা এবং শুক্রের ভাগ অধিক হইলে পুত্র জন্মে। বায়ু কুপিত হইয়া বীজকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে যমজ সন্তান হয়, ঐ দ্বিধা বিভক্ত বীজের কোন ভাগে যদি রক্তের ভাগ অধিক

হয়, তবে সেই ভাগে কন্যা ও অপর যে ভাগে শুক্রের ভাগ অধিক থাকে সেই ভাগে পুত্র জন্মে। আর দ্বিধা বিভক্ত বীজের দুই ভাগেই যদি রক্ত বা শুক্রের ভাগ অধিক হয়, তবে দুইটাই কন্যা বা পুত্র জন্মে। অতি প্রবৃদ্ধ বায়ু যখন ঐ বীজকে বহুধা বিভক্ত করে, তখন গর্ভিণী বহু সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। প্রকুপিত বায়ু কর্ত্তৃক যদি বীজ বিষমাংশে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ এক অংশে অধিক ও অপর অংশে বীজ অল্প হয় তবে প্রসূত সন্তান দ্বয়ের মধ্যে একটী পরিপুষ্টাঙ্গ ও অপরটী ক্ষীণাঙ্গ হয়। আর গর্ভিণী যদি যথোপযুক্ত আহার প্রাপ্ত না হয় এবং কোন ধাতুর ক্ষয় বা অধিক স্রাব হয়, তবে গর্ভ শুষ্ক হয়, পুষ্টিলাভ করিতে পারে না সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়াও কোন কোন গর্ভিণী প্রসব করিয়া থাকে।

অতঃপর নপুংসকাদির জন্ম কারণ বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। উল্লিখিত বীজে যদি শুক্র ও শোণিতের ভাগ সমান হয়, তবে স্ত্রীচিহ্ন বা পুরুষ চিহ্ন বিশিষ্ট সন্তান জন্মে। বায়ু কুপিত হইয়া গর্ভস্থ প্রাণীর শুক্রাশয় নষ্ট করিলে ঐ প্রাণী পবনেন্দ্রিয় হয়। বায়ু কর্ত্তৃক গর্ভস্থ প্রাণীর শুক্রাশয়দ্বার বিঘটিত হইলে সংস্কারবাহী উৎপন্ন হয়। যদি পিতা মাতা হীন-বীজ বা অল্প বীজ-বিশিষ্ট, দুর্ব্বল ও অহর্ষ অর্থাৎ মৈথুনে অল্প হর্ষ-বিশিষ্ট হয়, তবে সেই পুত্র বা কন্যা নরষণ্ড বা নারীষণ্ড হয়। মাতার মৈথুন কার্য্যে অনিচ্ছা ও পিতার বীজের দৌর্ব্বল্য হেতু বক্র সন্তান সম্ভূত হয়। পিতা মাতা ঈর্য্যাভিভূত বা মৈথুনে মন্দহর্ষ থাকিলে সন্তান ঈর্ষ্যা পরতন্ত্র হয়। যে পুরুষের কোষ দ্বয় বায়ু ও অগ্নি দোষে নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে বাতিক ষণ্ড বলে।

শুক্র শোণিতজীব সংযোগে তু খলু কুক্ষিগতে গর্ভ সংজ্ঞা ভবতি।

শুক্র, শোণিত ও জীব কুক্ষিগত হইয়া সংযুক্ত হইলে তাহাকেই গর্ভ বলা যায়। ফলতঃ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি এই সমুদায়ের বিকৃতিই গর্ভ। এই গর্ভই চেতনার অধিষ্ঠান। এই চেতনা গর্ভের ষষ্ঠ ধাতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে স্ত্রীদিগের অনেক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যৌবনে স্ত্রীদিগের স্তনদ্বয় পীনোন্নত, যোনি বিকশিত ও বস্তিদেশ লোম সমূহ দ্বারা সমন্তাৎ পরিব্যাপ্ত হয়। জরায়ু কোষ হইতে তনু (পাতলা, গাঢ় নহে) ও স্বচ্ছ রক্ত নিঃসৃত হয়, ঐ রক্তকে আর্ত্তব বা পুষ্প বলে, চলিত কথায় উহাকে স্ত্রী স্বও বলা হইয়া থাকে। প্রতি মাসে একবার করিয়া ঐ রক্তস্রাব হয়। ঐ রক্ত যদি শশ রক্ত সদৃশ বা লাক্ষা জল সদৃশ হয়, বস্ত্রাদিতে লাগিলে দাগ না পড়ে, তবে উহা নির্দ্দোষ বলিয়া স্থির করিবে। ঐ রজঃ প্রবৃত্তি ৪।৫ দিন স্থায়ী হয়। এই সমুদায় নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে রজোদুষ্টি স্থির করিতে হইবে। রোগ শোক বর্জ্জিত পরিপুষ্টাঙ্গী স্ত্রীদিগের প্রায় দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম হইতে এই রজঃ প্রবৃত্তি হইতে থাকে এবং পঞ্চাশ বৎসরের পর নিবৃত্তি হইয়া যায়। শরীর সুস্থ না থাকিলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও রজোনিবৃত্তি হইতে দেখা যায়।

রজঃ প্রবৃত্তির প্রথম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত সময়কে ঋতুকাল বলা যায়। এই কালই গর্ভ গ্রহণের উপযুক্ত কাল। স্ত্রীদিগের প্রকৃতি ভেদে ঋতুকালের ও অন্যথা হয়, অর্থাৎ কোন কোন স্ত্রীর ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভ গ্রহণ শক্তি থাকে না। সূর্য্য অস্তগত হইলে পদ্মিনী যেরূপ মুদ্রিত হয়, সেইরূপ ঋতুকাল অতীত হইলেও নারীদিগের জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া যায়, গর্ভ গ্রহণে ঐ সময়ে আর শক্তি থাকে না। ঋতুকালে স্ত্রীগণ অপেক্ষাকৃত সম্ভোগাভিলাষিণী হইয়া থাকে, ঐ সময়ই প্রকৃত রতি-কাল। মরুক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় অন্য সময়ের শৃঙ্গার নিরর্থক।

পুরুষাভিলাষিণী কামাতুরা ব্যাধিহীনা স্ত্রীর সহিত সঞ্জাত হর্ষ, ব্যাধিহীন রতিজ্ঞ পুরুষের ঋতুকালে যে সংসর্গ সংঘটিত হয়, উহাতেই অপত্যোৎপাদন ইচ্ছা ফলবতী হইয়া থাকে। সম্যক্ কৃষ্ট জলসিক্ত উপযুক্ত গুণ সম্পন্ন ক্ষেত্রে যথাসময়ে নির্দোষ বীজ বপন করিলে যেমন তাহা হইতে নিশ্চয়ই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অদোষ যোনিতে যথা সময়ে অদোষ শুক্র আহিত হইলে গর্ভোৎপত্তি অবশ্যই হইয়া থাকে।

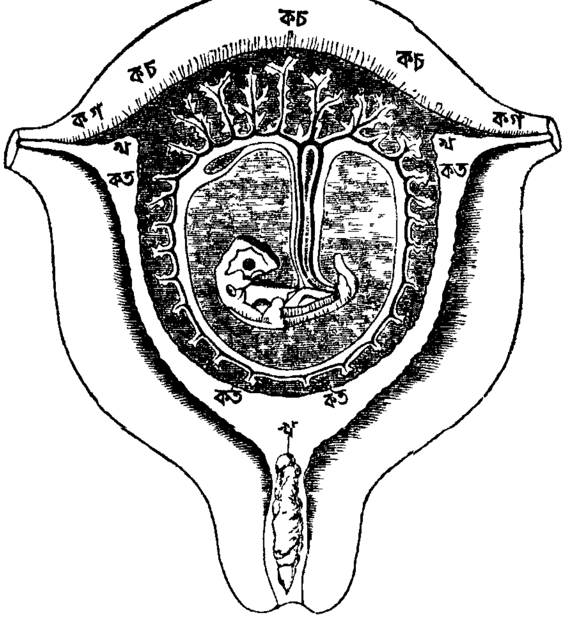
রতিক্রিয়া দ্বারা পুরুষের বীর্য্য স্খলিত হইয়া অতি বেগে প্রথমতঃ নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে, অনন্তর তথা হইতে ডিম্বাশয়ে গমন করিয়া রূপান্তরিত হয়। পরে ডিম্ব ও শুক্র একীভূত হইয়া জরায়ুতে উপস্থিত ও একটী আবরণী দ্বারা আবৃত হইয়া নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। জীব প্রথমতঃ নারীর জরায়ুতে শ্লেষ্মার ন্যায় বিন্দু বিন্দু হইয়া অবস্থিতি করে। এই সময়ে ইহার কোন বিগ্রহ ব্যক্ত থাকে না। দ্বিতীয় মাসে গর্ভ অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয় এবং পিণ্ড, পেশী বা অর্ব্বুদের আকার ধারণ করে। যদি ঐ গাঢ় পদার্থ পিণ্ড হয়, তবে পুরুষ, পেশী হইলে কন্যা ও অর্ব্বুদ হইলে নপুংসক উৎপন্ন হয়। তৃতীয় মাসে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও সমস্ত অঙ্গাবয়ব এককালে উৎপন্ন হয়। এই অঙ্গাবয়বের মধ্যে কতকগুলি মাতৃজ ও কতকগুলি পিতৃজ।

গর্ভের অঙ্গাবয়ব সমুদয় মাতা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইলেও পঞ্চ মহাভূতের বিকার মাত্র, কারণ জীবদেহ পঞ্চ ভূতাত্মক। ক্রমশঃ কোন মহাভূত হইতে কি উৎপন্ন হইতেছে, বিবৃত করিব। শব্দ, শ্রোত্র, লঘুতা, সূক্ষ্মতা ও ছিদ্র এই সমুদায় আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয় রুক্ষতা, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া, ধাতুব্যূহন এবং শারীরিক চেষ্টা বায়ু হইতে উৎপন্ন। রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়, প্রকাশ, পরিপাক ও উষ্ণতা এই সমুদায় অগ্নি হইতে উৎপন্ন। রস, রসেন্দ্রিয়,

শৈত্য, মৃদুতা, স্নেহ ও ক্লেদ জল হইতে উৎপন্ন। গন্ধ, ঘ্রানেন্দ্রিয়, গুরুত্ব, স্থৈর্য্য এবং মূর্ত্তি এই সমুদায় পৃথিবী হইতে উৎপন্ন। জগতে যে সমুদায় ভাব আছে পুরুষের ও সেই সেই ভাব অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা জগৎ ও পুরুষের ভাবকে একই রূপ বলিয়া থাকেন। এইরূপ তৃতীয় মাসে গর্ভের আরও কতকগুলি অঙ্গ ও কতকগুলি অঙ্গাবয়ব এককালে উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন কালান্তরে আরও কতকগুলি ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। দন্ত, স্তনোন্নতি, অধোলোম, শ্মশ্রু ও কক্ষ লোম কাল বিশেষে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধি, রূপ, বাক্‌শক্তি, শুক্র ও গমন ধাবনাদি ভাবের উৎপত্তিও ক্রমশঃ হইয়া থাকে।

গর্ভের ইন্দ্রিয় সমস্ত উৎপন্ন হইলে শিশুর অন্তঃকরণে বেদনা অনুভব করিবার শক্তি সঞ্চার হয়। ঐ সময় হইতে গর্ভ স্পন্দিত হইতে থাকে। লোকে সচরাচর গর্ভ যন্ত্রণা বলিয়া থাকেন, বাস্তবিক ঐ যন্ত্রণার ন্যায় ভয়ঙ্করী যন্ত্রণা আর আছে কিনা সন্দেহ। এই সময়ে গর্ভ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভগবানের স্তব করিতে থাকে। গর্ভস্থ শিশুর হৃদয় মাতৃজ ও মাতার হৃদয়ের সহিত শিশুর হৃদয় সম্যক্ সম্বদ্ধ সেইজন্য বৃদ্ধগণ গর্ভকে দৌহৃদব্য বলিয়া থাকেন। এই সময়ে গর্ভিণীর গর্ভপ্রতিকূল আহার বিহারাদি ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সময়ে গর্ভের অনিষ্টজনক কার্য্যাদি দ্বারা গর্ভের বিনাশ বা বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।

চতুর্থ মাসে গর্ভ অত্যন্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, এই সময়ে গর্ভিণীর শরীরও এইজন্য অত্যন্ত গুরু হইয়া থাকে। পঞ্চম মাসে অপেক্ষাকৃত গর্ভের মাংস ও শোণিতের বৃদ্ধি হয় সেই জন্য গর্ভিণী পঞ্চম মাসে অত্যন্ত কৃশ হইয়া যাইতে থাকে। ষষ্ঠ মাসে গর্ভস্থভ্রূণের অন্যান্য মাসাপেক্ষা বল ও বর্ণের বৃদ্ধি হয় ও তজ্জন্য গর্ভিণীর বল ও বর্ণের হ্রাস হয়। সপ্তম মাসে গর্ভের সমস্ত ভাবেরই বৃদ্ধি হয় ও সেই সময়ে গর্ভিণীকে সমস্ত আকারে ক্লান্ত দেখা যায়। অষ্টম মাসে গর্ভ ও মাতা রস বাহিনী শিরাসমূহ দ্বারা পরস্পরের ওজঃ গ্রহণ করে। এই সময় গর্ভিণীকে মুহুর্মুহু গ্লানিযুক্ত ও মুহুর্মুহু হৃষ্ট পুষ্ট দেখা যায়। ওজঃ ধাতুর অনবস্থিতত্ব বশতঃ এই সময়ে বিপদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। কুশল মহাত্মাগণ এই অষ্টম মাসকে গর্ভের অহিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অষ্টম মাস অতীত হইয়া নবম মাসের প্রথম দিন হইতে দশম মাস পর্য্যন্ত গর্ভ প্রসবের মুখ্য কাল। ইহার অন্যথা হইলে বিকৃতি বলিয়া স্থির করিবে। কুক্ষিই গর্ভের উৎপত্তি স্থান। সহজ প্রতীতির জন্য একটী চিত্র প্রদর্শন করা গেল। এই চিত্রে ভ্রূণ গর্ভে কিরূপে অবস্থিতি করে, তাহাই প্রদর্শিত হইল।



এই চিত্রের খ খ খ জরায় গহ্বর। কত, কত, কত, কত, অস্থায়িনী ভ্রূণাবরক কলা। কগ, কগ, অস্থায়িনী জরায়ু বেষ্টিকা কলা। কচ, কচ, অস্থায়িনী জরায়ু বেষ্টিকা ডিম্ব কলা।

ধাত্বাদির শোধন ও মারণ।

পার্ব্বত্য প্রদেশই ধাতু সমুদায়ের আকর স্থান। বিশুদ্ধ ধাতু সেবিত হইলে বলী, পলিত, খালিত্য, দৌর্ব্বল্য, কার্শ্য ও জরাদি বিবিধ পীড়া উপশমিত হয়। অপেক্ষাকৃত পার্ব্বত্য দেশীয় জল বায়ু উৎকৃষ্ট, কারণ ধাতুকণা সংস্পর্শে ঐ সমস্ত স্থানের জল অতি বিশুদ্ধ ও উপকারী হয় এবং ঐ কারণেই পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিদিগকে নীরোগ ও বলবান্ দেখা যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, দস্তা, সীস ও লৌহ এই সাতটী মূল ধাতু। আর স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুত্থ, কাংস্য, পিত্তল, সিন্দূর ও শিলাজতু ইহারা যথাক্রমে পূর্ব্বোল্লিখিত সাতটীর উপধাতু অর্থাৎ স্বর্ণের স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যের তার মাক্ষিক, তাম্রের তুত্থ, রঙ্গের কাংস্য, দস্তার পিত্তল, সীসের সিন্দূর ও লৌহের উপধাতু শিলাজতু। যে ধাতুর যে গুণ, তাহার উপধাতুরও সেই গুণ, পার্থক্য এই যে উপধাতুর

গুণ অপেক্ষাকৃত অল্প। এই সমুদায় দ্বারা আমাদের দেহ ধৃত (রক্ষিত) হয় বলিয়া ইহাদের নাম ধাতু।

ধাতু সমুদায়ের মধ্যে স্বর্ণই শ্রেষ্ঠ। সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বুনদ, জাতরূপ ও মহারজত এই সমুদায় স্বর্ণের পর্য্যায় বা নামান্তর। যে স্বর্ণ দগ্ধ করিলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শ্বেত বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র সংমিশ্রণ বর্জ্জিত, স্নিগ্ধ, কোমল, গুরু ও যাহার কষ কুঙ্কুমের ন্যায় গাঢ় রক্তবর্ণ, তাহাই উৎকৃষ্ট। শ্বেত বর্ণ, কঠিন, অচিক্কণ, বিবর্ণ, মলযুক্ত, স্তরবিশিষ্ট, দাহ ও ছেদে শ্বেত বর্ণ, লঘু, যাহার কষ শ্বেতবর্ণ ও যাহা আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়, তাদৃশ স্বর্ণ অব্যবহার্য্য। শোধিত স্বর্ণ সেবনে যেরূপ বহু রোগের প্রতিকার ও শারীরিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেইরূপ অশোধিত ও অজারিত স্বর্ণ সেবনে বহু রোগের উৎপত্তি ও শারীরিক অবনতি সংঘটিত হয়।

স্বর্ণ জারণ করিবার পূর্ব্বে শোধন করিয়া লওয়া বিশেষ আবশ্যক। স্বর্ণকে প্রথমতঃ পিটিয়া পাতলা পাত প্রস্তুত করিতে হয়, অনন্তর অগ্নিতে পোড়াইয়া যথাক্রমে তিনবার করিয়া তিলতৈল তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথ কলায়ের কাথে নিক্ষেপ করিলে স্বর্ণ বিশুদ্ধ হয়। তিলতৈল ও কাথাদি প্রত্যেক বারই ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রত্যেক বার পোড়াইয়া ভিন্ন ভিন্ন তৈলেও ভিন্ন ভিন্ন তক্রাদিতে নিক্ষেপ করিবে। এই নিয়মে রৌপ্যাদি ধাতুর ও শোধন হইয়া থাকে।

উল্লিখিত রূপ স্বর্ণপত্র কাঁচি দ্বারা কাটিয়া যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিবে। পরে ঐ স্বর্ণের সমপরিমাণ বিশুদ্ধ পারদ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে খলে মর্দ্দন ও পিণ্ডাকৃতি করিবে। এই পিণ্ড একখানি কটোরায় গন্ধক চূর্ণ রাখিয়া তাহার উপর স্থাপন করিবে ও পিণ্ডের উপরিভাগে গন্ধক চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। পিণ্ডের পরিমাণ যত হইবে, ঐ পরিমিত গন্ধক, তুল্যাংশ করিয়া অর্দ্ধাংশ নিম্নে ও অর্দ্ধাংশ উপরিভাগে প্রদান করিতে হয়। পরে আর একখানি কটোরা দ্বারা উহাকে আচ্ছাদিত করিবে এবং কটোরা দ্বয়ের মুখসন্ধি উত্তম মৃত্তিকা লেপন করিয়া রুদ্ধ করিবে। অনন্তর সামান্য গর্ত্তের মধ্যে ৩০ খানি বিল ঘুঁটে দ্বারা পুট প্রদান করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া পুনরায় পারদের সহিত মর্দ্দন করিবে এবং পূর্ব্ববৎ গন্ধক চূর্ণ দিয়া কটোরায় রাখিয়া পুট দিবে। ১৪ বার এইরূপ পুট প্রদান করিলে স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হয়। ক্রিয়া কুশল ব্যক্তিগণ ৭।৮ পুটেও স্বর্ণকে সুন্দর ভস্ম করিয়া থাকেন। উল্লিখিত রূপ মারিত স্বর্ণই সর্ব্বত্র ব্যবহার্য্য। মারিত স্বর্ণ কষায়, তিক্ত, মধুর, গুরু, লেখন, হৃদ্য, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুষ্য, কান্তিপ্রদ, বিষঘ্ন ও পবিত্র। এই মারিত স্বর্ণ সেবনে আয়ুঃ, মেধা, প্রভা, বুদ্ধি ও রতিশক্তি বৃদ্ধি, বয়ঃ, স্থৈর্য্য, বাক্‌শুদ্ধি ও দেহের পুষ্টি হয় এবং ক্ষয়, উন্মাদ ও উপদংশ জনিত বিবিধ পীড়া প্রতিকৃত হয়। ইহার মাত্রা ১ রতি।

রৌপ্য।

রৌপ্য, রজত, চন্দ্রকান্তি ও সিত-প্রভ ইত্যাদি রৌপ্যের পর্য্যায়। যে রৌপ্য গুরু, চিক্কণ, কোমল, শুভ্রবর্ণ, আঘাতসহ, অপর ধাতুর মিশ্রণ বিহীন, স্বচ্ছ এবং দাহ ও ছেদে বিকৃত হয় না, তাহাই উৎকৃষ্ট ও ব্যবহার্য্য। কৃত্রিম, কঠিন, রূক্ষ, রক্তবর্ণ, পীতদলযুক্ত ও লঘু এবং যাহা দাহ, ছেদ ও আঘাতে নষ্ট হয়, তাহা নিকৃষ্ট ও অব্যবহার্য্য। অবি-শোধিত ও অমারিত রৌপ্য সেবনে আয়ুঃ-শুক্র ও বলনাশ এবং বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয় অতএব শোধিত ও জারিত রৌপ্য ব্যবহার করাই বিধেয়।

স্বর্ণের যেরূপ সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ ও তৈলাদিতে নিক্ষেপ করিয়া শোধন করিতে হয়, রৌপ্যেরও তদ্রূপ।

শোধিত ও খণ্ড খণ্ড কৃত রৌপ্য সমান পরিমাণ পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে, পরে রৌপ্যের সমান হরিতাল ও গন্ধক একত্র করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। স্বর্ণ মারণ বিধি অনুসারে মর্দ্দিত হরিতাল ও গন্ধক দ্বারা উক্ত পিণ্ড ব্যাপ্ত ও কটোরিকায় স্থাপন করিয়া অপর কটোরিকা (কটরা) দ্বারা আবৃত করিয়া সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিবে। অনন্তর অল্প ঘুঁটের অগ্নিতে পুট দিবে। অধিক উত্তাপ পাইলেই গলিয়া যায়, সুতরাং অল্প ঘুঁটে দ্বারা পুট প্রদানই বিধেয়। ২।৩ বার পুট দিলেই রৌপ্য ভস্ম হইয়া যায়। অপর উপায়েও রৌপ্য ভস্ম করা যায়। ২ ভাগ গন্ধক ও এক ভাগ পারদ একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে ঐ কজ্জলী জম্বীরাদি রসে দ্রব করিয়া উহা দ্বারা কজ্জলীর সমান পরিমাণ রৌপ্যপত্র প্রলিপ্ত করিয়া তীব্র অগ্নিতে বালুকা যন্ত্রে অথবা গজপুটে পাক করিবে। অপেক্ষাকৃত এই প্রণালীই সহজ। মারিত রৌপ্য শীতল, কষায়, মধুর, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেহন, বায়ু নাশক, পিত্তপ্রশমক ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নাশক। মারিত রৌপ্যের মাত্রা ১ রতি।

ভৈষজ্য বিজ্ঞান।

কফজনিত শোথে—পিপুল, সরিষার পুরাতন খইল, সজিনার ছাল ও তিসি জলে উত্তমরূপ বাটিয়া ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দিলে অতি সত্বর কফজনিত শোথ আরোগ্য হয়।

কুলথ কলায ও শুঁঠ গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ঐ গোমূত্রের কিয়দংশ দ্বারা উহা সুন্দর রূপে শিলায় পেষণ করিয়া উষ্ণ উষ্ণ প্রলেপ দিলে কফজনিত শোথ ৪।৫ দিনে আরোগ্য হয়। অনেক স্থলে ইহা পরীক্ষা করা হইয়াছে।

বহেড়ার বীজ জলে ঘসিয়া প্রলেপ দিলে সমস্ত প্রকারের শোথই আরোগ্য হইয়া থাকে।

পাথরের কয়লা জলে ঘসিয়া প্রলেপ দিলে অতি সত্বর শোথ আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

ব্রণ (কুচ্‌কী)—সজিনার আঠা কিম্বা যজ্ঞ ডুমুরের আঠা যদি ব্রণের উপক্রমে অর্থাৎ যে সময়ে বেদনা হয় ও ফুলিয়া উঠে, সেই সময়ে দেওয়া যায়, তবে

উহা আর বড় হয় না ও পাকে না, বসিয়া যায়।

মধু ও চূণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিলে অত্যাশ্চর্য্য রূপে বেদনা নিবৃত্তি ও বাগী বসিয়া যাইতে দেখা যায। মধু ও চূণ মিশ্রিত করিলে উহা উষ্ণ হইয়া উঠে, ঐ অবস্থায়ই প্রলেপ দিতে হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, বাগী ও ব্রণ প্রভৃতির উপক্রমে কষ্টিক প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা ঐ শোথযুক্ত স্থান দগ্ধ করিয়া দেওয়া হয, কিন্তু যেগুলি নিশ্চয়ই পাকিবে, সেই সমুদায স্থলে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়, কারণ কষ্টিকাদি দ্বাবা পোড়াইয়া দিলে ব্রণ সুন্দব রূপে পাকিতে পারে না, অথচ মধ্যে ক্রমশঃ ক্ষত হইয়া যায়। এরূপ ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে। আমাবা যে সমুদায প্রলেপের বিষয় উল্লেখ করিলাম, উহাতে ঐরূপ ক্লেশের সম্ভাবনা নাই।

কোন কোন সময় সামান্য স্ফোটক তৈল বা অপর কোন দূষিত পদার্থ দ্বারা প্রবল হইয়া উঠে এবং অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ঐরূপ যন্ত্রণাদায়ক ব্রণে তেলাকুচার পাতা অল্প সৈন্ধবের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে। এই প্রলেপ ক্রমাগত প্রদান করিলে ইহা দ্বারাই ব্রণ ফাটিয়া যায়। আমরা অনেক স্থলে ইহার এই উপকারিতা দেখিয়াছি। ব্রণ ফাটিয়া গেলে তখন পুরাতন ঘৃত সহযোগে তিসি (মসিনা) বাটিয়া ও উষ্ণ করিয়া পুলটিশ্ দিলে শীঘ্রই ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়।

ব্যবস্থা সংগ্রহ।

১। রোগী পুরুষ বয়ঃক্রম ২৪।২৫ বৎসর। পীড়ার অবস্থা সর্ব্বদাই জ্বরভাব, শরীর গ্লানিযুক্ত, বৈকালে জ্বরের বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে কুইনাইন ও অপর ডাক্তারি ঔষধ দ্বারা জ্বর বন্দ করা হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, জ্বর কালীন অল্প পিপাসা (জলপান না করিলেও বিশেষ কষ্ট হয় না), চক্ষুঃ জ্বালা ও মাথাধরা ইত্যাদি। ক্ষুধা আদৌ হয় না।

ব্যবস্থিত ঔষধ প্রাতে চন্দনাদি লৌহ ১টী মধুদিয়া মাড়িয়া পাচন সহ, বৈকালে বজ্রক্ষার ২ রতি মোরীভিজার জলসহ ও সন্ধ্যায় সর্ব্বেশ্বর রস ১টী মধুদিয়া মাড়িয়া উচ্ছেপাতার রস সহ সেবা।

পাচন—ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ, ধনে, পলতা, আতইচ, চিরাতা, কট্‌কী ও জাঙ্গিহরিতকী প্রত্যেক।০ আনা সমষ্টিতে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা।

২। রোগিণীর বয়স ৩০।৩২ বৎসর। ৩।৪ মাস যাবৎ জ্বর। পূর্ব্বে অবশ্যই কুইনাইন সেবন করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থা প্রাতঃকালে জ্বর আইসে, ১০।১১টা পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। অবশিষ্ট সময়েও শরীর সুস্থ বলিয়া বোধ হয় না, শরীর কৃশা হইয়াছে, ২।৩বার অল্প অল্প তরল ভেদ হয়। মাথা ভার এবং কোমর প্রভৃতিতে বেদনা। যকৃতেব সামান্য দুষ্টি থাকিলেও পারে কিন্তু প্লীহার বৃদ্ধি নাই। বাহ্যে যাইবার পূর্ব্বে পেট অত্যন্ত বেদনা করে ইত্যাদি।

ব্যবস্থিত ঔষধ—প্রাতে বিষম জ্বরান্তক লৌহ (পুটপক্ক) ২ রতি মাত্রায় শোধিত হিঙ্গু চূর্ণ ২ রতি, পিপুল চূর্ণ ২ রতি ও সৈন্ধব লবণ ২ রতি সহ সেব্য। বৈকালে—রামবাণ ১টী মরিচের গুঁড়া ৵০ আনা ও বিল্বপত্র রস ১ তোলা সহ ও সন্ধ্যায়—মহা জ্বরাঙ্কুশ ১টী গোঁড়া-লেবুর বীচির শাঁস সহ সেব্য।

৩। বালিকা—বয়স ৫।৬ বৎসর। পীড়ার সূচনা প্রায় ১ মাস যাবৎ হইয়াছে। অল্প জ্বর, বৈকালে জ্বরের সামান্ত বৃদ্ধি বলিয়া বোধ হয়। বাহ্যে যাহা হয়, উহা পাতলা, পরিমাণে নিতান্ত অল্প নহে। পায়ের পাতা ও পিট ফুলিয়াছে ক্রিমির লক্ষণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুধার অবস্থা, খাইতে দিলে খায়, না দিলেও বিশেষ কষ্ট বোধ করে না।

ব্যবস্থিত ঔষধ—প্রথম দিন প্রাতে কীটারী রস অর্দ্ধ বটী বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৵০ আনা ও আনারসের পাতার রস সহ সেবন করিয়া পর দিন প্রত্যূষে বেড়ীর তৈল ১৷৷ তোলা সেবন করিবে। ৩।৪।৫ বার বাহ্যে হওয়ার পর শরীর বিশোধিত হইলে পরদিন হইতে প্রাতে কীটারি রস অর্দ্ধবটী বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৩ রতি ও আনারসের পাতার রস ২ তোলা সহ সেব্য।

বৈকালে রামবাণ রস অর্দ্ধবটী মরিচের গুড়া ৩ রতি ও বিল্ব পত্র রস ১ তোলা সহ ও সন্ধ্যায় সর্ব্বেশ্বর অর্দ্ধবটী তুলসী পাতার রস সহ সেব্য। বিল্বপত্র, শুঠ, পুনর্নবা, গুলঞ্চ ও বাসের শিকড় প্রত্যেক ।৵৫ আনা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা শেষ থাকিতে নামাইয়া বেলা ৯ টায় ও ৪ টায় (অর্দ্ধেক সেবনে কষ্ট হইলে ৩ তোলা করিয়া দিবে।) সেবন করিবে। যতদিন জ্বর ও পায়ের শোথ না যায়, ততদিন সাগু, বার্লি বা ক্ষুধা অনুসারে ২।১ খানি সুজীর রুটী পথ্য করিবে। ৷৷০ তোলা পুরাতন মাণ চূর্ণ ও পুরাতন তণ্ডুলচূর্ণ ১ তোলা ২১ তোলা জল মিশ্রিত দুগ্ধে (১০৷৷০ তোলা দুগ্ধ ও ১০৷৷০ তোলা জল) সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে কিঞ্চিৎ মিছরির সহিত ২।১ বার সেবন করিলে এইরূপ পীড়ায় বিশেষ উপকার হয়। ইহার নাম মাণমণ্ড। মাণমণ্ড সেবনে শোথ, উদরাময়, প্লীহা, ও জ্বরাদি শীঘ্র উপশম প্রাপ্ত হয়। ইহা যেরূপ বলকর পথ্য, তদ্রূপ ঔষধের ন্যায় উপকারী।

শোথ নিবৃত্তির জন্য—ধান কাট-খোলায় ভাজিয়া দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিবে পরে, সিজের (মনসা) পাতা আগুনে ঝলসাইয়া রস করিবে ও এই রসে ঐ চূর্ণ ঘন করিয়া গুলিয়া ঈষৎ উষ্ণ উষ্ণ প্রলেপ দিবে। দিবসে অন্তত ২ বার প্রলেপ দেওয়া উচিত।

৪। একটী বালকের বয়স ৮ বৎসর প্রথমতঃ আমাশয় হয়, পেটে অত্যন্ত বেদনা থাকে। ঔষধ—হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ দেওয়া হয়, বেদনা অপেক্ষাকৃত কম হয় বটে কিন্তু বাহ্যের সহিত রক্ত পড়িতে থাকে। দিন রাত্রিতে প্রায় ৮।১০ বার এইরূপ হয়, পেটের বেদনা ও অল্প অল্প আছে।

ব্যবস্থিত ঔষধ—প্রাতে বৃহৎনৃপবল্লভ অর্দ্ধবটী কাল জামের পাতার রস ও ছাগ দুগ্ধ ৵০ ছটাক সহ, বেলা ৫।৬ টায় বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ ১ রতি আমাপানার পাতার রস ।০ তোলা সহ। পথ্য—কাচকলা ছাড়াইয়া না ধুইয়া উহার সহিত থুলকুড়ির পাতা

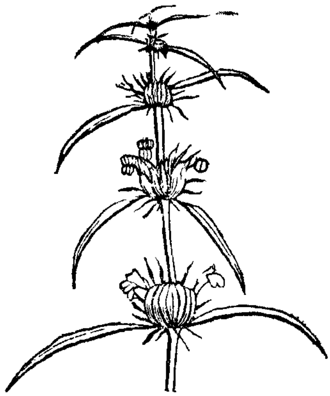
১ মুঠা দিয়া মাগুর মাছের ঝোল ও বার্লি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। রক্ত নিবৃত্তি ও বাহ্যে কমিয়া গেলে এবং ক্ষুধার বিলক্ষণ উদ্রেক হইলে সরু চাউলের অন্ন ও উক্তরূপ মাগুর মাছের ঝোল সেবন করিবে। গোদুগ্ধের পরিবর্ত্তে ছাগদুগ্ধ সেবন দিবেন। জলখাবার ২।১ খানি বেলের মোরব্বা। এই সময় টাট্‌কা ঘোল জীরা ভাজার গুড়া সহ সেবনে পাকস্থলী শীতল হইয়া শরীর বিলক্ষণ সুস্থ করে।

৫। পুরুষ, বয়ঃক্রম ১১।১২ বৎসর। সান্নিপাতিক জ্বর, জ্বরের প্রারম্ভেই কর্ণমূলে শোথ হইয়াছে, চক্ষুঃ অত্যন্ত রক্তবর্ণ, সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ মস্তক চালনা করিতেছে, ডাকিলে অল্প উত্তর পাওয়া যায় এবং মধ্যে মধ্যে প্রলাপও আছে—প্রাতে মহালক্ষ্মীবিলাস এক-তৃতীয়াংশ ও অর্দ্ধরতি মকরধ্বজ মধুদিয়া মাড়িয়া আদা ও পানের রস সহ. বেলা ৯।১০টায় সৌভাগ্য বটী অর্দ্ধখানি মধুদিয়া মাড়িয়া দশমূলের এক ছটাক ক্বাথ সহ সেব্য। বেলা ৩ টায় অবশিষ্ট অর্দ্ধখানি সৌভাগ্য বটী মধু ও অবশিষ্ট এক ছটাক দশমূলের ক্বাথ সহ। রাত্রি ৭।৮ টায় যে সময় পীড়া বৃদ্ধি হয়, সেই সময় বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ এক-তৃতীয়াংশ আদা পানের রস সহ সেবন করিবে। গেরিমাটী, সৈন্ধব, শুঁঠ, বচ ও কট্‌ফল কাঁজিতে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া অল্প উষ্ণ অবস্থায় কর্ণমূলে দিবসে ২।৩ বার করিয়া প্রলেপ দিবে। মস্তক মুণ্ডন করিয়া আদা ও পান বাটিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে পুরু করিয়া বসাইয়া দিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা ক্রমশঃ দোষের লাঘব হইয়া আসিলে জ্বরের জন্য মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধের পরিবর্ত্তে নবজ্বরাধিকারোক্ত স্বচ্ছন্দভৈরব ১টী তুলসী পত্র রস ও মধু সহ সেবন করিবে।পথ্য সাগু কিম্বা বার্লি। জ্বরের অতিশয় বৃদ্ধির সময় ৬ই এক দিবস মুগ ২ তোলা ও মসুর ২ তোলা একত্র ২।৪ খণ্ড আদ্রক ও ২।১ কোয়া রসুন সহ উত্তমরূপ সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সংযোগে পান করিতে দিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। ২০।২১ দিনে দাঁতের গোড়ায় ক্ষত ও বেদনা উপস্থিত হওয়ায় জামছাল, আমছাল, বকুলছাল, জিউল ছাল ও কাল খয়ের একত্র ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জলে কুল্ল করিতে দিবে।

রোগিণী স্ত্রী, বয়ঃক্রম ১৫।১৬ বৎসর জ্বর ও পেটে বেদনা, সময় সময় পেটে গুল্মের ন্যায় অনুভব হয়। বেদনার সময় চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয়, ঘর্ম্ম ও পিপাসা অত্যন্ত হয়। ৫।৬ মাস যাবৎ রজঃ প্রবৃত্তি হয় না। হাত পা ও চক্ষুতে জ্বালা আছে। প্রাতে গুড়ূচ্যাদি লৌহ ১টী মধু ও নিম্নলিখিত পাচন সহ। পাচন—ক্ষেতপাপড়া, ধনে, গুলঞ্চ, জাঙ্গিহরিতকী, আমলকী, বহেড়া, চিরাতা ও কট্‌কী প্রত্যেক ।০ আনা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। মধ্যাহ্নে চিত্রকাদি গুড়িকা ১টী শীতল জল সহ ও সন্ধ্যায় রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটী ১টী জল সহ। গুড়ূচ্যাদি তৈল অল্প অল্প তলপেটে ও হাত পায় মালিশ করিবে। পথ্য দিবসে মাগুর মাছের ঝোল পাতিলেবুর কুশি ও বল্কা দুগ্ধ প্রভৃতি। রাত্রিতে খই দুধ কিম্বা দুগ্ধসাগু।



অশ্বগন্ধা—বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা, কুষ্ঠগন্ধিনী ও অশ্ববাচক সমস্ত শব্দ ইহার পর্য্যায়। অশ্বগন্ধা বলকারক, রসায়ন, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ ও অতিশয় শুক্রজনক। ইহার দ্বারা বায়ু, শ্লেষ্মা, শ্বিত্র (ধবলরোগ), শোথ, ক্ষয়রোগ, আমবাত, ব্রণ, কাস ও নাসারোগ নষ্ট হয়। ইহার মূল অভাবে সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। মাত্রা ৵০ আনা। অশ্বগন্ধার মহীয়সী শক্তি বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আমাদের অশ্বগন্ধা রসায়ন সেবনে সহস্র সহস্র রোগী আরোগ্যলাভ করিতেছেন কিন্তু এই কল্যাণপ্রদ ওষধি সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না এবং অনেকেই ইহা বিদিত নহেন, কেবল নামই শুনিয়াছেন। সেজন্য আমরা আজ অশ্বগন্ধার একটী প্রতিকৃতি প্রদান করিলাম।



কোকিলাক্ষ। বাঙ্গালা কুলেখাড়া ও হিন্দি তালমাখনা।

কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুগন্ধা ও ইক্ষুবালিকা এই কয়েকটী কুলেখাড়ার পর্য্যায়। কুলেখাড়া শীতল, বলকারক, স্বাদু অম্ল, পিত্তজনক ও তিক্ত। ইহা দ্বারা আমশোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, অরুচি ও বাতরক্তরোগ নিবারিত হয়। নীরক্তাবস্থায় ইহার শাক আহারার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ অথবা সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ৷৷০ তোলা। যখন শরীরে রক্তাল্পতা উপস্থিত হয়, প্লীহা বর্দ্ধিত হয় ও অল্প অল্প জ্বর হইতে থাকে, তখন কুলেখাড়ার রস অনুপানে বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, প্লীহাধিকারোক্ত মহামৃত্যুঞ্জয় কিম্বা প্লীহাধিকারোক্ত অপর কোন ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুলেখাড়া বিনা যত্নেই জন্মিয়া থাকে। পাঠক বর্গের অবগতির জন্য একটী কুলেখাড়ার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

স্মরণার্থে।

এই সংখ্যায় আমরা আমাদের অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে শোক সন্তপ্ত চিত্তে একটী দুঃখময় সংবাদ দিতেছি। সমীরণের এক জন প্রধান লেখক বাবু ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। রোগে ভুগিয়া নয় তাহা হইলে বুঝিতাম, জীবের সাধারণ ধর্ম্মে। স্নান করিতে গিয়া জাহ্নবী গর্ভে পদস্খলিত হইয়া প্রখর স্রোত মুখে তাঁহার জীবন স্রোত মিশিয়া গিয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন—সৎস্বভাববিশিষ্ঠ বিনয়ী, সদালাপী ও সুলেখক। তিনি অতি অল্পদিনই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে যেরূপ ফুটিয়া উঠিতেছিলেন, তাহাতে কালে তিনি শ্রেষ্ঠ লেখক হইয়া দীনা মাতৃভাষার অঙ্গে অনেক নূতন অলঙ্কার সাজাইতে পারিতেন। কবির—Child is the Father of man এই বাক্যের সার্থকতা হইতে না হইতেই কাল আসিয়া অকালে তাঁহার অস্তিত্ব লোপ করিল।

বাঙ্গালা দেশে উপন্যাস জগত আজও স্বল্প বিরল সুলেখকে পরিপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর আর কেহ সে শূন্য আসন পূর্ণ করিতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি লেখনীকে ক্রমশঃ বিশ্রাম দিতেছেন বাঙ্গালা সাহিত্যে এ ভিন্ন আর যাঁরা কৃতী লেখক আছেন তাঁহারাও নানা কারণে নকল লেখায় ভীতগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।

আমাদের দেশে—উপন্যাস লেখকের অবস্থা একেত এই—তাহার উপর আবার Realistic লেখকের সংখ্যা আরও কম। Realistic হইয়া হয়ত পাশ্চাত্য জগতে, অনেক লেখক, যশের শ্রেষ্ঠ শিখরে উপস্থিত হইয়াছেন। ক্ষেত্রনাথ এক জন Realistic শ্রেণীর উপন্যাসকার। তাঁহার ফুল ফুটিতে ফুটিতে কাল কীট তাঁহাকে কোরকে বিনাশ করিয়াছে। হায়! যদি তাহা ফুটিবার অবসর পাইত—যে ভবিষ্যৎ প্রতিভার স্বল্প তীক্ষ্ণ জ্যোতি সাহিত্য ক্ষেত্রের এক কোণে ক্ষীণ তীব্রভাবে মধুর ছটা বিস্তার করিয়াছিল তাহা যদি পূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করিবার সময় পাইত—তাহা হইলে হয়ত—সাহিত্যসেবীর সহিত এরূপ ভাবে—আমাদের ক্ষেত্রমোহনের পরিচয় দিতে হইত না।

সমীরণে প্রকাশিত, একটী বাজে গল্প, দাদামহাশয়ের স্বর্গলাভ, প্রাইভেট টিউটরের দুঃস্বপ্ন, নক্সা-জরির জুতা ক্ষেত্রমোহনের শেষ লেখনী প্রসূত অতি সুন্দর ক্ষুদ্র প্রবন্ধ নিচয়। বর্ণনার ছটা, কথার বাঁধুনি, ভাবের গাঁথুনী, ভাবের ওজস্বিতা, কল্পনার তেজস্বিতা—কেমন ধীর নম্র ভাবে তাহার প্রতি ছত্রে ছত্রে বিরাজমান। আমাদের

সমীরণে বাহির হইয়াছিল বলিয়া নয়—অনেক মাসিকপত্র পাঠকের নিকট ইহার সুখ্যাতি শুনিয়াছ। তার পর তাঁহার ক্রমশঃ প্রকাশিত উপন্যাস গৌরী; হায়! হতভাগ্য "গৌরী" না ফুটিতে পিতৃহীনা হইয়া পড়িল।

ক্ষেত্রনাথ একজন স্থূলেখক ছিলেন বলিয়া যে আমরা কেবল দুঃখ করিতেছি তাহা নহে। অমায়িকতা, সহৃদয়তা—সেই অকাল মৃত যুবকের চরিত্রে, ফুটন্ত ভাবে বর্ত্তমান ছিল। ক্ষেত্রনাথ এর পরে অনেক লেখক জন্মিতে পারেন কিন্তু সেই অর্দ্ধমুকুলিত অস্ফুট বাস কোরক প্রতিভা স্ফুটিত হইলে যাহা দাঁড়াইত তাহা আর আমরা দেখিতে পাইলাম না।

সমালোচনা।

সাধন সপ্তকম্। জয়দেব কৃত দশাবতার স্তোত্র, কুলশেখর কৃত কুমুদ মালা, শঙ্করাচার্য্য কৃত মোহমুদ্গর, সাধনপঞ্চক, যতি পঞ্চক, অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্র ও ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ স্তোত্র অনুবাদে পুস্তক খানি গঠিত। গ্রন্থে এই সকল প্রবন্ধের মূলও প্রদত্ত হইয়াছে। আজ কাল হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের দিনে এরূপ গ্রন্থের আবশ্যকতা বুঝাইতে হইবে না। হিন্দুমহিলা, পূজা করেন, মন্ত্রোচ্চারণ করেন, অনেক সময় তাহার অর্থ বোধ হয় না, শুধু বুঝিয়া লয়েন হৃদয়ের পূর্ণপ্রীতি, ঋষি কৃত স্তোত্রে নিশ্চয়ই অনন্তের দ্বারে পাঠান হইল। কিন্তু এই স্তোত্র মালার ভিতরেই কি অমৃতের উৎস প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা জানিবার সুবিধা হয় না। কেহ বুঝাইয়া দিলেও তাহাতে মূলের উচ্ছ্বাস মাধুরী প্রায়ই বিলুপ্ত হয়। মহাকাব্য বা মহাকবির নামানুবাদ অনেক সময় মৌলিক রচনা অপেক্ষা দুরূহ। শুধু বাঙ্গলায় স্ত্রীলোকেরই যে শুধু এ ভাগ্য বিপ্লব তাহা নহে, অনেক পুরুষের অদৃষ্টেও বিধাতা ইহা অপেক্ষা অধিক সুপ্রসন্ন নহেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে অভাব অনেকটা দূর হইয়াছে। অনুবাদ মধুর, এত সুললিত, এত কবিত্ব পূর্ণ, যে স্থানে স্থানে আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল, মূল ভাল না অনুবাদ ভাল। শঙ্করাচার্য্যের অপরাধ ভঞ্জন স্তবের একাংশ এত দার্শনিকতা পূর্ণ, অন্ততঃ টীকাকার তাহাতে এত দার্শনিক জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন যে সাধারণের বিশ্বাস, সে অংশ একরূপ অবোধ্য। আমরা সানুবাদ সেই শ্লোকটী উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

স্থিত্বাস্থানে সরোজে প্রণবময়
মরুৎকুম্ভে সূক্ষ্মমার্গে,
শান্তেস্বান্তেপ্রলীনেপ্রকটিত
গহনেজ্যোতিরূপেপরাখ্যে।
লিঙ্গং তদ্‌ব্রহ্মবাচ্যং সকলমতিমতং
নৈব দৃষ্টং কদাচিৎ,
কর্ত্তব্যোমেহপরাধং শিবশিব-
শিবভোঃ। শ্রীমহাদেবশম্ভো॥ ১২

পদ্মাসন যোগাসনে, উপবেশি একমনে,
* পদ্মানল মত মুখ করিয়া ব্যাদান ;
পবিত্র ওঙ্কার পূর্ণ, সর্ব্বশ্বাস ক্রিয়া শূন্য,
কুম্ভক যোগের প্রভু করিয়া সাধন,—
আপনার মাঝে প্রভু,হেন না হেরিনু কভু,
শান্ত, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের বিদ্রোহ, ভীষণ ;
ঘুচেছে ভিতর বার, মুছে গেছে চরাচর,
আলোর সাগর শুয়ে—আনন্দ গর্জ্জন !—
আপনার মাঝে প্রভু, হেন না হেরিনু কভু,
অন্ধকার আলো হয় জ্যোতির পরশে ;
চৈতন্য সাগর পরে, বিরাট, গম্ভীর, ধীরে,
তোমার পরাখ্য জ্যোতি বিতত বিকাশে !—
হেন দীপ্ত প্রাণে প্রভু !—জীবনে হেরিনু কভু
পূর্ণব্রহ্মরূপী লিঙ্গ সমুদিত তব ;
আমার অশেষ দোষ, ক্ষমা কর আশুতোষ,
জয় শম্ভো।—মহাদেব ! দেব শিব শিব শিব

সংস্কৃত ছন্দের যে বাঙ্গালায় এত অনুরূপ ছান্দিক অনুবাদ হইতে পারে, তাহা গ্রন্থকার কৃত সানুবাদ মোহ মুদ্গর পাঠের পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল না। এই পুস্তকের দুই একটী প্রবন্ধ পূর্ব্বে ২।১ জন খ্যাতনামা অধ্যাপক কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছিল। আমরা তাহার নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু এ অনুবাদ স্বতন্ত্র ধরণের। ইহাতে ব্যাখ্যার মৌলিকত্ব, আছে, কবিত্ব আছে, মূলের জীবনী আছে, যাহা অনুবাদে প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমরা উদাহরণ স্বরূপ ২।১টী স্থল না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

বহবি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্।
হলহতি ভীতি মিলিত যমুনাভম্ ॥
কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥

বিধুমুখে সীধুগন্ধ, রোহিনী-চুম্বনস্পন্দ,
গণ্ডযুগে তাম্বুলের রাগে ;
মন্দ গন্ধবহ তালে, কুন্তলে কুসুম দোলে
নীলবাস ঢাকিছে পরাগে !
ললাটে স্বেদের বিন্দু,শিশিরিত আধ ইন্দু,
হেথা হোথা জড়িত অলক ;
চলিতে চরণ টলে, মদির নয়ন ঢুলে,
আধ আধ মুচেছে তিলক !
শ্রীঅঙ্গ পরশ বায়, বসন্ত ছড়ায়ে যায়,
দেহ ঘিরি লাবণ্য উথলে ;
ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল,মুখ দেখে ভাবে ভুল
শশী বুঝি লুকাল কমলে !
বরবপু হলধারী, ব্রজকুলে অবতরি,
স্নানবাঞ্ছা করিয়া মানসে ;
যমুনারে কাছে ডাক,নদী কাছে আসে নাক,
আন তারে হলের কর্ষে।
যমুনা ভয়েতে নীলা, বৃন্দারণ্যে উতরিলা,
স্ত্রীসুলভ সরমেতে ম'রে ;
কালিন্দী সন্ত্রাস-ভব,মিলে সে নীলিমা তব,
নীরদাভ বসন ভারে !
জয় !—জগদীশ হরে।

* অন্তর স্তম্ভবৃত্তিঃ কুম্ভকঃ। তস্মিন জলমিব কুম্ভে নিশ্চলতয়া প্রাণঃ অবস্থাপ্যন্তে ইতি কুম্ভকঃ। ভোজবৃত্তি।

বাহ্যাভ্যন্তর স্তম্ভবৃত্তির্দেশকাল সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ সূক্ষ্মঃ পাতঞ্জল যোগসূত্র। সাধং। ৫০
বক্ত্রেনোৎপলং নালেন বায়ুং কৃত্বানিরাশ্রয়ম্।
এবং বায়ুর্গ্রহীতব্যঃ কুম্ভকস্তেতি লক্ষণম্ ॥
অমৃতবিন্দুপং। ১২।

বার্দ্ধক্যচেন্দ্রিয়ানাং বিগতগত-
মতেরাধিদৈবাদিতাপৈঃ,
পাপৈরোগৈর্বিযোগৈর-
সদৃশবপুষং প্রৌঢহীনঞ্চ দীনং।
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি-
মমমনোধূর্জ্জটের্ধ্যান শূন্যম্,
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিবশিব
শিবভোঃশ্রীমহাদেবশম্ভো ॥ ৬

কত উষাময়ী আশা, ডেকে নেছে অমানিশা,
প্রাণের প্রান্তরে কত অশনির ঘটা ;
প্রতি ভুল ভেঙেগেছে, প্রতিপদে ফুটে গেছে,
অনভিজ্ঞ জীবনের রক্ততৃষ কাঁটা !
হৃদয়ে হুঁচট লাগে, "আজন্ম" শিহরি জাগে,
মহাত্রাসে কক্ষপাশে ঝুঁকে পড়ে প্রাণ ;
বাসনার বালিঘর, গড়ি—ভাঙে নিরন্তর,
ভূমিকম্প আছে— যেথা আগে ছিল প্রাণ !
বৃদ্ধকাল আসিয়াছে, মৃত্যু আজ পড়েদেছে,
শুভ্র অধিকার চিহ্ন কুন্তল মাঝার ;
আজ আয়ু সন্ধ্যাকালে, পাপতাপ শোকে জ্বলে
ইন্দ্রিয়ের ব্যাধ বংশী উঠিছে আবার !
রোগে শোকে পাপে প্রভু! শ্রী, যৌবন গেছে তবু
মিছে অভিলাষে মন চিন্তাশূন্য তব ;
আমার অশেষ দোষ, ক্ষমা কর আশুতোষ,
দেব শম্ভো ! মহাদেব ! দেব শিব শিব ! ৬

বাঙ্গালা ভারতে অন্নদামঙ্গল স্থানে স্থানে এইরূপ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বলিলে কোন দোষ হয় না। অনুবাদ বিষয়ে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ অন্নদামঙ্গল অপেক্ষ কোন অংশে ন্যূন নহে। ইংরাজ আপনার ধর্ম্মের অনুবাদ অকাতরে বিতরণ করে, হিন্দুধর্ম্মের পক্ষাশ্রয়ীদের এই গ্রন্থ অন্ততঃ স্কুল পাঠশালার ছাত্র বা ছাত্রী, বর্গে, বা আপনার পরিবারস্থ মহিলা বর্গের ভিতর প্রচলন বা বিতরণ করিলে, মহা পুণ্য সঞ্চিত হইবে ভুল নাই।

জীবন্ত নক্সা। জি, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত গল্পাংশ পাঠ করিলে লেখকের অভিরুচির পরিচয় পাওয়া যায় লেখকের পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়, গল্প কয়টী ক্ষুদ্র হইলেও পাঠে তৃপ্তি হয়। লেখক এব্রতে নূতন দিক্ষিত, ভবিষ্যতে চেষ্টা থাকিলে সাধারণকে মোহিত করিতে পারিবেন।

জামাই বরণ প্রহসন। বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত হইয়াছিল হাস্যরসে লেখকের ক্ষমতা আছে লেখক নিজে না হাসিয়া অপরকে হাসাইতে পারেন।

রঘুনাথ দাসের জীবন চরিত। চৈতন্য চরিতের কয়েকটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর আজ কাল বাঙ্গলা ভাষায় বৈষ্ণব সাহিত্যের একটা খরস্রোত বহিয়াছে। এই গ্রন্থখানি তাহারই একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ। চৈতন্য ভক্ত রঘুনাথ দাসের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়, অতি সুন্দরভাবে সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। মুদ্রাঙ্কণের দোষে যে কয়েকটী সামান্য ত্রুটি আছে তাহা অতি সহজেই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। আশা করি গ্রন্থকার ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

রয়াল বেঙ্গলে "যমের ভুল।

বড়দিনের বাজারে কলিকাতার থিয়েটার সমূহে নানাবিধ রং সং প্রহসন ইংরাজী বৎসরের বিদায়ী আমোদরূপে বাহির হইয়াছে। "যমের ভুল" রয়াল বেঙ্গলের পঞ্চরঙ্গ। ইহাকে ঠিক পঞ্চরঙ্গ বলিতে পারা যায় না, প্রথমটা পঞ্চরংএ আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মের মধুরে শেষ হইয়াছে।

আজকালকার প্রহসন গুলিতে উপকার কি অনুপকার হইতেছে তাহা বিচার করা, বড় কঠিন। ব্যঙ্গবিদ্রুপের কশাঘাত সমাজের পৃষ্ঠে পড়িলে তাহার দাগ কতদিন থাকে তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু বঙ্গ প্রহসন পঞ্চরঙ্গে লোকের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটু

আমোদলাভ হয়। পঞ্চরঙ্গ প্রহসনের অধিকাংশই শেষ হয় ত পঞ্চরাজ্যে না হয় ত কোন অদ্ভুত দৃশ্যে। যমের ভুলের কিন্তু এসম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে।

বঙ্গ রঙ্গভূমির সুযোগ্য অধ্যক্ষ বেহারি বাবু এই প্রহসনের রচয়িতা। রয়াল বেঙ্গলের চির অমর প্রভাস মিলন তাঁহার লেখনী প্রসূত। সেই লেখনীর ভক্তিরস প্রাধান্যের কতক ছায়া যমের ভুলের শেষাঙ্কে পড়িয়াছে।

গ্রাম্য পঞ্চায়েতের দোষ দেখানই এই প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পঞ্চায়েত পল্লীগ্রামে এখন কিরূপ বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া তাহার চির উপভোগ্য শান্তি ও সরলতা নষ্ট করিতেছে তাহাই এই প্রহসনে বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে। চৈতন্য মণ্ডল বাস্তবিকই ভয়ানক প্রভৃতির লোক। যমালয়ে গিয়া সে যে কাণ্ডটা করিয়াছিল তাহাতে মানুষের শয়তানী বুদ্ধির নিকট দেবতাদেরও যে মাঝে মাঝে নাকাল হইতে হয় ইহাই দেখান হইয়াছে।

"যমের ভুলের" আরম্ভ শেষে কিন্তু শেষ ভক্তিতে। পর পর বিরুদ্ধ রসে এই প্রহসনের অবতারণা ও উপসংহার হইয়াছে। যে হরিনাম গান করিয়া বেঙ্গল দিন দিন পবিত্র হইতেছে প্রহসনের শেষভাগে সেই হরিনামের মাহাত্ম মাধুরী সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

অভিনয় সম্বন্ধে রয়াল বেঙ্গলের পূর্ব্বযশ সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। গ্রাম বাজার ও যমপুরীর দৃশ্য অতি মনোরম। যমের ভুলে, অনেক দেখিবার শিখিবার জিনিস আছে। নাট্যামোদীগণ যাহারা এখনও ইহা দেখেন নাই একবার দেখিয়া আসিবেন।

মরকতে "আবুহোসেন"।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কৌশলময়ী লেখনী প্রস্তুত "আবুহোসেন" মরকতে অভিনীত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ধরণের Comic Drama অতি কম, নাই বলিলেই হয়। ইহার আগাগোড়া উপভোগের জিনিস। চক্ষু ও কর্ণ উভয়ের পরিতৃপ্তি জন্য "আবুর" সৃষ্টি। প্রধান অংশ "আবু" সাজিয়াছিলেন আমাদের নটপ্রবর মুস্তফী সাহেব মিনার্ভায় যাঁহার জন্য "আবুর" যশ বাড়িয়াছিল মরকতে তিনিই আবুর অংশ অতি সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। মরকতে রোশেনার সঙ্গীত সুধারা আর আবুর অদ্ভুত অভিনয় আমরা যথেষ্ট পরিতৃপ্তির সহিত উপভোগ করিয়া আসিয়াছি। যাঁহারা মিনার্ভার আবুহোসেন দেখিয়াছেন তাঁহাদের আমরা একবার মরকতে গিয়া ঐ বিষয়ে অভিনয় দেখিতে বলি।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

২য় খণ্ড। | ১৩০১ সাল—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা।

শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন চরিত।

(প্রতিবাদ আলোচনা।)

শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রঘুনাথ চরিতের সমালোচনা করিতে অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল। নানা কারণে এতদিন হইয়া উঠে নাই বলিয়াই, আজ তাহার অবতারণা। অঘোর বাবুর কাছে যে আশা আমরা করিতে পারি, রঘুচরিত পাঠে তাহাতে নিরাশ হইয়াছি। তিনি অনুসন্ধিৎসু বটে, কিন্তু বক্ষ্যমান গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল না। ফল কথা—পুস্তক খানি ভ্রম প্রমাদ পরিশূন্য হয় নাই। চৈতন্য চরিতামৃত ও ভক্তমালা অবলম্বনেই তিনি রঘুচরিত লিখিয়াছেন।

রঘুনাথের জীবনকাল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম—নীলাচল বাস পর্য্যন্ত পূর্ব্ব জীবন, ২য়—বৃন্দাবনবাস—দেহত্যাগ পর্য্যন্ত শেষ জীবন। আলোচ্য পুস্তিকায় গোস্বামীর পূর্ব্ব জীবন বর্ণিত হইয়াছে, শেষ জীবনের কোন কাহিনী এ পুস্তকে বিবৃত হয় নাই। পুস্তকের আখ্যানভাগ (রঘুনাথের জীবনী) এইরূপ।

সপ্তগ্রামের "কর সংগ্রাহক" * হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস। কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্রই রঘুনাথ দাস। রঘুনাথের হৃদয় ধর্ম্মপ্রবণ—বাল্যাবধিই তিনি বিষয়ে বিরক্ত। বাল্যকালে রঘুনাথ যখন পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন, তখন "যবন কুলোদ্ভব পরম ভাগবত হরিদাসের মুখে হরিনাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া" তাঁহার "ধর্ম্মে মতি" হয়।

হরিদাসকে অনেকেই যবন কুলোদ্ভব মনে করেন, কিন্তু হরিদাসের জন্ম সম্বন্ধে

* এ প্রস্তাবে কোটেশনের ভিতর যাহা আছে, সমালোচ্য পুস্তক হইতে তাহা উদ্ধৃত করা গেল। লেখক।

সংশয় আছে। কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত যে, হরিদাসের পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নাম সুমতি শর্ম্মা, হরিদাসের মাতার নাম গৌরীদেবী। হরিদাসের বয়স যখন ছয় মাস, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; পতি শোকে উন্মাদিনী প্রায় পতিপরায়ণা গৌরীদেবী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করেন। আত্মীয় কেহ ছিল না; নিরাশ্রয় শিশুকে এক মুসলমান প্রতিবাসী লইয়া গিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন, এই-রূপে ব্রাহ্মণ সন্তান যবনত্ব প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ হরিদাস ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান। তাঁহার পিতৃদত্ত "হরিদাস" নামই ইহার প্রমাণ। যাহা হউক, যখন এ বিষয়ে মতদ্বৈত আছে, তখন স্পষ্টাক্ষরে "যবন সন্তান" বলা যুক্তিযুক্ত কি?

১৪৩১ শকে "চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুর আগমন করিলে" রঘু-নাথ তৎসঙ্গ সম্মিলিত হন। বাটী আসিলে রঘুনাথের মন আর গৃহে তিষ্ঠে না, সুতরাং তিনি বার বার পলায়ন করেন। রঘুনাথের পিতা "অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া রঘুনাথকে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং পাঁচজন পাইক"কে প্রহরায় নিযুক্ত করিলেন। আর "রঘু-নাথের প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাসকে বায়ু-রোগের লক্ষণ মনে করিয় আত্মীয়গণকে চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ দিলেন। রঘুনাথ এই অবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া অতি কষ্টে বন্দীভাবে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরে যখন শান্তিপুর আসেন, সমস্ত ভক্তগণ তখন বিহ্বল; সে সময় রঘুনাথ শান্তিপুর আগমন করেন নাই। তবে নীলাচল হইতে যখন গৌরাঙ্গ শান্তি-পুর আসেন, রঘুনাথ তখন শান্তিপুর আসিয়া তৎসহ সম্মিলিত হন। আর এই মিলনের পূর্ব্বে রঘুনাথ, মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলনেচ্ছায় বাড়ী হইতে পলা-ইতে চেষ্টা করেন; সেই সময় গোবর্দ্ধন দাস পুত্রের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়া ছিলেন, শান্তিপুরাগমনের পরে নহে, পূর্ব্বে। কিন্তু রঘুনাথের পিতা যে পুত্রের প্রেমোন্মাদকে "বায়ুরোগ" মনে করিয়া-ছিলেন ও চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ করা হইয়াছিল, তাহা কোথাও শুনি নাই, অঘোর বাবু শুনাইলেন।

ভক্তমালায় লিখিত আছে বটে—[শেষে রজ্জু দিয়া হস্ত রাখিল বান্ধিয়া] কিন্তু চরিতামৃতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। চরিতামৃতের কথাই অধিক প্রামাণ্য, কেন না কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথের সহ বৃন্দাবনে একত্র বাস করিতেন ও তাঁহার সকল কথা জানি-তেন, অঘোর বাবুও বোধ হয় একথা অস্বীকার করিবেন না। তবে বিরক্ত হইয়া একদা রঘুনাথের জননী বলিয়া-ছিলেন—[পুত্র বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া] এ বাতুল শব্দ বিরক্তি প্রকাশক মাত্র। কেননা ইহার উত্তরে গোবর্দ্ধন দাস স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন।

[ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্যভোগ স্ত্রী অপ্সরা সম।
ইহাতে বান্ধিতে যার নারিলেক মন॥
দড়ির বান্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা হইয়া ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে।]

চৈঃ চঃ

রঘুনাথের জন্মদাতার ইহাই প্রকৃত উত্তর। রঘুর পিতা রঘুকে বান্ধিতে সম্মত হন নাই, রঘুর "বায়ুরোগ"ও মনে করিতেন না।

শ্রীগৌরাঙ্গের সহ রঘুর মিলন—গ্রন্থকার চরিতামৃতে যেমন দুইস্থলে পাইয়াছেন, তেমনই গদ্য করিয়া লইয়াছেন; গুছাইয়া—মিলাইয়া দেখেন নাই। তাহা হইলে মহাপ্রভুর সহিত দুইবার মিলনের কথা লিখিতেন না। নীলাচল গমনের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর সহিত রঘুনাথের একবার মাত্র মিলন হয়।

"রঘুনাথ গৃহে আসিয়া গৌরের উপদেশানুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন; বাহ্য বৈরাগ্য ও বাতুলতা পরিত্যাগ করিয়া অনাশক্ত চিত্তে বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া পিতা মাতা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সমুদয় বিষয় সম্পত্তি তাঁহার তত্ত্বাবধানে অর্পণ করিলেন। পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহারে পিতা মনে করিলেন, রঘুনাথের ধর্ম্মানুরাগ হ্রাস হইয়াছে; আর তাঁহাকে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। রঘুনাথ এখন রক্ষকদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন।"

এই কথা নিতান্ত অনুমাণিক। প্রহরীদের হাত হইতে রঘুনাথ মুক্ত হইয়ছিলেন, একথা আমরা কোথাও পাই নাই; কবিরাজও বলেন নাই, ভক্তমালায়ও লিখে নাই। আর রঘু বাহ্য বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইচ্ছা করিলেই কি "বাতুলতা" ত্যাগ করা যায়? তাহা হইলে উন্মাদগ্রস্ত লোক আর থাকিত না।

চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—একদা রাত্রিযোগে প্রহরীরা নিদ্রিত হইলে রঘুনাথ পলাইয়া যান। রজনী প্রভাতে সেবক ও রক্ষকগণ রঘুনাথকে দেখিতে না পাইয়া ভীত হইল।

এখানে জিজ্ঞাস্য যে, নিষ্প্রয়োজন বোধে যে প্রহরীদিগকে পূর্ব্বে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহারা কোথা হইতে সমুদিত হইল? গ্রন্থকারের বলা উচিত ছিল।

এইরূপে রঘুনাথ গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর নিকট গমন করেন। একদা রঘুনাথ স্বরূপের দ্বারা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার "জীবনের উদ্দেশ্য কি?" স্বয়ং জিজ্ঞাসা না করার কারণ—কেবল "অসাধারণ বিনয়" নহে, মর্য্যাদা রক্ষাও বটে। অতি অল্প সংখ্যক ভক্তই সাক্ষাৎ ভাবে মহাপ্রভুর সহিত কথা কহিতে পারিতেন। যাহা হউক, মহাপ্রভু রঘুনাথকে বৈরাগ্য ধর্ম্মের উপদেশ দান করিলেন।

রঘুনাথ ষোল বৎসর শ্রীক্ষেত্রে ছিলেন, তৎপরে বৃন্দাবন আগমন করেন। বৃন্দাবনে তিনি দানচরিত, মুক্তাচরিত ও স্তবমালা নামে তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ও কএকটী বাঙ্গালা পদ রচনা করেন।

অঘোর বাবু লিখিয়াছেন—"রঘুনাথ চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষ, মনঃশিক্ষা ও গুণলেশ শেখর ইত্যাদি কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।"

অঘোর বাবুর কথিত মনঃশিক্ষা ও স্তবকল্পবৃক্ষ স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, পূর্ব্বোক্ত স্তবমালায় (স্তবমালার নামান্তর স্তবাবলী। শ্রীরূপ গোস্বামী স্তবমালা নামে আর এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, দাস গোস্বামীর গ্রন্থ তখন স্তবাবলী নামে আখ্যাত হয়) ২৯টী পৃথক পৃথক্

বিষয় বর্ণিত আছে; মনঃশিক্ষা ও স্তব-কল্পবৃক্ষ—স্তবমালারই অন্তর্নিবিষ্ট দুইটী পৃথক বিষয় বিশেষ।

"গুণ লেশ শেখর" রঘুনাথ প্রণীত, তাহা এই প্রথম শুনা গেল। শ্রীনিবাস শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজ (কবিকর্ণপূর নহেন) কৃত একখানি পুস্তকের নাম "গুণলেশ শেখর" জানি।

অঘোর বাবুর আর একটী ভ্রম—কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তিনি রঘুনাথের "মন্ত্রশিষ্য" বলেন।

[যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস]—ইত্যাদি স্থলে চরিতামৃত গ্রন্থকার স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার গুরু। প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তিও একথা স্বীকার করিয়াছেন। যথা:—

[যদ্যপীত্যাদিনা চ গুরুপদেনাত্র নিত্যানন্দ-প্রভুরেবেতি ব্যঞ্জিতং। ইত্যাদি।]

কবিরাজ চরিতামৃতের প্রতি অধ্যায়ের শেষে "শ্রীরূপ ও রঘুনাথের" নামোচ্চারণ করায় রঘুনাথকে কেন মন্ত্রদাতা বুঝাইবে? তাহা হইলে, শ্রীরূপের নাম কেন? তিনি ত মন্ত্রদাতা নহেন! বস্তুত:—

[শ্রীরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।]

প্রতি অধ্যায় চরিতামৃতের শেষে শ্রীরূপ ও রঘুনাথের নাম উচ্চারণ করিয়া গ্রন্থকার এই ছয় শিক্ষা-গুরুকেই স্মরণ করিয়াছেন। আদিতে শ্রীরূপ ও অন্তে রঘুনাথের নাম থাকায় অন্তরে অবশিষ্ট চারিজন থাকিলেন,—ইহাই বৈষ্ণব ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা সঙ্গত কি না, বিচার ভার পাঠকবর্গের হাতে।

যাহা হউক, এইরূপে দীর্ঘকালের পর রঘুনাথ দেহত্যাগ করেন। অঘোর বাবুর মতে রঘুনাথ ১৫০৪ শকে দেহ-ত্যাগ করেন। 'সজ্জন তোষণী' পত্রিকায় কোন প্রাচীণ বৈষ্ণব ভক্তের লিখিত একটী নোটে দাস গোস্বামীর অপ্রকট-কাল ১৫০৪ শক বলিয়া লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নির্ভর যোগ্য নহে; ভক্তিরত্নাকর এবং কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে তাহার বহুকাল পরে তিনি দেহত্যাগ করেন। বৈষ্ণব দিগ্দর্শিনীর কথা বৈষ্ণবগণ প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে মতে ১৫১৪ শকে চতুর্নবতি বর্ষকালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

তবে অঘোর বাবু রঘুনাথের জন্মকাল নিরুপণ সম্বন্ধে যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার্হ। তিনি বলেন ১৪১৯ শকে রঘুনাথের জন্ম, কিন্তু আমাদের মতে তাঁহার জন্মকাল ১৪২০ শক।

অঘোর বাবু সুলেখক, তাঁহার লেখার ভিতর ছিদ্র থাকা অনুচিত মনে করি। তাঁহার পুস্তক অনেকে পাঠ করিবে, অতএব অনুরোধ—দ্বিতীয় সংস্করণে এ ভ্রম গুলি রঘুচরিতে যেন দেখিতে না পাই। তিনি ভ্রমগুলি শোধন করিয়া লইবেন উদ্দেশ্যেই এ প্রস্তাবটী লিখিত হইল।

শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী।

অভাগিনীর আত্মকথা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষা।

দিদী ও বাবা চলিয়া গেলেন; আমি তখন দিদীর কাজ করিতে লাগিলাম। আশ্রমের প্রায় সমস্ত কাজই দিদী করিতেন। আমাকে তত করিতে হইত না, অধিকাংশ কাজ অধিরাজ নিজে করিতেন; কেবল দুই চারিটী কাজ আমাকে করিতে হইত। এইরূপে কয়েক দিন অতীত হইলে একদিন অধিরাজ আমাকে ডাকিলেন। তাঁহার সঙ্গে দিনের মধ্যে চার পাঁচবার দেখা হইত, সুতরাং তাঁহার কাছে যাইতে আমার তত সঙ্কোচ হইত না।

একদিন সন্ধ্যাকালে মহামায়ার মন্দিরে আরতির আয়োজন করিয়া দিয়া কুটীরের অভিমুখে আসিতেছি, এমন সময়ে অধিরাজ বলিলেন "মা! আজ রাত্রে তোমায় গুটিকত কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

আমি দিদীর কাছে পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, সুতরাং প্রভু বলিবা মাত্র বুঝিতে পারিলাম; অমনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিলাম "যে আজ্ঞে, কখন আসিব?"

"সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া আসিবে।"

আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম এবং যথাকালে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার সম্মুখে একখানি মৃগচর্ম্ম পাতা ছিল, তিনি আমাকে সেই আসনে বসাইয়া বলিলেন, "তোমার ব্রতের দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে, আমার বোধ হইতেছে তুমি সিদ্ধির পথে অনেকদুর অগ্রসর হইয়াছ। সেই জন্য আমি ভুবনকে ও তোমার পিতাকে মায়ের কোন বিশেষ কাজে পাঠাইয়াছি। তোমাকে ও তোমার পিতাকে পাইয়া আমাদের সন্ন্যাসিসেনার অনেকটা শান্তি বাড়িয়াছে, বলিতে হইবে। বিশেষতঃ তোমার পিতা যে, এত কাজের লোক, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। এক্ষণে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। প্রথম প্রথম তোমরা অনেক মনঃকষ্ট পাইয়াছ, কিন্তু বৎসে! সেই সমস্ত কষ্ট সফল হয়, যদি এই তারাদেবীর মূর্ত্তি হিমালয়ের উচ্চ শিখরে যথাস্থানে স্থাপিত করিতে পারি; তাহা হইলেই সকল সার্থক হয়, নতুবা এতদিনের উদ্যোগ ও অধ্যবসায় বিফল হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি সতৃষ্ণ নয়নে মায়ের ভীষণ মুখমণ্ডলের দিকে চাহিলেন; তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর হইল, নয়ন দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "মা! জগদম্বে! যে খর্পরে অসুর শোণিত লোলজিহ্বা দিয়া পান করিতেছ, ঐ খর্পরে কি আমাদিগের শত্রুর শোনিত স্থান পাইবে না? ঐ বিকট লোল রসনা কি সেই রক্তে

পরিতৃপ্ত হইবে না? যাহারা সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পরম শত্রু, জগতের শান্তি ভঙ্গকারী, তাহাদিগের কি ধ্বংস হইবে না?" বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

অধিরাজের ঐরূপ ভাবান্তর পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই; সুতরাং সেদিন তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইলাম; ভাবিলাম—সন্ন্যাসিসেনার কি কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা? নতুবা বাবা ও দিদী হঠাৎ স্থানান্তরে যাইবেন কেন? তাঁহারা যে তীর্থ পর্য্যটনে গেলেন, তাহার কোন বিশেষ কারণ আছে নাকি?" আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে অধিরাজ বলিলেন "মা গৌরি! বার বৎসরে কি শিখিলে আজি সঙ্ক্ষেপে তাহা বুঝিয়া লইব। বল দেখি, বৎসে! মানব জন্মের উদ্দেশ্য কি?"

"জগতে চরম সুখ বাড়াইবার নিমিত্ত।"

"চরম সুখ কি?"

সাম্যকালই চরম সুখ; অর্থাৎ সুখ ও দুঃখে সমান জ্ঞান। কিম্বা সুখ ও দুঃখের অভাবই চরম সুখ।"

"ইহা কি একেবারে হইতে পারে?"

"না, ক্রমে ক্রমে।"

"ব্যাখ্যা কর"

"যথাসাধ্য স্বধর্ম্মাচরণ"

"বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন"

"যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে সন্তোষ"

"আত্মতত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের চরণার্চ্চন"

"নিরন্তর নির্ব্বিরোধ ও নিভৃত স্থানে বাস"

"পরিমিত অথচ বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ"

"অহিংসা ও সত্য কথন"

"বাহ্য ও অভ্যন্তরে শৌচ"

"ব্রহ্মচর্য্য।

"তপস্যা।"

ইহাতে অধিরাজ সন্তুষ্ট হইলেন এবং পূরক, রেচক ও কুম্ভক প্রাণায়ামাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সঙ্ক্ষেপে তৎসমুদয়ের উপযুক্ত উত্তর দিলাম। তাহাতে তিনি অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি" তোমার অচিরে সিদ্ধি হউক, কিন্তু বৎসে, এখনও তোমার কিছু বাকি রহিয়াছে; সেইটুকু হইলে তোমার ও আমাদিগের কার্য্যোদ্ধার হইবে। আগামী কল্য আর একটী ব্রাহ্মণ কন্যা এই আশ্রমে আসিবে; তাহাকে মায়ের দাসী করিয়া লইতে হইবে। ভুবন-মোহিনী তোমাকে দাসী করিয়াছে, এই নূতন কন্যার ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত হইল। দেখিও খুব সাবধান, প্রাণান্তে আশ্রমের গুহ্য কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিও না; সে বড়ই তেজস্বিনী ও চতুরা। তাহাকে দমন করিতে পারিলে আশ্রমের বিশেষ লাভ হইবে। বৎসে! এইবার বিষম পরীক্ষা-স্থল। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যাহা শিখিলে, এক্ষণে তাহার পরিচয় দিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, জীবন পর্য্যন্ত পণ, তথাপি কর্ত্তব্য পণ হইতে কিছুতেই অপসৃত হইও না। আজি যদি তোমাকে কেহ স্বর্গের সিংহাসন দেয়, ভ্রূক্ষেপ করিও না। মাতার আদেশ পালন করিবে, অনন্তের দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

তুমি যদি মাতাকে ত্যাগ করিয়া সেই স্বর্ণ সিংহাসনে লোভ কর, তোমার ইহকাল, পরকাল সকলই নষ্ট হইবে, তোমার স্বর্ণ সিংহাসন দুই দিনে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে, শেষে তুমি এক-মৃণ্ময় সিংহাসনও পাইবে না। আজি যদি তোমার মৃত স্বামী পুনর্ব্বার বাঁচিয়া উঠিয়া বলেন, 'দ্বাদশ বৎসরের ব্রতফল জলে ফেলিয়া দাও, মাকে ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর' তাহা হইলেও তুমি মাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। সেই জন্য বলিতেছি, সাবধান। মুখ বুজিয়া কাজ করিবে। পদস্খলন হইলে চণ্ডালীরও অধম হইবে, আর কিছুতেই তোমার উদ্ধার হইবে না। একদিকে সমস্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপকার, অন্যদিকে তোমার নিজের সামান্য স্বার্থ; সুবিশাল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত তুলনায় তোমার নিজের স্বার্থ কত ক্ষুদ্র! হিমালয়ে ও পরমাণুতে যে তুলনা, সাগরে ও জল-কণার যে সম্বন্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত তোমার নিজের স্বার্থের সেই তুলনা। কিন্তু বৎসে! তুমি নিজে সামান্য নহ, তোমার স্বার্থ ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তোমার আত্মা ক্ষুদ্র নহেন, তিনি মহান, তিনি একাকী শত হিমালয় তুল্য। তুমি যদি সেই আত্মাতে জগতের বল একত্রিত দেখিয়া থাক, তোমারই আত্মা জগতের অন্যত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে—যদি তোমার এই জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। যাহা হউক, এইবার তাহার পরিচয়। আবার বলিতেছি বৎসে, সাবধান, নিজের অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর, যৎসামান্য স্বার্থ ভুলিয়া যাও, ভুলিয়া বিশ্বপতির চরণে আত্মা সমর্পণ কর। এখন যাও, কল্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে সংবাদ পাইবে।"

আমি প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। আসিবার সময় জগজ্জননীর চরণে বার বার প্রণাম করিরয়া বলিলাম "মা! এইবার রক্ষা কর। জননি! যে শক্তিতে মহাকালকে পদতলে রাখিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার নিজে করিতেছ সেই শক্তির কণামাত্র আমাকে দাও, আমার হৃদয় বলবান হউক; তোমার কার্য্য উদ্ধার করি।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিষম সমস্যা।

সেই রাতে কুটীরে আসিয়া শয়ন করিলাম, অন্য দিন যেরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করি এবং শয়ন করিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ি, সে দিন সেরূপ হইল না। দিদী কাছে নাই, একাকীই শয়ন করিলাম, আশ্রমে কোন ভয় নাই। পরম হিংস্র প্রকৃতি বিষধর ভুজঙ্গও হিংসা করে না। সন্ন্যাসীর যোগ বলেই হউক অথবা আশ্রমের গুণেই হউক, আমি স্বচক্ষে অনেকবার প্রত্যক্ষ করি-য়াছি। একাকী শয়ন করিলাম, ভয়ের লেশমাত্র নাই, কিন্তু চিন্তা বড়ই বলবতী হইল। ভাবিতে লাগিলাম, "অধিরাজ এত কথা বলিলেন কেন; বারবার এত

সাবধান করিয়া দিলেন কেন? তবে কি আমি পারিব না; বার বৎসরের ব্রতফল কি নষ্ট হইবে? কখনই নয়,—মা! জগদম্বে! হৃদয়ে বল দাও। আমি তোমার অকৃতজ্ঞ সন্তান নহি।" কত কাঁদিলাম কত প্রার্থনা করিলাম। শেষে আপন মনে আশ্বস্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। হায়! সেই নিদ্রাতেই যদি আমার অনন্ত নিদ্রা হইত, তাহা হইলে এ কলঙ্কিত মুখ আর জগৎকে দেখাইতে হইত না। তাহা হইলে বার বৎসরের ব্রত ফল নষ্ট হইতে না হইতে পরলোকে চলিয়া যাইতাম; আবার জন্ম গ্রহণ করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে সিদ্ধ হইতে পারিতাম। কিন্তু পাপিষ্ঠা আমি; আমার সে সৌভাগ্য কোথায়?

পরদিন নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যেই কাটিয়া গেল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দিদী আশ্রমে না থাকাতে আমার কাজ একটু বাড়িয়াছিল; কিন্তু অভ্যাস বশতঃ তাহা সুচারু রূপে সম্পন্ন করিলাম। সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা আসিল। আমি আহ্নিকে বসিলাম। আহ্নিক শেষ করিয়া মালা জপ করিতেছি, এমন সময়ে সংবাদ আসিল "প্রাসাদে যাইতে হইবে, যাহার আসিবার কথা ছিল, আসিয়াছে। এখনই যাইতে হইবে।" মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া অমনই চলিলাম। তুমি বোধ হয় জান যে, যে গৃহে আমি প্রথমে আসিয়াছিলাম এবং বহুদিন দিদির সঙ্গে একত্রে ছিলাম; তাহার নাম প্রাসাদ। নূতন লোকদিগকে সেইখানে প্রথমে আসিতে হয়। প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম-বিপরীত ব্যাপার! এক উন্মাদিনী বিকট স্বরে চীৎকার করিতেছে এবং সম্মুখে যাহাকে দেখিতেছে "চোর" বলিয়া গালি দিতেছে। আমি ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিল এবং আমার পায়ে পড়িয়া বারবার প্রণাম করিতে লাগিল। তখনই পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে অপর সকলেই গৃহ হইতে চলিয়া গেল, কেবল সেই উন্মাদিনী ও আমি রহিলাম। যত্ন করিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিলাম এবং মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলাম। পাগলের মন; তখন সে চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু অবিরত কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল "বল, ক্ষমা করিবে; বল আমাকে ফাঁসি দিবে না?"

আমি বলিলাম "না, তোমার কিছুই ভয় নাই। তুমি কাঁদিও না।"

উন্মাদিনী আরও কাঁদিতে লাগিল, কাঁদিতে কাঁদিতে এক একবার তাহার শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম; কিন্তু সে তখন কোন কথাই শুনিল না; কেবল কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল "আমাকে তুমি বাঁচাইবে বল। আমি তোমার স্বামীকে দিব" বলিয়া বিকট হাস্য করিল এবং তাহার পরক্ষণেই আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম "আমার স্বামীকে আবার আনিয়া দিবে কি? তিনি যে সর্ব্বব্যাপী, তিনি ত এখানে রহিয়াছেন।" যেমন এই কথা বলিয়াছি অমনি "দাদা! দাদা! আমি তোমার গিরি।" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল

এবং গৃহে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিল। 'গিরি" নাম শুনিয়া আমি চমকিত হইলাম। আমারননদীর নাম—গিরিবালা। যে দিন আমি বিধবা হই, সেই দিন সে শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছিল। তাহার মুখ পানে চাহিয়া দেখিলাম। একবারে বিশ্বাস হইল না, বার বার দেখিলাম;—দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম, সে যে বাস্তবিকই আমার ননদিনী গিরিবালা! একি, এ দুর্দ্দশা কেন? আমার বুদ্ধি শুদ্ধি মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই মা জগদম্বা যেন আমার হৃদয়ে বল দিলেন, আমি উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আবার উত্তেজিত হইলাম এবং কর্ত্তব্যপথে দৃঢপদে অগ্রসর হইব মনে করিলাম। তাহাকে হাসিতে হাসিতে বলিলাম "তোমার কিছু ভয় নাই; আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। তুমি চুপ কর এবং কিছু আহার করিয়া শান্ত হও।"

সে তখন মৃদু হাস্য করিল এবং ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বালকের মত বলিল "হাঁ হাঁ, আমিও তোমার স্বামী আনিয়া দিব। তুমি কিছু খাও।"

আমি বলিলাম "তুমি না খাইলে আমি খাইব না। তুমি সমস্ত দিন কিছুই খাও নাই। কত কষ্ট হইয়াছে। এ তোমারই বাড়ী, তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে; যাহাকে যাহা আদেশ করিবে, সে তখনই তাহা পালন করিবে। তোমার কিছুরই অভাব থাকিবে না।"

উন্মাদিনী অতীব সন্তুষ্ট হইল এবং হাসিয়া বলিল "হাঁ! তবে আমি দাদাকে চাহিলে পাইব? তুমি আনিয়া দিবে?"

"নিশ্চয়ই; তোমায় কোন চিন্তা নাই। তুমি খাও" বলিয়া এক বাটী সরবত দিলাম। অধিরাজের আদেশক্রমে সেই সরবতে পূর্ব্ব হইতেই উন্মাদরোগের ঔষধ মিশ্রিত ছিল। উন্মাদিনী তাহা খাইল এবং অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। উন্মাদিনী ঘুমাইল, কিন্তু সে রাত্রে আমার ঘুম হইল না। ব্রতের জন্য ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা সমস্তই জয় করিতে হইয়াছিল। যখন ইচ্ছা খাইতাম, যখন ইচ্ছা ঘুমাইয়া পড়িতাম। কিন্তু এইদিন আমার সেই ক্ষমতা যেন লোপ পাইল। গিরিবালাকে পাগল অবস্থায় দেখিয়া এবং তাহার মুখে ঐ সকল ভয়ঙ্কর কলরব শুনিয়া আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। সে ঘুমাইলে, সে বাস্তবিক গিরিবালা কিনা, আলো লইয়া ভাল করিয়া দেখিলাম। একবার সে নিজের স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সকলে জানিতে পারিয়া দড়ি কাটিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিল, সেই জন্য তাহার গলায় দড়ির দাগ ছিল। সেই দাগটী আছে কিনা দেখিলাম। দেখিলাম তাহা স্পষ্ট রহিয়াছে। তথাপি সন্দেহ ঘুচিল না; ভাবিলাম অন্য কারণেও এরূপ দাগ হইতে পারে। তখন মনে পড়িল যে, তাহার ডান হাতের বুড় আঙ্গুলে একটী বড় আঁচিল আছে। সুতরাং সেইটীর সন্ধান করিয়া দেখিলাম, ঠিক সেই আঁচিলটী রহিয়াছে। তখন আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন আমি স্পষ্টই বুঝিলাম যে, সে গিরিবালা। কিন্তু তাহার সে দশা কেন হইল, কেনই বা সে সেই সব ভয়ানক

কথা বলিল, আমি তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে একটু তন্দ্রা আসিল; তন্দ্রার আবেশে একটী বিকট স্বপ্ন দেখিলাম। ভাই কেশব! তাহা স্বপ্ন কি বাস্তব দৃশ্য, আজিও আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু সেই দৃশ্য মনে হইলে আমার মাথা ঘুরিয়া যায়, প্রাণভয়ে নরকের অন্তস্থলে লুকাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু নরকেও কি অভাগিনীর স্থান হইবে? অনায়াসে যে দ্বাদশ বৎসরের ব্রতফল বিসর্জ্জন দিল, সোনার অনন্ত মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বরদানকালে স্বহস্তে সেই মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাহার আবার নরকে স্থান হইবে? স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমি স্বামীর জন্য পাগল হইয়া দেশে দেশে ফিরিতেছি; একটা লোক আসিয়া বলিল "আমি তোর স্বামী"। আমি অমনি তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরিলাম; কিন্তু সে অজগর হইয়া আমাকে গ্রাস করিল। পা হইতে গলা পর্য্যন্ত গিলিয়াছে, এমন সময়ে বিকট হুঙ্কার শুনিতে পাইলাম, দেখিলাম—সেই ভীমা তারা মূর্ত্তি ভীষণ খড়্গ দ্বারা আমার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। ভয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে মনে বড়ই অপ্রস্তুত হইলাম। হায়! আমার এত শিক্ষা, এত সাধনা, একটা পাগলের কথায় কি সব নষ্ট হইবে? দিদী যে বারম্বার বলিয়াছিলেন, পিতা যে সর্ব্বদাই শিক্ষা দিতেন, অধিরাজ যে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, এ জগতে কোন রমণীই বিধবা নহে। খুঁজিয়া লইয়া বুঝিয়া চলিতে পারিলে সকলেই আজন্ম সধবা। বিশ্বপতি বাসুদেবকে পতি ভাবিয়া পূজা করিলে আর বৈধব্য থাকে না, আর জনম মরণ ক্লেশ সহিতে হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য মিলনে তাহাদিগের জীবনে অনন্ত রাসলীলা হইতে থাকে। তাহাদিগকে কখনই বিরহ যাতনা সহ্য করিতে হয় না। এই স্বর্গীয় সুধামাখা সদুপদেশ যে কতবার শুনিয়াছি, কতবার যে ইহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছি; তবে সেদিন আমার সে সর্ব্বনাশিনী দুর্ম্মতি ঘটিল কেন? হায়! বাস্তব পদার্থ ছাড়িয়া মরীচিকার প্রতি মন ধাবিত হইল কেন? হা অভাগিনি! তোর মরণ ভাল। আমি সেই জন্যই মরিতে আসিয়াছিলাম। মরিলে সকল যাতনা দূর হইত কিন্তু তুমি মরিতে দিলে না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অধঃপতন।

গিরিবালা আমার সৌভাগ্য সূর্য্যের দুরন্ত রাহু, আমার বক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ। হায়! সে রাহু আমাকে সম্পূর্ণরূপে চিরকালের জন্য গ্রাস করিল না কেন, কেন সে বিদ্যুতে আমি পুড়িয়া ছাই হইলাম না। তাহা হইলে লোক সমাজে আর এ মুখ দেখাইতে হইত না। তাহা হইলে জগতে এ পাপের কাহিনী আর কেহ প্রচার করিত না। আমার বার বৎসরের ব্রত ফল নষ্ট হইল! আমি যে জগৎপতি অনন্তদেবের ব্রতে দীক্ষিত হইয়া বার বৎসর অবিরোধে পার করিয়া আসিলাম, আজি একটা পাগলিনীর কথায় তাহার ফল নষ্ট হইল; বার বৎসরে যে হৃদয়কে পাষাণের মত দৃঢ় করিয়াছিলাম, চিরশত্রু ননদিনীর কথায় আজি তাহা চলিয়া গেল। হায়, নারীর মন! বিধাতা তোকে কি উপাদানে গড়িল! পুষ্প—পাষাণ—বজ্র, কিছুরই সহিত তোর তুলনা দেখিতে পাই না। কুসুম আপনি ফুটে আপনি হাসে, হাসিয়া হাসিয়া জগৎকে সৌরভ বিতরণ করে, শেষে সৌন্দর্য্য ফুরাইলে আশা, পিপাসা সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়া আপনি খসিয়া পড়ে। তাহার কোরকে যে কোমলতা, ফুটন্ত অবস্থায় সেই কোমলতা, আবার যখন নতমুখে খসিয়া পড়ে, তখনও সেই কোমলতা। কৈ, তাহাকে ত কখন কঠিন হইতে দেখিলাম না। তবে নারীর মন কখন সুকুমার, কখন পাষাণ হয় কেন? কেন ফুটন্ত গোলাপের নীচে কালসর্প থাকে; কেন কমলে কণ্টক থাকে? পাষাণেরও সহিত তোর তুলনা হয় না, পাষাণ অনন্ত কালের জন্য কঠোর, কিন্তু তাহাতেও তাহার সৌন্দর্য্য আছে, তন্মধ্যেও তাহার হৃদয় আছে,—তাহার হৃদয়ে যাহা একবার অঙ্কিত হয়, তাহা আর মুছিয়া যায় না। পাষাণ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবে, তথাপি সেই দাগ মিলাইবে না। কিন্তু মন, তুই যদি পাষাণ হ'তিস্ তাহা হইলে যাঁহাকে একবার হৃদয়েশ্বর বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিস্ তাঁকে কেমন করিয়া ভুলিতে পারিস্। যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে একবার অঙ্কিত হয়, আবার তাহা কিরূপে মুছিয়া যায়? তবে কি তুই বজ্র?—না, না, বজ্র হইলে তোর তেজে সব পুড়িত, কমল পুড়িত, কণ্টক পুড়িত, পুণ্য পুড়িত, পাপ পুড়িত, পাহাড়ের চূড়াও পুড়িয়া গুঁড়া হইয়া যাইত!

হায়! হায়! আমি কেন গিরিবালাকে দেখিলাম? দেখিলাম ত তাহাকে চিনিতে পারিলাম কেন? আমি ত তখন স্বামিগৃহে বাস করি নাই, তবে তাহাকে ননদিনী বলিয়া কেন গ্রহণ করিলাম? আমি ত তখন সম্পূর্ণ নূতন জগতে, নূতন নূতন লোকের সঙ্গে বেড়াইতেছিলাম, তবে পূর্ব্ব স্মৃতি কেন জাগিয়া উঠিল? যদি চিনিলাম ত তাহার কথা কেন কাণে স্থান দিলাম? সে ত আমার চির শত্রু। হায়! হায়! কে আমার এ সর্ব্বনাশ করিল! নগরে উঠিতে না

উঠিতে কে নগরে আগুন দিল? সুখের সরোবরে ডুবিতে না ডুবিতে কে কুম্ভীর হইয়া আমাকে গ্রাস করিল? কেশব! কাহারও দোষ নাই, আমি নিজেই দোষী। আমার মন যে আমার নিজের নয়। তবে কাহার দোষ দিব? সে সত্য বলিল কি মিথ্যা বলিল, তাহা আমি বিচার করিয়া দেখিলাম না। তাহার কথাই আমি ব্রহ্মজ্ঞান করিলাম। আমার দীক্ষা—শিক্ষা—সাধনা—তপস্যা সমস্তই বৃথা হইল।

কিন্তু কেন মিছা বকিতেছি। নিজের অযোগ্যতার পরিচয় নিজে আর কি বলিয়া জগতে প্রকাশ করিব?—প্রকাশেই বা ফল কি? পরিতাপে প্রায়শ্চিত্ত হয়—আমার কি ইহাতে প্রায়শ্চিত্ত হইবে? বল কেশব। তুমি ত শাস্ত্র পড়িয়াছ,—বল আমি কি এত পাপিনী যে, কিছুতেই আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না? আমি ত ব্যভিচারিণী নই? শৈশবে যাঁহাকে পতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, পিতা মাতা আমার আশ্রয়স্থল ভাবিয়া যাঁহার হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি ত তাঁহাকে অবহেলা করি নাই? তবে আমার পাপ কিসে? তবে আমার অধঃপতন কিসের জন্য? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমি কি পাগল হইলাম? আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, স্বহস্তে সেই স্বর্গীয় মুখে এই শ্মশান সৈকতে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছি, স্বচক্ষে সেই দেবদেহ পুড়িয়া ছাই হইতে দেখিয়াছি, তবে আমার এ চিত্তচাঞ্চল্য কেন? যিনি এখন স্বর্গে বাস করিতেছেন, যিনি নিজে স্বর্গপতি, তাঁহাকে এ পৃথিবীতে পার্থিব দেহে পাইবার জন্য কেন ব্যাকুল হইলাম? মমতার ডোর ছিঁড়িতে পারিলাম না। হায়, তিনি নিজেই যে কতবার আমাকে বলিয়াছেন "পতিকে স্বর্গগত ভাবিয়া কায়মনোবাক্যে" তাঁহারই সেবা করা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য; সে অমূল্য উপদেশ আমি ভুলিয়া গেলাম! ভুলিলাম ত সকলই ভুলিতে পারিলাম না কেন? হায়! যাঁহার প্রতি লোমকূপে কোটি কোটি স্বর্গ বিরাজ করিতেছে, যাঁহাকে একবার পাইলে আর কখনও বিচ্ছেদ হয় না, যিনি সাক্ষাৎ মোক্ষ, আমি যে তাঁহাকেই পাইব বলিয়া তাঁহারই ব্রত পালন করিতেছিলাম, তবে আমার এ দুর্দ্দশা কেন হইল?

হা কেশব। ভ্রাতঃ। নিজের মুখে নিজ দুর্ভাগ্যের কথা আদ্যোপান্ত সমস্তই প্রকাশ করিলাম, কিন্তু সেই অধঃপতনের কাহিনী বলিতে বুক ফাটিয়া যাইতেছে। সে কথা আমি কিছুতেই বলিতে পারিব না। কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে, সর্ব্বজ্ঞ অধিরাজ সকলই জানিতে পারিলেন, তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। "এরূপ দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া তুই মায়ের কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিবি না" বলিয়া ত্রিশূল কাড়িয়া লইলেন, আমার চোখে কাপড় বাঁধিয়া সেই আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিলেন। আমি মূর্চ্ছিত অবস্থায় ময়দানে অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলাম, যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, চোখ চাহিয়া দেখিলাম, তখন রাত্রি। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, সকলই দেখিতে পাইলাম; কিন্তু সেই স্বর্গীয় সন্ন্যাসীর

আশ্রম দেখিতে পাইলাম না। নিবিড় বন আমার দৃষ্টি রোধ করিল। সেই দিন হইতে কতস্থান ঘুরিলাম, কত তীর্থ দেখিলাম; কত সন্ন্যাসীর পদধূলি লইলাম, কিন্তু আমার কিছুই হইল না। বাবাকে খুঁজিলাম, দিদিকে খুঁজিলাম; কিন্তু তাঁহাদের দুজনকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

সেই দিন—সেই দুর্দ্দিন হইতে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে। আজি অনন্ত চতুর্দ্দশী; আজি আমার ব্রত উদ্‌যাপন হইবার কথা; কিন্তু আমি কোথা, ব্রত কোথা! কোথা সন্ন্যাসিগণ, কোথা মায়ের কার্য্য, কোথায় সে নৃমুণ্ডমালিনী তারা দেবী! সকলই স্বপ্ন, সমস্তই মায়া,—সমুদয়ই প্রহেলিকা!

কুটীরের মীমাংসা।

উপক্রমণিকা।

১। মানুষ যতদিন, বাদ বিসম্বাদও ততদিন—ধ্রুব সত্যও চিরদিনই জাগরূক। যখন বিশ্ব ছিল না, তখন বিশ্বস্রষ্টা সত্য ছিল, কারণ অতদ্‌গুণে তদ্‌গুণ থাকিতে পারে না। কালহীন, ব্যাপ্তিহীন শূন্য অন্ধকার, মনুষ্য কল্পনার অতীত। বায়ু—গতির অবশ্যম্ভাবী সহচর। জল—বায়ুর ঘনীভূত প্রসব। আবার গতি একরূপ উত্তাপ। তবে এ বিশ্বের উত্তাপশীল প্রাণ কোথা হইতে আসিল?

বৈজ্ঞানিক সঙ্কটে পড়িয়াছেন। একটা সামান্য সৌরজগতের কেন্দ্রীভূত সবিতার উত্তাপের উৎস নির্ণীত নাই, সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিতমৃত্তিকাখণ্ডের ইহা অস্খালনীয় অপমান।

আকাশে সূর্য্যগ্রহণ—দুরবীক্ষণ উঠিল। ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব রক্ষক, পরগ্লানির একমাত্র সরবরাহকার, অপবাদের স্বায়ম্ভবমনুরূপ, স্তন্যপায়ী মনুষ্য দ্বিপদের মত, ক্ষুদ্র কাচখণ্ড আপনার ক্ষুদ্র হৃদয় তপ্ত করিয়া, ভূর্ভবস্ব প্রসর হৃদয়ের কলঙ্কের কথা আকাশ হইতে মাটীতে নামাইয়া ফেলিয়াছে! রসায়ন,—পদার্থবিদ্যা, প্রভৃতি বৃদ্ধ গৃহিণীর মত, তাহা কুটিয়া পাড়িয়া, তাহা সিদ্ধ সন্তলন করিয়া, তাহার খুদ কুঁড়া বাদ দিয়া, বেচারার কলঙ্কের পালো আপনার স্পিরিট ল্যাম্প ভাসিত কাচের আলমারির ভিতর তুলিয়া রাখিল। বোতলের গায়ে টিকিট দেওয়া হইল—"সূর্য্য স্বয়ং দীপ্তিশীল নহেন। কেবল একটা প্রোজ্জ্বল আবরণীভূত বায়ুমণ্ডল (?) আমাদের বেদার্চ্চিত সবিতার আলোকের কারণ।

সেই ভাস্বর বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বদাই উৎপাৎ ঝটিকা বহিতেছে। তাই মাঝে মাঝে, মোসাহেবের অন্তর্ধ্যানে বাবুর প্রকৃত সত্বার মত, বায়ুমণ্ডলের অবকাশে, আমরা রবির ভাস্বর কামিজের প্লেটের ভিতর দিয়া, তাহার কৃষ্ণ শরীর দেখিতে পাই।

আবার যুক্তি—তর্ক উঠিল। রবি, একরূপ দহ্যমান উল্কাপিণ্ড পরিপূর্ণ। তেজ তাহার অন্তঃস্থিত দাহ্যপদার্থের।

এ দাহ্যপদার্থ কি? আমাদের এ জগতে এরূপ পদার্থ কোথাও নাই। এ জগতের গ্রহে গ্রহে অনেকটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে—রবি একেবারে বিভিন্ন জীব।

তবে কে কোন্ অন্য বিশ্বের দাহ্যমান পরিবার হইতে ইহাকে অন্ধশূন্যে বিবর্জ্জিত করিল? ইহাকে জ্বালাইল কে?—ইহাতে জ্বলে কি?—একি অন্য বিশ্বের সামাজিক গর্হাযুক্ত জীব এ দেশে জুড়াইতে আসিয়াছে?—শীতল অন্ধকারে বুকের উত্তাপ দিনরাত ডুবাইয়া ডুবাইয়া! একি অন্য পবিত্রতর বিশ্বের ভাস্কোডিগ্যামা, এ শূন্যে আলোকের উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিল!—একি অনাদি অন্ধকারের কাছে আলোকের প্রাণোৎসর্গ? একি আকাশের ধ্রুব প্রহ্লাদ, না বুদ্ধ ইষা, পরতমের আলোক বুকে লইয়া, কোন ভবিষ্য সত্বার কল্যাণে পুড়িতে আসিয়াছে!

বিজ্ঞান,—বিশ্বকর্ম্মার গূঢ় কর্ম্মশালার সম্যক রহস্যবিৎ। বিজ্ঞান বেত্রহস্ত, অবিশ্বাশূন্য, তত্ত্বদর্শী। বিজ্ঞানের অভ্রান্ত সত্য আর একবার শুন। আলোক জ্যোতিষ্মৎ ইথারের অবিরাম আন্দোলনের গুণ। প্রতিপক্ষ বলিল, আলোক একরূপ জড়, কোন রহস্যসূত্রে এ সৌরজগতে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। কনাদ বলিলেন দীপ্যমান পরমাণুপুঞ্জ কোন অদৃষ্ট কারণের বশবর্ত্তী হইয়া, এ সৌরবিশ্বের নির্ম্মাতা। প্রথমে এই অনন্ত আকাশব্যাপী পরমাণুপুঞ্জ একটা বিরাট জ্বলন্ত গোলকে পরিণত হইল। ইহা উপসর্পিনী শক্তির গুণ। "মূর্খে ইহাকেই হিরণ্যগর্ভপ্রসূত ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া থাকে।" তাহার পর আদি গোলকের কেন্দ্র ও মধ্যস্থিত পরমাণুবর্গের অবিষম উত্তাপ সমতায় ও অপসৎর্পিনী শক্তির গুণে, সেই প্রথম গোলক হইতে অনেক আপেক্ষিক ক্ষুদ্র গোলকে উদ্ভব হইল। তাহার পর, মাধ্যাকর্ষণ ও অপসর্পিনী শক্তির গুণে, তাহারা নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরিতে লাগিল। উৎসৃষ্ট দুরোৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র গোলকেরাই সৌরবিশ্বের গ্রহ উপগ্রহ। কেন্দ্রস্থিত নিশ্চল পরমাণুপুঞ্জই সবিতা।

আমরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, গুণ, গুণের আশ্রয় হইতে পারে না, আলোক গুণ! তেজ ও তাপ সমবায় সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এক অন্যের প্রসব নহে। আলোক জড়ের অবস্থা বিশেষের অনুসঙ্গী হইতে পারে, আলোক জড়ের নিত্যগুণ নহে। জড়াশ্রিত আলোকের ক্ষয় বৃদ্ধি আছে। আলোক, গতির গৌণ প্রসব বলিলে জ্যোতির্ব্বিদের, অন্ধতারকা, বা অন্ধসূর্য্যের (Dark Stars) অস্তিত্বে বিশ্বাস হয় না। তাপ বা তেজ এক পদার্থ নহে। এ দীপ্ত পরমাণু সংশ্লিষ্ট গ্রহ উপগ্রহ কালে জ্যোতিহীন হইয়া পড়িবে কেন। আলোক তাহা হইলে গতির প্রসব নহে।

যে কারণেই হউক, কাল, ব্যাপ্তি, তেজ, গতি, প্রভৃতি অসংখ্য পূর্ব্বসম্পাদ্য না লইয়া বিজ্ঞান চলিতে পারে না। পরমাণু পুঞ্জের গতি ছিল, জ্যোতিছিল, অথচ তাহার কারণ বা উৎস নির্ণীত নাই। সকল জড়াত্মক দর্শনের প্রথম

আশ্রয় জ্যোতিষ্মৎ পরমাণু। গতিই সুদূর ভবিষ্যে জীবচৈতন্য। তবে জড়ের নিশ্চেষ্টত্ব (Inertia) পাইবার পূর্ব্বে, কে এই বিশ্বের আদি পুরুষ বর্গের নাসা-রন্ধ্রের ভিতর দিয়া, আপনার পাবকী প্রতিভার ফুৎকারে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল! কে এমন আনন্দ উচ্ছ্বাস, এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হৃদয়ের, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নিগূঢ় আশীর্ব্বাদ সন্তার মস্তকে তুলিয়া বলিয়া দিয়াছিল ঃ—যাও আণবিক সংশ্লেষ! এই অনন্ত শূন্যে রবি শশী গ্রহ উপগ্রহ হইয়া, আলোক আনন্দের পরিবার বাঁধিয়া আইস! কে বলিয়া দিয়াছিল, (আজ তোমরা আনন্দ প্রসব হইলেও ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকের চক্ষে জ্বলন্ত নীহারিকা পুঞ্জ)—যাও, এই অজর প্রখর যৌবন বুকের ভিতর করিয়া, আপন আপন আলোকী কর্ত্তব্যে বিশ্বের অদৃষ্টতন্তু বুনিয়া আইস! দেখাইও কোমলতাই শক্তিশালিনী। সৌন্দর্য্যের তলে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রসুপ্ত থাকে! তোমাদের অবিসম্বাদী, আণবিক ভ্রাতৃতন্ত্রের পার্শ্বে, শূন্যের অন্ধ গহ্বরের ভিতর, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের পরমায়ু কুণ্ডলে গুটাইয়া, সংজননের চিরন্তনধাত্রী অজর অমর চিরকাল, তোমাদের জ্যোতিষ্মৎ প্রসবের সহায়তা করিবে। যাও আনন্দ উদ্ভবের দল!—সৃষ্টি, তোমাদের ভাব জরায়ুর ভিতর নাড়ীচ্ছেদ, স্থিতি, তোমাদের গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যা, প্রলয় তোমাদের অনন্ত আকাশের মাঝে স্বাধীন পরিবার সংস্থিতি। তোমরা সম্পূর্ণ হও, পূর্ণ হও, পূর্ণ চৈতন্য হও। তোমাদের আত্মধর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক।

স্থির হও বাপু!—"প্রকৃতি সত্ত্ব রজ তমের অকার্য্যকারী অবস্থা। মূলে মূল নাই, সুতরাং মূল অমূল। এই মূল প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান কারণ। মূল প্রকৃতির পূর্ব্বে ঈশ্বর নাই। একথা স্বীকার করিলে, তিনি কর্ম্ম ফলভোগ করেন বলিয়া, সামান্য রাজার ন্যায় তাঁহার অবিষ্ঠান স্বার্থপর। বস্তুত পুরুষ, প্রকৃতিতে অবিষ্ঠিত। এই প্রধান পুরুষ সমস্ত জীবের আদিবীজ। এইরূপ জন্যেশ্বর অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রধান পুরুষ অপরের জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন। উষ্ট্রের কুঙ্কুম বহনবৎ তিনি স্বয়ং ফলভোগী নহেন। প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন সকলই মিথ্যা।"

"অকার্য্যকরী অবস্থা"?—জগতে সকল নংতৎপুরুষই তৎপুরুষ-সাধক। তবে সত্ত্ব রজ তমের কার্য্যকরী অবস্থা সূচিত হইতেছে। কার্য্য, কর্ত্তৃ সম্পাদ্য। মহর্ষি এক কর্ত্তৃসত্তার বিলোপ প্রয়াসে তাহারই পূর্ব্ব নির্দ্দেশ করিয়া ফেলিলেন নাকি! "ভাব" "অভাবের" এমন সূক্ষ্মতম ভেদ কল্পনায়, ভা.. ..ত্য ভেদ সন্ধান বা গৃহ বিচ্ছেদ হইল না। সকল অভাব অবস্থা ভাব সত্ত্বার সংস্থাপক।

"নাসতো বিদ্যতে ভাব, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"।

"অব্যক্ত" হইতে "ব্যক্ত" হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। বিশ্বে সকল বিকাশের প্রাগ্‌ভাবই অব্যক্ত। বেদান্তী বলেন ব্রহ্ম (পুরুষ) মূল—আপনার প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া সৃজন করিয়াছেন।

সাংখ্য বলেন প্রকৃতিই মূল। পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত।

কেবল আশ্রয় আশ্রয়ী লইয়া আন্দোলন। কেবল কথার শিকলে কথা টানিয়া ধ্রুব সত্যের পায়ে নিগড় বন্ধন। কেবল লেখা পড়া দিয়া এ বিরাট জ্যোতি ঢাকিবার প্রয়াস। যেখানে সাংখ্যে, সত্ত্ব রজ তমের অকার্য্যকরী অবস্থার ভিতর দিয়া, মূল প্রকৃতির ক্রোড়ে জন্মেশ্বর জন্মাইতেছেন, সেই-খানে বেদান্তের অব্যক্ত পুরুষ, অনন্ত নিবিড় মায়ার আশ্রয়ে এ বিশ্ব লীলায় বিকশিত।

এ বড় ভয়ঙ্কর স্থল!—বিশ্বের এ অন্ধকারময় প্রাগ্‌ভাব! এই শূন্য অন্ধ-কারে ডুবিয়া বৌদ্ধ দর্শনের পরম কাক-ণিক জ্যোতি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অন্ধকারের ভিতর চার্ব্বাকের ঔদরিকতার অজীর্ণ উদ্গার আত্মার তৃপ্তিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। স্থূল দৃষ্টির কাছে এই প্রথম অকাশ হইতেই ঈশ্বর নির্ব্বাসিত তান্ত্রিক এই মহাঘোরা মুক্তকেশী অন্ধকারের ভিতর একরূপ মহাকর্ষণ পরিস্ফুট দেখিয়াছিলেন। কেবল যাঁহারা চৈতন্যের রাজ্যে অধিক-তর পরিস্ফুট, তাঁহারাই কেবল এই অনাদি নিশার সমাধি মন্দিরের রন্ধ্রের ভিতর দিয়া, মূলপ্রকৃতির এই অসংখ্য প্ররোহবদ্ধ মূলের, জটিল গ্রন্থিসংক্রমনপরম্পরার ভিতর জগতের জ্যোতিশীল প্রাণউৎস দেখিতে পাইয়া-ছিলেন। তাই কুরুক্ষেত্রে, মরণের দানবী নৃত্যের পূর্ব্বে, অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণ গভীর পাঞ্চজন্য নিনাদে বুঝাইয়া-ছিলেন—বেদান্তের ব্রহ্ম, সাংখ্যের প্রধান, বৈশেষিকের অদৃষ্ট, ন্যায়ের কারণ, যোগের ঈশ্বর সকলই একসত্তা।

"অজোপি সন্নব্যয়াত্মা লোকানামীশ্বরোপি সন্।
প্রকৃতিম্ স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

তখন বড় উপযোগী অবসরে, (কারণ মরণের মুখ দিয়া, মরণের অনেকটা রহস্য ইতিহাস বাহির হইয়া পড়ে); অর্জ্জুন সেই কুরুক্ষেত্ররূপ মহাবৈতরণীর বেলায়,—অসংখ্য সূর্য্যময়ী জ্যোতির ভিতর, কত দেব, কত দানব, কত ভীষ্ম, কত দুর্য্যোধন, বুদ্‌বুদের মত উঠিতেছে ডুবিতেছে, দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, ধূমকেতুর মত অনন্ত পর্য্যটন করিয়া এই সর্ব্বসবিতার ভিতর আসিয়া পড়িতেছে, আবার বিভিন্ন আখ্যায় অনন্তে বাহির হইয়া যাইতেছে!—মৃত্যু সত্ত্বার জন্য

কারণের বিকার সূর্য্য!

মৃত্যু, সত্ত্বার জন্য কারণের,

উপাদান।

কারণের দিকে পশ্চান্নিবৃত্তি।

বিএ পাশ!—বিকোর্সের হদ্দচূড়ান্ত, বিলাতী বৈশেষিকের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বালখিল্যবর্গ—বাঙ্গালীর শীর্ষস্থানীয়েরা! হাসিতেছেন!—Maxwell, Gunot, Desenelএর ৩৩০০ পাতার ভিতর এ প্রহেলিকা কোথাও নাই। দিকশূন্য অন্ধব্যাপ্তির মাঝখানে, উপসর্পন অপ-সর্পন প্রভৃতির শিকলিবদ্ধ দাঁড়িপাল্লা টাঙ্গান আছে। শিষ্ট, শান্ত, জ্যোতিষ্মৎ পরমাণু, অবিসম্বাদী সুবোধ বালকের মত আপনা আপনি তাহাতে বসিয়া, সত্ত্ব রজ তমগুণে, উপযুক্ত সংখ্যায়

মিলিয়া জুলিয়া, উপযুক্ত অবসরে এ বিশ্বের স্রষ্টা। আমরা এই দেববর্জ্জিত, তুলাদণ্ডসেবী, পোদ্দারের দোকানে বিশেষ কিছু সত্য পাই নাই।

তোমরা বৃহৎ, আমি ক্ষুদ্র। তবু বলি তোমরা হয়ত এ বিশ্ব সংগঠনের, এ মায়া বিস্তারের ইতিহাস কতক বলিতে পার,—তোমরা এ বিশ্বশিল্পীর ভাবসত্ত্বা কিছুই জান না। তোমরা যাহাকে জড় বল, সেই জড় সত্ত্বারও অনেক জানিতে তোমাদের বাকী আছে। জড় জড় করিয়া আজন্ম চীৎকার করিতেছ,—তবু তাহার প্রচ্ছন্ন ধমনীর রহস্য ভুপ্চুপের কথা, তাহার শিরায় শিরায় যে কত সৌন্দর্য্যের প্রবাহ বহিতেছে, তাহার পাষাণ বুকের আড়ালে কত ভীরু ভালবাসা, কত স্নেহ আশীর্ব্বাদ, কত নীরব সন্তাপন যে দিন রাত কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়, তাহা জানিতে পারিয়াছ কি? তোমরা বল কৃত্তিকা কোন পূর্ব্বকালীন গ্রহের ধ্বংসাবশেষ। তোমার টমসন্ ম্যাক্স ওয়েল ছাড়িয়া দাও,—তোমার নিউটন্ ল্যাপল্যাস্ যেথানে আকাশের অন্ধ, উদাসীন, কেশসম্ভারের উপর, দেবতার প্রীতিবর্ষসম, দীপ্ত পরমাণু ঝরিতে দেখিয়া, তাহাকেই বিশ্বের আদি কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন কখন ভাবিয়াছিলে কি তাহাও কোন পূর্ব্বগামী বিশ্বের ধ্বংসাবশেষ হইতে পারে। হয়ত আকাশের ক্যালিডোয়েস্কোপ এর আর একবার আবর্ত্তন হইয়াছে! কখন ভাবিয়াছ কি

মরণের পথ দিয়া জীবনের দ্বার। জীবন বিকাশ মাত্র। জীবনের সাজসজ্জা মরণের নেপথ্য গৃহে হইয়া থাকে। জীবন শুধু যবনিকা উত্থান। মরণ—জীবনের ফল্গু অংশ—অপ্রত্যক্ষ গতিশালিনী।

তোমরা সংসারে গরীয়ান—পূজ্য আমি ক্ষুদ্র, অজ্ঞাতনামা। আমি হৃষীকেশ নহি, আমার পাঞ্চজন্য নাই, যে তাহার নিনাদে তোমাদের এই পঞ্চতন্মাত্র প্রসূত পাঞ্চজন্য জ্ঞানের বিসম্বাদ ঘুচাইয়া দিব। তোমাদের আলোক আছে, তাহাতে কেবল এই ভাস্বর মধ্যাহ্নের মাঝখানে, দীনহীন মনুষ্যের চক্ষে অন্ধতা সৃজন করিতেছ। তবু বলিতে পারি বাপু!—তোমাদের ল্যাবোরেটারীরূপ কৌরব পাশক্রীড়াগারে, এই পঞ্চতন্মাত্রস্পৃষ্টা প্রকৃতির দ্রৌপদীকে যতই বিবসনা করিতে চেষ্টা করিবে, ততই পরতে পরতে বিচিত্র বর্ণের সৌন্দর্য্যের শাটী, ততই আচম্বিত অতনু আনন্দময় আবরণ, ততই কোন ক্ষুণ্ণ কল্যাণের উত্তপ্ত নিশ্বাস, কোন যুগান্তরীণ মরণের হীরকী উপসাহ কোন অভিসম্পাত বদ্ধ আভিচারিক রক্ষাকবচ ইহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া পড়িবে! তুমি যতই তপ্ত বুভুক্ষিত করে ইহার নগ্ন সৌন্দর্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবে, ততই অক্সিজন্, হাইড্রজন্, নাইট্রোজন্, সিলিকন্, কারবন ওকোন্, প্রটোপ্ল্যারম্ প্রভৃতি জলন্ত ধূলি ধোঁয়া আসিয়া, তোমার গৃহলক্ষ্মীর উপাদনীভূত হাত দুটীকে ঝল্সাইয়া ফেলিবে। স্ত্রীমর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ইহার অঙ্গ স্পর্শ করা কাহার সাধ্য! তুমি ইহার দুকূলপ্রান্ত ধরিয়া, শত ঐরাবতের বলে

টানিয়াও ইহার সন্ধ্যা উষার আদিপুরুষ রঞ্জিত, চরণের অলক্তক রাগটুকু কখন দেখিতে পাইবে না।

আমি তোমাদের নিন্দা কবিতেছি না বাপু!—**তোমাদের জড়াত্মক বিজ্ঞান, প্রকৃতির স্ত্রী মর্য্যাদার উপর মনুষ্য প্রতিভার অযথা ব্যভিচার প্রয়াস।** তোমাদের নিন্দা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। বিজ্ঞান—ভগবানের বিভূতিযোগ। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, ক্ষুদ্রের উপকারিতা, ক্ষুদ্রের মহত্ব, ক্ষুদ্রেব সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা। কত ক্ষুদ্র সাধনে বিশ্বে কত মহৎ সিদ্ধি সাধিত হয়, তাহার নির্ণয়ই বিজ্ঞানের যথার্থ অধিকার। যে ক্ষুদ্রের মহত্ব বুঝিতে পারে, সে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায়।

এ অনন্ত আকাশব্যাপী নক্ষত্রপুঞ্জ মানুষের অদৃষ্টের বিধাতা না হইতে পারে, এই বিষ্ণুপদরূপ বিশ্বের অনন্ত ডায়েরে, বিশ্বস্রষ্টার সর্ব্বশক্তিশালিনী প্রতিভা লিখিত আছে। সৃষ্টির মাঝে—সৃষ্টিকৌশল প্রচ্ছন্ন। যে যথার্থ বৈজ্ঞানিক, সে তাহার মানমন্দির বা বিজ্ঞান গৃহের সাহায্যে তাহা পড়িয়া লইতে পারে। যিনি, এই স্থির উৎসব সমুদ্র-বাহিনী আলোকপূর্ণ জলযানযূথের মত, অসংখ্য নক্ষত্র পূর্ণ আকাশে শুধু দাঁড়ীপাল্লা দেখিবার জন্য, দুরবীক্ষণ তুলেন, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্রদায়িনী হইলেও, আলুলায়িত অন্ধকার। বিজ্ঞান মায়া নষ্ট করিতে বলে। যে মায়া নষ্ট করিতে বলে সে দেবতা। কিন্তু যে মমতা নষ্ট করিতে বলে, যে এই নিখিল চরাচরের ভিতর হইতে, এই কালব্যাপ্তি অতীত বিরাট আমিত্ব মুছিয়া ফেলিতে প্রয়াস পায় সে কি? **মমতা—চিরন্তন আমির প্রণয়ী প্রসারণ, মমতা—চির'দবদের আমির চিরবর্দ্ধমান হিল্লোল মমতা—চিরন্তনের, আপনার বুকে, সর্ব্বতোমুখী অবাহুবন্ধনী প্রেম আমন্ত্রন।**

তবে আলো কি?

আলোক, সৌন্দর্য্যদ্যোতক। আলোক, জীবনের প্রধানতম নির্ভর। ক্রমবিকাশ সূত্রে, প্রথম জীবান্নুর ইহা দৃষ্টি উন্মেষক। সাধারণ অনুভবে, ইহা দৃষ্টির আনন্দ আশ্চর্য্যের মহাতীর্থ। ইহা চিরন্তন। ইহা বিশ্ব বিকাশের যমজ সহোদর। ইহা সকল সম্পূর্ণ পবিত্রতার অপরিহার্য্য মঙ্গলচিহ্ন। দেবকল্পনায়, মানুষ, জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্বা না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। গৃহরুদ্ধ উদ্ভিদ অমৃতের আশায় আলোক প্রবেশের পথে, আপনার উপবাসী শির উত্তোলন করিয়া থাকে। তবে আলো কি? গুণ হইলে কাহার গুণ? প্রক্ষিপ্ত হইলে কোথা হইতে প্রক্ষিপ্ত!

ক্রমশঃ—

জাগিল না।

(১)
বসন্ত এসেছে আজি
ফুটিয়াছে কত ফুল;
পুন আজি মধুভরে
ছুটিয়াছে অলিকুল।
(২)
পুনরায় জোছনায়
মধুরিমা ফুটিয়াছে;
নবীন উলসে পুন
গ্রামখানি জাগিয়াছে;
(৩)
ক্ষুদ্র যে তটিনীতার
কুটীরের পার্শ্বদিয়ে;
ধীরে ধীরে বহে যেত
সমুচ্ছল কথা কোয়ে
(৪)
সেও আজি জাগিয়াছে
পেয়েছে আনন্দ কণা
জেগেছে সকলে আজি
সেই শুধু জাগিল না।
(৫)
বাসন্তী প্রাণের মাঝে
ক্ষুদ্র সে কুটীর তার,
সে যে জাগিল না বলে'
হয়ে আছে অন্ধকার!

শ্রীমতী ফুলকুমারী বসু।

প্রিয় বোন্‌টী আমার।

১

প্রিয় বোন্‌টী আমার!
ডাকিতেছে পিককুল কুহুকুহু বকুলে।
গুন্ গুন্ রবে অলি,
সাধে সুধা ফুল কলি,
আনন্দে অধীর বায়ু চুমি নব মুকুলে॥
এ সময় বসি একা,
দেখি কত প্রহেলিকা,
জাগে মনে রাকা শশী আনন তোমার,
প্রিয় বোন্‌টী আমার॥

২

প্রিয় বোন্‌টী আমার!
হের কুন্দমনচোর নিরমল গগণে।
উঠিতেছে হাসি হাসি
মাতাইয়ে দশদিশি,
সমল সলিলে কুন্দ হাসে ফুল আননে।
এ সময় নিরজনে
ভাবি কত আনমনে
জাগিতেছে মনে চারু বরাঙ্গ তোমার।
প্রিয় বোন্‌টী আমার!

৩

প্রিয় বোন্‌টী আমার!
সরলা হরিণী ঘুমে সুউরস শয়নে।
রজতের অলঙ্কারে
সুধাংশু সাজায় থরে,
শ্যামলা প্রকৃতি সতী সুশ্যামল বরণে॥

হায় এ গভীর রাতে,
চেয়ে একা শূন্য পথে,
জাগে মনে আধো মধু বচন তোমার।
প্রিয় বোন্‌টী আমার!

৪

প্রিয় বোন্‌টী আমার!
চকোর চকোরী মিলি চাঁদ সুধা পিয়িছে।
মুঞ্জ যামিনী যোগে,
যুবক যুবতী জাগে,
জোছনা সমীর হের দোঁহে মিলি হাসিছে।
পুরাণ প্রাণের কথা,
পশি প্রাণে দেয় ব্যথা,
বিলীন মলিন ছায়া ধীরে মনে জাগিছে।
সুদূরে ঘুমাও তুমি,
হেথা একা বসি আমি,
ভাবিতেছি মনে মনে কুশল তোমার;
প্রিয় বোন্‌টী আমার!

ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য।

অনুকরণ মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বস্তুদ্বয়ের অঘাতোৎপন্ন শব্দ অথবা জন্তু বিশেষের ধ্বনির অনুকরণেই ভাষার সৃষ্টি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে আর্য্যজাতি মধ্যএসিয়া হইতে ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আদৌ তাঁহাদের এক ভাষা ছিল পরে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্য দিয়া গমনকালীন সেই সেই দেশের শীতোষ্ণতা ভেদে ও নূতন নূতন প্রাকৃতিক দৃশ্যের সংঘর্ষণে উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হয়। বাইবেলে বর্ণিত আছে যে ব্যাবিলনের অত্যুচ্চ গৃহ নির্ম্মাণকালীন ভাষা ভেদ ঘটে। যাহাই হউক অধুনাতন প্রচলিত ভাষা সমূহের শব্দ সকলের উচ্চারণ প্রণিধান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আদৌ তাহারা এক শব্দ ছিল কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। দেশভেদে এইরূপ উচ্চারণ ভেদ ও রূপান্তর বাঙ্গালা ভাষার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। পল্লীগ্রামের প্রচলিত ভাষা অপেক্ষা সহরের ভাষা অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন ও দ্রুতোচ্চারিত; আবার পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত ভাষায় অনেক বর্ণের উচ্চারণ নিম্নবঙ্গের ভাষায় দৃষ্ট হয় না। ইংরাজী ভাষার মধ্যেও স্থান ভেদে এইরূপ উচ্চারণের বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়।

সভ্যসমাজ মাত্রেই দুই প্রকার ভাষার প্রচলন আছে। একটী সাধু-ভাষা অর্থাৎ লিখিবার ভাষা অন্যটী চলিত বা কথোপকথনের ভাষা। আর্য্য জাতি যখন আর্য্যাবর্ত্তে বসতি করিতেন তখন তাঁহাদের যেটী চলিত ভাষা ছিল, তাহার নাম প্রাকৃত। এই প্রাকৃত শব্দের ব্যুৎপত্যর্থ "প্রকৃতেরাগতম্" অর্থাৎ স্বাভাবিক উৎপন্ন। এই প্রাকৃত ভাষাকে ব্যাকরণাদির নিয়মে সংস্কার করিয়া যে লিখিবার ভাষা প্রস্তুত হয় তাহাই সংস্কৃত বা দেবভাষা। ভদ্র-লোকেরা পুস্তকাদি লিখিতে এই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং সাধারণে

ও স্ত্রীলোকেরা প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। প্রাকৃতের শব্দ সকলই যে মার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃতে পরিণত হইয়াছে, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। নিরুক্ত পরিশিষ্টের ভাষ্যে উদ্ধৃত একটী ব্রাহ্মণ বচনে লিখিত আছে—"ব্রাহ্মণা উভয়ীং বদন্তি যাচ দেবানাম্ যাচ মনুষ্যাণাম্" এই দেবভাষাই সংস্কৃত আর মানব ভাষাই প্রাকৃত। এই প্রাকৃত হইতেই সংস্কৃত ভাষার স্থষ্টি।

এই প্রাকৃত আবার চারি প্রকার—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, ও পৈশাচী। খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে কাত্যায়ন বররুচী "প্রাকৃত প্রকাশ" নামক পুস্তকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্রী শৌরসেনীর জননী; শৌরসেনী মাগধ ও পৈশাচী ভাষাদ্বয়ের জননী। সংস্কৃত নাটকোল্লিখিত ভদ্র মহিলাগণের উক্তিতে এই শৌরসেনীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় আর মাগধী বা পালী ভাষা বুদ্ধদেবের উপদেশাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই সংস্কৃত ভাষণ হইতেই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তবে ইহাতে অনেক প্রাকৃত শব্দও মিশ্রিত হইয়াগিয়াছে। কাল ক্রমে ভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে হিন্দী, আরবী, পার্‌সী, ইংরাজী, ইটালিক্, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষার শব্দ সমূহ ইহাতে প্রবেশলাভ করিয়া ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে ও করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতি নির্দ্দেশ করিতে হইলে প্রধানতঃ ইহার তিন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়; ১ম আদিম অবস্থা, ২য় মধ্যাবস্থা, ৩য় বর্ত্তমানাবস্থা।

আদিম অবস্থায় প্রথমতঃ এই বাঙ্গালা ভাষা চলিত ভাষার আকারেই প্রচলিত ছিল। লিখনাদি তখনও সংস্কৃত ভাষায় সম্পন্ন হইত। প্রাচীনকালের অনুশাসন পত্রাদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তখন বাঙ্গালা ভাষার অবয়ব পূর্ণ না হওয়ায় লিখনাদিতে ইহা ব্যবহার হইবার উপযুক্ত হয় নাই। পরে যত শব্দের অপ্রতুলতা অনুভূত হইতে লাগিল, ততই নিকটবর্ত্তী ভাষা হইতে শব্দ সকল অবিকৃত বা রূপান্তরিত ভাবে গৃহীত হইতে লাগিল। এইরূপেই হিন্দি ভাষার অনেক শব্দ এই সময়েই এই ভাষায় প্রবিষ্ট হইল এবং ইহার পর হইতেই বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি লিখিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রাচীন কাব্যাদি গ্রন্থে হিন্দি শব্দের বহুল প্রচলন দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তৎকালীক কবিগণ ভাব প্রকাশার্থ বাঙ্গালা শব্দের অভাব হেতু হিন্দী শব্দ সকল গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই বঙ্গদেশ মুসলমান কর্ত্তৃক বিজীত হইলে যাবনিক অনুকরণে অনেক আরবী ও পারসী শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া যায়। উক্ত হিন্দিও যাবনিক ভাষার শব্দ সকল কালক্রমে এত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের অধিকাংশকেই আর চিনিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ কতকগুলি শব্দ এরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে যে আর তাহাদের উৎপত্তির বিষয় কিছুই জানিবার উপায় নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির গ্রন্থে হিন্দি ও যাবনিক শব্দের ব্যবহার যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল। কথিত ভাষায় আজিও যে সকল পারসী ও আরবী শব্দ দেখা যায়, তাহাও উক্ত পাঠানাধিকারে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ

লাভ করিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই পাঠান অধিকারকাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষার মধ্যাবস্থা।

বর্ত্তমান চলিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত অন্য ভাষা হইতে আগত কতকগুলি শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

প্রাকৃত—কাজ, বউ, হয়, পাথর, বুড়া ইত্যাদি।

হিন্দী—বাপ্, ডর, গাঁজা, আন্দাজ, গহেরা, সবাই, বাগান, পাল্কী, মোটা, ফাটা, সিপাহী, নাও ইত্যাদি।

আরবা ও পারসী—আইন,আদালত, পেয়াদা, হাজির, পেশ্, মামলা, রোকা, গুজরৎ, খোদ, নিরিখ, তারিখ, দস্তখৎ, মালগুজারী, খরিদ, দাখিলা, খুশী, হুজুর ইত্যাদি। ইহার অধিকাংশ শব্দই জমীদারী মহাজনী হিসাব ও আদালতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পরাজিত জাতি অনেকাংশে বিজিত জাতির অনুকরণ করে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই সত্যের বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালীরা যাবনিক আচার ব্যবহার পরিচ্ছদাদির ন্যায় ভাষারও অনুকরণ করিয়াছিলেন। এই সত্যবলেই ইংরাজেরা রোমান্ জাতির ভাষার অনুকরণ করিয়াছিলেন। মুসলমান আক্রমণের পরই যে সকল কবি বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেন, তাঁহারাই বাঙ্গালার আদি কবি, তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক সকল আজিও বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য বলিয়া অভিহিত হইতেছে। এক্ষণে সেই সকল কবিগণের রচনা, সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাৎকালীক বঙ্গভাষার অবস্থার বিষয় লিখিত হইতেছে।

বিদ্যাপতি বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সংস্কারক ও আদি কবি। এই ভাবুকপ্রবর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং রাজা শিবসিংহের সভাসদ থাকিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক পদাবলী প্রণয়ন করেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও ইহাঁর সমসাময়িক। বীরভুমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রাম—চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। এই সকল কবিগণের রচনা সুরস প্রেমভক্তি রসাত্মক। সুললিত রচনায় তাৎকালীক পণ্ডিতগণের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছিল। যে সুললিত রচনা আজিও বাঙ্গালি হৃদয়ে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে, তাহা যে বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের মহামূল্য রত্ন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সম-সাময়িক হইলেও তাঁহাদের রচনায় পার্থক্য আছে। চণ্ডীদাসের রচনার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার প্রভেদ অতি অল্প, কিন্তু বিদ্যাপতির রচনায় হিন্দি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। মিথিলা নিবাসী বিদ্যাপতির রচনায় বীরভূমস্থ চণ্ডীদাসের রচনা অপেক্ষা বহুল হিন্দি শব্দের ব্যবহার হওয়া বিচিত্র নহে। এক প্রকার ভাবের দুই জনের দুইটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠকবর্গ—উভয়ের ভাষাগত পার্থক্য অনেকাংশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল বলে ধনী দেকে পড়ে গেল॥
কবহুঁ ঝাপয়ে অঙ্গ কবহুঁ বিথার।
কবহুঁ বাঁধয়ে কুচ কবহুঁ উথার॥
থির নয়ান নাহি অথির ভেল।
উরজ উদয় থল নালিম দেল॥

জনম অবধি, হমরূপ নিহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল, শ্রবনহি শুনমু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
বিদ্যাপতি।

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারও কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥

এপাপ পরাণে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোর গরল হইল॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এদেহ অনল তাপে পাষাণ যে গলে॥
চণ্ডীদাস॥

চণ্ডীদাসের রচনায় যে আদৌ হিন্দী শব্দ নাই এমত নহে, তবে তাঁহার ভাষা ও ছন্দ বাঙ্গালা ভাবের কিন্তু বিদ্যাপতির ভাষা ও ছন্দ হিন্দি ভাবের। চণ্ডীদাসের ভাষার ন্যায় ভাষাই তৎকালে বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। এই সময়ে নরহরি দাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণের রচিত অনেক পদাবলী বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। ইঁহাদের লেখায় চণ্ডীদাসের ন্যায় হিন্দী শব্দের অল্পই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ তৎকালে কথিত ও আদালত সম্বন্ধীয় ভাষায় যাবনিক শব্দের ও গ্রন্থাদিতে হিন্দী শব্দের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে গোবিন্দ দাস, নরহরি দাস ও বৈষ্ণব দাসের পদাবলীর কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

কিয়ে কিয়ে করে চিত, চমকয়ে ঐছন;
রসময় চম্পু বিথারী।
এত সুখ সম্পদ বহইতে আনমন
যৈছন বামনহি ধরবহি চন্দে।
গোবিন্দদাস।

বৃন্দাবন নব কেলি বিলাস।
করু কত ভাতি যতনে পরকাশ॥
শ্রীগোকুল বিধু গোর কিশোর।
গন সহ যাক গীত রসেরি ভোর॥
নরহরি ভন অব কি কহব তায়।
অনুখন মন জনু রহে তছু পায়॥
নরহরিদাস।

যবহুঁ যে ভাব উদয় হুঁহুঁ অন্তরে।
তব গাযহি দুহুঁ মেলি।
শুনাইতে দারু; পাষাণ গলি যায়ত,
ঐছন সুমধুর কেলি॥
বৈষ্ণব দাস।

ক্রমশঃ—

শ্রীচৈতন্যের চৈতন্য লাভ।

"অস্ত গেলা নদীয়ার শশী ;" *
উদয় হইলা পুনঃ আসি।
অস্ত গেলে সমুদয়,
প্রাকৃতিক রীতে হয়,
কিরণে তিমির নাশে হাসি। ১

সুগভীরা জ্যোৎস্নাময়ী নিশি,
সুধা বর্ষে শরতের শশী,
সাগরের নীল গায়,
দ্বিতীয় চাঁদের ন্যায়,
ধীরে যায় গোরাচাঁদ ভাসি। ২

ভক্তগণ উঠে চমকিয়া ;
নিমাইরে কাছে না পাইয়া।
মা যদি সন্তানে ছাড়ে,
শিশু স্থির হ'তে নারে,
—অন্বেষণে চলিল ধাইয়া। ৩

জেলে এক উন্মত্তের প্রায়,
দ্রুতগতি পলাইয়া যায়।
দেখিল ভক্তগণ,
হতাশ চঞ্চল মন,
যারে পায় তাহারে সুধায়। ৪

ভয়ে অভিভূত সে ধীবর,
ভীত চিত্তে করিল উত্তর ;—
মৎস্য ধরিবার কালে,
ঠেকেছে বিপদ জালে,
শব ছুঁয়ে ভূতের সে ডর। ৫

ধাইল ধাইল ভক্তগণ ;
এতক্ষণে পাইল চেতন।
যেন জলহীন মীনে,
জল পেলে বহুক্ষণে,
কিন্তু হায়! গোরা অচেতন। ৬

কি উপায়ে পাইবে চেতন ?
মূর্চ্ছা ভঙ্গ হবে কি কখন ?
কৃষ্ণের বিরহানলে,
"প্রভু" পড়েছিলা জলে,
—আরম্ভিল কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন। ৭

ধীরে ধীরে ধীরে বহে শ্বাস ;
হ'ল বুঝি জীবনের আশ।
আনন্দিত ভক্তগণ,
আনন্দিত ত্রিভুবন,
পুনরায় শশীর প্রকাশ। ৮

পুনরায় শশীর প্রকাশ,
ভক্তচিত্ত উৎপল বিকাশ।
প্রেম সুধা বরষিল,
তৃষিতা চকোরী পি'ল,
পূর্ণ হ'ল তা'সবার আশ। ৯

শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী।

* কোন শরৎকালীন রজনীতে যমুনাভ্রমে শ্রীচৈতন্যদেব সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যের সমুদ্রপতনোপলক্ষে বিগত অগ্রহায়ণের "সাহিত্যে" চৈতন্যের দেহত্যাগ" শীর্ষক পদ্যটী প্রকাশিত হয়। শরৎকালের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নিমাই সাগরে পতিত হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু একটী ধীবর মৃতপ্রায় চৈতন্যকে উত্তোলন করে এবং বহু যত্নে তিনি চৈতন্য লাভ করেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধান—বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে—বর্ষাকালে, শরৎকালে নহে। ৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসের ৭মী তিথিতে চৈতন্যদেব অপ্রকট হন। অতএব শরৎকালেই "অস্তগেলা নদীয়ার শশী"—সাহিত্যের এ উক্তি অযথার্থ।

গুরুশিষ্যসংবাদ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

শিষ্য। পূর্ব্বদিন অবশ্য জিজ্ঞাস্য কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই; তাই আজ জিজ্ঞাসা করিতেছি। ভাল, যদি বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষ-সংসর্গ-দূষিতা কন্যা, অকন্যা না হইল, তবে "অকন্যেতি যঃ কন্যাং ব্রূয়াদ্দ্বেষেণ মানবঃ" এই মনু বচনে "অকন্যা" শব্দের ব্যাখ্যাতে "নেয়ং কন্যা ক্ষতযোনিরিয়মিতি" অর্থাৎ এ কন্যা নহে, এ পুরুষসংসর্গদূষিতা; টীকাকারের এতাদৃশী উক্তি কিপ্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? (১)

গুরু। এমত স্থলে ক্ষতযোনির কন্যাত্বনিষেধ, গুরুতর দোষারোপকরা-মাত্র; প্রকৃত পক্ষে কন্যাত্ব নিষেধ নহে। টীকাকার কল্লূকভট্ট দূষণকারীর আক্রোশের আতিশয্য প্রদর্শনের নিমিত্তই এতাদৃশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যথা কল্লূকভট্টই আবার কেমন করিয়া বলিলেন যে, "অর্য্যমণং নুদেবম্ ইত্যাদি নতু ক্ষতযোনের্বৈবাহিক মন্ত্র হোমাদি নিষেধকমিদম্" "যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে" তথা "বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্ ইতি ক্ষতযোনেরপি মনুনৈব বিবাহসংস্কারস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ।" অর্থাৎ "অর্য্যমণংনুদেবম্" ইত্যাদি মন্ত্র ক্ষতযোনির (বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষসংসর্গদূষিতার) বৈবাহিক মন্ত্র, হোমাদির নিষেধক নহে; কারণ "যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে" ও "বোঢ়ুঃ কন্যা-সমুদ্ভবম্" এই সকল বচনে মনু স্বয়ংই ক্ষতযোনিরও বিবাহ সংস্কারের কথা বলিবেন।" (১)

আর উন্মত্তা, কুষ্ঠিনী প্রভৃতিকেও অকন্যা বলিতে পার না। কারণ,

নোন্মত্তায়া নকুষ্ঠিন্যা নচ স স্পৃষ্টমৈথুনা।
পূর্ব্বং দোষান অভিখ্যাপ্য প্রদাতা দণ্ডমর্হতি॥ ২

অগ্রে দোষের পরিচয় দিয়া, উন্মাদ গ্রস্তা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা ও পুরুষ সম্ভুক্তা কন্যার সম্প্রদান কর্ত্তা দণ্ডনীয় হইতে পারে না।

এই মনুবচনে ব্যতিরেক মুখে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কুষ্ঠিনী প্রভৃতির বিবাহ দিতে হইলে, অগ্রে তাহার দোষের কথা বর পক্ষের নিকট প্রকাশ করিয়া বিবাহ দিবে। যদি কুষ্ঠিনী প্রভৃতি অকন্যা হইত, তবে মনু কখনই তাদৃশী কন্যার সম্প্রদান বিধি দিতেন না। আর যদিও কুষ্ঠিনী প্রভৃতি অকন্যা, ইহা কথঞ্চিৎ প্রতিপাদন করিতে পার; তথাপি ক্ষতযোনি যে অকন্যা নহে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ সম্প্রদান দূষিতা কন্যাই অকন্যা,

(১) বিধবা বিবাহে ও রত্ন পরীক্ষায় বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষসংসর্গদূষিতাকে অকন্যা বলা হইয়াছে, এই প্রস্তাবে সর্ব্বপ্রথমে তাহাই খণ্ডিত হইতেছে। বিধবা বিবাহের ১৭২ পৃষ্ঠা ও রত্ন পরীক্ষায় ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

(১) মনুর অষ্টম অধ্যায়ের ১২৬ শ্লোকের কল্লূক ভট্টকৃত ব্যাখ্যা দেখ।

(২) মনু ৮।২০৫।

তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রস্তাবের কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শিষ্য। "অন্য" "অপর" প্রভৃতি বিশেষণ থাকিলে, তাহারা নিজ নিজ বিশেষ্যের স্বজাতীয় দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা প্রতিপাদন করে; যেমন অন্য মনুষ্য অথবা অপর মনুষ্য বলিলে, অন্য বা অপর শব্দে নির্দ্দিষ্ট মনুষ্য ভিন্ন তৎ স্বজাতীয় দ্বিতীয় মনুষ্য আছে—ইহাই বুঝায়, সেই প্রকার "পতিরন্যোবিধীয়তে" অর্থাৎ "অন্য পতি শাস্ত্রবিহিত" এই পরাশর বচনে "পতি" শব্দ "অন্য" এই বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তৎ স্বজাতীয় বস্তু অর্থাৎ পতি পতিত হইলেই পত্যন্তর বিহিত, অপতি পতিত হইলে নহে, এই প্রকার অর্থই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব অপতি পতিত হইলে অন্য পতি শাস্ত্রবিহিত এতাদৃশ অর্থ কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?

গুরু। ব্রাহ্মাদি বিবাহে যথাবিধি দত্তাকন্যার পতি, গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিবাহে অদত্তা কন্যার পতি অথবা দ্বিতীয়বার বিবাহে বিবাহিত পতি; এই ত্রিবিধ পতিই অবশ্য শাস্ত্রানুমত এবং সামান্যতঃ পতি শব্দেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নঞ্ সেই ভর্তৃসামান্য বাচী পতি শব্দের সহিত অন্বিত হইয়া, তাহার অপ্রাশস্ত্য মাত্র বিধান করিতেছে; পতিশব্দের পতিত্ব-রূপ অর্থের কোনই হানি করিতেছে না। যদি এমতই হইল, তবে অপতি অর্থাৎ অপ্রশস্ত পতি পতিত হইলে, অন্য পতি শাস্ত্রবিহিত, এতাদৃশ প্রয়োগ কখনই দূষিত হইতে পারে না।

শিষ্য। যদি "পতৌ" এই প্রকার নির্দ্দেশ দেখিয়া, ব্যাকরণের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সম্ভবতঃ অকার প্রশ্লেষ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে "জারেণ জনয়েদ্ গর্ভং গতে ত্যক্তে মৃতে পতৌ। তাং ত্যজেদ পরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপ কারিণীম্"॥ এই বচনে "মৃতেপতৌ" এই প্রকার নির্দ্দেশ থাকায় "মৃতে অপতৌ" এবংবিধ সন্ধিচ্ছেদ করিতে বাধা কি? এই উভয়বিধ প্রয়োগইত সমানাকার ও এক পরাশর সংহিতাতেই আছে। অতএব উক্ত বচনের এই অর্থ হইল যে, অপতি অর্থাৎ অপ্রশস্ত পতি অনুদ্দেশ হইলে, পরিত্যাগ করিলে অথবা মরিলে, যে স্ত্রী উপপতি দ্বারা গর্ভ-উৎপাদন করে, সে পতিতা হয়; সেই পাপকারিণীকে অন্য রাজ্যে নির্ব্বাসিতা করিবে।

গুরু। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" এই বচনে পতিশব্দের পূর্ব্বে অকার প্রশ্লেষ করিয়া যে কেবল ব্যাকরণেরই সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু সংহিতাকারের অনুমত অর্থেরই অনুসরণ করা হইয়াছে; ইহা প্রথম প্রস্তাবে বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। "জারেণ জনয়েদ্ গর্ভং" এই বচনে অকার প্রশ্লেষ করিয়া, তুমি যাদৃশ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলে, তাহা কখনই সংহিতা-কারের অভিমত অর্থ নহে। কারণ, প্রকরণের অনুধাবন করিলে ইহাই বুঝায় যে, পতির অনুদ্দেশ প্রভৃতি স্থলে স্ত্রীর ব্যভিচার নিষেধই উক্ত বচনের উদ্দেশ্য। তবে যে পতিশব্দের গৌণাকৃতি নির্দ্দেশের কোনও অর্থ নাই, তাহাও নহে। এতাদৃশ প্রয়োগ দ্বারা অবশ্যই পতির নিন্দা বুঝাইতেছে। কারণ,

পত্নীকৃত পাপে পতিও লিপ্ত হইয়া থাকে। যথা তন্ত্রসারে,—

রাজ্ঞি চামাত্যজোদোষঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্

যেমন মন্ত্রিকৃত পাপ রাজাতে ও পত্নীকৃত পাপ নিজ পতিতে সংক্রান্ত হয়, সেই প্রকার শিষ্যকৃত পাপ গুরুতে সংক্রান্ত হয়।

এমন কি পত্নীর পাপে পতির পাতিত্য পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে, তাহা মহর্ষি পরাশর নিজেই বলিয়াছেন; যথা—

পত্ত্যর্দ্ধং শরীরস্য যস্যভার্য্যা সুরাং পিবেৎ।
পতিতার্দ্ধ শরীরস্য নিষ্কৃতির্নবিধীয়তে॥

যাহার ভার্য্যা সুরাপান করে, তাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হয়, যাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হয়, তাহার নিষ্কৃতি নাই।

অতএব যখন সংহিতাকার, বিশিষ্ট কারণ বশতঃ পতি শব্দের গৌণাকৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন অকার প্রশ্লেষ করিয়া, শাস্ত্রের অনভিমত অর্থ করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে।

শিষ্য। যদি দত্তাকন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত না হয়, তবে—

কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদি পতিতস্য চ।
অপস্মারি বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ॥

কুল শীল বিহীন, ক্লীবাদি, পতিত, অপস্মাররোগগ্রস্ত, যথেচ্ছাচারী, চির-রোগী অথবা বেশধারী, এরূপ ব্যক্তির সঙ্গে যে কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়, তাহাকে এবং সগোত্র কর্ত্তৃক বিবাহিতা কন্যাকে হরণ করিবেক অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তির সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিবেক। (১) ক্রমশঃ—

(১) উদ্বাহ তত্ত্বধৃত বশিষ্ঠ বচন।

আমার পশ্চিমে চাকরী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইংরাজের উদ্যোগ ও ভয়—
নদীতে ভীষণ হত্যাকাণ্ড।

নামটা আমার ঠিক্ মনে নাই—হিলার্স কি হিলডেন এই রূপ নামেই এক জন ইংরেজ সেই সময় কানপুরের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার ছিলেন। নানা সাহেবের নাচ গান ও প্রীতি ভোজের দরুণ তিনি তাহাকে বিশেষরূপে চিনিয়াছিলেন। নানার উপর তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁহার নিজের ও বন্ধুবর্গের পরিবারবর্গকে নানার—বিঠুরের বাটীতে র'খিয়া নিরাপদ করিতে চাহিয়াছিলেন। নানা—বীর পুরুষ, তিনি গবর্ণমেণ্টের এ বিপদের সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। কালেক্টার সাহেবের বন্দোবস্ত অনুসারে নানা-সাহেব

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের পাঁচশত সিপাহী লইয়া, নবাবগঞ্জের থাজনাথানা রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইলেন।

কাজটা অবশ্য লাভের জন্য নহে, কেবল গবর্ণমেণ্টের উপকারের জন্য। নানা সাহেবের এইরূপ সহৃদয়তা ও সহানুভূতির জন্য কালেক্টার সাহেব এমন কি কানপুরের অনেক বড় বড় ইংরাজ তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এ প্রকার রাজভক্ত লোকের হাত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে, সমূহ অন্যায় করিয়াছেন ইহা তাঁহাদিগের মনে সময়ে সময়ে উদিত হইতে লাগিল। *

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। আমি দুই তিন বার করিয়া সপ্তাহে আমার পরিবারবর্গকে দেখিয়া আসিতে লাগিলাম। আপিসের কাজকর্ম্মও চলিতেছে। সাহেবদেরও বিদ্রোহ সম্বন্ধে আশঙ্কা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বহুক্ষণ ধরিয়া অন্ধকার দেখিলে যেমন ভবিষ্যতে ঝটিকা আশঙ্কা মনে উদিত হয়, কানপুরের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক্ সেইরূপ বোধ হইল। রাত্রে যদি দশ বারটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিত মনে হয়—ঐ সিপাহী ক্ষেপিল। আমি ভীতু বাঙ্গালী বলিয়াই যে কেবল ঐরূপ ভয় পাইতাম, তাহা নহে। অনেক বড় বড় সাহেবও ঐ সময়ে আমার মত অবস্থাগ্রস্থ হইয়াছিলেন।

মধ্যে আর একটী সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল; সকলেরই চিত্ত তাহাতে আকুলিত হইল। ইংরাজ মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সংবাদ আসিল—কানপুরের পক্ষে একদল অশ্বারোহী সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া সমস্ত ইংরাজ অফিসারদের নিহত করিয়াছে। এ সংবাদ কানপুরে পৌঁছিবামাত্র, ইংরাজ মহলে বড় একটা আশঙ্কা ও বিভীষিকার আবির্ভাব হইল। সকলেই বুঝিলেন, কানপুরে যে অগ্নি ধূমায়িত হইতেছে, তাহা শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠিবে।

হুইলার সাহেব ক্রমশঃ বিশেষ সতর্কতা আরম্ভ করিলেন। সৈন্যদিগের মতি গতি প্রচ্ছন্নভাবে পরীক্ষার জন্য তিনি দুই জন গুপ্ত-চর নিযুক্ত করিলেন। উপযুক্ত লোক দেখিয়াই প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহারা যে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিল, তাহাতে সিপাহীদিগের সম্বন্ধে অনেক গোপনীয় কথা হুইলারের কাণে উঠিতে লাগিল।

এই দুই জন গোয়েন্দার মধ্যে এক জনের নাম বদ্রীনাথ। বদ্রীনাথ কমিসরিয়েটের গোমস্তা—ইংরাজের কর্ম্মচারী—কিন্তু খুব বিশ্বাসী, খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। আর এক জন মুসলমান, নাম—আমীর খাঁ। আদত খাটি পাঠান, ইংরাজের নিমকের মর্য্যাদা রাখিতে বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই দুই জন প্রধান গোয়েন্দার অধীনে দশ বার জন বিশ্বস্ত লোক ছিল, তাহারা কখনও ভিস্তী সাজিত, কখনও বা ফেরিওয়ালা সাজিত, কখনও বা দুধ, শাকসব্জী বিক্রেতা হইত, কখনও বা সময় বুঝিয়া কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া ঘুরিত। কেহ মজুর সাজিয়া মজুরী করিত—এবং কেহ বা সিপাহীদের উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিয়া তাহাদের মনের

* এইরূপ মর্ম্মের একখানি চিঠি আমি একবার পড়িয়াছিলাম।

কথা জানিবার চেষ্টা করিত। বদ্রীনাথ আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী বিশেষতঃ সে অনেক সময়ে আমার কাছে অনেক উপকার পাইয়াছিল সুতরাং আমাকে ভক্তি ও স্নেহ করিত। হুইলার সাহেব এই লোককে গুপ্তচর নিযুক্ত করায় আমার বিশেষ সুবিধা হইল। আমি একদিন গোপনে বদরীকে ডাকিয়া বলিলাম "দেখ বদরীনাথ! আমি তোমায় কখনও কোন বিষয়ের জন্য অনুরোধ করি নাই। কিন্তু আজ-কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে এ বিষয়ে তোমার নিকট সাহায্য না লইলে কোন উপায় নাই। আমার বিশেষ অনুরোধ—তুমি যখনই জানিতে পারিবে যে, কানপুরের সিপাহীরা ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইবে, তখনই হুইলার সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সংবাদ দিবে। বদ্রীনাথ আনন্দের সহিত এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল এবং বলিল "বাবু সাহেব। লিখিত সংবাদ—বিশেষতঃ এ সময়ে—এ সম্বন্ধে পাঠাইলে আমার খালি চাকরি নয়—ইংরাজের হুকুমে প্রাণ পর্য্যন্ত তোপের মুখে যাইবে। তবে এই কথাবার্ত্তা রহিল—প্রথম বিদ্রোহ সংবাদ পাইবামাত্রই আমি আপনাকে একগাছি যষ্টি আমার চাকরের দ্বারা পাঠাইরা দিব। তাহা হইলেই আপনি বুঝিবেন যে, বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।

ইংরাজেরা কিন্তু প্রথম হইতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনেকে স্ত্রীপুত্রদিগকে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিবার জন্য দেশীয় ভৃত্যদিগের বা সম্ভ্রান্ত বন্ধুবর্গের গৃহে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে লাগিলেন। অনেক সাহেব ও মেম, নিজেদের ও ছেলেদের জন্য গোপনে এক এক সুট হিন্দুস্থানীর পোষাক পর্য্যন্ত প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন—বদ্রীনাথ আমায় এই সমস্ত সংবাদ দিয়া গেল।

অম্বালায় বন্দুক শিক্ষা দিবার এক সৈনিক বিদ্যালয় আছে। অনেক দিন হইল জনকতক মুসলমান সিপাহী অম্বালায় নূতন ধরণের বন্দুক, কাওয়াজ শিক্ষা করিতে গিয়াছিল। তাহারা আবার এই মাহেন্দ্রক্ষণে ফিরিয়া আসিল। তখন ইংরাজ সেনার মধ্যে Enfieldএর পাট্যার্ণ অনুযায়ী বন্দুক ব্যবহৃত হইত। ইহা ছুড়িতে হইলে দাঁত দিয়া টোটা কাটিতে হয়। মুসলমান সিপাহীরা কানপুরে তাহাদের হিন্দু ও মুসলমান সঙ্গীদের নিকট এই নূতনবিধ বন্দুক ছোড়ার কার্য্য প্রণালী এরূপভাবে বর্ণনা করিল যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ইহাতে আশঙ্কিত হইয়া—মনে মনে ইহার প্রচলনের বিরুদ্ধে সংকল্প স্থির করিল।

সহরের অবস্থাতে যেন বিদ্রোহা-শঙ্কা প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজেরা—যাঁহারা সহরের চারিদিকে ছড়াইয়া-ছিলেন, সকলেই খালের ধারে—ছাউ-নীর সীমার মধ্যে আসিয়া জুটিয়াছেন। তাঁহারা গঙ্গার ধারে "বারুদখানা"কে (Magazine) আপনাদের আশ্রয়স্থল করিবার জন্য হুইলার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেব তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য—বিদ্রোহ সংবাদ পাইলেই তিনি বারুদখানায় আগুণ লাগাইয়া দিয়া, সিপাহীদের বারুদ লুঠের পথ বন্ধ করিবেন।

আমি অনেক দিন স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখি নাই। একবার সাহেবকে বলিয়া আমার বন্ধুর বাটীতে গেলাম। দেখিলাম, তাহারা সেখানে বাটীর অপেক্ষাও স্বচ্ছন্দে আছে। ব্যাঙ্কে ও আশেপাশে আমার যে সমস্ত টাকাকড়ি ছিল, সমস্তই সেই দিন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। টাকাগুলি আমার স্ত্রীর নিকট রাখিয়া দিলাম। তৎপরদিন প্রাতে আহারাদি করিয়া আবার আপিসে আসিলাম। আসিবার সময় পথে—একবার বদ্রীনাথের বাড়ী গেলাম। সেখানে মহা খাতির। সে আমায় কোথায় বসাইবে, কি করিয়া আদর করিবে—কিছুই খুঁজিয়া পায় না। তাহার মুখে শুনিলাম—কানপুরের সিপাহিরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে, তাহারা আর কোম্পানির চাকর নহে—শীঘ্র তাহারা দিল্লীর বাদসাহের পতাকা চুম্বন করিবে। তবে সহরে কোন অত্যাচার বা ইউরোপীয়দের উপর কোন পীড়ন করিবার ইচ্ছা তাহাদের নাই। কিন্তু কথার ভাবে বোধ হয়, থাজনাথানাটা তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। দিল্লীর বাদসাহের নিকট যাইতে হইলে সুধু হাতে যাওয়া চলে না; কিছু নজর চাই। দরিদ্র সিপাহী নজরের টাকা কোথা পাইবে? তাহাদের নাই কিন্তু কোম্পানির ত আছে। তাহাদের হাতে কোম্পানির বন্দুক ত আছে। বন্দুকের জোরে তাহারা যাহা হয় একটা করিয়া যাইবে।

আমি আমার সাহেবকে গিয়া এই সংবাদ দিলাম। কথাটা—ক্রমে ক্রমে হুইলার সাহেবের কাণে উঠিল। তিনি থাজনাথানা হইতে নগদ চৌত্রিশ হাজার টাকা, কোম্পানির কাগজপত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সরকারী দলিল সমস্তই স্থানান্তরিত করিয়া—নূতন গড়খাইএর মধ্যে আনিলেন। নূতন গড়খাই—ক্যাণ্টনমেণ্টের চারিদিকে নূতন করিয়া প্রস্তুত হইতেছিল।

হুইলার সাহেব—সিবিল, সওদাগর, সরকারী, বেসরকারী সাহেবদের একদিন একত্র করিয়া বলিলেন "আপনারা ভয় পাইয়া সহর পরিত্যাগ করিবেন না। সিপাহীরা যে ইংরাজদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে—তাহাত সহজে বোধ হয় না। যদিও করে—আমাদের যে সৈন্য মজুত আছে ও যাহা আসিতে লিখিয়াছি, তাহাতে তাহাদিকে সহজেই দমন করা যাইবে। আপনারা ভয় পাইলে সিপাহিরা সাহস পাইয়া উন্মত্ত হইবে। তখন শেষ রক্ষা অতি দুরূহ হইয়া পড়িবে।"

যাঁহারা কানপুর ত্যাগের জন্য নৌকাদি জোগাড় করিয়াছিলেন বা অন্য কোন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বড় মিলিটারি সাহেবের এইরূপ আশ্বাসবাণী শুনিয়া তাঁহারা সে সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।

আমাদের আপিসে হুকুম আসিল, নূতন গড়খাইএর মধ্যে রসদ জোগাইতে হইবে। হাজার লোকের একমাস চলে, এরূপ রসদের প্রয়োজন। আমরা তদনুসারে দুই একদিনের মধ্যে আটা, ডাল, ঘৃত, লবণ, চাউল, চিনি, রম, দোয়াস্তা ইত্যাদি উপযুক্তরূপ আহরণ করিয়া দিলাম।

আমি এখন গড়খাইএর মধ্যে সাহেবের ঘরের পাশে একটী কামরাতে আড্ডা করিলেও আমার আহারাদি সহরে আমার খুড়তুত ভাইএর বাড়ীতেই হইত। একদিন আহারাদির পর ছাউনীতে যাইতেছি, দেখি—একদল পদাতি সৈন্য লক্ষ্ণৌ হইতে আমাদের সাহায্যার্থে আসিয়া উপস্থিত হইল। আপিসে গিয়া শুনিলাম, এলাহাবাদ হইতে আরও একটী রেজিমেণ্ট আসিতেছে। ইংরাজদের ইহাতে বড়ই আনন্দ হইল কিন্তু সে আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না।

সার হেন্‌রি লরেন্স তখন লক্ষ্ণৌএর কর্ত্তৃত্বভার লইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ভূয়োদর্শী উদার চরিত, স্বদেশ ভক্ত রাজকর্ম্মচারী অতি অল্পই এদেশে আসিয়াছেন। তাঁহার শরীর রুগ্ন, পঞ্জাবের সুশৃঙ্খলা সাধনে জীবনের তীব্র শোণিতের তেজ নানা বাধা বিপত্তিতে মন্দীভূত; ছুটী লইয়া তিনি বিলাত যাইতেছিলেন—কিন্তু লর্ড ক্যানিং তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত একজন কর্ণধারকে এ ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলে মহা বিপত্তির সম্ভাবনা। তিনি কাজেই জোর চিঠি লিখিয়া—বিশেষ অনুরোধ করিয়া লরেন্স সাহেবকে লক্ষ্ণৌএ পাঠাইয়া দেন।

ভবিষ্যতে দৃষ্টি রাখিয়া যে সকল রাজকর্ম্মচারী সেই সিপাহী যুদ্ধে ইংরাজ রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, সার হেনরি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ন্যায় অবস্থাভিজ্ঞ, কৃতী, কৃতজ্ঞ সন্তান ইংলণ্ড অতি অল্পই পাইয়াছেন। অবস্থাভিজ্ঞ লরেন্স—হুইলারের অনুরোধে সেনাগুলিকে কানপুরে পাঠাইলেন বটে কিন্তু স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—লক্ষ্ণৌএর অবস্থা কানপুরের অপেক্ষাও শোচনীয়। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন "যদি বিশেষ আবশ্যক বোধ করেন—এই ইংরাজ পদাতিদলকে কানপুরে রাখিবেন। কিন্তু যদি আবশ্যক না থাকে—তবে ইহা হইতে কতক সৈন্য আমার নিকট পাঠাইবেন।"

জেনারেল হুইলারও কর্ম্মদক্ষ লোক। কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সার হেনরির মত নহে। তিনি এলাহাবাদের উপস্থিত কতক সৈন্য ও লক্ষ্ণৌএ হেনরি সাহেব প্রেরিত কতক সৈন্য লক্ষ্ণৌএ পাঠাইয়া দিলেন। আমাদের অবস্থা পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এখনও তাহাই দাঁড়াইল।

এই সময়ে একদিন প্রাতে উঠিয়া নদীতীরে বেড়াইতে গেলাম। গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আত্মা পুরুষ শুকাইয়া গেল। দেখিলাম, রুধিরসিক্ত দুই ইংরাজ পুরুষ ও রমণী দেহ—জাহ্নবীর স্রোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। আমি দৌড়িয়া আসিয়া ছাউনীতে খবর দিলাম। সাহেবরা নৌকা করিয়া সেই মৃতদেহদ্বয় উদ্ধার করিলেন। কাহাদের শব—তাহা স্থির হইল না। মৃতদেহ বড় পচিয়া ও ফুলিয়া উঠিয়াছিল। অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। শব দুটির অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বদিন দিবাভাগে তাহাদিগকে কেহ হত্যা করিয়াছে। কিন্তু কে হত্যা করিল? সিপাহী? স্থির কিছুই হইল না, তবে জনরব শতমুখে এই বার্ত্তা ঘোষণা করিল যে, সিপাহীরা দুই জন ইংরাজকে হত্যা করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছে। এ সংবাদে সহরের ইংরাজদের মধ্যে এক হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ক্রমশঃ—

সেকালের বড়লোক।

মহারাজ নবকৃষ্ণ।

(২)

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হয় তাহাদের উপায় ভগবান নিজেই করিয়া দেন। রামচরণের বিধবা—ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়া পুত্রগুলি অতিকষ্টে মানুষ করিতে লাগিলেন। রামসুন্দর মাতার দুঃখ, নিজের দায়িত্ব, ভ্রাতাদিগের পরিপালন-ভার, সাংসারিক অবস্থার উন্নতি এই সকল গুলিকে সম্মুখে রাখিয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসার ধর্ম্মের উপযোগী হইয়া উঠিলেন।

নবাব সরকারে পূর্ব্বে প্রতিপত্তি ছিল বলিয়াই রামসুন্দর আবেদন মাত্রেই পঞ্চকুটের ও অন্যান্য কয়েকটী স্থানের সুপার ভাইজারের পদলাভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল। সংসার-পালন, মাতার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন, ভাইদিগকে তৎকালীন প্রথামত শিক্ষাদান, ইত্যাদি কার্য্যে রামসুন্দরের উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল।

গোবিন্দপুর কোথায় ছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইংরাজ এই গোবিন্দপুরে কেল্লা তৈয়ার করিবার সংকল্প করিলেন। গোবিন্দপুর তখন একখানি গণ্ডগ্রাম। এখন কলিকাতায় যাঁহারা বনিয়াদি বড় মানুষ তাঁহাদের দু'চারজন গোবিন্দপুরে থাকিতেন। সকলেরই বাড়ীঘর গেল। রামসুন্দর অগত্যা আড়পুলীতে উঠিয়া আসিলেন। কিন্তু আড়পুলী তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি আবার সুতানুটী অঞ্চলে একটী বাড়ি ও কয়েক বিঘা জমী খরিদ করিলেন। এই বাড়ী ও জমী বর্ত্তমান শোভাবাজার রাজবংশের বাস্তুভিটার মূল পত্তন করিল।

নবকৃষ্ণ তখন মুরসীদাবাদে পারসী অধ্যয়ন করিতেন। ইংরাজী যেমন এখনকার অর্থকরী বিদ্যা সেই সময়ে পারসীও সেইরূপ প্রধান ছিল। ইংরাজের আমল তখন হইয়াছে বটে কিন্তু ইংরাজ তখন সওদাগর মাত্র। তাহাদের বিশেষ সত্ব কিছুই নাই। তাঁহারা সাধারণ প্রভাব সামিল তবে ফ্যাকটরি ও তাহার রক্ষার্থে দুচারজন সেনা কতকগুলি অস্ত্র শস্ত্র তখন তাঁহাদের কেবল প্রভুত্ব পরিচায়ক। ইহাদের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে বা কাজ কর্ম্মে যাঁহারা লিপ্ত হইতেন তাঁহারাই দুই একজন ইংরাজী শব্দ ওয়ালাকে আয়ত্বাধীন করিয়া রাখিতেন। *

* রীতিমত ইংরাজি শিক্ষা তখন হইত না, তবে Vocabularyর কথা কতকগুলি সেকালের লোকে শিখিয়া রাখিতেন। এই কথাগুলি মাঝে মাঝে অসম্বদ্ধ রূপে একত্রিত হইয়া এক অদ্ভুত ভাবে মনোভাব প্রকাশের সহায়তা করিত। যাঁহার যত ইংরাজি শব্দ মুখস্থ থাকিত, তিনি তত পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন এখনকার

নবকৃষ্ণ পারসীতে খুব পাকা হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার অন্ত চাকরী জুটিল না বটে কিন্তু পারসী পড়াইয়া তিনি অর্থাগমের উপায় করিলেন। তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব নূতন কলিকাতায় আসিয়াছেন। উভয়েই সমবয়স্ক; হেষ্টিংস, নবকৃষ্ণের নিকট পারসী শিখিতে লাগিলেন। †

সেরাজদ্দৌলা তখন বাঙ্গালার মস্নদে বসিয়াছেন। তাঁহার অত্যাচারে—সেই অপরিণত বুদ্ধির ও আলিবর্দ্দির অসাধারণ প্রশ্রয়ের পরিণামে ফল স্বরূপ বাঙ্গালা দেশে এমন কতকগুলা কার্য্য হইয়া গিয়াছে যাহাতে বাঙ্গালার সমস্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁহার বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াছেন। তরুণবয়স্ক নবাবের অত্যাচারে যখন বাঙ্গালার প্রধানগণ, সর্ব্ববিষয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন নবকৃষ্ণ কলিকাতায় মুন্সীগিরিতে নিপুণ।

রাজা রাজবল্লভ ঢাকার গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার সহিত কি কারণে নবাবের মনান্তর ঘটে, তাহা রাজবল্লভের নামে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলিলেই চলিবে। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, রাজা রাজবল্লভ নবাবের পীড়ন ভয়ে নিজপুত্র কৃষ্ণদাসকে তীর্থ-দর্শনচ্ছলে কলিকাতায় ইংরেজাধিকারে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন।

অন্যায়রূপে তহবিল তছরূপ করা,—রাজবল্লভের বিরুদ্ধে নবাবের অন্যতম অভিযোগ। সম্পত্তি বাঁচাইবার অন্য কোন উপায় নাই বলিয়াই তিনি কৃষ্ণদাসের নৌকায় ধন রত্ন বোঝাই করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। নবাব যখন শুনিলেন রাজবল্লভ প্রতারণা করিয়া যথেষ্ট ধন সম্পত্তি সমেত পুত্রকে কলিকাতায় ইংরেজ অধিকারে আশ্রয় লইতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তখন তিনি এক জোর "রুবকারী" কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের নামে পাঠাইলেন।

নবাবের চিঠির উত্তর গেল। ড্রেক সাহেব লিখিয়া পাঠাইলেন—"আশ্রিতকে পরিত্যাগ—ইংরাজের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কৃষ্ণদাসকে তাহারা যখন আশ্রয় দিয়াছেন, তখন অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন—তাহাতে তাঁহারা প্রস্তুত।"

অধীনস্থ প্রজার এই প্রকার অদ্ভুত পত্রোত্তর দেশাধিপতির কাণে কিরূপ প্রতিঘাত করিতে পারে—ড্রেক সাহেব তখন ততটা তলাইয়া বুঝেন নাই। তিনি নিজেও বড় একটা পাকা লোক ছিলেন না। সিংহের মুখ মধ্যে হস্ত প্রবেশ করানর কি ভয়ানক ফল, তাহা জানিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার বুদ্ধির দোষে কলিকাতায় ইংরাজের বাস্ত লোপ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল।

ড্রেক সাহেবের পত্র পাইয়া—সেরাজউদ্দৌলা ঘৃতসিক্ত অগ্নির ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। পত্রের উত্তরে আর এক পত্র আসিল—"আপনারা আমার

ইংরাজি নবীশেরা সে সকল ইংরাজি শুনিলে হাস্য কোলাহলে মজলিস্ মাতাইয়াছেন।

† Lord Thurlow, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নামে পার্লামেণ্টে অভিযোগের সময় বক্তৃতা মুখে নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"He (Navakrishna) was the Persian Precepter of Mr. Warren Hastings so far back as the year 1750. when they were both youngmen." এত পলাসী যুদ্ধের ৭ বৎসরের আগের কথা।

অধিকারে আমার অনুমতি না লইয়া দুর্গ সংস্কার করিতেছেন—পত্রপাঠমাত্র তাহা স্থগিত করিয়া দিবেন—আর আমার বন্দী কৃষ্ণদাসকে আবদ্ধ অবস্থায় মুর্শীদাবাদে প্রেরণ করিবেন। অন্যথায় আমি কলিকাতা হইতে আপনাদের বাস উঠাইব”। বস্তুতই ইংরেজেরা তখন কলিকাতায় দুর্গ-সংস্কার করিতেছিলেন, কিন্তু অন্য সময়ে, ও বিভিন্ন ঘটনা-ক্ষেত্রে। তাহাতে নবাবের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না।

নবাবের অজ্ঞাতে আর একখানি পারসী চিঠি এক জন বিখ্যাত হিন্দু অনুচরের দ্বারা এই সঙ্গে ভিন্ন পথে প্রেরিত হইল। মুর্শীদাবাদের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া-দিলেন। পত্রখানি বিশেষ জরুরি ও তাহা কোন বিশ্বাসী হিন্দু-মুন্সী দ্বারা পড়াইবার আদেশ ছিল।

মুন্সী তাজউদ্দিন, তখন ইংরাজ কোম্পানীর বেতনভোগী সদর-মুন্সী। তিনি মুসলমান, নবাবের জাত, বিশ্বস্ত হইলেও তাহার দ্বারা পত্র পড়ান—কলিকাতার সাহেবেরা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। ড্রেক সাহেব এক জন হিন্দু মুন্সীর তল্লাস আরম্ভ করিলেন।

নবকৃষ্ণ সেদিন ঘটনাকালে বড়বাজার অঞ্চলে কিছু জিনিষপত্র কিনিতে গিয়াছিলেন, ড্রেক সাহেবের লোক সেইখানে গিয়া তাঁহাকে ধরিল। নবকৃষ্ণ তদবস্থাতেই কলিকাতার দুর্গাধ্যক্ষের নিকট সেই গোপনীয় পত্রের অর্থ ভেদ করিলেন। নবকৃষ্ণের বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র।

এই নবীন যুবকের পারস্য ভাষায় অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখিয়া ড্রেক সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইলেন। তিনি নবকৃষ্ণকে দিয়া সেই চিঠির এক উপযুক্ত প্রত্যুত্তর লিখাইয়া মুর্শীদাবাদে জগৎশেঠের কুঠীতে প্রেরণ করিলেন। কার্য্যশেষে নবকৃষ্ণ যথাসাধ্য পুরস্কার ও কোম্পানীর “সদর মুন্সী” গিরি লাভ করিলেন।

পত্রখানি কি—এতৎ সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। মুর্শীদাবাদের সম্ভ্রান্তগণ * ড্রেক সাহেবকে সহায়তা করিবার আশ্বাস দিয়া এই পত্র লেখেন। নবাবের উপর তাঁহারা বিরক্ত এবং তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ইংরাজকে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত একথাও সেই পত্রে উল্লিখিত ছিল। ক্রমশঃ—

---

* জগৎশেঠ (স্বরূপ চাঁদ ও মাতাব চাঁদ) রাজা মহেন্দ্র সিংহ, রাজবল্লভ, নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র, দুলভ রাম ও নবাবের মন্ত্রী ও সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর এই গুপ্ত সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

সমীরা।

১ম সর্গ।

(১)

পোহাইল বিভাবরী, প্রমোদ-উদ্যানে
জাগিল পাপিয়া-বধূ সুমধুর তানে;
জাগিল কোকিল কত কুজিয়া কাকলি,
জাগিল কমল-হৃদে মধুকর অলি।
অদূরে ভূধর-শিরে,
সুদূরে তটিনী-নীরে,
তরুণ অরুণ-বিভা খেলিছে মধুর!
কমল-মুখ-কালিমা হ'ল এবে দূর॥
হাসিছে প্রকৃতি সতী,
হাসিছে পঙ্কজ-পতি,
হাসিছে কুসুম-রাজি প্রমোদ-উদ্যানে
হাসি সমীরণ ধায় উদাস পরাণে॥
অদূরে কুটীর-পাশে
শবরী মধুর হাসে
শবরের গলা ধরি চুম্বিল অধরে;
"চলিনু প্রেয়সি" বলি,
ভুজে ভীম ধনু তুলি,
ধরিল বিশাল শৃঙ্গ মুখে দুই করে।
জাগিল নিনাদ ঘোর কাঁপায়ে ভূধরে॥
"চলিনু প্রেয়সি তবে,
পুনঃ কবে দেখা হ'বে;
লিখিলা বিধাতা ভালে, বিরহ-বেদন—
সহিয়া রহিতে হবে এ পাপ জীবন।
কবে কালী দিবে কাল,
ঘুচিবেক এ জঞ্জাল;
পূজিব পরাণ ভরি মায়ের চরণ,
শোণিত-আসবে কবে ঘুচিবে বেদন?"

(২)

ধীরে—ধীরে—ধীরে—ফিরি,
মুছিল নয়ন-বারি;
শবরী আবরি চারু চটুল নয়ন,
"এস নাথ!" বলি পুনঃ মুছিল বয়ান।
নাদিল আবার শৃঙ্গ,
কুরঙ্গের মনোরঙ্গ,
শবরীর শিরে যেন হ'ল বজ্রপাত;
"যেওনা দাঁড়াও ফিরে, শুন প্রাণনাথ!
যুগল চরণ ধরি,
শুনহে মিনতি করি,
শুন নাথ অভাগীর এক নিবেদন;—"
ফিরিল শবর;—ফিরি
চারু চন্দ্র-মুখ ধরি,
হাসিতে হাসিতে পুন করিল চুম্বন,
"কেনলো প্রমদে আজি বিরস বদন?
বহে দুনয়নে ধারা,
কেন পাগলিনী পারা,
কেনবা পড়িছে খসি কবরী-কুসুম;
নিতি যাই, নিতি আসি,
চাঁদ মুখে হেরি হাসি;
কভুত হেরিনি হেন তোমারে আকুল
কেন প্রিয়তমে হেন হ'লে প্রতিকূল?"

(৩)

"নহে প্রতিকূল, নাথ, কভু এ কিঙ্করী,
আমি হে তোমার দাসী,
এবে দয়া পরকাশি,
শুন নিবেদন মম, পদযুগে ধরি।
তবেত সকল দুঃখ এখনি পাসরি।
না জানি কি আছে ভালে,
যা হেরিনি কোন কালে,
স্বপন আবেশে আজি করি দরশন,
বিদরিছে হিয়া নাথ, রাখহ জীবন।"

আলুথালু পাগলিনী,
মণিহারা যেন ফণি,
আকুল পরাণে সতী করিল রোদন :—
কাঁদিতে কাঁদিতে হায়,
"স্মরি বুক ফেটে যায়
শমন সমান তার ভীষণ বদন!
না পারি ভুলিতে, নাথ, সে কাল স্বপন।
আজি যেন নিশি-শেষে,
দুজনে বিজন দেশে
তীর্থ-দরশন আশে করি বিচরণ,
গৃহ ছাড়ি বহু দূরে,
উতরিনু কোন পুরে,
কনকে গঠিত চূড়া স্ফাটিক প্রাচীর,
বাহিরে সরসি শোভে সুবিমল নীর।"

(৪)

"দূরপথ অতিক্রমি, কান্ত, শ্রান্তপদ,
গগনে প্রকট রবি,
প্রদীপ্ত অনলচ্ছবি ;
আর নাহি বিশ্রামিলে ঘটিবে বিপদ।
তেঁই দোঁহে পশি পুরে,
বহু অন্বেষণ করে,
উপস্থিত হৈনু এক বণিক-ভবনে ;
বদনে মধুর হাস,
চারু চন্দ্র পরকাশ,
অমিয়-জড়িত স্বরে সাধু আবাহনে,
জুড়াল পরাণ, তার মধুর বচনে।
করিল যতন কত,
বাখানিল নানা মত
অভাগীর পোড়া রূপ বলিব কেমনে,
না বুঝিনু সেইকালে তাহার ছলনে।
যদি চিনিতাম তারে,
যদি কুসুমের হারে
জানিতাম আছে গুপ্ত কাল বিষধর
আসি তাপসের বেশে
শেষে সে ধরিয়ে কেশে
নাশিবে জীবন হায়—
আর নয়—আর নয়—"
বলিতে বলিতে সতী পড়িল ভূতল,
মুখে নাহি বাক্য সরে,
হিয়া দুরু দুরু করে ;
আলুথালু কেশপাশ অঙ্গের বসন,
কনক-লতিকা হায়,
ভূমে গড়াগড়ি যায়,
হেরিয়া ব্যাকুল কান্ত, ফেলি শরাসন
লইল কান্তারে কোলে
অমিয় মাখান বোলে
সান্ত্বনা করিল কত—করিল চুম্বন।
"উঠ, উঠ, চারুশীলে
কিসে বা বেদন পেলে,
কেন বা সহসা ভূমে হলে অচেতন!
উঠ প্রিয়তমে, ধর আমার বচন॥
স্বপন—সে ছার চিন্তা, নাহি তার মূল
ভাবিয়া দেখ না শাস্ত্রে, কেনবা ব্যাকুল॥
উঠ প্রিয়ে চারু আঁখি
মেলিয়া বারেক দেখি
জুড়াও আজিলো মোর কাতর পরাণ,
একান্ত আমি যে তব, নাহি তাহে আন।"

(৫)

ধীরে ধীরে বহে শ্বাস,
বদনে অস্ফুট ভাষ,
খুলিল কমল-আঁখি শবরী তখন
ধীরে ধীরে মুছাইল শবর আনন।
"চল, প্রিয়ে, ঘরে চল,
বিলাপে কি ফল বল,
থুইনু দেখলো এই তূণ-শরাসন ;
জানিনু নিশ্চয় আজি বিফল ব্যসন।"
শিশু সম কোলে তুলি,
বলিয়া মধুর বুলি,
চলিল লইয়া ধীরে নিকুঞ্জ ভিতরে।

পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটে ফুল,
গুঞ্জরিছে অলিকুল,
দুলিছে মাধবীলতা কত থরে থরে।
বহে মৃদু সমীরণ,
কুহরিছে পিকগণ
বিহরিছে শাখা'পরে ময়ূর ময়ূরী।
কভুবা নাচিছে তারা,
যেনরে পাগলপারা,
হেরিছে শিহরি কভু শবরী-মাধুরী।

(৬)

ডুবিলরে রাকা শশী
মরি আধ আধ হাসি,
ভাসিল শবর মন আনন্দ-সাগরে।
ধরি চারু মুখখানি,
কোমল কটাক্ষ হানি,
আবেশে ধরিয়া বক্ষে চুম্বিল অধরে।
লীলা-লজ্জাবতী লতা,
তবু না কহিল কথা,
হাসিয়া লুকাল মুখ পতির উরসে।
ভাসিল শবর প্রাণ প্রেম-সুধা-রসে।
ক্রমে বেলা বেশি হ'ল,
পাখি সব দূরে গেল,
বকুলের ছায়া ক্রমে কমিয়া আসিল।
খরতর দিনমণি,
কুমুদী প্রমাদ গণি,
ডুবিল সরসী-জলে ; কমল হাসিল।
চরাচর জীবগণ,
আহারে নিবেশে মন,
বিশ্বের বাড়িছে ক্রমে জীবন-সমর।

ক্রমশঃ।

GENERAL HINTS.

ওয়াটারপ্রুফ করিবার উপায়।

অল্প Isinglass মিশ্রিত জলে মোটা কাপড়ের উল্টাদিক ভিজাইবে। শুষ্ক হইলে Nutgallএর (মাজুফল) রস মাখাইয়া লইবে।

Mucilage (গাছের আটা বিশেষ) রাখিবার উপায়।

একটি বোতলে পুরিয়া রবারের ছিপি দিয়া আঁটিয়া রাখিবে। সাধারণ ছিপির ন্যায় ইহা গ্লাসে আটকাইবে না। ইহার ভিতর দিয়া বায়ু প্রবেশ করিতে না পারায় ইহার ভিতরস্থ আটা নষ্ট হইবে না। এই ছিপি সহজে পরিষ্কার করিতে পারা যায়।

কাচে দাগ কাটিবার প্রথা।

শুষ্ক ঝাড়া Barium sulphate এবং double hydrogen ammonium fluoride'র সমভাগ একটি চিনামাটি খলে উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। ঐ মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা যেরূপ অঙ্কিত করিবে সেইরূপ দাগ পড়িবে।

ধাতুর উপর লিখিবার প্রথা।

নাইট্রিক এ্যাসিড ... ২ পাউণ্ড।
মুরিয়াটিক এ্যাসিড ... ১ আউন্স।

উভয়কে বোতলে পুরিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশ্রিত করিবে। ঈপ্সিত ধাতুর উপর গরম মোম ঢালিয়া ঢাকিয়া ফেলিবে। পরে ঠাণ্ডা হইলে শক্ত

ধারাল অস্ত্রের দ্বারা ইচ্ছানুসারে মোমের উপর লিখিবে। পরে পালকের দ্বারা মিশ্রিত এ্যাসিড অতি সাবধানে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া লিখিত স্থান পূর্ণ করিবে। কম বেশী দাগ করিবার ইচ্ছানুসারে এক ঘণ্টা হইতে দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে। পরে জল ঢালিয়া দিবে; জল ঢালিলে এ্যাসিডের কার্য্য-কারিতা নষ্ট হয়। অবশেষে মোম চাঁচিয়া ফেলিলে দেখিবে, ধাতুব উপর সুন্দর লেখা হইয়াছে।

ষ্টীল পালিস করিবার প্রথা।

ভাল ষ্টীল হইলে Diamantive মিশ্রিত জিঙ্ক পালিস ব্যবহাব করিলে উত্তম পালিস হয়। নরম ষ্টীল হইলে টিন পালিসই উত্তম।

কাচের পাত্রে কাচের নুড়ি দ্বারা অতি অল্প খড়ির তৈল Diamantive মিশ্রিত করিতে হইবে। কারণ Diamantive তৈলের সহিত মিশ্রিত হইলে চট্‌চটিয়া হইয়া যায় এবং দুই এক দিনের মধ্যে খারাপ হইয়া যায়। মিশাইবার কালে কোন ধাতুতে লাগিলে কাল হইয়া যায়।

স্পঞ্জ পরিষ্কার করণ।

নিস্তেজ মুরিয়াটিক এ্যাসিডে অন্যূন বার ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। পরে জল দিয়া ধৌত করিয়া চুন পরিষ্কার করিবার জন্য জল মিশ্রিত Hyposulphate of soda যাহাতে এই মাত্র নিস্তেজ মুরিয়াটিক এ্যাসিড মিশান হইয়াছে, তাহাতে ডুবাইয়া রাখিবে। উত্তমরূপে পবিষ্কার হইলে তুলিবে। পবে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এই প্রকারে ইহাকে অত্যন্ত সাদা কবিতে পারা যায়।

লেস্ পরিষ্কার করিবার উপায়।

লেস্‌কে ইস্তাবি করিলে অল্প পরিষ্কার হয় ও কোক্‌ড়ানগুলি সিধা হয়। পরে ভাঁজ করিয়া একটি পরিষ্কার নেক্‌ড়ার থলির ভিতর পুরিয়া সেলাই কবিয়া মুখ বন্ধ কবিয়া বিশুদ্ধ সুইট অয়েলে অন্যূন ২৪ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে। ঐ থলিটি ১০ মিনিট কাল সাবানের জলে ফুটাইয়া ঈষৎ উষ্ণ জলে চুবাইয়া চুবাইয়া ধৌত করিবে। পরে অল্প ফেন মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া লইবে। শেষে সেলাই খুলিয়া ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া টানে টান বাঁধিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে।

রাসমালা।

ঘোরতর যুদ্ধ।

প্রসিদ্ধ কুমারপাল চরিতে বংশরাজ বা বনরাজ সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত আছে; "গুর্জ্জর দেশে বড়িয়ার নামে একটী জনপদ আছে; পঞ্চাস্র তাহার প্রধান নগর। সৈলুগ স্থরি আচার্য্য নামা জনৈক জৈন পুরোহিত সেই নগর হইতে বহির্গত হইয়া নিকটস্থ বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তত্রত্য তরুশাখা-লম্বিত একটী দোলামধ্যে একটী বালককে দেখিতে পাইলেন; তাহার নিকটেই একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি সেই বালকের জননী। তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে জৈন আচার্য্য প্রত্যুত্তরে অবগত হইলেন যে, সেই রমণী গুর্জ্জরের রাজপত্নী; তাঁহার পতি জনৈক আক্রমকের হস্তে পতিত হইয়াছেন; তাঁহার রাজধানী শত্রু কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে; তিনি সসত্ত্বাবস্থায় বনমধ্যে পলাইয়া আসিয়া সেই কুমারকে প্রসব করিয়াছেন। এতদ্বিবরণ শ্রবণ করিয়া আচার্য্য সেই বালককে "বনরাজ" আখ্যা অর্পণ করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বনরাজ মৌলা নগরের শূলপাল নামা জনৈক প্রসিদ্ধ দস্যুর সহিত মিলিত হয়েন। তৎকালে কল্যাণ নগরে যে সমস্ত রাজস্ব বাহিত হইত, বনরাজ তাহা পথি মধ্যে লুণ্ঠন করিয়া লইতেন। এইরূপে ধন সঞ্চয় করিয়া তিনি অনেকগুলি সৈন্য নিয়োগ করিলেন এবং এক প্রদেশে একটী নগর স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনহল নামক জনৈক গোপাল সেই নগরের স্থিতিভূমি দেখাইয়া দেওয়াতে তদীয় নামানুসারে সেই নব-প্রতিষ্ঠিত পুরী অনহলপুর বা অনহল নগর নামে অভিহিত হইল।"

যে জৈন আচার্য্য বনরাজ ও তাঁহার জননীকে স্বীয় আশ্রয়ে স্থান দিয়াছিলেন, "রত্নমালা" গ্রন্থে তিনি শিলগুণ স্থরি নামে অভিহিত হইয়াছেন। বনরাজ তাঁহার মঠে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। শ্বেতাম্বর সন্ন্যাসিগণের শান্তিময় নিকেতনে পবিত্র শাস্ত্রালাপন করিয়াও শিশু বনরাজ মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীয় পিতৃরাজ্য পুনর্লাভের আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সহাধ্যায়িগণ যখন সাঙ্খ্য সূত্রের সমালোচনায় কাল অতিবাহিত করিত, বনরাজ তখন কোন নিভৃত কক্ষ মধ্যে একাকী উপবেশন করিয়া সৌরাষ্ট্রের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। কত চিন্তা তাঁহার সুকুমার হৃদয়ে প্রবল ঝটিকার ন্যায় আঘাত করিত। সেই প্রচণ্ড বাত্যার অবিরল ঘাতে তিনি সময়ে সময়ে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন; দুর্বৃত্ত শোলাঙ্কি রাজকে শত অভিশাপ ও স্বীয় মন্দভাগ্যকে সহস্র ধিক্কার প্রদান করিতেন। তিনি রাজপুত্র, শূরপূজ্য সৌর-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; সুবিশাল সৌরাষ্ট্র তাঁহার পিতৃপুরুষগণের রাজ্য; সেই বিরাট রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া কোথা তিনি প্রচণ্ড প্রতাপের

সহিত শাসনদণ্ড পরিচালন করিবেন, না ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে, বিধির বিড়ম্বনে তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া সন্ন্যাসিগণের মঠ মধ্যে কাল যাপন করিতেছেন; এই সকল চিন্তা সময়ে সময়ে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত। শিশু সৌররাজকুমার সেই অসহনীয় যাতনায় উন্মত্ত হইয়া আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিতেন। তাঁহার সহাধ্যায়িগণ তাঁহাকে ধরিয়া আবার মঠে আনয়ন করিত।

বনরাজ নিরঙ্কুশ উন্মত্ত হৃদয়ের এইরূপ উন্মাদচিন্তায় অতি কষ্টে কাল যাপন করিতেছেন, এমন সময়ে একদা তাঁহার মাতুল শূরপাল তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে স্বীয় নিভৃত অরণ্যাবাসে লইয়া গেলেন। মাতুলের কঠোর দস্যুবৃত্তি মনোনীত হওয়াতে বনরাজ তাহাতে দীক্ষিত হইলেন। তখন তিনি শৈশব অতিক্রম করিয়া তরুণ বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। বাল্যের আশা ও অভিলাষ রোধ সমূহ উৎকট তেজে উত্তেজিত হইয়াছে। এক্ষণে বনরাজ তৎসমুদায়ের তৃপ্তি বিধানে ব্যাপৃত হইলেন। প্রত্যেক অভিযানেই মাতুলের সহিত তিনি যোগ দান করিতেন এবং কার্য্যক্ষেত্রে বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়া স্বীয় সহচরদিগকে ঘোরতর উৎসাহিত করিতে সক্ষম হইতেন। প্রায় প্রতি আক্রমণেই বিপুল ধন রত্ন তাঁহাদিগের হস্তগত হইত। মাতুলের আদেশক্রমে বনরাজ তৎসমস্ত অনুচরবর্গের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন; তাহাতে তাহাদের উৎসাহ শতগুণে বাড়িয়া উঠিত। যখন শিকারের কোন সুবিধা না থাকিত, বনরাজ তখন তাহাদিগকে লইয়া সেই নিবিড় গিরিগহন মধ্যে কল্পিত রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইতেন। বিশাল বনস্থলি তাঁহার রাজ্য, আরণ্য তরুনিচয় ফলপুষ্প প্রসব করিয়া তাঁহাকে রাজকর অর্পণ করে, এক খণ্ড পাষাণ তাঁহার সিংহাসন, বৃক্ষপল্লব তাঁহার রাজচ্ছত্র, তদীয় অনুচরবর্গ সেই প্রাকৃতিক ছত্র তাঁহার মস্তকোপরি ধারণ করিত, কেহ বন্য চামরীর লোমশ লাঙ্গুল লইয়া চামর ব্যজন করিত, কেহ মন্ত্রী, কেহ সভাপাল, কেহ বা কোষাধ্যক্ষ সাজিত। বনরাজ তাহাদিগকে লইয়া নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন, নূতন নূতন রাজ্য জয়ের মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইতেন। বালসুলভ কৌতুকে এইরূপ কিছুকাল অতীত হইল;—সকলে ভাবিল এ কৌতুক শীঘ্রই যাথার্থ্যে পরিণত হইবে। শ্রীদেবী নাম্নী জনৈক বণিকপত্নী একদা বনরাজকে ভক্তিসহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন; বনরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন "আমার অভিষেককালে আপনিই রাজটীকা অর্পণ করিবেন।" চম্প বা জাম্ব নামক একজন বণিক অনেকগুলি যুদ্ধব্যাপারে বিশেষ রণদক্ষতা প্রকাশ করাতে বনরাজ তাঁহাকে মন্ত্রিপদে অভিষেক করেন; এই চম্পই প্রসিদ্ধ চম্পানীর রাজ্যের স্থাপয়িতা। তদ্ব্যতীত অপর এক ব্যক্তি ইতিহাসে অক্ষয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন;—অনহল নামে জনৈক গোপাল বনরাজের অনুগত ছিলেন; অদৃষ্টদেবের সুপ্রসাদে যখন তিনি নূতন নগর স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে উপযুক্ত স্থলের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন, এই অনহল তাঁহাকে একটী পরম রমণীয় স্থল

আবিষ্কার করিয়া দেয়;—সেই নগর আনহলবারা নামে অভিহিত হইল।

এইরূপে অনেক দিন অতীত হইল;—রাজ্যের নানা প্রদেশ হইতে সাহসিক পুরুষ আসিয়া বনরাজের দলে নিবিষ্ট হইতে লাগিল;—তাঁহার সম্প্রদায় ক্রমে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। এই সময়ে শূরপালের মৃত্যু হওয়াতে বনরাজের উন্নতিস্রোত কিছুদিনের জন্য প্রতিরুদ্ধ হইল। কিন্তু তাহা স্বল্পদিনের জন্য; অচিরে তাঁহার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত হইল; তাঁহার উন্নতিস্রোত অসীম খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়া চলিল। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কিয়ৎকাল নীরবে কালযাপন করিলেন। এই সময়ে একদা সৌরাষ্ট্র হইতে জনৈক দূত আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি নিয়োগপত্র অর্পণ করিল। বনরাজ কুতূহল চিত্তে পাঠ করিয়া দেখিলেন;—শোলাঙ্কিরাজ ভুবরের কন্যা মিলান দেবী তাঁহাকে শেলভৃৎ পদে অভিষেক করিয়াছেন। পদটী উচ্চ বটে, কিন্তু রাজপুত্র বনরাজ তাহাতে কিরূপে সম্মত হইতে পারেন? যে রাজ্যে তাঁহার পিতৃপুরুষগণ প্রচণ্ড প্রতাপে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, আজি তিনি তাহার অপহারকের নিকট সামান্য দণ্ডধর হইয়া থাকিবেন? তিনি সদর্পে তাহা অগ্রাহ্য করিলেন এবং অভীষ্টসিদ্ধির সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া বীরভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদা সংবাদ আসিল যে, কল্যাণনগরের কর্ম্মচারিগণ ছয়মাস সৌরাষ্ট্রে থাকিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রতিগত হইতেছে। এই সমাচার পাইয়া বনরাজ আনন্দে উল্লম্ফন করিয়া উঠিলেন এবং সমস্ত দলবল একত্রিত করিয়া কেশরী বিক্রমে পথিমধ্যে তাহাদিগের উপর আপতিত হইলেন। সেই স্থলে উভয় দলে একটী সামান্য যুদ্ধ বাধিল;—সে যুদ্ধে বনরাজই জয়ী হইলেন। শোলাঙ্কি কর্ম্মচারিগণের সমস্ত ধন রত্ন তাঁহার হস্তে পতিত হইল। বিজয়ী বনরাজ সেই সমস্ত লুণ্ঠিত ধন সম্পত্তি লইয়া সানন্দে স্বীয় বনবিভাগে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু তিনি আর একস্থলে দীর্ঘকালের জন্য স্থির থাকিতে পারিলেন না;—কল্যাণরাজের প্রতিশোধ-পিপাসা দাবানলের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া বহুদিনের পর অবশেষে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন এবং চিরলালিতা আশার চরিতার্থতা সাধনের জন্য শুভদিনে শুভক্ষণে অনহলপুর বা অনহলবারা নগর স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, "সম্বৎ ৮০২ (খ্রীঃ ৭৪৬) অব্দে অনন্তকাল বিরাজ করিবার নিমিত্ত একটী নগর স্থাপিত হইয়াছিল। মাঘ মাসের সপ্তম দিবসে শুভ শনিবারে অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় বনরাজের আদেশ প্রচারিত হইল। জ্যোতির্ব্বিদ জৈন সন্ন্যাসিগণ নগরের কোষ্ঠি পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, সম্বৎ ১২৯৭ অব্দে অনহলপুর বিধ্বস্ত হইবে।" পাষাণহৃদয় আল্লাউদ্দীনের সময়ে এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাক্য কিরূপে সফল হইয়াছিল, ইতঃপর যথাস্থলে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

কুমারপাল চরিত নামক প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থে অনহলপুরের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে ভারতের তদানীন্তন গৌরব গরিমার শ্লাঘা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। প্রয়োজন বোধে, সেই বিবরণ এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। "অনহলপুর বহুবিস্তৃত; ইহার পরিধি দ্বাদশ ক্রোশ; তন্মধ্যে বহু দেবমন্দির ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত; চতুরশীতি চতুষ্ক; চতুরশীতি পণ্যশালা,—তন্মধ্যে অনেকগুলি রৌপ্য ও সুবর্ণ মুদ্রাশালা। বহুবর্ণের শিল্পী, কারুকর ও বণিক; প্রত্যেকের স্বতন্ত্র মহল নির্দ্দিষ্ট; পণ্যদ্রব্যও বহুবিধ, যথা,—হস্তিদন্ত, রেশম, পশম, হীরক, মুক্তা প্রভৃতি। এক একটী পণ্যসামগ্রী এক একটী স্বতন্ত্র চতুষ্কে বিক্রীত হয়। কোথাও কুঙ্কুম, কস্তরি, চন্দনাদি বিবিধ সুরভি দ্রব্য, কোথাও বা বৈদ্য, কোথাও শ্রেষ্ঠী, কোথাও বা স্বর্ণকার, কোথাও বা রৌপ্যকার, আবার কোন স্থলে কর্ম্মকার, কোথাও বা সূত্রধর। এইরূপ নাবিক, ভট্ট, আচার্য্য ও অধ্যাপক প্রভৃতি সম্প্রদায় সমূহেরও এক একটী স্বতন্ত্র মহল নিরূপিত। সকলেই সুখী, সকলেই সন্তুষ্ট। সুবিশাল প্রাসাদমালা কুট্টিম শোভিত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকে বিভক্ত, কোনটীতে অশ্বাগার, কোথাও বা রথবেশ্ম। তদ্ব্যতীত রাজকর্ম্মচারিদিগেরও ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট ছিল। কি দেশীয়, কি বিদেশীয় প্রত্যেক প্রকার পণ্যদ্রব্যের এক একটী স্বতন্ত্র বীথিকা নিরূপিত ছিল। তথায় সকল প্রকার শুল্ক গৃহীত হইত। অনহলবারা বিশ্বের বাণিজ্যক্ষেত্র; তথায় প্রত্যহ এক লক্ষ টাকা * শুল্ক স্বরূপ আদায় হইত। নগরের অধিবাসীগণ এত ধনী যে, জল চাহিলে দুগ্ধ আনিয়া দেয়। তথায় অনেকগুলি জৈন মন্দির স্থাপিত আছে; এবং একটী বিশাল সরোবরের তটভূমে ভগবান্ মহাদেবের একটী সুন্দর আয়তন প্রতিষ্ঠিত। স্মৃতি, তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রালাপনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপিত; ফলকথা অনহলবারা একটী নরসমুদ্র; যদি তুমি সমুদ্রের বীচি গণনা করিতে পার, তাহা হইলে সেই মহা নগরের অধিবাসী সংখ্যা গণনা † করিতে চেষ্টা করিলেও সফল হইতে পারিবে। মহাত্মা সৈলগস্থরি বংশরাজের ললাটে রাজটীকা অর্পণ করিলেন এবং নবাভিষিক্ত নৃপতি তাঁহার

* ইহা এক প্রকার তাম্রমুদ্রা। এইরূপ একলক্ষ টাকা আধুনিক দশ সহস্র রৌপ্য মুদ্রার সমান।

† এই আতিশয়োক্তি স্পষ্ট বুঝাইবার উদ্দেশে কবি একটী মনোরম গল্প লিখিয়াছেন; তিনি বলেন, অনহলপুরে কোন রমণীর রাণো নামে একটী কাণা স্বামী ছিল। একদা রাণো স্বীয় বনিতার নিকট হইতে অদৃশ্য হওয়াতে বিরহবিধুরা পত্নী রাজার নিকট যাইয়া স্বীয় মনোবেদনা জ্ঞাপন করে। তখন নৃপতি এইরূপে রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অনহলপুরে রাণো নামে যে কোন কাণা ব্যক্তি থাকিবে, সে প্রধান বিচারালয়ে শীঘ্র উপস্থিত হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, অল্পদিনের মধ্যেই সেইরূপ ৯৯৯ জন ব্যক্তি উপস্থিত হইল। দুঃখিতা রমণী সেই বিশাল শ্রেণীর সম্মুখ দিয়া দেখিতে দেখিতে গমন করিল; কিন্তু নিজ স্বামীকে পাইল না। রাজা দ্বিতীয়বার ঘোষণা করাতে সেই নিরুদ্দেশ রাণো আসিয়া উপস্থিত হইল।

ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পার্শ্বনাথের মন্দির স্থাপন করিলেন। এই ব্যাপার সম্বৎ ৮০২ অব্দে সংঘটিত হয়।"

অনহলপুর কি এক দিনে বা এক মাসে অথবা এক বৎসরে এরূপ উচ্চ গৌরব ও সমৃদ্ধির সোপানে উত্থিত হইয়াছিল? অথবা কবি স্বচক্ষে নগরের যেরূপ চিত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন? বিচার করিয়া দেখিতে গেলে শেষোক্ত অনুমানকেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কর্ণেল টড সাহেব বলেন, "সেই সকল বিপ্লব পীড়িত প্রদেশে নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের বসতি স্থাপনে অসীম সুযোগ থাকিলেও ইহা কখনও সম্ভবনীয় বলিয়া বোধ হয় না যে, কবি অনহলপুরের যে গৌরব ও সমৃদ্ধিশালীতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা একটী মাত্র রাজার শাসনকালেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। তবে আচার্য্য যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যদি যথার্থই হয়, তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পলায়িত সৌর রাজকুমার স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের রাজপাট দেবপত্তন হইতে অনহলপুরে অন্তরিত করিয়াছিলেন এবং আমরা প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন করিতে পারি যে, বিধ্বস্ত বল্লভীপুরের বিচ্ছিন্ন প্রজাকুল বাহ্লিকরায়দিগের নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের লোকপূর্ণতা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে নানা দিগ্দেশ হইতে তন্নগরে আগমন করিয়াছিল।‡" মহাত্মা টড সাহেবের এই অনুমান অনেকাংশে যুক্তিসিদ্ধ ও সমীচিন বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

এই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরে সৌর রাজকুমার বনরাজ অভিষিক্ত হইলেন। শ্রীদেবী তাঁহার ললাটে রাজতিলক অর্পণ করিলেন। অনন্তর বনরাজ জাম্বকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে অভিষেক করিয়া আচার্য্য শিলগণ স্থরির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। আচার্য্য তাঁহার শৈশবের রক্ষক; আজিও তাঁহার জননী তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিয়া কঠোর ব্রতপালনে নিযুক্তা রহিয়াছেন। সেই জৈন যতী তাঁহার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা বনরাজ এজীবনে ভুলিতে পারিবেন না। যথোচিত সম্মান ও যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের পূজিত জিনবিগ্রহকে অনহলপুরে আনয়ন করিলেন। অচিরে তথায় একটী মন্দির স্থাপিত হইল; ভগবান জিনদেব তন্মধ্যে পঞ্চাস্র পার্শ্বনাথ নামে অভিষিক্ত হইলেন। বনরাজ স্বয়ং কোন্ ধর্ম্ম অনুসরণ করিতেন, তাহা অভ্রান্তরূপে নিরূপণ করা কঠিন। রত্নমালা গ্রন্থে তিনি "দেবানুরাগী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কবি তাঁহাকে কামজিৎ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। পত্তনের স্থানে স্থানে আজিও উমা মহেশ্বর ও গণপতির পাষাণপ্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তৎসমুদায়ের সহিত যে সমস্ত শিলালিপি সম্বদ্ধ আছে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে যে, অনহলবারা স্থাপনের সহিত তৎসমুদায় দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বোধ হয়, প্রথম বনরাজা

‡ Tod's *Western India.* p. p. 155—156

ধর্ম্মসম্বন্ধে অতিশয় উদার ছিলেন; সেই জন্য শৈব হইয়াও কৃতজ্ঞতা ও মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার প্রভিপ্রায়ে তীর্থঙ্করদিগকে উৎসাহিত করিতে ত্রুটি করেন নাই।

বনরাজের জীবননাট্য এই খানেই পরিসমাপ্ত হইল; কোন ভট্টগ্রন্থেই তাঁহার অন্তিম জীবন সম্বন্ধে কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। তিনি ৬৯৬ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অনহলপুরে ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৮০৬ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। *

বনরাজের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র যোগরাজ অনহলপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। রাসাগ্রন্থে যোগরাজ সম্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য বৃত্তান্তের ভিতরেই তাঁহার যোগ্যতা ও রাজনীতিজ্ঞতার স্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। যুদ্ধকার্য্যে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল, তিনি অতীব সাহিত্যনিপুণ ও শাস্ত্রজ্ঞ। বর্ণিত আছে, যোগরাজ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তৎরচিত গ্রন্থ তদীয় জীবনচরিতাখ্যায়কদিগের সময়ে বর্ত্তমান ছিল, দুঃখের বিষয়, সে পুস্তকের প্রকৃতিবিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

ভট্টগ্রন্থে যোগরাজের রাজত্বের একটী বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, তাঁহার রাজত্বকালে সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত পত্তনবন্দরে কতকগুলি বিদেশীয় পণ্যপোত আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সমস্ত জাহাজ বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্যে পরিপূরিত ছিল। বণিকগণ কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কোথায় বা যাইতেছিল, তাহার কোন বিবরণই কুত্রাপি বর্ণিত নাই। দেবপত্তনে সেই সমস্ত জাহাজ উপনীত হইল, যোগরাজের পুত্র যুবরাজ ক্ষেমরাজ স্বীয় ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তৎসমুদায়ের সমস্ত দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। এই দুরাচরণের, আতিথেয়তার এই শোচনীয় ব্যভিচারের সমাচার অচিরে রাজসন্নিধানে বাহিত হইল। তৎশ্রবণে যোগরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় পুত্রত্রয়কে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি চিরজীবন যে যশ অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তৎসমস্তই তোমরা নষ্ট করিলে। হা মূঢ় পুত্রগণ! তোরা কি করিলি। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বুধগণ ভারতীয় আর্য্য

* "রত্নমালা" প্রণেতার মতে বনরাজ ৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উইলফোর্ড সাহেব ঐ মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত "আইন আকবরীর" সাহায্য গ্রহণ করিয়া বলেন, বনরাজ ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে নেহরবারা (অনহলবারা) স্থাপন করেন, সুতরাং ৬৯৬ খ্রীঃ অব্দই তাঁহার জন্ম বৎসর। "প্রবন্ধ চিন্তামণি" গ্রন্থে লিখিত আছে, বনরাজ ৭৪৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০ বৎসর অর্থাৎ ৮০৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদি উইলফোর্ড সাহেবের মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, বনরাজ ১১০ বৎসর জীবিত ছিলেন। কর্ণেল টডের মতে তিনি ৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং পঞ্চাশ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোকগত হয়েন। তবে কি তিনি দশ বৎসর বয়সে অনহলবারা স্থাপন করিয়াছিলেন? এই সকল বিসম্বাদী মতের সামঞ্জস্য করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা বড় কঠিন।

নরপতিগণের চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে বলিয়া আসিয়াছেন যে, গুর্জ্জরের রাজকুল চোরের রাজা। পূর্ব্বপুরুষগণের এই কলঙ্ক আমি অপনয়ন করিয়াছি, মনে করিয়াছিলাম; সেই জন্য বিস্তর ভরসা ছিল যে, আমি যথার্থ নৃপতিকুলের আসনে স্থান পাইব; কিন্তু, হায়, তোরা আমার সমস্ত উদ্যম, সকল যত্ন ব্যর্থ করিলি, আমার সকল আশার মূলে কুঠারাঘাত করিলি; আজি তোদের দুর্ব্বৃত্ততায় সেই বিলীয়মান কলঙ্ক আবার ঘোরতর হইয়া উঠিল।” যোগরাজ দীর্ঘজীবন সম্ভোগ করিয়াছিলেন। ৩৫ বৎসর রাজ্যশাসনের পর তিনি চিতানলে তনুত্যাগ করেন *।

* চিতোরের অধিপতি খোমান রাজা এই যোগরাজের সমকালিক। রাজস্থানে (১ম খণ্ডে ১০৮ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে যে ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক চিতোরপুরী আক্রান্ত হইলে যে সকল হিন্দু-নরপতি মহারাজ খোমানের সাহায্যার্থে তদীয় রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন, পত্তন হইতে আগত সৌরবীর রাজধর তাঁহাদিগের অন্যতম। বোধ হয়, যোগরাজ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন প্রতিনিধি চিতোর রক্ষার্থে সেই ভীষণ বিপ্লবে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।

যোগরাজের উত্তরাধিকারিগণ সম্বন্ধে ভট্টগ্রন্থ সমূহে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায়; তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেমরাজ অনহলবারার সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। ক্ষেমরাজের প্রকৃতি অতিশয় উগ্র ও তেজস্বিনী; সেরূপ প্রচণ্ডস্বভাব হইয়া তিনি যে, সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাজ্যশাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা কখনও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তৎকর্ত্তৃক রাজ্যের সীমা ও সমৃদ্ধিতা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ক্ষেমরাজ ৪৬৬ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

ক্ষেমরাজের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র শ্রীভূয়দ অনহলপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ৮৯৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সগৌরবে ও শান্তিসহকারে অতিবাহিত হইয়াছিল; কোন শত্রুই সেই শান্তি ও গৌরব নাশ করিতে চেষ্টা করে নাই। তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় পুত্র বৈরসিংহ তৎসিংহাসনে আসীন হয়েন।

অমৃত কি বিষ?

কোথায় সে?

যাহাকে ভালবাসি সে দূরে—গিয়াছে, আর আসিবে না। সূর্য্য যায়, চন্দ্র যায়, আবার আসে; বসন্ত যায়, মলয় পবন যায়, আবার ফিরে; কিন্তু আমার যাহা গিয়াছে, তাহা চিরদিনের জন্য গিয়াছে আর ফিরিবে না। কালচক্র অবিশ্রাম-গতি। তুমি ক্ষুদ্র, তুমি মহৎ, তুমি রুগ্ন, তুমি শোকার্ত্ত, তাহাতে কাল চক্রের কি? সে যেমন যাইতেছিল তেমন চলিবে, সে চক্রে তুমি আমি পিষ্ট হই'ত চক্রের কি? তুমি ক্ষুদ্র হও আর মহৎই হও সে সংসারের চক্ষে, কাল-চক্রের চক্ষে নয়। কালচক্র কাহারও জন্য ভাবে না কাহাকেও দেখে না। যে তেজীয়ান্ বীরপুরুষ ইউরোপখণ্ড করগত করিয়া বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ড ভস্মীভূত করিব, তিনিও সে চক্রের বশতা স্বীকার করিয়াছেন, যে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তিনিও সে চক্রে পিষ্ট হইয়াছেন, যে ধার্ম্মিকপ্রবর ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ হইয়া ইউরোপ হইতে পোপের আধিপত্য সমুন্মূলিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ইউরোপে বিষম বিপ্লব সংঘটিত করিয়া-ছিলেন তিনিও সে চক্রের গতি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কাহার কথা বলিব? রুমের সম্রাট হইতে ভারত-বর্ষের দার্শনিক পর্য্যন্ত, সেক্ষপির হইতে বাল্মীকি, বেদব্যাস পর্য্যন্ত, অর্জ্জুন হইতে নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত সে চক্রের আধিপত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তুমি আমি কোন ছার? শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যিশু, বুদ্ধ, চৈতন্য সকলেই তাহার অধীন হইয়াছেন এ বিশাল সংসারের ক্ষুদ্রতম কীট আমি কে? তাহার পেষণে যে আমি পিষ্ট হইব, ইহা কোন ছার কথা?

এমন দিন ছিল যাহাকে ভাল-বাসিতাম তাহাকে দেখিতে পাইতাম। সহকারবিজড়িতা মাধবীবল্লরী দোলাইয়া বসন্ত পবন বহিয়া যাইত, সান্ধ্য গগনে তারকারাজি হাসিয়া হাসিয়া চাহিয়া দেখিত—দেখিত আমরা দুইটী পুষ্প এক বৃন্তে ফুটিয়া রহিয়াছি। মনে ভাবিয়া-ছিলাম তেমনি করিয়া ক্ষুদ্র বীচিমালিনী কুলপরিপ্লাবিনী নির্ম্মল হৃদয়া নদীতীরে বসিয়া তৎপ্রতিবিম্বিত বৃক্ষশ্রেণী, আকা-শের অনন্ত বক্ষে তারকা রাজি, বসন্ত পবনবিধুত মাধবীবল্লরী দেখিতে দেখিতে এ জীবন কাটাইব কিন্তু কে জানিত যে সে একদা নিদাঘ ঝটিকায় ছিন্নবৃন্ত হইবে আর আমি এইরূপ তরঙ্গপ্রপীড়িত হইয়া কেবল সংসারসমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইব? হা নিয়ন্তা, মানবজীবনের কি এই পরিণাম? এই পরিদৃশ্যমান জগতে এমন কিছুই নাই যাহাতে এই সংসারসমুদ্রে পার পাওয়া যায়?

মন ত স্থির হয় না। জানি, জীবনের সুখস্বপ্ন, স্মৃতির সৌন্দর্য্য, আশার বিশ্বাস, হৃদয়ের ধন আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, আর তাহাকে পাইব না, তবুও ত মন বুঝে না। ভাবি—বহিশ্চক্ষু নিমীলিত করিয়া মনশ্চক্ষু উন্মীলিত করিয়া কেবল

ভাবি—দেখি——অনন্তবিস্তার উত্তাল তরঙ্গময় জলধি মধ্যে ক্ষুদ্র ভেলায় আমি একা ; যে দিকে দেখি—দেখি—পর্ব্বত-প্রমান উর্ম্মিচয় গর্জ্জন করিয়া সেই ক্ষুদ্র ভেলার দিকে আসিতেছে—কেবল নিলীমাময় সমুদ্রে বেষ্টিত—শিরঃপরি নীল সমুদ্র—চতুপার্শ্বে নীল সমুদ্র—বৃক্ষ-লতা পশুপক্ষী কিছুই দেখা যায় না—এই অনন্ত বিশাল অপার সাগরে আমি একা। জীবনের সঙ্গী নাই—পীড়ার চিকিৎসক নাই—আর্ত্তের সান্তনাকারক নাই—দুঃখের নিবারক নাই—অশান্তির দূরীকারক নাই—আছে ফেনময় লবনাক্ত বারিরাশি তৃষ্ণায় বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া প্রাণ বাহির হইয়া যায়, আশায় মুগ্ধ হইয়া সে বারি পান কর, অচিরাৎ ফলভোগ করিতে হইবে। হরি হরি, এ সমুদ্রে কেন আসিলাম ?

সংসার খুঁজিয়া, যত্ন করিয়া, হৃদয় পিঞ্জরে একটী পাখি পুষিয়াছিলাম, চুরি করিয়া কে লইল রে ? হৃদয় অন্ধকারের আলোক, হৃদয় মরুভূমির সরসী, হৃদয় উদ্যানের স্বর্ণলতা, হৃদয় সরোবরের প্রস্ফুটিতা কমলিনী, হৃদয় আকাশের চন্দ্র কে লইল রে ? বিমল আলোকময় মৃদু হাসি, সেই অমৃতনিস্যন্দিনী দৃষ্টি পিযুষ-পূরিত বাক্যচয়, প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি যাহার ছিল তাহাকে কে লইল রে ? কত ভাল বাসিতাম—কত আদর করিতাম—জীবনের জীবন্ত আশ্বাস, অমল সোহাগ কে লইল রে ? আমায় বিষণ্ণ দেখিলে যে নয়নজলে ভাসিয়া যাইত, আমার. দীর্ঘ নিশ্বাসে যে কাঁদিয়া ফেলিত, দুঃখের সে সুখ—দারিদ্র্যের সে শান্তনা—নিরাশার সে আনন্দ কে লইল রে ? সে গিয়াছে, আমি আর তাহার নই, আমি কেবল ভাবি—কি ভাবি তাহা বলিতে পারি না—দূরাগত বংশীর সঙ্গীত—অর্দ্ধ বিস্মৃত সুখ স্বপ্নের স্মৃতি—বাল্যের সে সুখ—গতজীবনের সে আনন্দ সকলই ওতপ্রোত দারুণ বেগে অন্তরে প্রবেশ করে। চিন্তা-প্লাবনে হৃদয় প্লাবিত হয় আর কিছুই মনে হয় না। লোকালয়ে আর যাইতে ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা হয় রাত্রিদিন এমনি করিয়া কেবল একাকী বসিয়া ভাবি। জানি না লোকসমাগম-বর্জ্জিত স্থানে থাকায় কি লাভ, কিন্তু অন্তরে একটু সুখ হয় জানি।

একবার সান্ধ্যগগনে স্বর্ণমেঘমালার ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া দেখিতে ইচ্ছা করে, বাল্যকালের সুখস্বপ্নময় দিন তখন মনে পড়ে। সুখশয্যায় শয়ন করিয়া শান্তিময় অন্তরে সুখের খেলায় বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছি। পিতা মাতার স্নেহ, ভ্রাতার অমূল্য ভালবাসা, বন্ধু-বর্গের প্রণয় তখন ছিল, গুরুজনের অতুল সোহাগ, শিক্ষকের ক্রীড়াবিমিশ্রিত উপদেশ, ভালবাসার মধুর জ্যোতিঃ তখন ছিল—যৌবনের উত্তপ্ত নিশ্বাস তখন অঙ্গ-স্পর্শ করে নাই—দিগ্দাহ ভীষণ দাবানল তখন দৃষ্ট হয় নাই। প্রীতির যাহা সুখ, আশার যাহা মমতা, বিশ্বাসের যাহা তৃপ্তি, মনের যাহা সৌন্দর্য্য, তাহা তখন ছিল—কুটীল প্রলোভনের ভীষণ নৈরাশ্য, দারুণ শোকের হৃদ্ভেদী সঙ্গীত তখন সহ্য করিতে হয় নাই। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই আশার ছলনা, প্রলোভনের ভীষণ নৈরাশ্য, দুঃখের বিষাদময়ী ছায়া, শোকের ধূমবহ্নিময়ী জ্বালা হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কঙ্কালময় হাসি আর

হাসিতে পারি না। দুঃখরেখা স্তরে স্তরে ভেদ করিয়া হাসি ফুটিতে ফুটিতে মুখেই তাহা মিলাইয়া যায়, কাঁদিতে যাই কাঁদিতে পারি না। দুঃখ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া কণ্ঠরোধ করে, বুক চাপিয়া ধরে, হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শেল ফুটাইয়া দেয়। কাঁদিতে পারিলে শোকের অনেক লাঘব জন্মে—হতবিধি—এ অদৃষ্টে তাহাও নাই।

এই সময়ে একবার দেখিতে সাধ করে—সেই শান্তিময়ী মূর্ত্তি, সংসার কাননে যাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি, হৃদয়-দর্পণে যাহার প্রতিবিম্বটুকু অবশিষ্ট আছে, চন্দ্রকিরণশীতল পৃথিবীর মত—স্তোকনম্র পেলবলতিকার মত যাহার দর্শনমাত্রেই হৃদয়ে নিত্যনূতন আনন্দাবির্ভাব করিত—সেই মূর্ত্তি আর একবার দেখিতে বাসনা করে তাহা পাইব কি? গভীর নিশীথে যখন অন্ধকার গাঢ়কৃষ্ণ-কেশজালে পৃথিবী ঢাকিয়া দিয়াছে, ইন্দ্র-নীলোৎখচিতান্তর চন্দ্রাতপের ন্যায় অনন্ত নক্ষত্রগ্রথিত অম্বরতল যখন কেবল অন্ধকারের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধিরই সহায়তা করে—প্রাণীজগৎ যখন সুপ্ত—নীরব—নিশ্চল—মৃতপ্রায়—ঝিল্লীরব ব্যতীত অন্য-রব শ্রুতিগোচর হয় না- শব্দশূন্য -বর্ণ-শূন্য—বায়ুশূন্য জগতের ন্যায়, তরঙ্গহীন চাঞ্চল্যহীন সমুদ্রের ন্যায় অন্ধকারময়ী প্রকৃতি যখন সেই গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে সেই সময় সাধ করে তাহাকে একবার দেখিব—দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিবে, বাহ্যজগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করিবে জন প্রাণী নাই—কাহারও মুখে কথা নাই—জগদীশ, এ সাধ কি পূরিবে? এতদিন জ্ঞান উপার্জ্জনে মত্ত ছিলাম, প্রতিপন্ন হইবার আশা হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, বাঁচিবার সাধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু তখন জানি নাই—জ্ঞান কঠোর, আশা ছলনাময়ী, জীবনই এখন জানিয়াছি, প্রেম ভিন্ন জ্ঞান কিছুই নয়, ধৈর্য্যবিচ্যুত আশা মৃত্যুর কারণ—যতদিন আমাদের জীবন ততদিন মৃত্যু, যে দিন মৃত্যু সে দিন নিষ্কৃতি।

কেন ভালবাসি?—তাহার রূপ দেখিয়া? কই, তাহার রূপে জগৎ সংসার ত মুগ্ধ হয় না—কই, সে নয়নে চকিতাহরিণীর দৃষ্টি নাই—বদনে সূর্য্যা-লোকের জ্যোতি নাই—অবেণীসম্বদ্ধ আলুলায়িত কেশদামাবৃত বদনমণ্ডলে বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত নাই—গঠনে অনিন্দ্য পারিপাট্য নাই—চরণে কোটি শশীর সমুদয় নাই—তবে কেন তাহায় ভাল-বাসি? জানি না তাহাতে কি আছে। তাহার যাহা আছে তাহা কামে নাই, রতিতে নাই, বিশ্বাসে নাই, তৃপ্তিতে নাই যাহা জ্ঞাত তাহার কোন পদার্থে নাই—তাহা যেন অসাংসারিক, অপার্থিব, স্বর্গীয়। আমি আজ জ্বলিতেছি আমি একদা সেই অপার্থিব স্বর্গীয় রত্ন দেখিয়াছি, এক দিনও তাহার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কথা কহিয়াছি—নীরব কথা কহিতে কহিতে তন্ময় হইয়া সেই নীরব বাক্য-সমুদ্রে আত্ম ডুবাইয়া দিয়াছি—তাহার সহিত অলিন্দে উপবিষ্ট হইয়া চন্দ্রকিরণে স্নাত বৃক্ষ লতা গুল্ম নদী সরিৎ প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সেই সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া গিয়াছি—আমি যাহা ভালবাসি তাহা আমার ভালবাসার ধনকে দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি বলিয়া আজ আমি

কাঁদিতেছি, জ্বলিতেছি। আমি যাহা করি তাহা যদি সে ভাল না বাসিত, আমার ভালবাসার প্রতিদানে সে যদি তাচ্ছীল্য দিত, আমার সহিত যদি তাহার আশার সমতা না থাকিত, তাহা হইলে আজ এত জ্বলিতে হইত না। কিন্তু কেন ভালবাসি ? তাহার গুণও ত ছিল না। সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা লেখা পড়াই সে ভালবাসিত, আর কিছুই করিতে পারিত না কিন্তু তাহাতেও সে বিশেষ নিপুণা ছিল না। তাহার লিপিতে লজ্জাশীল কবির মত অর্দ্ধস্ফুট অথচ মধুর বাক চয় দেখা যাইত না—ভাস্বর তেজোময় সূর্য্যের মত অন্যকে সে তেজে আলোকিত করিত না—তাহাতে জয়দেবের পদলালিত্য থাকিত না—রঘুনাথের ন্যায়শাস্ত্র থাকিত না—কালিদাসের কবিত্ব থাকিত না—কত ব্যাকরণ দোষ হইত, কত ভ্রমপ্রমাদ ঘটিত কিন্তু তবুও যেন তাহাতে কি আছে তাহা আর ভুলিতে পারিতেছি না।

তোমরা জগৎসংসারের জ্ঞানী, বিদ্বান, কবি, তোমরা কেহ জান, কেহ শুনিয়াছ স্ফুটনোন্মুখ কলিকা ঝরিয়া পড়ে, গগনস্পর্শীতরুরাজিবেষ্টিত চারাগাছে বজ্রাঘাত হয় ? কিন্তু তাহা হইয়াছে, প্রবলপ্রধাবিত নিদাঘঝটিকা স্ফুটনোন্মুখ কলিকা ছিন্নবৃন্ত করিয়াছে, বজ্রপতনসময়ে কাল তরুগুলিকে দূরে রাখিয়া চারাগাছটী বিনষ্ট করিয়াছে। কি বলিব ? ইহা কি করুণাময়ের করুণাবারি না নিষ্ঠুরের নিষ্ঠুরতা ?

যখন ভালবাসিয়াছিলাম তখন বুঝিতে পারি নাই কি করিতেছি—ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া হৃদয়ে কি বিষম আধেয় সঞ্চয় করিতেছি। স্নেহের দাস হইয়া আত্মহারা হইয়া যখন কার্য্য করি তখন বুঝিতে পারি না স্মৃতির দংশন আছে, আশার ছলনা আছে, প্রলোভনের নৈরাশ্য আছে ; বুঝিতে পারি না স্নেহের খরস্রোতেও প্রতি ধমনীতে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত হয়, দেহে জ্বরদাহের সন্তাপ জন্মাইতে পারে ; স্মরণ থাকে না যে আমি আমার নই, যে শক্তি এই বিশ্ব সংসার পরিচালিত করিতেছে, যে শক্তির কটাক্ষমাত্রে পর্ব্বত থাকে না, সাগর থাকে না, বন, উপবন, দেশ মহাদেশ সকলেরই অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায়, যে শক্তির অপাঙ্গ দৃষ্টিতে জগৎসংসার জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যায় সেই শক্তির শক্তি আমার উপর কার্য্য করিতেছে। নহিলে, কই, তাহাকে পাইলাম না ত! এত নির্যাতন, এত কষ্ট সহ্য করিলাম কই সে থাকিল না ত! কই, এত ত্যাগস্বীকার করিলাম, এত খুঁজিলাম, তাহার দেখা পাইলাম না ত! তবে কে বলে "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"! তবে কি দৈবই বলবান্ ? যিনি "দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি" বলিয়াছিলেন তিনি যদি "যত্নে কৃতে ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ" না বলিতেন তবে আজ বলিতাম—তিনি ভ্রান্ত—সংসারকে সম্যক্ বিচার করেন নাই। বিশ্বরচনায় এমন একটী অদৃশ্য শক্তি আছে যে মনুষ্য যত চেষ্টা, যত যত্ন করুক না কেন, কর্ম্ম করিতে করিতে জীবনপাত করুক না কেন, সে সমুদয়ই ব্যর্থ করিয়া দিবে, তাহার বাসনাতিরিক্ত একপদও অগ্রসর হইতে দিবে না।

তবে কি শুধু কাঁদাইবার জন্যই ভালবাসার সৃষ্টি? কয়জন যৌবনে বিকার বিহীন অন্তরে সুখের আশা করিতে পারে? কয়জনকে বাল্যস্মৃতি দগ্ধ না করে? কয়জন সংসারে ভালবাসার বস্তু হারায় নাই? কয়জন অব্যথিত অন্তরে অশঙ্কিত হৃদয়ে ভালবাসার ধন বুকে রাখিতে পাইয়া সংসার সাগরে পার পাইয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে আবার বন্ধু মিলে, আবার ভালবাসার অভিনয় হয়, কিন্তু যাহা যায় তাহা আর হয় কি? প্রথম যেমন ভালবাসিয়াছিলাম তেমন বাসা আর যায় কি? ভালবাসার নাম শুনিলে অগ্নিদর্শনে দাবদগ্ধ কুরঙ্গের মত মন ব্যাকুল হইয়া উঠে না কি? কেন বিধাতা এমন সৃজন করিয়াছিলে? তুমি ইচ্ছাময়—ইচ্ছা করিলে সবই ত পারিতে তবে কর নাই কেন! ভাল জিনিষের মত মন্দ জিনিষেরও ব্যবহার আছে মানি। ভালবাসা নামে যে ছলনা বুঝে, প্রণয় অর্থে রিপুচরিতার্থতা বুঝে, প্রেম অর্থে আত্মতৃপ্তিসাধন জানে, তাহাকে দুঃখ দাও, প্রভু; কিন্তু যে ভালকে ভাল বলিয়াই গ্রহণ করে—ভালবাসা অর্থে আত্মবিসর্জ্জন বুঝে, প্রণয় অর্থে তোমার নিয়মরক্ষা বুঝে, প্রেম অর্থে মিলন বুঝে সে কেন দুঃখ পায়? স্বার্থ ত্যাগ করিয়াই হউক বা স্বার্থময় হইয়াই হউক যদি স্বভাবতঃই তাহাতে জ্বলিতে হইল তবে তাহাকে মঙ্গলকর কেমন করিয়া বলিব? স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, অগ্নিতে হাত দিলে হাত পুড়িবে, তবে কেমন করিয়া বলি ভালবাসায় মঙ্গলের এক কণা আছে?

এ ক্রন্দনের পরিণাম কি? এ দুঃখের অন্তরালে কি আছে? বাষ্পের পরিণাম জল, জলের পরিণাম এই পৃথিবী, এ ক্রন্দনের পরিণাম কি? এ দুঃখের পরিণতি কোথায়? এ দুঃখের পরিণাম দুঃখ—এ ক্রন্দনের পরিণাম ক্রন্দন। সে গিয়াছে তাহাকে আর পাইব না তবে কি জন্য কাঁদিব? তাহার সঙ্গে আমার এমন কি সম্বন্ধ যে তাহার বিরহে আমায় শুধু কাঁদিতেই হইবে? জন্মিবার সময় একাকী জন্মিয়াছি, যাইবার সময় পরের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতে হইবে! কেন আমার সুখদুঃখ পরের উপর নির্ভর করে? সৃষ্টির মহান্ রত্ন জড়জগতের পূর্ণ-অভিব্যক্তি আত্মবান্ আমি আপনা-আপনি সুখী নই কেন? কেন আমি পরের জন্য কাঁদি।

হা ঈশ্বর, আর পাইব না কি! যাহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া ক্লান্তি শ্রান্তি উপশান্ত করিতাম তাহাকে আর পাইব না কি?

সেই অপরিমিত ভালবাসা—সেই সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমতী ছায়া যখন মনে পড়ে তখন বক্ষঃস্থল কম্পিত করিয়া, গৃহাঙ্গন ধ্বনিত করিয়া উচ্চৈঃ শব্দ হয়—কোথায় সে? প্রতিধ্বনিও নিরাশ-গম্ভীরস্বরে উত্তর করে "কোথায় সে"।

আয়ুর্ব্বেদ।

প্রমেহ চিকিৎসা।

ভারতবর্ষে আজ কাল সমুদায় রোগেরই আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে আবার প্রমেহ প্রভৃতি পীড়ার প্রসার অত্যন্ত অধিক। যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আজ কাল এই প্রমেহ প্রায় অধিকাংশ লোককে আক্রমণ করিতেছে ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে, সুতরাং অত্যাবশ্যক বিধায় আজ আমারা ইহার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আস্যাসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি,
গ্রাম্যৌদকানূপরসাঃ পয়াংসি।
নবান্নপানং গুড়বৈকৃতঞ্চ
প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্ব্বম্॥

সর্ব্বদা সুখকর সুকোমল আসনে নিশ্চেষ্টভাবে উপবেশন, সুকোমল শয্যায় নিরন্তর নিদ্রা যাওয়া, দধি, ছাগাদি গ্রাম্য পশু, মৎস্যাদি জলচর জন্তু ও বরাহাদি আনূপ মাংস রসের অতি সেবন অধিক পরিমাণ দুগ্ধ সেবন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, নূতন পানীয়, শর্করা প্রভৃতি গুড় বিকৃতি সমুৎপন্ন বস্তু সমুদায় এবং কফ প্রকোপ জনক দ্রব্য সেবন এই কয়েকটী প্রমেহ রোগের নিদান অর্থাৎ এই সমুদায় কারণে প্রমেহ পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রমেহ হইতেও ভয়ানক শুক্রমেহরূপ একটী পীড়া বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই পীড়াটী যৌবনের পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বেও দুই একটী বালকের হইতে দেখা যায়। বোধ হয় ইহার নিদান জানিতে কাহারও কষ্ট হইবে না, বালকগণ, যেমন যৌবনের অঙ্কুর দেখা দেয়, অমনি অস্বাভাবিক সভ্য অত্যাচারে লিপ্ত হয়। সকল কার্য্যেই গুরুর উপদেশ আবশ্যক। ইহাতেও সুতরাং গুরু আছে। অপেক্ষাকৃত বয়োধিক অসচ্চরিত্র বালকগণই ইহার উপদেষ্টা। শুক্র মেহের লক্ষণ ও চিকিৎসা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে। আপাততঃ প্রমেহ পীড়ার সম্প্রাপ্তি বলা যাইতেছে।

মেদশ্চ মাংসঞ্চ শরীরজঞ্চ
ক্লেদং কফো বস্তিগতঃ প্রদূষ্য।
করোতি মেহান্ সমুদীর্ণ মুষ্ণৈ
স্তানেব পিত্তং পরিদূষ্য চাপি॥
ক্ষীণেষু দোষেম্ববকৃষ্য ধাতূন্
সংদূষ্য মেহান্ কুরুতেঽনিলশ্চ।

সর্ব্বাগ্রে কফজনিত মেহের সম্প্রাপ্তি বলা হইয়াছে, কারণ কফজ মেহই সমধিক ও সাধ্য। বস্তিদেশগত কফ, মেদঃ, মাংস ও শরীরজ ক্লেদ পদার্থকে দূষিত করিয়া মেহ উৎপাদন করে, ইহারই নাম কফজ মেহ। এইরূপ উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য দ্বারা প্রকুপিত পিত্ত উল্লিখিত মেদঃ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া পৈত্তিক মেহ জন্মায় এবং কফ ও পিত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলে প্রকুপিত বায়ু, বসা মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা নামক ধাতু সকলকে

বস্তিমুখে আকর্ষণ পূর্ব্বক বাতিক মেহ উৎপাদন করে।

সাধ্যাঃ কফোত্থা দশ পিত্তজাঃ ষট্
যাপ্যা ন সাধ্যঃ পবনাচ্চতুষ্কঃ।
সমক্রিয়াত্বা দ্বিষম ক্রিয়ত্বাৎ
মহাত্যয়ত্বাচ্চ যথাক্রমং তে॥

কফজ দশ প্রকার মেহ সাধ্য, পিত্তজ ছয় প্রকার যাপ্য এবং বাতজ চারি প্রকার মেহ অসাধ্য। দোষ ও দূষ্য উভয়ের নিবৃত্তির চেষ্টাই চিকিৎসার রীতি। কফজ মেহে দোষ কফ এবং মেদ প্রভৃতি দূষ্য। মেদঃ প্রভৃতি দূষ্য পদার্থ সকল কফের সমপ্রকৃতি, সুতরাং কফের ও মেদঃ প্রভৃতির দমনকারক পদার্থ এক, অর্থাৎ কটু তিক্তাদি দ্রব্য দ্বারা দোষ ও দূষ্য উভয়েরই শমতা হয়। ইহারই নাম সমক্রিয়ত্ব। এইরূপ সমক্রিয়ত্ব হেতু কফজ মেহ সাধ্য। পিত্তজ ষট্ প্রকার মেহে দোষ পিত্ত এবং মেদঃ প্রভৃতি দূষ্য। যাহা দ্বারা পিত্তের শান্তি হয়, তাহা দ্বারা মেদঃ প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, আবার মেদঃ প্রভৃতির শান্তিকারক ঔষধে পিত্তের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। অতএব পৈত্তিক মেহে এমন কোন ক্রিয়া হইতে পারে না, যদ্দ্বারা দোষ ও দূষ্য উভয়েরই শান্তি হয়, অর্থাৎ মধুরাদি যে পদার্থ পিত্তহর, উহা মেদস্কর এবং কটুকাদি যে সমুদায় পদার্থ মেদোহর, তাহারা আবার পিত্তবর্দ্ধক। সুতরাং এই বিষম ক্রিয়ত্ব হেতু পৈত্তিক মেহ যাপ্য। বায়ুজনিত চারি প্রকার মেহ মহাত্যয়ত্ব হেতু অসাধ্য অর্থাৎ বায়ু মজ্জাদি গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী, বহু বিপত্তিজনক ও আশু অনিষ্টকর বিধায় কোনরূপ ঔষধেই ইহার প্রতিকার হয় না, সুতরাং বাতজ মেহ অসাধ্য।

কফঃ সপিত্তঃ পবনশ্চ দোষা-
মেদোঽস্র শুক্রাম্বু বসালসীকাঃ।
মজ্জারসৌজঃ পিশিতঞ্চ দূষ্যাঃ
প্রমেহিণাং বিংশতিরেব মেহাঃ॥

সর্ব্ব প্রকার প্রমেহেই বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ এবং মেদঃ, রক্ত, শুক্র, দৈহিক জল, বসা (মাংসস্নেহ), লসীকা (মাংস ও ত্বকের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থ), মজ্জা (অস্থিমধ্যগত স্নেহ), রস (আমরস), ওজঃ (সমস্ত ধাতুর সার পদার্থ অর্থাৎ যে পদার্থ থাকাতে মনে সাহস ও উৎসাহাদি জন্মে) ও মাংস এই সমুদায় দূষ্য অর্থাৎ উপরোক্ত বাত, পিত্ত ও কফ নিম্নোক্ত মেদঃ প্রভৃতি ধাতুকে মেহরোগে দূষিত করে। কফজ মেহ দশ প্রকার, পিত্তজ ছয় প্রকার ও বাতজ চারি প্রকার; সমুদায়ে বিংশতি প্রকার প্রমেহ।

দন্তাদীনাং মলাঢ্যত্বং প্রাগ্‌রূপং পাণিপাদযোঃ।
দাহশ্চিক্কণতা দেহে তৃট্ স্বাদ্বাস্যঞ্চ জায়তে॥

মেহরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে দন্ত ও নয়নাদিতে অধিক মলসঞ্চয়, হস্তপদাদির জ্বালা, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা ও মুখে মধুরাস্বাদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাকে মেহের পূর্ব্ব রূপ বলে।

সামান্যং লক্ষণং তেষাং প্রভূতাবিলমূত্রতা।

মূত্রের পরিমাণাধিক্য ও আবিলতা (অপরিষ্কার) সমস্ত মেহেরই সাধারণ লক্ষণ।

দোষদূষ্যাবিশেষেঽপি তৎসংযোগ বিশেষতঃ।
মূত্রবর্ণাদিভেদেন ভেদো মেহেষু কল্প্যতে॥

বাতজাদি সমস্ত মেহেতেই দোষ ও দূষ্য পদার্থ সমান। তথাপি মেহরোগ বিংশতি প্রকার, কারণ—যেমন শ্বেত,

পীত, লোহিত, কৃষ্ণ ও শ্যাব এই কয়েকটী বর্ণের ন্যূনাধিক্য ও মিশ্রণবিশেষে নানাবিধ বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দোষ ও দূষ্য পদার্থ সকলের প্রভেদ না থাকিলেও উহাদের ন্যূনাধিক্য ও সংযোগবিশেষে মূত্রাদির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে এবং সেই মূত্রাদির ভেদ অনুসারে প্রমেহের বিংশতি প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। অতঃপর প্রত্যেকের পৃথক্ লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্ম্মেহ ও লালামেহ এই দশটী কফজ।

১। যে মেহে মূত্র স্বচ্ছ, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ, শীতল, গন্ধহীন, জলতুল্য কিঞ্চিৎ আবিল (ঘোলাটে) ও পিচ্ছিল হয়, তাহার নাম উদকমেহ।

২। ইক্ষুমেহে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় অতিশয় মিষ্টাস্বাদ হয়। প্রস্রাব করার কিছু পরে যদি উহাতে পিপীলিকাদির সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়, তবে স্থির করিতে হইবে যে প্রস্রাবের আস্বাদ মিষ্ট ও ইহা ইক্ষুমেহ।

৩। সান্দ্রমেহে নিঃসৃত মূত্র কিয়ৎক্ষণ পরে অথবা তৎপর দিন ঘনীভূত দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। সুরামেহে পরিত্যক্ত মূত্র সুরার ন্যায় এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিম্নভাগে ঘন হয়।

৫। প্রস্রাব করিবার সময় শরীর যদি রোমাঞ্চিত হয় এবং মূত্র যদি পিটুলিগোলার ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও পরিমাণে অধিক হয়, তবে তাহাকে পিষ্টমেহ বলে।

৬। শুক্রমেহে শুক্রসদৃশ বা শুক্রমিশ্রিত মূত্র নির্গত হয়। আজ কাল অপর একরূপ শুক্রমেহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিষয় পরে লিখিত হইতেছে।

৭। সিকতা মেহে মূত্রমার্গ দিয়া কঠিন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকার ন্যায় মল (শুষ্ক কফ) নির্গত হয় ও মূত্র ত্যাগে বিশেষ কষ্ট বোধ হয়।

৮। যে মেহে শীতল, মধুরস্বাদ ও বহুপরিমাণ মূত্র নির্গত হয়, তাহার নাম শীতমেহ।

৯। শনৈর্ম্মেহে আস্তে আস্তে অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়।

১০। লালাযুক্ত, তন্তুবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হইলে তাহাকে লালামেহ বলা যায়।

পিত্তজনিত মেহ ছয় প্রকার যথা—ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রামেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ। ক্রমশঃ এই সমুদায়ের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

ক্ষার মেহে নিঃসৃত মূত্রের গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ ও স্পর্শ অবিকল ক্ষার জলের ন্যায়।

নীল মেহে মূত্র নীলবর্ণ ও কালমেহে মসীনিভ অর্থাৎ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়।

হারিদ্র মেহে, মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরস এবং প্রস্রাবকালে লিঙ্গনালিতে অতিশয় জ্বালা উপস্থিত হয়।

মাঞ্জিষ্ঠ মেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত ও মঞ্জিষ্ঠা ভিজান জলের ন্যায় লোহিতবর্ণ হয়।

রক্ত মেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ, লবণাস্বাদ ও রক্তবর্ণ হয়।

বসামেহ, মজ্জমেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ এই চারিটী বাতজ। তন্মধ্যে যে মেহে বারংবার বসার ন্যায় মূত্র নির্গত

হয় তাহাকে বসা মেহ বলে। সুশ্রুত ইহাকে সর্পির্ম্মেহ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মজ্জমেহে মজ্জা সদৃশ কিম্বা মজ্জামিশ্রিত মূত্র নির্গত হয়। ক্ষৌদ্র মেহে মূত্র কষায়, মধুরাস্বাদ ও রুক্ষ হয়। চরক ইহাকে মধুমেহ নামে অভিহিত করিয়াছেন। হস্তিমেহ রোগীর নিরন্তর মত্তহস্তীর ন্যায় মূত্রধারা নিপতিত হয়। বেগ ব্যতীতই মূত্র নির্গত হয় এবং মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়, এইরূপ মেহের মূত্রে বসা মিশ্রিত থাকে।

ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রা, কাস ও পীনস এই সমুদায় কফজ মেহের উপদ্রব। বস্তিদেশে লিঙ্গনালে সূচীবেধবৎ পীড়া, অণ্ডকোষের বিদীর্ণতা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, আম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও অতিসার এইগুলি পৈত্তিক মেহের উপদ্রব। আর বাতজ মেহে উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, আহারে অতিশয় লোভ, শূল, নিদ্রানাশ, শোষ, (যক্ষ্মা) কাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। বাতজাদি উল্লিখিত উপদ্রব ও সুশ্রুতোক্ত অন্যান্য উপদ্রব সকল প্রকাশ পাইলে এবং অধিক পরিমাণে ধাতুর সহিত মূত্র নির্গত ও বক্ষ্যমাণ শরাবিকাদি প্রমেহ পিড়কা সমূহ সবলভাবে উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে। প্রমেহ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তানের যদি প্রমেহ পীড়া জন্মে, তবে তাহাও অসাধ্য বলিয়া স্থির করিবে। কারণ উহা বীজকোষ সমুৎপন্ন, এইরূপ অন্যান্য যে সমুদায় পীড়া কুলজ অর্থাৎ পিতা, পিতামহ ও মাতা মাতামহাদি হইতে প্রাপ্ত, তৎসমুদায়ও অসাধ্য হইয়া থাকে।

সর্ব্বএব প্রমেহাস্তু কালেনাপ্রতিকারিণঃ।
মধুমেহত্ব মায়ান্তি তদসাধ্যা ভবন্তি হি॥

প্রতিকারে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিলে সমস্ত মেহই কালে কালে মধুমেহরূপ ধারণ করে এবং অপ্রতিকার্য্য হইয়া পড়ে। মধুমেহ রোগে মূত্র মধুর ন্যায় হয়। ইহা দুই প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে। একরূপ, ধাতুক্ষয় হইলে বায়ু কুপিত হইয়া পীড়া উৎপাদন করে, অপর পিত্তাদি দোষ কর্ত্তৃক মার্গরুদ্ধ হইয়া বায়ু প্রকুপিত হওয়াতে ইহার উৎপত্তি হয়। ধাতুক্ষয় হেতু প্রকুপিত বাতজনিত মধুমেহের রূপ কেবল বাতিক মেহের ন্যায় আর পিত্তাদি দোষাবৃত প্রকুপিত বাতজনিত মধুমেহে বায়ুর লক্ষণ ও পিত্তাদি যে দোষ দ্বারা বায়ু আবৃত মার্গ ও প্রকুপিত হইয়া মধুমেহ উৎপাদন করে তাহারও লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এই মেহ সময়ে সময়ে অল্পও পিত্তাদি দ্বারা আবৃত মার্গ হইয়া পুনরায় প্রবৃদ্ধ হয়, ইহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। অচিকিৎসিত সমস্ত মেহেই মূত্র মধুর ন্যায় মধুরাস্বাদ ও দেহ মধুররস-ভূয়িষ্ঠ হয় বলিয়া উহাদিগকেও অনেককালের পর মধুমেহ বলা যাইতে পারে।

অতঃপর প্রমেহ রোগের চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে। প্রমেহ রোগীদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্থূল ও বলবান্ এবং কেহ কেহ দুর্ব্বল ও কৃশ দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং দোষের ও শরীরের বলাবল বিবেচনা করিয়া দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বৃংহণ (শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক) ও বলবান্ দোষ বহুল ব্যক্তিকে সংশোধন (দোষের শোধনকারক) ঔষধ প্রদান করিবে।

মেহরোগে গাঢ়রূপে রূক্ষ গাত্র মার্জ্জন ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ ও শ্লেষ্ম-পিত্ত নাশক ঔষধাদির বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগ হিতকর।

গুড়ূচীর রস ১ তোলা ও মধু অর্দ্ধ তোলা সেবন করিলে মেহের শান্তি হয়, এইরূপ গুড়ূচীর পালো (চিনি) ও মধু সেবনেও মেহের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। দুই আনা হরিদ্রাচূর্ণ মধু ও আমলকীর রসের সহিত সেবনে এবং হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু ও মুতার কাথ এবং হরিতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতার কাথ সেবনে মেহের নিবৃত্তি হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে জল মিশ্রিত কাঁচাদুগ্ধ সেবনে ও দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস সেবনে বিশেষ উপকার হয়। নিম্নোক্ত এই দুইটী যোগ দ্বারা প্রস্রাব পরিষ্কার ও জ্বালা যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কচি শিমুল মুলের রস কাবাবচিনির সহিত সেবন করিলে শুক্র মেহে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মেহরোগে বঙ্গেশ্বর, বৃহদ্ বঙ্গেশ্বর, সোমনাথ, বৃহৎ সোমনাথরস, তারকেশ্বর রস, পঞ্চানন রস, মেহকুলান্তক ও সোমেশ্বর রস, শুক্র মাতৃকাবটী, ইন্দ্রবটী, বসন্ত কুসুমাকর, বিড়ঙ্গাদি লৌহ, চন্দ্রপ্রভাদি বটিকা, দাড়িমাদ্য ঘৃত, কদল্যাদি ঘৃত, প্রমেহমিহির তৈল ও দেবদার্ব্বরিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা অনুসারে প্রযোজ্য। কুশাবলেহ একটী মেহ রোগের অত্যুৎ-কৃষ্ট ঔষধ।

কুশাবলেহ—কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণেক্ষু ও খাগ্ড়া ইহাদের মূল প্রত্যেক ১০ পল অর্থাৎ ৮০ তোলা, পরিষ্কৃত ও কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে জ্বাল দিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে ও ইহাতে চিনি দুই সের গুলিয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া লেহবৎ হইলে নামাইয়া যষ্টিমধু, কাকুড় বীজ, কুষ্মাণ্ড বীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কৃত ঘৃতভাণ্ড বা কাচপাত্রে সাবধান করিয়া রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান উষ্ণদুগ্ধ কিম্বা শীতল জল। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি যাব-তীয় বস্তিগত রোগ প্রতিকৃত হয় এবং অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি দূর হয় ও শরীর বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হয়।

শিলাজতু প্রয়োগ—সালসার, (ধুনা) অজকর্ণ (পেয়াশাল) খদির, বাবলা, গাব, রক্তলোধ্র, ভূর্জপত্র, মেষশৃঙ্গী, তিনিশ বৃক্ষ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, শিশু, শিরীষ, আসনবৃক্ষ, ধাওয়া, অর্জ্জুন, তাল, সেগুন, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, সাল, অগুরু ও কালিয়াকাষ্ঠ ইহাদের কাথে শিলাজতু ভাবনা দিয়া ইহাদেরই কাথের সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া সেবন করিবে। সেবনের নিয়ম প্রতিদিন ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিয়া যখন দেখিবে সাড়ে বারসের সেবন করা হইয়াছে, তখন উক্ত ঔষধ সেবন ত্যাগ করিবে। অধুনা অগ্নি বল বিবেচনা করিয়া ।০ আনা হইতে সেবন আরম্ভ করিয়া ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিতে উপদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে। ঔষধ জীর্ণ হইলে হরিণাদি জাঙ্গল মাংস

রসের সহিত অন্নাদি আহার করিবে। নিয়ম পূর্ব্বক ইহা সেবন করিলে শর্করা, অশ্মরী ও সমস্ত প্রকার মেহের প্রতিকার হয়, শরীর বলিপলিতাদি শূন্য, দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয় এবং নিরাময় কলেবরে শতবর্ষ জীবিত থাকা যায়। আজ কাল ভারতের লোক সমুদায় অতিশয় অলস ও অধ্যবসায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কোন একটী কার্য্য করিতে হইলে আপাত ফলের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করেন, ভবিষ্যৎ ফলের দিকে কেহই দৃক্‌পাত করেন না। এই স্থলেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইব। উল্লিখিত রূপে শিলাজতু সেবনে বোধ হয় অনেকেরই প্রবৃত্তি হয় না। কারণ ইহাতে অর্থব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও পরিশ্রম অধিক। তাই বলিতেছি যে, যে সুধা সদৃশ উপকারী শিলাজতু সেবনে শতবর্ষ পর্য্যন্ত সুস্থ দেহে যাপন করিতে পারা যায়, তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, আর অকিঞ্চিৎকর, অস্থায়িফল বহুমূল্য ঔষধ সমুদায় অহরহ সন্তুষ্ট চিত্তে আর্য্যাভিমানী ভারতসন্তানের সেবন করিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। সাবেক চাল চলন আর পছন্দ হয় না, সুতরাং খল নোড়া আর ভাল লাগেনা। অনুপান সংগ্রহ করিতে হইলেই আবার চক্ষুস্থির। শিশি হইতে ঢালিয়া খাইতে পারিলেই মহাসুখ। ভবিষ্যতে যে কি ফল দাড়াইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। এদেশের যদি এরূপ দুর্দ্দশাই না ঘটিবে, তবে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নিত্য রোগে কেন আমরা এত কষ্ট পাইতেছি? শুদ্ধ অপরিণামদর্শিতাই আমাদের রোগ ভোগের কারণ। মহামুনি চরক প্রজ্ঞাপরাধকে রোগের একটী কারণ বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও প্রজ্ঞাপরাধের বিষয় সমীরণে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের নিয়ত রোগ ভোগের কারণ কেবল সেই অপরিণামদর্শিতারূপ প্রজ্ঞাপরাধ, অপর কিছুই নহে।

শুক্রমাতৃকা বটী–গোক্ষুর বীজ, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, রসোত, ধনিয়া, চই, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগা ও দাড়িম বীজ প্রত্যেক ৪ তোলা, শোধিত গুগ্‌গুল ২ তোলা, পারদ, অভ্র, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা। সমুদায় একত্র করিয়া দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটী করিবে। দাড়িমের রস, ছাগদুগ্ধ অথবা শীতল জলানুপানে ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ—বিড়ঙ্গ, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, পিপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক সমভাগ সর্ব্বসমান লৌহ, একত্র জলদ্বারা মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ৬ রতি। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহ ও সর্ব্বপ্রকার মূত্র বিকার দূর হয়।

পঞ্চাননরস—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, বঙ্গ ৮ তোলা সমুদায় একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা শীতল জলের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

প্রমেহ চন্দ্রকলা—রস সিন্দুর ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ এই সমুদায়

একত্র শুলঞ্চের রস ও শিমুল ছালের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। কচি শিমুল মূলের রস বা অপর কোন উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবিত হইলে ইহাতে সমস্ত মেহই প্রতিকৃত হয়।

তারকেশ্বর রস—রস সিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগে মধুর সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান পাকা যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ও মধু। ইহাতে সমস্ত প্রকার মেহ ও বহুমূত্র আরোগ্য হয়।

চন্দ্রপ্রভাদি গুড়িকা—সোমরাজী, বচ, মুতা, চিরাতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতইচ, দারুহরিদ্রা, পিপুল মূল, চিতা-মূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, তেজপত্র, গুড়-ত্বক্‌, এলাইচ ও বংশলোচন প্রত্যেক ১ তোলা। ধনে, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ প্রত্যেক ১ তোলা। লৌহ ৪ তোলা, চিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা গুগ্‌গুল ১৬ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহ প্রভৃতি পীড়া আরোগ্য হয়। শুক্রতারল্য জন্য স্বপ্নদোষ এবং শুক্রমেহে কাবাব চিনির গুড়া অনুপানে সেবনে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

বঙ্গেশ্বর রস—রসসিন্দূর ও বঙ্গ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধু দিয়া মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। আমলকীর রস কিম্বা কাঁচাহলুদের রসের সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত দাহযুক্ত মেহও আরোগ্য হয়।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর রস—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক ॥০ তোলা ক্ষুদ্র কেশুবের পাতার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান কেশুরে পাতার রস, ছাগদুগ্ধ অথবা গব্যদুগ্ধ ও মধু। ইহাতে বিংশতি প্রকার মেহ, ধাতুস্থ জ্বর, হলীমক, রক্ত-পিত্ত, গ্রহণী, আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বহুমূত্র, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাতীসার নষ্ট হয়। কাঁচাহলুদের রস কিম্বা আম-লকীর রস ও মধুসহ সেবন করিলে জ্বালা যন্ত্রণাযুক্ত মেহে অতি সত্বর আশ্চর্য্যরূপ উপকার পাওয়া যায়। ইহা পুষ্টিবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক ও রুচিজনক এবং রসায়ন।

বৃহৎ সোমনাথ রস—পালিধা পত্র রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থিত পারদ এবং ইন্দুরকাণি পানার রসে শোধিত গন্ধক সমানাংশে লইয়া কজ্জলী করিবে। এই কজ্জলী ১ তোলা ও ঘৃতকুমারীর রসে পুটিত লৌহ ২ তোলা, অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক এবং স্বর্ণ প্রত্যেক ॥০ তোলা। সমস্ত একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান মধু কিম্বা শিমুল মূলের রস ও মধু বা যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু ইত্যাদি। ইহা সেবনে সোমরোগ, বিংশতি প্রকার মেহ, বহুমূত্র, মূত্রাতিসার, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি নষ্ট হয়। সোমনাথ রস একটী মেহরোগের অত্যুৎকৃষ্ট প্রচলিত ঔষধ।

বসন্তকুসুমাকর—স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, (রৌপ্যের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ কর্পূর ব্যবহার করেন) বঙ্গ, সীসা ও লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ, অভ্র, প্রবাল ও

মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ। এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ ইক্ষুরস, বাসক ছালের রস, লাক্ষার ক্বাথ, বালার ক্বাথ, কদলী মূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতী ফুলের রস বা ক্বাথ ও মৃগনাভির ক্বাথ এই সমুদায়ের প্রত্যেক দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত, চিনি ও মধু। ইহা মেহরোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

বসন্তকুসুমাকর রস সেবনে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, একাদশ প্রকার ক্ষয়, সাধ্যাসাধ্য সর্ব্বপ্রকার সোমরোগ ও বলিপলিতাদি নষ্ট হয় এবং ইহাতে কান্তি, পুষ্টি, বীর্য্য, বল, স্মৃতি, আয়ু ও সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

প্রমেহমিহির তৈল—তিলতৈল ৪ সের ক্বাথার্থ লাক্ষা ৮ সের জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের ও দধির মাত ১৬ সের। এই সমুদায়ের সহিত ক্বাথ পাকোক্ত রীতি অনুসারে পাক সমাধা করিয়া কল্ক পাক করিবে। কল্কার্থ—শুল্‌ফা, দেবদারু মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুক, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, বামনহাটী, চই, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মৌরী, বচ, জীরা, বেণারমূল, জায়ফল, বাসকছাল, ও তগরপাদুকা প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত কল্ক প্রদান করিয়া পাক শেষ করিবে ও গন্ধপাক সমাধা করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে জ্বর, প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, ও দাহ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। অধিকাংশ পীড়ার জীর্ণাবস্থাতেই তৈল প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত সুতরাং ইহাও জীর্ণাবস্থায় অর্থাৎ যখন বায়ুর প্রকোপ অধিক বলিয়া লক্ষিত হয়, তখনই ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত।

লোধ্রাসব—লোধকাষ্ঠ, শটী, পুষ্করমূল, ছোট এলাচ, মূর্চামুখী, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, যমানী, চই, প্রিয়ঙ্গু, সুপারি, গোরক্ষকর্কটী, চিরতা, কট্‌কী, বামনহাটী, তগরপাদুকা, চিতা, পিপুলমূল, কুড়, আতইচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, নাগকেশর, নখী, তেজপত্র, মরিচ ও কৈবর্ত্তমুস্তক প্রত্যেক ২ তোলা। সমুদায় একত্র করিয়া ৬৪ সের জল দ্বারা জ্বাল দিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথে ৮ সের মধু দিয়া একত্র ঘৃতভাণ্ডে ১৫ দিন মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। এই লোধ্রাসব সেবনে কফপিত্তজনিত সমস্ত প্রমেহ, পাণ্ডু, অরুচি, গ্রহণী, কিলাস ও নানাবিধ কুষ্ঠের শান্তি হয়।

পূর্ব্বে যে শুক্রমেহের কথা বলা হইয়াছে, ইহা অবশ্যই প্রমেহের অন্তর্গত, কিন্তু তথাপি আমরা লক্ষণাদির পার্থক্যবশতঃ ও সহজে অবগতির জন্য পৃথক্‌ প্রদর্শন করিতেছি। বালকগণ যৌবনারম্ভ হইতেই কুসংসর্গে পড়িয়া অস্বাভাবিক হস্তমৈথুনে প্রবৃত্ত হয়। এই অবৈধ হস্তমৈথুন এবং অপরিণত যৌবনে স্ত্রীসংসর্গ অথবা অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি কারণে দুষ্প্রতিকার্য্য শুক্রমেহ উপস্থিত হয়।

এই রোগে মলমূত্র ত্যাগের সময় সামান্য বেগ প্রদান করিলেই শুক্র নির্গত হইতে থাকে। শুক্রের ধারণাশক্তি

অতিশয় শিথিল হইয়া পড়ে। কামবেগ উপস্থিত হইবামাত্র এবং স্ত্রীলোকের স্পর্শন, দর্শন অথবা স্মরণ মাত্রেই শুক্র ক্ষরিত হইতে থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, কতগুলি লোকের পশু পক্ষী প্রভৃতির শৃঙ্গার দর্শনেও শুক্রচ্যুতি হয়। শুক্রতারল্যই এ সমুদায়ের একমাত্র কারণ। শুক্রমেহীদিগের প্রায়শই স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে। পীড়া প্রবল হইলে লিঙ্গের শিথিলাবস্থাতেই শুক্রপাত হয়। স্বপ্নদোষ হইলেও জানিতে পারে না। এইরূপ অবস্থা ঘটিলেও যে মূঢ় ব্যক্তিগণ লজ্জা বা ভয় পরবশ হইয়া কোন উপায় চেষ্টা করে না পরন্তু গোপন করিবা রাখিতেই চেষ্টা করে, তাহারা নিশ্চয়ই কালে কালে সর্ব্বস্বাস্থ্যবিধ্বংসি ধ্বজভঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠদোষ, শিরোঘূর্ণন, অজীর্ণ, অতীসার, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, মানসিক চাঞ্চল্য, স্মৃতিশক্তির অল্পতা এবং নেত্র প্রান্তভাগে নীলিমোৎপত্তি এই সমুদায় শুক্রমেহের উপদ্রব।

শুক্রমেহে সর্ব্বাগ্রে শুক্ররক্ষা করিতে যত্ন করিবে এবং ধাতু-পুষ্টিকর অন্ন, পানীয় ও ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

মধুর সহিত আমলকীর রস পান করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয়। গুলঞ্চের রসের সহিত বংশলোচন সেবন করিলে সত্বর শুক্রমেহের নিবৃত্তি হয়।

প্রত্যহ শিমুল মূলের রস ১।২ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে শুক্র মেহের প্রতিকার হয়। স্বপ্নদোষ নিবারণার্থ কাবাব চিনি চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায় প্রত্যহ শয়নের পূর্ব্বে মধু সহ সেবন করিবে। কর্পূর দুই রতি ও সিকি রতি অহিফেন একত্র মাড়িয়া শীতল জল সহ বৈকালে সেবন করিলে স্বপ্নদোষ নিবৃত্ত হয়। প্রাতে চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা ১টা শিমুল মূলের রস মধু ও সন্ধ্যায় মকরধ্বজ ১ রতি কাবাব চিনি চূর্ণ ৪ রতি ও মধুসহ সেবনে আশ্চর্য্যরূপ ফল পাওয়া যায়। শুক্রমেহে কামধেনু রস, শিলাজত্বাদি বটী, চন্দনাদি চূর্ণ, মাক্ষিকাদি চূর্ণ ও চন্দনাসব প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থেয়।

চন্দনাদি চূর্ণ—শ্বেতচন্দন, শিমুলমূল, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামলতা, মুতা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, আমলা, সোনামুখী, বংশলোচন, বামনহাটী, দেবদারু ও হরিতকী প্রত্যেক সমভাগ। একত্র করিয়া সমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ সহ মিশ্রিত ও মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৬ হইতে ১০ রতি পর্য্যন্ত। অনুপান শীতল জল অথবা বিবেচনা পূর্ব্বক কোন শুক্রবর্দ্ধক পদার্থ ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে শুক্রমেহ ও প্রমেহাদি পীড়ার শান্তি হয়। আমরা অনেক স্থলে ইহার পরীক্ষা করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

চন্দনাসব—শ্বেতচন্দন, বালা, মুতা, গাম্ভারী ফল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, আকনাদি, চিরাতা, বটছাল, অশ্বত্থছাল, শটী, ক্ষেতপাপড়া, যষ্টিমধু, রাস্না, পটোল পত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল ও মোচরস প্রত্যেক ৮ তোলা, ধাইফুল ৴২ সের, (৬৪ তোলা সেরের ২ সের) দ্রাক্ষা ৴২॥০ সের, চিনি ১২॥০ সের ও গুড় ৴৬।০ সের, এই সমুদয় ১২৮ সের জলে বিমিশ্রিত করিয়া আবৃত ভাণ্ডে ১ মাস রাখিবে। পরে কল্কদ্রব্য ত্যাগ করিয়া দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। এই চন্দনাসব শুক্রমেহ নিবারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, হৃদ্য ও অগ্নিসন্দীপক। ক্রমশঃ—

রয়াল বেঙ্গল থিয়েটরে রজনী।

ষ্টারে "চন্দ্রশেখর" অভিনয়ের পর, রয়াল বেঙ্গলে "রজনীর" অভিনয় বড়ই সময়োপযুক্ত হইয়াছে। রজনী ও চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধ বড়ই নিকটবর্ত্তী। রজনী চন্দ্রশেখরের Sequel বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি চন্দ্রশেখর পুস্তকে যে যে চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন তাহাদের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও কার্য্যগত ভাব রজনীর কয়েকটী চরিত্রে বিশেষরূপে প্রতিফলিত ও পরিস্ফুট হইয়াছে "চন্দ্রশেখরের" প্রতাপ "রজনীর" অমরনাথরূপে, শৈবলিনী—রজনী ও লবঙ্গলতার সমষ্টিরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। কবির প্রতাপ চরিত্রের অসম্পূর্ণতা অমরনাথে পরিশোধিত হইয়াছে, শৈবলিনীর অসম্পূর্ণতা লবঙ্গলতা ও রজনীতে বিভাগ করিয়া সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। চন্দ্রশেখরে কবি দেখাইয়াছেন সাহস ও হৃদয় বলের অভাবে শৈবলিনী সোণার সংসার ছারে খারে দিয়াছে অন্যপক্ষে রজনী সেই সাহস ও হৃদয় বলে বলবতী হইয়া কেমন নূতন সংসার গড়িয়াছে। শৈবলিনী যদি সংসারে প্রবেশ করিবার সময় রজনীর ন্যায় হৃদয়ের বল দেখাইতে পারিত তাহা হইলে তাহার জীবন অদ্ভুত ঘটনা সঙ্কুল বৈচিত্রময় ও যন্ত্রণাপ্রদ হইত না; শৈবলিনীর জীবনে যাহা মহাভ্রম, রজনীর জীবনে তাহা প্রকৃত জ্ঞান। শৈবলিনীর জীবনে যাহা চঞ্চলতা রজনীর জীবনে তাহা কার্য্যক্ষেত্রানুসারী স্থির-বুদ্ধি। শৈবলিনী চক্ষু থাকিতেও ভবিষ্যতে অন্ধ, রজনী অন্ধ হইয়াও ভবিষ্যতে পূর্ণ দৃষ্টিময়ী। শৈবলিনীতে হৃদয়ের আবেগ ও অসংযত প্রবৃত্তির পূর্ণোচ্ছাস, রজনীতে হৃদয়ের আবেগ সম্পূর্ণরূপে সংযত ও প্রশমিত ও মানব হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে ভুয়োদর্শন, সহিষ্ণুতা ধীরতা দ্বারা পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

কিন্তু শৈবালিনীকে কবি এক অদ্ভুত চরিত্র করিয়া আঁকিয়াছেন। অন্যপক্ষে একা রজনীর দ্বারা তাহার অভাব পূর্ণ হয় নাই। লবঙ্গলতা ও রজনীর সমষ্টিতে যে একটী উজ্জ্বল চরিত্রের সৃষ্টি হয় তাহা দ্বারাই শৈবলিনী চরিত্রের অভাব ও শূন্যতা পূরণ হইয়াছে।

রজনী অন্ধ—জন্মান্ধ। প্রকৃত পক্ষে যাহাকে দুই চোক খোজা অন্ধ বলে, রজনী তাহা নয়। তাহার চক্ষুদ্বয় বাহির হইতে দৃষ্টিশক্তিময় বলিয়া অপরে বোধ করিতে পারে, কিন্তু চক্ষুমধ্য স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য সে চক্ষুতে রশ্মি প্রতিফলিত হয় না কাজেই সে অন্ধ। রজনী শৈবলিনীর ন্যায় রূপবতী। জানি না, অন্ধ যুবতীর সৌন্দর্য্যে কোন মোহিনীশক্তি আছে কি না? রজনীর ছায়া আমরা একখানি ইংরাজি নভেলে দেখিতে পাই। লর্ড লিটনের Last days of Pompiee নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসে Nydia নামে এক অন্ধফুলওয়ালির চিত্র আছে। নিডিয়া আগে জন্মিয়াছে—এবং কবিও যখন স্বীকার করিয়াছেন তখন—রজনী, নিডিয়ার অনুকরণ।

আদিকাল হইতে চক্ষুষ্মান্ লোক লইয়াই এপর্য্যন্ত কবিরা প্রণয়ের চিত্র

আঁকিয়াছেন। অন্ধ লইয়া কেহ বড় একটা ঘাঁটাঘাটি করেন নাই। চক্ষুষ্মানের প্রকৃতি ও অন্ধের প্রকৃতির মধ্যে কোন মানসিক ও নৈতিক তত্ত্বের বিভিন্নতা আছে কিনা তাহা প্রদর্শনের জন্য এই দুই অন্ধনায়িকা সমান্তরালভাবে চিত্রিত হইয়াছে। মানসিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিডিয়া শ্রেষ্ঠা, রজনী তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারে নাই। রজনী অন্ধ, দরিদ্রা হইয়াও রূপবতী, পরে, ঘটনায় পড়িয়া পুনরায় অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী। কিন্তু নিডিয়ার সেই প্রণয় সৌন্দর্য্যময় পবিত্র হৃদয়খানি ভিন্ন আর কিছু ছিল না। এই জন্য নিডিয়ার দিকে আমরা অধিকতর বেগে আকৃষ্ট হই। রজনী অবছিন্নভাবে কেবল শচীন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট, শচীন্দ্র আর কাহাকেও ভালবাসিতেন না, শচীন্দ্রকে লাভ সুখে রজনীর অন্য কোন অন্তরায় ছিল না. কিন্তু নিডিয়ার প্রেমের পাত্র গ্লক্স, প্রতিযোগী প্রণয়িনী আইয়নের প্রতি অনুরক্ত থাকায় নিডিয়ার পক্ষে মহা পরীক্ষাময় ঘটনা সৃজন করিয়াছিল। বিজন বনে যে সুবাসিত ফুলটী আপনি আপনি ফুটিয়া, আপনি আপনিই ঝরিয়া পড়ে যাহাকে দেখিবার কেহ নাই বা যে অপরকে দেখা দিবার অবসর পায় না, সে ফুলটী কত পবিত্র কত সুন্দর। নিডিয়া এই বিজন কাননের সৌরভভরা প্রস্ফুটিত ফুল—কেহ তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া হৃদয়ে ধরে নাই—কেহ তাহার সেই নীরব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় নাই—কেহ তাহার গুণের সৌরভ লয় নাই, কিন্তু রজনীর—সৌন্দর্য্যে—মুগ্ধ হইয়া রজনীর গুণে মুগ্ধ হইয়া—অমরনাথ, সংসার ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিলেন—এইজন্য নিডিয়া অপেক্ষা রজনীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি অধিক। এক পক্ষে রজনী ধনবতী, রূপবতী, ভদ্র বংশোদ্ভবা অপর পক্ষে নিডিয়া দরিদ্রা, রূপে রজনীর অপেক্ষা নিকৃষ্টা, নীচ বংশোদ্ভবা কিন্তু নৈসর্গিক গুণরাশি বিশিষ্টা। রজনী উচ্চকুলে জন্মিয়া উচ্চতর প্রবৃত্তি সঙ্গে লই। উচ্চ হইয়াছে—কিন্তু নিডিয়াকে তাহার বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া শ্রেষ্ঠতা লইতে হইয়াছে। তবে নিডিয়া যেরূপ বহুদূর পরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া খুব ফুটিয়া উঠিয়াছে বঙ্কিমবাবু অল্প পরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার অনুকরণে রজনীকে ফুটাইয়া খুব বাহাদুরি দেখাইয়াছেন।

লিটনের নিডিয়া অপেক্ষা, বঙ্কিমের রজনী—তীক্ষ্ণ প্রতিভাময়ী। প্রতিভা নিডিয়ারও ছিল—কিন্তু তাহা রজনীর ন্যায় তত তীব্র তেজস্বিনী নহে। রজনীর চিন্তা গুলি কূট দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ নৈতিক রাজ্যের দুর্ভেদ্য সমস্যার সন্দেহময় প্রশ্নজালে বেষ্টিত। তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। রজনীর অন্তর্দৃষ্টি অতি প্রখরা, তাহার চিন্তা প্রণালী অতি শ্রেণীবদ্ধ তাহার শেষ উপস্থিত মন্তব্য—অতি গভীর ভাব পূর্ণ। রজনীর এ অদ্ভুত চিন্তাশক্তিতে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা কবির হৃদয় সঞ্চারী ভাবের প্রতিফলিত মূর্ত্তি*। নিডিয়া অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠা হইলেও রজনীকে বঙ্কিম বাবু নিজের করিয়া গড়িয়া অন্যদিকে তাহার শ্রেষ্ঠতা বাড়াইয়াছেন।

অন্ধের মনে অনুরাগ হইতে পারে কি না? ইহাই অদ্ভুত প্রশ্ন। রূপ, রস,

শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এই পাঁচটীই সৌন্দর্য্য অনুভূতির ও ভালবাসার প্রধান উপকরণ। অন্ধ ইহার সর্ব্ব প্রথমটী হইতেই বঞ্চিত। জগতে ধারাবাহিক নিয়মে এপর্য্যন্ত প্রণয়ের যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা দর্শন শক্তির সম্পূর্ণ অধীন। এই দর্শন শক্তির অভাবে—প্রেমের সৌন্দর্য্য অনুভূতি কতদূর সম্পূর্ণ হইতে পারে—প্রেম কত গোপনে গোপনে কত সংচিত ভাবে, পরিপুষ্ট হইতে পারে, তেজ লুকাইয়া প্রবণতা লুকাইয়া—বাহবল লুকাইয়া, কেবল গাম্ভীর্য্যকে সঙ্গে লইয়া তাহা কতদূর বাড়িতে পারে-তাহাই রজনীতে দেখান হইয়াছে। পাঠক! একটা চিত্র দেখুন।

লবঙ্গলতা রজনীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন—

"সত্য সত্যই কি তুমি বিষয় বিলাইয়া দিবে?

"সত্য সত্যই। আমি গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করিয়া বলিতেছি

লবঙ্গ। আমি তোমার দান লই—তুমি আমার কিছু দান লও।

র। অনেক লইয়াছি।

লবঙ্গ। আরও কিছু লইতে হইবে।

রজনী জানিত না—এ-কি দান তাহা হইলে বলিত না—"একখানি প্রসাদি কাপড় দিবেন" লবঙ্গলতা বলিলেন "তা নয় আমি যা দিই তাই নিতে হবে।"

র। কি দিবেন?

লবঙ্গ। আমার শচীন্দ্র বলিয়া একটী পুত্র আছে আমি তোমায় শচীন্দ্র দান করিব। স্বামীরূপে তুমি তাহাকে গ্রহণ করিবে। তুমি তাহাকে গ্রহণ করিলে—আমি তোমার বিষয় গ্রহণ করিব।

রজনী দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া অন্ধ নয়ন মুদিল। তারপর তাহার মুদিত নয়ন হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল। চক্ষের জল আর ফুরায় না রজনী কথা কহেনা-কেবল কাঁদে। লবঙ্গলতা বলিলেন—"কি রজনী! অত কাঁদ কেন? রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"সেদিন গঙ্গার জলে আমি ডুবিয়া মরিতে গিয়েছিলাম, ডুবিয়াছিলাম লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য। তুমি যদি বলিতে তুমি অন্ধ তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব—আমি তাহা চাহিতাম না। আমি শচীন্দ্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের অপেক্ষা এজগতে আর আমার কিছুই নাই। আমার প্রাণ উহার কাছে—দেবতার কাছে ফুলের কলি মাত্র। শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক। অন্ধের দুঃখের কথা শুনিবে কি?

তখন রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় খুলিয়া সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ (!!) তাহার পলায়ন, নিমজ্জন, উদ্ধার সবই বলিল। বলিয়া বলিল—ঠাকুরাণি তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি?" বস্তুত আমরাও মনে ভাবি ও আপনাকে সম্ভাষণ করিয়া বলি—হে পদ্মপলাশ চক্ষু বিশিষ্ট জীব! তোমরা আলোকের—জড় প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও, কি এই অন্ধা নারীর অন্ধকার হৃদয়ের প্রেম প্রকৃতির অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ প্রেম কি আপনাদের হৃদয়ে কল্পনায় আনিতে পার?

শৈবলিনী ও রজনী চরিত্রের বিভিন্নতা আমরা উপরে দেখাইয়াছি। এক্ষণে রজনী শৈবলিনীর চরিত্রের অভাব পূর্ণতার অপরাংশ দেখাইব। এ অংশ লবঙ্গলতাকে লইয়া ফুটিয়াছে। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহে সুখী হইতে পারেন নাই, কিন্তু লবঙ্গ—রামসদয়ের গৃহে উচ্চতর প্রেমসুখে চিরজীবন কাটাইয়াছেন। রামসদয়, চন্দ্রশেখরের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানে অনেক কম, স্বভাব সৌন্দর্য্যে অনেক পশ্চাতে প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠতার অনেক নিম্নে—প্রণয়ের গভীরতার অনেক দূরে কিন্তু তবু লবঙ্গ—রামসদয়ের গৃহে সুখের সংসার পাতিয়াছিলেন। শৈবলিনীর প্রতাপ, শৈবলিনীর প্রণয় অতি সংগোপনে হৃদয়ের নিভৃত গুণে পোষণ করিয়াও আবার বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু লবঙ্গের অমরনাথ আজীবন সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত। লবঙ্গলতার অমরনাথ—জীবনে অপর কাহারও হন নাই—লবঙ্গ তাহার অতদূর লাঞ্ছনা করিয়াছে—জগতের চক্ষে তাঁহাকে কলঙ্কের ছাপ দিয়াছে তথাপি লবঙ্গ তাহাকে একবারও বিরিয়া দেখে নাই—এই জন্যই যখন অমরনাথ—বড় আশায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু যদি তুমি কখন, শোন, যে অমরনাথ কুচরিত্র নহে। তবে তুমি আমার প্রতি, একটু—অনুমাত্র স্নেহ করিবে?

তখন—লবঙ্গ সদর্পে বলিল—

"তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।"

অমরনাথ তথাপি বলিলেন—

না—স্নেহের ভিখারি আর নহি। তোমার এই সমুদ্র তুল্য হৃদয়ে আমার জন্য কি আর এতটুকু স্থান নাই?"

লবঙ্গ। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

শৈবলিনী। দেখ দেখি, তুমি কি লবঙ্গলতার কাছে তোমার প্রবৃত্তি লইয়া সাহসী হইয়া দাঁড়াইতে পার? বস্তুতঃ কবি শৈবলিনী চরিত্রের যে সমস্ত অভাব—তাহার অর্দ্ধাংশ লবঙ্গলতার দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। শৈবলিনী—যদি লবঙ্গ হইতে পারিত তবে—চন্দ্রশেখরের সোণার সংসার অমন ছারখারে যাইত না।

মূল গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র সমালোচনা করিয়া তুলনা দেখাইবার স্থান ও ইচ্ছা আমাদের নাই। এক্ষণে অভিনয় কিরূপ হইয়াছে তাহাই দেখা যাক।

রজনীকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করার সম্বন্ধে কতক গুলি অন্তরায় আছে রজনী সাধারণ উপন্যাসের চিরপ্রচলিত নিয়ম হইতে কিছু দূরপথে। এ পথ বিদেশের প্রদর্শিত। আমার বোধ হয় বিখ্যাত বিলাতী নবেলিষ্ট Wilkie Collins এই প্রথার প্রধান প্রবর্ত্তক। গ্রন্থের পাত্র ও পাত্রীদিগের মুখ দিয়া—লিপিবদ্ধ ঘটনার অনুরূপে—সমগ্র গ্রন্থের কথা, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে—ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে প্রকটিত হইয়াছে। একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খলতা ও ঘটনার পরিপুষ্টি

ভাব ইহাতে নাই। নাট্যকার গ্রন্থের মধ্যান্তর হইতে এমন একটী সংযোগস্থল বাহির করিয়া লইয়াছেন- যাহাতে গ্রন্থোক্ত সমস্ত বিষয়টী তাহার চারিদিকে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ করার জন্য নাটককার বিহারি বাবু বিশেষরূপে প্রশংসার যোগ্য। এরূপ না করিলেও তিনি সহজে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন না।

রজনীর অংশাভিনয় যোগ্য পাত্রী-তেই অর্পিত হইয়াছিল! এ পাত্রী ভিন্ন অপরে যে এরূপ দক্ষতার সহিত রজনীর অংশ অভিনয় করিতে পারিত—এরূপ ত আমাদের বোধ হয় না। রজনীব অভিনয়ে যদি কিছু অদ্ভুত দৃশ্য থাকে—তবে তাহা এই অন্ধ পুষ্প নারীর ভাব প্রবণ অভিনয়। রজনীর অভিনয় হাবভাব ও অবস্থানুযায়ী কার্য্য প্রণালী আগাগোড়াই সুসঙ্গত, সুন্দর ও পুস্তকনিহিত মূল চরিত্রের অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন শচীন্দ্র নাথ ও রামসদয় আগাগোড়া, বেশ স্বাভাবিকতা ও দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তার পর লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা যদিও বঙ্কিম বাবুর সৃষ্ট "লবঙ্গলতা" হয় নাই—তথাপি যাহা হইয়াছে—তাহাতে অভিনয়ের উৎকর্ষতা বাড়াইয়াছে বই কমায় নাই। অমর নাথের অভিনয়, আরও আবেগময় ও উৎকৃষ্ট হইবে আমরা এরূপ আশা করিয়াছিলাম। ভবানন্দ ব্রহ্মচারীর শেষ অভিনয় বেশ দাঁড়াইয়াছিল। হীরালালের অভিনয় ভাল, কিন্তু সহোদরার সম্মুখে অতদূর মাতলামীটা করা ভাল হয় নাই এটী নাট্যকারের অসাবধানতার জন্যও হইতে পারে। দুই এক স্থলে হীরালালের কথাবার্ত্তা ও হাব ভাব, শীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আশা করি বিহারি বাবু এ বিষয়টী একবার লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন।

দৃশ্যপট সম্বন্ধে আমাদের দুই একটী বক্তব্য আছে। গঙ্গাবক্ষে ভাসমানা রজনী হীরালালের জাহ্নবী-চরে রজনীকে পরিত্যাগ, এই দৃশ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। পীর পাহাড় ও রজনীর নূতন দ্বিতল বাটীর দৃশ্য বেশ স্বাভাবিক। কিন্তু কয়েকখানি দৃশ্যপটের উপযুক্ত সংস্কার অভাবে ও ষ্টেজ ম্যানেজমেণ্টের দোষে দুই একস্থলে একটু ত্রুটি উপস্থিত হইয়াছিল।

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির অধ্যক্ষদের প্রতি আমাদেব সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যেন তাঁহারা ঐক্যতান বাদ্যের অনধিক দীর্ঘতার অপনোদনে একটা বন্দোবস্ত করেন। এরূপ না কবিলে শ্রোতৃবর্গের বড় বিরক্তি উপস্থিত হয় এবং নাটকের স্থায়ী ভাবের ও উত্তেজনা শক্তির ক্ষমতা মন্দীভূত হইয়া আইসে।

রয়াল বেঙ্গলে "রজনীর" অভিনয় দেখিবার নূতনতর জিনিস। যাঁহারা বঙ্কিম চন্দ্রেব আর একটী কল্পনা-কুসুমের অদ্ভুত বিকাশ দেখিতে সমুৎসুক, তাঁহারা একবার বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে গিয়া "রজনীর" অভিনয় দেখিয়া চক্ষুকর্ণের সার্থকতা সাধন করুন। অন্ধ রজনীর অপূর্ব্ব অভিনয়ে তাল-লয়-বিশুদ্ধ মনোহারী সঙ্গীতে নিশ্চয়ই তাঁহারা সন্তোষ লাভ করিবেন ও কবি রজনী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া যে অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছেন, তাঁহারও সার্থকতা দেখিতে পাইবেন।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

২য় খণ্ড। } ১৩০১ সাল—ফাল্গুন। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পঞ্চযজ্ঞ।

মহর্ষি মনুর মতে আশ্রম চতুর্ব্বিধ—গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য। ইহাদের মধ্যে গার্হস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু গৃহীমাত্রেরই কতকগুলি পাপানুষ্ঠান অপরিহার্য্য। গৃহস্থের পাঁচটী সূনা অর্থাৎ প্রাণিবধ স্থান আছে যথা;—চুল্লী (উনন), পেষণী (জাঁতা), উপস্কর (ঝাঁটা), কণ্ডনী (উদূখল-মুষল) এবং উদকুম্ভ (জলকলস)। এই কয়েকটী ব্যবহার না করিলে গার্হস্থ্য চলিতে পারে না, অথচ এই পঞ্চদ্রব্যে প্রাণিবধ অপরিহার্য্য। আর্য্য ঋষিগণ পাপের ভয়ে এত ভীত ছিলেন যে, এই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যে গৃহী প্রত্যহ এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি আর পঞ্চসূনাপাপে পতিত হইবেন না। সেই পঞ্চযজ্ঞ এই,—(১) ব্রহ্মযজ্ঞ (২) পিতৃযজ্ঞ, (৩) দেবযজ্ঞ, (৪) ভূতযজ্ঞ, (৫ মনুষ্যযজ্ঞ। কোন কোন ঋষি এই পঞ্চযজ্ঞকে যথাক্রমে অহুত, হুত, প্রহুত, ব্রাহ্মহুত ও প্রাশিত এই পঞ্চনামে অভিহিত করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মযজ্ঞ—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। অধ্যয়ন অর্থে এস্থলে শাস্ত্রাধ্যয়নই বুঝায়। বর্ত্তমান সময়ের অর্থকরী বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় পাপ দূর হওয়া দূরে থাক্ বরং চিত্তমালিন্য বর্দ্ধিতই হইতেছে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণমাত্রেরই বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই বেদপাঠে প্রস্তুত হইবার জন্যই দ্বিজাতির উপনয়নসংস্কার হইত। বেদপাঠার্থ গুরুগৃহে উপনীত হইবার জন্য প্রস্তুত করে বলিয়াই ইহার নাম "উপনয়ন"-সংস্কার। বেদাধ্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক কৃতস্নান বিপ্র গুরুর অনুমতিক্রমে সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট ও দারপরিগ্রহ করিতেন এবং যজন, যাজন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে কালাতিপাত করিতেন। অধুনাতন প্রচলিত উঞ্ছবৃত্তি ও

নিষিদ্ধবৃত্তি অবলম্বনে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হইত। এই ব্রহ্মযজ্ঞ এখন লুপ্ত-প্রায়। এখন অধ্যয়ন আছে, অধ্যাপনা আছে কিন্তু তাহাতে আর সেই ব্রহ্ম-যজ্ঞের স্বর্গীয় সৌরভ নাই বরং কুশিক্ষার তীব্র পূতিগন্ধে তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। কালবশে কর্ত্তব্যকর্ম্মে ঘোরতর বিভ্রাট উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ যে কীদৃশী দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহা সকলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

পিতৃযজ্ঞ – অন্নাদি বা উদকদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ। এই যজ্ঞ এখনও কিয়ৎপরিমাণে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে ইহার ক্রমেই অবনতি হইতেছে। শিক্ষিত বর্ত্তমান সভ্যদলের সংস্কার যে, "মরা গোরু কখনও ঘাস খাইতে পারে না" ভাবার্থ এই যে—মৃত পিতৃলোক কখনও পিণ্ড বা উদক গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশে কোন অনুষ্ঠান বৃথা, কিন্তু সেই সকল সভ্য মহাশয়েরাই আবার পাশ্চাত্য সভ্য জাতির আদর্শে মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা মৃত্যুর দিবসে প্রতিবর্ষে সভাদি করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে ব্যস্ত হন। শোকপ্রকাশ, মূর্ত্তিস্থাপন ইত্যাদি যে মানসিক বৃত্তি হইতে উদ্ভূত, হিন্দুর এই শ্রাদ্ধাদিও সেই মানসিক বৃত্তির ফল। শোকপ্রকাশ বা শ্রাদ্ধাদি না করিলে মৃতের কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমি দেবোদ্দেশে অন্নাদি উৎসর্গ না করিলে দেবতা উপবাসী থাকিবেন না, তাহা সকলেই জানেন। তবে হিন্দু দেবোদ্দেশে উপাদেয় বস্তু উৎসর্গ করিয়া আত্মবৎ তাঁহার সেবা করিয়া মনের তৃপ্তি-সাধন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। হিন্দুর মতে মৃতেরা দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তাই মৃত ব্যক্তির নাম লিখিবার পূর্ব্বে দেবত্ববোধক ৺ এই চিহ্ন লিখিতে হয়। দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃলোকের উদ্দেশে তাঁহাদের সম্মানার্থ বা স্মরণার্থ মৃত্যুর দিবসে শ্রদ্ধার সহিত যাহা নিবেদন করা যায়, তাহাকেই শ্রাদ্ধ কহে। এই শ্রাদ্ধক্রিয়া যাহাতে সকলেই অনুষ্ঠান করেন, তজ্জন্য শাস্ত্রকারগণ অনেক বিধিব্যবস্থা ও ফলের কথা বলিয়া গিয়াছেন, অন্যথা অনেক পাপেরও ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্" *— এই বচনেই শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। বস্তুতঃ মৃত্যুর দিবসে মৃতের স্মরণার্থ অথবা ভক্তি প্রদর্শনার্থই যে এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই যে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিনও মৃত পিতৃলোকের স্মরণার্থ এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অবহেলা করে, তাহার কিরূপ পিতৃভক্তি তাহা সুসভ্য-মহাশয়েরাই জানেন। মৃত্যুর দিবসে মৃতের স্মরণার্থ কোন না কোন প্রকার অনুষ্ঠান সকল সভ্য সমাজেই প্রচলিত আছে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহার বিধি ব্যবস্থা আছে, তবে আমাদের সুসভ্য মহোদয়গণের স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্রে পিতৃভক্তির কোন নিদর্শন নাই। ইঁহারা "স্বনাম পুরুষো ধন্যঃ"।

পূর্ব্বকালে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রতিদিন ও পর্ব্বাহে অনুষ্ঠিত হইত। এখন কেবল মৃতাহতিথিতেও এই কার্য্য অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, অথবা তাঁহারাই আবার অপরের পিতার

স্মরণার্থ মূর্ত্তিস্থাপন ও সভাদিতে যোগদিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন।

দেবযজ্ঞ,—দেবোদ্দেশে হোম করার নাম দেবযজ্ঞ। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা॥"

অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে তাহা সূর্য্যদেবে উপনীত হয় এবং সূর্য্য হইতে তাহা আবার মেঘ ও বৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই বৃষ্টি হইতে শস্য ও শস্য হইতে প্রজাবৃদ্ধি হয়। সূর্য্যই যে সবিতা বা জগৎ-প্রসবিতা তাহা সকল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরাই স্বীকার করেন। জগতের নিদানস্বরূপ জীবের জীবনস্বরূপ সেই সূর্য্যদেবের উদ্দেশে যজ্ঞাদি যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সহজেই অনুমেয়।

ভূতযজ্ঞ,—পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীকে খাদ্যাদি প্রদানের নাম ভূতযজ্ঞ। গৃহী অগ্রে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞত্রয় সমাপন করিয়া পতিত, কুক্কুর, পাপরোগী, কাক ও ক্রিমী প্রভৃতির জন্য ধূলি না লাগে এরূপ ভাবে ভূমিতে অন্ন রাখিবেন। সর্ব্বভূতে সর্ব্বব্যাপীর সত্তা বিরাজমান। সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান কেবল যে হিন্দুরই ছিল, এই ভূতযজ্ঞই তাহার প্রমাণ। যে মহাত্মা দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছেন যিনি জগৎকে সেই বিশ্বস্রষ্টার অংশ বলিয়া বুঝিয়াছেন, যিনি "সোঽহং" তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার আর মানব বা কীটানুকীটে কোন প্রভেদ কিরূপে থাকিবে? তিনি আর কিরূপে নিজের পাঞ্চভৌতিক দেহ লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন? তাঁহার প্রেম পশুপক্ষি প্রভৃতি সর্ব্বজীবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। তিনি সকলকেই যে, সেই পরমাত্মার অংশস্বরূপ বোধ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? যে আর্য্য জাতি স্বীয় উদারতা-গুণে সর্ব্বভূতে সর্ব্বব্যাপীর সত্তা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, বিশ্বসংসারকে আত্মপরিবার তুল্য জ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন, সেই আর্য্য জাতির পতিত সন্তানেরা আজ সর্ব্বভূতের কথা দূরে থাক্, সর্ব্বমানবের কথা দূরে থাক্, আত্মপরিবারবর্গের মধ্যেও অনেককে বাদ দিতে কুণ্ঠিত নহেন। দুই জন আত্মীয়, কুটুম্ব-প্রতিপালন করিতে যাঁহাদের অপব্যয় বলিয়া বোধ হয়, এই সুমহান ভূতযজ্ঞের মহান্ ভাব কিরূপে তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন!

মনুষ্য যজ্ঞ,—অতিথি সেবাই মনুষ্যযজ্ঞ।

"অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে।"

হিন্দু মতে অতিথি দেবতুল্য সুতরাং অতিথি সৎকারে বহুপুণ্য ও প্রত্যাখ্যানে অতিশয় পাপের কথা শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশ গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥"

যদি গৃহস্থের গৃহ হইতে অতিথি ভগ্নান্তঃকরণে ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে অতিথি স্বীয় দুষ্কৃত গৃহস্থকে প্রদান করিয়া গৃহীর পুণ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়।

প্রতিদিন এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থ-দম্পতী স্বয়ং আহার করিতেন, একথা বর্ত্তমান কালে হাস্যাস্পদ হইলেও পূরাকালে হিন্দুর গৃহে এই প্রথাই ছিল। অতি প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালের অর্থাৎ যে সময়

সেকেলে অসভ্য লোকগুলা পাশ্চাত্য সভ্যতার সভ্য হইতে শিখে নাই, নিজ পরিবার অর্থাৎ কেবল স্ত্রীর নামে কোম্পানীর কাগজ করিতে জানিত না, তখনও অনেক ভাগ্যবান্ গৃহস্থের গৃহে এই মনুষ্যযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সেবার সুবন্দোবস্ত ছিল। অতিথি সৎকার না করিয়া তাঁহারাও অন্ন গ্রহণ করিতেন না। দীন-দুঃখীর দুঃখে তাঁহাদের চিত্ত গলিয়া যাইত, তাই তাঁহারা নিজের আহার্য্যের অর্দ্ধাংশ পরকে দিতে আনন্দিত হইতেন। সেই দেবোপম মহাত্মাগণই জানিতেন—

"ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞমুৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।"

এ সমস্তই এখন কথার কথা হইয়াছে। পূরাকালের প্রথা এখন স্বপ্নবৎ হইয়া উঠিয়াছে। সেই সোণার ভারত আছে, সেই হিন্দু-সমাজ আছে, তবে জানি না, কেন, কোন্ পাপে আমরা—সেই আর্য্য সন্তানেরা দিন দিন রসাতলে গমন করিতেছি? কেন হিন্দু গৃহস্থেরা ঈদৃশ কলুষিত হইয়া পড়িতেছে। হিন্দু গৃহস্থের এই অধঃপতন মনে হইলে, মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হয়, পাষাণও বিগলিত হয়। ভগবান্ বলিয়া দিন, হিন্দু-সন্তানের এই ব্যাধির ঔষধ কি?

গৌরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নবম পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাস। সন্তপ্ত পৃথিবীর, দুর্দ্দিনের কাঁদিবার বন্ধুর মত, কাল কাল মেঘ, দিগন্তের বুক চাপিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। সে মেঘে কোন অলকার উদ্দেশে, কোন নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহপত্র গোঁজা ছিল কি না, তাহা জানা যায় নাই। তবে ভগ্নগৃহীর চক্ষের জল, বড় বড় পগারের ভেকসংকুল জল, উচ্চ বংশবনপ্রচ্ছন্ন উমেদার "ফটিকজলের" আর্ত্তস্বর, অবিরাম, সবিরাম কম্পজ্বর, বৈতরিণীতীরস্থ বিষণ্ণতামাখা, আর্দ্র, দুহমর পূর্ব্ববাত, আর অস্থি পেশী মজ্জাগত বাত লইয়া, পল্লীগ্রামের মেঘময়, গল্পময়, আর প্রাণখোঁজাময় আষাঢ় আসিয়াছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বাতাশ্রয় করিয়াছিল। মধ্যাহ্নে, গৃহিণী কোন গ্রাম্য ধন্বন্তরিপ্রদত্ত অরিষ্ট মালিশ করিতেছিলেন; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপেক্ষিত গুণরাশি ও সর্ব্বংসহা-সহিষ্ণুতার সর্ব্ব "ল"কারে রূপ করিতেও ভুলিতেছিলেন না। গৃহের এক পার্শ্বে, শ্রীমতী মৃণালিনী, ঢুলন, ভুলন ও নাসিকার অযথা শ্লৈষ্মিক অবরোধিতার ভিতর দিয়া, মাঝে মাঝে

আপনার ঘর্ষিত রক্তিম চক্ষুদ্বয় উত্তোলন করিতেছিলেন। বাহিরে, শ্রীমান জামাতা বাবাজীবন, কোন শিবসন্তোষ উদ্ভিদের সাহায্যে, বিধিদত্ত দুর্দ্দিনের সুদিন করিয়া,

"আকাশেতে নব ঘন,
করে বারি বরষণ,"— ইত্যাদিরূপ,

কোন বঙ্গবাসীর অমর সঙ্গীত-রচয়িতার, অমর নিবাপ তোয়াঞ্জলি প্রদান করিতেছিলেন। চান্‌কা হইতে, সে স্বর মাঝে মাঝে বড়ই অবৈধরূপে অন্দরে পরিস্ফুট হইতেছিল। কর্ত্তা বলিলেন—আঃ! আবার ডাক্তারের দুটো টাকা হলো! বাড়ীর এক আধ জনের অসুখ ক'রে,—কোনই লাভ নেই—কোনই লাভ নেই!—বরং ক্ষতি। বাড়ীশুদ্ধ অসুখ ক'ল্লে তবু বুঝ গেল, এ দিকে যেমন ডাক্তার খরচ, ও দিকে তেমন বাজার-খরচ বন্ধ!

গৃহিণী। ও খরচ ত তোমার নিত্যিই আছে। সেই দিন সেই বৌমার একটু ফিক্ ব্যথা ধল্লো। আর অমনি নিয়ে আয় ডাক্তার!—নিয়ে আয় ডাক্তার! বাপের বাছা, বেটার বৌ!—ও ত আর আমাদের মত হেলা ফেলা নয়!

এই বলিয়া গৃহিণী, আপনার অসাধারণ স্থূলতায় পরিণত, অনৈসর্গিক ব্যাধির বিশদ নিদান ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন। এবং অযোগ, অতিযোগ, মিথ্যাযোগ প্রভৃতি বাদ দিয়া যে আরো অনেক রকম অসুখের কারণ আছে; তাহা বুঝাইয়া, কর্ত্তার মনে, যুগপৎ বিস্ময়, রাগ ও বিদুষীজনিত্বের গৌরব উৎপাদন করিয়া দিলেন।

কর্ত্তা, কিন্তু গৃহিণীর এই শ্লেষাত্মক বাক্যে বিশেষ সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি কেমন জানিতেন, গৃহিণী, পুত্রবধূর বড় ব্যক্তিগত শুভানুধ্যায়িনী নহেন। কর্ত্তা যে টাকা-অপচয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে পুত্রবধূর শারীরিক অমঙ্গল-দূরত্বজন্য খরচের কোন সুদূর সংস্রব ছিল না। দৈহিক অস্বাস্থ্যের প্রথম উপশমের সময়, মানুষের যে একরূপ সমস্ত জগতের উপর শুভইচ্ছা-প্রবণতা আইসে; যে একটা রুদ্ধকণ্ঠ-নীরবতা, একটা উচ্চারিত কথার দেবধ্বনি হইয়া, অপরের অন্তরাত্মার জনাকীর্ণতার ভিতর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে; লইতে চেষ্টা করে; সেই সার্ব্বভৌম শুভানুধ্যায়িতার বশেই, আপনার মাঝ হইতে সেই রুগ্ন বিজনতা নির্ব্বাসনের প্রয়াসেই, কর্ত্তার অন্তরাত্মা হইতে, একটা অতর্কিত, অবর্ম্মিত কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। হইতে পারে, অধিকাংশ লোকের টাকাত্বই প্রকৃত আমিত্ব। হইতে পারে, কর্ত্তার এই ছিন্ন ভিন্ন, লূনপক্ষ আমিত্বের যাতনা, প্রথম কথাপ্রসঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

তবু তিনি গৃহিণীর এই কথার ভিতর, অনেকগুলা, তৃতীয় প্রহরে অন্নদান—শান্ত, শিষ্ট, বিলম্বিত লয়ের মর্ম্মচ্ছেদী কথার অনেকগুলা ধীর বিদ্যুৎ;—অনেকগুলা, আপনার লোকের সেতুহীন ক্রূরপর হওয়া;—অনেকগুলা, থামের আড়ালের বড় বড় চোখের বড় বড় জল;—অনেকগুলা স্তিমিত মধ্যাহ্নের, পুকুরের পাড়ে প্রচ্ছন্ন অন্নাদি-বিসর্জ্জন, যেন দেখিতে পাইতেছিলেন। অসহায় বালিকার অনেকগুলা নীরব, করুণ-অভিযোগ, যেন তাঁহার চরণের প্রান্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কাঁদিয়া বেড়াইতে

লাগিল! কর্ত্তা এবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমার স্থষ্টিধরের লক্ষ্মী। লক্ষ্মীপূজার জন্য খরচের কথা তুমি মুখে আনিও না। উহার গর্ভে আমার পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের সম্ভাবনা। কর্ত্তা গিন্নী থাকিলে, আজ কত আহ্লাদ করিতেন!—আমার সুরেশের বৌ!" প্রাণ সমর্পণের জায়গায় হুঁচট খাইলে, লোক, বাপমার নিরাপদ ক্রোড় স্মরণ করিয়া থাকে। চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার স্বর্গীয় পিতা মাতাকে মনে করিলেন' তিনি আরো অনেক কথা ভাবিতেন। কিন্তু আপনার গৃহের ভিতরের নীচত্বের সম্মুখে, মন একেবারে চক্ষু মুদিয়া ফেলে; তাহার সবটুকু ভাবিতে ভাবিতে হটাৎ সে কেমন পাশ কাটাইয়া যায়। কয়জন ক্ষতরোগী আপনার ক্ষতের তলপর্য্যন্ত সলাকা চালাইতে পারে?

গৃহিণী কিন্তু পুরাণ ভাগবতাদি সকলই শুনিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং পঞ্জিকা দেখিয়া, ৭।৮ খানা পাড়ার বিধবাবর্গের একাদশীর উপবাস স্থির করিয়াছেন। সামুদ্রিক, জ্যোতিষরত্নাকরাদি ও তাঁহার নখদর্পণের ভিতর। তিনি জানিতেন ব্রহ্মা—স্থষ্টিকর, বাসুকি—স্থষ্টিধর। স্বয়ং ভগবান, ২।৪ অবতারিত্বের পর, অনেক কষ্টে বাসুকির স্কন্ধে সে ভার নামাইয়া রাখিয়াছেন। গৃহের ভিতর পঞ্চদশবর্ষীয়া পুত্রবধূর নূতন স্থষ্টিধরত্বে, তাঁহার আদৌ বিশ্বাস জন্মিল না। মানুষের ধ্রুব ধারণা টলিলে, আমূল সৌরজগৎও বিলুপ্ত বোধ হয়।

তিনি কিন্তু বধূর, বাসুকির মত সর্ব্বসহত্বের অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলেন। কখন কখন ভূমিকম্পে, বাসুকি আপনার ক্লান্ত মাথাটা বদলাইয়া লয়; পুত্রবধূকে, গৃহিণী কখন সেরূপ অবকাশও দেন নাই। তবুও আর্য্যা গৃহিণী, দেব মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দিলেন; এবং হেলা, দোলা, ঘোলা ভাবে, অনেকগুলা অতীত কাল্পনিক দুঃখ, অনেকগুলা স্বামীজয়ী কোন্দলের ভুক্তাবশেষ রোমন্থন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমার পেটের মেয়ে, তা তুমি দেখতে পারবে কেন? ওদের এক পয়সা দিতেই তোমার স্থষ্টিধরের লক্ষ্মীর খুঁচি শূন্যি হয়। বাছার একটা ছেলের একটা ঝি রাখিতে, তোমার কত কথাই শুনিয়াছি! হরিশ আমাদের, বড় ঘরের ছেলে। শাক ডাল খেয়ে আমাদের ঘরে থাকে কত ভাগ্যি। তোমার আবাদ আওলাতের কত উপকার। তা না হয় মেয়েটার হাত ধরে একদিকে চলে যাব। কলিকাতায় গিয়ে রাঁধুনীগিরি করে খাব। বাছাদের মুখনাড়া ভাত খেতে হবে না। হরিশ বড় ঘরের ছেলে।—হাঁটু ধরে কন্যা দান করে, তুমি তার এত অপমান কর!"

গৃহিণীর বিশ্বাস ছিল, কলিকাতার পাচিকাব্রাহ্মণীদিগের সঙ্গে সঙ্গে একটা করিয়া অবশ্য প্রতিপাল্য গোষ্ঠী ফিরিয়া থাকে; এবং তাহাদের শয়ন গৃহ, জল্পনগৃহ প্রভৃতি, দৈহিক সকল ব্যাপারের এক একটা স্বতন্ত্র গৃহের পিছনে নৈশবায়ু সেবনের জন্যও একটা করিয়া প্রমোদ উদ্যান থাকিবার বিশেষ আপত্তি নাই। কর্ত্তা, কিন্তু বাপাজীবনের এই কুরুপিতামহ সদৃশ আত্মত্যাগের ভিতর, বিশেষ নৈতিক উচ্চতা দেখিতে পাইলেন না। তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে

পারিতেছিলেন না, একটী ক্ষুদ্র বালিকার বিরুদ্ধে কেন এত অহর্নিশ ষড়যন্ত্র! বালিকা, গৃহিণীর কোন্ প্রভুত্ব কাড়িয়া লইতে পারে? কর্ত্তা বুঝিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহার সমস্ত কুলের আনন্দাশ্রু স্বরূপ, এই ক্ষুদ্র শিশির কণাটী দেখিয়া দীপ্ত সূর্য্যসম গৃহিণীর কেন এ কল্পিত দক্ষিণায়ন! আবার জামাতার অনুগ্রহপ্রসঙ্গে তাঁহার রাগ হইতেছিল; আপনি এরূপ তিক্ত প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন বলিয়া, মাঝে মাঝে তাঁহার অনুতাপও হইতেছিল। তিনি কতকটা তোতো করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কে কে বড়লোক! আ—আমরা ধন বিজয় চাটুতির সন্তান—

এমন সময়, এই শুম্ভসংহারের উপক্রমে, মৃণালিনী তাঁহার মহাশল্য লইয়া জননীর সহায়তা করিল—"তা বোলে বাবা!—লক্ষ্মী বল আর যাই বল, বউ তোমার লক্ষ্মীর মত সুন্দরী নন। মাগো!—বউ বাবু! তোমার কেবল পঞ্জিকের অবাতিল!

কন্যার কথা সাঙ্গ হইতে না হইতেই মাতা আবৃত্তি করিয়া উঠিলেন।

"ছয় অঙ্গুল, উচ্চদন্ত, বহুলোমযুক্তা।
সে কন্যারে বিবাহেতে জানিবে বর্জ্জিতা॥"

চট্টোপাধ্যায়, মুখ চোখ রাঙ্গা করিয়া বলিয়া উঠিলেন।

"তা—তা—তে—

বেচারা ব্রাহ্মণ যতই শীঘ্র শীঘ্র রসনা চালনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, ততই কোন স্বপ্ন দৃষ্ট ভয়ে দৌড়াইবার প্রয়াসের মত, তাহা ব্যক্তব্যের অনুসঙ্গ হইতে পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। গৃহিণী, স্বামীর বাগিন্দ্রিয়ের জড়তার সুযোগে, অনেকগুলা সংদাহন অস্ত্র বড় ক্ষিপ্রহস্তে নিক্ষেপ করিলেন।—"সুরেশের সঙ্গে আর-জন্মে ওঁর কি শত্তুরতাই ছিল। তাই অমন বৌ করে দিলেন। দেখতে যাবার সময়, আমি আবাগী যদি সিন্দুক থেকে চসমা থান বার করে দিই?

আর কি মানুষকে ধরিয়া মারিতে হয়! মুখ বন্ধ করা, বেচারার স্বচক্ষে দেখা কার্য্যের নিন্দাকরা, প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণের অকাল বার্দ্ধক্য বর্ণন; ফলত অসুখের সময় একজনের কানে প্রেতপুরীর কল্লোল ঢালিয়া দিবার প্রয়াস! ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"পিপাসায় প্রাণ যায়!—বিছানাময় ছারপোকা!— বৌমা আমায় একটু জল দাও!"— মানুষের ভাব ও অভিব্যক্তিতে প্রভেদ কত!

গৃহিণী বুঝিলেন, ব্রাহ্মণকে রাগ প্রকাশ করিতে না দিয়া ভাল করেন নাই। যাহা নিবারণের জন্য, এতক্ষণ তাঁহারা প্রহরী হইয়া বসিয়া আছেন, তাহাই ঘটিবার উপক্রম। মাতা কন্যা উভয়ের যত্ন—পুত্রবধূ কোনরূপ শ্বশুরের সেবা করিতে না পায়। অসুখের পরিচর্য্যায় মানুষ বড় স্নেহাধীন হইয়া পড়ে। স্নেহ—পরনির্ভরত্ব সাপেক্ষ। আমি, প্রতিপদে যতই আপনার অক্ষমতা বুঝিতে পারিব, যতই বুঝিতে পারিব, প্রাণের এ সর্ব্বাঙ্গীন জ্বরত্যাগ, তোমারই করুণায় হইতেছে; ততই বুঝিব তোমার করুণায় এত হয়!—না জানি তোমায় প্রাণের ভিতরে পুরিতে পারিলে, প্রাণ কোন সুধার সাগরে, চিরদিনের জন্য আরোগ্য স্নান করিয়া উঠে! সুখ—প্রধানধর্ম্ম—শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মশাস্ত্রনির্ম্মাতা।

অসুখ অবস্থায় অনেকবার তাঁহার পুত্র-বধূকে মনে পড়িয়াছিল ;—অনেকবার বাতের যন্ত্রণা ভুলিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিয়াছিলেন—"মা ! আমি না বুঝিয়া, তোমার ওই পদতল হইতে, বালোর ভাবনাহীন নীরিবিলি টুকু মুছিয়া লইয়া, তোমায় এই সংসারের তপ্ত বালুভূমে দাঁড় করাইয়াছি !" ব্রাহ্মণের অনেক-বার মনে হইয়াছিল—"ভাল করি নাই !—ভাল করি নাই—মা ! এ জীবন হয় ত তোমার সুখের হইবে না !—আমার পরকালে !—ওই ছল ছল, চোখের অভিসম্পাত ঢালিয়া দিও না মা ! আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল – ওই বর্ষায়, নিভৃত, প্রাণের প্রাণাকাঙ্ক্ষা-ময়, নিবিড় নিথর মেঘশিশুর মত রূপ ! আমার মনে হইয়াছিল দেবতাদের কাল মেয়ে ছেলে হলে বুঝি ওইরূপই হইয়া থাকে। আমার ওই কালোর কাছে দুই দণ্ড দাঁড়াইতে পারে, এমন আলোরূপ কোথায় আছে মা !" অনেকবার, অসুখের সময় ব্রাহ্মণের মনে হইয়াছিল, বুঝি বালিকার মাথার উপর কতকগুলা তপ্ত অশ্রু ফেলিতে পারিলে, যাতনার অনেক লাঘব হয়। অনেকবার চক্ষু বুজিয়া, ব্রাহ্মণ তাঁহার বালিশের পার্শ্বে, সেই একটা ঝুমুর ঝুমুর চুলওয়ালা মাথা হাতড়াইয়া ছিলেন। কন্যা, অনিষ্টলক্ষণ ভাবিয়া চক্ষু ঘসিয়া-ছিল। ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দেখিতেছিলেন,—যেন তাঁর সমস্ত জীবনটা একটা দারুণ বাত-ব্যাধি। যেন বিশল্যকরণীর মত, পুত্রবধূরূপে একটা শ্যামলতিকা, তাঁহারই গৃহের ভিতর, একটা অক্ষম, রুদ্ধবাহু মাতৃস্নেহের মত "সঞ্চারিণী, পল্লবিনী" হইয়া তুলিতেছে ! যেন তাহার একটা স্পর্শের বায়ু লাগিলে,—যেন সব-প্রাণ-খালি করা, একটা আর্ত্ত "মা" রব, তাহার নিথর, শ্যামল স্নেহের ভিতর পাঠাইতে পারিলে, জীবনের উপর একটা অক্ষয় রক্ষাকবচ আসিয়া ঢাকা পড়িয়া যায়। কেবল কতকগুলা নিদ্রাহীন, সর্পচক্ষু তাঁহাকে পাহারা দিয়া রাখিয়াছে। সে দিকে চাহিলে, বেদনার উপর যেন নির্দ্দয় চেড়ীর বেত্রাঘাত পড়িয়া যাইবে ! সে দিকে মুখ ফিরাইলে যেন, কেবল অকুশল, কেবল কতকগুলা রক্তনখী শ্যেনসংগ্রাম, কেবল কোন প্রলয় আকা-শের নিম্ন হইতে কতকগুলা রক্তরৌদ্রের বাদল তাঁহার উপর পড়িয়া যাইবে !

কন্যা কহিলেন—"বাবা ! তোমার এতটা অসুখ ! আজ সমস্ত দিনের ভিতর বৌ কবার এ ঘরে উঁকি মেরেছে ? বাবা ! তুমি আমাদের দেখতে পার না ব'লে,—বৌকে তুমি এত ভালবাস, বৌ কিন্তু তোমার ভালমন্দ টাঁকিয়া বসিয়া আছে।"

গৃহিণী। থাক্ গো !—থাক্ !—ওসব কথায় আমাদের দুঃখী মানুষদের কায কি ? নিজের চোখে দেখে করা, বেটার বউ,—ও লঙ্কাথেকে সোণার গুঁড়ো এসেছে।

ব্রাহ্মণের পায়ের তলা হইতে ব্রহ্ম-রন্ধ্র পর্য্যন্ত, যেন একটা তপ্ত শলাকা ফুটিয়া গেল। মনে হইল যেন দুইখানি কোমল করপল্লব, সবেমাত্র তাঁহার প্রাণকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, হটাৎ কোন নারদ ঋষি আসিয়া কোন নরমেধ যজ্ঞের উদ্দেশে, যেন সেই কচি হাত দুইখানিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে !

ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন, ভবিতব্যের কতকটা দীপ্ত অংশ যেন তাঁহার চোখের উপর দিয়া জ্বলিয়া গেল। চট্টোপাধ্যায় বালকের মত বালিশে মুখ লুকাইয়া ফেলিলেন। সংসারে কয়জন আপনার পূর্ব্বজ্ঞাত অদৃষ্ট স্থিরদৃষ্টে দেখিতে পারে? সেই জন্যই বোধ হয়, ভগবান্‌, বিধাতা-পুরুষের লেখা, অত অজ্ঞেয় অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন!—সেই জন্যই বোধ হয়, ভগবানের ঢাকা খুলিয়া সে লেখা পড়িতে যাওয়া, ক্ষুদ্র মানুষের পাপ!

এমন সময়, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র কোলে করিয়া ঝি আসিয়া দরোজার নিকট দাঁড়াইল। তাহার রূপার থইনোর বোলনে, শানপেড়ে কাপড়ের দোলনে, কর্ত্তার শয্যা-লুক্কাইত মুখ উঠিল না দেখিয়া, বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায়ের আদিরস বিষয়ে, আদিদেব কৃত প্রভুত ভাগ্যবঞ্চনা লইয়া সে মনে মনে যে একখানা দারুণ করুণ রসাত্মক নাটক লিখিয়াছিল, তাহা কখন পুস্তকাকারে মুদ্রিত বা কোন বঙ্গীয় নাট্যশালায় অভিনীত হইতে দেখা যায় নাই। ঘোষজপত্নী, বোধ হয় আপনার দিনকতক পূর্ব্বের ভরা ভাদ্দর যৌবনে সে কার্য্য সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল ভাবিয়া মনটায় অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল। তবু তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা বিজয় গর্ব্বব্যঞ্জক প্রতিভা বাহির হইতেছিল। সেটা বোধ হয়, সুরেশ-চন্দ্রের সহিত বিবাহ জন্য; সর্ব্বাপরাধিনী বৌব্রেকে তাহার গিন্নীর সহিত কতকটা হিংসা ছিল বলিয়া। তবু তাহার, গৌরীর পুকুরঘাটের কাঁদ কাঁদ মুখখানা ভাবিয়া মাঝে মাঝে মনটা অন্যরূপ হইয়া যাইত। মাঝে মাঝে পাচিকার মহাসন্তোষের কারণ, সে তাহার রাত্রির আহারটা বন্ধ করিত;—এবং হরিশ্চন্দ্রের পুত্রের প্রগাঢ় নিদ্রা আসিলেও সে অনেক রাত্রি ধরিয়া খোকা ছেলে ঘুম পাড়াইবার জন্য অভিমানী কঙ্কাবতীর গান গাওয়াতে, কোন প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধতা দেখিতে পাইত না। অনেক-দিন, সেই জন্য সে জামাই বাবুর আঁস্তা-কুড়ের আদিরস বরদাস্ত করিয়াছিল। তবে পল্লীগ্রামের চাকরী বজায় রাখিতে, মাঝে মাঝে, তাহাকে প্রভুপত্নীর কোন নিষ্ঠুর কার্য্যে যোগ দিতে হইত। তা ভগবানের দুই আখ্যা—ক্ষুধা আর খোদা। ক্ষুধার জন্য আমরা অনেক সময় অনন্ত নরকাগ্নির ক্ষুধা শান্তির উপায় হইয়া থাকি। তবু তাহার প্রাণটা গৌরীর জন্য মাঝে মাঝে বড় খারাপ হইত। ঝির প্রাণ ছিল,—কারণ সে ছোটলোক।

ঝি আসিয়া বলিল,—"মা! বউদিদী একখানা পুরাণ কাপড় চাচ্চে। বাসন-ওয়ালা এসেছে, একটা ছোট ডিপা কিনিবে।" কর্ত্তা তখনও মুখ তুলেন নাই।

গৃহিণীর, হঠাৎ পুত্রের বিবাহ রাত্রি মনে পড়িল এবং ডিপা, পিলসুজ আদি আবশ্যকীয় তৈজসপত্র, সে রাত্রে বা কন্যার ঘর বসতির সময় না দিয়া, গৌরীর পিতা যে একটা অতি গর্হিত পাটীবেচার কায করিয়াছেন, তাহার চূড়ান্ত সাব্যস্ত করিয়া দিলেন। সংসা-রের লোকের আপনার যথার্থ ঋণ পরি-শোধ বিষয়ে এতাদৃশ ঔদাসীন্য দেখিয়া মৃণালিনীর ক্ষুদ্র নাসারন্ধ্রও অনেক-বার কুঞ্চিত হইয়াছিল;—এবং যে দেশে,

লোক সাধিয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দেয়, এমনি কোন কল্পতরু বলিরাজার দেশ স্মরণ করিয়া তাঁহার কৃপণ বসুন্ধরার উপর বড়ই রাগ হইতেছিল। কারণ সোণা, রূপা হেতায় খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। পৃথিবী কেন একটা ভয়ানক ভূমিকম্পের প্রসব বেদনা সহ্য করিয়া তাহার সমস্ত মণি রত্নময় গর্ভ-সঞ্চার শ্রীমতীর পদতলে ধরিয়া দিয়া যায় নাই। ভূমিকম্পে গিরি, গর্ত্ত, উল্কা জ্বালামুখী না হইয়া বালিকার এই ক্ষুদ্র সাধ পুরাইলে, চতুর্ম্মুখের কি একটা মুখ খসিয়া যাইত! রাগ করিও না দেবি!—তোমার এই ভবিষ্য সংসারাগমের স্বাগত সংবাদ, বোধ হয় বৃদ্ধ, ভীমরতিশীল, ভগবানের স্মরণ ছিল না। বুড়োলোক—অনেক ভুলে।

ঝি আবার বলিল—"তা বাপু!—কি ব'লতে হবে বল। আমার এখনো বিছানা মাদুর কত্তে আছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চ'লবে না।"

গৃহিণী। তা আবার বলব কি!—তাঁরইত দিনে সাতখানা কাপড় চাই। সুরেশও এখনো চাকরি করে নি যে, তাঁর যতবার দরকার হবে, ততবার সিন্দুক থেকে কাপড় বেরুবে। এখনো দিনকতক তাঁকেই পুরাণ কাপড় পোত্তে হবে। সুরেশের রোজগার হলে যত পারেন, সাধ আহ্লাদ, দান খয়রাৎ কোরবেন।

চট্টোপাধ্যায় তখনও বালিশের ভিতর হইতে মুখ তুলেন নাই। কথাগুলা তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত, বড় ছুটাছুটী করিতেছিল। কাণ, শূন্যগর্ভ লোকের মত সকল কথাই হাঁ করিয়া গিলিতেছিল;—কিন্তু হৃদ্‌পঞ্জর প্রভৃতির দুর্গাবরুদ্ধ প্রাণ, বড় লোকের মত সে কথাগুলার বড় তীব্র, ত্বরিত অর্দ্ধ চন্দ্রের ব্যবস্থা করিতেছিল। চট্টোপাধ্যায় কেমন জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—যেন কোন অজয়ের পীত বালুকাময় ধুধু করা তীর, যেন উচ্চ তটভূমির উপর বড় বড় তালগাছ, যেন দূরে—দূরে—আরো দূরে একটা কুসুমিত অশোক তরু, যেন তাহারই পার্শ্বে তাঁহার সেই—কালরূপে আলো করা পুত্রবধূ,—যেন বহুদিনের মৃত সেই পাঁচালীওয়ালা মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তী, যেন সেই মর্ত্তে নরক নির্ম্মাণ করা, কতকগুলা পীড়িতদন্ত, ঈর্ষাপূর্ণ ঔষধি বণ্টন,—সন্ধ্যায়, বারসীর ধ্বনিত স্পর্শশব্দের মত যেন সেই—

"শোয়াবে অজের ছালে,
অন্ন দিবে সন্ধ্যাকালে"—

তাঁহার উচ্চখাটের চারিপার্শ্বে আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইতেছে। তাহারা যেন সকলেই জীবন্ত। সকলেই যেন চট্টোপাধ্যায়ের দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া, তাঁহার শয্যার উপর ক্রমে ঘেরিয়া আসিতেছে। একটা অপাপবিদ্ধ স্ফাটিক শুভ্রতা, তাহাকে বড় ভয় দেখাইতে লাগিল। তিনি যতই নামিতে যান, ততই তাহারা গৌতমের অভিসম্পাতের মত, একরূপ পাষাণ করা হাসি হাসিয়া, চট্টোপাধ্যায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। চট্টোপাধ্যায়, পাষাণ হইবার ভয়ে আবার বিছানায় ফিরিয়া যান। ব্রাহ্মণ, ভীত শশকের মত আরো জোরে চক্ষু বুজিয়া বালিশের ভিতর মুখ লুকাইলেন। ও ব্রাহ্মণ!—চোখে জল পড়ে

কেন?—কিছু নয়!—কিছু নয়!—বুড়ার আফিম খাইবার সময় হইয়াছে!

কর্ত্তার, এবারও আপনার অপরাধ স্খালনের বিশেষ কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। তিনি আপনার দৌহিত্রের শুভ উপস্থিতি উপেক্ষা করিয়া শুইয়া রহিলেন। তাঁহার বংশপরম্পরাগত কৌলীন্যের বিহিত মর্য্যাদা স্বরূপ তাহাকে কোলে লইতে ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু এ শিশুকুলীনের মাতার চোক্ষে তাহা এড়াইয়া গেল না। তিনি বিস্মিত সিংহীর মত ঝির কোল হইতে খোকা বাবুকে টানিয়া লইয়া তাহার আত্ম-মর্য্যাদাহীনত্বের সংশোধন স্বরূপ দুই চপেটাঘাত বসাইয়া দিলেন। বল্লাল-সেন, এড়ুমিশ্র প্রভৃতির পরলোকগত আত্মা বিনা আয়াসে, বিনা গোলাগুলি ব্যয়ে বাঙ্গালীর শাসনতন্ত্রে আবার প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বালক কিন্তু কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মহিমার এই পুনঃ প্রতিষ্ঠাসাধনে বিশেষ খুসী হইতে পারিল না। অতিশয় বর্ব্বরের মত সে এমনি একটা বেনজীরী চীৎকার করিয়া উঠিল যে, তাহাতে গৃহিণী অতিশয় ক্ষিপ্রহস্তে আপনার অদৃষ্টের উপর অনেকগুলা অভিসম্পাতের বীজবপন করিয়া ফেলিলেন; এবং কর্ত্তা তাড়া তাড়ি উঠিয়া শ্রীমান ভাইজীউর মুখচুম্বন করিতে পথ পাইলেন না। হটাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি যেন একটা দুঃস্বপ্নের নাগপাশ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। কর্ত্তা, খানিকটা অন্ধ শূন্যতার ভিতর দিয়া যেন অহর্নিশ তলাইয়া যাইতেছিলেন; হটাৎ মনুষ্য প্রাণের, সূর্য্যালোক দীপ্ত, শ্যামল গ্রহ যেন তাঁহার পদস্পর্শ করিল। তাঁহার মনে হইল, যেন বড় উপযোগী অবসরে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। আর একটু চোখ বুজিয়া থাকিলে, অনেকগুলা সন্ধ্যাকালের মিটিমিটি আলোতে বসিয়া বর্ষার অজস্রধারার ঝুপ্‌ঝুপের মাঝে ভার্য্যাকন্যার সহিত তাঁহার অনেক সুখদুঃখের গোষ্ঠী, অনেক দিনের জন্য চোখ বুজিয়া পড়িত। জীবন মুহূর্ত্তের। এ অনন্ত কাল হয়ত চৈতন্যের সাগরে একটা মুহূর্ত্তের ঢেউ। সেই নিরাপদ মাতৃক্রোড়ের উষ্ণ স্নেহের সংস্পর্শে, সেই একটা মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে! সে স্পর্শ অনুভব, সে অধীর আনন্দ, মানুষ যতদিন জীবনে জাগরূক রাখিতে পারে, ততদিন সে চিন্তাহীন, বিকারহীন দেবশিশু। সেই মুহূর্ত্তের ব্যাপ্তির হিল্লোলকে, মানুষ, বাল্যকাল কহিয়া থাকে। সেই বাহিরের আলোকের সহিত, মানুষের ভিতরের আলোর কেমন একরূপ হটাৎ চিনা শুনা হইয়া যায়;—সেই এক মুহূর্ত্ত!—মানুষ, একরূপ আলোকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়;—আলোকের মত সমস্ত আকাশ জুড়িয়া বিশ্বের সকলেরই উপর প্রাণদিয়া পড়িয়া থাকিতে চায়। সে মুহূর্ত্তের বর্দ্ধমান হিল্লোল—কৈশোর—অনূঢ় যৌবন। তাহার পর, আর এক মুহূর্ত্তে একটা অবিদ্য ত্রিদিব আসিয়া আমাদের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করে;—আর এক মুহূর্ত্তে, কোন অজ্ঞেয় রসায়নের বলে মানুষ, বিরাট শুন্য-কিছুই-নয়-এর ভিতর পড়িয়া যায়। মানুষের জীবন—নিরবচ্ছিন্ন জীবন নয়;—কেবল কতকগুলা প্রাণের মুহূর্ত্ত।

প্রচুর শুন্যতার ব্যবধানে ব্যবধানে দীপ্ত তারকাময় আকাশের মত মনুষ্য-

জীবনও, কতকগুলা অজীবনের ফাঁকে ফাঁকে, কতকগুলা দীপ্ত জীবনের মুহূর্ত্ত মাত্র। চট্টোপাধ্যায় এইরূপ জীবনীমুহূর্ত্তের দাম জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া জানিতেন। তাই তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে হইয়াছিল। গৃহের অকুশলে, কন্দর্পধ্বংসীরও হৃদয়ের সমতারত্ব নষ্ট হইয়াছিল। এই জীবনের মুহূর্ত্তের অপব্যয়ে জীবন্ত মৃত্যু ভিন্ন, মনুষ্য জীবনের অন্য আখ্যা হইতে পারে না।

কর্ত্তা উঠিয়া বসিলেন; দৌহিত্রের আদর আরম্ভ করিলেন;—"তোর বোন হলে, ভাই, তোর সঙ্গেই বিয়ে দিব। তাহলে আর কোন গোলোযোগই থাকিবে না।" কর্ত্তার নৈতিক শিক্ষা অতীব শোচনীয়! বোধ হয়, তাঁহাদের আমলের পাঠ্য কোন সম্ভ্রান্ত টেক্‌স্‌ট্‌বুক কমিটি কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইত না। বোধ হয়, বাল্যের সুখময় খেলাঘর হইতে বিছিন্ন হইয়া কতকগুলা সুবাধ সম্পর্কহীন বর্ণসংযোগ মুখস্থকরা রূপ দারুণ ভাগ্য বিপর্য্যয় তখনকার ৩ বৎসরের বালকের ভাগ্যে ঘটিত না। বোধ হয়, তখন ৯ বৎসরের বালককে ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি, কোন ইনিস্পেক্টর আত্মীয় প্রসূত অপদার্থের স্তূপ কণ্ঠস্থ করিয়া শুধু বৃত্তির জন্য কোন পদার্থহীন পরীক্ষকের সম্মুখে কসলৎ দেখাইতে হইত না। তখন লোকে বাল্যকালে বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর গল্পের অবসানে ২।১ টা চাণক্যশ্লোক আবৃত্তি করিত। দাতাকর্ণ, বস্ত্রহরণ পড়িয়া গুরুশিষ্যে উভয়েই কাঁদিতেন। তবু তখনকার লোক বুঝিত, বাল্যের উপকথার ভিতর এত শিক্ষা, এত উপদেশ, এতটা কবিত্ব আছে যে, তাহার সহিত বালকহৃদয় পরিচিত হইলে সে অনেকটা দুর্লভ বাণিজ্য করিয়া যৌবনের দ্বারে উপস্থিত হইতে পারে। তাই কাক, শুক, শকুনের নিরস, ডেঁপোপনাপূর্ণ পদ্য সংগ্রহ পড়াইয়া বাল্যকাল হইতেই মানুষকে লেখাপড়ার উপর বীতশ্রদ্ধ করা হইত না। তখন এদেশে বনজঙ্গল ছিল; সভ্যতার অনুসঙ্গী ম্যালেরিয়া বা মিউনিসিপালিটী ছিল না;—এবং সমস্ত দেশের একটা সাধারণ সরল পথ ভিন্ন, গ্রামে গ্রামে এত নানারকমের "নীতিপথ"ও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখন বড় হইলে লোকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তত্ত্বনির্ণয়ের স্থলে উভয় পক্ষ সম্মুখে শালগ্রাম রাখিয়া বিচার করিত। ৮০ বৎসর বয়সে ৮ ক্রোশ পথ, মাঠ ভাঙ্গিয়া নিমন্ত্রণ যাওয়া—দৈনন্দিন জীবনের একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। এখন কয় জন লোক বাল্যের শিক্ষা—জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে বহিয়া লইয়া যাইতে পারে? তখন অধিকাংশ লোক যা কিছু শিখিত, বাল্যেই শিখিত। বাঙ্গালা শিক্ষা,—শিক্ষকের অভাবে, নায়কের অভাবে, আজ কাল একরূপ আংশিক পরমায়ু অপব্যয়। যাহা দেশে শিক্ষা বলিয়া অভিহিত, তাহা কেবল ইংরাজ প্রকাশকের পুস্তক বিক্রয়ের প্রশস্ত বিপনি। কয়টা ইংরাজী জ্ঞান, বাঙ্গালী দখল করিয়াছে? তবে দেশে এত হাহাকার উঠিতেছে কেন? আজকাল ত বাক্‌দেবতার পৌর্ব্বকালীন কাব্যময় একতারায়, অনেক তার যোজনা হইয়াছে;—আজকাল ত লক্ষ্মী সরস্বতীর

পূর্ব্বতন বিগ্রহ নূতন মিলনের প্রেমোচ্ছ্বাসে পরিণত! আজ কাল ত যে জাতের যত সরস্বতী, সে জাতের তত লক্ষ্মী! তবে এদেশ এত সার্ব্ববর্ণিক বিদ্যাচর্চ্চায়ও এত লক্ষ্মীছাড়া কেন?

সে যাই হউক, আমরা স্বীকার করিলাম, কর্ত্তার ভাষায় বড় মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি সে কথা কহিয়াই অপ্রক্ষালিত মুখে সন্ধ্যার উদ্যোগ করিতে বলিলেন। বোধ হয় চট্টোপাধ্যায়ের অন্তঃকরণের পরিচ্ছন্নতা থাকিলেও থাকিতে পারে।

কর্ত্তা সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। কিন্তু, সে দিন কেমন সংসারের বেড়া ডিঙ্গাইয়া মনটা, প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে পৌঁছাইতে পারিতেছিল না। যেন একটা সমগ্র নিরানন্দপুরী,—সন্ধ্যাকালে সে পুরীতে কেহ জলের ঝারা দেয় না;—তারকিত আকাশ হইতে স্বর্গ আমন্ত্রণ করিয়া কেহ শঙ্খধ্বনি করে না;—এমনি একটা অন্ধকার পুরের পাষাণছায়া, ভারী ভারী, ঘন ঘন, সন্ধ্যার ছায়ার সহিত মিশিয়া তাঁহার বুক চাপিয়া ধরিতেছিল। হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে, যেখান দিয়া প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের পর ভূর্ভুবস্বপ্রসূর সবিতার ছটা, তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিত;—সেই সব ক্ষুদ্র বিবরপথে যেন একটা পরিত্যক্ত ভগ্নগৃহের পাষাণ ভাঙাচোরা আসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল। তাঁহার সেই অন্তরের বড় নিভৃত অন্তরে, যেখানে গৃহিণীর অপ্রয়োজনীয়, অতর্কিত প্রবেশের ভয় নাই;—যেখানে কন্যার শ্লেষাত্মক বাক্য, কখন তাহার সর্পজিহ্বা বিস্তার করিতে পারে না;—সেই প্রাণের বিজনতার মাঝে;—এই অকুশলের কারণ বুঝিয়া লইবার ইচ্ছা হইতেছিল। কর্ত্তা ভাবিতেছিলেন "কেন এমন হয়? আমারও ত মা, বোন ছিল;—কই সুরেশের গর্ভধারিণীকে ত কখন অযত্ন করে নাই! স্বর্গীয় কর্ত্তা, পিসীমার দৌহিত্রীর বিবাহে, মুখুয্যেকে ভঙ্গ করিয়াছিলেন। সে কুলভঙ্গের ব্যয়ে মা'ত কখন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই! তখন জনার্দ্দনের ভোগের পর পাঁচ জন অতিথি না আসিলে মা বলিতেন—"বাবা! ঠাকুর ঘরে গিয়ে একবার জোরে কাঁসরটা বাজিয়ে এস" বোধ হয় লোকে জানিতে পারে নাই, ঠাকুরের ভোগ সারা হইয়াছে। আজ ঘরের বৌকে ভাত দিতে গিন্নির অনুগ্রহ মনে হয় কেন?" তাহার পর ফাটা ফাটা মেঘাবকাশে হঠাৎ জ্যোৎস্নাভাতির মত ব্রাহ্মণের প্রাণে একটা সুখময় অতীতের ঝলকা আসিয়া গেল। ব্রাহ্মণ মুখ ফুটিয়া, ফোঁফাইয়া উঠিলেন। "বাবা বলিয়াছিলেন, এই জনার্দ্দনের সেবা করিলে গৃহের সব অকুশল নষ্ট হয়। ঠাকুর! আমি ছেলে মানুষ—বাবার ছেলে। আমার সব অপরাধ মার্জ্জনা করিও। আমার উঠানভরা মরাই, বাগানভরা তরকারি, পুকুরভরা মাছ, গোয়ালপোরা গরু—আমার কিসের অভাব? তবু আমি কেন এ সব ভোগ করিতে পাইব না।" ব্রাহ্মণ, কাহার দুইখানা চরণের উদ্দেশে দুই হাত বাড়াইয়া উপুড় হইয়া পড়িল। রামনিধি চট্টো খুব লেখাপড়া জানিতেন না। তিনি জানিতেন বাবার কথা কখন মিথ্যা হইতে পারে না;—জনার্দ্দন তাঁহাদের একপরিবারভুক্ত। চট্টোপাধ্যায় কখন,

ভিখারীকে ভিক্ষা দিবার সময় ঔচিত্য, অনৌচিত্য ভাবেন নাই; তাই বোধ হয়, অত শীঘ্র ভিক্ষা চাহিতে পারিয়াছিলেন! পাড়াগেঁয়ে লোক!—

চট্টোপাধ্যায়ের সন্ধ্যার উপর ঘন রাত্রি ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। মীমাংসা কোথায় মিলিবে? তখন কুলীনে করা কন্যা পিতৃগৃহে থাকিত। পিতৃগৃহে তাহার বসতি—মাতৃস্তন্যের মত অধিকারের বিষয়। সুতরাং তাহার জন্য গৃহকর্ত্তার প্রীতিদৃষ্টি গেরেপ্তারের তাহার কোন প্রয়োজন হইত না। তখন ভাইএর সংসারে বোন গিন্নী, একটা গৌরবের কথা। বাঙ্গালার সহমরণের অবশেষ বধূকুল হাজার যন্ত্রণা সহিয়া সে গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। ভাইএর সংসারে চুরি বা অপব্যয় বাঁচাইয়া যাহা নিজস্ব করিতে পারিতেন, তাহাতে পরজন্মে স্বামী সুখের জন্য জগদ্ধাত্রী পূজা করিতেন;—বা সকল জ্বালার অত্যন্ত নিবৃত্তিজন্য বার্দ্ধক্যে কাশী গিয়া বড় বাঞ্ছিত, বড় দেরী-করে-আসা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেন। তখন বহুবিবাহ ছিল। ভাত কাপড় পাইয়া দাসীর মত—স্বামীগৃহে থাকিয়া সমস্ত পরিবারবর্গের সুখসুপ্তির অবকাশে এক হাত ঘোমটা, একমাথা সীঁদুর, মোম দেওয়া পেটে, মিসিঘসা হাসি, আর কতগুলা জড় সড় ভাব লইয়া সহমরণের আকড়া দেওয়ার মত, ধীরে ধীরে শয্যা-প্রান্তে গিয়া স্বামীর চরণে ১ টা নমস্কার করিয়া পরদিনের রন্ধনীয়ের প্রসঙ্গ করিতে পারিলে, বধূর ভাগ্যদেবতা অনেকটা প্রসন্ন বুঝিতে হইত। তখন, বধূর হৃদয় থাকিবার কোন আইন ছিল না। স্বাধীন ভর্ত্তৃকারা বড়জোর একটা কৃষ্ণ যাত্রার ছুতিগিরি, বা ভারতের অমর খেউড়ের ২।১ টা পাপড়ী ভাঙার বেশী সোহাগের কথা শুনিতে পাইতেন না। তবে, যে বাঙ্গালার ছেলে স্ত্রীকে সম্মান করে না; যে বাঙ্গালীর মেয়ে স্বামীকে ভূ-দেবত্বে বসাইতে পারে না,—তাহারা বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ে নয়। এ ভাবটা বাঙ্গালীর মাতৃস্তন্যের গুণ;—বাঙ্গালীর কোণপর-তন্ত্রতার অবশ্যম্ভাবী সহচর। তখনকার অধিকাংশ স্বামী কোন প্রাণ পরিচিত-মূলক শ্রদ্ধা ভার্য্যাকে না দিন, ধর্ম্মশাস্ত্র নজিরী সম্মানে বনিতাকে বঞ্চিত করিতেন না। উকিলের আদালত সম্মান-নার মত তাহার তলায় অনেকগুলা কঠোর শাসন শুইয়া থাকিত। তখন বাঙ্গালীর মেয়ের ঈর্ষা বা মর্ম্মকাতরতা ছিল না, এমন নহে। তখন বহুবল্লভ স্বামীর বহু কলত্রত্বের ১ হিস্যার উপসত্ব আদায় করা বড় সহজ হইত না। আবার অনেকের ভাগ্যে জীবনে ২।১ বার ভিন্ন স্বামী দর্শন ঘটিয়া উঠিত না। অনেক স্থলে মর্ম্ম কাতরতা—মুক্তকণ্ঠ পড়শী কোন্দলে আত্মনিমজ্জন করিত। তাহার পর ইংরাজ বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল;—ইংরাজী বাঙ্গালী জয় করিল। ইংরাজের মূলমন্ত্র স্বাতন্ত্র্য—আত্মনির্ভরতা। লোক দশটাকা রোজগার করিতে লাগিল, বহু বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গালীর মেয়ে প্রথম শাঁকাশাড়ী ছাড়িয়া সোণা, বারানসী দেখিল। স্বামীর কৃতীত্বের, আত্মনির্ভরত্বের আদর করিতে শিখিল। আলমারি আসিয়া এঁবো সিন্দুকেরস্থলে বসিল, গুরু পাদোদকের ক্ষুদ্র ঘটীরস্থলে কাচের পুতুল অভিষিক্ত হইল—

ছিল—

"আলনার কাপড় দলমল্ করে।
ঘরের ঘটী বাটী ঝক্ মক্ করে"।

হইল—

আয়না, চায়না, ঝক্ ঝক্ করে,
দেয়ালের ঘড়ী টক্ টক্ করে।

হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল. বিফ, ব্যারগ্যাণ্ডি ও বিলাতী হালচালের সহিত, কৌচকেদারা প্রভৃতি, বাঙ্গালীর গৃহেব তক্তপোস প্রভৃতির সহিত আপনাদের সুদূর স্বাকুল্য সংস্থাপিত করিয়া ফেলিল। সিপাহী বিদ্রোহ হইল, বাঙ্গালার শাসনের ভার—কুইন ও কুইনাইনের হস্তে সমর্পিত হইল। কুইনাইন বোধ হয়—কুইন + আইন। কারণ প্রজার ম্যালেরিয়া নাশস্বরূপ রাজোচিত কার্য্য ও মনুষ্য শরীরের দৌর্ব্বল্য হেতু অবৈধ নৈতিক বিদ্রোহ নিবারণ, ইহাতে উভয়ই সংসাধিত হইয়া থাকে।

ভারতের উপনিষদ অদ্বৈতবাদ, বিলাতের সার্ব্বভৌম বিজয় নিবারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসব করিলেন। বাঙ্গালীর বড় চাকরী মিলিতে লাগিল। ইংরাজের গৃহে স্ত্রীর ১৬ আনা দখল। ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে "মা"-স্ত্রীর হাততোলার অধিন হইলেন। তাহার পর চাকরির বাজারে আগুণ লাগিল। বাঙ্গালীর অদৃষ্টে যে ঘরপোড়া কাট মিলিল তাহাতে পূর্ব্ব লক্ষিত বিলাসিতার পূর্ণ উদরপূর্ত্তি হইল না। দান করা কন্যার পিতৃগৃহে বসতি, অনেকটা পৈত্রিক অর্থের অযথা আক্রমন বলিয়া স্থির হইয়া গেল। গৃহিণীকুল স্বামীর উপার্জ্জনের ছায়ায় বসিয়া অকৃতী পুত্রের ভার্য্যার উপর আপনার আর্থিক পরাক্রম প্রতি চলনে ফিরণে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার তোমার স্নেহে বকরা না বসাইতে পারিলে তোমার গৃহে আমার বাসকরা অসম্ভব। কারণ, স্নেহই প্রকৃত গৃহত্ব। সুতরাং গৃহপালিত জামাতা, পিতৃগৃহবাসিনী কন্যা, যথাসাধ্য কর্ত্তার স্নেহ ভালবাসার ভিতর হইতে বধূগণকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া সেই শূন্য সিংহাসন দখলে প্রভূত প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অনেক সময় কৃতকার্য্যও হইলেন। আবার এদিকে স্ত্রীশিক্ষা হইতেছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভর করিয়া বসিয়াছে। সেই বিশ্ববাসী দেবতার নিশ্বাস—বর্ত্তমান বাঙ্গালী কবির প্রতি নিশ্বাসে ঝরিয়া পড়ে। কবিরা, পত্নি প্রেমকে তাহার একমাত্র পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিলেন। বাঙ্গালার আদিরসের অন্য অর্থ হইল। ঋষিদের স্ত্রীসম্মাননা বিলাতী পোষাকে বাঙ্গালীর গৃহ অধিকার করিল। তাই আজকাল ভার্য্যার মনোকষ্টে পুত্র-পারিবারিক ইষ্টে উদাসীন হন। বিলাতের শিক্ষা আসিল, বিলাতের স্বাধীনবৃত্তি, বিলাতী বিবাহের স্বাধীনতা এদেশে আসিল না। তাই বাঙ্গালীর গৃহ—কেবল গৃহহীন ইটকাঠের গাঁথুনী—কেবল ঈর্ষিত একান্নবর্ত্তী জনাকীর্ণতা। তাই বাঙ্গালীর পুত্র কন্যার মুখে আজকাল একরূপ মাপা জোপা পাটীগণিত কসা হাসি।

সাংখ্য স্বরলিপি।

বিরামচিহ্ন।

বিরামের জন্য নূতন চিহ্নের কোন আবশ্যক নাই। বিরামে সুরই অন্তর্হিত হয়; মাত্রার বিরাম নাই, মাত্রা বরাবর চলিয়া যায়; সেই হেতু সঙ্গীতে সুরটী না লিখিয়া মাত্রাচিহ্নটী রাখিয়া গেলেই তাহা সুরের বিরাম সঙ্কেত হইল। একমাত্রিক বিরামচিহ্ন ১, দ্বিমাত্রিক বিরামচিহ্ন ২ ইত্যাদি। দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি ঃ—সা রে ১ মা। এখানে 'রে' সুরের পর ১ চিহ্নটী একমাত্রিক বিরামচিহ্ন বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ এই একমাত্রাকাল কোন সুরই গাহিতে বা বাজাইতে হইবে না। যদি এই ১ চিহ্নের স্থানে কোন সুর লিখিত হয়, তাহা একমাত্রিক সুর হইবে। সেইরূপ সা রে ২ মা থাকিলে বুঝিতে হইবে যে 'রে' সুরের পর দুই মাত্রাকাল বিশ্রাম করিতে হইবে।

কথার সংক্ষেপ।

আওয়াজ বৃদ্ধির চিহ্ন=(বৃঃ); আওয়াজ হ্রাস=(হ্রঃ); প্রবল আওয়াজ=(বঃ); মৃদু আওয়াজের চিহ্ন=(মৃ); অতি প্রবল আওয়াজ=(বঃ বঃ বা ব্বঃ); অতি মৃদু আওয়াজ=(মৃঃ মৃঃ বা ম্মৃঃ); আওয়াজের ক্রমশ হ্রাস=(ক্র—হ্রঃ); আওয়াজের ক্রমশ বৃদ্ধি=(ক্র—বৃঃ); মধ্য বল আওয়াজের=(মঃ বঃ বা ম্বঃ;

আস্থায়ী—স্থা
অন্তরা—অ
আভোগ—ভো
সঞ্চয়ী ঞ্চ
পুনরায়—পু

তালিবিভাগ সঙ্কেত।

দুই তালির মধ্যস্থিত এক একটী ভাগকে এক একটী তালিবিভাগ বলে। প্রত্যেক তালিবিভাগ কতকগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে, যেমন কাওয়ালি তালের প্রত্যেক তালিবিভাগ চারিটী করিয়া মাত্রা অধিকার করে। গানে যে যে মাত্রায় তালি পড়িবে, সেই সেই মাত্রার পূর্ব্বে এক একটী করিয়া দাঁড়ি দিতে হইবে।

তালি ও মাত্রাবিভাগ সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য তালিবিভাগের নিম্নে মাত্রা বিভাগ লিখিতে হইবে; প্রথম তালির নিম্নে প্রথম তালির মাত্রা সংখ্যা, দ্বিতীয় তালির নিম্নে দ্বিতীয় তালির মাত্রা সংখ্যা এইরূপ ক্রমান্বয়ে লিখিতে হইবে; যথা কাওয়ালি তালের সংকেত ঃ—

তালি।	১।	২।	৩।	০।
মাত্রা।	৪।	৪।	৪।	৪।

তালিবিভাগ সঙ্কেত স্বরলিপির পূর্ব্বেই দেওয়া হইবে।

সকল সময়ে সুরের মাথায় তালি সংখ্যা দেওয়া সুবিধাজনক নাও হইতে পারে,

এই কারণে আমরা ইচ্ছামত পূর্ব্বোক্ত তালিবিভাগ সঙ্কেতের ন্যায় অপর একটী সঙ্কেতের দ্বারায় সঙ্গীতের স্বরলিপির পূর্ব্বেই বুঝাইয়া দিব যে, আস্থায়ী প্রভৃতি কোন্ তালিতে আরম্ভ হইবে। যথা

আরম্ভ। স্থা। অ। ভো। ঞ।
তালি। ১। ২। ৩। ০।

এইখানে বুঝিতে হইবে যে, আস্থায়ী প্রথম তালে, অন্তরা দ্বিতীয় তালে, আভোগ তৃতীয় তালে, সঞ্চারী ফাকে আরম্ভ হইবে। এইরূপে আরম্ভ হইযা নিয়মিতরূপ তালিবিভাগ চলিবে।

আমাদের দেশীয়তালে যে সম্ ও ফাঁক আছে তাহার মধ্যে সমেই গানের বিশ্রামস্থান। সমেই গানটীর রীতিমত বিসর্জ্জন হয। ফাঁক যদিও বস্তুতঃ একটী তালি ছাড়া কিছুই নহে, কিন্তু ইহাতে কার্য্যতঃ তালি দেওয়া হয না। সমের চিহ্ন = তালি সংখ্যা অথবা সুরের পার্শ্বে বা স্থানে যুগল বিন্দু চিহ্ন বা বিসর্গ। যথা ১।২ঃ।৩।০ বা ১।°।৩।০।

সমে গানটী রীতিমত বিসর্জ্জন করা হয় বলিয়া বিসর্গচিহ্ন সম বুঝাইবার বিশেষরূপ উপযোগী চিহ্ন।

গানের সঙ্গে তাল লিখিতে গেলে, যে মাত্রায় তালি পড়িবে, সেই মাত্রার উপরে বক্রবন্ধনীর মধ্যে তালি সংখ্যা লিখিতে হইবে।

তালিবিভাগ ও আরম্ভ সঙ্কেত একত্রে।

তালিবিভাগ-সঙ্কেতের মধ্যে আরম্ভ-সঙ্কেত লিখিতে গেলে, আস্থায়ী, অন্তরা প্রভৃতি যে তালি কিম্বা তদন্তর্গত যে মাত্রাতে আরম্ভ হইবে, সেই তালি বা তদন্তর্গত মাত্রার ডান পার্শ্বে আস্থায়ী, অন্তরা প্রভৃতি কথা অথবা তাহাদের সংক্ষেপ, বন্ধনী দ্বারা বেষ্টিত করিয়া লিখিতে হইবে। এবং ইচ্ছা করিলে তাহাদের সহিত 'আরম্ভ' কথাটীও যোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যথা,

তালি। ১ (স্থা, অ, ভো)। ২। ৩।
মাত্রা। ৪ । ৪। ৪।

বা

তালি। ১ (স্থা, অ, ভো আরম্ভ)। ২। ৩।
মাত্রা। ৪ । ৪। ৪।

তালিবিভাগের সহজ কথা।

গানের আরম্ভ স্থলে ইচ্ছা করিলে না দাঁড়ি দেওয়াও যাইতে পারে। যেমন সংস্কৃত কাব্যে কোন পদের অংশ শেষ হইলে, তাহার পরে দাঁড়ি, পদের বিশেষ সমাপ্তিতে যেমন যুগল দাঁড়ি বা দ্বিদাঁড়ি বসে, গানের বেলাযও সেইরূপ; গীতির প্রতি অংশ শেষ হইলে তাহার পরে দাঁড়ি এবং গীতের বিশেষ সমাপ্তিতে যুগল দাঁড়ি বা দ্বিদাঁড়ি বসিবে।

গীতের সম্যক সমাপ্তিতে ইচ্ছা করিলে দ্বিদাঁড়ি—তৃদাঁড়ি—বহুদাঁড়ি বসাইতেও পারা যায়।

গানের কথা স্থাপন প্রণালী।

সুরের নীচে নীচে কথার অক্ষর বসিবে। যথা—

। সা গা রে মা ।
। ক বে যা বে ।

কিন্তু যেখানে স্বরের নীচে কথার অক্ষর না থাকিবে সেখানে পূর্ব্ব অক্ষরের স্বরবর্ণের জের চলিতেছে বুঝিতে হইবে। সেই জের বুঝাইবার জন্য কসিচিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে। যথা—

। সা গা রে মা ।
। হ — — রি ।

এইবার দৃষ্টান্তস্বরূপে পাঠকবর্গকে একটী গান উপহার দিই।

গান।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ
শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিদং
রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ
প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনা
কূলে রহঃ কেলয়ঃ *

তালি। ২ঃ (স্থা, স্ত, ভো)। ৩। ০। ১।
মাত্রা। ২ । ২। ২। ২।
(স্থা)। রেই গাই মাই
(স্থা)। মে — —

মাই । পা মা । মা + মা +
— । — ঘৈ । — —

মা গা । মা ২ । মা
— র । মে — । —

+ মা ২। মধা পা। পধা + ধা।
—। দু র। মম্ —।

+ ধা মা। মপা "পা"
— ব। রম্ —

বা "পাই মাই"। মা
— —। ব

সা। সা সা। সা গা।
ন। ভু ব। — শ্যা।

গা গা। + গা গা।
— মা। — স্ত।

। গা গাই রেই। রে গা।
। মা — —। ল দ্রু।

রেই সাই সা অথবা
মৈ — — অথবা

"রেই সাই নিই সা"।
২
মৈ — — —।

অথবা। "রসা সা।
অথবা। মৈ —।

---

* গীতগোবিন্দের এই আরম্ভশ্লোকটী গীতাংশে না পড়িলেও এটী সকলেরই প্রায় অতিশয় আদরের জিনিষ। সম্ভবতঃ ইহার স্নিগ্ধ আরম্ভ মাধুর্য্যে ও চিত্রলালিত্যে গায়কেরা সহজেই আকৃষ্ট হইয়া ইহাতে নিজ নিজ মনোমত সুর বসাইয়া গাহিতে চেষ্টা করিয়াছেন—গাহিয়া গিয়াছেন। ত্রিভুবন ও সজীবন নামে বিখ্যাত পাঠক ভ্রাতৃদ্বয় এই শ্লোকটী ককুভে ও ঠুংরীতে বসাইয়া জন সাধারণের সমক্ষে গান-পাঠ করিতেন। (অন্যত্র ইহার বসান সুর ভৈরবী ও তাল তেতালা দৃষ্ট হয়; যাহার যে সুরে ও তালে ইচ্ছা গাহিতেন।) কিন্তু কেহ ইহাকে মেঘ বা মল্লার রাগে কেন যে বসাইলেন না তাহা বলিতে পারি না। অন্য রাগের অপেক্ষা মেঘ বা মল্লার রাগে বসান গায়কদিগের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক অন্য রাগেও বসান চলে তাহা অসঙ্গত হয় না। আমরা এখানে উক্ত পাঠক ভ্রাতৃদ্বয়ের বসান সুর তাল প্রকাশ করিলাম।

অথবা। "র্সা সা২্
অথবা। মৈ —

নি২্"। সা সা ॥
২
—। — — ॥
(ঙ)। পা "মা" বা "গা"।
(ঙ)। ন ক্তং ক্তং।

মা পা। নি নি। নি নি।
— ভী। — রু। র য়ং।

২..............................
সা সা। সা সা। সা
ত্ব দে। — ব। ত

সা। ন্সা ধা। ধ্নি
দি। ম —ম্। রা

ধা। ধ্নি ধা। ধ্নি
—। ধে —। —

পা। পা পা। প্ধা২্ গা২্
—। গৃহং —। — —

গা। গা২্ রে২্ গা।
প্রা। — — প।

র্সা সা। সা সা।
য় —। — —।

। সা সা। সা স্বে।
। ই খং। — ন।

রে রে। রে রে। র্গা
— ন্দ। — নি। দে

রে। গা গা। গা গ্মা।
—। শ ত। — শ্চ।

। মা মা। পা পা। পা
। লি ত। য়ো —। —

পা। পা পা। গা
—। — —। প্র

মা। মা পা। প্নি নি।
ত্য। — ধ্ব। — —।

২...... ...
। সা সা। ধ্নি২্ ধা২্
। — —। কু —

নি। নি ধা। পা২।
জ্ঞ। — দ্রু। মম্ —।

: পা২। গা মা।
। — —। রা —।

। মা ম্নি। "নি নি"
। ধা —। মা —

২ ২.........
অথবা "নি সা। সা
মা —। ধ

....
সা। সা সা। সা
ব। য়ো —। —

.... ২
সা। সা সা। ন্সা
জ। য়ন্ —। তি

ধা। ধ্নি ধা। ধা
—। — —। য

ধা। ধ্নি ধা। ধনি
মু। না —। —

পা। পা পা। প্ধা২্
—। — কু। লে

ধা২্ গা। গা গা।
— —। — স্ব।

গা	গা	।	"গা"	অথবা
হ	—	।	কে	অথবা

"র্গা"	রে।	রে	গা।
কে	—।	...	ল।

"র্সা"	অথবা
র	অথবা

"রেঁই	সাঁই"	সা।	সা
..	...	...।	...

সা।	(স্থা-পু)।	রেঃ॥॥
...	(স্থা-পু)।	মে॥॥

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার পশ্চিমে চাকরী।

৩রা জুন—গ্রীষ্মকাল হইলেও সকালে কেমন মেঘের মত করিল, যত বেলা হইতে লাগিল, ততই মেঘ বাড়িয়া ঝড়ের মত করিল। দুই এক পশলা ভারি বৃষ্টি হইয়া গেল। বেশ ঠাণ্ডা পড়িল। আমরা ঠাণ্ডা পাইয়া একটু খিচুড়ীর বন্দোবস্ত করিলাম। আপনারা বোধ হয় জানেন, আমি আমার খুড়-তুতো ভাইয়ের বাসায় থাকি। মধ্যাহ্নে দিব্য করিয়া ভুনি খিচুড়ী ও মাংসের ঝোল আহার করিয়া সুখে একটু নিদ্রা দিতেছি ও সিপাহী লড়াইয়ের স্বপ্ন দেখিতেছি এমন সময়ে আমার চাকর আসিয়া জাগাইয়া দিয়া বলিল—"বাবু সাহাব উঠুন শয়তান লোগ্ খাপ্পা হইয়াছে।"

তাহার 'শয়তান্ লোগ্' অর্থে সিপাহী—তাহা আমি বুঝিয়া লইলাম। মুখে জল দিতে দেরী সহিল না। আঙ্গ-রাখা ও কোর্ত্তা পরিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—প্রায় আদ্‌মাইল দূরে, মাঠের সম্মুখে মহাভীড়। সেই ভিড়ে আবার কোলাহল জাগিয়া উঠিয়াছে। অনেক লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে দুই এক জন ইংরাজ অফিসারের টুপি দেখিতে পাইয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া সেইদিকে ছুটিলাম।

নিকটে গিয়া দেখিলাম Oudh Irregular দলের সিপাহীদিগের মধ্যে কাপ্তেন অ্যাশ্ সাহেব দাঁড়াইয়া। এই দল ইতিপূর্ব্বে অন্য ইংরাজ সেনানীর অধীনে ফতেগড়ে যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু পথের মধ্যে সিপাহীরা সেই সেনা-নায়ককে হত্যা করে। এক্ষণে অ্যাশ্ সাহেব ইহাদের কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছেন।

মাঠটী লোকে লোকারণ্য। এক দিকে এই সৈন্যদল আবার অপরদিকে গোলমাল দেখিয়া, ইংরাজ গোলন্দাজেরা পিস্তল ভরিয়া একবারে সম্মুকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের সহিত দুইটী কামান আসিয়াছে। আমার বোধ হইল একটা রক্তারক্তি কাণ্ড না হইয়া যায় না। যাই হক ঈশ্বরেচ্ছায় সেদিন সেই মুহূর্ত্ত ভালয় ভালয় কাটিল। আশসাহেব গোলন্দাজ সেনাকে ফিরাইয়া দিয়া নিজের অধীনস্থ সেনাদিগকে

ছাউনীতে লইয়া গেলেন। জ্বলনোন্মুখ অগ্নি আপাততঃ নির্ব্বাপিত হইল বটে কিন্তু তাহার মধ্যে দাহ্যমান পদার্থ গুলির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল না।

মাঠের জনতার মধ্যে হিন্দুস্থানীর দলই অধিক। আমি সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া আসিতে আসিতে একদল হিন্দুস্থানীর মধ্যে পড়িলাম। হিন্দু ও মুসলমান উভয় বিধ লোকই এই দলে ছিল। আমি ভাবিলাম, ইহাদেরও আকার প্রকারে সিপাহী বলিয়া বোধ হইতেছে। দুচারিটা কথা ইহাদের বুঝাইয়া বলিলে হানি কি? "সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়" একটা প্রবাদ আছে আমি বাহাদুরী করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িলাম।

একজন সর্দ্দার গোছ লোককে সম্বোধন করিয়া মিষ্টভাবে বলিলাম—বাপু! তোমাদের আমি দুই চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বোধ হয় তাহা তোমরা সরলভাবে লইবে। আমার এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই—ঐ সিপাহিই বলিতেছিল "ফিরিঙ্গি লোকের মতলব আমরা বুঝিয়াছি তাহারা আমাদিগের জাতি ধর্ম্ম ও প্রাণ বিনাশ করিতে চাহে। দেখ এইমাত্র কামান আনিয়া আমাদের উপর দাগিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শেষ ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল।"

এই শেষের কথাগুলা আমার ভাল লাগিল না বলিয়াই আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম সিপাহী সাহেব! তুমি বলিতেছ ইংরাজ অবিশ্বাসী, কিন্তু তাহারা কি অবিশ্বাসের কাজ করিয়াছে? তোমরাই ত অবিশ্বাসের পথ প্রথম দেখাইলে। এই দেখ ফতেগড় যাত্রী সৈন্তেরা কি না করিল? তাহাদের বিশ্বাসী ভাবিয়াই কোম্পানী অন্যস্থানে সহায়তার জন্য পাঠাইতেছিল, কিন্তু পথিমধ্যে তাহারা বিনা কারণে তাহাদের ইংরাজ সেনানায়ককে হত্যা করিল।"

সিপাহী। না বাবু সাহেব আপনি ইংরাজের দিকে টানিয়া বলিতেছেন। সিপাহীরা প্রথমতঃ কিছুই করে নাই। অর্দ্ধেক রাস্তা লইয়া গিয়া সঙ্গী ইংরাজ সেনার সহায়তায় সিপাহীদের অস্ত্র কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাহাদের পোষাক কাড়িয়া লইয়া বিদায় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল কাজেই তাহারা ঐরূপ করিয়াছে। এবং ঠিক্ কাজই করিয়াছে। ইংরাজেরা আমাদের বড়ই অবিশ্বাস করিতেছে—খাজনাখানা হইতে আমাদের সরাইয়া দিয়াছে—আমরা লুঠপাঠ করি, জাত মারিবার জন্য টোটায় না পারিয়া রুড়কী হইতে কলের ময়দার মধ্যে গো ও শূকরের অস্থি মিশাইয়া দিতেছে। তাহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে আমাদের "বদ্‌হারাম" (জাতিভ্রষ্ট) করে। বাঙ্গালীরা ইংরাজীর গোলামীর অর্থ বুঝিয়াছে তাই তাহারা আজও ইংরাজের জন্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত।"

সিপাহীর মুখে এই কথা গুলি আগ্নেয় গিরি-গর্ভ-সঞ্চিত জ্বলন্ত ধাতু স্রোতের ন্যায় বাহির হইয়া আমার চারি দিকে ভীষণ অগ্নিমণ্ডল উপস্থিত করিল। এই কথা গুলি শুনিয়া সিপাহীরা সকলে উত্তেজিত হইয়া আমার চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। একটী দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণের লোক, হাতে এক গাছা লাঠি মুখে বসন্ত চিহ্ন—চক্ষু দুইটা পাকল করিয়া আমার

দিকে ফিরিয়া বলিল—"বাবু! সিপাহীরা তোমার মত বোকা নহে। মীরটের ব্যাপারটা কি ইংরাজের বিশ্বাসের চিহ্ন! এখনও ইংরাজ আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিতেছে—কেবল কানপুরে ইংরাজ সেনা কম আছে বলিয়া। সেনা-বল বৃদ্ধি হইলেই তাহারা আমাদের মীরটের দশা করিবে। কিন্তু আমরা এত বোকা নহি যে ততদিন অপেক্ষা করিব। ইংরাজ উপর হইতে একবারে আমাদের খুব নীচে ফেলিয়া দিয়া আমাদের দফা-রফা করিয়াছে। ঐ পরশু দিন এই কাণপুরেরই একজন ইংরাজ সেনা, নায়ক, একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীকে হত্যা করিল। শেষ কি না ইংরাজেরা গুজব রটাইলেন লোকটা পাগল হইয়া হত্যা করিয়াছে। কিন্তু বাবু! বলুন দেখি যদি একজন সিপাহী ঐরূপে একজন ইংরাজকে গুলি করিয়া মারিত তবে—কোম্পানী তাহাকে ফাঁসি কাঠে লট্‌কাইতেন কি না?"

আমি একটু স্থির ভাবে ভাবিয়া দেখিলাম ইহাদের এরূপ উত্তেজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে যাহাই হউক না কেন? বর্ত্তমানে আমারই ত সম্পূর্ণ ক্ষতি। এখনি আমার অপমান হইবার এমন কি প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা।

আমি কাজে কাজেই সেখান হইতে সরিবার চেষ্টা দেখিলাম। কিন্তু আমার চারিদিকেই উন্মত্ত হিন্দুস্থানীরা ছিল। মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, ইহাদের মধ্যে লেক্‌চার দিতে আসিয়া বড় দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি। আমি সেই মুসলমান সিপাহীকে মিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিলাম "সিপাহী সাহেব—খাঁ বাহাদুর একবার ভাবিয়া দেখ ভাই; হিন্দু মুসলমানের জাতি লইয়া ইংরাজের কি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে? কিছুই না। কিন্তু তোমরা না বুঝিয়া নিজের পায়ে কুড়ালি মারিতেছ এই ইংরাজের নিমক খাইয়া হিন্দুস্থানের নাম কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেছ। বল দেখি তোমরা এমন সুখের চাকরি কোথায় পাইবে? নিয়মিত বেতন, উৎকৃষ্ট পোষাক কার্য্যতার পুরস্কার, উপযুক্ত পদোন্নতি, বৃদ্ধ বয়সে বৃত্তি,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসদ আর কোথায় মিলিবে বল দেখি?

সেই মুসলমান সিপাহী আমার কথা শুনিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল—"মিলিবে—মিলিবে—বাবু সাহেব ঢের মিলিবে। মুসলমানেরা শীঘ্রই গিয়া তাহাদের স্বজাতির দিল্লীর বাদসার অধীনতা স্বীকার করিবে।

এই কথা শেষ না হইতে হইতেই উন্মত্ত মুসলমান সিপাহীরা "দীন্" "দীন" "আল্লা" "আল্লা" করিয়া ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের চীৎকার ভীষণ ভাবে চারিদিকে ব্যপ্ত হইল সে মুসলমানটা আমার সহিত কথা কহিতেছিল—সে চীৎকার করিয়া বলিল—"ভাই রে—"সফন্ সাফা" অর্থাৎ সব পরিষ্কার করিয়া ফেল।

সকলেই মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"সফন্ সাফা"। আবার এক মুহূর্ত্তের জন্য সে চীৎকার থামিল। আমি সেই বসন্ত—চিহ্নওয়ালা মুসলমানকে বলিলাম "আচ্ছা বাবু! ইংরাজ সেনানী যেন তোমাদের কাছে দোষী। কিন্তু যে সকল ইংরাজ পার্শী, বা বাঙ্গালী

ইংরাজের অধীনে চাকরি করে বা এখানে ব্যবসাদি করে তাহাদের উপর তোমাদের এত রাগ কেন? তাহারা তোমাদের কি করিয়াছে? যাহাকে বলিলাম সে কোন কথা কহিল না কিন্তু আর একজন পিছন হইতে আসিয়া লাঠি ঘুরাইয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"সব এক মতলব কেহই ভাল নয়, আমরা ইংরেজ বাঙ্গালী সাদা কালা সকলকেই একবার দেখিয়া লইব। বাঙ্গালী ত সাপের জাত। উহাদের ছাড়িতে নাই।" আবার সেই মহা কল্লোল "সুফ্‌ন সাফা" আমি এই নূতন বিপদে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। কিন্তু সহসা ঘটনা পরিবর্ত্তন হইল। ঈশ্বর যেন দয়া করিয়া আমার সেই বিপদজনক অবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন। সিপাহীরা যখন উত্তেজিতভাবে আমার চারিদিকে এই প্রকার গোলমাল করিতেছে তখন একজন নায়েক আমার সম্মুখে আসিয়া তাহাদের সরাইয়া দিল। খালি সরাইল না তাহারা সেই সঙ্গে দুই চারিটী ধমকও খাইল। পরে সে আমার হাত ধরিয়া ভিড়ের বাহিরে লইয়া গিয়া বিনীত ভাবে বলিল "বাবু! সাহেব আপনি ঐ উত্তেজিত সিপাহীদের ওরূপ ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ভাল করেন নাই। উহাদের রাগ যেরূপ বাড়িতেছিল তাহাতে হয়তঃ আপনার জীবন সংশয় হইত। যাই হক ঈশ্বর আপনাকে বড় রক্ষা করিলেন। যান বাড়ী চলিয়া যান। আর কখনও ইহাদের কাছে আসিবেন না।

বিপদ কিন্তু যাইয়াও যায় না।" খানিকদূর গিয়াছি—দেখি—সেই সেই কর্কশভাষী কাল সিপাহী চার পাঁচ জনকে সঙ্গে লইয়া আমার আগে আগে কোথায় যাইতেছে। তাহাদের অতিক্রম না করিয়া আমার যাইবার আর অন্য পথ নাই কাজেই আমি যথাসাধ্য পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিলাম। তাহারা আমায় দেখিয়া বিকট হাস্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল "বাবু সাহেব! তোমার কোন ভয় নাই তুমি এক কাজ কর আমাদের মত পোষাক পরিয়া মাথায় টুপি দিয়া যদি "উল্‌হমদ্‌-উল ইল্লা-রুবিল-আল্লা-মীঙ" বলিতে পার তবে তোমায় আমরা আমাদের সুবাদার করিয়া ফেলি।"

হতভাগাদের বিদ্রূপবাক্যে আমার আপাদ—মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কি করিব আমি নাচার। হঠাৎ একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইলে কোম্পানী বাহাদুর আমাকেই দোষী ভাবিবেন। অনেক কষ্টে মনের রাগ মনে চাপিয়া বাসায় ফিরিলাম।

আমি আমার খুল্লতাত পুত্রের বাটীতে আহারাদি করিতাম একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যেখানে সিপাহীদের সহিত আমার পূর্ব্বোক্ত বচসা হয় সেখান হইতে আমার বর্ত্তমান বাসার দূরত্ব দেড় পোয়ারও অধিক হইবে না। আমার ভায়া ত সমস্ত ঘটনা আমার মুখে শুনিয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মতলব স্থির হইল আমার পরিবর্গ যে স্থানে আছে ইহাদেরও সেইস্থানে পাঠান হইবে। আমি অন্য রাস্তা দিয়া বাঁকা পথে বাড়ীর মেয়ে ছেলেদের আমার বন্ধুর বাটীতে রাখিয়া আসিলাম।

দুই ভায়ে এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম বটে কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে ভাবনা ঘুচিল না। ভাবিলাম, যদি আমরা এখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের সমূহ বিপদ! পরিবারবর্গ যখন কাছে অথচ তাহাদের নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিয়াছি তখন এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত। ভাবিয়া চিন্তিয়া নূতন গড়খাই (যাহা আত্মরক্ষার জন্য সাহেবরা প্রস্তুত করিতে দিলেন) মধ্যে আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত বোধ হইল।

গড়খাইএর কাজ এখন অনেকটা অগ্রসর। সাবেক বারাকগুলির চারিদিকে উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ দ্বারায় বেষ্টন করা হইয়াছে। হুইলার সাহেব যেন বিদ্রোহ সম্বন্ধে নিঃসংশয়িত বিশ্বাসে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গড়খাই (Intrenchment) মধ্যে ইংরাজ রাজ স্ত্রীপুত্র লইয়া আশ্রয় লইয়াছেন। আমি সাহেবের সঙ্গে আগে যে ঘরে থাকিতাম সেটি এখনও খালি পড়িয়া আছে। আর কাল ক্ষয় উচিত নহে ভাবিয়া দুই ভায়ে সেই গৃহে আশ্রয় লইলাম। আপীশের কাজ কর্ম্ম সমান ভাবে চলিতে লাগিল।

রোজ আপিসে যাই আসি, কিছু নূতন খপর পাই না। সেই হিন্দুস্থানী গুপ্তচরও কোন নূতন খপর আনিতে পারে না। এক দিন আমাদের আপিসের পাহারায় নিযুক্ত জন কয়েক হিন্দু-সিপাহীর সহিত কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। তাহারা সম্পূর্ণ শান্ত ও রাজভক্ত। যাহারা বিদ্রোহ চেষ্টা করিতেছে তাহাদের তাহারা "নিমক হারাম" বলিয়া গালি দিল। বিশেষতঃ ২নং দলের মুসলমান সিপাহীদের উপর তাহারা ভয়ানক বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিল। বলিল বাবু সাহেব—ঐ কাফের লোকই সকল অনিষ্টের মুল। উহারা নিজেও নষ্ট হইবে ও অপরকেও নষ্ট করিবে। ইহাদের কথা বার্ত্তা এতদূর সাবধানতা পূর্ণ যে আমি অনেক চেষ্টা ও কৌশল করিয়া তাহার মধ্য হইতে তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে অসমর্থ হইলাম।

৩রা জুন আপিসের কাজকর্ম্ম সারিয়া অপরাহ্নে গঙ্গারধারে একটু বেড়াইতে গেলাম। সেসময়ে এমন দিনকাল পড়িয়াছিল—অন্ধকারের পূর্ব্বে নিরস্ত্র হইয়া বাহিরে থাকিতে কাহারও ভরসা হইত না। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাটী ফিরিলাম এবং সেই দিন রাত্রে যে মহা ব্যাপারের অনুষ্ঠান ঘটিবে তাহা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

এক প্রহর রাত্রি অতীত হইয়াছে এমন সময়ে ২নং অশ্বারোহীদলের ছাউনীর দিকে একটা মহা গোলমাল উঠিল। একটী যেন হৈ হৈ, রৈ, চৈ; শব্দ পড়িয়া গেল। মহা কোলাহলে সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। সেই শব্দে অনেক সাহেব বারাকের ছাতের উপর উঠিলেন। দুই জন সওয়ার তখনই হুইলার সাহেবের ছাউনীরদিকে ছুটিল।

শব্দটা খালি গোলমাল। কতকটা ডাকাত পড়ার মত—কিন্তু তাহাতে "মার" "কাট" নাই। সহসা সেই নিবিড় নৈশান্ধকার ভেদ করিয়া দিগন্ত প্রসারিত মহা অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। দাউ দাউ শব্দে এক খানা বাঙ্গলা জ্বলিয়া গেল। আমরা সেই আলোকের সাহায্যে দেখিলাম—"দুই নম্বর দলের অশ্বারোহীগণ নবাবগঞ্জের পথ ধরিল।

বারাকের কাছেই একটা সৈনিক গির্জ্জা ছিল। আশপাশে খানকতক বাঙ্গলাও ছিল। অনেক ইংরাজ হয়ত এই সময় গির্জ্জার মধ্যে বা বাহিরে অন্য কোথায় থাকিতে পাবেন—এই আশঙ্কায় হুইলার সাহেব একটী বিপদ পরিজ্ঞাপক (Alarm) তোপধ্বনি কবিলেন বাহিরের ইংরাজেরা সেই শব্দ শুনিয়া বারাকে ও গড়খাইএর সীমার মধ্যে ঢুকিল।

আমরা সেই—অনন্ত নীলিমাময় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে পবিপূবিত দিগন্ত প্রসারিত নভোমণ্ডলের নিম্নে দাঁড়াইয়া কানপুরের সিপাহীদিগেব প্রথম বিদ্রোহ ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলাম। যাহার জন্য এত অব্যক্ত আশঙ্কা আজ তাহা ফুরিয়া উঠিল।

সিপাহীবা প্রথমে যে পথ ধবিযাছিল কিয়দ্দূব গিয়া তাহা পবিবর্ত্তন কবিল। আমাদের তোপের শব্দ শুনিযা তাহাবা অন্য কিছু ঠাওরাইযাছিল। যাই হ'ক তাহাদের যাইবার পথেই কমিশরিয়েট বিভাগের Cattle yard এখানে কমিশরিয়েটেব হাতী, ঘোড়া, উঠ ও গাডির ও কামান টানিবাব গরু থাকে। সিপাহীরা এখানে আসিয়া বাঙ্গলায আগুণ ধবাইযা দিল। আমাদের সিপাহীদেব গুলি করিল পরে গবর্ণমেণ্টেব দুই তিনটা হাতী লইয়া তাহাদের গন্তব্য পথে চলিল। আশ্চর্য্যেব বিষয় ইহাদের গতি রোধ করিবার জন্য ইংবাজ সেনানীবা কোন চেষ্টা করিলেন না।

সেদিন রাত্রে কেহ ঘুমাইতে পারিলাম না। পরদিন প্রাতে আমাদেব সেনারা গিয়া কমিশরিয়েটের কাটেল-সার্জেন্টের মৃত দেহ ছাউনীর মধ্যে আনিল। পথিমধ্যে খালের ধারে তাহারা আর একটা অর্দ্ধ মৃত দেহ দেখিয়া ডুলী করিয়া তুলিয়া আনিল।

আহতের শরীরে তখনও প্রাণ আছে। অতি হীন ভাবে শ্বাস বহিতেছে; কিন্তু সংজ্ঞাহীন। গায়ে ৫।৭ জায়গায় মস্তকে ও বক্ষস্থলে তরবারিব তীক্ষ্ণ আঘাত চিহ্ন। শোনিত ক্ষবণে সমস্ত বস্ত্র ঘোর লাল। এই আহত ব্যক্তি ২ নং পদাতি দলের সুবাদার হরিসিংহ।

হবিসিংহকে হাসপাতালে পাঠান হইল। হুইলাব সাহেব নিজে তাহার বন্দোবস্ত কবিয়া দিলেন। কিন্তু ঘণ্টা খানেক পবেই সেই রাজভক্ত সিপাহী ইহলোক ত্যাগ করিল।

আটটা নয় টা বেলার সময় আমার সেই পূর্ব্ব পরিচিত হুইলারের নিযুক্ত প্রতিনিধি, বদ্রীনাথ আমায় সমস্ত খপর দিযা গেল। সে বলিল—"বাবু সাহেব আপনি যে সিপাহীদের মধ্যে পড়িয়াছিলেন তাহারাই বিদ্রোহী হইযা গত রাত্রে দিল্লী চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের দলে মুসলমানই বেশী। হতভাগ্য হবিসিংহ তাহাদের সুবাদার। সে তাহাদের সহায়তা কবে নাই বরঞ্চ সাধ্যমতে হিতোপদেশ দিয়া তাহাদের বিদ্রোহ ব্যাপারে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল উন্মত্ত সিপাহীরা তাহাকে তরবারে খুঁচিয়া মাবিযাছে। যাইবার সময় তাহারা কমিসেবীএট পশুশালা হইতে ৩।৪ টা হাতী ও দুই তিন টা উট্ সঙ্গে লইয়াছে। অনেক রসদ ঘি ময়দা ও লুচি লইয়াছে। মাজিষ্টর সাহেব ও পাহারার ৮ জন সিপাহীকে বধ করিয়াছে। এবং যাইবার সময় রাস্তার

লোককে ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছে "তোমাদের আমরা এখন কোন অনিষ্ট করিব না। ভয় নাই নিশ্চিন্তে থাক। দিল্লীতে আমরা বাদসাহের নিকট চলিলাম। তাঁহার হুকুমে আমরা আবার কানপুরে ফিরিয়া আসিতেছি। আসিয়া একবার ফিরিঙ্গীদের দেখিয়া লইব।"

কলির দেবতা (নিদ্রিত)।

কঠিনে কোমল রচি,
পাষাণে কুসুম শুয়ে,
কে গো ঘুমে রূপরাণী,
বাহুতে মু'খানি থুয়ে ?
উপবাসী সুর-পুর,
ভাঙ্গিতে দেবের ক্ষুধা,
এসেছে লইতে বায়ু,
অধরে মথিত সুধা ?
জাগিলে মোহিনী পাছে
সুধা-চুরি টের পায়,
তাই বায়ু ভয় ভুলে
চুল ছুঁয়ে চলে যায় ?
এ কেরে চাঁদের চাঁদ-
পেতে ফাঁদ ধরাতলে !
এ কাহার প্রেম-ধার
যেন শুধিবার ছলে ?
এ কাহার ভাবে ভোর
প্রাণ-খোলা পাগলিনী ?
এ কার প্রাণের মায়া
প্রেমছায়া সুগভীর ?
এ কাহার সাধা গান-
ভোলা-তান বিরহীর ?
এ কার প্রাণের নেশা ?
এ পিপাসা ওগো কার ?
প্রাণ সাদা এ প্রমদা,
চোকে ধাঁ ধাঁ সে কাহার ?
কার তরে এ মোহিনী
পোষে প্রাণে প্রেম-পাখী
কার তরে এ সোহাগী
মগ্নপ্রাণে স্বপ্ন মাখি ?

বুঝি এর তরে কেহ
ত্যজি গেহ উদাসীন ?
বুঝি এর তরে কেহ
পথ চেয়ে নিশিদিন ?
বুঝি এর তরে কেবা
নিশি দিবা পরাধীন !
এ কাহার প্রেম ফুল ?
ঢুল ঢুল ভাবে ভোরা ?
কে বুঝি ইহার লাগি
সব ত্যগি ভব ঘোরা ?
অজানা কোন থানে ; এরি গানে
করে কেবা আবাহন ?
বুঝি বা সুর পুরে, নাদ সুরে
করে দেবী আরাধন ?
বুঝি কে এর আশে, আছে ব'সে
বেঁধে বাসা কোন থানে,
বুঝি এ মাধুরিতে, সাধুচিতে
উঠে জেগে বেদগানে ?
যেন কোথা এর কথা
কহে কেহ কাণে কাণে ;
যেন কেহ এর গুণ
গাহিতেছে কোন গানে ?
সবল-তরলা লোকে
আলোকিত কে রূপসী !
ইন্দিরাকা ঢাকা আঁকা
মোহ মাখা ছাঁকা শশী।
অনল গরলে-সুধা
ভব-ক্ষুধা নিবারণ ?
কলির দেবতা ঘুমে
মরভূমে অচেতন ?

শ্রীপ্রাণকিশোর শর্ম্মা।

গোপাল নায়ক ও আমীর খস্রু।

৩

কবি খস্রুর এই দিবান গ্রন্থ ভারতবর্ষে অত্যন্ত সমাদৃত হয়। তাঁহার নহ্‌সিপেহ্‌র (—নব—নয় সিপেহ্‌র—Sphere—স্ফুরণ) বা নবমণ্ডল একটী গূঢ় তত্ত্বপূর্ণ কাব্য, তাঁহার দিবান উস্‌সাদীন অর্থাৎ শুভরেখা নামক একটী গ্রন্থে দিল্লীপতি সুলতান মুইজুদ্দিন কাইকোবাদ ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারী তদীয় পিতা বঙ্গাধিপ নসিরুদ্দিন বগরা খাঁর স্তুতি গত হইয়াছে, তাঁহার মাথালা নামক গ্রন্থে প্রথম চারি জন খলিফাঃ আবু বাকর উমার উসমান এবং আলি ইহাঁদিগের স্মৃতি লিপিবদ্ধ এবং তন্মধ্যে তাহার ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত সুফিমন্ত্র বা সুফিসূত্র সম্পর্কীয় একটী সন্দর্ভও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তিনি খামসা অর্থাৎ পঞ্চপুথি নামক একটী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১৮০০০ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক নিবদ্ধ আছে, এই পঞ্চপুথির অন্তর্গত পুথিগুলি, হাস্ত, বাহস্ত, সিকান্দর নামা, পাঞ্জগাঞ্জ, লাইলিওয়া খস্রু। পুথিগুলির মধ্যে পঞ্চপুঁথির 'সিকান্দর নামা'টীর প্রভাব যে প্রাচ্যে বিশেষতঃ ভারতে সাধারণ লোকের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা নেসর্ফীল্ড সাহেবের কথার দ্বারা বেশ প্রতীয়মান হয়। নেসফীল্ড সাহেব বলেন ঃ—সিকান্দর নামার মধ্যে খোয়াজা খিজুর নামক একটী চরিত্র আছে তিনি একজন মুসলমান পীর, অমৃতকূপের উপর তাঁহার আধিপত্য; তিনি গ্রীকরাজ আলেকজণ্ডরকে, অমৃতবারি যে সকল স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই সকল স্থানে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছিল *। সিকান্দর নামান্তর্গত আলেকজণ্ডরের অমৃতপথ প্রদর্শনেচ্ছু

—

* এস্থানে একটী কথা মনে আইসে যে গ্রীকরাজ আলেকজণ্ডরের গৌরব মাহাত্ম্য প্রাচ্য প্রদেশে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ তাহা পারস্যের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সে তাহার একরূপ চিরশত্রু গ্রীসের বীরত্ব কিছু সেই ভুলিতে পারে নাই গ্রীকবীর আলেকজণ্ডরকে লইয়া পারস্য কত স্বপ্নরাজ্য গড়ে, তাহাদের নানা গল্প গুজব চলে, (নেহাটসেক সাহেব পারসীয়দিগের আলেকজণ্ডর সম্পর্কীয় কাহিনী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন।)

প্রাচ্যের আলেকজণ্ড কাহিনী সমূহ পাশ্চাত্য প্রদেশকেও প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল, প্রতীচ্য ভূমিও তাহার অদ্ভুত অনুবক্তিগুলিতে অব্যাহত পায় নাই। বেভারেও টপযোড ব্রুক বলেন The third romantic story arose after the crusades and is that of the *Life of Alexander*; already alluded to as coming from the East. Its romantic wonders, fictions, and magic partly derived from the Arabian books about Eskander (Alexander) were doubled by the imagination with all the romance of chivalry, and the story became so common in England that "every wight that hath discrecioune" says Caucer, had heard of Alexander's fortune"

আলেকজণ্ডরের কথা জল্পনা হইতে তদীয় ও তদানুসঙ্গিক নানা ঘটনা এবং তাহাদের প্রকৃত তথ্য অনেকটা অবধারিত হয়। যেমন,

পীর খোয়াজা খিজর হিন্দী ভাষায় অপভ্রষ্ট ভাবে রাজা কিদর নামে কথিত হইয়া থাকে, এবং আরও এই রাজা কিদর পশ্চিমের হিন্দু দাঁড়ি মাঝিদিগের এবং জেলেজাতির মাল্লা, কেওয়াৎ, কাহার প্রভৃতি জাতিদিগের পোষক—প্রতিপালক দেবতা স্বরূপ হইয়াছেন। উহারা তাঁহাকে তাঁহাদের নৌকা বিপদে পড়িয়া যাহাতে না জলমগ্ন হয়, না ভগ্নচূর্ণ হইয়া যায় ও পথহারা হয় তজ্জন্য আহ্বান করিয়া থাকে।

পারস্য কবি খস্রু আলেকজণ্ডর কাহিনী মায়া প্রণোদিত হইয়া শুধু যে সিকান্দরনামা নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি আইনি সিকান্দরি নামে আর একটী সিকান্দরের আইন বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নপূর্ব্বক প্রাচ্য সাহিত্য বিশেষতঃ পারস্য সাহিত্য যে সিকান্দর জল্পনা বিরহিত হইয়া থাকিতে পারে না এইটী যেন সাধারণ সমক্ষে ব্যক্ত করিয়া দিয়া'ছেন।

এতদ্ব্যতীত খস্রুর আরও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অবগত হওয়া যায় যথা আইজাক খসরোই, এবং খিজিরখানি। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত কাব্য গ্রন্থটী, ভারতের ইতিহাসে মুসলমান সম্রাট আলাউদ্দিনের সময় দেওয়ালদেবী ও খিজির খাঁর যে প্রণয়ের কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই প্রণয়কাহিনী অবলম্বন পূর্ব্বক রচিত হইয়াছে। লেথব্রীজ সাহেব খস্রুর এই প্রণয়কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে একটী দীর্ঘ পারস্য কাব্যে কবি খস্রু দেওয়ালদেবী এবং কিশোর বয়স্ক ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী খিজির খাঁ এই দুই জনকে নায়ক নায়িকা সাজাইয়াছেন তাহাতে নায়িকা দেওয়ালদেবীর মাধুর্য্যরস যেন অসামান্য সৌন্দর্য্যের শান্তিস্বরূপ বিষাদময় পরিণামের দ্বারা শোকময় হইয়া বিয়োগান্তভাবে অনেকটা 'ট্রাজেডি'র ভাবে ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

কবি খস্রুর কতদিকে যে মাথা ছিল তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ। তাঁহার বিচিত্র কাব্য গ্রন্থের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে কাব্যরাজ্যে তাঁহার নানাদিকে মস্তিষ্ক খেলিত—বিচিত্রভাবে বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পাইত। ঐতিহাসিকতা, দেবভাব, ধর্ম্মভাব, প্রেম ভাব এইরূপ নানা ভাবে তাঁহার কাব্য গ্রন্থ সমূহ অলঙ্কৃত হইয়াছে। খস্রুর যথার্থ কবির ভাব ছিল; তাঁহার কল্পনা প্রাবল্য প্রকৃতই ছিল। কিন্তু

সিকান্দরনামার পূর্ব্বোক্ত কাহিনী—আলেকজণ্ডর ও খোয়াজা খিজরের ঐরূপ ব্যাপারের মধ্যে আলেকজণ্ডরের সম্বন্ধে একটী ঐতিহাসিক সত্যের আভাস দেখিতে পাই যে তিনি যুদ্ধকালে যুদ্ধযুগে সম্ভবতঃ কাহারো কথায় সহজে বিশ্বাস করিতেন না। ইতিহাসে আছে তিনি একজন মহাপণ্ডিতও ছিলেন, রাজা হইলেও গ্রীকশাস্ত্রে তাঁহার মন্দ পারদর্শিতা ছিল না। তিনি যুদ্ধ যাত্রাকালে যে ঐ মুসলমান পীরের কথা অবহেলা করিয়াছিলেন তাহার মনোরথ পূর্ণ করেন নাই ইহাতে প্রকৃত সূক্ষ্ম সংগ্রাম শাস্ত্রবিদেরই কার্য্য করিয়াছেন কারণ যুদ্ধকালে সকল দেশেরই রণশাস্ত্রে সহজে অপরে দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করে। সংগ্রামযুগে সাবধানতা ও অবিশ্বাস যেন স্বাভাবিক রণশাস্ত্ররূপে লোকসাধারণের অন্তঃকরণে বিরাজ করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মপথে শাসিত ও নিয়মিত করে। এই স্বাভাবিক রণনীতির উপর নির্ভর করিয়াই যেন শস্ত্রধারী বীর আলেকজণ্ডর পীর খোয়াজা খিজিরের চেষ্টা ব্যর্থ করতঃ চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহার কবিজনোচিত ভাব একটু আমীর রাগরঞ্জিত হইয়া যেন শোভা পাইত। তাঁহার কবিত্বের মধ্যে তাঁহার আমিরী ভাবটীও অন্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া বিরাজ করিত। তাহা হইতেই পারে হওয়া কিছু অসম্ভব নয় কারণ আমীরি ভাব তাঁহার পৈতৃক ধন, আমীর উপাধিও তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি।—খস্রুর পিতার নাম আমীর মহম্মদ সাই-ফুদ্দিন ছিল। সর্ব্ব প্রথম প্রস্তাবে ইহার একরূপ আভাস দিয়া আসিয়াছি—(বলিয়া আসিয়াছি যে খস্রু পলাতক রাজপুত্রদিগের অন্যতম।) খস্রুর পিতা লাচিনতুর্ক ছিলেন; বাল্‌খ অর্থাৎ বাহ্লিক প্রদেশ হইতে ভারতে আগমন পূর্ব্বক প্রথমে পাতিয়ালাতে নিবাস স্থাপন করেন।

কবি খস্রুতে তাঁহাব পৈতৃক আমীরী ভাবের বিগুমানতাসত্বেও তাঁহার জীবনে কোনরূপ আমীরী গরিমা বা বৃথা দর্প-মত্ততা আধিপত্য লাভ করেন নাই কিন্তু কর্ম্মকালে আবশ্যক হইলে তাঁহার রাজ-পুত্রের উপযুক্ত বিক্রম তেজ কৌশল ফুটিয়া উঠিত; কিন্তু তিনি আবার এক জন মহা কবিও ছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবনে কবিজনোচিত বিনয়ও রীতিমত আসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃত কবি হইলেই প্রায় বিনয় তাহার কাছে আপনা হইতেই আসিয়া যুটে; বিনয় গুণ কবিহৃদয়ের একটী ধর্ম্মবিশেষ। সকল কবিদিগের মধ্যেই বিনীত ভাবের সত্তা কেমন স্বাভাবিক প্রকৃতিগত বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব কবিরা আপনাদিগকে তাঁহাদের পদাবলীতে সদা সর্ব্বদা দাস বলিয়া উল্লেখ করতঃ বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কবি শ্রেষ্ঠ কালিদাস রঘুবংশের আরম্ভসর্গে "কসূর্য্য প্রভবো বংশ কচাল্প বিষয়া মতি" বলিয়া কেমন বিনয় দীনভাব জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।—ভারতের পারস্ত কবি খস্রুরও সেই কবিজনোচিত বিনতির আকর হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। দেখিতে পাইঃ—তিনি তাঁহার একটী গানে তাঁহার গুরু সুলতান নেজা-মুদ্দিন আউলিয়ার তুলনায় আপনাকে অতিশয় বিনীত ভাবে, দাসের ন্যায় পরিচয় দিয়াছেন—বলিয়াছেন

"দিল্লীরা নগবমে জস গাঁউ জেতে
হরপা দছিনা সোই মের পাঁউ।
সুলতান নেজামদ্দীন তোম পরবীন
হোয় অধীন কেসেকে রেঝাউ॥

দিল্লীনগবে যশোগান করিয়া যাবর্ণ দক্ষিণা অর্থাৎ বর্ণনা রচনাদির নিমিত্ত যৎসামান্য যা দক্ষিণা তাহাই পাই অর্থাৎ তিনি আপনাকে গুরু নে জামদ্দীনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকরভাবে প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"সুলতান নেজামদ্দীন! তুমি প্রবীণ—এ অধীন দাস কি প্রকারে তোমাকে সন্তুষ্ট করিবে—তোমার তুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ হইবে। কবি খস্রু অত বড়লোক হইয়াও কেমন আপনাকে দীন হীন অধীনভাবে নিজগানের মধ্যে স্থাপন করতঃ গুরুভক্তির যথার্থ মর্য্যাদা ও নিজের প্রকৃত মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিনতির সঙ্গে সঙ্গে গুরুর প্রতি অবিচলিত প্রীতি শ্রদ্ধা ভক্তি কিরূপ জাগ্রত ছিল তাহা তাঁহার অন্যান্য গানের দ্বারা আরও বিশিষ্টরূপে বোধগম্য হয়। দেখিতে

পাওয়া যায় যে তিনি তাঁহার গুরু নেজামদ্দীনকে অতিশয় শোভান্বিত ও উচ্চাসনে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিম্নোক্ত প্রকারে মনোভাব প্রকাশপূর্ব্বক একটী গানে গাহিতেছেন—এতো আমার পীর নেজামদ্দীন আউলিয়া জরিখচিত বস্ত্রাদি সকলকে পুরস্কার বিতরণ করিতেছেন।—আউলিয়া সেক মসায়েকগণ উপস্থিত—ধীরভাবে মোহিত করিয়া দিতেছেন। আবার কোন একটী গানে তিনি অনেকটা মেঘদূতের বিরহ ব্যথিত যক্ষের মেঘের ন্যায় প্রীতিভাবে তাঁহার প্রিয় গুরু নেজামদ্দীনের উদ্দেশে পুরবী প্রেরণের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে নানা প্রকারে বুঝিতে পারা যায় যে খস্রুর অন্তঃকরণ যথার্থই প্রেম ভক্তি বিনতি বলে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করিয়াছিল এবং এই সকল কারণেই আমার ধ্রুব বিশ্বাস তাঁহার কবিত্বের মধুর সৌরভ সঞ্চারিত হইয়া দিকদশ আমোদিত করিয়াছিল, কবি খস্রুর নাম ভারতে প্রায় সর্ব্বসাধারণের প্রিয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ক্রমশঃ—

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মানবদেহ গঠনে ঈশ্বরের সৃষ্টি নৈপুণ্যের অভাব।

মুখবন্ধ।

লেখা পড়ায় অনেক দিন হইল এক রকম খতম্ দিয়াছি তবে দায়ে পড়িয়া মধ্যে মধ্যে সরস্বতীকে লইয়া টানাটানি না করিলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া একান্ত সুকঠিন বলিয়া এখনও এক এক বার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও লেখা পড়ায় মনোনিবেশ করিতে হয়। পেট বড়ই বিষম জিনিষ ইহার জ্বালায় পড়িয়া লোকে করেনা এমন কাজ নাই। চুরি বল, চামারি বল, খুন বল, জালিয়াতি বল, সকলই দগ্ধ উদরের জন্য। আমিও ঐ জঠর বহ্নির জ্বালায় অস্থির হইয়া মধ্যে মধ্যে কলম রূপ শানিত তরবারি লইয়া কাগজ রূপ যুদ্ধ ক্ষেত্রে নানা প্রকার আপনার কেরদানি দেখাই। ইহাতে যদি অপরাধ হয় কোমল হৃদয় পাঠক, বা কোমল হৃদয়া পাঠিকা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

সরস্বতীকে লইয়া টানা হিঁচ্ড়া করি বটে, কিন্তু মা জননী আমার প্রতি এমনই বিমুখ যে কিছুতেই মুখ তুলিয়া চান না। কি যে শুভক্ষণে শুভলগ্নে মায়ের শুভ দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলাম কোন মতেই তাঁহার মন উঠাইতে পারিলাম না। বাস্তবিক, বলিতে গেলে আমার স্বভাবটা কেমন এক প্রকার উগ্র, সারা দিনটা যেন গম হইয়া বসিয়া থাকি, মিষ্ট কথা মুখে নাই। মেজাজের উত্তাপে কেহ কাছে আসিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করে না, এবং সময়ে

সময়ে নিজের উত্তাপে নিজেই জ্বলিয়া পুড়িযা মবি। সুতরাং আবাধনা করিয়া বে মাযেব ভাল করিয়া তুষ্টিসাধন কবিব সে আশা বৃথা। স্তোত্র পাঠ কবিতে গিয়া হয়ত কটূক্তি কবিয়া ফেলিব সেই ভয়ে ভাল করিযা স্তবটী পর্য্যন্ত কবা হয় না। আব সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয পাব হইযা বিদ্যা ক্রমে ক্রমে চতুষ্পদী হইবার উপক্রম কবিতেছে।

সকল বিষযে দোষ ধবা আমার একটা স্বভাব, সেই জন্যই কাহাবও সঙ্গে আমাব ভাল করিযা বনিবনাও হয় না—কি দেবতা, কি মানুষ, দোষ দেখিলেই কেমন আমার মনেব মধ্যে গোলমাল হইযা যায়, সেটী বিশেষ কবিযা সর্ব্বজন সমক্ষে দেখাইবাব জন্য কেমন এক প্রকাব অমানুষিক ব্যগ্রতা উপস্থিত হয, আর যতক্ষণ সেই অস্বাভাবিক তৃষ্ণা নিবাবণ না হয, ততক্ষণ অপব কোন কাজ কবিযা সুখ হয় না। আজ অনেক দিন নানা প্রকাব বোগে, শোকে জর্জ্জবীভূত হইয়া মানব দেহেব উপব অকস্মাৎ কেমন একটু সূক্ষ্ম নজর পড়ে, সেই সময হইতে মানব দেহেব নানা বিষয়ে অসম্পূর্ণতা আমাব দৃষ্টিগোচব হয়। অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি, যে এই অসম্পূর্ণতা গুলি একে একে তন্ন তন্ন কবিয়া সকলকে দেখাইব। আজ নানা কারণে দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ একটু ফুবসদ্ হইয়াছে তাই আপন বহুদিনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত কবিতে প্রবৃত্ত হইযাছি।

তুমি যদি ঘোর আস্তিক এবং ধর্ম্মানুরাগী হও, অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ং মানিয়া চল, এবং ঈশ্বব নিরাকার, নির্ব্বিকার, অনাদি, অনন্ত, পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রযুক্ত যত গুলি বিধান আছে সকলই বিশ্বাস কব, তাহা হইলে তোমায় মানব দেহেব অসম্পূর্ণতা দেখান বৃথা—কারণ তুমি চক্ষু থাকিতে দেখিবে না, ঈশ্বরের নাম শুনিযা হযত নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিবে, অথবা অবিরল ধাবায আনন্দাশ্রুপাত কবিবে, এরূপ অবস্থায আমাব অথণ্ডনীয় প্রমাণ গুলি তোমাব নিকট উন্মাদ গ্রস্ত বোগীর প্রলাপ বাক্য বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই। সুতবাং ঘোব আস্তিক। তুমি এই খানেই আমার প্রবন্ধ পাঠ শেষ কর তোমাব জন্য ইহা লিখিত হয় নাই। আব যদি তুমি নাস্তিক হও তাহা হইলে তোমার মতে ত ঈশ্বরই নাই তুমি বলিবে যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহাব আবাব স্বষ্টি নৈপুণ্যেব অভাব কি? অতএব, আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয় দলেব নিকট আমি প্রথমেই আমার এই ভ্রমপূর্ণ প্রবন্ধেব জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। তবে যদি বল মানব মাত্রেই হয় আস্তিক নয় নাস্তিক, এই উভয় দলেব মধ্যে কেহই যদি প্রবন্ধেব যুক্তি বুঝিয়া উঠিতে না পাবে, তবে এই প্রবন্ধ কাহাব জন্য লিখিত হইযাছে? তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই, সংসারে এমন একদল লোক আছে যাহারা অ্যাও নয অও নয়, ইংরাজিতে যাহাদের বলে "Nither fish nor flesh nor good red herring." ইহারা ঈশ্বর আছে সাহস করিয়া বলিয়া উঠিতে পারে না আবার একেবারে ঈশ্বরের অস্তিত্বও অবিশ্বাস করিতেও সাহসে

কুলায় না। ইহারা ভাবে কি জানি যদি ভবিষ্যতে ঈশ্বর বলিয়া একটা বিষম প্রকাণ্ড পদার্থ বাহির হইয়াই পড়ে তাহা হইলেই ত মুস্কিল। ইহারা জঞ্জাল মিটাইবার জন্য স্বার্থানুরোধে একটা কি জানি কেমনতর পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লয়। ইহাদের জন্যই আজি আমি ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে কটিবদ্ধ করিয়াছি। অলমতি বিস্তরেন।

অথ প্রবন্ধারম্ভ।

দৈহিক অসম্পূর্ণতা দেখাইতে হইলে অঙ্গ বিশেষের অসম্পূর্ণতা সাধারণ অসম্পূর্ণতা হইতে পৃথক্ করা উচিত। সুতরাং প্রথমে অঙ্গ বিশেষের অসম্পূর্ণতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১। উত্তমাঙ্গ। এই শব্দের অর্থ যে কেন মাথা হইল, তাহার মাথা মুণ্ড আজ পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। সেটুকুও বোধ হয় সরস্বতীর কৃপা। যাহা হউক বাক্য প্রয়োগ সম্বন্ধে মারামারি না করিয়া পাঠক তোমাকে একটী কাজ বলি করিবে কি? নিজের মাথাটা একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, যদি আমার ন্যায় জঠর জালায় অস্থির হইয়া, ইতিমধ্যে সেটী ভক্ষণ করিয়া না থাক, তবে বেশ করিয়া হাত বুলাইয়া, টিপিয়া টুপিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, হেলাইয়া দোলাইয়া, দেখ উহার ভিতরে ও বাহিরে কি আছে। সামান্য পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাইবে যে বর্ত্তমান ঊনবিংশতি শতাব্দীর উচ্চাঙ্গের সভ্যতার সহিত আমাদের উত্তমাঙ্গের সামঞ্জস্য একেবারেই নাই। প্রমাণ চাও, একে একে দিব উতলা হইও না।

(ক প্রথমেই দেখিতে পাও সভ্যতার খাতিরে, সাহেব সুবোদের সহিত দেখা করিতে হইলে, কিম্বা কোন বিরাট সভায় উপস্থিত হইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতাদি করিতে হইলে, একটী টুপির দরকার। শামলা হউক, ক্যাপ হউক, হ্যাট হউক, পাগড়ী হউক, একটা না একটা চাইই চাই। এ কথা তোমায় মানিতেই হইবে। আচ্ছা এখন জিজ্ঞাসা করি, কে বিধাতাকে মাথার দিব্য দিয়া, আমাদের নেড়ামাথায় পৃথিবীতে পাঠাইতে বলিয়াছিল? তাঁহার অসীম অপরিমেয় বুদ্ধির, তিলার্দ্ধ খরচ করিলে কি তিনি একটী মাথার উপর সুন্দর টুপি গড়াইয়া দিতে পারিতেন না? অথবা মাতৃগর্ভ হইতে ভুমিষ্ঠ হওনকালীন যেন বিনা টুপিতেই আমরা সংসারে আসিলাম, কিন্তু তাহার পরও ত মাথার উপর সভ্যতার খাতিরে একটী গজাইতে পারিত। বিধাতা পুরুষ কি জন্য যে আমাদের অসভ্যের চূড়ান্ত স্বরূপ সংসারে Bare headed পাঠাইয়াছেন তাহার গূঢ় রহস্য আমি আজ পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারি নাই।

(খ) দ্বিতীয় কথা—আচ্ছা টুপিই যেন না হইল, একটী ছাতাও কি মাথার উপর ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজাইতে পারিত না। বাঙ্গালার ভীষণ বর্ষায় কত দীন দুঃখী ভিজিয়া সারা হয়, এমন অর্থ নাই যে ঋতুর কঠোর নির্য্যাতন হইতে আপনাকে রক্ষা করে, এসব দেখিয়া কি বিধাতার দয়া হয় না?

স্বীকার করিয়া লইলাম যখন বিধাতা মানব সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন ছাতা বলিয়া কোন পদার্থ সংসারে ছিল না সুতরাং তাঁহার ওটা Strike করে নাই। কিন্তু আজকাল ত স্রষ্টা পথে ঘাটে স্ত্রী পুরুষের মাথায় বৈশাখের ভীষণ রৌদ্রে ও আষাঢ়ের দারুণ বর্ষায় কত রকম দেশী ও বিলাতী ছাতা দেখিতেছেন, আজকাল যে সকল মানব জন্ম গ্রহণ করিতেছে, তাহাদেরই বা কোন্ ঐ Patternএর এক একটী ছাতা মাথার উপর বসাইয়া দিলেন? তুমি ভাবিতেছ আমি অসম্ভব কথা বলিতেছি মাথার উপর এক একটী ষোল সিক ওয়ালা ছাতা বসাইয়া দিলে, মানব মাতৃগর্ভ হইতে কেমন করিয়া বাহির হইবে? আরে ছি! আমি সে কথা বলিতেছি না, মনে কর ভূমিষ্ঠ হইবার সময় মাথার উপর একখানি পাতলা চামড়া আছে, তাহাতে কতকগুলি শিরা আছে। সেই চামড়াখানি বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া ছত্রাকার ধারণ করিলে তোমার আপত্তি কি? আরও মনে কর ঐ ছত্রের আকুঞ্চন প্রসারণ তোমার ইচ্ছাধীন। প্রয়োজন হইলে বিস্তৃত হইবে, আবার যখন দরকার নাই তখন আপনিই কুঞ্চিত হইয়া মাথার উপর একটী কোমল আবরণের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে? এরূপ আকুঞ্চন কি অসম্ভব, বা মনুষ্য শরীরে দেখিতে পাওয়া যায় না? না বুঝিয়া সুঝিয়া প্রথমেই আপত্তি কর কেন হে বাপু? আচ্ছা, দোহাই ধর্ম্ম বল দেখি যিনি বিশ্বনিয়ন্তা, সর্ব্বপ্রকার পূর্ণতার আধার সর্ব্বশক্তিমান ইত্যাদি ইত্যাদি, যিনি অনন্ত শূন্য মধ্যে অনন্ত গতিশীল সৌরজগৎকে স্থাপিত করিয়াছেন, যিনি অনন্ত প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে অপরিমেয় অচিন্ত্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি সামান্য কীট পতঙ্গ হইতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের জীবন স্রোত প্রতি মুহূর্ত্তে পরিচালিত করিতেছেন তাঁহার ন্যায় একটী বিপুল, বিশাল, অসীম নিরাকার মস্তিষ্ক, যে উনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার চরম সীমায় ছাতা ও টুপির আবশ্যকতা বুঝিতে পারিল না, ইহা কি সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না?

(গ) আরও দেখ, অতি বাল্যকাল হইতে আমাদের দেশের ছেলেদের চিরুণী ও ব্রাসের সাহায্যে চুল ফিরাইতে ফিরাইতে, মাথার বোধ হয় সাত পুরু চামড়া উঠিয়া যায়। প্রথম নম্বর, প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবার পূর্ব্বেই একবার চুল গুলি ভাল করিয়া ফিরান না হইলে, মানুষ আজকাল সভ্য সমাজে পরিগণিত হইতে কোন মতেই পারে না। তাহার পর স্নান করিয়া উঠিয়া ত এক দম মাথার সঙ্গে রীতি মত লড়াই করিতে হয়। চুলও পছন্দমত ফিরিতে চাহে না, আমরাও কোন মতে চুলকেও ছাড়িতে চাহি না। এরূপ স্থলে হে পাঠক! যদি ভগবান ভূতভাবন ভবানীপতি মাথার উপর একটী চিরস্থায়ী টেরীর বন্দোবস্ত করিতেন, তাহা হইলে কেমন হইত বল দেখি; কত খানি কষ্টের লাঘব হইত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কয় ঘণ্টা চুল ফিরাইতে লাগে, সেই সময়ে মানব মাত্রেই কত সৎকার্য্যের

অনুষ্ঠান করিতে পারিতে। মোট কথা সভ্যতার খাতিরে যদি চুল ফিরাইতে না হইত, অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছানুসারে চুল গুলি আপনিই ফিরিত তাহা হইলে সময় ও কায়িক শ্রম উভয়েরই যে কত সৎব্যবহার হইত তাহা বলিতে পারা যায় না। তুমি হয় ত বলিবে, টেরিও চাহি টুপিও চাহি ছাতাও চাই এত দাবি একত্র করিলে বেচারি বিধাতার উপর রীতিমত জবর্দ্দস্তি করা হয়। আর বস্তুতঃ যখন টুপির দ্বারাই মস্তক আবৃত রহিল, তখন আর চিরস্থায়ী টেরির প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাহি যে আমাদের অনন্ত বুদ্ধিজীবী ঈশ্বর, এক ঢিলে ইচ্ছা করিলে তিন পাখী মারিতে পারিতেন। মনে কর প্রথমতঃ মাথায় যেমন চুল ওঠে সেইরূপ উঠিল, ক্রমে সেই চুল গুলি চিরস্থায়ী টেরীর আকার ধারণ করিল। তার পর ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই বল, আর প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই বল, সেই টেরি প্রয়োজনানুসারে টুপির আকার বা ছাতার আকার ধারণ করিতে পারে। তুমি ভাবিতেছ তাহা অসম্ভব। কখনই নহে; যে বিধাতার বিধানানুসারে হুতাশন বৃক্ষলতাদি দগ্ধ করিয়া ফেলে, সুশীতল জল তৃষ্ণা নিবারণ করে, মেঘ বারিবর্ষণ করে, সূর্য্য আলোক ও উত্তাপ বিকীরণ করে যাঁহার সৃষ্টি কৌশলে লতা, পাতা, ফুল, ফল, হ্রদ, নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, দেশ, মহাদেশ ইত্যাদি এত জিনিষ সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। জগতে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষের উপর কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিতেছে, কই তাহাতে ত আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি না—এই বিশাল জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে যে অভেদ্য রহস্য আছে তাহার সহিত তুলনা করিলে আমি যে সকল কথা বলিতেছি তাহা মোটেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না।

২য়। এই ত গেল মাথার কথা। তাহার পর পাঠক তোমার কাণ দুটি লইয়া একবার টানাটানি করিয়া দেখ দেখি। প্রথমেই দেখিতে পাইবে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের একটি বিশেষ দোষ আছে। এই ইন্দ্রিয়টী ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিতে পারা যায় না। চক্ষের নিকট একটী অতিরিক্ত উজ্জ্বল পদার্থ ধরিলে আমরা কেমন চক্ষের পাতা বন্ধ করিতে পারি; কিন্তু কাণের নিকট একশত ঢাক বাজিলেও কাণের পাতা বন্ধ করা যায় না। তুমি হয় ত বলিবে কাণে আঙ্গুল দিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। সত্য! কিন্তু বল দেখি কাঁহাতক একজন মানুষ কাণে আঙ্গুল দিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। মনে কর তুমি তোমার পাঠাগারে বসিয়া এক মনে একটী প্রবন্ধ লিখিতেছ, বাম হস্তে তোমার হুকা, দক্ষিণ হস্তে কলম, এমত সময়ে যদি রাস্তায় কোন ভীষণ কোলাহল তোমার কাণে প্রবেশ করিয়া, তোমার শীতল মস্তিষ্ককে অকস্মাৎ অতিশয় উত্তপ্ত করিয়া তুলে, তাহা হইলে তোমার কত খানি বিরক্তি বোধ হয়। তখন হুকা ও কলম ফেলিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া তুমি কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পার? বাস্তবিক সংসারে সভ্যতার খাতিরে আজ কাল এতই অসহ্য কোলাহলময় হইয়াছে

যে আর কিছু দিন পরে এই শব্দাধিক্যের যে কোথায় শেষ হইবে তাহা বলা যায় না। সভ্যতার কেন্দ্র স্বরূপ বড় বড় যত গুলি মহানগরী আছে সর্ব্বত্রই দিবারাত্রি ভয়ানক কোলাহল। এত ভীষণ শব্দ যে ঈশ্বর কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আমি ত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারায় এইটুকু ঠিক করিয়াছি যে কেবল মাত্র মানুষকে জ্বালাতন করিবার জন্য সংসারকে এত কোলাহলময় করা হইয়াছে। সংসারে শব্দের যত অপব্যয় দেখিতে পাওয়া যায় এত আর কোন দ্রব্যেরই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশাল জলধি মধ্যে প্রচণ্ড ঝটিকার সময় উত্তাল তরঙ্গ মালা যে ভয়ানক শব্দ উৎপন্ন করে তাহার অস্তিত্বের যে উদ্দেশ্য কি তাহা সৃষ্টিকর্ত্তা (যদি কেহ থাকেন) তিনিই জানেন। তুমি বলিতে পার যে উত্তাল তরঙ্গ মালা যখন আমার কাণের কাছে আসিয়া কোন গোলমাল করে না তখন তাহাদের লইয়া আমার এত মারামারি কেন ?

স্বীকার। কিন্তু সংসারে এমন কত শব্দ আছে যাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না, অথবা যাহা শুনিলে আমার সুখের হ্রাস বই বৃদ্ধি হয় না, অথবা যাহার দ্বারা আমার সুখ দুঃখের হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হয় না। যদি আমার কাণের পথটা ইচ্ছামত বন্ধ করা যাইত তাহা হইলে এই সকল শব্দ হইতে ইচ্ছামত নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতাম সন্দেহ নাই। মনে কর, তুমি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্তদেহে দেওয়ালীর দিন রাত্রি ৯টার সময় আপন ঘরের মেজের উপর ছিন্ন কন্থা বিছাইয়া নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করিতেছ, তন্দ্রা আসিয়াছে দুচার মিনিটের মধ্যেই নিদ্রা আসিয়া তোমার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষে পদ্ম হস্ত বুলাইয়া দিনের জ্বালা যন্ত্রণা তোমায় ভুলাইয়া দিবে, এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী বাবুদের বাটীতে ছেলেরা একত্রে দশটা তারাপটকায় অগ্নি সংযোগ করিল, তুমি কোথায় সুখের স্বপ্ন ভোগ করিবার উপক্রম করিতেছ এমন সময় নিষ্ঠুর দুম্‌দাম শব্দ তোমার নিদ্রাকে দূরীভূত করিয়া দিল। তুমি অতিশয় বিরক্ত হইয়া অকস্মাৎ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া তোমার লক্ষ্মীর বরপুত্র প্রতিবেশীদিগের প্রতি মনে মনে মিষ্ট সম্ভাষণ করিলে। কিন্তু যদি তোমার চক্ষের পাতার ন্যায় কাণের পাতা বন্ধ করিবার ইচ্ছামত শব্দ দূর করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে কতখানি সুবিধা বল দেখি। দীন দুঃখীর কাতর স্বর তোমার কর্ণে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না তোষামোদপ্রিয় স্বার্থপর বাবুদের অযথা প্রশংসা তোমায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারিত না। নীচমনা সমাজ শত্রু, পরশ্রী কাতর ব্যক্তিদিগের পরনিন্দা তোমায় সর্ব্বদা জ্বালাতন করিতে পারিত না। এক কথায়, তুমি ইচ্ছা করিলে বিশাল সংসারের এই তানলয় শ্রুতি কঠোর, ভীষণ, Chaotic নিনাদ তোমার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। ইহা কি কম লাভ! কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট আর ঈশ্বরের অসীম বুদ্ধির কেমন যে প্যাঁচ কাণের পাতা রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা মনুষ্যকে দিলেই যেন তাঁহার লবণের

জাহার অতলস্পর্শ জলনিতলে একেবারে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাইত।

৩য়। যাক্ কাণ লইয়া অ'ক টানাটানি করা ভাল নহে। কি জানি যদি ছিঁড়িয়া যায়। এবার মানবের দর্শনেন্দ্রিয়টী ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

(ক) চক্ষের এক প্রধান দোষ, ইনি পরকে দেখিতে পান, কিন্তু আপনাকে দেখিতে পান না। এ বিষম Fallacyর যে কারণ ও তাৎপর্য্য কি তাহা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে পারি নাই।

(খ) ভাল নিজের বুদ্ধির দোষেই হউক, বা যে কোন কারণেই হউক যেন বুঝিতে অক্ষমই হইলাম কিন্তু সেই সঙ্গে চক্ষু সম্বন্ধে আর এক বিষম সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত হইয়াছে। শরীরের যে অংশে চক্ষু দুটি বসান হইয়াছে তাহার অপেক্ষা অপর কোন অংশে বসাইলে ভাল হইত কি না। তুমি বলিবে এখন, কোন অংশে দেখাইয়া দেও। তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই, দেখাইতে পারি আর নাই পারি এ কথাটা কিন্তু মানিয়া লইতে হইবে যে সমস্ত মানব-দেহের যদি কালি করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে সমস্ত দেহের প্রায় অর্দ্ধাংশ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেহের পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখমণ্ডলও দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং শরীরের মধ্যে আরও অপরাপর অংশ আছে তাহা চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিগোচর নহে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, দেহের অপর কোন ভাগে চক্ষু বসাইয়া দিলে দেহের ঐ সকল অংশ দৃষ্টিগোচর হইত কি না? যদি তাহাই না হয়, তাহা হইলে চক্ষুর সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়া ঐ সকল অংশ দৃষ্টিগোচর করিলে বিধাতার কি ক্ষতি হইত? মনে কর তুমি প্রাতঃকালে উঠিয়া নাপিত ডাকিয়া তোমার চুল কাটিতে বসিয়াছ, চুল ছাঁটা শেষ হইলে ঘাড়ের চুল ছাঁটা কেমন হইল তাহা দেখিবার জন্য কতখানি ঔৎসুক্য তোমার মনে উপস্থিত হয়। তুমি দুখানি আয়না লইয়া নানা প্রকার গ্রীবাভঙ্গি করিয়া ঘাড়ের চুল দেখিবার জন্য কত চেষ্টা কর? যদি পশ্চাভাগে আর একটী চক্ষু থাকিত তাহা হইলে কি ঐ সকল কষ্টের ও ঔৎসুক্যের লাঘব হইত না?

(গ) আর একটী কথা। চক্ষের মধ্যে ভগবানকে একটী অনন্ত ফোয়ারা বসাইতে যে কে মাথার দিব্য দিয়াছিল তাহা অন্তর্যামীই জানেন। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সেই ফোয়ারা হইতে যে অশ্রুপাত হইতে আরম্ভ হয় তাহার আর শেষ নাই। সংসারে যত দিন বাঁচিবে ততদিনই অশ্রুজল অনবরত পড়িবে। কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন আচ্ছা অশ্রুর প্রস্রবন যেন শুষ্ক হইল তাহা হইলেই কি মানব জীবনের দুঃখ একেবারে অন্তর্ধান হইবে? অশ্রুজল ত দুঃখের কারণ নহে দুঃখই অশ্রুপাতের কারণ। সুতরাং যদি মানব অশ্রুপাত নাও করিত তাহা হইলেও দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারিত না। উত্তম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বল দেখি বিধাতা কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুঃখের সঙ্গে অশ্রুপাতের কার্য্য কারণ সম্পর্ক স্থাপন

করিয়াছেন? দুঃখের কারণ হইল দুঃখ অনুভব করিলাম, হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে রহিল, মিছামিছি রাশীকৃত চক্ষের জল ফেলিবার আবশ্যকতা কি? সংসারে যত লোক প্রতিমুহূর্ত্তে ক্রন্দন করে তাহাদের বিন্দু বিন্দু অশ্রুগুলি একত্রিত করিলে বোধ হয় প্রত্যহ এক একটী প্রশান্ত মহাসাগব সৃষ্টি হয়। এই যে অগাধ জলরাশি জীব চক্ষুব মধ্য হইতে মিছামিছি নির্গত হয় ইহা কি সংসাবের মধ্যে একটী বিষম অন্যায অপব্যয় নহে? এই অশ্রুপাতে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয না, জীবের তৃষ্ণা নিবাবণ হয় না কেবল মিছামিছি কাঁদিয়া কাঁদিয়া নাসাবন্ধ্র টী ঘণ্টা খানেকের মত বন্ধ হইয়া যায, আর চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ হইবাব মস্তকে রক্তাধিক্য হয়। উপকাবেব মধ্যেত এই, না শুধু তাহাও নহে আবও আছে; সংসারে কত দুষ্ট লোক অশ্রুপাত কবিযা বিশাল কার্য্যক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামে বিনা আয়াসে জয় লাভ করে জান কি? তোমার ভাল বাসার পাত্র অথবা পাত্রীব এক বিন্দু অশ্রুজলে তোমার ন্যায় দর্শন, বিজ্ঞানবাদির কত অখণ্ডনীয যুক্তি একদম্ ভাসিয়া যায় তাহার হিসাব রাখ কি? যদি না রাখ বৃথা তর্ক করিও না যাহা বলি শুনিয়া যাও।

(ঘ) তর্ক স্থলে স্বীকার করিয়া লইয়াছি অশ্রুজল দুঃখের কাবণ নহে দুঃখই অশ্রুজলের কারণ, কিন্তু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে অশ্রুজলের ন্যায় দুঃখের কারণ আর সংসারে নাই।

অশ্রুজল যদি দুঃখের কারণ না হইবে, তবে পরের অশ্রুজল দেখিয়া হৃদয় এত অস্থির হইয়া উঠে কেন? মুষ্টিভিক্ষোপজীবী দীন দরিদ্র, দিবারাত্রি আকাশ যাহাদের চন্দ্রাতপ, যাহারা মা লক্ষীর ত্যাজ্যপুত্র, শত গ্রন্থি পরিধেয়, পথের কাঙ্গাল, তাহাদের অশ্রুপাত দেখিয়া কত পাষাণ হৃদয় প্রতি মুহূর্ত্তে বিগলিত হইতেছে। সংসারের কত লোক পরের অশ্রুজল মুছাইতে গিয়া জন্মের মত নিজেব সুখ সচ্ছন্দ বিসর্জ্জন দিয়াছে। অথবা পরের কথা ছাড়িয়া দেও, আপন সন্তানের চক্ষে জল দেখিলে জনকজননীর হৃদযে শেল বিদ্ধ হয কেন বলিতে পাব? এখন বিবেচনা কর অশ্রুপাত সংসাবে কত অনর্থ ঘটায়।

(ঙ) চক্ষুব সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিব। আমাদের সৃষ্টি কর্ত্তার সভ্যতাব Idea টা একেবারেই নাই কাবণ 19th century civilization এর মর্ম্ম তিনি অবগত হইলে আজ কাল চস্‌মা শূন্য মানব সৃষ্টি করিতে কোন মতেই সাহস করিতেন না। চস্‌মা যে কেবল চক্ষুবোগ গ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য আবশ্যক তাহা নহে, উহা আজ কাল কার সভ্যতাব Sign quanon হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতার বয়স অধিক হওয়াব কারণ বোধ হয় তিনি সেটা এখনও দেখিতে পান নাই। তাঁহার উচিত আগে এক খানি ভাল নিরাকার, নির্ব্বিকার, অনাদি, অনন্ত চস্‌মা সৃষ্টি কবিয়া নিজের চক্ষে লাগাইয়া দেওয়া, পরে সেই চস্‌মার বলে সভ্যতার চটক দেখিয়া আজ কালকার প্রত্যেক মানবকে চস্‌মাবৃত চক্ষে পৃথিবীতে পাঠান।

৪র্থ। আচ্ছা, এখন একবার এস পাঠক, তোমার নাকটী ভাল করিয়া পরীক্ষা করা যাউক। তুমি হয়ত বলিবে

আমার নাসিকার কোন দোষ নাই। এমন সুন্দর, সুঠাম, নাসিকা আর কাহারও নাই, সুতরাং আমার নাসিকার পরীক্ষা নিষ্প্রয়োজন; তুমি যতই বল, আমি কিন্তু, তোমার নাকটী লইয়া টানাটানি না করিয়া ছাড়িতেছি না। নাসিকাটী আমার মতে মনুষ্য দেহের মধ্যে একটী anomaly ইহার উপকারিতা কিছুই নাই, অপকারিতা যথেষ্ট আছে। সর্দ্দি হইলে নাক মানবকে যত জ্বালাতন করে এত জ্বালাতন আর মানুষ অন্য কোন কারণে হয় না; চব্বিশ ঘণ্টা নাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে প্রাণান্ত উপস্থিত হয়। বিশেষ আজ কাল কার সভ্য সমাজে নাক ঝাড়ার মত পূর্ণ অসভ্যের চিহ্ন আর আছে কি না সন্দেহ। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন নাক না থাকিলে ত দম বন্ধ হইয়া দু চারি মিনিটের মধ্যে ইহ লোক পরিত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং নাকটী কোন মতে anomaly নহে, বরং বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নাসিকাটী একটীunavoidable necessity; ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই, নাসিকার দুইটী function নিশ্বাস প্রশ্বাস ও আঘ্রান।

(ক) প্রথম, মনে কর আমাদের নাক নাই এখন দেখা যাউক অপর কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে পারে কি না। আমার বোধ হয় মানব শরীরে যত গুলি লোমকূপ তাহার মধ্য দিয়া অতি সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া উত্তমরূপ চলিতে পারে, আর ঈশ্বর ঐরূপ বন্দোবস্ত করিলে আমরা Suffocationএর ভয় হইতে নিস্তার পাই, ফাঁসি সংসার হইতে একদম্ উঠিয়া যায়, আর গলায় দড়ি দিয়া কেহই মরিতে পারে না। আজ কালকার বালক বালিকা প্রায় আফিঙ্গ খাইয়া গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে, সুতরাং নিশ্বাসের সহিত গলদেশের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে আত্মহত্যার একটী প্রধান উপাদান দূর করা হয়।

(খ) নাসিকার দ্বিতীয় কার্য্য আঘ্রান। আমার মত পরছিদ্রান্বেষী কোন পাঠক হয় ত এই সম্বন্ধে বলিতে পারেন যদি লোমকূপ দ্বারা শ্বাস ক্রিয়াই সম্পন্ন হয় তবে ঘ্রাণ ক্রিয়াও অবশ্য ঐ সকল লোমকূপ দ্বারা সংসাধিত হইবে। কিন্তু যখন কোন পূতিগন্ধময় দ্রব্য আমাদের নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন আমরা কি উপায়ে সমস্ত দেহের প্রতিলোমকূপ বন্ধ করিব। নাসিকার দুইটী মাত্র রন্ধ্র, কোন প্রকার দুর্গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিলে আমরা অনায়াসে কাপড় কি অঙ্গুলির দ্বারা নাসারন্ধ্র দুটি বন্ধ করিতে পারি, কিন্তু এরূপ ক্রিয়া প্রতি লোমকূপের দ্বারা ঘ্রাণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই যুক্তির যৌক্তিকতা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে পোষণ করি। কিন্তু বল দেখি পাঠক, পূতিগন্ধময় দ্রব্যের ঘ্রাণ মানুষের লইতেই হইবে, এমন কথা কোন শাস্ত্রে আছে কি?

কে বিধাতাকে কাতর স্বরে, গলদশ্রুলোচনে নাছোড় বান্দা হইয়া বলিয়াছিল হে ঈশ্বর! হে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ! হে অপরিমেয় অজ্ঞেয়, অচিন্তনীয়, অনুপমেয়, অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয়, অগণনীয়। অপরিসীম বিশ্বনিয়ন্তা, পরমব্রহ্ম, পুরুষোত্তম, দোহাই তোমার, সাত দোহাই, তুমি মানব মণ্ডলীকে পূতিগন্ধময়

দ্রব্যের ঘ্রান শক্তি দেও। দুর্গন্ধ দ্রব্য আঘ্রাণ করিতে না পারিলে মানবের কি ক্ষতি হইত! বিজ্ঞানবিৎ হয়ত বলিবেন আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে দুর্গন্ধময়দ্রব্য আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর। সুতরাং ঘ্রাণ শক্তির দ্বারা অর্থাৎ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই দুইয়ের পার্থক্য অনুভব করণ শক্তির দ্বারা আমরা অনেকটা কোন দ্রব্য স্বাস্থ্যকর ও কোন দ্রব্য অস্বাস্থ্যকর তাহা সহজে নির্ণয় করিতে পারি। ঈশ্বরের অসীম বুদ্ধি এই জন্য নাক ও মুখ এই দুই ইন্দ্রিয়কে অতিশয় নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন; এই জন্যই আহারের সময় কোন আহার্য্য পদার্থ দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হইলে আমরা তাহা গলাধঃকরণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি। জনসাধারণে বিজ্ঞানবিতেরা এই যুক্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ করিতে পারেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি ঐ যুক্তি খণ্ডন করিতে প্রস্তুত। আমি একথা বলিতে চাহিনা যে দুর্গন্ধময় দ্রব্য কোন সময়ে আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নহে। আমার বক্তব্য এই যে খাদ্যাখাদ্যের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য নাসিকার ন্যায় একটী কুৎসিত Unæsthetical, unpoetical, unphilosophic কুরুচি-ব্যঞ্জক ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করার কোন কারণ আমি অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই। খাদ্যাখাদ্যের পার্থক্য যদি ঘ্রাণ শক্তির দ্বারাই করিতে হয় তাহা হইলে ঐ শক্তি জিহ্বাতে বিন্যস্ত না হইয়া নাসিকাতে হইল কেন তাহা পাঠক বলিতে পার কি?

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

শ্রীলালগোপাল চক্রবর্ত্তী,
এম্, এ,।

পার্ব্বতীয়া কৃষক-বালিকা।

মধুর সায়াহ্নকাল, হিমকর-স্নাত
শ্যামল প্রান্তর ভূমি, মুক্তা প্রতি শিরে।
চুরি করি ঝুম্‌কার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু
মাতায়ে তুলিছে দিক্ চতুর সমীরে।
ক্ষুদ্র এক শৈল পরে গাহিছে পাপিয়া
সমস্ত প্রকৃতি যেন স্তম্ভিত তাহায়
কেবল অদূরবর্ত্তী কানন হৃদয়ে
ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তার হতেছিল হায়!

প্রকৃতির প্রীতিফুল্ল বদন নিরখি'
মুগ্ধ আনমনে হতেছিনু অগ্রসর।
নির্জ্জন শৈলের সেই প্রান্তে—আচম্বিতে
হেরিনু বালিকা এক ত্রিদিব সুন্দর।
প্রভাত নলিন আঁখি দিঠি নয়নের,
প্রকৃতির সুশ্যামল হাসিটুকু ছানি'
গর্ব্বিত সে দেহ যেন, দেহ ভরি তার
পূর্ণতার কি উচ্ছ্বাস আকুলিছে প্রাণী।

কুসুমিত বসন্তের তরুণ প্রভাত,
স্নিগ্ধ শান্ত শরতের মধুর যামিনী—
ভ্রমি যবে নিরজন কাননে পর্ব্বতে
সুন্দর বলিয়া বটে মনেতে বাখানি।

কিন্তু নারী স্বভাবের চির প্রিয় শিশু।
সকল মাধুরী-শোভা একত্রিত সেথা।
হেরি ওই পার্ব্বতীয়া বালিকার রূপ
বোধ হয় প্রকৃতির আর সব আধা।

কৃষক বালক যদি হইতাম আমি,
ওই বলিকার সনে প্রভাত সন্ধ্যায়—
প্রকৃতির সুবিশাল লগ্ন বক্ষ' পরে
মনোসুখে খেলিতাম, থাকিতাম হায়!
কচি ঠোঁটে সোহাগের চুম্বন পরশে
স্বরগের রুদ্ধ দ্বার যাইত খুলিয়া,
সারাটি জীবন ভরি কিবা সুখে দুঃখে
পিয়িতাম সে মাধুরী অঞ্জলি পুরিয়া!

সংসার! ফিরিয়া লও ধন মান যশ,
শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গর্ব্ব যা কিছু তোমার।
ও কেবল জীবনের বিড়ম্বনা-ভার,
মনুষ্যত্ব পদে দলি' মানুষ আবার!
ওই দূর শৈল-প্রান্তে অর্কটী-ছায়ায়
নিরমিয়া একখানি সামান্য কুটীর
চরাইব মেষপাল, হেরিব আনন্দে
স্বভাব সৌন্দর্য্য ওই পার্ব্বত্য দেবীর।

শ্রীঃ—

চন্দ্রশেখর।

(সমালোচনার প্রতিবাদ)।

এই "চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমীরণে" গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ষ্টার থিয়েটারে "চন্দ্রশেখর" অভিনয়ের এক বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইয়াছে। চন্দ্রশেখর অভিনয়ের পর অনেকস্থলে অনেক কথা হইয়া গিয়াছে কিন্তু সমীরণের প্রবন্ধে ইহার সমালোচনা একটু বিশদ ও পরিস্ফুট ধরণের। লেখক তাঁহার প্রবন্ধে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নাটকীয় চরিত্রগুলির সমালোচনার সহিত অভিনয়ের সমালোচনা করিয়াছেন।

ইহার পর "অনুশীলন" নামক এক নূতন মাসিক পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় চন্দ্রশেখরের আর এক সমালোচনা বাহির হয়। সমালোচক তাঁহার বক্তব্য মধ্যে সমীরণে প্রবন্ধ লেখকের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই কিন্তু উক্ত পত্রের তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন "অনুশীলনের লেখক, কোন কোন স্থলে প্রকারান্তরে সমীরণের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা অনুশীলনে কোন প্রকার "প্রতিবাদের" একটিও বিশেষ চিহ্ন পাই নাই।

উভয় লেখকই অভিনয় দেখিয়া স্ব স্ব স্বাধীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য কেহই দোষী নহেন। অভিনয় দেখিয়া যিনি যেমন বুঝিয়াছেন তিনি সেইরূপই নিজ নিজ মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু অনুশীলনের লেখক কিছু মুরুব্বিয়ানা চালে চলিতে গিয়া স্বাধীন সমালোচনার ধুয়া ধরিয়া কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। সেইগুলির এখন পর্য্যন্ত কেহ কোন প্রতিবাদ করিলেন না দেখিয়া অগত্যা আমায় অনিচ্ছার সহিত এ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইল। অনুশীলনের বিজ্ঞ সমালোচক মহাশয়, অনেক অংশে অনেক অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য এবং উপহাসাস্পদ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধের আগাগোড়াই একটি কেমন তর একদেশদর্শিতার ভাব আনিয়া ফেলিয়াছেন।

চন্দ্রশেখর সমালোচনা, এমন একটা বিশেষ রাজনৈতিক সমস্যা, বা সমাজ সংস্কারের কোন প্রশ্ন নহে যাহা লইয়া এতটা বাদ প্রতিবাদ মসী ও লেখনীর অবিশ্রান্ত সংঘর্ষণ চলিবে। তবে যে ইহার বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইতেছে তাহা কেবল নাটকাভিনয়ের গৌরব রক্ষার্থে।

চন্দ্রশেখর সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যের সম্পত্তি। এই সম্পত্তি রক্ষার জন্য বাদ প্রতিবাদ হওয়াটা নিতান্তই যে অনাবশ্যকীয় এরূপ নহে। এ পর্য্যন্ত নাট্যশালায় অনেক নাটক নাটক মিষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার মধ্যে দুই চারিখানি ছাড়া প্রকৃত নাটকীয় গুণ অতি অল্প পুস্তকেই আছে। যেগুলির আছে

সেগুলি দেখিয়া লোকের কৌতুহল ও আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি লাভ করিয়াছে। এতদিন নাটকাভিনয় উপভোগের প্রকৃত আনন্দ এক-স্রোতবাহী হইয়া এক বিশিষ্ট শ্রেণীর দর্শকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। চন্দ্রশেখরের অভিনয় অনেক দিনের পর প্রকৃত নাটকীয় সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিয়া দিয়াছে অনেক দিনের পর অসাড় ও এক ঘেয়ে নাট্যমঞ্চে আবার এমন একটি খরস্রোত বহাইয়াছে—যাহাতে পাঁচ মাসের উপর হইল এমন কি আজও পর্য্যন্ত শত শত দর্শক সমানভাবে এই অভিনয় দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিতেছেন।

ইংলণ্ডের এক জন প্রতিভাশালী সমালোচক কোন বিখ্যাত নাটকাভিনয় সমালোচনাব্যপদেশে বলিয়াছিলেন—রঙ্গালয়ে যতদিন পর্য্যন্ত না কাব্যাভিনয় দর্শনামোদী সাহিত্যবিদ্‌গণের ঘন সমাবেশ হইতেছে ততদিন প্রকৃত নাটকীয় গুণ সম্পন্ন পুস্তকাভিনয়ে ষ্টেজ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। অমৃত বাবুর নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত চন্দ্রশেখরের অভিনয়ে বাঙ্গালার Literary classএর যত আমদানি হইয়াছিল ও এখনও হইহইতেছে এরূপ বোধ হয় বঙ্কিম বাবুর অন্য কোন পুস্তকের অভিনয়ে হইয়াছিল এরূপ ত বোধ হয় না।

নাট্যাভিনয় দর্শন একটি অপূর্ব্ব আমোদ। চক্ষুকর্ণাদি দুইটি প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়, ইহাতে মানস-জগতে এক অপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ বহাইয়া দেয়। প্রকৃত অভিনয় উপভোগ কয় জনে করিতে পারেন? বিশেষতঃ যাঁহারা ক্রিটিকের ভাবে আত্মভোর হইয়া—তাঁহাদের মতামতের উপর সর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছে; এরূপ ভাবিয়া অভিনয় দেখিতে যান—তাঁহারা অভিনয় উপভোগ করা দূরে থাক—আত্মগরিমার গরমে, স্বাধীন ভাবের উন্মত্তার মধ্যে ডুবিয়া অভিনয়ে কোন সৌন্দর্য্য থাকিলেও তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

অনুশীলনের লেখক মহাশয়, "চন্দ্রশেখর" অভিনয়ের পথে যে সমস্ত বাধা বিপত্তি আছে—ইহার নাটকাকারে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে সমস্ত অসুবিধা আছে, তাহার আলোচনা করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছেন,—"আরও সুখের বিষয় যতটুকু সাফল্য লাভ আশা করা যায় এ অভিনয়ে তিনি (অমৃত বাবু) তাহাও লাভ করিয়াছেন। যাহা অভিনয় করা কঠিন তাহাই অভিনয় করিয়া তিনি সহস্র সহস্র লোককে মুগ্ধ করিতেছেন। গ্রন্থকর্ত্তা জীবিত থাকিলে অমৃত বাবুর প্রতি সাধারণতঃ সন্তুষ্ট বই রুষ্ট হইতেন না।"

লেখক নিশ্চয়ই এক জন সুবিবেচক লোক। কারণ যতটুকু সাফল্য লাভ আশার সীমার মধ্যে—অমৃত বাবুর অভিনয় তাহাই লাভ করিয়াছে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। আশার অতীত জিনিস জগতে কে কোথায় পাইয়াছে? যাহা অভিনয় করা কঠিন তাহাও অমৃত বাবু অভিনয় করিয়া শত সহস্র লোককে মুগ্ধ করিতেছেন—এ কথাও তিনি বিশেষ উদারতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরই তিনি আবার বলিতেছেন—"অভিনয় সৌকর্য্যের জন্য যে "চন্দ্রশেখর" লোকপ্রিয় হইয়াছে—তাহা

নয়। নাটকাকারে চন্দ্রশেখর যে উপন্যাসাকার হইতে অধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে তাহাও নহে। অমৃত বাবু রঙ্গমঞ্চে কয়েকটি অতি সুন্দর দৃশ্যপটের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া। ইহার একটি দৃশ্যপট জ্যোৎস্নালোকে বিধৌত নায়ক নায়িকার নদীবক্ষে সন্তরণ, নূতন ও সুন্দর। এই এক দৃশ্যের জন্যই চন্দ্র শেখরের অভিনয় অন্যান্য অনেক নাটকাভিনয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।”

পাঠক! বোধ হয় লেখকের মন্তব্যের অসারতা এই দুইটী মন্তব্যের তুলনায় উপলব্ধি করিয়াছেন। উপরোদ্ধৃত অংশ দুইটীর তুলনায় তাঁহার উক্তির অসামঞ্জস্যতা বেশ স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তিনি সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছেন—“এ অভিনয়ে যতটুকু সাফল্য আশা করা যায় তাহাই হইয়াছে” আবার বলিতেছেন কেবল অদ্ভুত দৃশ্যপট দেখাইয়া অভিনয় লোকপ্রিয় হইয়াছে!! বড় পরিষ্কার ও যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য!! উভয়ের মধ্যে মতের সঙ্গতিও যথেষ্ট!! আমরা বলি বঙ্গদেশ কি আজকাল এত অপদার্থ ও অন্তঃসার শূন্য হইয়াছে যে, দুই একখানি দৃশ্যপট দেখিবার প্রলোভনে দর্শকেরা অগণ্য জনতা করিয়া পাঁচ ঘণ্টা রঙ্গালয়ে নিশি যাপন করেন? বস্তুতই যদি ইহা প্রকৃত ঘটনা হয়, তাহা হইলে চন্দ্রশেখরের অভিনয় অসফল হইলেও অনুশীলনের প্রবন্ধলেখক ছাড়া আর কাহারও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বঙ্কিম বাবুর দুর্ভাগ্য ত ঘটিয়াছে—ততোধিক ঘটিয়াছে অমৃত বাবুর ও দর্শকবৃন্দের। কারণ লেখক মহাশয়ের মতে অসার দর্শকেরা, মৎস্যলুব্ধ মার্জ্জারের ন্যায় পাঁচ ঘণ্টা খালি ছবি দেখিবার আশায় জাগিয়া বসিয়া থাকেন। কেবল দৃশ্যপট দেখাইয়া অভিনয় সাফল্য লাভ করিয়াছে একথা যিনি বলিতে পারেন তিনি হয় অভিনয়ের সার্থকতা ও সাফল্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—না হয় তিনি Allwise সলোমানের ন্যায় বিজ্ঞতার চসমা চোখে দিয়া অভিনয়টিকে আগাগোড়া নিন্দা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া গিয়াছিলেন। সমালোচকের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা যেরূপই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, মূল চরিত্রের সৌন্দর্য্য কোনমতেই নষ্ট হয় না। বাল্মিকীর রাম—কালিদাস ভবভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ কালকার দাশুরায় মতিরায় প্রভৃতি সকলের হাতেই ঘুরিয়া যাইতেছেন। তত্রাপি কি রামচরিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে? যাহা খাঁটি জিনিস, যাহা প্রকৃত রত্ন—যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন স্বাভাবিক নিয়মে বাধ্য হইয়া তাহার গুণরাশি তাহা হইতে পৃথক থাকিবে না। চন্দ্রশেখর কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়া লইলে ষ্টারের ন্যায় একটি প্রধান ও প্রতিষ্ঠাশালী রঙ্গমঞ্চে তাহার সৌন্দর্য্যের যে সমূহ অপচয় হইয়াছে একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

তার পর লেখক বঙ্কিম বাবু জীবিত থাকিলে যেরূপ ভাবে অভিনয় সমালোচনা করিতেন, মতামত প্রকাশ করিতেন ঠিক সেই ভাবে না হউক—“সেই ধরণে সেই ভাবে সেইরূপে” এই নূতন নাটকের সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর ধরণে তিনি প্রথমেই বলিতেছেন—

"চন্দ্রশেখরকে নাটকাকারে পরিণত করায় নাটকাকারের একটি প্রধান ত্রুটি লক্ষিত হয়। যাহার উপন্যাসখানি পড়া নাই, তিনি চন্দ্রশেখর অভিনয়ের অনেক স্থলেই বুঝিতে পারিবেন না" চন্দ্রশেখর নাটকাকারে অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণ। যদি উপন্যাস পড়া না থাকিলে অভিনয় বুঝিতে ক্লেশ হয়, যদি ইহার অভিনয় দর্শনের পরেও উপন্যাস খানি পাঠ করা আবশ্যক হয় তবে ইহা যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ ভাবে নাটকাকারে পরিণত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।"

ইহার ভিতর একটু কথা আছে। লেখক মহাশয় কেন যে তাহা ভাবেন নাই তাহার কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিতেছি না। কতকগুলি পুস্তক আছে তাহার অভিনয় দেখিতে গেলে মূল পুস্তক পাঠের আদৌ প্রয়োজন নাই। সেগুলি অবশ্য সাধারণের জানিত ঘটনাবলীর মধ্য হইতে গ্রথিত। পৌরাণিক ঘটনা-প্রাণ নাটকগুলি ইহার উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাইতে পারে।

কিন্তু কাব্যের প্রকৃত লক্ষণ বিশিষ্ট পুস্তকাভিনয় দর্শন ব্যাপারে পুস্তক পাঠ নিতান্ত আবশ্যক। আগে হইলে ত কথাই নাই কিন্তু অভিনয় দেখার পরও পুস্তক পাঠের প্রবৃত্তি বড়ই জাগিয়া উঠে। মনে করুন ভবভূতির "উত্তর রামচরিত" অভিনয় হইতেছে এস্থলে রামচরিতের সমস্ত ঘটনা জানা থাকিলেও, একবার পুস্তকখানি পাঠ করা আবশ্যক। সেটুকু কেবল ঘটনার অবগতির জন্য নহে, কবি কিরূপে তাঁহার কাব্যে নাটকীয় চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহারও হৃদয়ঙ্গম জন্য। রামচরিতের ঘটনা সকলেই জানেন, তবে এরূপস্থলে "উত্তর রামচরিত" কেন পাঠ করিতে হয়?

উত্তর রামচরিত ছাড়িয়া দিই। "ম্যাকবেথ" বা "হ্যামলেট" ইংরাজী শিক্ষিতের মধ্যেও অনেকেই জানেন। যখন তাঁহারা পুস্তকগুলির অভিনয় দেখিতে যান তখন কি তাঁহারা পুস্তক পাঠ করিয়া যান না? * যাঁহারা নাটকের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিতে যান, তাঁহারা অভিনয় দেখিবার পূর্ব্বে পুস্তকখানি দুই চারিবার পাঠ করেন। ইহা সাহিত্যগত প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্ম।

চন্দ্রশেখরের নাটকাকারে' পরিবর্ত্তন সমজদার লোকের পক্ষে এতদূর অস্ফুট ও দুর্ব্বোধ হয় নাই যে অভিনয় দেখিবার জন্য মূল গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। যাহাদের বুদ্ধি বৃত্তি ও ঘটনা বোধগম্য ক্ষমতা এত অল্প তাঁহাদের এ প্রকার পুস্তকের অভিনয় না দেখাই উচিত। চন্দ্রশেখর নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে কি না একটি ঘটনা (যাহা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি) হইতেই প্রমাণিত হইবে। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখরের নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না এমন অনেক ইংরাজি নবিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য

---

* আমি জানি Herr Bandman যখন কলিকাতায় Hamlet অভিনয় করিয়াছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কার স্বরূপ অনেক গ্রাজুয়েট বই হাতে করিয়া নাট্যশালায় গিয়াছিলেন। প্রবীণ সম্পাদক নাইটকে এরূপভাবে দেখিয়াছি।

ব্যক্তি ইহার অভিনয় দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে পুস্তক কিনিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের অভিনয়ে পুস্তকের কাটতি আরও বাড়িয়া গিয়াছে একথা বঙ্কিম বাবুর কোন পরমাত্মীয়ের মুখে আমরা শুনিয়াছি।

তার পর লেখক আর এক স্থলে বলিতেছেন "পুস্তক পাঠে যে জীবন্ত ভাব দেখিতে পাওয়া যায় অভিনয়ে তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্রশেখরের অভিনয়ে শৈবলিনী, চন্দ্রশেখরকে রক্তমাংসে দেখিবার আশা করা অন্যায় নহে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে পুস্তক পাঠে যে শৈবলিনী, প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর দেখিতে পাই অমৃত বাবুর অভিনয়ে তাহা পাই না। তাহা না পাইবারই কথা। চন্দ্রশেখরের চরিত্রগুলি এক প্রকার Ideal. আইডিয়ালের প্রকৃত আদর্শ দেখান পুস্তক লেখা অপেক্ষাও অসম্ভব। কেহই বা কখন, কোথায় পারিয়াছেন? বাল্মিকী রাম লক্ষণ রাবণ সীতা যেরূপ ভাবে চিত্র করিয়াছেন ভবভূতি ও কালিদাস যেরূপ ভাবে তাঁহাদের চিত্র সাধারণের সমক্ষে ধরিয়াছেন—সেক্ষপীয়ার তাঁহার চরিত্রগুলি যেরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন আমরা কি ষ্টেজে তাহার প্রকৃত আদর্শ দেখিতে পাই? আজানুলম্বিত বাহু প্রশান্ত বদন; নবদূর্ব্বাদলশ্যাম কিরীট কুণ্ডল শোভিত ইন্দীবর-নয়ন রাম তাঁহার দেবভাব ও গাম্ভীর্য্য কি আমরা ষ্টেজের উপর দেখিতে পাই? ষ্টেজের উপর লম্ফঝম্ফ পরায়ণ বীরপুঙ্গব ধানুকী বাঙ্গালীই কি বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের সজীব রক্তমাংসের পরাকাষ্ঠা নিদর্শন! তাঁহার অভিনয়ই কি রামচরিত্রের বিচিত্রভাবের পরিচায়ক? যাত্রার শ্রীকৃষ্ণ কি সেই ভগবানরূপী মহাভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ? ষ্টেজে যাহাকে সীতা দেখিতে পাই তাহা কি ভবভূতির সেই প্রেম গর্ব্বিতা অভিমান স্ফুটিতা রাজরাজেন্দ্রাণী সীতা? ষ্টেজে যাহাকে শকুন্তলা দেখিতে পাই তাহা কি সেই তপোবন পালিতা কমনীয়তার ক্রীড়াভূমি কুসুমকোমলা ব্রীড়াময়ী প্রেমাভিভূতা, তাপস বালিকা শকুন্তলা? ইংরাজি থিযেটারে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ সিজার দেশডেমিনা, ক্লিওপেট্রা কি সেই প্রতিভাময় কবির সুকুমার শিল্পের চরমোৎকর্ষ উদাহরণ! লেখক নিজেই চন্দ্রশেখরের চরিত্রগুলিকে Ideal বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার উৎপত্তি কল্পনার লীলাক্ষেত্রে-তাহাকে প্রকৃত শরীরিভাব বিশিষ্টকরা কি লেখক সহজ কথা মনে করেন? লেখকের ন্যায় এক জন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি Ideal কে real করিয়া দেখানর পথে যে সমস্ত অন্তরায় ও অসুবিধা আছে তাহা যে বুঝিতে পারেন নাই ইহা বড় দুঃখের বিষয়!

চন্দ্রশেখরের প্রধান চরিত্র "চন্দ্রশেখর' "প্রতাপ" "শৈবলিনী"। প্রধান পার্শ্বচরিত্র মীর-কাসেম দলনী ফষ্টর ও সুন্দরী। ইহাদের অভিনয়গুলির উপর চন্দ্রশেখরের সাফল্য নির্ভর করে। এ সম্বন্ধে অনুশীলনের সমালোচক মহোদয়ের মত কি তাহা আলোচিত হইতেছে। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন "নাটককার অমৃত বাবু নাটকীয় চরিত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাহাদের অংশ ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারেন নাই।"

শৈবলিনীর প্রথম দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া লেখক বলিতেছেন "প্রথম দৃশ্যে বেদগ্রামস্থ ভীমা পুষ্করিণী—শৈবলিনী ও তাহার সখী ও প্রতিবেশিনী সুন্দরী অবগাহনে নিযুক্ত। দৃশ্যপট সুন্দর অভিনয়ও সুন্দর।" তারপর দ্বিতীয় দৃশ্যে শৈবলিনীর অভিনয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন "শৈবলিনী যে সাধারণ নারী নহে তাহা দেখাইবার জন্যই গ্রন্থকার এই দৃশ্য চিত্রিত করিয়াছেন। অভিনেত্রি যে ভাবে এই অংশ অভিনয় করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় তাহার সন্দেহ নাই।" শৈবলিনীর এই দুইটি অংশের অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া আবার অন্যস্থলে প্রকারান্তরে তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

সমালোচক মহাশয় যদিও দয়া করিয়া শৈবলিনীকে এই সার্টিফিকেট দিয়াছেন কিন্তু পত্রিকার সুদক্ষ তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় আবার তাহার নীচে ফুটনোট করিয়া বলিয়াছেন "এখনকার অভিনয়কারিণীকে এ প্রশংসা দেওয়া যায় না পূর্ব্ব অভিনয়কারিণীই এ প্রশংসা পাইবার যোগ্য। সত্য বটে পূর্ব্বাভিনয় কারিণী শৈবলিনীর অংশ নিন্দার বাহিরে থাকিয়া অভিনয় করিয়াছে এবং এখনও যে করিতেছে সে তাহার অপেক্ষা কোনরূপে অনুপযুক্ত চরিত্র নহে। তাহার অভিনয়ে যে শৈবলিনী চরিত্রের মর্য্যাদা হানি হয় নাই যাঁহারা আজকাল তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। প্রথমকার অবস্থার তুলনায় এখন তাহার অভিনয় অতি সুন্দর দাঁড়াইয়াছে। লেখক মহাশয় কোন অভিনয়ের সমালোচনা করিতেছেন তাহা খুলিয়া বলা উচিত ছিল। এটা অবশ্য স্বীকার্য্য যে অভিনয় সকল রাত্রে সমান উৎরাইয়া যায় না। কিন্তু একদিনের দোষে যে সব মাটী হইয়া যায়, বই পর্য্যন্ত—Dramatise পর্য্যন্ত নগণ্য হইয়া পড়ে এ কথা যুক্তির বিরুদ্ধ।

তারপর সমালোচক মহাশয় শৈবলিনীর উদ্ধাব-ব্যাপারের দৃশ্য লইয়া একটু গোলমাল করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন "নাটককার উপন্যাসের এই অংশ নাটকাকারে পরিণত করিতে নিতান্তই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিরূপে কোথায় প্রতাপ শৈবলিনীকে উদ্ধার করিল ইহা না বলিলে যে কেবল নাটক অসম্পূর্ণ হয় এরূপ নহে—প্রতাপেরচরিত্রও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রতাপ যে কি তাহা আমরা শৈবলিনীর উদ্ধার ব্যাপারে দেখিতে পাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় অমৃত বাবু এই অংশ একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।"

সমালোচক মহাশয়ের একথা আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানি। কিন্তু এগুলির মধ্যে অনেক অন্তরায় আছে। এমন অনেক দৃশ্য আছে যাহা কাব্যের মধ্যে থাকিলেও অভিনয়ক্ষেত্রে—ষ্টেজে দেখান বড়ই দুরূহ ব্যাপার। শৈবলিনীর উদ্ধার ব্যাপারও সেইরূপ। দৃশ্যপটগুলির যথোপযুক্ত অঙ্কানুক্রমে সমাবেশ করার কষ্টকর অবস্থা, ষ্টেজের ভুক্তভোগীগণ ভিন্ন আর কাহারও উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। চন্দ্রশেখর পুস্তকে

Scenic difficulty এত বেশী যে আমাদের দেশীয় নাট্যমঞ্চে সে সমুদায় দেখান অনেকস্থলে অসম্ভব। বিশেষ দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনীশক্তি না থাকিলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। কসাড়বনের সমস্তকাণ্ডে—জাহ্নবী গর্ভে নৌকার উপর শৈবলিনীর উদ্ধার সংকল্পে প্রতাপের কার্য্যকলাপ অভিনয়ের উপযুক্তস্থলে দেখান—সমালোচক যত সহজ ভাবিতেছেন কার্য্যতঃ তত সহজ নহে। এতদ্ব্যতীত পরের Scene গুলি manage করিবার সম্বন্ধে বড় একটা গোল বাধিয়া যাব। এই জন্যই অমৃত বাবু তাহা ত্যাগ করিয়া রামচরণের মুখ দিয়া সে ঘটনাব কথা বলাইয়া দিয়াছেন। এস্থলে নাটককারকে হয়ত ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইযাছে। তিনি সমুদ্রেব শুক্তি আকাশের চাঁদ—সাপেব মাণিক—ধরিয়া দিতে পাবেন নাই বলিয়া এস্থলে তাঁহাকে মার্জ্জনা করিলে বোধ হয় সমালোচক মহাশয় সহৃদয়তা দেখাইতেন। শিলাব বলিয়াছেন Place yourself in a relative position with me and you will see why do I so much lack in my capacity. লেখক মহাশয় একবার এ কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন এই অংশটী এত অপবিস্ফুট নহে যে কি প্রকারে শৈবলিনী উদ্ধার পাইল তাহা পরের অভিনয় দেখিয়া বুঝিতে লোকের কষ্ট হইতে পারে। এরূপস্থলে সকলদিক বিবেচনা না করিয়া যে সমালোচক মহোদয় নাটককারকে "অকৃতকার্য্য" হইয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন—ন্যায়পরতার বিচারে তিনি এ অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইবার পাত্র।

তাবপর সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন "দ্বিতীয় চিত্রে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী। চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। শৈবলিনী অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু নাটককাব চন্দ্রশেখবকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখাইয়াছেন। চন্দ্রশেখরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব কোন লক্ষণ নাই। চন্দ্রশেখর যেন একটি নব্য বাবু!! যিনি পুঁথি লইয়া চির উন্মত্ত তিনি কেশ ও গুম্ফ কখনও রাখেন নাই বিশেষতঃ যেরূপ সময়ের কথা হইতেছে সেই সময়ে এরূপ বেশী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন তাহাব সন্দেহ নাই। চন্দ্রশেখরের প্রতি কেন শৈবলিনীর মন আকৃষ্ট নহে তাহা এ দৃশ্যে উপলব্ধি করিবাব উপায় নাই।"

লেখকের আপত্তিগুলি মোটামুটি এই—চন্দ্রশেখব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য গোছেব লোক। যিনি চন্দ্রশেখর সাজিয়াছিলেন তিনি তাহা নহেন। গুম্ফ ও শ্মশ্রুব অভাব-গোলাকারে মুণ্ডিত মস্তক-দীর্ঘ শিখাব লকলকি ও নস্যদানী তাহাতে নাই। বিশেষতঃ যে সময়ের কথা হইতেছে সে সময়ে ষ্টেজের চন্দ্রশেখর অভিনেতার ন্যায় অবস্থা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত থাকা অতি অসম্ভব।

লেখক নিজে চন্দ্রশেখরকে বুঝিতে পারেন নাই তাই এরূপ গোলযোগ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত, কিন্তু "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত" নহেন। ইহাতেই অনেকটা প্রমাণিত হয় তিনি লেখক মহাশয়ের শৌচাচারী পুরোহিত ঠাকুরের মত মুণ্ডিতগুম্ফ—মুক্তশ্মশ্রু

নহেন বা তাঁহার মস্তকের মধ্যভাগ বৃত্তাকারে মুণ্ডিত নহে। চন্দ্রশেখরকে বঙ্কিম বাবু যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বিশেষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচকেও অনেক কষ্টে অনুভব করিয়া থাকেন। চন্দ্রশেখর আজীবন শাস্ত্রাধ্যায়ী—তাঁহার শাস্ত্রাধ্যায়ন যজমান রক্ষার বা বিদায় লইবার জন্য নহে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য; চন্দ্রশেখর শৈবলিনী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বটে কিন্তু নবঙ্গলতার রামসদয়ের মত নহেন। লেখক যদি নবঙ্গলতার ও শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখর ও রামসদয়ের অবস্থা আলোচনা করিতেন তাহা হইলে দেখিতেন রামসদয় যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠ চন্দ্রশেখরকে বঙ্কিম বাবু তাহাব অপেক্ষা অনেক অল্প বয়স করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রশেখর অনেক দিন অকৃতদার ছিলেন—সে কেবল শাস্ত্রাধ্যায়নের জন্য। সচরাচর ব্রাহ্মণদিগের সেকালে যে সময় বিবাহ হইত—চন্দ্রশেখর তাহা অপেক্ষা পরিণত-বয়সে বিবাহিত। এই জন্যই শৈবলিনীর অপেক্ষা তিনি অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ। বেদগ্রামে গৃহ দাহের পর যেরূপ ভাবে চন্দ্রশেখর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন তাহাতে কবি তাঁহার হৃদয়ে যৌবনের চঞ্চলতা ও উৎকণ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের এই স্থলের উক্তিগুলি বেশ ভাল করিয়া দুই তিন বার পড়িলেই সমালোচক দেখিতে পাইবেন কবি চন্দ্রশেখরকে একটা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিত করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। যেরূপ আবেগে—যেরূপ উৎসাহে—যেরূপ উৎকণ্ঠায়—যেরূপ প্রেমোদ্বেলিত চিত্তে—যেরূপ ভাবী আশঙ্কায় আকুলিত হইয়া, চন্দ্রশেখর গৃহে ফিরিতেছেন; তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বয়োধর্ম্মের অনুরূপ। এ প্রকার উদ্বেগ, এ প্রকার চপলতা, এ প্রকার সন্দিগ্ধতা, এ প্রকার প্রাণের উচ্ছাস কি কোন অতিবয়োবৃদ্ধের হৃদয়ের ভাব? অনেক যুবক প্রণয়ী যে অমন করিয়া হৃদয় ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না!

লেখক মহাশয়ও সে সময়ের লোক নহেন বা বঙ্কিম বাবুর পুস্তকে চন্দ্রশেখরের একটা Wood-cut নাই—যাহা হইতে অনুমান করা যায় যে তিনি একজন গোঁফ কামান মাথা নেড়া ভট্টাচার্য্য। পুঁথি লইয়া থাকিলে কেন যে কেশ গুম্ফ মুণ্ডিত রাখিতে হইবে ইহার কোন বিশেষ বাধ্যকর নিয়ম নাই। চন্দ্রশেখর যে সকল পুঁথি পড়িতেন তাহা কাব্য নাটক, পুরাণ, স্মৃতি, উপনিষদ প্রভৃতি। সেগুলি দশকর্ম্ম, ব্যবস্থাদর্শন বা প্রায়শ্চিত্তবিধি নহে। বঙ্কিম বাবু যাঁহাকে নায়ক করিয়া সৃজন করিয়াছেন তিনি যে লেখক মহাশয়ের অনুভব মত একটী আদত টোল উত্তীর্ণ ইহা কখন সম্ভবপর নহে। অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা যজমান ব্যবসায়ীরা বা গুরুঠাকুরেরা সমালোচক মহাশয়ের চন্দ্রশেখরের আদর্শ হইয়াছেন দেখিতেছি। অভিনেতার শ্মশ্রু ছিল না কিন্তু "গুম্ফ" আখ্যা লইয়া তাঁহার নাসারন্ধ্রের নিম্নে যাহা বিরাজিত ছিল তাহাতে নব্য বাবুর কোন লক্ষণই নাই। তিনি যৌবনের প্রথম ফুটন্ত কুসুমটীর ন্যায় নবীন বাবু সাজিয়া বাহির হন নাই। তাঁহার গায়ে কামিজ ছিল না; মাথায় দ্বিধা বিভক্ত কেশরাজিও অবর্ত্তমান ছিল। চন্দ্রশেখরের অংশ অভিনেতার লম্বিত কেশ গৈরিক বা শুভ্র

বসন, গম্ভীর ভাব, দীর্ঘ আকার, বলিষ্ঠ-প্রকৃতি, কি বাহ্য সাদৃশ্যে কবির চন্দ্রশেখরের পূর্ণ না হউক আংশিকের অপেক্ষাও অধিক পরিচায়ক নহে?

আমরা চন্দ্রশেখর পুস্তক হইতেই দেখাইব যে বঙ্কিম বাবু চন্দ্রশেখরকে লেখকের নিজ গঠিত আদর্শ চিত্রিত করেন নাই। সেই গঙ্গাতীরের পথে সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্যে যখন দুর্গ-প্রবেশ-নিষিদ্ধা পথ-পরিত্যক্তা দলনী সেই দীর্ঘাকার চন্দ্রশেখরের মূর্ত্তি অবলোকন করিল সে অবস্থায় কবি চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহাকে কি বলিয়া বোধ হয়? চন্দ্রশেখর যখন অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন তখন কেমন দেখাইতেছিল? সহৃদয় পাঠক! একবার দেখুন দেখি শৈবলিনী যখন পর্ব্বত-গহ্বরে রামানন্দ স্বামীর কৌশলে পড়িয়া চন্দ্রশেখরকে ভাবিতেছে তখন কি সে চন্দ্রশেখরের প্রকৃত আদর্শের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে? সে সময় কি তাহার মনে কাপট্য বা অতিরঞ্জিত ভাব বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে? তখন সে চন্দ্রশেখর প্রকৃতই যেরূপ—তাহাই দেখিয়াছিল। কঠোর পরীক্ষায় পড়িয়া তাহার মনে অবশ্য চন্দ্রশেখরের প্রকৃত মূর্ত্তির ছায়া পড়িয়াছিল। দেখুন দেখি শৈবলিনী বলিতেছে "এ কি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরু নিন্দিত, সুভুজ বিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, সুকুমার বলময়, এ দেহ যে রূপের শিখর!! এই যে ললাট প্রশস্ত চন্দনে চর্চ্চিত, চিন্তারেখা বিশিষ্ট, এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ—লক্ষ্মীর সিংহাসন। ইহার কাছে প্রতাপ! ছি! ছি!! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন জ্বলিতেছে, হাসিতেছে ফিরিতেছে ভাসিতেছে—দীর্ঘ বিস্ফারিত তীব্র জ্যোতিঃ, স্থির, স্নেহময়, করুণাময় ঈষৎ রঙ্গ প্রিয়, সর্ব্বতত্ত্বজিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু! কেন আমি ভুলিলাম, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম এই যে সুন্দর, সুকুমার বলিষ্ঠ দেহ, নবপত্র-শোভিত শালতরু, মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুম-পরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধচন্দ্র আধভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধরাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয় আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম কেন মরিলাম সেই যে ভাষা-পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্য প্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত মৃদু মধুর, পরিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশি তুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎতুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য, আমার সুখস্বপ্নতুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম কেন বুঝিলাম না? সেই যে ভাল বাসা সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল, প্রশান্ত ভাবে স্থির গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কুলপ্লাবী, তরঙ্গ ভঙ্গ-ভীষণ, অগম্য অজেয় ভয়ঙ্কর—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না!" সহৃদয় পাঠক আপনারা এখন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের কৈফিয়ৎ গ্রহণ করুন। গরিব বেচারা অমৃতলাল বাবু কেন যে অমন অপাত্রে

চন্দ্রশেখরের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার অবিবেচনার নিন্দা করুন এবং লেখক মহাশয়কে কলিকাতার সমস্ত নাট্যমঞ্চ খুঁজিয়া ষ্টারের চন্দ্রশেখর অংশ অভিনেতা অপেক্ষা একজন উচ্চদরের অভিনেতাকে আনিয়া রঙ্গমঞ্চে স্থাপন করিতে পরামর্শ দিন। Perfection দেখিতে কার না ইচ্ছা হয়? নাট্যশালার অধ্যক্ষ ইহা দেখাইতে তাঁহার সাধ্যের অতীত যাহা কিছু তাহাও করিয়াছেন—সূর্য্য কিরণ ও ইন্ধন-জাত অগ্নি এবং নিন্দা ও সমালোচনা যে পরস্পর বিভিন্ন জিনিস তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং Fastidious critic এর চক্ষু যাঁহাদের নাই তাঁহারা সহজেই অনেক ভাল বিষয় সোজাভাবে দেখিতে পান এবং ঐ প্রকার সামান্য ত্রুটির জন্য একটা মহা ভৈরব হুঙ্কার করিয়া উঠেন না।

তার পর লেখক মহাশয় বলিতেছেন "শৈবলিনীর গৃহ ত্যাগের পর দৃশ্যে নাটককার কতকগুলি বেদগ্রামবাসী আনিয়াছেন। শৈবলিনী যে ফষ্টরের সহিত পলাইয়াছে ইহাই দর্শকবৃন্দকে অবগত করানই এরূপ করার উদ্দেশ্য। এটী একটী "সঙের" দৃশ্যে খুব হাসির কথা আছে। এরূপ ভাবে শৈবলিনীর গৃহত্যাগ দর্শক বৃন্দকে অবগত করান পুস্তকের সৌন্দর্য্যের লাঘব ভিন্ন বৃদ্ধি হয় নাই। এ দৃশ্যও কি অনাবশ্যক নয়?

সকলেই স্বীকার করিবেন নাটক রসপ্রধান কাব্য। বিভিন্নরসের সমাবেশ ও অবতারণাই ইহার প্রকৃতি। অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি মধুর গুণের বিরোধী রস। কিন্তু অম্ল কষায়াদি না থাকিলে মধুরের আস্বাদনের কোন বিশেষত্ব থাকিত না। এক পথ প্রবাহী রস, কাব্যের সৌন্দর্য্য হানি করে। এই দৃশ্যে বেদগ্রাম বাসীদের এ প্রকারে আনয়ন করিয়া নাটককার কোন অপরাধই করেন নাই। সকল দর্শক লেখকের মত অত বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কঠোর Critic নহেন কাযেই এ প্রকার দৃশ্যের অবতারণায় তাঁহারা বিশেষ বিরক্ত হন নাই। দক্ষ নাটককারের যাহা করা উচিত এস্থলে নাটকের মাধুর্য্য রক্ষার্থে তাহাই হইয়াছে।

বেদগ্রামবাসী আনাইবার উপায় ব্যতীত শৈবলিনীর গৃহত্যাগ বার্ত্তা সাধারণের গোচর করা নানা কারণে অসম্ভব। ষ্টেজের মধ্যে গৃহ দাহ প্রভৃতি দ্বারা বা ডাকাতির অন্যান্য আনুসঙ্গিক চিহ্ন প্রদর্শন করান বড় নিরাপদ ব্যাপার নয়, কাজেই বেদগ্রামবাসীদের এই খানে আনান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শৈবলিনীর উদ্ধার ব্যাপার না দেখানর অভিযোগের সাফাই স্বরূপ আমরা অগ্রে যাহা বলিয়াছি তাহাও এস্থলে প্রযুজ্য হইতে পারে। সে কালের পল্লিগ্রামবাসীরা আজকালের মত অত সুশিক্ষিত ছিলেন না। লোকগুলিকে আনানতে তাহাদের কথাবার্ত্তায় আমরা সেই ইংরাজের প্রথম অভ্যুদয় সময়ের পল্লিগ্রামের বেকার বাঙ্গালীর কতকটা পরিচয় পাই। এ দৃশ্য অবতারণা করায় যখন মূল পুস্তকের কোন ক্ষতি হয় নাই—অথচ নাটকের এক মুখ-প্রবাহী-স্রোত একটু ছোট খাট ঘটনা বৈচিত্রের মধ্যে পড়িয়া অন্য দিকে ফিরিয়াছে—তখন এরূপ দৃশ্যের কোন অনাবশ্যকতা আছে বা নাটককার ইহার অবতারণা দ্বারা

মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

সমালোচক মহাশয় বোধ হয় পুস্তক খানি পাঠ না করিয়া অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। পুস্তক পাঠ না করিয়া এ প্রকার স্থলে অভিনয় দেখিতে গেলে কি প্রকার অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হয়, রকম দেখিয়া বোধ হইতেছে তাহা তিনি করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাব্য-লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থের অভিনয়ের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে অভিনীত কাব্য খানি আগাগোড়া দুই একবার পড়িয়া যাওয়া প্রত্যেক দর্শকের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা বই না পড়িয়া যান পুস্তকের ঘটনা কতক কতক অবগত থাকিলেও অভিনয় দেখিয়া আসিয়া গৃহে বসিয়া পুনরায় সেই অভিনীত পুস্তক পাঠে অতীত অভিনয়ের নির্জ্জন সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। পুস্তকখানি পাঠ না করিয়া গেলে যখন নানাদিকে অসুবিধা তখন বই খানি পড়িয়া যাওয়াই উচিত। মূল পুস্তক পাঠ না করিলে নাটককার তাহার কি কি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহারও ভালমন্দ বিচার আসিতে পারে না। এই জন্যই আমরা বলিতেছি—সমালোচক মহাশয় "বই পড়া" "বই-পড়া" করিয়া যে একটা মহা গণ্ডগোল বাধাইয়াছেন তাহা নিতান্ত অসারগর্ভ সহজ পথ বহির্ভুত যুক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই জন্যই তিনি প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী প্রভৃতির অভিনয়ের কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারেন নাই বরঞ্চ অযথা রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। যিনি চন্দ্রশেখরকে অনেক দিন নাড়া চাড়া করিয়া অনেক পরিশ্রম ও মাথা ঘামাইয়া যাহা—হয় একটা, না হয় হইল নাটকাকারের পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন ও নিজে "তরুবালার" ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন এতদিন সামাজিক চিত্রের বিচিত্র Phantamasgoria সাধারণের চক্ষে ধরিয়া আসিতেছেন—তিনি যে প্রতাপ চরিত্র কিছুই বুঝেন নাই, একথা আমরা বলিতে পারি না, বলিতে সাহসও হয় না তবে প্রতাপের চরিত্র সমগ্র চন্দ্রশেখর মধ্যে বড় বেশী পোছের Ideal এবং স্বয়ং বঙ্কিমবাবু ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্টতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রতাপ চরিত্র যে অভিনয়ে ঠিক তাঁহার কল্পনা মত যথাযথ ফুটিতে পারে না এ কথাও তিনি একবার কথা প্রসঙ্গে আমার কোন সম্মানিত প্রবীণ লেখক বন্ধুর কাছে বলিয়াছিলেন। প্রতাপচরিত্র নাটকের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ চরিত্র বলিয়া সকলের উৎক্রোশ দৃষ্টি উহার উপরিই পরিবদ্ধ। অন্য চরিত্রের খুঁত দেখিতে লোকে যত ব্যগ্র না হয়—প্রতাপের চরিত্রে কোন ত্রুটী দেখিলে তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হইয়া উঠে। যাহা সর্ব্বদাই সকলের চোখের উপর থাকে তাহার সফলতা ও সার্থকতা অবশ্য অনেক দোষগুণের অনল পরিক্ষার সীমা মধ্যবর্ত্তী হইয়া তবে শেষ উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

প্রতাপের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা অতি দুরূহ। কবি মানসিক বৃত্তির যে যে উপাদান সহায়ে প্রতাপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা যে নাটককার কিছুই বুঝেন নাই বা অভিনেতা তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই একথা আকাশ

কুসুমের ন্যায় নিতান্ত অলীক। প্রতাপ চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর যুক্ত অভিনয়ে যে Stage effect হয় তাহাতেই এই তিন চরিত্রের অভিনয়ের সফলতা বিশেষরূপে বোধগম্য হইতে পারে। তবে ইহার মধ্যে কাহারও বা অভিনয়ের দক্ষতা একটু বেশী, কাহারও বা কম। ন্যায্য পন্থানুসারী এমন কোন লোক নাই যিনি অভিনয় দেখিয়া বলিতে পারেন না উল্লিখিত তিনটি পাত্রের অভিনয়ে চন্দ্রশেখরের শেষ যবনিকা পতনের পূর্ব্বে তাঁহার মনে কোন একটা স্থায়ী ভাবের সঞ্চার হয় না। একথা যিনি বলিতে সক্ষম হইবেন তাঁহার হৃদয় হয়ত প্রস্তরে নির্ম্মিত—প্রকৃতির কোমলাংশ—মধুরিমা-ময়ী ভাব তাঁহার হৃদয়ে অতি অল্প বা তিনি চন্দ্রশেখরের গল্পাংশ ছাড়া ইহার বিশেষত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। হইতে পারে; প্রতাপ চরিত্র যতদূর Perfectionএ অভিনয় হওয়া উচিত তাহা হয় নাই কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহাতে কি সাধারণের সন্তোষ উৎপাদিত হয় নাই? যদি তাহাও না হইয়া থাকে চরিত্রের দুরূহতার জন্য কি অভিনেতা রেহাই পাইতে পারেন না? বা তাঁহাকে কিছু দীর্ঘ সময় দেওয়া যাইতে পারে না? আসল কথা হইতেছে প্রতাপ চরিত্রের অভিনয়ের অপারগতায় চন্দ্রশেখরের অভিনয় কখনই Suceessful হইতে পারে না। প্রতাপকে বাদ দিয়া চন্দ্রশেখর দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং প্রতাপ চরিত্র যে কিছুই হয় নাই ইহা নিতান্ত জবরদস্তির কথা।

প্রতাপ চরিত্র কি গূঢ় রহস্যময় করিয়া সৃজন করিয়াছেন তাহা গ্রন্থকারই জানেন। আমরা বেশ জানি কোন সুদক্ষ ও তীক্ষ্ণদর্শী সমালোচক বঙ্কিম বাবুর চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রতাপ সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্যে উপনীত হইয়াছেন বঙ্কিম বাবু কোনস্থলে কথাপ্রসঙ্গে ঠিক তাহার বিপরীত মতই প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত প্রবীণ সমালোচক মহাশয় প্রতাপকে Defective বলিয়া গিয়াছেন। প্রতাপের হৃদয়ের বল যথেষ্ট থাকিলেও তিনি "শৈবলিনীর বিষের ভয়ে বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন" এবং তদ্দ্বারা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছেন ইহাই সেই তীক্ষ্ণদর্শী সমালোচকের অভিযোগ কিন্তু গ্রন্থকার নিজে এইস্থলে বলিয়াছেন "প্রতাপ চরিত্র—এই কথাতেই আরও সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রতাপের যে নিজের হৃদয়ের উপর বিশ্বাস ছিল না—ইহাই তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত মহত্ব। প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্য্যশালী তথাপি ইন্দ্রিয়জয়ী—কিন্তু অমরনাথ অবস্থার পরিবর্ত্তনে মনঃসংযম করিতে পারিয়াছিলেন।"

পাঠক দেখুন—যিনি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রগুলি সমালোচনা করিয়া সাহিত্য-সংসারে যশস্বী, গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন ও চরিত্র বিশ্লেষণে অদ্ভুত প্রতিভা দেখাইয়াছেন তিনি নিজেই প্রতাপ সম্বন্ধে কত ভ্রান্ত!! তখন অন্য পরে কা কথা।

কবি যে উদ্দেশ্যে নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টি করেন তাহার যথাযথ মর্ম্মভেদ গ্রন্থকার ব্যতীত অপর কাহারও করা সম্ভব নহে ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সমালোচক ও গ্রন্থকার উভয়ের মিলনে এ বিষয়ের একত্র আলোচনা না

হইলে এ সম্বন্ধে মতভেদ সহজে মিটে না। বিখ্যাত নবেলিষ্ট উইলকি কলিন্স জীবনের শেষ দশায় একখানি নবেল লেখেন। তাহার কয়েক অধ্যায় লিখিয়া পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলির এক একটি বিশ্লেষণ মন্তব্য (Synopsis) করিয়া তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের আর দুই জন বিখ্যাত নবেলিষ্টের (ব্রেটহার্ট ও বেসাণ্ট) হাতে তাহা সম্পূর্ণ করিবার ভার দিয়া যান। ব্রেটহার্ট ও বেসাণ্ট সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলেও পুস্তক শেষ করিয়া যাহা দাঁড় করাইলেন—অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশ্রম করিয়া লিখিয়া—যাহা প্রকাশ করিলেন, তাহা ভাবে, ভাষায়—চরিত্র গঠনে ; আকার প্রকারে কলিন্সের প্রথমকার অধ্যায়ের লেখা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দাঁড়াইল। এই জন্যই বলিতেছি সাধারণ চক্ষুতে আমরা যাহা প্রকৃত কাব্য সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি বলিয়া দর্পে স্ফীত হই অপরে তাহা বুঝে নাই বলিয়া আস্ফালন করি পরিণামে হয়ত পরিণত বিবেচনায় দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তার ফলে নিজেদেরই সেই পোষিত মত ভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করি।

নাটককার অমৃত বাবু অনেক স্থলে গ্রন্থকারের কথা প্রতাপ শৈবলিনীর মুখে বাহির করিয়াছেন বলিয়া লেখক-কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছেন। অমৃত বাবুর এইরূপ করার বিশেষ কারণ আছে। এ সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যবিদ্ বন্ধুগণের মধ্যে একবার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তাঁহাদের মত এই—এরূপ স্থলে নাটককার গ্রন্থকারের ভাবগুলি তাঁহার নায়ক নায়িকার মুখে পরিব্যক্ত করাইয়া বিশেষ বিবেচনা—কৃতিত্বের ও সাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন। এ সকল স্থলে নিজের কলম চালাইলে যাহা হইত—গ্রন্থকারের ভাব ব্যক্ত করায় তাঁহার দায়িত্ব অনেক কমিয়াছে—এবং তিনি কবি প্রতিভার উপর হস্ত ক্ষেপের চার্জ্জ হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছেন। তিনি নিজে এই সমস্ত পরিবর্ত্তন করিলে হয়তঃ সাধারণে বঙ্কিম বাবুর লেখাগুলি পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। আর এরূপ করায় সাধারণের বিচারে যে প্রকার স্পর্দ্ধা, আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাইত—বর্ত্তমান স্থলে তাহা না হইয়া তাঁহার সরলতা ও কবি প্রতিভার প্রতি সম্মান ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বাভিনীত মৃণালিনী প্রভৃতি পুস্তকে, নাট্যশালার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা নিজের কলম চালাইয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিয়া গিয়াছেন—পুস্তকের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন—স্বয়ং বঙ্কিম বাবু এ কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"নাট্যশালায় আমার পুস্তকের বড় দুর্গতি হয় মৃণালিনীর সৌন্দর্য্য থিয়েটার ওয়ালারা তাঁহাদের নিজের মত চালাইয়া বিকৃত করিয়াছেন—তাই আমি এবারকার সংস্করণে মৃণালিনীকে প্রকৃতনাটকীয় ভাবে পুনঃমুদ্রিত করিয়াছি"। তাহা ছাড়া তিনি নিজেই অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন ভাষার লীলা ও দৃশ্যের উৎকর্ষ চন্দ্রশেখরে অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা বেশী। এ প্রকার স্থলে তাঁহার ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করিতে গেলে অমৃত বাবু নিশ্চয়ই অকৃতকার্য্য হইতেন। এ প্রকার স্থলে অমৃত বাবু যে একথা জানিতে না পারিয়াও স্বীয় হৃদয়ের স্বাভাবিক

সৎপ্রবৃত্তি পরিমিত জ্ঞান ও অহমিকা-হীনতা বলে ধীর ভাবে কার্য্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার দক্ষতার বিশেষ প্রশংসা করা উচিত। তাহা না হইয়া সমালোচক মহাশয়ের নিকট তিনি অপরাধীর ন্যায় অভিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা বিজ্ঞ সমালোচক মহাশয়কেই সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করি তিনি এই সমস্ত দুরূহ অংশগুলি নিজে পরিবর্ত্তিতরূপে নাটকাকারে আনিতে কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত আছেন? তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া এই অংশগুলি পরিবর্ত্তিত করিয়া অজ্ঞ অমৃত বাবুকে প্রেরণ করিলে উদারতার জন্য তিনি বিশেষরূপে ধন্যবাদার্হ এবং ভ্রান্তকে পথপ্রদর্শনের যে গৌরব ও পুণ্য তিনি তাহার অধিকারী হইবেন।

আমাদের প্রবন্ধ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ততার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কাজেই আমরা অনুশীলনের সমালোচক মহাশয়ের শেষ কথাগুলি পরম্পরাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহার উত্তর দিব।

তিনি বলিতেছেন—

(১) প্রতাপের গৃহ—দুইজন সাহেব ও সিপাহির দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ। রামচরণ বন্দুকের গুলি খাইয়া আহত হইল, প্রতাপও বন্দী হইলেন—এই দৃশ্যে দুইটি হাস্যজনক ব্যাপার আছে প্রথম গৃহ আলোকিত—তথাপি সাহেবেরা দেশলাই জ্বালিয়া বাতি জ্বালিলেন। যদি বাতি জ্বালা হইল তবে ঘরটি অন্ধকার করিতে ক্ষতি কি ছিল? দ্বিতীয়, সাহেব রামচরণকে লক্ষ্য করিয়া যে পিস্তল ছুড়িলেন সে পিস্তল ছেলেদের খেলিবার পিস্তল। এরূপ পিস্তল ছুড়িয়া এ দৃশ্যের অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা কি?

(১) এর সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় নিজের গাম্ভীর্য্য ও প্রবীণতা হারাইয়াছেন। তাঁহার এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। তিনি বলিতেছেন গৃহ আলোকিত সত্ত্বেও সাহেবেরা বাতি জ্বালিয়া দোষের কাজ করিয়াছেন এবং তাহাদের বাতি জ্বালিবার পরই বা কেন ষ্টেজের আলো কমাইয়া দেওয়া হয় নাই! অভিযোগটা অবশ্য গুরুতর গোছের। অন্ধকারের দৃশ্য অভিনয়ে ষ্টেজ সম্পূর্ণ অন্ধকার করাই উচিত। কিন্তু লেখক-মহাশয়ের ভাবা উচিত ছিল, রামচরণ যখন ইগুিল মিগুিলের শ্রাদ্ধ করিতেছিল, তখন ঘটনার স্বাভাবিকতা ধরিতে গেলে অভিনয়ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অন্ধকারময় হওয়া উচিত। কেন না প্রতাপের বাড়ী সে রাত্রে বিবাহবাটী ছিল না—রামচরণের কার্য্যকলাপ, শৈবলিনীর তাহা গবাক্ষপথ হইতে পরিদর্শন, দলনী ও কুলসমের ব্যাপার সুতরাং এই সময়ে অন্ধকারের মধ্যেও হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দর্শকগণ মার্জ্জারের দৃষ্টিশক্তির সংক্রামতা প্রাপ্ত হন নাই—কাজেই রামচরণের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ রাখিবার জন্য সে সময়ে ষ্টেজে পূর্ণ আলোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই কারণ বশতঃ সাহেবেরা আসিবার পরও আলো রাখা প্রয়োজন হয়। সাহেবদের একটা সামান্য বাতি কখন অত বড় ষ্টেজকে পূর্ণরূপে আলোকিত করিতে সক্ষম নহে—এবং হইলেও সে আলোকে সাধারণের অভিনয়দর্শনপক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে না। ষ্টেজের আলো কমাইতে হইলে অভিনয়ের কার্য্যগুলি দেখাইবার জন্য মশালের আলোর

প্রয়োজন। সমালোচক মহাশয়, কি তাহাই করিতে বলেন? ছেলেদের পিস্তল, এ সাহেবী দাঙ্গায় ছুড়িয়া অমৃত বাবু বড় অন্যায় করিয়াছেন! ইহা তাঁহার মহা অসাবধানতার চিহ্ন। তাঁহার উচিত ছিল Walter lockeএর বাড়ী হইতে একটা ছয় নলী রিভলভার ও ১নং ছয়টা বুলেট সাহেবদিগের হাতে দিয়া হতভাগ্য রামচরণের মস্তকের খুলিটা উড়াইয়া দেওয়া। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি নাট্যশালার অধ্যক্ষদের এই পিস্তলের জন্য Arms Act অনুসারে পাশ রাখিতে হইয়াছে। লেখক যদি তাঁহার আরও একাদশ জন বন্ধুকে লইয়া ইহার বল পরীক্ষা করিয়া সাফাই দেন তবে আমরা বড় সুখী হই।

(২) পরের দৃশ্যে চন্দ্রশেখর ও রামানন্দ। ইহাদের কথোপকথন অতি দীর্ঘ মূলউপন্যাসে নাই। এ বক্তৃতায় পুস্তকের সৌন্দর্য্য হানি হইয়াছে। চন্দ্রশেখর ও রামানন্দকে যাত্রার নারদ বলিয়া বোধ হয়।

(২) চন্দ্রশেখর ও রামানন্দের দীর্ঘ কথোপকথনে সমালোচক মহাশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহ'তে তাঁহার দোষ নাই। কিন্তু চন্দ্রশেখরকে একবার "নব্য বাবুর" মত বলিয়া আবার তাহাকে "যাত্রার নারদ" বলিলেন কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাত্রার নারদ কি ভ্রমরকৃষ্ণ কেশধারি নব্যেরাই হয়?

(৩) অমৃত বাবু শৈবলিনীর প্রতাপ কর্ত্তৃক উদ্ধার ও প্রতাপের শৈবলিনী কর্ত্তৃক উদ্ধার ষ্টেজে না দেখাইয়া সুন্দর দৃশ্য দুটী বাদ দিয়াছেন। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে এ দুটি প্রধান দৃশ্য অথচ এ দুইটিই নাটককার বাদ দিয়াছেন। গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে তিনি অমৃত বাবুকে নিশ্চয়ই এই ক্রটির জন্য বলিতেন।

(৩) ইহার উত্তর আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। তবে গ্রন্থকার এসম্বন্ধে অমৃত বাবুর উপর রুষ্ট হইতেন কি না তাহা লেখকের ন্যায় আমরা গণনা করিয়া ভবিষ্যত বলিতে পারি না।

(৪) তার পর নদীবক্ষ। এ দৃশ্য অতি সুন্দর। অমৃত বাবু এ দৃশ্যের দৃশ্য পট ও অভিনয়ের জন্য ধন্যবাদের পাত্র।

(৪) চন্দ্রশেখরের গঙ্গাবক্ষের দৃশ্য অতি মহান। অমন মহৎ দৃশ্য আর কোন পুস্তকে পড়িয়াছি কি না মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র—অনেক দিন পূর্ব্বে যখন তাঁহার বঙ্গদর্শন উঠিয়া যায় ও বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের হাতে তিনি তাহা সমর্পণ করেন তখন একদিন চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন "গঙ্গাবক্ষে অগাধজলে সাঁতারের মত দৃশ্য আমি আর কই লিখি নাই।" অমৃত বাবু অবশ্য সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না—কিন্তু মনীষি ও বিজ্ঞ সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কবিবর হেমচন্দ্র প্রভৃতি সেখানে ছিলেন। এ কথা আবার চন্দ্রশেখর অভিনয়ের অনেক পরে সাধারণে উপস্থিত হইয়াছে। এ দৃশ্যটি যে মহান তাহা অমৃত বাবু নিজের বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়াই বুঝিয়াছেন। এ দৃশ্যটি দেখাইবার পক্ষে অনেক অন্তরায় থাকিলেও তিনি বুঝিয়াছেন ইহার অভাবে তাঁহার নাটক মাটী হইবে। Unguided

ও Unaided হইয়া যখন তিনি গ্রন্থকারের মনের কথা বুঝিয়া ঠিক্‌স্থলেই কোপ মারিয়াছেন তখন তিনি যে চন্দ্রশেখরের কিছুই বুঝেন নাই ইহা বলা ধৃষ্টতামাত্র।

(৫) শেষ দৃশ্যে নবাবের দরবার। সমালোচক মহাশয় এটিকে সংক্ষেপে সারিবার মন্ত্রণা দিয়াছেন।

(৫) এ দৃশ্যটির মধ্যে অমৃত বাবু যে কারিকুরী দেখাইযাছেন আমাদের মক্ষিকা-প্রকৃতি বিশিষ্টসমালোচক মহাশয় ভ্রমেও তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। মীরকাশেম চরিত্র দুই একস্থল ছাড়া বঙ্কিম বাবু পুস্তকের মধ্যে ফুটাইয়া যান নাই? কিন্তু নাটককার মীরকাশেমের Historical character (ঐতিহাসিক চরিত্র) এর সার অংশ আলোচনা করিয়া সেই বাঙ্গলার শেষ নবাবকে চন্দ্রশেখরের শেষ দৃশ্যে র'জোচিত গৌরবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শেষ দৃশ্যে দরবার অভিনয় বিশেষ সফল হইয়াছে। মীরকাশেম উদয় নালার শেষ যুদ্ধে কিরূপ হঠকারিতা ও উত্তেজিত প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়াছিলেন অমৃত বাবু তাহার যথাযথ প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন। আর কিছুর জন্যে যদিও না হউক অন্ততঃ এইটুকুর জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে খাঁটি প্রশংসা পাইবার যোগ্যপাত্র। এ দৃশ্য সংক্ষেপে সারিবার মন্ত্রণা দেওয়াতে সমালোচক মহাশয় যে চন্দ্রশেখরের প্রধান একটি পরিচ্ছেদকে মাটি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা তিনি ভাবেন নাই। নাটকের বীজ অঙ্কুর ও ফল আছে। দলনী, ফষ্টর, শৈবলিনী প্রভৃতি চরিত্রে নাটকীয় বীজ এই স্থানে ফলবতী হইয়াছে।

(৬) তারপর গিরিগুহায় শৈবলিনী। কোথা হইতে শৈবলিনী কিরূপে এখানে আসিলেন—তাহার কিছুই নাই। এ দৃশ্য বোঝাই কঠিন অভিনয় ত দূরের কথা। এটী শৈবলিনীর মানসপটে নরক দর্শন। এ ব্যাপার অভিনয় করিয়া প্রদর্শন সহজ নহে-যাহা হউক যিনি শৈবলিনীর অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন তাহাকে এ অংশের অভিনয়ের জন্য প্রশংসা করি।

(৬) গিরিগুহার দৃশ্যে সমালোচক মহাশয় প্রথমে বলিতেছেন "এ দৃশ্য বোঝাই কঠিন, অভিনয় ত দূরের কথা।" কিন্তু পরে লিখিতেছেন যিনি শৈবলিনীর অংশ অভিনয় করিযাছিলেন তাঁহাকে এ অংশের অভিনয়ের জন্য প্রশংসা করি। সমালোচক যখন নিজেই সর্ব্বাপেক্ষা এই দুরূহ অংশ অভিনয়ের সুখ্যাতি শৈবলিনার অভিনয়কারিণীকে দিতেছেন তখন তাহার পূর্ব্ব অভিনীত অদুরূহ অংশ যে ভাল হয় নাই তাহা কে বিশ্বাস করিবে? দুরূহাংশের সাফল্যেই শৈবলিনী অভিনয়ের আগাগোড়া সার্থকতা প্রমাণ হইতেছে। শৈবলিনীর অভিনয় যথাযথ হইয়াছে লেখক তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াও ধরা দিতেছেন না।

(৭) তারপর তকি খাঁ ও দলনী। দলনী বিষ পান করিলেন। তারপর নবাবের শিবির। কুলসমের মুখে নবাব শুনিলেন দলনী কুলটা নহে।

(৭) দলনীর শেষ অংশের অভিনয় অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক। কিন্তু লেখক দলনী চরিত্রের মূল্য ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই।

(৮) "তারপর চন্দ্রশেখরের গৃহ। চন্দ্রশেখর রামানন্দ শৈবলিনী প্রভৃতি। চন্দ্রশেখর যোগবলে শৈবলিনীর মুখ হইতে জানিলেন সে অসতী নহে। পর দৃশ্যে নবাব শিবিরে নাট.কাল্লিখিত সকল ব্যক্তিই উপস্থিত। রামানন্দ স্বামীর যোগপ্রভাবে ফষ্টর স্বীকার করিল শৈবলিনী সতী। এ সকল দৃশ্য সংক্ষেপে সারিলে ভাল হইত। শিবিরের দৃশ্যে নবাবের সম্মুখে সহসা রামানন্দের প্রবেশ ও ফষ্টরের যোগবলে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা কহা অবিশ্বাসজনক ব্যাপার বই কিছুই নহে।"

(৮) রামানন্দের যোগবল পরীক্ষায় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে শৈবলিনীর নিজের মুখে তাহার অজ্ঞান অবস্থায় নিজ চবিত্র বর্ণন দৃশ্যটি সমালোচক মহাশয় সংক্ষেপে সারিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে যত রাত্রি বৃদ্ধি হইতেছে লেখক মহাশয় ততই অধৈর্য্য হইয়া "সংক্ষেপেণ সমাপয়েৎ" ব্যবস্থা দিতেছেন। বঙ্কিম বাবু এই অধ্যায়টী বিশদভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার মূল্যও বাড়াইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক পুস্তক নিহিত এক একটী সন্ন্যাসী বা যোগী চরিত্রের একটা যে বিশেষত্ব আছে তাহা চন্দ্রশেখর গ্রন্থের এই অধ্যায়ে বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষীভূত। রামানন্দের কার্য্যকলাপগুলির মধ্যে গুহায় শৈবলিনীর প্রথম উন্মাদ অবস্থায় তিনি যাহা করিয়াছিলেন এইটীতে তাহা শেষ হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু নিজে এই অধ্যায়ের নাম দিয়াছেন "যোগবল না Psychic force?" Psychic force এর ও Mesmerism এর উপর তাঁহার নিজের বিশ্বাস ছিল এ কথা শ্রীশ বাবুর লেখনী মুখে ও এমন কি স্বয়ং বঙ্কিম বাবুর বন্ধুদের মুখেও আমরা এ কথা শুনিয়াছি। শৈবলিনী চরিত্রের রহস্যোদ্ভেদ এই অধ্যায়েই। সীতার অগ্নি পরীক্ষার যে মূল্য শৈবলিনীর উপর রামানন্দের যোগ পরীক্ষাও তাহাই। শৈবলনার চরিত্রের এক অতি গূঢ় অংশ যাহা কথনই অন্য উপায়ে প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল না এইখানে বিকশিত হইয়া তাহাকে চন্দ্রশেখরের সমক্ষে শুদ্ধা ও সতী প্রমাণ করাইল। ইহার পর আবার নবাবের সভায় ফষ্টরের মুখে তাহার অন্য অংশ পরিস্ফুট ও প্রমাণিত হইয়া শৈবলিনীর সতীত্ব ও ম্লেচ্ছ সহবাস বিহীনতা প্রমাণ করিল। সমালোচক মহাশয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ধন্যবাদ যে তিনি এই মহামূল্য পরিচ্ছেদকে সংক্ষেপে সারিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। রামানন্দের যোগ শক্তি বলে বঙ্কিম বাবু ফষ্টরকে বাঙ্গালা কথা কহাইয়াছেন-লেথকের সন্তোষের জন্য অমৃত বাবুর উচিত ছিল এগুলির অনুবাদ করাইয়া দেওয়া। লেখক মহাশয় গো! একবার এ পরিচ্ছেদটী ভাল করিয়া মাথা ঠাণ্ডা করিয়া পড়িবেন।

(৯) "তার র পার্ব্বত্যপথে চন্দ্রশেখর ও রামানন্দ। শৈবলিনীকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইতেছেন এ দৃশ্যের অভিনয় ভাল হয় নাই। নেপথ্যে তোপ ও রণবাদ্য হইতেছে দেখাইবার জন্য অমৃত বাবু পটকা ফুটাইয়াছেন ও কনসার্টিনা বাজাইয়াছেন।"

(৯) তার পর পার্ব্বত্য পথে রামানন্দ। এক "এ দৃশ্যের অভিনয় ভাল হয় নাই" আবার তাহার উপর দ্বিতীয়

অভিযোগ—"যুদ্ধক্ষেত্রে তোপ ও রণবাদ্য হইতেছে দেখাইবার জন্য অমৃত বাবু পটকা ফুটাইয়াছেন ও কনসার্টিনা বাজাইয়াছেন।" এ অভিযোগ অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। অমৃত বাবু স্বদেশ দ্রোহী! বাঙ্গালীর যুদ্ধক্ষেত্রে পটকার ব্যবহার? মাভৈঃ মাভৈঃ রণহুঙ্কার ও রণবাদ্যের স্থলে কিনা ছেলেদের খেলাইবার কনসার্টিনা!! ছি! ছি! দমদম ও বারাকপুর ত কাছে। না হয় আলিপুরেও ত ছাউনি আছে—গোটা দুই আঠার পাউণ্ডার কামান ও ১৯ নং বেঙ্গল মিলিটারি ব্যাণ্ড আনিয়া ষ্টেজের উপর হইতে প্রকৃত যুদ্ধ ক্রীড়ার আয়োজন করিলে আমাদের এ জাতীয় কলঙ্ক ভোগ হইত না, অনির্ভিক দর্শক বৃন্দও জলন্ত গোলার আস্বাদ পাইয়া যথা সম্ভব তৃপ্তিলাভ করিতেন—ও বীর পুঙ্গব সমালোচককে তাঁহার তেজোময়ী লেখনী চালনার জন্য শত শত ধন্যবাদ দিতেন!!

(১০) "তার পর শেষ দৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত প্রতাপ ও রামানন্দস্বামী। উপন্যাসে এ দৃশ্যটী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—প্রতাপের কথা গুলি বড়ই হৃদয় গ্রাহী। কিন্তু অনেক পূর্ব্ব হইতেই দর্শকগণের নিকট এ অভিনয় নীরস বোধ হইয়াছিল। তাই তাঁহারা একবার মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য খানি দেখিয়াই রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। প্রতাপের কথা আর কেহ শুনিবার বড় অপেক্ষা করেন না। ইহাতেই নাটককারের বোঝা উচিত—তিনি চন্দ্রশেখর নাটকাকারে পরিণত করিতে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নাই। যে গ্রন্থের পাঠক পুস্তকের শেষ না পড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, যে নাটকের অভিনয়ে শেষ দৃশ্য দেখিতে দর্শকগণ ব্যগ্র না হয়েন সে পুস্তক ও সে নাটক উৎকৃষ্ট নহে এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।"

(১০) শেষ দৃশ্য। লেখকের ইহাই শেষ অভিযোগ—কাযেই কিছু গুরুতর রকমের। তাঁহার মত এই দর্শকেরা আগে হইতেই চন্দ্রশেখরের নীরস অভিনয়ে চটিয়া ছিলেন সুতরাং প্রতাপের কথা আরম্ভ না হইতে হইতেই সেই "মর্ম্মস্পর্শী" কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া বিরক্তভাবে সহসা রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিলেন। যে অভিনয়ের শেষ দৃশ্য পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিতে লোকে অপেক্ষা করে না তাহা উৎকৃষ্ট নাটক নহে। লেখক বলিতেছেন অধৈর্য্যই দর্শকগণের স্থান ত্যাগের কারণ—কিন্তু অধৈর্য্যই যদি স্থান ত্যাগের প্রধান কারণ হয় তবে কোথা হইতে প্রথম অধৈর্য্য ভাব উপস্থিত হয়? গ্যালারির দর্শকেরা পিছনে দূরে বসার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকাময় দৃশ্য ভূপতিত ও মৃত অশ্ব পৃষ্ঠ সংলগ্ন রক্তাক্ত প্রতাপকে না দেখিতে পাইয়া পিছন হইতে দাঁড়াইয়া উঠে। ইহাতেই যে গোলমাল হয় তাহা থামাইতেই play শেষ হইয়া আসে। এ দৃশ্যের অভিনয় অতি কম—বিশেষতঃ আহত ব্যক্তির অভিনয়। দর্শকের গোলমালে কাজেই অভিনয়ের সব কথা শোনা যায় না, যে সকল দর্শক ৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন তাঁহারা যে আর ৫ মিনিট ধৈর্য্যতার লাগামটা কসিয়া রাখিতে পারেন না ইহা বড়ই

আশ্চর্য্যের বিষয়। আর লেখকও ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাও সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। অধৈর্য্যতার জন্য নহে ভাল করিয়া শুনিবার ও দেখিবার অভিলাষে,—ক্লান্তির কোলাহলে নয়—পরস্পরের গোল থামাইবার চেষ্টায়—অবসাদে নয—সমস্ত বিয়োগান্ত অভিনয়ের শেষ দৃশ্যের সাধারণ ধর্ম্মে, দর্শকগণ ব্যস্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করেন। লেখক মহাশয় দর্শকের দোষও অমৃত বাবুর ঘাড়ে চাপাইতেছেন। একটি গল্প শুনিয়াছি—কোন বালকের বাজারে ক্রীত তৈল পক্ক জিনিস খাইয়া উদরাময় হইয়াছিল। বালকের পিতা যখন জানিলেন কি কারণে তাহার পুত্রের অসুখ হইয়াছে তখন তিনি সমস্ত দোষ সেই খাদ্য বিক্রেতার উপর ফেলিলেন। তাঁহার পুত্রের স্বেচ্ছায় ক্রয়ের যে দোষ তাহাও সেই হতভাগোর ঘাড়ে গিয়া পড়িল। সমালোচক মহাশয়ের এই তিরস্কার সেইরূপ ধরণের হইয়াছে। তিনি অপরের দোষও নাটককারের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন।

শেষ আমরা গুটিকয়েক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমরা যে এত কথা বলিলাম তাহা অমৃত বাবুর সমর্থনার্থে ও সাফাইয়ের জন্য নহে—ন্যায়পক্ষে বিচার করিলে যাহা দাঁড়ায়, দর্শধর্ম্মে যাহা বলিতেছে তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। সমালোচকের দায়িত্ব বড় গুরুত্বপূর্ণ। মক্ষিকাধর্ম্ম প্রকৃত সমালোচনা নহে। নিন্দা ও গুণগ্রাহিতা—ত্রুটি প্রদর্শন ও তাহার সংশোধনের সাধু চেষ্টা; ভিন্ন পথে পরিচালিত। লেখক মহাশয় নিজের ক্রিটিকত্বে আত্মভোর হইয়া যে পবিত্র দায়িত্বের অপব্যবহার করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের এ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইল।

অমৃতলাল বাবুকে তিনি যতদূর অসার ও অপদার্থ ভাবিয়াছেন তাঁহার আর্টিকেল যাঁহারা পড়েন তাঁহারা অবশ্য সেরূপ ভাবেন না। নীরবে—বাহ্বাস্ফোট না করিয়া লম্বা চেড়া গজীমাপে আর্টিকেল না লিখিয়া অপরের অজ্ঞাত ভাবে বাঙ্গালা ভাষার বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অমৃতলাল বাবু যাহা করিতেছেন তাহাতে তিনি বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র।

সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত অধিবেশনে হীরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতাপাঠের দিন অমৃত বাবু কি কি বলিয়াছিলেন সমালোচক মহাশয় কি তাহা শুনিয়াছিলেন? ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের মেমোরিয়ল—সভায় জষ্টিস গুরুদাসের সম্মুখে তিনি কি কি বলিয়াছিলেন তাহাও কি লেখক মহাশয় শুনিয়াছেন? তাঁহার প্রহসনগুলিতে তিনি কি করিতেছেন তাহা কি লেখক মহাশয় একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? লেখক মহাশয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ভবিষ্যতে তিনি যেন সমালোচনার প্রকৃত দায়িত্ব বুঝিয়া জজিয়তী করিতে আসেন। সমাপ্ত।

আয়ুর্বেদ।

ঔপসর্গিকমেহ।

অতিশয় স্ত্রীসম্ভোগ ও সঙ্কর সম্ভোগ (এক স্ত্রীতে বহুপুরুষ উপগত হইলে তাহাকে সঙ্কর সম্ভোগ বলে) দ্বারা স্ত্রীজাতির জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরভাগ ক্ষত ও প্রক্লিন্ন (ক্লেদবিশিষ্ট অর্থাৎ পাঁচাধরা) হইয়া উঠে। ঈদৃশী যোনি-সম্পন্না স্ত্রীসংসর্গে পুরুষেরও মূত্রনালীর অভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মবহা ত্বকে ক্ষত হইয়া পূযাদি নিঃসৃত হইতে থাকে। এই পীড়াকে ব্রণমেহ, ঔপসর্গিক মেহ অথবা আগন্তুক মেহ বলা হইয়া থাকে। সঙ্গম দিবসের পর সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন সময়ে এই পীড়ার সূত্রপাত হইতে দেখা যায়। ঔপসর্গিক মেহে লিঙ্গের অগ্রভাগে কণ্ডু, মুহুর্মুহু লিঙ্গের উত্থান ও মুহুর্মুহু প্রস্রাবের বেগ এবং লিঙ্গোত্থান ও প্রস্রাব করিবার সময়ে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই-রূপে ক্রমশঃ লিঙ্গস্ফীত ও রক্তবর্ণ এবং কোষ ও কুচ্‌কীতে অত্যন্ত বেদনা হয়। কখন কখন নিঃসৃত ক্লেদ পদার্থ দ্বারা প্রস্রাব দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে অতি-শয় যন্ত্রণার সহিত মূত্র নির্গত হইতে থাকে। কখনও বা প্রস্রাব ত্যাগ কালে রক্তস্রাব হয় অথবা ক্লেদ (পূয) নির্গত হয় ও ৭।৮ দিন পরে গাঢ় ক্লেদ নির্গত হয়, উহা শুকাইলে হরিদ্রা বর্ণ হয়। এই সমুদায় ক্লেদ পদার্থে রুদ্ধ হইয়া কখন বা প্রস্রাব দুইধার হইয়া নির্গত হইতে থাকে। যত কাল অতীত হইতে থাকে, ততই যন্ত্রণার লাঘব হয় বটে কিন্তু পীড়া ক্রমশঃ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। এই পীড়া হইতেও আমবাত, বাতরক্ত ও নেত্ররোগ প্রভৃতির সূচনা হইতে থাকে।

ঔপসর্গিক মেহে স্ত্রীসঙ্গম একেবারে পরিত্যজ্য, কারণ ইহা দ্বারা পীড়ার বৃদ্ধি ও উপগতা স্ত্রীরও ঐ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল ঔষধ ও অন্ন পানীয় বাতানুলোমক, ব্রণ নাশক ও মূত্র কারক, তৎসমুদয় এই পীড়ায় সেব্য এবং উগ্র ক্রিয়া বর্জ্জনীয়। বাবলার আটা জলে ভিজাইয়া উহাতে ৪ রতি যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবনে অথবা সজল কাঁচা দুগ্ধ পানে এই পীড়ার বিশেষ উপশম হয়। জাতিপত্র অথবা ত্রিফলার কাথে লিঙ্গ নিমগ্ন করিয়া রাখিলে যন্ত্রণার উপশম শীঘ্রই হয়।

অনন্তমূল ২ তোলা ৩২ তোলা জলে জ্বাল দিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া উহাতে যবক্ষার ৪ রতি ও নিশাদল ৪ রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। শ্যামালতা, অনন্তমূল, গোক্ষুর বীজ ও কট্‌কী ইহাদের কাথে শোধিত গন্ধক ২ রতি ও নিশাদল ২ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঔপসর্গিক মেহের নিবৃত্তি

হয়। মকরধ্বজ ১ রতি কাবাবচিনি চূর্ণ ৪ রতি ও মধুসহ সেবনে অথবা কেবল কাবাবচিনি চূর্ণ প্রাতে ৵০ আনা ও সন্ধ্যায় ৵০ আনা মধুসহ সেবন করিলে ঔপসর্গিক মেহে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রমেহপীড়োক্ত বৃহদ্বঙ্গেশ্বর ও সোমনাথ রস সেবনেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। মহাভ্র বটী ও কন্দর্প রস এই দুইটী ঔষধ ঔপসর্গিক মেহে বিশেষ উপযোগী। প্রমেহ পীড়া উপেক্ষিত হইলে দশ প্রকার পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে। ঐ পিড়কা সমুদায়ের নাম, লক্ষণ ও চিকিৎসা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। দশপ্রকার পিড়কা যথা—শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি।

শরাবিকা—অন্তভাগে উন্নত, মধ্যভাগে নিম্ন ও শরাবাকৃতি যে পিড়কা তাহাকে শরাবিকা বলে। ইহা সন্ধি স্থানে, মর্ম্মস্থানে ও উরু প্রভৃতি মাংসল স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কচ্ছপিকা—দাহযুক্ত ও কচ্ছপ সদৃশ আকৃতি সম্পন্ন পিড়কাকে কচ্ছপিকা বলে।

জালিনী—অতিশয় দাহযুক্ত ও মাংসজালে জড়িত পিড়কাকে জালিনী বলে।

বিনতা—পৃষ্ঠে বা উদরে উৎপন্ন নীলবর্ণ বৃহৎ পিড়কাকে বিনতা বলে। ইহাতে অতিশয় বেদনা ও অত্যন্ত ক্লেদ উৎপন্ন হয়।

অলজী—রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকব্যাপ্ত পিড়কাকে অলজী বলে। ইহা অতিশয় ক্লেশজনক ও কষ্টসাধ্য।

মসূরিকা—মসূর কলায়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট পিড়কাকে মসূরিকা বলে।

সর্ষপী—শ্বেত সর্ষপের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট পিড়কাকে সর্ষপী বলা যায়।

পুত্রিণী—অল্প স্ফোটক ব্যাপ্ত বৃহদাকার পিড়কাকে পুত্রিণী বলে।

বিদারিকা—বিদারিকা নামক পিড়কা বিদারীকন্দ অর্থাৎ ভূমি কুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন হয়।

বিদ্রধিকা—বিদ্রধিকা নামক পিড়কা বিদ্রধি অর্থাৎ ফোড়ার ন্যায় আকৃতি ও লক্ষণ বিশিষ্ট হয়।

যে মেহ যে দোষ হইতে উৎপন্ন, তাহার পিড়কাও তদ্দোষ জনিত বলিয়া স্থির করিতে হইবে। মেদোধাতুর অতিশয় বিকৃতি হইলে প্রমেহ ব্যতিরেকেও এই সকল পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে। তৃষ্ণা, কাস, মাংস পচন, মূর্চ্ছা, হিক্কা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প ও হৃদয়াবরোধ এই সমস্ত প্রমেহ পিড়কার উপদ্রব। গুহ্য, হৃদয়, মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও মর্ম্মস্থানে পিড়কা উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে তৃষ্ণাদি উপদ্রব সমস্ত প্রবল ভাবে উদিত হইলে এবং পরিপাক শক্তি ও বলের হ্রাস হইলে পিড়কাক্রান্ত রোগীর জবনাশা পরিত্যাগ করিবে।

প্রথমতঃ প্রমেহ পিড়কায় বিরেচন প্রদান করিয়া কুষ্ঠাধিকারোক্ত তৈল ঘৃতাদি বিবেচনা মতে প্রয়োগ করিবে। অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সোনামুখী, কট্‌কী, হরিতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ মিলিত ২ তোলা ৩২ তোলা

জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে ও ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান করিবে। ইহাতে প্রমেহ ও তজ্জনিত পিড়কার শান্তি হয়।

সারিবাদি লৌহ—অনন্তমূল, নীলমূল, রাস্না, গুলঞ্চ, এলাইচ, চিতামূল, মাণ, ওল, চোরকাচ্‌কী তেউড়ী, ভেলা ও হরীতকী সমুদায় সমভাগ ও সমষ্টির সমান লৌহ। একত্র মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি মাত্রায় গুলঞ্চের ক্বাথ বা শীতল জলানুপানে সেবন করিলে প্রমেহ পিড়কা, বাতরক্ত, অর্শঃ ও ত্বগ্‌গত সমস্ত পীড়ার শান্তি হয়। এই পীড়ায় মকরধ্বজ রস, বৃহৎ শ্যামাঘৃত ও শারিবাদ্যাসব প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ হিতকর।

ধাত্বাদি শোধন ও মারণ।

তাম্র।

তাম্র, ঔদুম্বর, শুল্ব, উদুম্বর, রবিপ্রিয়, ম্লেচ্ছমুখ এই সমুদায় শব্দও সূর্য্যের যাবতীয় নাম তাম্রের পর্য্যায়। যে তাম্র জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, চিক্কণ, কোমল, আঘাতসহ ও লৌহ সীসক সংমিশ্রণ বর্জ্জিত, তাহাই উৎকৃষ্ট, যাহা কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণ, রুক্ষ, অতিশয় স্বচ্ছ, লৌহাদি মিশ্রিত ও আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় তাহা নিকৃষ্ট ও অব্যবহার্য্য। অবিশোধিত তাম্র বিষ অপেক্ষাও অনিষ্টকর। বিষের এক দোষ, আর অবিশোধিত তাম্রে ভ্রম, বমি, বিরেচন, স্বেদ, উৎক্লেদ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি এই আট প্রকার দোষ বর্ত্তমান আছে। অবিশোধিত ও অজারিত তাম্র কোন মতে সেবন করা উচিত নহে।

তাম্রপত্র বারংবার উত্তপ্ত করিয়া স্বর্ণের ন্যায় তিলতৈলাদিতে তিনবার করিয়া নিমগ্ন করিবে। অনন্তর ঐ তাম্রপত্র সকল তীব্র অগ্নিতে গোমূত্রে ১ প্রহর পাক করিবে। এইরূপে বিশোধিত ও দোষ বর্জ্জিত হয়। সমভাগ পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা ঐ শোধিত তাম্রপত্র সকল লেপন করিবে। এই প্রলিপ্ত তাম্রপত্র সকল শরাবপুটে তিনবার পুট প্রদান করিলেই ভস্ম হইয়া যায়। কজ্জলীর পরিবর্ত্তে গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দিত হিঙ্গুল দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া পুট প্রদান করিলেও তাম্র ভস্ম হইয়া যায়।

তাম্রভস্মের অপর একটী সহজ উপায় এই যথা—কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করা যায় এরূপ পাতলা বিশোধিত তাম্রপত্র অথবা জরি গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দিত তাম্রাপেক্ষা দ্বিগুণ গন্ধক দ্বারা লেপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিলে ভস্ম হইয়া যায়।

জারিত তাম্র সেবনেও কোন কোন সময় বমনবেগ ও ভ্রমাদি উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এ জন্য জারিত তাম্রের অমৃতীকরণ নিতান্ত প্রয়োজন। অমৃতীকৃত তাম্রে ঐরূপ দোষোৎপাত্তির আশঙ্কা নাই। জারিত তাম্র কোন অম্লরসে পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। অনন্তর ঐ পিণ্ডটী একটী ওলের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে পূরণ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিবে ও রৌদ্রে শুকাইয়া গজপুট প্রদান করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই অমৃতী কৃত তাম্রই সেবনীয়। ইহা বিবিধ রোগনাশক।

জারিত তাম্র কষায়, মধুর, তিক্ত, অম্ল, কটুপাক, সারক, কফপিত্ত নাশক, শীতল, রোচক, লঘু, লেখন ও অল্প বৃংহণ। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু উদরী, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলরোগ প্রশমিত হয়। মাত্রা ১ রতি।

বঙ্গ।

রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু পিচ্ছট ইত্যাদি শব্দ বঙ্গের পর্য্যায়। বঙ্গ দ্বিবিধ খুরক ও মিশ্রক। মিশ্রক অপেক্ষা খুরক বঙ্গ শ্রেষ্ঠ। অবিশুদ্ধ বঙ্গ বিষোপম। অবিশোধিত বঙ্গ সেবনে আক্ষেপ, কম্প, কিলাস, গুল্ম, কুষ্ঠ, শূল, বাতশোথ, পাণ্ডু, প্রমেহ, ভগন্দর, রক্তবিকার, ক্ষয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, কফজ্বর, অশ্মরী, বিদ্রধি ও মুষ্কপীড়া প্রভৃতি উপস্থিত হয়। সীসকও অবিশুদ্ধ অবস্থায় শোধিত হইলে বঙ্গের ন্যায় অনিষ্ট উৎপাদন করে।

বঙ্গ ও সীসকের শোধন একরূপ। প্রথমতঃ উহাদিগকে অগ্নিসন্তাপে দ্রব করিয়া তিলতৈল, ঘোল, কাজি, গোমূত্র ও কুলত্থ কলায়ের ক্বাথে যথাক্রমে তিন বার করিয়া নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় দ্রব করিয়া আকন্দের আঠায় তিনবার নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে বঙ্গ ও সীসক বিশুদ্ধ হয়। বঙ্গ সীসক শোধন করিবার সময় বিশেষ সতর্ক হইয়া নিক্ষেপ করিতে হয়। নচেৎ নিষেক সময়ে ছিট্‌কাইয়া শরীরে লাগিতে পারে।

কোন দৃঢ় পাত্রে শোধিত বঙ্গ রাখিয়া অগ্নিসন্তাপ প্রদান করিবে ও ক্রমশঃ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। বঙ্গ দ্রবীভূত হইলে প্রথমে হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে, অনন্তর এক একটী চূর্ণ মিশ্রিত হইয়া গেলে অপর একটী চূর্ণ প্রদান করিবে। চূর্ণ যথা—যমানীচূর্ণ, জীরকচূর্ণ, অশ্বত্থের গলিত ছাল (চটা) চূর্ণ ও তেঁতুলছাল চূর্ণ। ক্রমশঃ চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ করিবে এবং বঙ্গ দ্রবীভূত হইলে অনবরত লৌহ-দণ্ড (খন্তী) দ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিবে। দুই প্রহর এইরূপে পাক করিলেই বঙ্গ ভস্ম হইয়া যাইবে। জারণার্থ যে সমুদায় চূর্ণের উল্লেখ করা গেল, উহাদের পরিমাণের বিশেষ নিয়ম নাই, অনুমান করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক চূর্ণ বঙ্গের সমান বা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও কার্য্য সমাধা হইতে পারে। দুই প্রহর পাকের পর বঙ্গ শীতল হইলে উহা জলে ফেলিয়া উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিবে ও কিয়ৎক্ষণ তদবস্থায় রাখিয়া পরে অল্পে অল্পে জল ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিসন্তাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই বঙ্গ ব্যাধি অনুসারে যথা-বিধি উপযুক্ত অনুপানের সহিত যথা মাত্রায় সেবনীয়।

তেঁতুলছাল, অশ্বত্থছাল, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণের সহিত তেঁতুল ও অশ্বত্থের চটাচূর্ণের সহিত অথবা যে কোন ক্ষার-বান্ পদার্থের চূর্ণের সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাক করিলে বঙ্গ ভস্ম হয়। এইরূপ মনঃশিলা বা হরিতালের সহিত পাক করিলেও বঙ্গ ভস্ম হইয়া থাকে।

জারিত বঙ্গ লঘু, সারক, রুক্ষ, ঈষৎ পিত্তকর ও চক্ষুর স্বাস্থ্য সম্পাদক। ইহা সেবন করিলে ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা পুষ্টি ও দেহের সুস্থতা লাভ হয়। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন, বঙ্গ মেহ রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার মাত্রা ৬ রতি পর্য্যন্ত।

শ্রেষ্ঠত্বনিরূপণ।

এপ্রবন্ধে চরকের সূত্রস্থান হইতে যে পদার্থ যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহাই উদ্ধৃত করিব। পাঠক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই সমুদায় বিষয় জানা থাকা আমাদের কতদূর আবশ্যক। মহামুনি চরকাচার্য্যেরও ইহাই উদ্দেশ্য যে, দোষ গুণ পরিজ্ঞাত হইয়া মনুষ্য হিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে ও অহিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবে। অদ্য বিশেষ আবশ্যকীয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম, খণ্ডান্তরে সমস্তই উদ্ধৃত করিব। একটী বিষয় অথবা একটী পদার্থ দ্বারা সাধারণের তৃপ্তিসাধন সুকঠিন। কারণ সমস্ত লোকই বিভিন্ন রুচি, কবিবর এই জন্যই বলিয়াছেন যে, "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" আমাদের একটু উদ্দেশ্য আছে, তাই এই কথাগুলি বলিতে হইল। সমীরণের ২য় বর্ষ অতীত হইতে চলিল, ইহার মধ্যে কত লোকের কতই অভিমত শুনিলাম কেহ বলেন সংস্কৃত মূল ভাল লাগে না এবং মূল উদ্ধৃত করার প্রয়োজনীয় তাও কিছু দেখা যায় না। আবার যিনি মূলের মধুরাস্বাদ আস্বাদনে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি পরমপ্রীতি সহকারে বলিতেছেন, মূল নিবদ্ধ হওয়াতে সমীরণ অতীব সুন্দর ও প্রয়োজনীয় পুস্তক হইতেছে। সমীরণের ন্যায় সদুদ্দেশ্য হৃদয়ে ধরিয়া এপর্য্যন্ত কোন পত্রিকাই জন্মগ্রহণ করে নাই।

কেহ বলিতেছেন, সমীরণ কেবলমাত্র বিফল আড়ম্বরে পুষ্ট কলেবর নহে, অত্যাবশ্যকীয় আয়ুর্ব্বেদোদ্ধৃত সৎপ্রবন্ধেই পূর্ণ। আবার পণ্ডিতম্মন্য কোন কোন্ মহাত্মা বলিতেছেন সমীরণে নূতনত্ব কিছুই নাই, সমস্তই পুরাতন। বোধ হয় এই শেষোক্ত পাঠক সমীরণের প্রস্তাবনা পাঠ করেন নাই সুতরাং উদ্দেশ্য ও বুঝিতে পারেন নাই, অতএব এ পাঠকের অভিমত আমাদের কিরূপ অনুমত, পাঠকগণই বুঝিয়া লইবেন।

"অবিজ্ঞাত প্রবন্ধস্য বচো বাচস্পাতে রপি।
ব্রজত্যফলতা সেবনযস্ত্রহ ইবে ছিতম্॥"

আবার বলিতেছেন সবই সুন্দর বটে, কিন্তু চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি প্রথমেই সন্নিবেশিত করা উচিত ছিল। পাঠক! বুঝিলেন ত ইহার উদ্দেশ্য। একটী কথা মনে হইল—বড় "উঁকি ঝুঁকি" কোন এক দোষৈক দৃক্ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আসিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইলেন, রাজা পরম্পর অতিথির স্বভাব শ্রুত হইয়া ভৃত্যাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহার আহারাদি করাইতে অনুমতি করিলেন। কার্য্যতঃ তাহাই হইল কিন্তু আহারকালে অতিথির গুণ শুনিয়া কৌতূহলাবহ হইয়া কে যেন খড়্‌খড়ি খুলিয়া অতিথিকে একটু দেখিয়াছিল। অতিথি অনুসন্ধান করিয়া অন্য দোষ পাইলেন না, কিন্তু রাজা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন হাঁ মহারাজ পরম পরিতোষ সহকারে আহার করিয়াছি কিন্তু বড় "উঁকি ঝুঁকি"। আমাদের অনুরোধ, পাঠকগণ যেন এই শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ প্রস্তাবেই অন্যান্য বস্তুর ন্যায় উল্লিখিত সমালোকেরও শ্রেষ্ঠত্বনিরূপণ করিয়া লন।

আমরা যে স্থানের মূল সংস্কৃত সুললিত সুগম মনে করিব, সেই স্থানেই সংস্কৃত উদ্ধৃত করিব। বোধ হয় ইহা সহৃদয় ব্যক্তির বিরক্তিজনক হইবে না।

গুরু ভোজনং দুর্ব্বিপাকানাং, একভোজনং সুখপরিণামকরাণাং, স্ত্রীপ্রসঙ্গঃ শোষহরাণাং, শুক্রবেগ নিগ্রহঃ ষাণ্ডাকরাণাং পরায়তন মন্না শ্রদ্ধাজননানাং, অনশন মায়ুষো হ্রাসকরাণাং, প্রমিতাশনং কর্শণীয়ানাং, অজীর্ণাধ্যশনং গ্রহণী দূষণীয়ানাং, বিষমাশনমগ্নিবৈষম্যকরাণাং, বিরুদ্ধ বীর্য্যাশনং নিন্দিত ব্যাধিকরাণাং প্রশমঃ পথ্যানাং, আয়াসঃ সর্ব্বাপথ্যানাং, মিথ্যাযোগো ব্যাধি-মুখানাং, রজস্বলাভিগমন মলক্ষ্মীমুখানাং, ব্রহ্মচর্য্য মায়ুষ্য করাণাম্।

গুরু ভোজনই দুষ্পরিপাকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুচারুরূপে পরিপাক হওয়ার পক্ষে একাহার, শরীরের শুষ্কতা সম্পাদকের মধ্যে স্ত্রীসংসর্গ, পুরুষত্ব শক্তি বিনাশক পদার্থের মধ্যে সমুপস্থিত শুক্র বেগরোধ, পরগৃহ (পরগৃহ নিজের মনোমত হয় না) অন্নে অশ্রদ্ধা জনকের মধ্যে, আয়ুনাশক কার্য্যের মধ্যে উপবাস, কৃশতা জনকের মধ্যে অল্প ভোজন, গ্রহণীরোগ উৎপাদনের মধ্যে পূর্ব্বকৃত আহার জীর্ণ না হইতে পুনরায় ভোজন, পাচকাগ্নির হ্রাস বৃদ্ধি জনকের মধ্যে বিষমাশন, (সময়ের বৈষম্য ও মাত্রার বৈষম্য) নিন্দিত অর্থাৎ কুষ্ঠাদি ব্যাধি জনকের মধ্যে ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধবীর্য্য পদার্থের একত্র ভোজন, হিতজনকের মধ্যে শান্তি অবলম্বন, অহিত জনকের মধ্যে আয়াস অর্থাৎ পরিশ্রম, সর্ব্বপ্রকার পীড়া জনকের মধ্যে আহার বিহারাদির মিথ্যা যোগ, অলক্ষ্মী জনকের মধ্যে রজস্বলা স্ত্রীগমন এবং আয়ুর্ব্বর্দ্ধক উপায় সমুদায়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সঙ্কল্পো বৃষ্যাণাং, দৌর্ম্মনস্যমবৃষ্যাণাং, অযথা বলমারম্ভঃ প্রাণোপরোধিনাং বিষাদো রোগবর্দ্ধনানাং স্নানং শ্রমহরাণাং, হর্ষঃ প্রীণনানাং শোকঃ শোষণানাং, নির্বৃতিঃ পুষ্টিকরাণাং, পুষ্টিঃ স্বপ্ন করাণাং, স্বপ্নতন্দ্রাকরাণাং, সর্ব্বরসাভ্যাসো বলকরাণাং, এক রসাভ্যাসো দৌর্ব্বল্যকরাণাং, গর্ভশল্য মহার্য্যাণাং, বালো মৃদু ভেষজনীয়ানাং বৃদ্ধো যাপ্যানাং, গর্ভিণী তীক্ষ্ণৌষধ ব্যায়াম বর্জ্জনীয়ানাং, সৌমনস্যং গর্ভধারকাণাং, সন্নিপাতো দুশ্চিকিৎস্যানাং আমো বিষম চিকিৎস্যানাম্।

বৃষ্য জনকের মধ্যে মানসিক সঙ্কল্প অর্থাৎ ইচ্ছাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শারীরিক তেজঃ নাশকের মধ্যে মনের উৎকণ্ঠা, স্বীয় শক্তিতে যাহা সম্পন্ন না হয়, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বলনাশকের মধ্যে, রোগ বর্দ্ধকের মধ্যে মনের অপ্রীতি, পরিশ্রম নাশকের মধ্যে স্নান, প্রীণন অর্থাৎ হর্ষজনক পদার্থের মধ্যে মনের সন্তোষ, শরীরের শোষণ কারকের মধ্যে শোক, পুষ্টিকারকের মধ্যে নির্ব্বৃত্তি, নিদ্রাকারকের মধ্যে পুষ্টি, তন্দ্রাজনকের মধ্যে নিদ্রা, বলকরের মধ্যে সকল রসের সেবন, দৌর্ব্বল্য জনকের মধ্যে নিয়ত একরস সেবন, অহার্য্য অর্থাৎ দুরাকর্ষণীয়ের মধ্যে গর্ভশল্য, বমন যোগ্য পদার্থের মধ্যে উদরস্থ অজীর্ণ দ্রব্য, মৃদু ঔষধ প্রয়োগযোগ্যের মধ্যে বালক, যাপ্য রোগের মধ্যে বৃদ্ধাবস্থার রোগ, উগ্র ঔষধ, ব্যায়াম ও ব্যাবায় যাহাদের বিধেয় নহে, তাহাদের মধ্যে গর্ভিণী, মনের সুস্থতা গর্ভধারণকারণের মধ্যে, দুশ্চিকিৎস্য রোগের মধ্যে সন্নিপাত ও বিষম চিকিৎস্য রোগের মধ্যে আম অর্থাৎ অপক্ক রস সম্ভূত রোগ সর্ব্বপ্রধান।

গুল্মনিদান।

হৃন্নাভ্যো রন্তরে গ্রন্থিঃ সঞ্চারী যদি বা চলঃ।
বৃত্তশ্চয়াপচয়বান্ স গুল্ম ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

হৃদয় এবং নাভীর মধ্যে সঞ্চরণশীল অথবা নিশ্চল হ্রাস বৃদ্ধি বিশিষ্ট বর্ত্তুলাকার গ্রন্থির নাম গুল্ম। গুল্ম রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে উদ্গার উঠে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, আহারে অনভিলাষ, দুর্ব্বলতা, অন্ত্রকুজন অর্থাৎ আঁতডাকা, পেটের ভিতর গুড় গুড় শব্দ, উদরের স্ফীততা ও অগ্নিমান্দ্য এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। আর প্রায়শঃ সমস্ত গুল্মেই অরুচি, অতি কষ্টে বাত মূত্র ও মলত্যাগ, অন্ত্রকুজন, আনাহ ও বায়ুর প্রতিলোম ভাব উপস্থিত হয়।

যদা পুরুষো বাতলো বিশেষেণ জ্বর বমন বিরেচনাতীসারাদ্যাময়তমেন কর্শনেন কর্শিতো বাতল মাহার আহরতি, শীতম্বা বিশেষেনাতিমাত্র মস্নেহপূর্ব্বং বা বমনবিরেচনে পিবত্যনুদীর্ণান বাতমূত্র পুরীষবেগান্ নিগৃহ্ণাত্যশিতো বা পিবতি নবোদকমতিমাত্রমতিসংক্ষোভিনা বা যানেন যাত্যভিবাবায় ব্যায়াম মদ্যাকচির্ম্মা ভিঘাতমিচ্ছতি বা বিষমাশনশয়নস্থান চংক্রমণসেবী বা ভবত্যন্যদ্বা কিঞ্চিদেবং বিধং বিষমতিমাত্রং ব্যায়ামজাত মারভতে, তস্যাপচারাদ্ বাতঃ প্রকোপ মাপদ্যতে।

বাতপ্রকৃতিক পুরুষ জ্বর, বমন, বিরেচন ও অতিসার প্রভৃতি কোন রোগ অথবা কোন কর্ষণ ঔষধ দ্বারা কর্ষিত (কৃশ) হইয়া যদি বাতল অর্থাৎ বায়ুর প্রকোপজনক বস্তু অথবা শীতল পান আহার সেবন করে কিম্বা নিঃস্নেহ বমন বিরেচন, বমন বেগ সম্যক্ উপস্থিত না হইলেও বমন চেষ্টা অথবা সমুদীর্ণ বাত মূত্র ও পুরীষাদির বেগনিরোধ, ভোজন করিয়া পরিতৃপ্তরূপে নূতন জল পান, এবং অশ্বাদি দ্রুত যানারোহণ, অত্যন্ত স্ত্রী-সংসর্গ, সমধিক পরিশ্রম, মদ্যপানে অত্যাশক্তি, কোনরূপ আঘাত প্রাপ্তি, বিপরীত ভাবে শয়ন বা উপবেশন, অতিশয় ভ্রমণ এবং অন্যান্য এইরূপ বাত-প্রকোপজনক কর্ম্ম অথবা বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করে, তবে ঐ ব্যক্তির বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয়।

স প্রকুপিতো মহাস্রোতোঽনুপ্রবিশ্য রৌক্ষ্যাৎ কঠিনীকৃত্যাপ্লুত্য পিণ্ডতোঽবস্থানং করোতি। হৃদি বস্তৌ পার্শ্বয়োর্নাভ্যাং বা স শূল মুপজনয়তি। স বাত জন্যানেকবিধান্ বেদনাবিশেষান জনয়তি, গম্ভীরশ্চানেকবিধান পিণ্ডিত শ্চাবতিষ্ঠতে, স পিণ্ডিতত্বাদ গুল্ম ইত্যুপ চর্য্যতে।

উল্লিখিত কারণে কুপিত বায়ু প্রধান ধমনী সমূহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় রুক্ষত্ব হেতু কঠিনীভূত ও সমস্ত শরীরকে আক্রমণ করতঃ হৃদয়ে, বস্তিদেশে, উভয় পার্শ্বে অথবা নাভিমূলে পিণ্ডাকার অবস্থান করে এবং বাত জন্য নানাবিধ বেদনা জন্মায়। ঐ পিণ্ডিত বায়ু হস্তাদি দ্বারা স্পর্শ করিলে গ্রন্থির ন্যায় অনুভূত হয় এবং পিণ্ডিত অর্থাৎ একটী জড়িত পদার্থের ন্যায় বলিয়া ইহার গুল্ম নাম প্রদত্ত হইয়াছে। বাস্তবিক গুল্মের (ঝোপ) সহিত সাদৃশ্য আছে, এজন্যই ইহার নাম গুল্ম হইয়াছে। মাধবকর স্বীয় নিদান গ্রন্থেও ইহাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন যথা—

দুষ্টা বাতাদয়োঽত্যর্থং মিথ্যাহারবিহারতঃ।
কুর্ব্বন্তি পঞ্চধা গুল্মং কোষ্ঠান্তগ্র স্থিরূপিণম্॥

অনুচিত আহার বিহারাদি দ্বারা বাতাদিদোষ অত্যর্থ কুপিত হইয়া কোষ্ঠ মধ্যে গ্রন্থিরূপ গুল্ম রোগ উৎপাদন

করে। পার্শ্বদ্বয়, হৃদয়, নাভি ও বস্তি এই পাঁচটী ইহার অবস্থিতি স্থান এবং গুল্ম পঞ্চবিধ।

স মুহুরাদধাতি মুহুরল্লত্ব মাপদ্যতে অনিয়ত বেদনাচঞ্চলত্বাদ্বায়োঃ পিপীলিকা সংপ্রকীর্ণ ইব। তোদস্ফুরণায়ামসঙ্কোচ হর্ষ প্রলয়োদয় বহুল স্তদাতুরঃ সূচোব শংকুনেব চাভিবিদ্ধ মাত্মানং মন্যতেঽপি চ দিবসান্তে জ্বরাতে শুষ্যতি চাস্যাপ্যুচ্ছ্বাসশ্চোপরুধ্যতে হৃষ্যন্তি রোমাণি বেদনায়াঃ প্রাদুর্ভাবে প্লীহাটোপান্ত্রকূজ বিপাকো দাবর্ত্তাঙ্গমর্দ্দমন্যাশিরঃশঙ্খশূলব্রগ্নরোগাশ্চৈন মুপ-দ্রবন্তি কৃষ্ণারুণপরুষত্বঙনখ নয়ন বদন মূত্র পুরীষশ্চ ভবতি নিদানোক্তানি চাস্যনোপশেরতে বিপরীতানি চোপশেরতে ইতি বাত গুল্মং।

বাতগুল্মে কখন অল্প বেদনা কখনও বা অধিক বেদনা এবং সঞ্চরণশীল স্বপাকার পিপীলিকার ন্যায় গুল্ম কখন বৃহদাকার কখনও বা অল্পাকার উপলব্ধি হয়, কারণ বায়ু চঞ্চলগতি। গুল্ম রোগ উপস্থিত হইলে রোগী সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা, স্ফুরণ, (জিলিক দেওয়া) বিস্তার, সংকোচ, লোমহর্ষ ও পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা অতিশয় পীড়িত হয়। বাতগুল্মরোগাক্রান্ত ব্যক্তি মনে করে যেন তাহাকে কেহ সূচি দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে, কখনও বা মনে করে যে, শঙ্কু দ্বারা তাহাকে কেহ আঘাত করিতেছে। দিবসের অবসানে অর্থাৎ শেষভাগে রোগীর জ্বর হয় ও মুখ শুষ্ক হইয়া যায়, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ করে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, উদরে গুড় গুড় শব্দ অথবা অন্ত্রকূজন, ভুক্ত বস্তুর অপরিপাক, মলমূত্রের আবদ্ধতা ও অঙ্গমর্দ্দ (হাত পা কামড়ান) প্রভৃতি উপস্থিত হয় এবং মন্যা (ঘাড়ের শিরা) মস্তক ও শঙ্খ অর্থাৎ কপালের দুই পার্শ্বে বেদনা উপস্থিত হয়। গুল্ম রোগে ব্রগ্ন বা কুঁচকিতে বেদনা জন্মিতে পারে। চর্ম্ম, নখ, নয়ন, আনন, মূত্র ও পুরীষাদি কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ এবং ইহাদিগের পরুষতা অর্থাৎ অস্নিগ্ধ খরখরে ভাব লক্ষিত হয়। যে সমুদায় বাত গুল্মের নিদান উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের উপসেবনে বৃদ্ধি এবং তদ্বিপরীত দ্রব্য সেবনে উপকার অর্থাৎ পীড়ার হ্রাস হয়।

গুল্মরোগে বায়ুর ক্রিয়াই বলবতী বটে, কিন্তু পিত্ত শ্লেষ্মারও ইহাতে বিশেষ আনুগত্য আছে। এইরূপে গুল্ম পঞ্চবিধ। বাতিক গুল্মের বিষয় বলা হইল, অপর পিত্তগুল্ম, শ্লেষ্মগুল্ম, সান্নিপাতিক ও রক্তগুল্মের বিষয় ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

কটু, অম্ল, বিদাহি (দহিজনক, লঙ্কা প্রভৃতি) তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও রুক্ষ বস্তু সেবন, ক্রোধ, অতিশয় মদ্যপান, রৌদ্র কিম্বা সূর্য্য সন্তাপ, বিদগ্ধাজীর্ণ-জনিত দুষ্ট রসোৎপত্তি ও রক্ত দুষ্টি এই সমস্ত পিত্ত গুল্মের নিদান। পৈত্তিক গুল্ম জন্মিলে পিপাসা, জ্বর, মুখাদি অবয়বের রক্তবর্ণতা, আহারের পরিপাক কালে গুল্মে অতিশয় বেদনা, ঘর্ম্মের অনির্গম ও শরীরে বিদাহ ইত্যাদি উপদ্রবে রোগী পীড়িত হয়। পৈত্তিক গুল্মে অতিশয় বেদনা উপস্থিত হয়, স্পর্শ করিতেও রোগী বিশেষ ক্লেশ বোধ করে। প্রকুপিত পিত্ত এবং বায়ু আমাশয়ের কোন এক স্থানে অবস্থান করিয়া বাতগুল্মের ন্যায় এই পিত্তগুল্মেও নানাবিধ বেদনা জন্মায়।

গুরু, স্নিগ্ধ ও শীতল দ্রব্যের নিয়ত সেবন, অধিক পরিমাণে ভোজন, ইক্ষু,

ক্ষীর, মাষকলাই, তৈল এবং গুড়জাত দ্রব্য সেবন, ও সর্ব্বদা পিষ্টক ভক্ষণ, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, পরিতৃপ্তরূপে আহার করিয়া জলপান অথবা ভোজন করিয়া নিদ্রা কিম্বা পথ পর্য্যটন দ্বারা শরীরস্থ শ্লেষ্মা বায়ুর সহিত প্রকুপিত হয়।

উল্লিখিত কোন কারণে প্রকুপিত শ্লেষ্মা বায়ু কর্ত্তৃক আমাশয়ের কোন এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া কফগুল্ম উৎপাদন করে। বাতগুল্মের ন্যায় এই কফগুল্মেও নানাবিধ বেদনা উপস্থিত হয়। কফজনিত গুল্মের হ্রাস বৃদ্ধি নাই এবং ইহা স্থির ও কঠিন। কফগুল্ম প্রবৃদ্ধ হইলে কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় ও রাজযক্ষ্মার উৎপত্তি হইতে পারে। ইহাতে চর্ম্ম, নখ, নয়ন, মুখ ও মল মূত্রাদি শীতল ও শ্বেতবর্ণ হয়।

এই তিন প্রকার গুল্মের নিদান ও লক্ষণ মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক গুল্ম বলা যায়, ইহা অসাধ্য সুতরাং অচিকিৎস্য। সান্নিপাতিক গুল্ম অত্যন্ত বেদনা ও দাহযুক্ত এবং প্রস্তরবৎ কঠিন ও উন্নত। ইহা শীঘ্রবিদাহী, ভয়ঙ্কর ক্লেশদায়ক এবং মন, শরীর ও অগ্নিবলনাশক।

সচরাচর এই চারিপ্রকার গুল্ম সকলেরই হইতে পারে কিন্তু রক্তগুল্ম স্ত্রীলোকদিগেরই হয়।

শোণিতগুল্মস্তু খলু স্ত্রিয়া এব ভবতি। ন পুরুষস্য, গর্ভ কোষ্ঠার্ত্তবাগমনবৈশেষ্যাৎ।

রক্তগুল্ম স্ত্রীলোকেরই হইতে পারে, পুরুষের পারে না, কারণ স্ত্রী ভিন্ন পুরুষের গর্ভাশয়ে ঋতুশোণিতের আগমন অসম্ভব।

পারতন্ত্র্যাদবৈশারদ্যাৎ সততমুপচারানুরোধাদ্‌-বেগানুদীর্ণানুপরুন্ধত্যা আমগর্ভে বা প্যচিরাৎ পতিতে তথাপ্যচিবপ্রজাতায়া ঋতৌ বা বাতপ্রকোপনান্যাসেবমানায়া বাতঃ প্রকোপ মাপদ্যতে।

পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাধীনতা হেতু, অশিক্ষিতত্ব হেতু, এবং সতত শুশ্রূষা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা হেতু স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপ বেগ রোধ এবং অপরিণত গর্ভস্রাবান্তে, প্রসবান্তে বা ঋতুকালে অহিত জনক আহার বিহার করিলে বায়ু কুপিত হয়।

স প্রকুপিতো যোন্যামুখমনুপ্রবিশ্যার্ত্তবমুপরুণদ্ধি, মাসি মাসি তদার্ত্তবমুপরুধ্যমানং কুক্ষিমভিবর্দ্ধযতি।

পূর্ব্বোক্ত কারণে কুপিত বায়ু যোনিমুখে অবস্থান করিয়া ঋতু শোণিতকে রোধ করে। এই আর্ত্তব এইরূপে মাসে মাসে গর্ভাশয়ে সঞ্চিত হইয়া উদরকে স্ফীত করে। রক্ত গুল্মে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ থাকে এবং পিত্ত জনিত গুল্মের তাবৎ লক্ষণই উপস্থিত হয়। এবং সমস্ত গর্ভ লক্ষণ অর্থাৎ ঋতু শোণিত রোধ, মুখ পীতবর্ণ, স্তনাগ্র কৃষ্ণবর্ণ ও নূতন নূতন বস্তু সেবনে অভিলাষ ইত্যাদি উপস্থিত হয়, কেবল প্রভেদ এই যে, গর্ভ—হস্ত-পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত নিরন্তর স্পন্দিত হয়, আর রক্তগুল্ম অঙ্গপ্রত্যাভাবে কেবলমাত্র পিণ্ডটীই দীর্ঘকালান্তে যাতনার সহিত স্পন্দিত হইয়া থাকে। অল্প মাত্র প্রভেদে নিশ্চয় করা সুকঠিন সুতরাং ঋতু রোধের পর দশম মাস অতীত হইলেই চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অন্যান্য পীড়া পুরাতন

হইলে কষ্টসাধ্য হয় কিন্তু রক্তগুল্ম দশম মাস অতীত হইলেই সুখসাধ্য হয়। পণ্ডিতগণ এই জন্যই বলিয়াছেন যে—

"মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ "

এই বচনটীতে এরূপ মীমাংসা করা অন্যায় যে, পণ্ডিতগণ গর্ভ ও গুল্মের প্রভেদ করিতে অক্ষম হইয়াই উক্ত বচনটীর অবতারণা করিয়াছেন। বাস্তবিক দশম মাস অতীত হইলেই রক্তগুল্ম সুখসাধ্য হয়।

গুল্ম ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া সর্ব্বোদর ব্যাপী, রস রক্তাদি ধাত্বাশ্রয়ী, শিরাব্যাপ্ত ও কূর্ম্মবৎ উন্নত হইলে, এবং রোগী দৌর্ব্বল্য, অরুচি, বমনবেগ, কাস, বমি, অসুস্থ চিত্ততা, জ্বর, তৃষ্ণা, তন্দ্রা ও প্রতিশ্যায়াদি দ্বারা আক্রান্ত হইলে রোগ অসাধ্য জানিবে। গুল্ম রোগীর হৃদয়, নাভি, হস্ত ও পদে শোথ এবং জ্বর, শ্বাস, বমি ও অতিসার উপস্থিত হইলে অথবা শ্বাস, শূল, পিপাসা, অরুচি, অকস্মাৎ গুল্মের বিলয় এবং দৌর্ব্বল্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তবে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

ভৈষজ্য বিজ্ঞান।

আটরূষক নির্য্যূহে প্রিয়ঙ্গু মৃত্তিকাঞ্জনে।
বিনীয় লোধ্রং সক্ষৌদ্রং রক্তপিত্তহরং পিবেৎ॥

পুটপাক দ্বারা গৃহীত বাসকপত্র রসে প্রিয়ঙ্গু চূর্ণ ।৷০ তোলা, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ।৷০ তোলা (সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা অভাবে পঙ্কপর্পটী) রসাঞ্জন ।৷০ তোলা ও লোধ্রচূর্ণ ।৷০ তোলা এবং ২ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত নিশ্চয় নিবৃত্ত হয়। বাসকপত্রের রস পাতাল যন্ত্র দ্বারা গ্রহণ করিবে। অপর উপায় দ্বারা গ্রহণ করিলেও চলিতে পারে; যথা— ২ তোলা রস পাওয়া যায়, এই পরিমাণ বাসকপত্র অল্প কুট্টিত ও কচি কলার পাতা দিয়া বেষ্টন করিয়া উপরে পুরু করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিবে ও আগুনে ঝল্‌সাইয়া শিশিরে রাখিয়া পরদিন রস ['হণ করিবে।

রক্তপিত্ত রোগে অতিশয় রক্ত বমন হইতেছে, এরূপ অবস্থায় পাকা যজ্ঞডুমুর ফলের রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি মিশ্রিত করিযা পান করিলে অতি সত্বর রক্ত বমন নিবারণ হয়।

মাখন ১ তোলা ও কৃষ্ণতিল ১ তোলা (খোসা ছাড়ান) সেবন অভ্যাস করিলে অতি দুর্ব্বার অর্শরোগ প্রশমিত হয়। যে অর্শে রক্তস্রাব হয়, সেইরূপ অর্শেই ব্যবহাব করা উচিত। মাখন, পদ্মকেশর, চিনি ও ঘোল একত্র সেবন করিলে অর্শের রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়। জীরক চূর্ণ ও ঘোল কিঞ্চিৎ বিটলবণের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, রক্তস্রুতি নিবারণ হয়, পাচকাগ্নির বৃদ্ধি ও সমস্ত অর্শ নিবারিত হয়।

বরাক্রান্তা, নীলোৎপল, মোচরস, লোধ, কৃষ্ণতিল ও রক্তচন্দন সমষ্টিতে ২ তোলা পরিষ্কার করিয়া শিলায় পেষণ করিবে ও ছাগদুগ্ধ সহ আলোড়ন করিয়া সেবন করিলে অর্শ হইতে রক্তস্রুতি নিবারিত হয়।

অনেক সময় মাতার দোষে শিশু সন্তানকে কষ্ট পাইতে হয়। মাতার স্তন্যদোষে শিশুর জ্বর, সর্দ্দি, কাসি ও অতিসারাদি কষ্টদায়ক পীড়া উপস্থিত

হইয়া থাকে। স্তন্যদোষই পীড়ার কারণ হইলে নিম্নলিখিত যোগটী স্তন্যপায়ী শিশুর মাতাকে সেবন করাইবে; ইহা সেবনে মাতার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয় ও স্তন্যদুগ্ধ বিশোধিত হয় সুতরাং শিশুর জ্বর অতিসারাদি পীড়া সত্বর আরোগ্য হয়। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, চাকুলে (পিঠানী) ও ইন্দ্রযব সমষ্টিতে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। ইহার নাম হরিদ্রাদিক্কাথ।

মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাকড়াশৃঙ্গী উত্তম চূর্ণ ও সমভাগ মিশ্রিত করিয়া এক বা দেড় আনা মাত্রায় মধু দ্বারা মাড়িয়া শিশুকে অবলেহন করাইলে জ্বরাতিসার, কাস, শ্বাস, বমন ও দুধতোলা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। বালকদিগের পক্ষে এই যোগটী অব্যর্থ ও প্রসিদ্ধ। ইহার নাম বাল চতুর্ভদ্রিকা।

যে শিশু দুগ্ধ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করে, তাহাকে বৃহতী ফল ও কণ্টকারী ফলের রস ৵০ বা ৶০ আনা মধু সহ সেবন করাইবে অথবা পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, চিতা ও চৈ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ৵০ বা ৵১০ আনা মাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করাইলে শিশুর বমন অর্থাৎ দুধতোলা নিবারণ হয়।

দ্রাক্ষা বা কিস্‌মিস্‌, হরিতকী ও পিপ্পলী সমভাগে পেষণ করিয়া ৶০ আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধুসহ লেহন করাইলে বালকের কাস ও শ্বাস প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

অনেকগুলি লোকের সংস্কার আছে যে, মসূরিকা অর্থাৎ বসন্ত রোগ উপস্থিত হইলে কোন চিকিৎসাই কর্ত্তব্য নহে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, বসন্ত-চিকিৎসক ব্যতীত অপর কোন চিকিৎসক বসন্ত চিকিৎসা করিতে জানেন না। ফলতঃ এ দুইটী সংস্কারই ভ্রমাত্মক। যে শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বন করিয়া অপরাপর বহুবিধ রোগের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতেছে, সেই শাস্ত্রেই যখন বসন্ত রোগের চিকিৎসা সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন শাস্ত্রযুক্তি অবলম্বন করিয়া বসন্তের চিকিৎসা করিলে ফললাভে বঞ্চিত হইবার কিছুমাত্র কারণ পরিলক্ষিত হয় না। কেহ মনে করিতে পারেন বিনা কারণে লোকের মনে এরূপ সংস্কার কেন বদ্ধমূল হইল? বিশেষ কারণ নিশ্চয় না হইলেও, সহজে এইটী অনুমান হয় যে, বসন্ত বড়ই সংক্রামক রোগ, পরন্তু মারাত্মক। এই দুইটী কারণে চিকিৎসকদিগের মধ্যে অনেকেই সহজে ইহার চিকিৎসা করিতে সম্মত নহেন। পূর্ব্বে যদিও দুই একটী চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে হইত, কিন্তু ক্রমশঃ এখন উহা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। চিকিৎসকের বসন্ত চিকিৎসা করিতে বিশেষ আগ্রহ হয় না, রোগী বা তাহার অভিভাবকদিগের সুতরাং এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে; আবার বিশেষ ফলদায়ক ঔষধ আছে বলিয়াও অনেকের ধারণা নাই। সকল রোগেরই সাধ্যাসাধ্যতা আছে, তদ্রূপ বসন্তের মধ্যেও যাহা অসাধ্য, তাহা কিছুতেই আরোগ্য হয় না। ফলতঃ ঔষধে উপকার হয় না, এরূপ স্বীকার করা যায় না। এ সময়ে চতুর্দ্দিকেই বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে সুতরাং আমরা এবারে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে বসন্ত

রোগের বিশেষ ফলদায়ক দুই একটী সহজ সহজ প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছি, আশা করি ইহা দ্বারা অবশ্যই উপকার লাভ হইবে।

গাত্রবেদনা, নাভিদেশে ভারবোধ, অত্যন্ত শিরোবেদনা এবং মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে সেই জ্বরে রোমান্তী (হাম) বা মসূরিকা (বসন্ত) প্রকাশ পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই অবস্থার জ্বর অধিকদিন স্থায়ী হয় না। সচরাচর চারিদিনেই ছাড়িয়া যায়। হাম বা বসন্ত প্রকাশ হইলে প্রায় তিন দিনেই হয়। চিকিৎসকের উল্লিখিত লক্ষণগুলির দিকে প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখা উচিত। উহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলে, জ্বরঘ্ন কোন ঔষধ প্রদান করা বিধেয় নহে। যাহাতে সামান্যরূপ বমন বা বিরেচন হয় এরূপ ঔষধ প্রদান করাই উচিত। সর্ব্বদা রোগীর গৃহ ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখিবে। চন্দন, ধূনা ও কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা রোগীর গৃহে ধূম প্রদান করিবে।

১। বাসকছাল, পটোলপত্র, গুলঞ্চ, দুরালভা, চিরতা, ধনে, নিমছাল, কট্‌কী ও ক্ষেতপাপড়া সমানাংশে মিলিত ২ তোলা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া শীতল হইলে পান করিবে। ইহাতে অপক্ক বসন্ত পাকিয়া উঠে ও পক্ক বসন্ত সমুদায় শুকাইয়া যায় এবং সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়।

২। নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পটোলপত্র, কট্‌কী, বাসকছাল, দুরালভা, আমলা, বেণারমূল, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন সমুদায় মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। এই কাথে ॥০ তোলা ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সমস্ত প্রকার বসন্ত, জ্বর ও বিসর্প প্রভৃতি আরোগ্য হয়। যে বসন্ত ভালরূপে শরীরে প্রকাশ হয় নাই, ইহা সেবনে তাহাও প্রকাশ হইয়া যন্ত্রণার লাঘব করে।

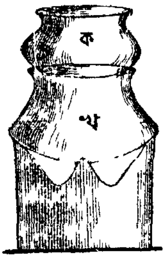
রুদ্রাক্ষচূর্ণ ৵০ আনা ও মরিচচূর্ণ ৵০ আনা একত্র বাসি জলের সহিত ২।৩ দিন সেবন করিলে বসন্ত আরোগ্য হয়। শরীরে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে নিম্বপত্র, তেলাকুচাপত্র ও বদরী (কুল) পত্র জলে আলোড়ন করিয়া তাহার ফেন প্রদান করিবে। বসন্তের মুখ ক্ষত হইয়া গেলে হরিদ্রাচূর্ণ ও মাখন অথবা কেবলমাত্র মাখন লেপন করিলে ক্ষত আরোগ্য হয়; পরন্তু বসন্তের চিহ্নগুলিও শরীরে মিলাইয়া যায়, মুখ কিম্বা অপর কোন স্থানে চিহ্ন থাকে না। মধু প্রক্ষেপ দিয়া বাসি জল পান করিলে বসন্তের দাহ আরোগ্য হয়।

অশ্বত্থ, বট, বকুল, যজ্ঞডুমুর ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ ক্ষতস্থানে ছড়াইয়া দিলে বসন্তের ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়। কেহ কেহ বলেন, পানিবসন্ত বাহির হইলে তেলাকুচা, থুলকুড়ি, বাসক, বুড়িগোপান, বাবুইতুলসী, কুড়, ক্ষেতপাপড়া ও মুতা ইহাদের কাথ পান করিলে ৩।৪ দিনের মধ্যে সমস্ত বসন্ত বাহির হয়, জ্বর বিচ্ছেদ হয় এবং সত্বরই ক্ষত আরোগ্য হয়। শ্বেতচন্দন ঘসিয়া পানিবসন্তে মাখিলে যন্ত্রণা দূর হয় ও ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়। সমস্ত বসন্ত প্রকাশ হওয়ার পর ক্ষত শুষ্ক ও জ্বর ত্যাগ হইলে কাঁচা হরিদ্রা ও নিমপাতা মাখিয়া

স্নান করিবে। বসন্ত শুষ্ক হইবার সময় হইতে যাহাতে রোগীর শরীর স্নিগ্ধ থাকে, এরূপ আহার প্রদান করা বিধেয়।

যন্ত্র প্রকরণ।

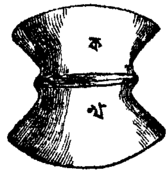
বিম্বাধর যন্ত্র।



একটী হাঁড়ীর মধ্যে পারদ রাখিয়া আর একটী হাঁড়ী উহার উপরে উর্দ্ধমুখ করিয়া বসাইতে হয় এবং সন্ধিস্থল কর্দ্দমাদি দ্বারা উত্তমরূপ লেপন করিয়া দিতে হয়। অনন্তর উহা চুল্লীর উপর বসাইয়া উপরের হাঁড়ীতে জল রাখিয়া মৃদু-অগ্নি সন্তাপ দিতে হয় ও হাঁড়ীর জল উষ্ণ হইলে উহা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শীতল জল প্রদান করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে জল পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। ১৫ ঘণ্টা জ্বাল দেওয়া উচিত। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা উপরিস্থ হাঁড়ীর নিম্নদেশে পারদ ফণা সমুদায় আসিয়া সংলগ্ন হয়। অগ্নি-নির্ব্বাণ হইলে উক্তরূপ পারদ ফণা সমুদায় গ্রহণ করিবে। এই যন্ত্র দ্বারা পারদের উর্দ্ধ পাতন ক্রিয়া সাধিত হয়।

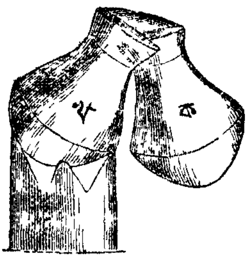
পারদ ব্যবসায়ীরা পারদের সহিত সীসকাদি ধাতু মিশ্রিত করে। এই উর্দ্ধপাতন অধঃপাতনাদি ক্রিয়া দ্বারা পারদের ঐ সীসকাদি মিশ্রণ দোষ দূরীভূত হয়।

ভূধর যন্ত্র।



ভূধর যন্ত্র ডমরু অথবা বিম্বাধর যন্ত্রের সদৃশ। ইহার নিম্নস্থালীতে জল রাখিতে হয়। এই যন্ত্র ভূগর্ভে নিহিত করিয়া উর্দ্ধে অগ্নি প্রদান করিতে হয়। এই যন্ত্র দ্বারা পারদের অধঃপাতন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

তির্য্যক্পাতন যন্ত্র।



এই চিত্রানুযায়ী দুইটী ঘট অর্থাৎ কলসী তির্য্যক্ভাবে স্থাপিত ও উভয়ের মুখ একত্রিত করিয়া সন্ধিস্থল উত্তমরূপে লেপন করিবে। একটী ঘটে পারদ রাখিবে ও অপর ঘটে জল রাখিবে। অতঃপর পারদযুক্ত ঘটের নিম্নে মৃদু অগ্নি-সন্তাপ প্রদান করিবে। অগ্নিসন্তাপে পারদ উত্থিত হইয়া অপর জলযুক্ত ঘটে সঞ্চিত হয়। এই ক্রিয়াকে তির্য্যক্পাতন ক্রিয়া কহে।

চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ।

২য় খণ্ড। | ১৩০১ সাল—চৈত্র। | ৭ম সংখ্যা।

ভারতের অব্দরহস্য।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—জগদীশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কার্য্য অপূর্ব্ব রহস্যময়। আমরা আরও বলিতে পারি, সেই ভগবানের প্রধান লীলাক্ষেত্র—এই ভারতভূমির সকল বিষয়ই রহস্যপূর্ণ, কিছুই বুঝিবার যো নাই। ধর্ম্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, রাজ নীতি—এ সমস্ত ত রহস্যপূর্ণ হইতেই পারে; এদেশের পুরাবৃত্তও পরম রহস্যময়—শতস্থানে ছিন্ন সূত্রের ন্যায় একদিক্ গোছাইতে অন্য দিকের আঁত হারাইয়া যায়! তাই স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত সমালোচনার নাম দিয়াছিলেন—"ঐতিহাসিক-রহস্য"—ও 'ভারত-রহস্য'; এখনও অনেকে এই রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বা 'রহস্য ভেদ করিয়াছি' মনে করিয়া প্রাচীন ভারতের পুরাবৃত্ত লিখিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাহাতে না আছে—প্রাচীন আর্য্য জাতির প্রকৃত ধর্ম্ম রহস্য, না আছে—প্রাচীন ভারতের সমাজ-রহস্য, এক কথায় বলিতে গেলে, তাহার আগা গোড়া 'সুধুই রহস্য'! কখনও কেহ প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে পারিবে কি না, সে বিচার অনাবশ্যক। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস যথা-যথরূপে সংগৃহীত হইলে যে, জগতের ইতিবৃত্তের প্রথম পরিচ্ছেদ লিখিত হইতে পারে, সেটী সত্য কথা। বেদই প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার প্রসূতি। সেই বৈদিক কাল, ভারতের সর্ব্ববাদিসম্মত গৌরব-কালকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের ইতিহাস লিখিতে হইবে। চেষ্টাও সেইরূপ হইতেছে। আবার রহস্যের সূত্রপাতও এই 'চেষ্টা' হইতে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, সেই আর্য্য সভ্যতার প্রসূতি বেদের উৎপত্তি বা প্রচার অদ্য হইতে কত দিন পূর্ব্বে—তবেই মহাগোল! হিন্দু পণ্ডিত-গণ বলিবেন,—"বেদ অপৌরুষেয়, তাহার আবার কাল-নির্ণয় কিরূপে হইবে?" যদি পুনঃ প্রশ্ন করা যায়, ঋষিগণ ভারতে

যে সময়ে বেদ প্রচার করিয়াছেন, সেই কালের কথাই বলুন না কেন? পণ্ডিতগণ বিরক্ত হইয়া বলিবেন,—"আরে বাপু! সেও কোটী কোটী বৎসরের পূর্ব্বের কথা; "শ্বেতবরাহকল্পাব্দাই" দেখ না কত দিনের? বেদ তৎপূর্ব্বে প্রচারিত হওয়া যদি অসম্ভব মনে কর, অন্ততঃ সেই সময়ের গ্রন্থ বলিতে আপত্তি কি?" পাঠকগণ বাঙ্গালা পঞ্জিকায় "শ্বেতবরাহকল্পাব্দা" দেখিয়া থাকিবেন, তাহার কালসংখ্যা গণিতকেও পরাস্ত করিয়াছে! এই ত গেল প্রাচীন হিন্দু-মত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতও এইরূপ রহস্যপূর্ণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা তাঁহাদের এদেশীয় শিষ্যগণ বলেন,—"অনুমান ২০০০ বৎসর হইতে ১০০০ বৎসর পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈদিক কাল!" হিন্দু পণ্ডিতগণের বেদপ্রচারের কাল-নির্ণয় শুনিয়া যে শিক্ষিতগণ হাস্য করেন, যদি সেই শিক্ষিতগণকেই জিজ্ঞাসা করা যায়, খৃষ্ট জন্মের ২০০০ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ১০০০ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যে বৈদিক কাল, তাহারই বা বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ কি? অমনি তাঁহারা একবাক্যে উত্তর দিবেন,—"সেটা ত জানা কথা; মোক্ষমূলার, গোল্‌ডষ্টুকর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণ; তাহার উপর আবার প্রমাণ কি?" আমরা এই সকল পণ্ডিত-গণকে (!) বিনীতভাবে বলি,—মহাশয়-গণ! আপনারা আপ্তবাক্য বিশ্বাস করেন না, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যে কোন উক্তি অবিচারিতভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা কি, আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করা হইতে বেশী লজ্জাজনক নহে? শিক্ষিতগণ তদুত্তরে বলেন,—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করি বলিয়া উপহাস করা সহজ, কিন্তু তাঁহাদের উক্তি যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা প্রমাণ করিবার উপকরণ তোমাদের কি আছে? বৈদিককাল ত বহুদূরের কথা, সে দিনকার চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-কাল-নির্ণয় করিতেই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই! বরং চন্দ্রগুপ্তের কাল নির্ণয় কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে আছে; কিন্তু তোমাদের পরম পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণ বা যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয়ের যে কোন উপায় নাই! এ সকল স্থানে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখাই যে অসম্ভব হইয়া পড়ে!

শেষোক্ত বাক্যে শিক্ষিতগণ প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতগণকে নিরুত্তর করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু হিন্দুপণ্ডিত-গণও নাছোড়বান্দা! তাঁহারা যে কোন প্রকারে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় করিতে বদ্ধপরিকর। ইদানীং কোন কোন শিক্ষিত হিন্দুসন্তানও এই কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বর্ণিত মহাভারত প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ আছে; দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাতে কাল নির্ণয়ের কোন প্রকার অব্দ ব্যবহৃত না থাকায়, জানিবার উপায় নাই যে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। আজ কাল নন্দ মহাপথের রাজ্যাভিষেক কালকে কেন্দ্র করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। অনেকেই সেই মতে সায় দিয়াছেন। কিন্তু

সেও পাশ্চাত্য মতেরই নূতন সংস্করণ মাত্র। আনুমানিক কাল নির্ণয় ভিন্ন তাহাতে নিশ্চিত কাল নির্ণয় হয় নাই, হইতেও পারে না।

যদি কোন প্রকার অব্দ সাহায্যে এই কাল নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলে আমরা পাশ্চাত্যপণ্ডিত এবং তাঁহাদের এদেশীয় শিষ্যগণকে প্রবোধ দিতে পারি। বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ বলেন, যুধিষ্ঠিরেরও রাজ্য-কাল-নির্ণায়ক একটী অব্দ ছিল। শকাব্দা প্রচলিত হওয়ার পর হইতে তাহার লোপ হইয়াছে। এ উক্তির উত্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিবেন, তোমাদের শ্বেতবরাহকল্পাব্দা রহিয়াছে, কল্যব্দাবও লোপ হয় নাই, ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল নির্ণায়ক অব্দটীই কি উড়িয়া গেল? তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। ওটা বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণের মনঃকল্পিত উক্তি। পাঠক! যখন সম্বৎ, শকাব্দা প্রচারকের নাম লইয়াই নানা মুনির নানা মত, তখন যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল-নির্ণায়ক কোন অব্দ থাকার উক্তিকে মনঃকল্পিত বলিলে উত্তর কি আছে? একালে যখন হিন্দুসন্তানের 'জন্মকোষ্ঠী বা জীবনচরিতে সম্বৎ বা শকাব্দার পরিবর্ত্তে খৃষ্টাব্দ পূর্ণাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তখন বহুকালের যুধিষ্ঠির রাজ যে বিস্মরণ-সাগরের অতল জলে ডুবিয়া যাইবেন, বিচিত্র কি? তবে শ্বেতবরাহ কল্পাব্দা, কল্যব্দা রহিল, বাঙ্গালা পঞ্জিকায় কেবল যুধিষ্ঠিরাব্দই স্থান পাইল না কেন, এটী ভাবিবার বিষয় বটে! প্রাচীন ভারতের যে সকল গ্রন্থকে আমরা ইতিহাস-স্থানীয় বলি, সেই সকল মহাকাব্য, পুরাণ, উপপুরাণে সত্যযুগ হইতে কলিযুগের শেষ পর্য্যন্ত রাজবংশ বর্ণিত আছে। অথচ কোন স্থানেই কোন একটী অব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। যত অব্দ একাধাবে দিন পঞ্জিকায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে! ভাবতের পুবাবৃত্তের ন্যায় এ ব্যাপার আরও রহস্যময় নয় কি? প্রাচীন ভারতের যে কোন বিষয়ের কাল নির্ণয় করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই অব্দ রহস্যভেদ কবা বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই আমবা এই প্রবন্ধের নাম দিয়াছি, "ভারতেব অব্দরহস্য।"

বাঙ্গালা পঞ্জিকায় শকাব্দা, সন, খৃষ্টাব্দ, সম্বৎ, বঙ্গাব্দা, ফস্‌লী, মগী, হিজরা, বিলায়তী লিখিত হয়। যেমন "শকাব্দা ১৮১৬, সন ১৩০১, ইংরাজী (খৃষ্টাব্দ) ১৮৯৪।৯৫, সম্বৎ ১৯৫১, বঙ্গাব্দা ১৩০১, ফস্‌লী ১৩০০। ১৩০১, মগী ১১৫৬।৫৭, হিজ্‌বা ১৩১১।১২, বিলায়তী ১৩০০।১৩০১। তাহার পর কল্যব্দা ৪৯৯৫। কিন্তু যুধিষ্ঠিবাব্দের নামগন্ধও বাঙ্গালা পঞ্জিকায় নাই।

বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ "জ্যোতির্ব্বিদাভারণ" নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের মতানুসরণ করিয়া বলেন,—যুধিষ্ঠিরাব্দ ৩০৪৪ বৎসর প্রচলিত ছিল। তাহার পর ক্রমে ১৩৫ বৎসর বিক্রমাদিত্যের, ১৮০০০ বৎসর শালিবাহনের, ১০০০০ বৎসর বিজয়াভিনন্দনের, ৪০০০০ বৎসর নাগার্জ্জুনের, এবং ৮২১ বৎসর বলির শকাব্দ প্রচলিত থাকিবে। বোম্বাই প্রদেশে এখন শকাব্দাই অধিক প্রচলিত, সম্বৎও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে।

অগ্রে বাঙ্গালা পঞ্জিকায় লিখিত অব্দ গুলির সমালোচনা করা যাউক।

বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকার ন্যায় বঙ্গদেশের পঞ্জিকাতেও সম্বৎ ও শকাব্দার উল্লেখ আছে। এদেশেও শকাব্দা অধিক প্রচলিত; সম্বতের নামমাত্র আছে। পাঠকগণ দেখিবেন পঞ্জিকার প্রথমেই লেখা হয়, "শুভমস্তু শকাব্দাঃ।" সম্বতের নামোল্লেখ সন ও খৃষ্টাব্দের পরে। কিন্তু শকাব্দার নাম পঞ্জিকার প্রথমে লিখিত হইলেও, "এবার কত শকাব্দা চলিতেছে" জিজ্ঞাসা করিলেই পঞ্জিকা খুলিয়া উত্তর দিতে হয়! বলা বাহুল্য, বঙ্গদেশে সনই বিশেষ পরিচিত। এবং তাহাই আপামর সাধারণে ব্যবহার করে। কাজেই পঞ্জিকাকারগণ পঞ্জিকার উপসংহারে লেখেন,— "সন ১৩০১ সালের দিন পঞ্জিকা সমাপ্ত।" শকাব্দার নাম কদাচিৎ উচ্চারিত হয়। আরও রহস্যের বিষয় এই যে, 'সন' এবং 'শকাব্দা' যে এক, তাহা বোধ হয় বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ জানেন না। আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি তাঁহারা পঞ্জিকায় ১৩০১ সনও লিখিয়াছেন, ১৩০১ বঙ্গাব্দাও লিখিয়াছেন। অথচ এই দুই অব্দের গণনা ও কালসংখ্যা একরূপ দেখিয়াও বিচার করেন নাই যে, 'সন' ও 'বঙ্গাব্দা' এক কি না? বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গাব্দার ইতিহাসে যতদিন না লিখিয়াছিলেন যে, "সন" ও "বঙ্গাব্দা" এক, ততদিন কেহই বোধ হয়, এ রহস্য জানিতেন না বা জানিবার চেষ্টা করিতেন না। এই বঙ্গাব্দা যে আক্‌বর বাদসাহের সৌরমানানুসারে বৎসর গণনার পক্ষপাতিত্বের ফল, তাহা বোধ হয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ব্যতীত বাঙ্গালার অন্য লোকে অল্পই জানে। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বঙ্গাব্দাকে হিন্দু প্রবর্ত্তিত "শক" বিবেচনা করেন। তাহার প্রমাণও নাকি দিবেন বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাতে হিন্দু জ্যোতিষের সৌরমানানুসারে বৎসর গণনার গৌরব ভিন্ন আর কিছু হিন্দুর নিজস্ব দেখিতে পাই না। তবে এ অব্দটি বঙ্গে বড়ই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। সেটী বাঙ্গালীর কতক, তাহা আমরা যথাস্থানে প্রদর্শন করিব।

"বঙ্গাব্দা" বা "সন" বঙ্গদেশে পূর্ণাধিপত্য বিস্তার করিলেও, চট্টগ্রামে 'মগী' অব্দ প্রচলিত। শকাব্দা নাই, সম্বৎ নাই, বঙ্গাব্দাও নাই, কোথা হইতে এই 'মগী' অব্দ আসিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। 'বঙ্গাব্দা' বা 'সন' সম্বন্ধে অধিকাংশ বাঙ্গালীর যেরূপ অভিজ্ঞতা, 'মগী' সম্বন্ধে চট্টগ্রামবাসিগণের অভিজ্ঞতা যে তদপেক্ষা বেশী এরূপ বোধ হয় না।

'ফস্‌লী', 'বিলায়তী' নামক দুইটী অব্দ বাঙ্গালা পঞ্জিকায় লিখিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ স্থান বঙ্গদেশ নহে। 'ফস্‌লী' হিন্দুস্থানে (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে) প্রচলিত 'বিলায়তী' উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়। কেবল বঙ্গাব্দ, খৃষ্টাব্দ, হিজরী কদাচিত শকাব্দা সম্বৎ (চট্টগ্রাম ভিন্ন) বঙ্গদেশে প্রচলিত। কল্যব্দের নাম পঞ্জিকাকারগণ এবং ১০।২০ জন শিক্ষিত হিন্দু সন্তান ব্যতীত অন্যে জানে না বলিলেই হয়। 'ফস্‌লী' ও 'বিলায়তী'ও বঙ্গাব্দের ন্যায় আক্‌বরসাহের সৌরমানানুসারে বৎসর গণনার পক্ষপাতিত্ব ফল, এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

বঙ্গাব্দ বা সন, ফস্‌লী, বিলায়তী যেভাবে বঙ্গবেহার উড়িষ্যায় গণিত হয় তাহাও অব্দ রহস্যের বিষয়ীভূত সৌরমানে গণিত হইয়া মহাবিষুব সংক্রান্তির পর হইতে অর্থাৎ ১লা বৈশাখ হইতে বঙ্গাব্দার বৎসরারম্ভ হয়। ফস্‌লী গৌণ-চান্দ্র মাসে গণিত হয় এবং ভাদ্র কৃষ্ণ প্রতিপদে বৎসরারম্ভ হয়। বঙ্কিম বাবু (কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায়) বলেন, "(পূর্ব্বে) যখন অশ্বিনী ক্ষেত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তখন আশ্বিন মাসে বৎসরারম্ভ হইত। * * * * এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এখনও ফস্‌লী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়।" বিলায়তী সৌরমানে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু সংক্রান্তি সঞ্চারের পূর্ব্ব দিবস মাস সমাপ্ত হয়, এবং ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশীতে বৎসর পরিবর্ত্তিত হইয়া উক্ত দ্বাদশীর পর সংক্রান্তি অবধি পর বৎসরীয় মাস ব্যবহৃত হয়। সুতরাং গণনার অর্থানুসারে এই তিন অব্দ এক সময়ে প্রচলিত হইলেও কালক্রমে বিভিন্নতায় পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান 'বঙ্গাব্দা' চলিতেছে ১২০১ 'ফস্‌লী' ও 'বিলায়তী' চলিতেছিল ১৩০১ বিগত আশ্বিন মাস হইতে ১৩০১ অব্দ আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস ফস্‌লী ও বিলায়তীর ১৩০১ অব্দ পূর্ণ হইবে।

মুগল মণীয় 'হিজরী' অব্দ মুখ্যচান্দ্র মানে ব্যবহৃত হয়, অমাবস্যার পর যেদিন সন্ধ্যার সময় চন্দ্র দর্শন হয়, সেই দিবস মাস সমাপ্ত হয়। পর দিবস হইতে পরমাস গণিত হয়। এইরূপ গণনা বলিয়া হিজরী অব্দের বৎসরারম্ভ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। ১২৭৯ বঙ্গাব্দার ১৯শে ফাল্গুন তারিখে হিজরী ১২৯০ অব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমে বৎসরারম্ভের দিন পিছাইয়া গিয়া, বর্ত্তমান ১৩০১ বঙ্গাব্দার হইলে আষাঢ় তারিখে ১৩১২ হিজরী অব্দ আরম্ভ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, হিজরী অব্দের বৎসর গণনা এইরূপ অধিষ্ঠিত ও পরিবর্ত্তনশীল দেখিয়াই আক্‌বরসাহ সৌরমানানুসারে বৎসর গণনা করিতে আজ্ঞা প্রকাশ করেন। কালে সে আজ্ঞা রহিত হইয়া হিজরী অব্দ চান্দ্রমানানুসারেই পূর্ব্ববৎ পরিগণিত হইতেছে। কিন্তু ম্লেচ্ছের আজ্ঞা হইলেও বহু হিন্দু সন্তান এখন সেই আজ্ঞা বহন করিতেছেন।

সম্বৎ শকাব্দা সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে। এবং সেই সঙ্গে খৃষ্টাব্দ সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিতে হইবে। এজন্য এস্থানে উক্ত অব্দত্রয়ের গণনাদি সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না।

বাঙ্গালা পঞ্জিকায় লিখিত হয়, "মাঘী পূর্ণিমায়াং শুক্রবারে কলিযুগোৎপত্তিঃ।" অর্থাৎ মাঘীপূর্ণিমাতিথিতে কলিযুগের উৎপত্তি। ইহাতে কলিযুগ কখন কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল, বুঝা যায় না। তবে এইটুকু বুঝা যায় যে, কল্যব্দ সৌরমাসানুসারে গণিত হয় না, চান্দ্রমাসানুসারেই গণিত হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঙ্গালা পঞ্জিকায় যুধিষ্ঠিরাব্দের নাম গন্ধও নাই, কিন্তু আ'জ কা'ল যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কালের কথা যুগ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গে পঞ্জিকায়

উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকায় লিখিত আছে,—"কলৌ যুধিষ্ঠির প্রভৃতয়ো বিংশত্যধিক শত সংখ্যকা হিন্দুবংশোদ্ভবা রাজানঃ। সাষ্টাদশদিন ত্রিমাসাধিক পঞ্চ নবতি বর্ষাধিক ষট্ত্রিংশচ্ছততমবর্ষং ব্যাপ্য রাজ্যংকৃত্বা স্বরারূঢ়া ততঃ সাহাসোলতান্ ময়নঙ্গস্থেক ষষ্টি সংখ্যকা যবনবংশোদ্ভবা রাজানঃ সষড়বিংশতি দিনাষ্টমাসাধিক চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বাদশশততম বর্ষং ব্যাপ্য রাজকর্ম্ম কৃত্বাগতাঃ। তত্র সাহ আকব্বর সানি শাসন সময়ে ইংলণ্ডদেশীয় ম্লেচ্ছকুলোদ্ভবা রাজান আসন্। সম্প্রতি তেষামেবাধিকারঃ॥ "ইহার ভাবার্থ এই যে, কলিতে যুধিষ্ঠির হইতে ১২০ জন হিন্দুবংশোদ্ভব রাজা ৩৬৯৫ বৎসর, ৩ মাস, ১৮ দিন রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তদ্পরে সাহ সুলতান্ আদি যবন বংশোদ্ভব ৬০ জন রাজা ১২৪৪ বৎসর, ৮ মাস, ২৬ দিন রাজত্ব করিয়া গত হইয়াছেন। তাহার পর সাহ আক্‌বরের বংশীয়দের শাসন সময়ে ইংলণ্ড দেশীয় ম্লেচ্ছ বংশোদ্ভব রাজা রাজাসন গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারই অধিকার কাল। তবেই দেখা যাইতেছে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ কাল ৪৯৪০ বৎসর ১৪ দিন হইয়াছিল। বর্ত্তমান ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজের রাজ্যাধিকার হইতেছে ১৩৮ বৎসর। ৪৯৪০ বৎসরের সহিত ১৩৮ যোগ করিলে হয় ৫০৭৮ বৎসর। বাঙ্গালা পঞ্জিকা মতে ইহাই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভকাল। বলা বাহুল্য এ বিষয় পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালা পঞ্জিকায় লিখিত হইত না। গুপ্তপ্রেস-প্রকাশিত পঞ্জিকাতেই এই বিষয়টী নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আজকাল অন্যান্য পঞ্জিকাকারও ইহা উদ্ধৃত করিতেছেন। বর্ত্তমান ৪৯৯৫ কল্যব্দের সহিত ইহার ৮৩ বৎসর মাত্র তফাৎ। এই ৮৩ বৎসর দ্বাপর যুগ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল পঞ্জিকাকারগণ ধরিয়াছেন; কেননা দ্বাপর যুগের রাজচক্রবর্ত্তী গণনা মধ্যেও যুধিষ্ঠিরের নাম আছে।

বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দ ৩০৪৪ বৎসর প্রচলন থাকার পর, ১৩৫ বৎসর সম্বৎ প্রচলিত থাকিয়া শকাব্দা আরম্ভ হইয়াছে। ৩০৪৪ বৎসরের সহিত ১৩৫ যোগ করিলে হয় ৩১৭৯। তাহার সহিত বর্ত্তমান শকাব্দা ১৮১৬ যোগ করিলে ৪৯৯৫ বৎসর হয়। কল্যব্দও এখন ৪৯৯৫। সুতরাং বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণের মতানুসারে কল্যব্দ ও যুধিষ্ঠিরাব্দ সমসাময়িক। বাঙ্গালা পঞ্জিকার সহিত উক্ত মতের ৮৩ বৎসর তফাৎ। এক সময়ে দুইটী অব্দ প্রবর্ত্তন অসম্ভব বলিয়া বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ উক্ত কারচুপি টুকু করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণের মত ভ্রম পূর্ণ হইলেও বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণের মতাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত। বোম্বাই প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ যুধিষ্ঠিরাব্দকে কল্যব্দের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছেন। কাজেই তাহা পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য হয় নাই। বঙ্গীয় পঞ্জিকার মত (পণ্ডিত) তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতের সহিত সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ভূমিকাতে "কলি প্রারম্ভের ৯০ বৎসরের

মধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব" বলিয়াছেন। তাহার ১৭৩ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক অসম্ভব নহে।

এস্থলে বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণকে একটা কথা না বলিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল দ্বাপর শেষে অর্থাৎ কল্যব্দের ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে যে বলেন, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, দ্বাপর এবং কলিতে তাঁহার রাজত্বের কাল গোঁজামিলনে সামঞ্জস্য করা যায়। কিন্তু পরীক্ষিত এবং তৎপুত্র জনমেজয়কে যে দ্বাপরের রাজচক্রবর্ত্তী মধ্যে গণনা করিয়াছেন, তাহাতে যুধিষ্ঠিরকে কলির রাজা বলিলে সামঞ্জস্য হয় কি? পরীক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, ইহাই অবিসম্বাদিত মত। এমত কি ঠিক ঠিক রাখিতে হইলে (ঠিক রাখাও নিতান্ত কর্ত্তব্য) পরীক্ষিত ও জনমেজয়কে যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী উল্লেখ করিয়া কলির রাজবংশভুক্ত করিতে হয়। পঞ্জিকাকারগণ কলির যবনবংশোদ্ভব রাজগণের রাজ্যকাল লিখিতেও প্রচলিত ঐতিহাসিক মতের সহিত অনৈক্য করিয়াছেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে (১১১৫ শকাব্দে) সাহাবুদ্দিন দিল্লীশ্বর পৃথু রায়কে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আজমীরে অধিকার বিস্তৃত করেন, সেই হইতে প্রকৃত যবনাধিকারকাল। উক্তকাল ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৫৬৩ বৎসর পঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে, ১২৪৪।৮।২৬ দিন, অর্থাৎ ১২৪৫ বৎসর। অতএব ১২৪৫ বৎসর হইতে ৬৮২ বৎসর-বাদ দিয়া, তাহা হিন্দু রাজাগণের রাজত্বকাল মধ্যে গণনা করিয়া ইতিহাসের সহিত গুরুতর মত-বিরোধ দূর হইবে বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ এই সৎপরামর্শটী শুনিবেন কি?

আমাদের দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কি বোম্বাই প্রদেশস্থ, কি বঙ্গদেশস্থ কোন পঞ্জিকার মতেই সায় দেন না। কিন্তু পঞ্জিকার মত সাধারণের আলোচ্য। এজন্য আমরা অগ্রে পঞ্জিকাকারগণের মত সমালোচনা করিলাম। অতঃপর দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত সমালোচনা করিয়া (উপসংহারকালে) প্রায় মত-প্রমাণ সংব্যক্ত করিব।

স্বর্গীয় বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "কৃষ্ণচরিত্র" নামক গ্রন্থে, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল" ইতি অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ১৪৩০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল; তাহা হইলে বর্ত্তমান ১৮৯৪র সহিত ১৪৩০ যোগ করিলে হয় ৩৩২৪ বৎসর। তৎপূর্ব্ব ১৪ বৎসর পাণ্ডবদের বনবাস, অজ্ঞাতবাস-কাল ও যুদ্ধোদ্যোগ প্রভৃতি কাল ধরিলে ৩৩৩৮ বৎসর পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবুর মত অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য করিলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন অদ্য হইতে ৩৩৩৮ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিতে হয়। অথবা বঙ্কিম বাবুর মতে যুধিষ্ঠিরাব্দ এখন ৩৩৩৮।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় দ্বিতীয় মত জন্মভূমির "পুরাবৃত্ত" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন; "আমার বিবেচনায় কলির একাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরের স্থিতিকাল; তন্মধ্যে একাদশ শতাব্দীর শেষাংশ অর্থাৎ ১০৭৫ কলি গতাব্দে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হয়;

যুধিষ্ঠিরের শকারম্ভ সেই সময় হইতে, আর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগকাল কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে।" তাহা হইলে বর্ত্তমান কল্যব্দে যুধিষ্ঠিরাব্দ ৩৯২০।

বঙ্কিম বাবু স্বীয় মত সমর্থনার্থে যে যে প্রমাণ ও যুক্তির আলোচনা করিয়াছেন এইবার তৎসমুদায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

বঙ্কিম বাবু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কাল নির্ণয়ে অগ্রে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোকের সমালোচনা করিয়াছেন। তাহাতে নানা গোল দেখিয়া পরিশেষে জ্যোতিষের আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার উক্তির সার মর্ম্ম এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অনতিকাল পরে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, সূর্য্যের উত্তরায়ণ দিনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাভারত হইতে তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভীষ্মোক্তিতে বুঝা যায়, তখন মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কিন্তু মাঘ মাসের কোন্ তারিখে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, তাহা বঙ্কিম বাবু ঠিক করিতে পারেন নাই। এস্থলে তিনি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। জ্যোতিষ্ আনুমানিক শাস্ত্র নহে বলিয়াই বঙ্কিম বাবু তৎ সাহায্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল নির্ণয়ের অখণ্ডনীয় প্রমাণ দিতে পারিবেন, সাহস করিয়াছিলেন। কিন্তু বিচার ক্ষেত্রে যাইয়া গোলে পড়িয়াছেন! তিনি একবার বলিয়াছেন, "এমন হইতে পারে না যে তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাহা হইলে 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' কথাটী বলা হইত না।" পরিশেষে কিন্তু তিনি ২৮ শে মাঘই উত্তরায়ণ ধরিয়া, বাঙ্গালা পঞ্জিকার মতানুসারে 'রবিস্ফুট' গণনা করিয়াছেন। এখন (বাঙ্গলা পঞ্জিকানুসারে) ১০ই পৌষ তারিখে উত্তরায়ণ হইতেছে। বঙ্কিম বাবুর মতে ৭ই পৌষ।* তিনি বলেন,—"৭ই পৌষ হইতে ২৯ শে মাঘ পর্য্যন্ত রবিস্ফুট বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে, ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা লইলে খৃঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পূরা লইলে খৃঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।"

আমরাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কাহার পূর্ব্বে? ১২৬৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, কি ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে? ১০।১৫ বৎসরের তফাৎ হইলে এ প্রশ্ন করিতাম না। প্রায় তিন শত বৎসরের তফাৎ ত সামান্য নহে, কাজেই ধোকা লাগিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম বাবু এ ধোকায়

---

* বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ বলেন; "যে বৎসর অয়নাংশ শূন্য, সেই বৎসর ৩০ শে চৈত্র ও ৩০ শে আশ্বিন দিবারাত্রি সমান হয়," গোবিন্দপুর নিবাসী পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা ১২৮৮ সালের পঞ্জিকায় অয়ন প্রকরণ কথনচ্ছলে বলিয়াছেন, "১৩৬৫ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখের ও কার্ত্তিকের প্রথম দিবসে অয়ন পরিবর্ত্ত হইত।" ১২৮৮ সালের পূর্ব্বে পঞ্জিকাতেও ঐরূপ লেখা আছে। বোধ হয় কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত বহু দিন পূর্ব্বে ঐ কথা বলিয়াছেন, পঞ্জিকাকারগণ এখনও সেই ১৩৬৫ বৎসর ধরিয়া আছেন। যাহা হউক, প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ৩০ শে আশ্বিন দিবারাত্রি সমান হইত বলিয়া যদি ধরা যায়, তবে (এই সূত্র ধরিয়া) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে উত্তরায়ণ কোন্ দিনে হইয়াছিল, নির্ণয় করা যায় কিনা কেহ সন্ধান করিবেন কি?

কাহাকেও ফেলেন নাই। পরিশেষে তিনি এ মত পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, "বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়।"

বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অংশ, ২৪ অধ্যায়, ৩২ শ্লোকের অর্থ এই যে "পরীক্ষিতের জন্ম অবধি নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত, এই ১০১৫ বৎসর।" বঙ্কিম বাবু চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেককাল খৃঃ পূঃ ৩১৫, এবং তৎপূর্ব্ব একশত বৎসর নন্দরাজ্যাভিষেক ধরিয়া উক্ত ১৪৩০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ মিলাইয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে উক্ত কালনির্ণয় ২৪ অধ্যায়ের ৩৩। ৩৪। ৩৯ শ্লোকত্রয়ের উপর নির্ভর করিয়া হইয়াছে। ঐ ঐ শ্লোকের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে "সপ্তর্ষিমণ্ডল শত বৎসর এক নক্ষত্র ভোগ করে। পরীক্ষিতের সময় সেই সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে, নন্দের রাজ্যাভিষেক সময়ে পূর্ব্বাষাঢ়াতে গমন করিবে।" এইরূপ ভবিষ্যদুক্তি আছে। বঙ্কিম বাবু ঐ সকল শ্লোকের সমালোচনায় পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, "সপ্তর্ষিমণ্ডল কতকগুলি স্থির নক্ষত্র * * * মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থির তারা। সকলেই জানেন স্থির তারার গতি নাই।" তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণের মত যে ঠিক নহে, তাহা বঙ্কিম বাবুর উক্তিতেই প্রকাশ। বিশেষতঃ তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের 'পুরাণ' নামক অধ্যায়ে (৯৪।৯৫ পৃষ্ঠাতে) বিষ্ণুপুরাণের ভবিষ্য রাজবংশ কীর্ত্তন প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। তবে আবার সেই অংশের বর্ণনীয় বিষয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন কেন?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-শাসন কালকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিম বাবু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-কাল পাশ্চাত্য মতানুসারে নির্ণীত। সকলেই তাহা আপ্ত বাক্যাপেক্ষাও অভ্রান্ত বিবেচনা করেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইলেও কথাটী অতিগুরুতর এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-কাল নির্ণয় পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নহে; এজন্য আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শুনা যায়, গ্রীক-পণ্ডিত মিগাস্থিনিস্ দীর্ঘকাল চন্দ্রগুপ্তের সভায় ছিলেন। তিনি স্বাবজ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় এক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে পাটলীপুত্র নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিগাস্থিনিসের লিখিত মূল গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। ষ্ট্রাবো, এরিয়ান প্রভৃতি রোমান্ ও গ্রীক্ পণ্ডিতগণ প্রয়োজনানুসারে সময় সময় সেই গ্রন্থ হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই জর্ম্মান্ পণ্ডিত ডাক্তার শ্বান্বেক (Dr. Schwanbeck) একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেব তাহারই ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে সেই ইংরেজী গ্রন্থই এদেশে মিগাস্থিনিসের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পুস্তক বলিয়া প্রচলিত।

মিগাস্থিনিসের লিখিত মূলগ্রন্থ যখন বিলুপ্ত, তখন এই নকলের নকল গ্রন্থকে আমরা অপ্রামাণ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারি। কিন্তু শিক্ষিত-সমাজে উক্ত মতটী এতদূর আদরণীয় হইয়াছে যে, তাহার সমালোচনা করিয়া চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া ভ্রম প্রদর্শন না করিলে

তাঁহাদের মত-পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। দেখা যাউক ইহার প্রামাণ্য কিছু আছে কি না?

এরিয়ান বলেন,—"মিগাস্থিনিস্ অনেক বার সণ্ড্রকোট্টাসের (Sandracottus) রাজধানীতে গমন করেন।"

যষ্টিন্ বলেন,—"সণ্ড্রকোট্টাস্ আলেকজাণ্ডারের গৃহ প্রতিগমনের পর ভারতে স্বাধীনতা পুনঃ সংস্থাপন করেন। * * * এই নরপতি নীচ কুলোদ্ভব হইয়াও দৈবী-শক্তি-বলে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।

এথিনিয়াসের মতে, সণ্ড্রকোট্টাসের নাম 'সণ্ড্রকোপ্টাস্' (Sandracoptus)।

প্লুটার্কের মতে, মিগাস্থিনিস্ যে রাজার নিকটে গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম 'অণ্ড্রকোট্টাস্' (Andracottus)।

ডিওডোরাস্ সিকিউলাস্ এবং কুইণ্টস্ কার্টিয়াসের মতে আলেক্জাণ্ডার যে সময় ভারতের প্রান্ত সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন পুরুরাজার মুখে শুনিয়াছিলেন 'প্রাসি' (Prasii) জাতির 'ঝণ্ড্রমাস্' (Xandramas) নামক একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা আছেন। কিন্তু তিনি এক রাণীর গর্ভে ক্ষৌরকার-ঔরসে জাত। যষ্টিন আবার এই ঝণ্ড্রমাসের সহিত সণ্ড্রকোট্টাসের অভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন, সণ্ড্রকোট্টাস্কে আর কেহ 'নীচকুলোদ্ভব' বলেন নাই, কেবল যষ্টিন্ই তাঁহাকে 'নীচকুলোদ্ভব' বলিয়াছেন!

এই ত গেল চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে গ্রীক পণ্ডিতগণের মত। এখন দেখা যাউক, পাটলীপুত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কতদূর ছিল।

ষ্ট্রাবো বলেন,—'পালিবোথ্রা' (Palibothra) গঙ্গা ও অন্য একটী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। সেই দেশের লোককে 'প্রাসি' (Prasii) বলে। মিগাস্থিনিস্ সেই দেশে গিয়াছিলেন।"

এরিয়ানের মতে, 'পালেম্বোথ্রা' (Palembothra) ভারতবর্ষের রাজধানী। 'পালেম্বাথ্রা', ইরান্নোবাস্' এবং গঙ্গা (Erannoboas and Ganges) এই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এরিয়ানের মতে এই 'ইরান্নোবাস্' সিন্ধু ও গঙ্গা হইতে ক্ষুদ্র। আধুনিক পণ্ডিতগণ কিন্তু এই 'ইরান্নোবাসকে "হিরণ্যবহ" অর্থাৎ বর্ত্তমান শোন নদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

স্যর উইলিয়ম জোন্স্ বলেন,—"সণ্ড্রকোট্টাস (Sandracottus) শব্দের সহিত চন্দ্রগুপ্ত (Chandragupta) শব্দের যখন সাদৃশ্য আছে, তখন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে সণ্ড্রকোট্টাসই চন্দ্রগুপ্ত।" রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের সম্পাদক ট্রয়ার সাহেব এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। আধুনিক ইয়োরোপীয় শব্দশাস্ত্রবিদ্গণ স্যর উইলিয়ম জোন্সের মতানুসরণ করিয়া বলিয়াছেন,—"সণ্ড্রকোট্টাস্ বা সণ্ড্রকোপ্টাস্ অথবা অণ্ড্রকোট্টাসই চন্দ্রগুপ্ত। এবং পালিবোথ্রা বা পালেম্বোথ্রাই পাটলীপুত্র।" আর আমাদের হিন্দু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহাশয় সেই মতকে অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া বলিতেছেন, "যাহা হউক আমাদের জানা আছে যে, নন্দাভিষেকের এক শত বৎসর পরে চাণক্যের মন্ত্রণায় চন্দ্রগুপ্ত মগধের

সিংহাসন লাভ করেন। সেই ঘটনার কাল খৃঃ পূঃ ৩২৫।" *

আমরা এসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। সকলেই বলেন মিগাস্থিনিস্ একজন পণ্ডিত লোক। তিনি দীর্ঘকাল পাটলীপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্তের সভায় ছিলেন। রহস্য এই যে, তিনি যে নগরে বাস করিতেন, যে নগর তৎকালীয় ভারতবর্ষের রাজধানী—সেই নগরের নামটীই তিনি ঠিক্ করিয়া লিখিতে পারেন নাই! যিনি পাটলীপুত্রস্থলে 'পালিবোথ্রা' বা 'পালেমবোথ্রা' লেখেন, তাঁহার পাটলীপুত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সহজেই বুঝা যায়।

ভারতবাসী অনেকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানী, রুসিয়াতে গিয়াছেন; চীনে ও কেহ কেহ গিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই ত ঐ ঐ দেশের রাজধানীর নাম লিখিতে এরূপ অদ্ভুত বর্ণ যোজনা করেন না? পাটলীপুত্র নামটীই বা এমন উৎকট কি যে, মিগাস্থিনিস্ তাহার ঠিক্ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, সুতরাং লিখিতেও ভুল করিয়াছেন। আরও রহস্য এই যে, সে সময়ে (চন্দ্রগুপ্তের সময়ে) পাটলীপুত্র কুসুমপুর নামেই বিশেষ খ্যাত ছিল। মিগাস্থিনিস্ ভ্রমক্রমেও তাহার উল্লেখ করেন নাই। 'কুসুমপুর' লেখাও ত সহজ?

বিশেষ রহস্য এই যে,—যে রাজার নিকটে তিনি দূত হইয়া গিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘকাল যাঁহার সভায় ছিলেন, সেই চন্দ্রগুপ্তের নাম একবার লিখিলেন 'সণ্ড্রকোট্টাস্', আবার লিখিলেন 'সণ্ড্র-কোপ্টাস্'; স্থানান্তরে লিখিলেন 'অণ্ড্র-কোট্টাস্'! একজনের লেখনী হইতে একটী লোকের উক্তরূপ বিভিন্নাকারের নাম যে কিরূপে প্রসূত হয়, তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাটলীপুত্র লিখিতে তবু পালিবোথ্রা' বা 'পালেম-বোথ্রা' লিখিয়াছিলেন বলিয়া পাটলী-পুত্রের আদি অক্ষর পাওয়া যায়। চন্দ্র-গুপ্ত লিখিতে নামের আদ্যাক্ষর 'চ' এক-বারে উড়িয়া গিয়াছে! 'চ' স্থলে 'স' এবং 'অ' ব্যবহৃত হইয়াছে! কেন, তৎকালীয় গ্রীক-ভাষায় কি 'চ' লিখিবার উপ-যোগী বর্ণমালা ছিল না যে, 'S' (স্) 'A' (অ) অক্ষরের দ্বারা কোন প্রকারে কাজ চালান হইয়াছে? 'চন্দ্র' স্থলে 'Chandra', 'গুপ্ত' স্থলে Gupta' পাশ্চাত্য ভাষায় এইরূপ উচ্চারিত হয় জানি। গ্রীক্-ভাষায় যে 'চন্দ্র' স্থলে 'সণ্ড্র' ('Sandra') বা 'অণ্ড্র' ('Andra') এবং 'গুপ্ত'স্থলে কোট্টাস্ ('Cottus'), কোপ্টাস্' (Coptus) লিখিত হওয়া সম্ভব, তাহা শব্দশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের মুখে কখন কখন শুনিতে পাই। ভারত-বাসী 'উড়িয়া'গণ (উড়িষ্যাবাসীগণ) 'লবণ' বলিতে 'ড়ঁবর' বলে। কিন্তু হাতে কলমে 'লবণই' লেখে। মিগা-স্থিনিসের উচ্চারণ-শক্তি উড়িয়াদের ন্যায় থাকা কল্পনা করিলেও, এরূপ অদ্ভুত লিপী-ভ্রম সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ষ্ট্রাবো বলেন,—সিলিউকস্ নিকে-টরের পারস্য পত্নীর গর্ভসম্ভূতা অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না এক দুহিতাকে চন্দ্র-গুপ্ত বিবাহ করিয়াছিলেন। এ উক্তিটী

* সাহিত্য—৫ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা "মধুসূদনের আবির্ভাব কাল" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সে সময়ের হিন্দুসমাজের বন্ধন এতদূর শিথিল হয় নাই যে, চন্দ্রগুপ্ত ম্লেচ্ছের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া হিন্দুনামে পরিচিত হইবেন। এরূপ আষাড়ে গল্প মিগাস্থিনিসের সৃষ্টি কি ষ্ট্রাবোর স্বকপোলকল্পিত, তাহা নির্ণয় করার উপায় নাই।

চন্দ্রগুপ্ত এবং পাটলীপুত্র সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা গেল, তাহা যথেষ্ট না হইলেও চক্ষুষ্মান পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য মন্ত্রে এরূপ মুগ্ধ যে, তাঁহারা এ সকল বিচারের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিবেন না। কিন্তু এক দিন এইরূপ বিচারের দিন আসিবে আশায় আমরা গৌরচন্দ্রিকা গাইলাম। যে কথার সহিত আমাদের প্রবন্ধের বিশেষ সম্বন্ধ, সেই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-কাল খৃঃ পূঃ ৩২৫ কিনা, এখন সেই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

এরিয়াণ, ডিওডোরাস্ প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতগণ, এবং ষ্ট্রাবো, প্লিনী প্রভৃতি রোমক্ পণ্ডিতগণ মিগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় চুম্বক মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সকলেই জানেন, গ্রীক্-দেশে "ওলিম্পিয়ড্", এবং রোমদেশে "ইণ্ডিক্সন্" নামক অব্দ প্রচলিত ছিল। খৃষ্টাব্দ তখন গ্রীক্ দেশে কি রোমরাজ্যে প্রচলিত হয় নাই। কেননা খৃষ্টজন্মের ৫৩২ বৎসর পরে ইতালিতে, ৮০০ বৎসর পরে ফ্রান্সে, ১৪০০ বৎসর পরে স্পেনে, এবং ১৫০০ বৎসর পরে পোর্টুগালে খৃষ্টশক খ্রীষ্টোপাসক সম্প্রদায়ে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় শক 'ইণ্ডিক্সন্' কি 'ওলিম্পিয়ড্' অব্দ দ্বয়ের অনুগামী হইয়া গণিত কি প্রচারিত হয় নাই।* যিশু খৃষ্টের জন্ম হইল আসিয়াখণ্ডে, তাঁহার জন্মকাল হইতে শক গণিত হইল ইয়োরোপে, কাণ্ডটা অদ্ভুত বটে! বরং খৃষ্টের মৃত্যুকাল হইতে খৃষ্ট-শক গণনা করিলে এক দিন সম্ভবপর হইত। কেন না, যিশুর মৃত্যুই প্রসিদ্ধ ঘটনা। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার মহত্ব কেহই অনুভব করিতে পারে নাই। তাহা তই দীর্ঘকাল পরে তাঁহার নামে অব্দ প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

সে যাহা হউক, যিশুখৃষ্ট যখন জরায়ু গর্ভে সংস্থিত হন নাই, সেই খৃষ্টের ৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে মিগাস্থিনিস্ স্বীয় গ্রন্থে যে খৃষ্টশকের ব্যবহার করিয়াছিলেন, একথা বুদ্ধিমানে বলিবে না। আর এরিয়াণ, ডিওডোরাস্ প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতগণ স্বদেশের বিখ্যাত "ওলিম্পিয়ড্" অব্দকে উপেক্ষা করিয়া, এবং ষ্ট্রাবো, প্লিনী প্রভৃতি রোমক্ পণ্ডিতগণও যে রোম সাম্রাজ্য পরিব্যাপ্ত "ইণ্ডিক্সন্" অব্দকে ভুলিয়া গিয়া অপ্রসিদ্ধ, সন্দেহযুক্ত খৃষ্টাব্দ দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-শাসনের কালনির্দ্দেশ করিবেন, সেরূপ বিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। মিগাস্থিনিসের লিখিত মূল গ্রন্থের সহিত এরিয়াণ, ষ্ট্রাবো প্রভৃতির উদ্ধৃত অংশ মিলাইয়া দেখিবার উপায় নাই। তবে এরিয়াণ, ষ্ট্রাবো প্রভৃতির লিখিত বিবরণের সহিত ডাক্তার শ্বান্বেকের এবং শ্বান্বেকের গ্রন্থের

* নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা, "খৃষ্টের জন্মকাল এবং খৃষ্টীয় শক" নামক প্রবন্ধ এবং তাহার প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে এ অন্ধ-রহস্য-ভেদ হয় কি না বলিতে পারি না। ডাক্তার শ্বাম্বেক এরিয়াণ প্রভৃতির উক্তির উপর যে বিস্তা ফলাইয়াছেন, তাহা অনুমান করিলে ক্ষতি কি? অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেবই যে অনু-বাদ ব্যপদেশে নূতন কলম চালান নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিব?

যাহাই হউক, ঐ সকল নকলের নকল তস্য নকল বিবরণ দেখিয়া ৩২৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত যে মগধের সিংহা-সনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা সমাচীন নহে।

বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ১৭।১৮ পৃষ্ঠায় প্রায় এই কথাই বলিয়াছেন। তবে তিনি সেই ভ্রান্ত মতেব অনুবর্ত্তন করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল নির্ণয় করিলেন কেন, বুঝিতে পারি না। তবে এইমাত্র বুঝা যায়, 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ প্রত্নতত্ত্বস্থানীয় নহে। ইউরোপীয় মতেও পাণ্ডবগণ খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং পাণ্ডবগণ বা কৃষ্ণ কবিকল্পিত নহেন—ঐতিহাসিক, ইহাই সপ্রমাণ করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পর অধ্যায়ে সে কথা তিনি একরূপ স্পষ্টই বলিয়া-ছেন। বিশেষতঃ বঙ্কিম বাবু যুধিষ্ঠিরাব্দ কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত, তাহার সিদ্ধান্ত করা দূরে থাকুক, তিনি যুধিষ্ঠিরাব্দের উল্লেখও করেন নাই। অতএব বঙ্কিম বাবুর মতানুসারে যুধিষ্ঠিবাব্দ বা তাহার প্রবর্ত্তনকাল যে নির্ণীত হ'তে পারে না, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

শ্রীচন্দ্রমোহন সেন।

গৌরী।

দশম পরিচ্ছেদ।

গয়ারাম পোড়েলের বিষয় কর্ম্মের কোন একটা চিরজীবী আখ্যা ছিল না। পূজার সময় সে পেশাদারী রাম যাত্রায় কৌশল্যা সাজিত; ফাল্গুনের প্রারম্ভ হইতে, সামলা চাপকান আঁটিয়া, পল্লীর গোরু বাছুরের কল্যাণে, মানিকপিরের দরবারে সে অনেক গান পাঁচালীবদ্ধ ওকালতি করিত। আবার সময় সময় তাহার সেই পোষাকী ব্যবসা তুলিয়া রাখিয়া, হলাকর্ষণরূপ সভ্যতার আদিম সোপান অধিরোহণ করিতে, সে বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িত। মৈ টানা কাদা ছানা প্রভৃতি, পুরাণ ফ্যাশানের আর্য্যা-মির উপর সে বড়ই বীতশ্রদ্ধ ছিল। তবে জীবনের সকল সোপান কুসুমাস্তীর্ণ না হইলেও তাহাতে উঠিতে হয়। প্রাণ-পাওয়া বড় সহজকার্য্য; দেহের ভিতর প্রাণশোধা একটা মস্ত নবাবি। মনুষ্য জন্ম, বড় কদর্য্য ব্যাপার; জীবন রাখিতে হইলে অনেক কদর্য্য স্থানে যাইতে হয়, এমনি একটা কিছু ভাবিয়া পোড়েল তাহার সঙ্গীত বিস্তার "সহোদরা" সভা

হইতে নামিয়া, এই মাটীর পৃথিবীর বুকে বুকে লাঙ্গলের ফলা চালাইয়া, তাহার সর্ব্ব কাঠিন্যের প্রতিশোধ লইত। তিনি বুঝিতেন, মহাশক্তিরূপা পোড়েল গৃহিনী,—তাঁহার এই নরকদর্শমের এক-মাত্র বিধাতা। গিন্নী যদি বাপের বাড়ী (নানা) মামার বাড়ী—(বালাই) যমের বাড়ী যান (কি না বেড়াইতে যান); তাহা হইলে তিনি বাকী বৎসরটা ধরিয়া, রাগিনী গুলীর অনুলোম বিলোম ভাঁজিয়া, একটা সুরের কম্বল বুনিয়া রাখিতে পারেন। এবং আগামী বর্ষের বাহানার সময়, তাঁহার সমস্ত দলকে সেই কম্বলে আচ্ছাদিত করিয়া, আপনার প্রচ্ছন্ন দেবত্বেরও প্রচুর পরিচয় প্রদান করা হয়। অনেকটা অবরোহণ, অনেকটা অনুগ্রহ স্বীকার করিয়া, পোড়েল, বর্ষার চাষ করিতেন। সঙ্গীত বিদ্যাদত্ত মুলধনে এবার সে কার্য্য সম্পাদনের সম্ভাবনা বড়ই অল্প। সুতরাং তিনি মাঠের মুক্ত বাতাসের "সর্ব্বমতান্ত গর্হিতম" সাহায্য লইয়া সে বিষয়ের একটা উপায় স্থির করিতে করিতে বেলা ২॥ প্রহরের সময়, রামনিধি চট্টোর বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন জামাই বাবু, বাটীর সম্মুখের শিবমন্দিরের রোয়াকে বসিয়া, আহারান্তিক তামাকু সেবন করিতেছিলেন, পোড়েলকে দেখিয়া, খুসী হই-না-রাগ করি ভাবে একটু থতমত খাইয়া সরিয়া বসিলেন। পরে শ্বাশুড়ী খুসী করা, একটা সংকল্পিত—অলাবুমঞ্চের স্থপতি কার্য্যে পোড়েল তাহার সাংসারিক অভিজ্ঞতা লইয়া অনেক সহায়তা করিতে পারে, ভাবিয়া এবং অনেক গুলা রিজন খোসগল্পের একজন আসন্ন তন্ত্রধার আসিয়া জুটিল দেখিয়া, তিনি হুঁকা টানিতে টানিতে বলিলেন "পোড়েল যে হে!—এত অবেলায় কোথা থেকে?"

পোড়েল। আজ্ঞে—আপনি অবেলা ব'লবেন না। আমরা পুরুষ মানুষ,—বুল্‌বুল্‌ পাখীর জাত। সকাল সন্ধ্যা একটু পাতলা হাওয়া না খেলে প্রাণ কেমন করে। সুরসারের কাজ,—বড় শক্ত,—নাদ—বিন্দে!—এত বড়—একটা সখীয়ান ওস্তাদের সম্মুখে, এমনি একটা প্রাতঃকালের পান্তাভোজী জীবনের নগ্‌দামুটের মতন, আকালিক ভ্রমণের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন বলিয়া, শ্রীমান মনে মনে একটু—অপ্রতিভ হইলেন;—এবং আপনার অসীয়ানত্ব স্খালনের ত্বরিত বিধান স্বরূপ, পোড়েলের ক্ষৌরীত শ্মশ্রু গুম্ফ সম্পন্ন মুখ, বেণে খোঁপাবাঁধা চুল ও গলার ২নর কাটীর মালার দিকে, বার কতক উদ্দেশ্য শূন্য ভাবে চাহিয়া, বলিয়া উঠিলেন—"এবার ঢাকায় বায়না ছিল না হে!—কুশি লবের পালা হ'ল বুঝি? নবাবের বাড়ী গাওনা টাওনা হয়েছিল নাকি?

পোড়েল। আজও গাওনা জমে ছিল মন্দ নয়। বড্ড মেহন্নৎ—একা সারা রাত রাগিনী দেওয়া!" শ্রীমানের চক্ষু ডাগর হইতে লাগিল; হুঁকা তাহার উপভোগী ইন্দ্রিয়ের দ্বার হইতে প্রায় একহাত সরিয়া পড়িয়াছিল। গয়ারাম আবার আরম্ভ করিলেন—

"আজত মকরাক্ষের পালা হয়েছিল।" অতি বদ্ "বধ" শব্দের সংস্রব থাকায়—গয়ারাম পালার পুরা নামটা উল্লেখ করিল না। "মকরাক্ষ বড্ড মানায় নি;

তোমায় যদি পাওয়া যেত জামাই বাবু! ত মনের সাধে একবার মকরক্ষ সাজিয়ে নবাবের আক্কেল দিয়ে আসতুম। তোমায় যদি পাওয়া যেত!—তোমার চেহারা,—তোমার আওয়াজ!"

বশ্!—শ্রীমানের চক্ষু ছল ছল হইয়া উঠিল। তিনি কুলীনের সন্তান;—পুরাণ কম জানিতেন তাহা নহে,—তবু তাঁহার কেমন মনে হইল, মকরাক্ষ বোধ হয় লক্ষহীরার স্বামী। নামটা খুব জবর;—বড়ঘরের উপযুক্ত। শ্রীমান জিজ্ঞাসা করিলেন—

"পোড়েল!—লক্ষহীরা কে সেজে ছিল!" পোড়েল সে কথা শুনিতে পাইল না। তখন প্রসঙ্গ ক্রমে নবাব, তাজমহল, দিল্লীর বাদশা, সকলেরই কিছু কিছু ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইতে লাগিল। শেষে আকব্বরসাহ যে পূর্ব্ব জন্মে হিন্দু ছিলেন, এবং কোন কাম্যকূপে অবগাহ-নান্তর, গোরোময়ুক্ত দুগ্ধপান করিয়াই যে, তাঁহার দিল্লীর রাজ তক্ত, রংমহলের সার্দ্ধ সাত শত বেগমের অযাচিত প্রণয় রূপ, দারুণ ভাগ্য বিপ্লব ঘটিয়াছিল, ইত্যাদিরূপ, অনেক মনুষ্যবুদ্ধি অতীত,—বিধাতার কার্য্যকলাপের একটা সমস্ত সিরাস্তার গাঁটরী,— খুলা হইয়াছিল। গয়ারাম, কখন কখন পূর্ব্ব বঙ্গে যাত্রা গাহিতে যাইত, সুতরাং জামাই বাবু বুঝিলেন, দিল্লীর রংমহলের সংবাদ জানা, তাহার পক্ষে আদৌ বিচিত্র নহে। শ্রীমান বলিলেন "বেস পোড়েলের পো!—তামাক খাও, তামাক খাও!—খপর কি বল!"

পোড়েল। আজ্ঞে টাকা কড়ির যোগাড় হয় নি। আমাদের বড় সুবিধা হচ্চে না। দাদাঠাকুরকে বলে ছিলেম, চাটুয্যে মহাশয়কে বলে কিছু টাকা দেওয়াতে, তিনি কৈ পেরে উঠ্লেন না। এবার দরবারে, জামাই বাবু! আগে তোমায় একটু ধ্বজা হতে হবে।

হরিশ। তার জন্যে ভাবনা কি হে পোড়েল! ধ্বজা ছেড়ে বজ্রাঙ্কুশ হতে পারি। তবে শুধু হাতে কর্ত্তার মন উঠে না। আর গোড়াতেই তুমি বিগড়েছ। বাপ বল, মা বল, সকলেই একটু আত্তি শো চায়। পরের ছেলেও আপনার হয় পোড়েল! আপনার ছেলেও পর হয়। ইংরিজি পোড়ে আজকাল লোকের মাগই মা বাপ। মা বাপ ভেসে গিয়েছে। কত্তা বড়ই নারাজ, কোলকেতায় থাকে, কে জানে, কেমন স্বভাব চরিত্তির! তোমাদের দাদা ঠাকু-রের চাল চলনে কর্ত্তার আর তেমন "প্রতিযোগিতা" নাই। তবে আমার বল কিসের মধ্যেই আছি! আর হেথা কয় দিন বা থাকা হয়।"

শ্রীমানের এবার জয় হইল। পোড়ে-লের রসিকতার উত্তরে তিনি একটা হীরাকাটা আভাঙা সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তাঁহার পুত্রের সহিত প্রীতিভোগে, জামা-তার বজ্রাঙ্কুশত্ব ও প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পোড়েল। হেঁগা!—তোমরা খুব বনিয়াদি ঘরের ছেলে। গুণ যশ সকলই তোমাদের। তোমরা আমায় মনে করে রাখবে, তা আবার বড় কথা। টাকা কড়ি ত হাতের ময়লা।

হরিশ। উ—তা—পোড়েল!—তুমি আটঘরের নও, তাই বোঝ। আর পোড়েল বৌ, তাদের হরিশ ঠাকুর

জামাইয়ের জন্তে, আগেকার মত যে সময়ের যে কিছু পাঠায় না কেন ?—তা তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আমরা আমাদের বংশের মত কাযই করবো। তোমরা ২।১০ টাকা যে আনো, সে কি আর একটা বড় কাজ !

"হরিশের সহিত" সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিশিষ্ট—গুষ্টীর বহুবচনান্ত পদটীর এক-বচনান্ত প্রয়োগ হইলে, পোড়েলের কত-দূর সুখশ্রাব্য হইত তা বলা যায় না। বহুবচনের ভিড়ের ভিতর তাঁহার একটা জনতা জন্য ভরসা হইয়াছিল। পোড়েলেরপো একেবারে চলিয়া গেলেন, এবং "আছেত," "এবং," "সে কি," বেলা হয়েছে, "পায়ে রাখবেন" প্রভৃতি কতক-গুলা ভগ্নপদ শীলতার বিগ্রহ বিসর্জ্জন দিয়া গৃহ যাত্রা করিল। জামাই বাবুও আপনার প্রতিজ্ঞা-পালনের চেষ্টায় অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহিণী তখন দরদালানে বসিয়া নীরবে রামপ্রসাদী পদাবলী পড়িতে-ছিলেন "কপালপোড়া" "ঘর ভাল নয়" "দোষী কিসে" প্রভৃতি নিরাশাব্যঞ্জক পদের কত উচ্চকণ্ঠ আবৃত্তি করিয়া, অপ্রতিভ বিধাতা ও মনুষ্য পতির সঙ্কুচিত হৃদয়ে তীব্র কষাঘাত করিতে-ছিলেন। গৃহের ভিতর বসিয়া, চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় তাম্রকুটের সাহায্যে ব্রাহ্মণ বর্জ্জ্য দিবা-নিদ্রা ও মক্ষিকা তাড়াইতেছিলেন। গৃহিণী ঈষদুন্মুক্ত কপাটের ভিতর দিয়া, কোন অবৈধা-হারী, খোঁয়াড়বদ্ধ পশুর মত, গৃহবদ্ধ স্বামীর গৃহিণী কার্য্যে মাঝে মাঝে মনঃ-সংযোগ করিতেছিলেন। কারণ তখনও পার্শ্বের বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে "পোয়া বারো কচে" রূপ পাড়ার কালামুখো নিকামায়ে মিন্সা কুলের পূর্ণক্রীড়া সমাবেশ সূচক ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ভরসা কি চট্টোপাধ্যায়ই যদি দুই দণ্ড মরাহাড় চালাইয়া তাঁহার জীবন্ত খিল হাড়ের খুলিয়া আসেন !

এমন সময় জামাতা বাবাজীবন শ্বাশুড়ীকে দেখিয়া কহিলেন—"মা ! পোড়েল এসেছিল। কতকগুলা ডেঙো-বিচি দিয়ে গেল। কোথা বসাব !

গৃহিণী একবার ঘরের ভিতরের দিকে চাহিলেন। সে চাহনিতে, জামা-তার নিঃস্বার্থ শ্বশুরকুল-বসতির অনেক শুভ চেষ্টিতের ভিতর, ডেঙোবণরূপ একটা নিষ্কাম উপকারের একটা প্রকাণ্ড ইস্তাহার প্রকাশ হইতেছিল। কর্ত্তা বুঝিতেছিলেন, গৃহিণীর হাতের কাছে পুর্ব্বদিনের প্রবন্ধের একটা বাস্তবীকৃত উদাহরণ আসিয়া উপস্থিত। তিনি তামাকে আরো একটু জোরে টান দিতেছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র আবার আরম্ভ করিলেন—"লোকটা কর্ত্তাকে খুব মানে ও আমাদের বিপদে সম্পদে বুক দিয়া করে। একালে এমন নিমকের চাকর খুঁজে মেলে না।"

গৃহিণী একটা শূন্য লক্ষ্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। ঘরের কড়ী বরগা ঠেকিয়া তাহা দালানময় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার অর্থ—এ পুরীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের আদর, এ পরিবারের কর্ত্তার কাছে নাই। হরিশ্চন্দ্রের গৌরচন্দ্রিকায় কিন্তু কোন নিকট উৎপাতের "অগ্নিগর্ভ ময়ূখ," চট্টোপাধ্যায়ের গায় ঝরিয়া পড়িতেছিল। চট্টোপাধ্যায় একটা সুদূর কোণ আশ্রয়

করিয়া, নূতন কলিকায় আগুন দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

বাপজানের তবু সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া, সার্ব্বভৌম শুভইচ্ছা ফাটিয়া পড়িতেছিল। তিনি আবার বলিলেন—বেচারার বড় ক্লেশ হয়েছে। সামান্য টাকার জন্য তাহার চাষবাস বন্ধ, এমন কি অনেক দিন ঘরে উপোষ—আধপেটা। আমার পিতামহ, জান গা,—বড়লোক ছিলেন। অ্যাঁ হ্যাঁ মাঝে মাঝে প্রজা নাতোযান হ'লে চাষবাস করিয়ে তাকে সাতোয়ান করে তুলতেন। বনিয়াদীর লক্ষণই ওই।—তা সে আমায় ধরেছে—কর্ত্তাকে বলবার জন্যে। আমি কি বাপু ওসব কথায় থাকৃতে পারি? কর্ত্তা যদি না দেওয়াই বিবেচনা করেন?"

"বনিয়াদীর লক্ষণ"—"জামাই"এর "অপমান" গৃহিণী মহা বেঁধে পড়িলেন। তিনি দেখিলেন হঠাৎ যেন চট্টোপাধ্যায়ের প্রাচুর্য্যের একটা অনেকদিনের পুরাতন পরমায়ু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া যায়!—যেন আবার একটা দক্ষযজ্ঞের অভিসম্পাত তাঁহার পারিবারিক কল্যাণের উপর আসিয়া পড়ে। তিনি স্বামীস্থ গৃহের দরোজা একটু বেশী করিয়া ফাঁক করিলেন, এবং তাহার ভিতর দিয়া, একটীবার আপনার উদ্বিগ্ন চক্ষের বিদ্যুৎ-চমক নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

"ওগো!—শুনচো"।

কর্ত্তা বলিলেন—"হুঁ"।

গৃ। হুঁ হাঁর কায নয়। পোড়েল ২।১০ টাকা যা চায় দিও।

কর্ত্তা। সুরেশ বলেছিল, তাকে দিইনি, জামায়ের কথায় দিলে উপযুক্ত ছেলের অপমান করা হবে। প্রজারা আমায় অমানুষ ঠাওরাবে। তা ছাড়া ওর কি বন্ধক রাখিব? ও কোরফা প্রজা। তুমি স্ত্রীলোক, তোমার মুখে বিষয় কর্ম্মের কথা অমঙ্গল।

গৃ। আমার বাতাস লাগলেই ত তোমার যত অমঙ্গল। তোমার সব অমঙ্গল নিয়ে আমি দূর হ'ব, তুমি ঘরে বসে মঙ্গলের সংসার কর। পদে পদে মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়া, আর জামাইএর অপমান!

কর্ত্তা। তোমায় বেরুতে হবে কেন! তুমি যখন এত তালিম হয়েছ, তুমি ফরাশ গুড়গুড়ি, তাকিয়ে দপ্তর নিয়ে, সদরে বৈঠক করে বস। আমি বৃন্দাবনবাসী হইগে!

গৃহিণী এইবার কাঁদ কাঁদ হইয়া কন্যাকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। চট্টোপাধ্যায়, কোন একটা পোড়েলের মুহূর্ত্ত বা কন্যাসঙ্গিনী সুরেশের মাতা একরূপ অদেয় ভাবিয়া বলিয়া ফেলিলেন—

"তোমার যা ইচ্ছা তাই করগে আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন?"

তুমি আমি এতই মুহূর্ত্তের দাস। তোমার আমার অটল অনন্তের দ্বার, বিধাতা, এমনি একটা পাকান মোচড়ান মুহূর্ত্তের ভিতর দিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন!

সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত গয়ারাম পোড়েল বিশ টাকা পাইল এবং এ সব ত আপনারই বলিয়া শ্রীমানের গাত্রে তাঁহার একটা ভবিষ্য শুভ অদৃষ্টের অঞ্চল স্পর্শ লাগাইয়া গেল।

কেন এই বই লেখা!—কেন এ অচ্যুত রস-কলী গৃহস্বামীর একজনেরও

দৌর্ব্বল্য-বর্ণনা! জগতের যাবতীয় নীতি-বোধ, সংসারের সমস্ত সুবোধ গোপাল-দের বৈরতা আমন্ত্রণ!

এইবার তোমায় আমায় একটা বুঝা পড়া চাই। ইহার পর ভাল না লাগিলে আমি কোন কৈফিয়ৎ কবুল করিব না। তুমি কোন জ্ঞানার্ণবাবগাহী, অর্দ্ধ পয়সা মূল্যের, অভ্রান্ত সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে চড়িয়া, আমার ভাগ্যে হলাহল ব্যবস্থা করিতে পার। আমি জানিব জগতে অতটা ঐশী শক্তির আংশিক অপ-ব্যয় করিয়াছ। সব করিও বাপু! কেবল কোন আদর্শ সাহিত্যের আদর্শ আরজী আমার মুখের সামনে ধরিও না! এ অজগর আলস্য ভেদ করিয়া আপন কুৎসিতত্ব প্রতিপাদনে আমার অবকাশ বড়ই অল্প। তোমার ষড়দর্শনের যুক্তি এক হইলেও আমি বলিব; আমার ভাল লাগে—দিবসে সার্দ্ধপ্রহর পর্য্যন্ত নিদ্রা, সারা দিনের ভিতর কোন রকম কাজটী না করা, আর সুডোল, নিটোল, বাঙ্গা-লীর মেয়ে!—কারণ এমন সন্ধ্যা-মাখা ভিক্ষা-ঢাকা, শ্যাম স্নিগ্ধ ভীক স্বস্ত্যয়ন, কেহ আত্মার ভিতরে চাহিয়া ফেলিতে পারে না। আমি বড়, ভাল চোখ ভাল বাসি বাপু!—সংসারে ভাল চোখের দাম নাই।

যুগধর্ম্ম—জীবধর্ম্ম—বিবর্ত্তবাদ!—জ্ঞানের ঘোড়দৌড়ের মাঠে কতটাই পিছাইয়া পড়িয়াছি। মাঝে মাঝে আল-স্যের অহিফেণ-নেশায়, অমনি কতকটা বেসাধা শানাইএর চেঁচানি বোধ হয় শুনিয়া থাকিব। তবে আইস তোমায় আমায় একটা রফা করা যাউক। এই উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর অবিরাম কবন্ধ আবর্ত্তনে আমি যখন একটা ঘুমের মশারি টাঙ্গাইয়া পড়িয়া থাকিব;—যখন মুদীর তাগাদা, মিউনিসিপ্যালের পেয়াদা, গোয়ালিনীর রুষ্ট হাসির মিষ্ট অভি-সম্পাতের আড়ালে আমি হয় ত একটা জমাট প্রভাত কাকলির প্রাচীর খাড়া করিয়াছি;—হয় ত উষার গোবৎস-হরণে তুষ্ট পুলিষের সাহচর্য্যে প্রবৃত্ত; তখন তুমি তোমার শ্রীমৎপ্রত্নতত্ত্ববিৎ নাসিকা বাহাদুরকে অগ্রগামী করিয়া আমার আলস্যের পুণ্য সমাধি উৎখাত করিতে আসিও না!

আমি যখন বলিব বাঙ্গালীর মেয়ে স্নেহের বৈশেষিক দর্শনে কনাদ, জীবনে বৈকুণ্ঠের স্রোত কাটিয়া আনিতে নেপো-লিয়ন, মরমে কথা ঢালিতে কালিদাস, স্বর্গ মর্ত্তে মিশামিশি দেখাইতে ভিক্টর হুগো; প্রতিভায় বাল্মীকি, করুণায় বুদ্ধদেব, ব্যাখ্যানে বেদব্যাস, চালনায় শ্রীকৃষ্ণ, মত্ততার গৌরাঙ্গ, ত্যাগে দধিচী; অমন সুন্দর কেহ মরিতে পারে না, মরণের সৌন্দর্য্য অমন কেহ বুঝিতে পারে না;—নমস্কার করি বাপু! অমন তোমার পরকোলা-আঁটা চোখ দুটী, বা টীকি-নাড়া অলঙ্কারের বুকুনী একটু তফাৎ করিয়া ফেলিও! তোমার কর-সেট-আঁটা নিরেট বিরাট সৌন্দর্য্য বা আলঙ্কারিক কৃত মনুষ্যহৃদয়ের জরীপি নক্সা আমরা উভয় বুঝিতেই সক্ষম! স্বীকার করিতেছি—তুমি একটা স্বার্থক জন্মা। তুমি না হইলে, ইষ্টক নির্ম্মাণ, পিষ্টকবিজ্ঞান, দুর্ব্বলের জীর্ণ গৃহের বহ্নি সংস্কারাদি গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্য আটক পড়িয়া থাকিত। স্বীকার করিলাম তুমি এই নীল আকাশের একটা

অবলম্বন-স্তম্ভ। তোমার তিরোভাবে আকাশের নীল সামিয়ানার এক দিক্ ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাইবে। নিদ্রিত দেবকুল তৈজস পত্রের মত আহা কি, গড়াইয়া পড়িতে পারেন। তুমি অনন্ত অস্থিবর—তুমি একটা দিগ্বারণ।

হিন্দুমহিলা।

অহল্যা।

(২)

অহল্যার ইতিহাস পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই; তাঁহার চরিত্রে যে জঘন্য কলঙ্ককালিমা আরোপিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; এস্থলে তাহার পুনরালোচনা করিয়া পাঠকদিগের রুচির গর্হনা করিতে ইচ্ছা করি না; তবে অহল্যা সম্বন্ধে ঐ ন্যাক্কারজনক বিবরণ কিরূপে কল্পিত হইল, এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইবে। এই ঘটনার সহিত ভগবান শ্রীরামের একটী অতুলনীয় অবদান প্রগাঢ়রূপে জড়িত, সুতরাং এই সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে হইবে।

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত; মুনিপত্নী অহল্যা পতিশাপে সর্ব্বলোকের অদৃশ্যা হইয়া সেই তপোবনে উৎকট তপস্যায় নিরত ছিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার পূর্ব্ব শাপ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীরামকে বলিলেন, "এই দেবরূপিণী মহাভাগা অহল্যাকে উদ্ধার কর।" গৌতমের শাপে অহল্যা এত দিন সর্ব্বলোকের অদৃশ্যা হইয়া ছিলেন; কিন্তু শ্রীরামের আগমনে এক্ষণে নিজ শাপাবসান-কাল অবগত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীরামলক্ষ্মণ তাঁহার সেই তপঃকর্ষিত তেজঃপুঞ্জ কলেবর দর্শন করিয়া সানন্দে তদীয় চরণ-যুগল গ্রহণ করিলেন। গৌতমের পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া সাধ্বী অহল্যা শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা আতিথ্য করিলেন। সেই সময়ে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি, এবং দেবদুন্দুভি নাদিত, হইতে লাগিল; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের মহানন্দধ্বনি উত্থিত হইল। দেবগণ তপোবল-বিশুদ্ধাঙ্গী গৌতমবশানুগা সাধ্বী অহল্যার সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন। এই সময়ে মহাতেজা গৌতম হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া অহল্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখ প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীরামকে বিধিবৎ পূজা করিয়া স্ত্রীপুরুষে মহাতপশ্চরণ করিতে লাগিলেন।

বাল্মীকীয় রামায়ণে অহল্যা-উদ্ধার সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইল। ইহাতে অতিপ্রাকৃতের অল্পই ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষয়টী অতীব গুরুতর; সুতরাং বিশদ-রূপে আলোচনা করা যাইতেছে। গৌতম ইন্দ্রকে শাপ দিয়া অহল্যাকে বলিতেছেনঃ—

"ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি
বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্ব্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি।
যদা ত্বেতদ্বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ।
আগমিষ্যতি দুর্দ্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি।
তস্যাতিথ্যেন দুর্বৃত্তে লোভমোহবিবর্জ্জিতা।
মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি॥" *.

অনাহারে বাত ভক্ষণ করিয়া তপঃ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া এই আশ্রমে বহু সহস্র বৎসর ভস্মশয়নে বাস করিবি। তাহার পর দশরথাত্মজ দুর্দ্ধর্ষ রাম যখন এই বনে আগমন করিবেন, তখন তুই পবিত্রতা লাভ করিবি। রে দুর্বৃত্তে! লোভ মোহ বর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য করিয়া সানন্দে পুনর্ব্বার আমার সহিত মিলিত হইবি এবং নিজ দেহ ধারণ করিবি।

কথিত আছে অহল্যা গৌতমের শাপে পাষাণী হইয়াছিল; কিন্তু এস্থলে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। পুনশ্চ অহল্যার উদ্ধারকালে বাল্মীকি যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহাও উদ্ধৃত হইল।

"বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশহ॥
দদর্শচ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ॥
প্রযত্নান্নির্ম্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥
স তুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
মধ্যেঽম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্য্যপ্রভামিব॥
সা হি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভূবহ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্রামস্ত দর্শনম্॥
শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা।
রাঘবো তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা॥
স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ।
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং চকার সুসমাহিতা॥"

মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন;—করিয়া তপস্যা দ্বারা দ্যোতিতপ্রভা ও সুরাসুরের দুর্নিরীক্ষ্যা মহাভাগা অহল্যাকে দেখিতে পাইলেন,—দেখিলেন বিধি যেন তাঁহাকে পরম যত্ন সহকারে দিব্য মায়াময়ীর ন্যায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন; তিনি ধূমাচ্ছন্ন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা, তুষারাবৃতা অভ্রান্বিতা পূর্ণচন্দ্রপ্রভা, ও সলিল মধ্যস্থ দীপ্ত সূর্য্যপ্রভার ন্যায় দুরাধর্ষা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। গৌতমের বাক্যানুসারে শ্রীরামের দর্শন পর্য্যন্ত তিনি ত্রিলোকেরও দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়াছিলেন। এক্ষণে শাপাবসানে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে আরূঢ় হইলেন। তখন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ আনন্দ সহকারে তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করিলেন এবং অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের উভয় ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া সুসমাহিত চিত্তে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের আতিথ্য করিলেন।

এস্থলেও পাষাণের মানবীকরণ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই। অহল্যা গৌতম-শাপে সর্ব্বভূতের দুর্নিরীক্ষ্যা অথচ তপস্যা দ্বারা দ্যোতিতপ্রভা হইয়া ধূমাচ্ছন্ন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা, তুষারাবৃতা পূর্ণচন্দ্রপ্রভা ও সলিল মধ্যস্থা প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন;

* বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৪৮ সর্গ।

সুতরাং তিনি যে পাষাণী হইয়া নির্জ্জীব-ভাবে তথায় পতিত ছিলেন, একথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। মহর্ষি বাল্মীকির এই কয়েকটী কথা তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, অহল্যা-উদ্ধার ব্যাপারে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দেব-ভাবের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। অহল্যা গৌতমের বাক্যে সর্ব্বভূতের অদৃশ্যা হইয়া ছিলেন শ্রীরামকে দেখিয়া সকলের সম্মুখে দেখা দিলেন। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার পাদ-যুগল স্পর্শ করিলেন। শ্রীরামের আগমনে তাঁহার শাপকালের অবসান হইল জানিয়া তিনি সকলকে দেখা দিলেন। সুতরাং তিনি যে এতদিন পাষাণীর ন্যায় নির্জ্জীব ভাবে ছিলেন এবং রামের পাদ স্পর্শে মানবী হইলেন, ইহারও কোন স্থলে সেরূপ কোন বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, কবিগুরু বাল্মীকি অহল্যা-উদ্ধারকে শ্রীরামের অতিপ্রাকৃত কার্য্য (Miracle) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই; অপিচ এ কার্য্যে যে শ্রীরামচন্দ্রের দেবভাবও আরোপিত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। অতএব অহল্যা উদ্ধার বাল্মীকির মতে শ্রীরামের অতিপ্রাকৃত-কার্য্য নহে এবং এই কার্য্যে শ্রীরামের উপর দেবত্ব আরোপিত হয় নাই; বরং একস্থলে নির্ব্বিশেষণ শুদ্ধ দশরথাত্মজ শব্দ দ্বারা শ্রীরামের মানবত্ব প্রতিপাদিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। গৌতম অহল্যাকে শাপ দিয়া বলিলেন "দুষ্টে! তুই পরমেশ্বর শ্রীরামকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া আমার এই আশ্রমস্থ শিলাতলে থাকিবি *।" তাহার পর তাঁহার উদ্ধারের উপায় উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, "এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে যখন দশরথাত্মজ শ্রীমান্ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়া চরণ দ্বারা তোর আশ্রয়শিলা স্পর্শ করিবেন, তখনই তুই শাপ হইতে বিমুক্ত হইবি †" শুদ্ধ ইহাই নহে, শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অহল্যা যে কয়েকটী স্তোত্র দ্বারা শ্রীরামের পূজা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটীতেই তাঁহার পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তন্মধ্য হইতে কেবল একটী শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত হইলঃ—

"অয়ং হি বিশ্বোদ্ভবসংযমানা
মেকঃ স্বমায়াগুণবিম্বিতো যঃ।
বিরিঞ্চিবিষ্ণীশ্বরনামভেদান্
ধত্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণআত্ম।" ‡

ইনিই একাকী বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা; স্বীয় মায়াজনিত সত্ত্বরজস্তম প্রভৃতি গুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিরিঞ্চি, বিষ্ণু ও শিব এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়া থাকেন; পরন্তু ইনি স্বতন্ত্র, অব্যয়, পরিপূর্ণ, পরাত্মা।

অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামের পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব স্বীকৃত হইলেও, কিরূপ অতি

* অধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় ২৭।২৮ শ্লোক।

† অধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় ৩০।৩১ শ্লোক।

‡ অধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক।

প্রাকৃত কার্য্য দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে; সেই সঙ্গে, অহল্যা উদ্ধার উপাখ্যানটী ঐতিহাসিক কি না তাহার যথাসাধ্য সমালোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ বাল্মীকীয় রামায়ণে লিখিত আছে, শ্রীরামকে দর্শন করিবমাত্র অহল্যা পতিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এস্থলে অধ্যাত্ম রামায়ণকার বলিতেছেন যে, শ্রীরাম স্বীয় চরণ দ্বারা অহল্যার সেই আশ্রয়-শিলা স্পর্শ করিয়াই সেই তপস্বিনীকে দেখিতে পাইলেন; অর্থাৎ শ্রীরামের চরণস্পর্শে অহল্যার পাপ বিমুক্ত হইবামাত্র তিনি সকলকে দেখা দিলেন। (বলা বাহুল্য এতদিন তিনি সর্ব্বজীবের অদৃশ্যা হইয়া ছিলেন।) অহল্যা উদ্ধার সম্বন্ধে বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণকারের যে, ঐকমত্য নাই, এস্থলে তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। অহল্যার শাপ ও উদ্ধার প্রসঙ্গে স্বয়ং বাল্মীকি, গৌতম, অহল্যা বা বিশ্বামিত্র কেহই এস্থলে শ্রীরামকে পূর্ণব্রহ্ম অথবা তাঁহার অন্যতম গুণাত্মক বিষ্ণু বলেন নাই *। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণকার তাঁহাকে একেবারেই পরাৎপর পরব্রহ্ম নারায়ণরূপে অবতারিত করিয়াছেন। অবশ্য বাল্মীকি-রামায়ণ যে, অধ্যাত্ম রামায়ণের বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না; সুতরাং বাল্মীকীয় রামায়ণের ছায়া অবলম্বনে যে, অধ্যাত্ম রামায়ণ রচিত হইয়াছে, একথাও বলা অন্যায় নহে। মূল গ্রন্থে যাহা নাই, অনুকরণে তাহা দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণই নাই; কেন না অধ্যাত্ম রামায়ণকার শ্রীরামের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশেই উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ অহল্যাহরণ বৃত্তান্ত বাস্তবিক ঐতিহাসিক কি না এস্থলে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। রামায়ণের পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে অহল্যা ও গৌতমের এরূপ কোন বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রামায়ণের পরবর্ত্তী সকল গ্রন্থেই বিশেষতঃ মহাভারতের স্থানে স্থানে ইন্দ্রকর্ত্তৃক অহল্যা-হরণের

* রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৩য় সর্গে এ সম্বন্ধে আর একটী উপাখ্যান আছে। তাহার একস্থলে শ্রীরাম নরদেহধারী বিষ্ণু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তদ্যথা,—

উৎপৎস্যতি মহাতেজা ইক্ষ্বাকুণাং মহারথঃ।
রামো নাম শ্রুতো লোকে বনং চাপ্যুপযাস্যতি॥
ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্বিষ্ণুর্মানুষবিগ্রহঃ॥
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে ততঃ পূতা ভবিষ্যসি।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যে কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাস বর্ণিত আছে, অনেকে সেগুলিকে বাল্মীকি রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে এই সর্গটীকেও প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে। যদিও বাল্মীকি শ্রীরামের পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ সংক্রান্ত বিবরণ বর্ণন করিবার সময় তাঁহাকে নরদেহধারী বিষ্ণু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি অহল্যা উদ্ধারের মৌলিক উপাখ্যানে শ্রীরামচন্দ্রের বিষ্ণুত্বের অণুমাত্রও উল্লেখ না থাকাতে একটা বিষম সন্দেহ রহিয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখা যায় *। উত্তর-কাণ্ডে অহল্যার জন্ম, বিবাহ, হরণ ও উদ্ধার সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে। তাহাতে অহল্যা সৃষ্টির প্রথমা রমণী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং পিতামহ, অমরেন্দ্রের নিকট অহ-ল্যার সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিতেছেন, "পূর্ব্বে আমি যে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহাদিগের এক বর্ণ, সমান ভাষা ও একই প্রকার রূপ ছিল; তাহাদিগের দর্শনে বা লক্ষণে কিছুই প্রভেদ ছিল না। সেই প্রজাকুলের সেইরূপ ভাব দর্শনে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং তাহাদিগের পার্থক্য সাধন করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকের অঙ্গ প্রত্য-ঙ্গের উৎকৃষ্টাংশ লইয়া একটী রমণী সৃষ্টি করিলাম। তাহারই নাম অহল্যা " অনন্তর ব্রহ্মা অহল্যা শব্দের ব্যুৎপত্তি নিষ্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্রকে বলিতেছেন, "হল অর্থে বৈরূপ্য; সেই হলে অর্থাৎ বৈরূপ্যে যাহার জন্ম, তাহাকে হল্য বলা যায়। যাহার হল্য নাই, অর্থাৎ যে রমণী রূপবতী; সেই রমণীই অহল্যা। সেই জন্যই আমার সৃষ্টা সেই বামলোচনা অহল্যা নামে প্রসিদ্ধ।" ইহার পর মহর্ষি গৌতমের সহিত অহল্যার বিবাহ; ইন্দ্রকর্ত্তৃক অহল্যা-হরণ, গৌতমের শাপ এবং পরিশেষে অহল্যার শাপ মোচন প্রভৃতি বিবরণ পূর্ব্বের ন্যায় একরূপই দেখা যায়। কেবল একটী স্থানে অল্প মাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয়;—আদি কাণ্ডে অহল্যার শাপমোচন সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে তাহার কোন স্থানেই শ্রীরাম বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন নাই; কিন্তু এই উত্তরকাণ্ডে তাঁহার বিষ্ণুত্বের উল্লেখ দেখা যায়। সে যাহা হউক, অহল্যা যে সৃষ্টির আদ্যা স্ত্রী নহেন, হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তাহা অবগত আছেন। তবে এ অহল্যা কে? সেই গৌতম, সেই ইন্দ্র, সেই শ্রীরাম,—সকলেরই উল্লেখ এবং সেই একই রূপ সমাবেশ দেখা যাইতেছে, অথচ আদৌ অহল্যাকে লইয়া বিষম সমস্যা। গৌতম-পত্নী অহ-ল্যাকেই আদ্যা মানবী বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে অন্যান্য শাস্ত্রবচনের সহিত বিষম বিরোধ ঘটিবে। শ্রুতি স্মৃতির সহিত এস্থলে মহাকাব্যের বিরোধ উপ-স্থিত; সুতরাং এস্থলে শ্রুতিস্মৃতির বচনই গ্রাহ্য; অতএব এ উপাখ্যানটী কতদূর মৌলিক, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। অনেকেই ইন্দ্র ও অহল্যার উপাখ্যানকে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ত বলিবেনই; ভারতীয় প্রসিদ্ধ প্রাচীন আচার্য্য ভট্ট কুমারিল স্বামীও ইহাকে রূপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এস্থলে অহল্যা রজনী এবং ইন্দ্র সূর্য্যের অর্থে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্য রজনীকে জীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় করেন বলিয়া রজনীর অর্থাৎ অহল্যার জাররূপে আখ্যাত হইয়াছেন *।

* "অহল্যা ধর্ষিতা পূর্ব্বমৃষিপত্নী যশস্বিনী।
জীবতো ভর্ত্তুরিন্দ্রেণ স বঃ কিন্ন নিবারিতঃ॥"
মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব।

অপিচ, মহাভারতের অন্যত্র;—
"অথ শপ্তশ্চ ভগবান গৌতমেন পুরন্দরঃ।
অহল্যাং কাময়ানোবৈ ধর্ম্মার্থঞ্চ ন হিংসিতঃ॥"

* (ক) "সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্য সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়া

ইন্দ্রের অহল্যা-হরণ বৃত্তান্তের ন্যায় প্রজাপতি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সাবিত্রী, গায়ত্রী বা শতরূপার হরণ বিবরণও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল গ্রন্থ পবিত্র শাস্ত্র বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে আদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে যে, এরূপ রুচিবিগর্হিত ধিক্কারজনক জঘন্য ব্যাপারের উল্লেখ থাকিবে, এবং যে সকল দেবতা হিন্দুর পরম আরাধ্য বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা যে, আপনাদের দেবত্ব ভুলিয়া নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এরূপ পৈশাচিক বা পাশব ব্যবহার করিবেন, এ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিতেও হৃদয় উন্মত্ত হইয়া পড়ে। যদি ইন্দ্রের গুরুপত্নী-হরণ এবং ব্রহ্মার কন্যাভিগমন বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের দেবতার আসন পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট পশুর মলদিগ্ধ মহাতলে অথবা পিশাচের প্রেতভূমে বাস করা উচিত ছিল। শাস্ত্রকারগণ যে শাস্ত্রের ও যে সকল দেবতার প্রকৃষ্টতা সাধন করিবার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের ও ধর্ম্মতত্ত্বের সারভূত অংশ সমুদায়ের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাই যে, জানিয়া শুনিয়া এরূপ নিকৃষ্ট, হেয় ও ঘৃণ্য ব্যাপারের উল্লেখ করিবেন, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

আর একটী বিষয় এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। ঋগ্বেদাদি অতি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে "ইন্দ্র" শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ;—কোথাও সবিতা, কোথাও সূর্য্য, কোনও স্থানে বা আকাশের অর্থে ইন্দ্র শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পৌরাণিক শচীপতি ইন্দ্র বৈদিক ইন্দ্র নহেন। পুরাণকারেরা ইন্দ্রের যেরূপ নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র সগুণত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, বেদে সেরূপ কিছুই নাই। বৈদিক ইন্দ্রের এইরূপ নানারূপত্ব পৌরাণিক উপাখ্যান-রচয়িতৃগণের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে নানা আকারে কল্পিত হইয়াছে; এমন কি ব্রহ্মা, সূর্য্য বা আকাশ বাচক এক একটী শব্দ অথবা বিশেষণ পদ লইয়া পৌরাণিকেরা এক একটী উপাখ্যান

ক্ষয়াত্মকজরণহেতুতাজ্জীর্যাত্যস্মাদনেন বোধিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যাভিচারাৎ ॥"

(খ) প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ম্যাকসমুলর সাহেবও এসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তৎপ্রণীত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ৩২০ পৃষ্ঠা দেখিবেন।

(গ) কিছুকাল পূর্ব্বে 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রিকায় ইন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে একটী নূতন(?) মত প্রচার হইয়াছিল। প্রয়োজন বোধে এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। সেই প্রবন্ধের লেখক অহল্যাকে ভূমি এবং ইন্দ্রকে আকাশ অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিতেছেন :—

"সকলেই জানেন হল বলে লাঙ্গলকে। অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কর্ষিত হয় না,—কঠিন অনুর্ব্বর। ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল করেন,—জীর্ণ করেন, এইজন্য ইন্দ্র অহল্যাজার। জৄ ধাতু হইতে জার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন; এইজন্য তিনি অহল্যাতে অভিগমন করেন।"

"প্রচার" ১ম বর্ষ, এবং বঙ্গ দর্শন" ১২৮১ সাল ৪৬৮ পৃষ্ঠা।

বেদের নিরুক্তকার দুর্গাচার্য্যও ঠিক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রচারে তাহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়।

রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল উপাখ্যানের অধিকাংশ আদৌ কাল্পনিক হইলেও প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া প্রায়ই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইন্দ্রের অহল্যাহরণ বৃত্তান্ত যে, ইন্দ্রের সেইরূপ রূপক অথবা গুণবাচক বাক্য অবলম্বনে উপাখ্যানাকারে রচিত হয় নাই, তাহা সহজে বলা যাইতে পারে না। বেদে যে পদ বৈদিক ইন্দ্রের সামান্য গুণবাচক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, পুরাণে ও মহাকাব্যে হয়ত তাহা শ্রীরামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব ও অতিপ্রাকৃত কার্য্যের প্রমাণ রূপে একটী উপাখ্যানের আকারে বিবৃত হইয়া থাকিবে। পরন্তু এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২

বাঙ্গালার প্রাচীন কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির রচনা প্রাঞ্জল ও প্রেমভক্তি-রসাত্মক। ইহাতে সুদীর্ঘ শব্দের আড়ম্বর নাই, ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধি নাই ;—মানসিক ভাব-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস মাত্র। ইহাদের গ্রন্থে প্রচলিত—অমিয়া, হাম্, ভাঁতি, গোপতে, ভেল, ঐছন, যৈছন, কহব, জনু, তছু, অনুখন, হোয়ল, মিলায়ল প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত-মূলক ; রূপান্তরিত হইয়া হিন্দি ভাবাপন্ন হইয়া তৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। ঐ সকল শব্দ আরও রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষাতেও বিরাজিত রহিয়াছে ; উক্ত শব্দগুলিকে কেহ কেহ "ব্রজবুলি" আখ্যা প্রদান করেন কিন্তু ব্রজবুলী হিন্দিরই প্রকারান্তরমাত্র।

এই সময় ও ইহার পরবর্ত্তী কিয়ৎ-কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমুদয়ই কৃষ্ণ-প্রেম বিষয়ক পদাবলী। তখন গদ্য-রচনার প্রচলন ছিল না ; তখন বিজ্ঞান-চর্চ্চার বাহুল্য হয় নাই। অনুভাবকতা ও কল্পনাই কবিত্বের প্রধান উপকরণ, বাঙ্গালী তখন অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, কুসংস্কারাবদ্ধ ; বিজ্ঞানের প্রদীপ্ত রশ্মি তখন বাঙ্গালার হৃদয় আলোকিত করে নাই, তখন পঞ্চভূত স্থলে চৌষট্টি ভূতের কথা বাঙ্গালী শিখে নাই। অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য, তাই বাঙ্গালী কাব্যপ্রিয়। বাঙ্গালী তখন প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের চক্ষে দেখিতে জানিতেন না ; সকল বস্তুতেই পরাৎপরের মহিমা ও সত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রেমে পুলকিত হইয়া ভাব-তরঙ্গে আপ্লুত হইতেন এবং সেই ভাব ছন্দোময় রচনায় গান করিয়া প্রেমিকের হৃদয়ে আনন্দধারা বর্ষণ করিতেন। আবার সেই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও তাৎকালিক প্রেমভক্তি বিষয়ক

কবিতাময়ী রচনার আবশ্যকতা স্পষ্ট অনুভূত হয়। এই সময়ে অর্থাৎ চৈতন্য-দেবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে—শোচনীয় ধর্ম্ম-বিপ্লবে বঙ্গভূমি জর্জ্জরিত হইতেছিল, তান্ত্রিকগণের পাশবাচারে, "পঞ্চমকারের" ব্যভিচারে, জাতিভেদের কঠোরতায় বিপ্লুত হইতেছিল, প্রেমভক্তির অভাবে মানব-হৃদয় পাষাণ সদৃশ হইয়াছিল। সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনেই এই সকল বৈষ্ণবগণের অমৃতময়ী কবিতারশ্মি দশদিক আলোকিত করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া ভক্তিরসে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিল। এই দুরন্ত যবনাধিকারকালে, সামাজিক ঈদৃশ বিপ্লবে এই ভক্তিরসাত্মক গীতি কাব্যই যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তৎসাময়িক মহাপুরুষেরা অবগত ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা এই সকল গীতি-কাব্যের প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে এক অভূতপূর্ব্ব রসভাণ্ডার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে কুলীনগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গুণরাজ খাঁ (কায়স্থ) শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য এবং কাঞ্চনপল্লী নিবাসী কবি কর্ণপুর প্রণীত চৈতন্যলীলা ও ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন দাস প্রণীত চৈতন্য ভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্য চরিতামৃত বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে প্রবেশ করে। এই সকল গ্রন্থও পদ্যে লিখিত। ইহাতেও অনেক হিন্দি ও পারস্য শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে বাঙ্গালায় পাঠানেরা রাজত্ব করিতেন; এই পাঠান রাজত্ব কালেই আরব্য ও পারস্য শব্দ সকল বঙ্গ ভাষায় প্রবেশ লাভ করে এবং "চৈতন্য-চরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙ্গালা ভাষার হিন্দি ভাব, হিন্দি শব্দ অনেকাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত ও বর্ত্তমান আকারের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। ফলতঃ এই চৈতন্য চরিতামৃতের পর হইতেই বাঙ্গালা ভাষার মধ্যাবস্থার সূত্রপাত।

চৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত অনেক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি চৈতন্য চরিতামৃতের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥

আজিও পূর্ব্ববঙ্গে যাইমু, খাইমু, প্রভৃতি ক্রিয়ার শেষে "ম" সংযোগ করার প্রথা আছে।

এই সময়ে বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঘোরতর বিদ্বেষ চলিতে থাকে, এই সময়ে অনেকেই শাক্ত মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, সুতরাং শাক্তেরা শক্তি মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য শক্তিবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সময়েই "মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী" "চণ্ডী" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মুকুন্দরামের জন্মস্থান দামুন্যাগ্রাম। কিন্তু তিনি মুসলমান অত্যাচারে জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী আড়বা গ্রামে গমন করিয়া তত্রত্য রাজা রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়ে বাস করেন এবং তাঁহার আদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি এই চণ্ডী কাব্য লিখিয়াই "কবিকঙ্কণ" উপাধি প্রাপ্ত হন, এই জন্যই

আজিও তাঁহার গ্রন্থকে লোকে "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" বলিয়া থাকে। "চণ্ডী"র রচনা বর্ত্তমান ভাষার অনেক নিকটবর্ত্তী, ইহাতে পারস্য বা হিন্দি শব্দের ব্যবহার অনেক কম আছে। রচনা সরল ও প্রাঞ্জল, ইহার রচনায় তৎকাল প্রচলিত সামাজিক প্রথার পূর্ণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

"বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।
কেহ জল দেয় কেহ চরণ পাখালে॥
আহড়ে থাকিয়া রম্ভা জামাতা নেহালে।
আইও স্বয়ো আনিতে বিজয়া দাসী চলে।
এক চক্ষু কোণে কেহ দিয়াছে অঞ্জন।
এক কর্ণে কর্ণফুল ত্বরায় গমন॥

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

সামাজিক প্রথা ও রুচির পরিবর্ত্তনানুযায়ী ভাষার রচনা-প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ; সুতরাং চণ্ডীকাব্য ও তৎসমসাময়িক কৃত্তিবাস এবং পরবর্ত্তী কাশীরামদাসের রচনার সহিত বর্ত্তমানে প্রচলিত গ্রন্থের রচনায় রূপবর্ণনাদিতে অনেক পার্থক্য দেখা যায় ; কালবশে, রুচিভেদই ইহার কারণ। কাশীদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির ও বর্ত্তমান কবি নবীনচন্দ্রের রূপ বর্ণনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশীমুখী
কিবা দিব রূপের উপমা।
সুচারু নিতম্ব সাজে, চরণে পঙ্কজ রাজে,
মণিময় কাঞ্চন নুপূর
জিনিয়া কুঞ্জর কুম্ভ, কুচ যুগ করে দম্ভ
কেবা দিতে পারে উপমান।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ রুচি কত শুচী করিয়াছে শোভা॥

কাশীরাম দাস।

ভারতচন্দ্রের রচনাতে ও রূপবর্ণনাদিতে এই প্রকার উপমা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান কবিগণের বর্ণনায় উক্ত প্রকার উপমা অতি বিরল। নবীন বাবু উত্তরার রূপ বর্ণনে লিখিয়াছেন—

"ক্ষুদ্র এক খণ্ড ফুল্ল নিরমল,
বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরি,
সৃজিলেন বিধি মূর্ত্তি উত্তরার,
আনন্দ নির্ঝর নয়ন তারা,
আনন্দ নির্ঝর ক্ষুদ্র রক্তাধর
ঢালে অবিরল আনন্দ ধারা।

কুরুক্ষেত্র কাব্য।

পুরাকালীন কবিগণ গ্রন্থের প্রারম্ভে দেবদেবীর বন্দনাদি করিয়া গ্রন্থ সূচনা করিতেন এবং গ্রন্থ মধ্যে আত্মপরিচয় ও প্রণয়নের কাল নির্দ্দেশ করিতেন। বর্ত্তমান কাব্যাদিতে আর সে সকল দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ সামাজিক প্রথা ও রুচির পরিবর্ত্তনে যে রচনার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা নিশ্চয়।

বঙ্গভাষায় রামায়ণ-প্রণেতা কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিকঙ্কণের সমসাময়িক। মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্য প্রণয়নের সময় নির্দ্দেশার্থ স্বয়ং লিখিয়াছেন ;—

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, চণ্ডীকাব্য ১৪৯৯ শকে অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত। কৃত্তিবাস পণ্ডিত,

জাতিতে ব্রাহ্মণ; ইনি পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী রাজা বেদানুজের সভাসদ্ নৃসিংহ ওঝার বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ইনি নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ফুলিয়া গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন; কৃত্তিবাস স্বীয় জন্মভূমি ফুলিয়াকে "স্থানের প্রধান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "ফুলিয়া" গ্রামকে কৌলিন্য মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ "মেল" বলিয়া দেবীবর ঘটক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, যখন কৃত্তিবাস রামায়ণ প্রণয়ন করেন, তখন দেবীবর ঘটকের "মেলবন্ধন" হইয়াছে। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের এক স্থলে লিখিয়াছেন;—

"স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়া নিবাস।
রামায়ণ গায় দ্বিজ মনে অভিলাষ"॥

বর্ত্তমান সময়ের শ তিনশত বৎসরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে "মেলবন্ধন" হইয়াছে। সুতরাং মেলবন্ধনের কিঞ্চিৎ পরেই কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ-রচনার সময় নির্দ্দেশ করিতে হয়। ইনি চৈতন্যদেবের তিরোভাবের প্রায় ৪০ বৎসর পরে রামায়ণ রচনা করেন, সে সময়ে নবদ্বীপ যে মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার রামায়ণের একস্থলে উক্ত রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"গঙ্গারে লইয়া যান আনন্দিত হইয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া॥"

কথিত আছে ইনি ও ইহার ন্যূনাধিক শতবর্ষ পরবর্ত্তী কাশীরাম দাস (কায়স্থ) কথকের কথকতা শুনিয়া রামায়ণ ও মহাভারত প্রণয়ন করেন। রামায়ণের রচনা অপেক্ষা মহাভারতের রচনা অনেক মার্জ্জিত এবং শব্দ বিন্যাস, বর্ণনা ও অলঙ্কারাদিতেও প্রথমোক্ত অপেক্ষা শেষোক্ত অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; ফলতঃ এই কাশীদাস হইতে বঙ্গভাষা পরিমার্জ্জিত হইয়া, সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্রের হস্তে পরিপুষ্ট ও অলঙ্কৃত হইয়া বর্ত্তমান আকারে উপস্থিত হইয়াছে। কাশীদাস কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সিঙ্গী নামক গ্রামবাসী।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পাঠানেরা ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দেই প্রথম পানিপথ যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী মোগলের প্রতি সুপ্রসন্ন হন। আদি কবি বিদ্যাপতি হইতে "চৈতন্য চরিতামৃত" প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে আমরা পাঠান রাজত্বে দেখিতে পাই। চৈতন্য চরিতামৃত পর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যের আদিম অবস্থা অর্থাৎ পাঠান শাসনকালেই বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিম অবস্থা, কবিকঙ্কণ হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ মোগল রাজত্বে ইহার মধ্যাবস্থা এবং ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে "অন্নদামঙ্গল" হইতে অর্থাৎ ইংরাজ রাজত্বে ইহার বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার প্রথম গ্রন্থ "অন্নদামঙ্গল"। রচনা সরল, সুললিত এবং নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। ইহাতে পার্সী ও আর্‌বি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু সংস্কৃত মূলক শব্দই অধিক। ভারতচন্দ্র রায় ইহার প্রণেতা। ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী "পেঁড়ো" গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান; বর্দ্ধমানাধিপতির অত্যাচারে তথা হইতে পলায়ন করিয়া কাব্যরসামোদী, গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে বাস করিয়া তাঁহারই আদেশে "অন্নদামঙ্গল"

"বিদ্যাসুন্দর," "চোরপঞ্চাশৎ" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল রচনায় প্রসাদ গুণ ছন্দের পারিপাট্য, বাক্যের মাধুর্য্য, ভাব ও রসের অবতারণ অতীব উৎকৃষ্ট। "অন্নদামঙ্গল" প্রণয়নের সময় নির্দ্দেশ করিয়া কবি একস্থানে এইরূপ লিখিতেছেন,—

"বেদে লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচিত সংস্কৃত-বাঙ্গালা-হিন্দি-পারস্য মিশ্রিত অনেক কবিতা আছে; নিম্নে একটী উদ্ধৃত হইল।

"শ্যাম হিতে প্রাণেশ্বর,
বারদ্‌কে গোয়াদ্ কুবর্
কাতর দেখে আদর কর,
কাঁহে মবুবো রোয়কে।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা,
ছুঁলানা চে মেরা
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা,
মেট্টিমে কাঁহে শোয়কে॥

ভারতচন্দ্রের "পাদপূরণের" আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার সভাসদেরা আমোদ করিয়া কবিকে নানা প্রকার বাক্যাংশ দিয়া অবশিষ্ট "পাদপূরণ" করিতে কহিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অদ্ভুত শক্তিবলে অবিশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া কবিতা প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এরূপ কবিতা অনেক আছে, তন্মধ্যে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

একদিন মহারাজ কবিকে কহিলেন—"পায়, পায় পায় না" কবি তৎক্ষণাৎ কবিতা রচনা করিলেন,—

"গেল সকল সম্পদ, এক্ষণে পরম পদ
বাকী আছে এক পদ ঋণ শোধ যায় না।
হ্রাদে শুনি হৃদিপ্রিয়ে, বৃন্দা দেবী দেখসিয়ে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে "পায় পায় পায় না"॥

কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কিঞ্চিদধিক আড়াই শত বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও উভয়ের বর্ণনা ও রচনা প্রণালীতে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কালক্রমে ভাষা পরিমার্জ্জিত ও উন্নত হওয়ায় অবশ্য ভারতের ভাষা কবিকঙ্কণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও ছন্দ, ভাব, অলঙ্কার, অনুপ্রাসাদিতে উভয়ের সাদৃশ্য দর্শনে বোধ হয় যে "অন্নদামঙ্গল" চণ্ডী কাব্যের অনুকরণে লিখিত। উভয় গ্রন্থই শক্তিবিষয়ক। উভয়ের রচনার স্থান বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে উভয়ের ছন্দ, অনুপ্রাস ও ভাবের সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রমাণ হইবে—

যখন ভগবতী সামান্যা রমণীবেশে ব্যাধপত্নী ফুল্লরার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তখন কবিকঙ্কণ লিখিতেছেন।

"বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল।
সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল॥
কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে।
বরঞ্চ গরল খায়, মোর পানে নাহি চায়
ভবন ছাড়িনু এই দুঃখে॥
বিষ কণ্ঠা মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি
তাহে হইল সতিনী প্রবলা।
সতীনের বাক্য জ্বালা, কতবা সহিবে বালা
পরিতাপে হয়ে গেনু কালা॥

পাটনীর নিকট অন্নদার আত্মপরিচয় স্থলে ভারতচন্দ্র ঠিক সেই ভাবে লিখিলেন।

"গোত্রের প্রধান পিতা মুখ বংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত॥

কুকথায় পঞ্চ মুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥

কবিকঙ্কণ একস্থলে তোটক ছন্দে লিখিয়াছেন—

"দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ"

ভারতচন্দ্রও সেই ছন্দে লিখিলেন,—

"পণে জাতি কেবা চায়,পণে জাতি কেবা চায়
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়।"

চণ্ডীর একস্থলে এইরূপ অনুপ্রাস আছে,—

পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন।
তুলা, তনু, তাপ, তৈল, তাম্বুল তপন॥

আবার ভারতের অনুপ্রাস,—

চেতরে, চেতরে চিত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥

ক্রমশঃ—

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রঘুনাথ গোস্বামীর জীবন চরিত।

প্রতিবাদের উত্তর।

বিগত মাঘ মাসের "সমীরণে" শ্রীযুক্ত বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় মৎ-প্রণীত শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত গ্রন্থের কএকটী ভ্রম প্রমাদের উল্লেখ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অচ্যুত বাবুর এই প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সমীরণেই প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায়, এই প্রবন্ধটী প্রেরিত হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমীরণে প্রকাশিত করিলে কৃতার্থ হইব।

১। অচ্যুত বাবুর প্রথম আপত্তি এই যে, "রঘুনাথের জীবনকাল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম—নীলাচল-বাস পর্য্যন্ত পূর্ব্ব জীবন; ২য়—বৃন্দাবনবাস—দেহত্যাগ পর্য্যন্ত শেষ জীবন। আলোচ্য পুস্তিকায় গোস্বামীর পূর্ব্বজীবন বর্ণিত হইয়াছে, শেষ জীবনের কোন কাহিনী এ পুস্তকে বিবৃত হয় নাই।" বোধ হয় অচ্যুত বাবু আমার গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই। গ্রন্থের ২৫ ও ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "রঘুনাথ বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড-তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠাসহকারে অতি দুঃসাধ্য তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।* * বৃন্দাবনে আসিয়া রঘুনাথ অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল যৎসামান্য মাঠা (ঘোল) মাত্র পান করিয়া জীবনধারণ করিতেন। রঘুনাথ প্রতি দিন তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে স্নানান্তে ব্রজবাসিগণকে আলিঙ্গন করিতেন। প্রত্যহ একলক্ষ হরিনাম জপ, সহস্র বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা ও এক প্রহরকাল শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক

গুণচরিত্র আলাপন এবং অবশিষ্ট সময় রাধাকৃষ্ণের ধ্যানধারণা মানসপূজায় অতিবাহিত করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থই মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণের লীলা সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীচরিতামৃত অবলম্বন করিয়াই আমি এই সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিয়াছি। বৃন্দাবন বাস সময়ে দাস গোস্বামীর সম্বন্ধে ২।৪টী অলৌকিক গল্প বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে; বর্ত্তমান সময়ের অনুপযোগী বিবেচনায় আমি তাহার উল্লেখ করি নাই।* অচ্যুত বাবু যদি আমার গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সত্যের অপলাপ করিয়া "শেষ জীবনের কোন কাহিনী এ পুস্তকে বিবৃত হয় নাই" এই কথা কিরূপে লিখিলেন বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যে জানিয়া শুনিয়া পাঠকদের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। এই জন্যই বলিতেছি অচ্যুত বাবু আমার গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই।

আমার দ্বিতীয় অপরাধ আমি পরম ভাগবত প্রসিদ্ধ যবন হরিদাসকে "যবনকুলোদ্ভব" লিখিয়াছি। অচ্যুত বাবু বলিতেছেন, "কিন্তু হরিদাসের জন্ম সম্বন্ধে সংশয় আছে। কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত যে, হরিদাসের পিতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। * * বস্তুতঃ হরিদাস ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান। * * যখন এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, তখন স্পষ্টাক্ষরে "যবন সন্তান" বলা যুক্তিযুক্ত কি?" যদি "মতদ্বৈধ"ই আছে, তবে অচ্যুত বাবুই বা কিরূপে "বস্তুতঃ হরিদাস ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান" বলিতে পারেন? কোন্ কোন্ প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে হরিদাসের পিতামাতার বিবরণ লিখিত আছে, অচ্যুত বাবুর তাহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল। প্রসঙ্গত অচ্যুত বাবুকে একটী কথা বলি, সংস্কৃত শ্লোক মাত্রই যেমন ঋষিবাক্য নয়, সেইরূপ পয়ার বা ত্রিপদীচ্ছন্দে রচিত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ মাত্রই প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ নহে। বিগত মার্চ্চ মাসের "দাসী" পত্রিকায় আমি অচ্যুত বাবুর একটী প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচরিতামৃত, এই দুই খানি, সর্ব্বজন সমাদৃত প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, হরিদাস যবনকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষ

* পাঠকগণ হয় ত অবগত নহেন যে, অচ্যুত বাবুও একখানি রঘুনাথ চরিত লিখিয়াছেন। আমার গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে অচ্যুত বাবুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অচ্যুত বাবু স্বীয় গ্রন্থে একটী অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী—"আর একদিন দাস গোস্বামীর অজীর্ণ হইয়া শরীর ভার ভার হইল, ইহা শুনিয়া প্রসিদ্ধ বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিট্ঠলনাথ দুইজন চিকিৎসক লইয়া আসিলেন। নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসক কহিলেন যে, দুগ্ধান্ন ভক্ষণেই এইরূপ হইয়াছে। সকলেই জানেন—দাস গোস্বামী অন্ন খান না, অতএব এই কথায় বিট্ঠলনাথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এ কখনই হইতে পারে না।" দাস গোস্বামী হাসিয়া বলিলেন, "এইই সত্য—আমি মানসে দুগ্ধান্ন প্রসাদ খাইয়াছি।" "এতৎ বিবরণ শ্রবণে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।" এই জ্ঞানোজ্জ্বলযুগে এরূপ "আষাঢ়ে গল্প" অবলম্বনে মহাপুরুষদিগের মাহাত্ম্য প্রচার বা ঐতিহাসিক তত্ত্বোদ্ভেদের চেষ্টা করা কতদূর সঙ্গত, বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

জিজ্ঞাসুগণ "দাসীর" উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিবেন। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এসম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিত হইল না।

৩। অচ্যুত বাবু বলিতেছেন, "রঘুনাথের পিতা যে পুত্রের প্রেমোন্মাদকে "বায়ুরোগ" করিয়াছিলেন ও চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ করা হইয়াছিল, তাহা কোথাও শুনি নাই, অঘোর বাবু শুনাইলেন।" আমার পুস্তকে আছে, "রঘুনাথের প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসকে বায়ুরোগের লক্ষণ মনে করিয়া আত্মীয়গণ চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ দিলেন।" কিন্তু অচ্যুত বাবু কোটেশন চিহ্ন দিয়া উদ্ধৃত করিতেছেন, "রঘুনাথের পিতা * * রঘুনাথের প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসকে বায়ুরোগের লক্ষণ মনে করিয়া আত্মীয়গণকে চিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ দিলেন" প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে এই অংশটা ভাগ করিয়া পড়া উচিত ছিল। তিনি যদি 'ধান' শুনিতে 'কাণ' শুনেন, সে দোষ কি আমার? আমরা কি ইহাই মনে করিব যে, অচ্যুত বাবু আমার পুস্তক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা আবশ্যক মনে করেন নাই, কিন্তু অসাধারণ প্রতিবাদকণ্ডূতীর বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন? রঘুনাথের প্রেমবিকার দর্শনে আত্মীয়গণের বায়ুরোগ মনে করা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। মহাপ্রভুর প্রেমোন্মত্ততা দর্শনে অনেকে বায়ুরোগ মনে করিয়া শচীমাতাকে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অচ্যুত বাবু আবার বলিয়াছেন, "ভক্তমালায় লিখিত আছে বটে [শেষে রজ্জু দিয়া হস্ত রাখিল বান্ধিয়া] কিন্তু চরিতামৃতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।" অচ্যুত বাবু কি চরিতামৃত পাঠ করেন নাই? এই দেখুন,—

"বার বার পলায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে ॥"

অচ্যুত বাবুকে বলি, আর প্রমাণ চাই কি?

৪। লেখক মহাশয়ের আর একটী আপত্তি, "শ্রীগৌরাঙ্গের সহ রঘুর মিলন গ্রন্থকার চরিতামৃতে যেমন দুই স্থলে পাইয়াছেন, তেমনই গন্ত করিয়া লইয়াছেন; গুছাইয়া—মিলাইয়া দেখেন নাই তাহা হইলে মহাপ্রভুর সহিত দুইবার মিলনের কথা লিখিতেন না। নীলাচল গমনের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর সহিত রঘুনাথের একবার মাত্র মিলন হয়।" শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্য খণ্ডের ষোড়শ পরিচ্ছেদ শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত রঘুনাথের শান্তিপুরে দুই বার মিলনের কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কেবল দ্বিতীয় বার মিলনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। আমি "গুছাইয়া—মিলাইয়া" দেখিয়াছি,—অচ্যুত বাবুই দেখেন নাই। অচ্যুত বাবু যে রঘুনাথ চরিত লিখিয়াছেন, তাহাতে ভ্রম বশতঃ প্রথম বারের মিলনের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজও তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন নাই; অধিকন্তু অন্যের ভ্রম সংশোধনে অগ্রসর হইয়াছেন। নিজে অন্ধ হইয়া অন্যকে পথ দেখাইবার চেষ্টা অতি অদ্ভুত সন্দেহ নাই। অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন "শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরে যখন শান্তিপুরে আসেন, সমস্ত ভক্তগণ তখন বিহ্বল; সে সময় রঘুনাথ শান্তিপুর আগমন

করেন নাই।" ভক্তগণ বিহ্বল হইলে রঘুনাথকে যে, শান্তিপুরে আসিতে নাই, ইহা অদ্ভুত ও অকাট্য যুক্তি বটে!! যাহা হউক, শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে।

"সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তি হোঁ বিষয়ে উদাস।
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা।
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥

* * * *

প্রভু তারে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তি হোঁ ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল

* * * *

একাদশ জন তারে রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর॥
এবে যদি মহা প্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা॥
আজ্ঞা দেহ যাইয়া দেখি প্রভুর চরণ।
অন্তথা না রহে মোর শরীরে জীবন॥
শুনি তার পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তারে শীঘ্র আসিহ কহিয়া॥
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে।
রাত্রি দিবসে এই মন কথা কহে॥ইত্যাদি

শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আশা করি অতঃপর অচ্যুত বাবু নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

৫। আমি লিখিয়াছি, "রঘুনাথ গৃহে আসিয়া গৌরাঙ্গের উপদেশানুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন; * * পিতা মনে করিলেন, রঘুনাথের ধর্ম্মানুরাগ হ্রাস হইয়াছে; আর তাহাকে প্রহরি-বেষ্টিত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। ইত্যাদি" অচ্যুত বাবু বলেন, "এই কথা নিতান্ত আনুমানিক। প্রহরীদের হাত হইতে রঘুনাথ মুক্ত হইয়াছিলেন, একথা আমরা কোথাও পাই নাই;" ইহা আনুমানিক নহে, সম্পূর্ণ প্রামাণিক। যথা—

"এত কহি মহাপ্রভু তারে বিদায় দিল।
ঘরে আসি মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্যকরে অনাসক্ত হঞা॥
দেখি তার পিতা, বড় সুখ পাইল।
তাহার আচরণ কিছু শিথিল হইল॥"

শ্রীচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড।

"মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ী প্রায়॥
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম।
দেখিয়াত মাতা পিতার আনন্দিত মন॥"

ঐ অন্ত্য খণ্ড।

রঘুনাথ বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন দেখিয়া পিতামাতা আনন্দিত হইয়া পুত্রকে কয়েদীর ন্তায় প্রহরিবেষ্টিত করিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিলেন না; ইহাই ত উপরি-উদ্ধৃত পয়ারের সরল ও সহজ অর্থ। অচ্যুত বাবুর আর একটী কথা, "রঘু বাহ্য বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই কি বাতুলতা ত্যাগ করা যায়?" অচ্যুত বাবুত স্বীয় গ্রন্থেই লিখিয়াছেন, "রঘুনাথ মনের ভাবোচ্ছ্বাস গোপন রাখাতে পিতা মাতা পুত্রের আর তেমন উন্মাদভাব নাই দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন।" তবে আর আমাকে আক্রমণ কেন?

৬। অচ্যুত বাবুর আর একটী আপত্তি, "চৈতন্ত চরিতামৃতে আছে— একদা রাত্রিযোগে প্রহরীরা নিদ্রিত হইলে রঘুনাথ পলাইয়া যান। * * নিষ্প্রয়োজন বোধে যে প্রহরীদিগকে

পূর্ব্বে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহারা কোথা হইতে সমুদিত হইল? গ্রন্থকারের বলা উচিত ছিল।” এ সম্বন্ধে যথেষ্টই বলা হইয়াছে। আমার গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, পাণিহাটী হইতে “গৃহপ্রত্যাগমনের পরে রঘুনাথ আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই, বহির্বাটীতে দুর্গামণ্ডপে প্রহরিবেষ্টিত হইয়া শয়ন করিতেন।” অচ্যুত বাবুর গ্রন্থের এই অংশটী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে, এই কথাটীর প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করিতেন।

৭। অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন, “অঘোর বাবুর আর একটী ভ্রম— কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তিনি রঘুনাথের “মন্ত্রশিষ্য” বলেন।” কবিরাজ গোস্বামী যে রঘুনাথের শিষ্য, ইহা বৈষ্ণবসমাজের একটী প্রসিদ্ধ কথা অচ্যুত বাবুও তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “রাধাকুণ্ড বাসে দাস গোস্বামীর একজন অতি হৃদ্য সঙ্গী ও শিষ্য ছিলেন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।” (৪৩ পৃষ্ঠা)। প্রেমবিলাসেও লিখিত আছে, “কবিরাজ শিষ্য রহিলেন যার কাছে, ফলতঃ এবিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে, অচ্যুত বাবুও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু ইত্যাদি গুরুতত্ত্বের মীমাংসায় আমি প্রবৃত্ত হই নাই, বৈষ্ণব সমাজের সাধারণ চলিত কথাই লিখিয়াছি। পরন্তু চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের ২০শ পরিচ্ছেদের “শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীগুরু শ্রীজীব চরণ।” তথা শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীব চরণ” ইত্যাদি স্থলে “শ্রীগুরু শব্দ রঘুনাথ দাসের বিশেষণ কি না বিবেচ্য। যাহা হউক, লেখক মহাশয়ও এবিষয়ের কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু স্বীয় গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় বলিয়াছেন, “আবার অনেকেই দাস-গোস্বামীকেই কবিরাজের দীক্ষাগুরু নির্দ্দেশ করেন।”

৮। অচ্যুত বাবু দাস গোস্বামীর গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ১৭৭১ শকের “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়” “বৈষ্ণব সম্প্রদায়” শীর্ষক গ্রন্থে “গুণলেশশেখর” গ্রন্থ রঘুনাথ দাসের রচিত লিখিয়াছেন! ফলতঃ আমি এযাবৎ উক্ত গ্রন্থ পাঠ করি নাই। অক্ষয় বাবুর অনুসরণ করিয়াই আমি ইহা লিখিয়াছি।

৯। রঘুনাথের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে অচ্যুত বাবু বলেন, অক্ষয় বাবুর মতে রঘুনাথ ১৫০৪ শকে দেহ ত্যাগ করেন। “সজ্জনতোষণী” পত্রিকায় কোন প্রাচীন বৈষ্ণব ভক্তের লিখিত একটী নোটে দাস গোস্বামীর অপ্রকট-কাল ১৫০৪ শক ধরিয়া লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নির্ভরযোগ্য নহে ইত্যাদি।” অচ্যুত বাবুর মতে ১৫১৪ শক দাস গোস্বামীর অপ্রকটকাল। আমি উক্ত প্রাচীন বৈষ্ণব ভক্তের সিদ্ধান্ত অনুসারেই লিখিয়াছি, “কেহ কেহ বলেন, ১৫০৪ শকাব্দে রঘুনাথ বৃন্দাবনে প্রাণ ত্যাগ করেন।” অন্যের সিদ্ধান্তই প্রকটিত করিয়াছি, নিজের কোন মত বা কোন স্থির সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করি নাই। অচ্যুত বাবুও কোন স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। ১৪১৫ শকে রঘুনাথ লীলা সংবরণ করেন, ইহা “ভক্তিরত্নাকর” গ্রন্থের কোথায় আছে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল।

লেখক তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থের কোন স্থানে লিখিয়াছেন, "শ্রীমন্নিত্যানন্দগৃহিণী শ্রীশ্রীজাহ্নবী ঠাকুরাণী (তাঁহার দ্বিতীয় যাত্রায়ও) বৃন্দ বনে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সে কিছু পরের কথা। তখন দাস গোস্বামীর শোচনীয় অবস্থা। * * * ঐ সময় ঈশ্বরীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। আবার বলিতেছেন, "বলা বাহুল্য যে, দাস গোস্বামীর এই অভিলাষটী [শ্রীলোকনাথ, শ্রীজীব ও কৃষ্ণদাসের অগ্রে দেহ ত্যাগের অভিলাষ] অচিরেই পূর্ণ হইয়াছিল।" অচ্যুত বাবু জাহ্নবী দেবীর সহিত রঘুনাথের উপরি-উক্ত মিলন জাহ্নবী দেবীর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন-আগমনকালে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল মনে করিয়া রঘুনাথ ১৫১৪ শক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন মনে করিয়াছিলেন, এইটী তাঁহার ভ্রম। এই যাত্রায় বৃন্দাবন প্রবেশকালে জাহ্নবীদেবী পরমেশ্বরী দাসকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সমাগত প্রধান প্রধান ভক্তগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। * সুতরাং ইহা যে প্রথম বারের আগমন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। দ্বিতীয়বারের আগমন-বৃত্তান্ত ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত হয় নাই। যথা—

"শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর গমনাগমন।
বিস্তারিয়া এ সব বর্ণিব বিজ্ঞগণ॥
শ্রীঈশ্বরী ব্রজে পুন গমন প্রকার।
অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থেতে প্রচার॥"

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

অচ্যুত বাবু বলেন, "বৈষ্ণব দিগ্দর্শনীর কথা বৈষ্ণবগণ প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন; সে মতে ১৫১৪ শকে চতুর্নবতি বর্ষকালে তিনি দেহ ত্যাগ করেন।" আবার তাঁহার গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "কর্ণানন্দে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দাস গোস্বামীর পরে কবিরাজ অন্তর্হিত হন। দ্বিতীয়তঃ ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থের বিশেষতঃ বৈষ্ণব দিগ্দর্শনীর সহিত এতন্মতের অনৈক্য নাই।" কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমার পিতৃতুল্য ভক্তিভাজন শ্রীযুত হারাধন ভক্তিনিধি মহাশয় ১৩০০ সালের নব্যভারতে "বঙ্গের বৈষ্ণব কবি-শীর্ষক প্রবন্ধে কবিরাজের মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন," ভক্তিদিগ্দর্শিনী তালিকায় দেখা যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ১৪১৮ শকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫০৪ শকের চান্দ্রাশ্বিন শুক্লপক্ষের দ্বাদশী দিবসে একটী আকস্মিক দুর্ঘটনা সংবাদে অত্যন্ত দুঃখের সহিত শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীমতী রাধাকুণ্ড তীরে গুপ্ত হইয়াছিলেন।" দাস গোস্বামীর পরে কবিরাজ গোস্বামীর অন্তর্ধান এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত এবং অচ্যুত বাবুও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দিগ্দর্শনীর কথা সত্য হইলে ১৫১৮ শকে অর্থাৎ কবিরাজ গোস্বামীর অপ্রকটের পরে দাস গোস্বামী অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? এই সকল জটিল তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমাকে আক্রমণ করা ভাল হইয়াছে কি?

উপসংহারে অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন, অঘোর বাবু সুলেখক, তাঁহার লেখার

---

* ১। ভক্তিরত্নাকর, একাদশ তরঙ্গ।
২। নরোত্তমবিলাসে, নবম বিলাস।

ভিতর ছিদ্র থাকা অনুচিত মনে করি। তাঁহার পুস্তক অনেকে পাঠ করিবে, * * তিনি ভ্রমগুলি শোধন করিয়া লইবেন উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাবটী লিখিত হইল।” অচ্যুত বাবুর এই সহৃদয়তার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। কিন্তু অনর্থক কয়েকটী কথার প্রতিবাদ করায় দুঃখিত হইয়া এই উত্তর লিখিলাম। অচ্যুত বাবুকে আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া জানি, অকারণ বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া বৈষ্ণবতার বিরুদ্ধ।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কুটীরের মীমাংসা।

ইতিপূর্ব্বে আলোক ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। জ্যোতিঃ, জ্যোতিষ্মানের তাবৎ ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, আলোকের জন্য কারণ ও শাশ্বত, সৌন্দর্য্যময়, আনন্দ-পূর্ণ জীবনী শক্তি। জ্যোতিষ্মৎ ও তাহার প্রতিভা সমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, জ্যোতিষ্মতেই সেই সকল ধর্ম্মের উৎকর্ষ। সুতরাং শাশ্বত আলোকের, শাশ্বত উৎস, অনন্ত সৌন্দর্য্যময়, অনন্ত আনন্দপূর্ণ, অনন্ত জীবনীশক্তি। ইহাই বিশ্বের জন্য কারণ—ইহাই প্রথম বিকাশ ও সমস্ত পশ্চাৎ বিকাশের বীজবাহক। তবে ইহা আন্দোলন ত বটে, প্রক্ষেপণও বটে। তোমার জ্যোতিষ্মৎ পরমাণু! বাস্তবিক কি তাহা জড়। বর্ত্তমান বিজ্ঞান তাহাদের জ্যামিতিক বিন্দু অপেক্ষা অধিক জড়ত্বে বিশ্বাস করে না। অণু—একরূপ চৈতন্য বিন্দুর, ব্যাপ্তির মাঝে বিস্তৃতি মাত্র।

তবে এ আন্দোলন কোথা হইতে? উচ্ছ্বাসিত, প্রোর্জ্জ্বল,! অনন্ত দ্যুতিময় চৈতন্যাব্ধি! উত্তাল আন্দোলিত আনন্দ সংক্ষোভ! এই আনন্দ-গর্জ্জনের ভিতর দিয়া কাল-ব্যাপ্তির উচ্চৈশ্রবা গভীর কেশর-সম্ভার লইয়া ভাসিয়া উঠে! অন্ধকার চামর জ্যোতির্বিদীর্ণ হয়। আবার কোন আবর্ত্ত সম্পূরক তর্য্যাঘাত হিল্লোলে ওই সাগরের ভিতর মুখ লুকাইয়া ডুবিতেছে! কম্পিত, ঘূর্ণিত, সংক্ষুব্ধ সাগর! সৃষ্টি—স্থিতি—প্রলয়ের আসন্নসত্তা আগ্নেয় তরঙ্গ উচ্ছ্বাস, আনন্দ আহারে পরস্পর প্রতিহত হইয়া ঝরিয়া পড়ে! কত মুমূর্ষু দিবসের অন্তিম নিশ্বাস, কত জায়মান বিশ্বের ভূমিষ্ঠ মঙ্গল শশ্বৎ নিনাদ, নিনাদিত হয়। গতিময়—প্রীতিময়—পুণ্যময়—সাগর! অমর সঙ্গীত! অমরায় গর্ভাধান লইয়া থর থর কম্পিত! আর সেই থান হইতেই এই আকম্পন, এই আন্দোলন, এই বিশ্বের অন্তরাত্মার আবেগের চির-বর্দ্ধমান হিল্লোল, ছায়াপথে নক্ষত্র, জরায়ুর ভিতর এই নিগূঢ় কল্যাণের আগ্নেয় সমাচার, এই অন্ধ গ্রহ উপগ্রহে, নীরব আমূলকম্পী আবেগে প্রতিহত হইতেছে। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি, ইহার অনন্তদৌত্য-যাত্রায়, অনেক গুরু বারতা রাখিয়া যাইবার স্থান। ইহার আনন্দ পদশব্দের পরশে, অগণ্য জ্যোতিষ্মৎ

হিল্লোল আকাশে আন্দোলিত হয়। এই সৌরবিশ্বে, এই আন্দোলিত ইথর কত ধূমকেতুর গায়ে রহস্যনিদেশ মাখাইয়া, আলোকের অগ্রসেনানীর মত, অন্ধকারের রাজ্য আবিষ্কার করিতে ছুটিতেছে! ইহা ঈশ্বরের অসীমতা; আলোকিতাই প্রক্ষিপ্ত সত্তা।

মহাচৈতন্যে ভাব সমুদ্র জাগরিত! জড় অস্ফুটভাব। প্রাণপূর্ণ অনন্তবিহগ, এই অস্ফুটভাব অস্ত পুঞ্জের উপর, আপনার হিরণ্ময় শফ বিস্তার করিয়া, তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। যতদিনকার মৃত জড় তত সাড়া দিয়া উঠে! আপনার অভিব্যক্তি শৃঙ্খলার অনুসারে।

শাশ্বতে আনন্দে, আনন্দভাব উদ্ভূত! এই আনন্দময় সত্তার ভাব কোন অভাবের জন্য নহে। এভাব আপনার অনন্ত আনন্দ সৌন্দর্য্যের পূর্ণতার উচ্ছ্বাস। এই অনাদি আনন্দের (মহাচৈতন্যের) অতিরিক্ত কিছুই নাই বলিয়া, তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস—এ জগৎ। ভাবের অস্তিত্ব ভাবুকের ইচ্ছাসাপেক্ষ। জগৎ তাই নিত্যময়। ভাব ও ভাবুকের সমান চৈতন্যশীলত্ব হইতে পারে না। তাই জীবচৈতন্যে পরচৈতন্যে প্রভেদ আছে। ভাবের ব্যষ্টি অংশ Units of consciousness ভাবের সমষ্টির সহিত সমান চেতনাশীল হইতে পারে না। পরিমাণের কথা বলা হইতেছে না, গুণত্বই কেবল বিবক্ষিত।

আবার তোমার বিজ্ঞানের কথা। জড়—মৃত্যুহীন—এ জগৎ নিত্য।

আমাদের নিবেদন

সমানরূপ চৈতন্যশীলেরই জগৎ প্রতীয়মান হয়। সুতরাং যতক্ষণ বিভিন্ন ভাবসত্তা, পরস্পরে সমান চেতনাশীল, ততক্ষণ তাহাদের পরস্পরের বিভিন্ন অস্তিত্ববোধ। অনন্তচৈতন্যের বুকে বিচরণ করিয়া, যখন ভাবসত্তাবর্গ চৈতন্যের রাজ্যে অধিকতর বা অবিষমভাবে পরিস্ফুট হয়,—তখন আর এক অবস্থা। সকল ভাবসত্তা যুগপৎ সমানভাবে চৈতন্যস্ফুট হয় না। বিভিন্ন সত্তার সহিত ঈশ্বরের মনঃসংযোগের তারতম্যই বা আপনার অভিব্যক্তিশৃঙ্খলার অনুস্মৃতি ইহার কারণ। সুতরাং চৈতন্যের ন্যূনাধিক্যে, এক ভাবসত্তার নিকট অপর ভাবসত্তার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়।

ভাবপুঞ্জ, ঈশ্বরের পূর্ণ পবিত্রতা প্রসূত; সুতরাং পবিত্রতাই তাহাদের ধর্ম্ম। এ পৃথিবীর কথা ধরিলে জীবচৈতন্যই চৈতন্যের রাজ্যে (অনাদি আনন্দ উচ্ছ্বাসে) সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট। সুতরাং তাহার অনেক প্রাগ্‌ভাব বা পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হয় না। কারণ সমানরূপ চেতনাশীলেরই জগৎ প্রতীয়মান হয়।

জীবচৈতন্য প্রথম অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যবোধ। শেষ অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যবোধশূন্যতা। জীবচৈতন্য পূর্ণপবিত্র আনন্দের প্রসব। সুতরাং পূর্ণপবিত্রতা অনুসারে কার্য্য করা বা পূর্ণপবিত্রতা উপসর্পণ তাহার অবশ্যম্ভাবী সহজ ধর্ম্ম। অনন্ত আনন্দ চৈতন্যে স্ফুটতম হওয়াই তাহাদের নির্ব্বাণ।

আবার তোমার বিজ্ঞানের কথা।

জড় মৃত্যুহীন এ জগৎ নিত্য।

এ সৌর বিশ্বেরও গতি আছে। এ সূর্য্য, আপনার অনুবর্ত্তী গ্রহ উপগ্রহ লইয়া হারকিউলিস্ নামক নক্ষত্রপুঞ্জের-দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আজ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জ্যোতিস্মতের এপ্রচ্ছন্ন আলোকী অভিসার জানিতে পারিয়াছে। এ আকর্ষণ কাহার—কোন কেন্দ্রের! কোন পুরাণ পুরুষ আজ রাসলীলায় অভিনয়ী। এতদিনের পর স্থূল দৃষ্টিতে এ ধ্রুব জগৎ টলিল কেন?

আমরা বলিব পরমানন্দের ভাবসত্তা-রূপ মনুষ্য, আজ অধিকতর চৈতন্যের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে। তাই পূর্ব্বে যাহা শুধু যোগীর কাছে "জগৎ" ছিল, এখন তাহা সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধিতে জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান। মনুষ্যরূপ ভাব-সত্তার গতি বা চৈতন্য, জগৎরূপ ভাব-সত্তার গতি বা চৈতন্য অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। তাই "জগৎ" জগৎ বলিয়া অনুভূত।

এ বিশ্বছবি আবর্ত্তমান সত্যের হিল্লোল। এই মহাসত্য, সকল বিরোধা-লঙ্কারের পরিণাম-ভূমি। এই মায়ার ব্যবধানে, ভাবচৈতন্য, পূর্ণ চৈতন্যে পরিণত হয়। ইহার উদ্দেশ্য অজ্ঞেয়। অনুসন্ধানের বিষয় কেমন করিয়া, এই পরম জ্যোতি জীবাত্মায় প্রবেশ করে।

আমাদের উত্তর মনুষ্যহৃদয়ের ভিতর দিয়া। তুমি মনুষ্য মস্তিষ্ককে কেশানু-সূক্ষ্মতায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়াও, নির্ব্বি-কল্প জ্ঞানের (Sensation) গূঢ় রহস্য কিছু বুঝিতে পারিবে না। নির্ব্বিকল্প জ্ঞান ও মস্তিকের পরস্পর কার্য্যকারি-তার মাঝে কোন অনিবার্য্য আইন স্থাপিত হইতে পারে না। আমরা এমন দেখাইতে পারিব উদ্ভিদের মস্তিষ্ক নাই, তবু তাহাদের অনুভূতি আছে। অনুভব শুধু মস্তিষ্ক বা স্নায়ুমণ্ডলীর অধীন না হইতে পারে। অনুভবশক্তি (Sensation) জীবের সর্ব্বাঙ্গীণ। এমন কি ইহা শরীর-অনাপেক্ষী। জীবের দেহানুরূপ অনু-ভূতি হয় না। জীবের আপন শ্রেণীস্থ আবশ্যকীয় অনুভব অনুসারে শরীর গঠিত হয়। চৈতন্য—আপন অনুরূপ দেহ নির্ম্মাতা।

আমরা বলিব অনুভব (Sensation) দেহবদ্ধ ও বিশ্ববদ্ধ আলোকের পরস্পর মিলন। ইহা উচ্চ দৈহিক ব্যাপার-সত্ত্বেও কার্য্যকর। বায়ুচঞ্চল, দীবা-শালী গ্রহের ন্যায়, জীবাত্মায়ও চৈতন্যের আবির্ভাব, তিরোভাব আছে। তুমি চৈতন্যের রাজ্যের অগোচর স্নায়বিক কম্পন, মনের অজ্ঞাতে মনের প্রচ্ছন্ন বিকার প্রভৃতি অনেক রকম মজার কথা বলিতে পার;—আমরা বলিব, জড় পরমাণুপুঞ্জের আণবিক অবকাশে যেমন আকাশ আছে, জীব চৈতন্যের রাজ্যের পর্য্যণ্যভূমের ধারেই, সেইরূপ চৈতন্য শূন্যতা বা অকার্য্যকারী চৈতন্যের রাজত্ব আছে। জীবচৈতন্যে বিশ্ব চৈতন্যের আবির্ভাব তিরোভাব হয় কেন?—আমরা বলিব হৃদয়ের জন্য।

প্রথমে দেখা যাউক, হৃদয়ের কার্য্য কি! হৃদয়, আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত রবির মত, একটী বিভিন্ন অধিকারের রাজ্য। এইখানে আমরা দেখিতে পাই, উপসর্পণ অপসর্পণ, প্রভৃতি জড়ধর্ম্ম ছাড়িয়া প্রেম ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। সুখ দুঃখ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ পূর্ব্বে যাহা জড়জগতে কোথাও ছিল না,

তাহা ইহাতে আছে। পূর্ব্বের জড় এইখানে প্রাণ পায়, বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভিতর এইখানে এক নূতন সুষমা ফুটিয়া উঠে। জড়সত্তা বিশ্বপ্রসূর ভাবসত্তা বলিয়া মনুষ্য হৃদয়ও বিশ্বপ্রসূর হৃদয়ের অভিমুখী আর একখানি concave দর্পণ। তাই জড়সত্তায় বিশ্বপ্রসূর হৃদয়ে যেরূপ প্রীতি, মনুষ্য হৃদয়েও সেইরূপ।

জড়জগতে অপসর্পণের পূর্ব্বে উপসর্পণ। মনুষ্য হৃদয়ে আগে ভালবাসা, তাহার পর ঘৃণা। ঘৃণা অর্থে করুণা। তোমায় এ সৌন্দর্য্যের জগতে সুন্দর করিয়া ফুটাইতে পারিলাম না বলিয়া আমার ক্ষোভ!—আমার জীবনের কর্ত্তব্যের কেন্দ্র হইতে বিপরীত গমন। আপনাকে পরিস্ফুট করাও জীবনের কর্ত্তব্য। কারণ ভাবসত্তার প্রত্যেক অংশ আপনার ধর্ম্মে ভাবুকের চৈতন্যে পরিণতির জন্য আকর্ষণবদ্ধ। ভালবাসা —প্রধানতম বৃত্তি। কেন না ইহা দয়া, সহিষ্ণুতা স্নেহ প্রভৃতির এজমালি উপঢৌকন। প্রেম—মাধ্যাকর্ষণ। সৌন্দর্য্য—ইহাকে আপনার স্তন্যে পরিস্ফুট করে। তাই এ বিশ্বের যেখানে যত সুন্দর ভাব আছে, প্রাচীরের মত ইহার চারিধারে ঘেরিয়া রহিয়াছে। রবি—আপনার বুক খুলিয়া ইহার চোখের পলকে জ্যোতি ঢালিয়া দেয়। পূর্ণিমার নিশা ইহার সরল ছল ছল চাহনির মাঝে অমৃত বর্ষণ করে। সায়াহ্নের মেঘ ইহার আশে পাশে নন্দনের সংবাদ লইয়া আসে। বুদ্ধদেব যেদিন যূপকাষ্ঠে পড়িলেন, উঞ্ছবৃত্তি যে দিন ৪৮ দিন উপবাসের পর আপনার আর্দ্র বসন, অপরের শুষ্কমুখে দিয়া, প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল, সেই দিনের সেই অশ্রুর মাঝে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষের বহুপূর্ব্ব প্রাগ্‌ভাব জ্যোতিষ্মৎ নীহারিকা। মানুষের মনুষ্যত্ব এই সকল দিনের অশ্রুসম্পাত। বহুপূর্ব্বে, ইহারা বৈজ্ঞানিকের জড় নীহারিকা পুঞ্জ. আর একদিন পূর্ণাভিব্যক্ত এই অশ্রুসম্পাত, ঈশ্বরের চৈতন্যে চিরন্তন বসতির জন্য আনন্দ ছাড়পত্র।

হৃদয় আত্মার জানালা।

বিশ্ব কর্ত্তব্যের পদস্খলনের ভয়ে, বিশ্বের চারিদিকে আলোক জ্বালান আছে।

রবি তাই—বাস্তবিকই সৌন্দর্য্যচৈতন্যের ভাণ্ডার ঘর। ভাবচৈতন্য আপনার উপাদান কারণ হইতে পশ্চাৎপদ হয়, আপনার পৈতৃক অধিকার, সৌন্দর্য্যের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনের দুরদৃষ্ট পীড়িত হয়, আর অমনি এই গানসুজা, মানসুজা, প্রাণসুজা, সবিতার ভিতর হইতে পূর্ণতম রূপ তাহার নয়নের উপর পড়িয়া যায়। অমনি সেই সৌন্দর্য্য-পুষ্ট চৈতন্য, সেই অমরার আপনার ঘর. সেই নিরাপদ ক্রোড়, সেই আনন্দ অভিজ্ঞান. সকলই জাগরূক হইয়া উঠে। সন্ধ্যার ঘন হিরণ্ময়, মেঘময় চন্দনচর্চ্চিত প্রাচীরের উপর দিয়া, এই বসন্তের বায়ু আন্দোলিত, কোকিল-কুহরিত—মধুমাস-কুসুমিত—জীবসত্তা, গৃহস্থের, যুথহারা, বসন্ত সমীরণের মত—ক্ষীণ চন্দ্রালোকের কাদম্বরী নিকুঞ্জের নীচু দিয়া দুলিতে দুলিতে,—অতিক্রান্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল!—উচ্চে—উচ্চে—-উচ্চতরে—ছায়াপথে—

নক্ষত্র স্থৃতিকা গায়ের ভিতর দিয়া যেথান হইতে—এবিশ্বের রূপ, সেই পূর্ণতমরূপে হারাইয়া যায়!—সৌন্দর্য্য—নির্ব্বাণের মুক্ত কপাট। তোমরা এই আলো প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিও না। পাপ ঘৃণ্য পাপী ঘৃণ্য নহে। যাহারা মানুষের ধূমকেতু, যাহাদের সর্ব্বাঙ্গে জ্যোতি মাখা থাকিলেও কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই। জানিও তাহারা আবার অনন্ত সবিতায় ফিরিয়া আসিবে, অন্ধকারে নিভিয়া যাইবার জন্য পরমানন্দে কোন ভাবসত্তার উদ্রেক হয় নাই।

এই সকল যেমন করিয়া ঘটিয়া থাকে, তাহার যুক্তিমত ব্যাখ্যানই, এক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহা কোন দর্শন বিশেষের অনুগামী নহে। পৌর্ব্বকালীন কতকগুলি উপন্যাস (অলসা), কাব্য (অশ্রুসঙ্গমে), নাটকে (কৈফিয়ৎ), যে সত্য স্বপ্নভাবে উঠিয়াছিল তাহারই বিধিবদ্ধ পরিস্ফুটন—প্রয়াস।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

৭। আণবিক ক্রিয়া।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন আমরা বস্তু সকলের রচনা প্রণালীর প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া অণুকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

পদার্থ দুই প্রকার যৌগিক ও রূঢ়ি। কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা হইতে আমরা ভিন্ন পদার্থ বাহির করিতে পারি, তাহাদিগকে যৌগিক পদার্থ কহে। কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ বাহির করিতে পারি না, তাহাদিগকে রূঢ়ি পদার্থ বা ভূত কহে। জল যৌগিক বা সংহত পদার্থ, কারণ উহা হইতে আমরা অম্লজান ও উদজান বাহির করিতে পারি। অম্লজান রূঢ়িক পদার্থ, কেননা উহা হইতে অম্লজান ভিন্ন আর কিছুই বাহির করিতে পারি না। উদজানও ঐরূপ রূঢ়িক পদার্থ।

পূর্ব্বে ইউরোপে চারি প্রকার ভূত গণনা করিত; যথা, ক্ষিতি, অপ্, বায়ু ও বহ্নি। ভারতবর্ষে ব্যোমকে লইয়া পঞ্চভূত গণনা করিত। কিন্তু আমরা এখন আর ঐ প্রথম তিনকে ভূত বলিয়া গণনা করিতে পারি না, যেহেতু আমরা উহাদিগকে এখন বিয়োগ করিতে পারি। আর যে বহ্নি ও ব্যোম, উহারা ভারহীন তরল পদার্থ অর্থাৎ পদার্থই নহে; উহাদিগকে ভারবান্ পদার্থের সহিত সমসূত্রে ধরা উচিত নহে। কিন্তু এই যে পৌরাণিক পঞ্চভূতের মত, ইহা দ্বারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে বলিতে হইবে, যেহেতু ইহা যৌগিক ও রূঢ়িক পদার্থের মধ্যে ভিন্নতা স্থাপন করিয়াছিল। ইহার ভাবটা সত্য ছিল, যদিও

ইহার ছাঁচটায় অর্থাৎ ইহার আকারে ভ্রম ঘটিয়াছিল—অর্থাৎ ঐ পাঁচটী যে ভূত, সেই বিষয়ে ভ্রম হইয়াছিল।

আজিকার দিনে চৌষট্টিটি ভূত বা রূঢ়িক পদার্থ গণনা করা যায়; তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করে, ধাতু এবং উপধাতু। কিন্তু এমন লক্ষণ নাই, যাহাতে করিয়া ইহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত করা যায়; উহাদিগের মধ্যে এমন পদার্থ আছে, যাহা উভয় শ্রেণীতেই বসে। তথাপি উপধাতুর মধ্যে সচরাচর পনেরটী রূঢ়িক পদার্থ গণ্য করে এবং ধাতুর মধ্যে উনপঞ্চাশটী রূঢ়িক পদার্থ ধরে।

প্রয়োজনীয় কতকগুলি রূঢ়িক-পদার্থের তালিকা।

উপধাতু।

(১) অম্লজান (oxygen); (২) উদজান (Hydrogen); (৩) যবক্ষারজান (nitrogen); (৪) গন্ধক (sulphur); (৫) উপগন্ধক (selenium); (৬) অনুপগন্ধক (Tellurium) (৭) হরিতন (chlorine); (৮) পুতীন (Bromine); (৯) রোহিতন Iodine); (১০) কাচান্তক (Fluorine); (১১) প্রস্ফুরক (Phosphorus); (১২) মনঃশিলা (Arsenic); (১৩) উপাঙ্গার (Boron); (১৪) শিলিক (Silicon) (১৫) অঙ্গার (carbon)

ধাতু।

(১) যাবক বা যবক্ষার ধাতু (Potassium); (২) কোবল্ট (Cobalt); (৩) অঞ্জন ধাতু (Antimony); (৪) স্বর্ণ (Gold); (৫) সর্জ্জ (Sodium); (৬) সুধ বা কস্তর (Calcium); (৭) নিকেল (Nickel); (৮) তাম্র (Copper); (৯) প্লবঙ্গ (Platinum); (১০) ম্যাগনিসিয়ম (Magnesium); (১১) রাং (Tin); ১২ লৌহ (Iron); (১৩) দস্তা বা যশদ (Zinc); (১৪) সীসক (Lead); (১৫) পারদ (Mercury); (১৬) স্ফট (Alluminum); (১৭) বর্ণক (Chromium); (১৮) বস্নমৎ (Bismuth) (১৯) রৌপ্য (Silver)

যুক্ত হইয়া এই সকল ভূত নানা প্রকার সংগত পদার্থ প্রস্তুত করে। ইহারা অম্লজানের সহিত অম্লী (oxide) প্রস্তুত করে; যেমন যবক্ষারের (পোটাসিয়ম) অম্লী যবানল বা যবিকা (পটাশ), সর্জ্জের (সোডিয়ম) সর্জ্জিকা (সোডা) কস্তরের (কালসিয়ম) কস্তরিকা বা চূর্ণ; যেমন লৌহের, সীসার, রৌপ্যের অম্লী ইত্যাদি।

গন্ধকের সহিত ইহারা গন্ধী (সলফাইড প্রস্তুত করে; যেমন লৌহের গন্ধী, রাঙের গন্ধী ইত্যাদি।

হরিতনের সহিত হরিতনী (ক্লোরাইড) যেমন যবক্ষারের (পটাসিয়ম) হরিতনী; সর্জ্জের (সোডিয়ম) হরিতনী, যাহা আহার্য্য লবণ; লৌহের হরিতনী, পারদের হরিতনী যাহা ক্যালোমেল; রৌপ্যের, সোণার, প্লবঙ্গের (প্লাটিন) হরিতনী ইত্যাদি। এইরূপ অনেক আছে।

ধাতু সকল যখন পরস্পর যুক্ত হয়, তাহাকে কলাই বলে। অম্ল বা দ্রাবক সকল অম্লীর (অক্সাইড) সহিত যুক্ত হইলে লবণ প্রস্তুত হয়—যথা যবক্ষারাম্লিত

যবিকা (পটাসের নাইট্রেট) অর্থাৎ সোরা; যবক্ষারায়িত সর্জ্জিকা বা সোডা; যবক্ষারায়িত তাম্র যবক্ষারায়িত রৌপ্য ইত্যাদি।

উদ্ভিদ্ পদার্থ, যাহা এত বিভিন্ন প্রকার তাহা প্রায় কেবল অম্লজান, উদজান এবং অঙ্গার এই তিন ভূতের ভিন্ন পরিমাণ যোগে উৎপন্ন হয়। আর যত জান্তব পদার্থ, তাহারা এই তিন ব্যতীত যবক্ষারজানকেও ধারণ করে; এতদতিরিক্ত কথন বা গন্ধক, কথন বা প্রস্ফুরক, কথন বা চূণ, এবং অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে অন্যান্য ভূতও থাকে।

পূর্ব্বোক্ত সংগত পদার্থের মধ্যে যে সকল ভূত থাকে, তাহার প্রতি অণুতেও সেই সেই উপাদান ভূত থাকে। আমাদের আহার্য্য লবণের অণুতে হরিতন ও সর্জ্জ আছে; উদ্ভিদ সূত্রের অণুতে অম্লজান, উদজান ও অঙ্গার আছে; মাংসপেশীর সূত্রের অণুতে অম্লজান, উদজান, অঙ্গার এবং যবক্ষারজান আছে।

একাধিক ভৌতিক উপাদান, যাহার দ্বারা অণু রচিত হয়, তাহারা যে পরস্পরে সংলগ্ন অর্থাৎ পরস্পরকে যে একেবারে ছুঁইয়া থাকে তাহা নহে; প্রাকৃতিক বিদ্যাগত, রাসায়ন বিদ্যাগত, দানা-(Crystal) বিদ্যাগত, জীবনীবিদ্যাগত যত কিছু ভূয়োদর্শন, সকলই প্রমাণ করে যে উহারা পরস্পর হইতে পৃথক্ এবং দূরে স্থিত।

তেমনি আবার যখন অসংখ্য অণু একত্রিত হইয়া অতি ক্ষুদ্র দৃশ্যমান রেণু-কণা প্রস্তুত করে, সেই সকল অণু যে স্বয়ং নিজের কোন এক বা অপর বিন্দু দ্বারা স্পর্শ করিয়া আপনাদিগকে সন্নিবেশ করে তাহা নহে, কিন্তু উহারা সর্ব্বতোভাবে পৃথক এবং দূরে দূরে থাকে।

এখন, একটা বৃহৎ পদার্থেরও যেরূপ গঠন তাহার রেণুরও সেই একই গঠন; সুতরাং পদার্থেরা শেষ ফলে পরস্পর অসংস্পৃষ্ট অণুর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং সেই অণুরা আবার পরস্পর অসংস্পৃষ্ট ভূতের সমষ্টিমাত্র।

আমরা সংগত পদার্থ এবং তাহাদের অণুদের বিষয় যাহা বলিলাম, রূঢ়িক পদার্থেও সর্ব্বতোভাবে তাহাই প্রযুজ্য; কারণ ইহাদের গঠন, উহাদের গঠন হইতে কোন বিশেষ লক্ষণ দ্বারা পরিচিহ্নিত হয় না; কেবল রূঢ়িক পদার্থের অণুতে অসবর্ণ এবং অসদৃশ ভূতের পরিবর্ত্তে সবর্ণ এবং সদৃশ ভূতের সংস্থান।

পদার্থ সমূহের এখন আমরা যে সকল গুণ দেখিতে পাই, তাহার কিছুই থাকিত না যদি উপকরণের ভূত সকল পরস্পরের উপর নির্ভর না করিত এবং সর্ব্বথা স্বতন্ত্র থাকিত; তাহা হইলে না কঠিন পদার্থ থাকিত, না তরল পদার্থই থাকিত, না বায়বীয় পদার্থই থাকিত; সমস্ত ভূমণ্ডল কেবল ধূলিরাশি হইয়া থাকিত—না তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বাঁধাবাঁধি থাকিত, না তাহাদের কোন আকার প্রকার থাকিত—কেবল এক স্থিতিরোধকতা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে থাকিত, এইমাত্র। অতএব জড় পদার্থের ভূত সকল পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারা সম্বদ্ধ। আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ শক্তি উহাদিগের মধ্যে অবিরত কার্য্য করিয়া উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরে রাখিতেছে,

পদার্থদিগের আকার, গঠন ও প্রকৃতি নিরূপিত করিয়া দিতেছে। এই শক্তিদ্বয় আণবিক ক্রিয়া নামে খ্যাত।

কঠিন পদার্থ উত্তাপকে আপনাব মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় এবং সেই সঙ্গে তাহার আয়তন বৃদ্ধি পায়; অতএব উহাদিগের অণু পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে না, কারণ, তাহা হইলে শীতল হইলে তাহারা পুনরায় সংকুচিত হইত না। তবে এই বলিতে হইবে যে প্রতি উত্তাপ-পরিমাণে উহারা আপনাদিগের আণবিক আকর্ষণ শক্তি দ্বারা এবং উহাদিগের মধ্যস্থিত সেই উত্তাপের বিকর্ষণী শক্তি দ্বারা (যাহা আয়তনকে ক্রমিকই বর্দ্ধন করিতে চাহে ও অণুদিগকে ক্রমাগতই দূরে লইয়া যাইতে চাহে) এক এক সামঞ্জস্যধারা প্রস্তুত করিয়া লয়। কঠিন বস্তুর দৃঢ়তা, জমাটবদ্ধভাব, আঁকড়াইয়া থাকার ভাব এবং আর আর গুণ সকল, যাহা উত্তাপের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়, উহারা আণবিক সাম্যভাবের ফলমাত্র; কিন্তু তথাপি কঠিন পদার্থে আকর্ষণী শক্তি বিকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা অল্লাধিক বেশী থাকে।

তরল পদার্থে যাহা হইলে দৃঢ়তা বলা যায় অণুসকলের সেরূপ অচলভাব থাকে না, উহারা আপনাদের ভিতর চলিয়া বেড়ায়; কিন্তু তাহাতে তাহাদের কতক পরিমাণে জমাটবদ্ধভাবের ব্যাঘাত হয় না। যদি পাত্রের "কাণায়" বা পাতার আগায় এক ফোটা জল ঝুলিয়া রহিয়াছে মনে করা যায়, তাহা হইলে সেই ফোটার নীচের অর্দ্ধভাগ যে উপরের অর্দ্ধভাগে লাগিয়া থাকে, তাহা কেবল, দুই অর্দ্ধভাগের অণুরা এক অন্যের উপরস্ যে আকর্ষণ প্রয়োগ করে তাহারই দ্বারা।

বাতাসে এবং বায়বীয় পদার্থে তাহাদের অণুসকলের আপনাদের মধ্যে আপেক্ষিক সচলতা আরো অধিক; উহাদের বিশেষ লক্ষণ এই যে উহাদের আভ্যন্তরিক বিকর্ষণী শক্তি উহাদের আকর্ষণী শক্তি অতিক্রম করিয়া লইয়া চলে; উহাদের অণু সকল অবিরত অধিকাধিক দূরে যাইতেই চেষ্টা করে। উহাদের এক অনির্দ্দিষ্ট প্রসারণ শক্তি। যদি তাহাদিগকে দশগুণ, শতগুণ, বা সহস্রগুণ অধিক আয়তন স্থানে বিস্তৃত হইতে দেওয়া যায়, তখনো তাহারা আরও প্রসারিত হইতে চেষ্টা করে এবং যে পাত্রের মধ্যে তাহারা থাকে, যে পাত্র তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেই পাত্রের পরদায় (গাত্রে) উহারা চাপ প্রয়োগ করিতে থাকে।



এই চাপই উহাদিগের প্রসারণ শক্তির বা স্থিতিস্থাপক শক্তির পরিমাণ। এই চাপ সর্ব্বদাই আছে কিন্তু উহার পরিমাণ অত্যন্ত বিভিন্ন। বাতাস বা মরুৎ বা স্থিতিস্থাপক তরল পদার্থকে যতই সংকুচিত করা যায়, যে পরিমাণে উহার আয়তনকে ক্ষুদ্র করা যায়, যতই অপ্রশস্ত স্থানের মধ্যে উহাদিগকে ঠাসিয়া রাখা যায়, ততই উহাদের চাপ বা স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। বায়ুর

পিচকিরি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়; বায়ুকে যত মুক্তভাবে আপনার আয়তন বৃদ্ধি করিতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, ততই ইহার চাপ ও স্থিতিস্থাপকতা কমিতে থাকে।

কঠিন পদার্থের লক্ষণ তাহাদের অণুর স্থায়িভাব, অটলভাব; জলীয় পদার্থের লক্ষণ তাহাদের অণুর অপেক্ষাকৃত সচলভাব; মরুৎ পদার্থের লক্ষণ তাহাদের অণুর প্রসারণ।

যাহা দ্বারা বস্তুর রচনাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হয় না প্রাকৃতিকবিজ্ঞানে কেবল সেই সকল আণবিক ক্রিয়া সমালোচিত হয়; যে সকল আণবিক ক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন ভূতের যোগাযোগ নিষ্পন্ন হয়, তাহারা রাসায়ন যোগাবনতির বিষয়।

শ্রীমদ্রূপ সনাতন।

(পূর্ব্ব বিবরণ)

বৈষ্ণব জগতে রূপসনাতনের স্থান অতি উচ্চ। রূপসনাতন বৈষ্ণবের আদি গুরু, রূপ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যবস্থাপক, রূপসনাতনই আদি বৈষ্ণব শাস্ত্রকার। সম্মানের তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াও যাঁহারা আপনাদিগকে দীনাতিদীন মনে করিতেন, প্রচণ্ড রাজকীয় ক্ষমতার সুদৃঢ় রজ্জু করধৃত রহিলেও, যাঁহারা অভিমানে ফুলিয়া উঠেন নাই, তাঁহারাই, বৈষ্ণবের গৌরব—বাঙ্গালীর গৌরব। এই রূপসনাতন সমীরণের প্রীতিভাজন পাঠকের প্রীত্যর্থে তাহাই উপহার দিতেছি।

রূপ সনাতন অতি মহাবংশসম্ভূত। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ দক্ষিণদেশ হইতে এ দেশে আগমন করেন। ১৩০৩ শকে কর্ণাটদেশে সর্ব্বজ্ঞ নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ভরদ্বাজ গোত্রোৎপন্ন যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ; তাঁহার এক মাত্র পুত্র, নাম অনিরুদ্ধ। সর্ব্বজ্ঞ এগার বৎসর মাত্র কর্ণাটের শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র অনিরুদ্ধ ১৩১৪ শকে কর্ণাটের অধীশ্বর হয়েন। অনিরুদ্ধ রাজযোগ্য বিবিধ গুণে বিভূষিত ছিলেন। "এই রাজত্ব সময়ে গৌড়ীয় রাজা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যান, তিনি কর্ণাট দেশের শ্রীবৃদ্ধি শুনিয়া সেই স্থান পরিদর্শনে গমন করেন এবং তথায় মহারাজ অনিরুদ্ধের সহিত মিত্রতা হয়।"* অনিরুদ্ধের দুই পুত্র, রূপেশ্বর

* কটেশনোদ্ধৃত উক্তি গুলি শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচি এম ডি (লিপজিক্) মহাশয় কর্ত্তৃক পরিকথিত। বাগচি মহাশয় আগ্রা থাকা কালীন বহুযত্নে শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্বহস্ত লিখিত অতি প্রাচীন একখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তাঁহাদের আত্মবিবরণ সহ মদন গোপাল দেবের কাহিনী সে অমূল্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এ প্রবন্ধে বাগচি মহাশয়ের অনুগমন করা গিয়াছে, অতএব এ প্রস্তাব প্রকৃত সত্যমূলক। সনাতন সম্বন্ধে যে সকল কাহিনীর এতৎসহ ঐক্য হইবে না, তাহা অমূলক বলিবার কারণ আছে।—লেখক।

ও হরিহর। রূপেশ্বর বিবিধ শাস্ত্রে বিচক্ষণ হইয়া উঠেন, এবং হরিহর শস্ত্র বিদ্যায় প্রবীণত্ব লাভ করেন। ১৩৩৮ শকে মহারাজ অনিরুদ্ধের দেহান্তে রাজাসন লইয়া দুই ভাইয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত এবং কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া রূপেশ্বর আটজন অশ্বারোহী ও স্ত্রীপুত্রাদি সহ পূর্ব্বপরিচিত পিতৃমিত্রের শরণাগত হন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ ঐ সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন না, ১৩০৮ শকে তাঁহার জন্ম হয়। * ১৩৫৫ শকে পিতার মৃত্যুর পর তিনি তত্রত্য মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন। ১৩৭৭ শকে বৃদ্ধ বয়সে তিনি গঙ্গাবাস হেতু মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া গৌড়েশ্বরের অধীন নৈহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন; ১৩৮১ শকে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। পদ্মনাভের ১৮টী কন্যা ও পাঁচটী পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠানুসারে তাঁহাদের নাম যথা—পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের জন্ম ১৩৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়, তিনি পিতৃপদ লাভ করিয়া ও সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়া ১৪০৫ শক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। মুকুন্দের পুত্র কুমার অতি সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, মুকুন্দের জীবদ্দশায়ই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কুমারের পাঁচ পুত্র † তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রীসনাতন, ৪র্থ শ্রীরূপ এবং ৫ম পুত্র বল্লভ। রূপসনাতন বিবাহ করেন নাই, কনিষ্ঠ বল্লভের পুত্র প্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামী।

শ্রীরূপ ও সনাতনের (পূর্ব্বপুরুষগণের) বিবরণ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী স্বীয় লঘুতোষণী নামক গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। * ভক্তিরত্নাকরেও এই মহাবংশ-বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া অদ্য বিদায় লইতেছি; ক্রমে পাঠক ইহাঁদের অদ্ভুত

---

* বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ভক্তচরিতামৃতে লিখিয়াছেন "সেই স্থানে তাঁহার এক পুত্র হয়, পুত্রের নাম পদ্মনাভ।" এ কথার কোন ভিত্তি নাই; ইহা অনুমানমূলক এবং অপ্রকৃত।—লেখক।

† সনাতন কুমারদেবের তৃতীয় পুত্র—জ্যেষ্ঠ সন্তান নহেন, এ কথায় অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। আগামীতে ইহার বিচার করিব। বস্তুতই সনাতন কুমারদেবের জ্যেষ্ঠ তনয় নহেন।—লেখক।

* "উদ্যাচ্চাক পদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিণী
জিহ্বাকল্পলতাবতী মধকবী ভূয়ো নবী নৃত্যতে।
বেজে বাজসভা সভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমীপতিঃ
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর্ভু বিভবদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ॥
পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুলামাবোহতো রোহিণী
কান্তস্পর্দ্ধাযশোভবঃ সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোঽভবৎ।
সর্ব্বক্ষ্মাপতি পূজিতোঽখিল যজুর্বেদৈকবিশ্রামভূঃ
লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ
জগ্মিবান
মহিষ্যো ভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনয়ৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বর হরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতর ভাবং বহুবিধে
জগন্মান্যঃ শস্ত্রে নিজ নিজগুণ প্রেরিততয়া॥
বিভজ্য স্বংরাজ্যং মধুরিপু পুরপ্রস্থিতি দিনে
পিতাতাভ্যাং রূপেশ্বর হরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদার্য্যানাং কুলতিলকমতং শয়দসৌ।
শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভির্নির্ধূতরাজ্যঃ ক্রমা
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিভয়ো সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
ধন্যপুত্রমজীজনদ্‌গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধং॥
যজুর্ব্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্ব্বোপনিষদাং
বসাজ্জায়াং যস্য স্ফুটমদ্যটয়তাস্তবকলাং।

আয়ুর্ব্বেদ।

গুল্মচিকিৎসা।

পূর্ব্ব খণ্ডে আমরা গুল্মের নিদান ও লক্ষণ-আদি বলিয়া আসিয়াছি, উপস্থিত প্রবন্ধে সমস্ত প্রকার গুল্মের চিকিৎসা সবিস্তার আলোচনা করিব।

লঙ্ঘনং দীপনং স্নিগ্ধমুষ্ণং বাতানুলোমনম্।
বৃংহণং যদ্ভবেৎ সর্ব্বং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥

সাধারণতঃ সমস্ত গুল্মেই লঙ্ঘন, অগ্নি-দীপ্তিকারক ঔষধ, স্নিগ্ধ উষ্ণ ও বাতানুলোমক ক্রিয়া এবং যদ্দ্বারা শারীরিক পুষ্টি সাধিত হয়, এরূপ সমুদায় গুল্মরোগীর পক্ষে হিতকর। এই শ্লোকে লঙ্ঘনের স্থলে লঘ্বন্ন পাঠও পঠিত হইয়া থাকে। উভয়তঃই বুঝিতে হইবে যে, গুল্মরোগীর সম্পূর্ণ উপবাস করিতে হইবে না, সাগু পেয়াদি লঘু অন্ন ভোজন করিলেই চলিতে পারে এবং ইহাই পরস্পরা-প্রচলিত প্রথা। গুল্মরোগে স্নেহ, স্বেদ, নিরূহ, অনুবাসন, বিরেক, বমন, লঙ্ঘন, বৃংহণ, শমন, রক্তাবসেচন ও অগ্নি কর্ম্ম এই একাদশ রূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইহার মধ্যে আবশ্যকীয় প্রচলিত উপায় গুলি আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

গুল্মরোগীর উদরে বাতানুলোমক বিষ্ণুতৈলাদি মর্দ্দন করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। বায়ুনাশক কোন কাথ কিম্বা কাঞ্জিকা দ্বারা একটী পরিস্কৃত ঘৃতভাণ্ড (অভাবে নূতন ভাঁড়) পূর্ণ করিবে ও তদ্দ্বারা ক্রমশঃ স্বেদ প্রদান করিবে। এইরূপ স্বেদ ক্রিয়া দ্বারা দৈহিক স্রোতঃ সমস্ত পরিস্কৃত হইয়া প্রকুপিত বায়ুর শমতা ও মলাদি রোধ নিবারণ করে, সুতরাং বাত গুল্মে বিশেষ উপকার হয়। এইরূপ স্বেদকে কুম্ভীস্বেদ বলে। সিদ্ধ মাংসাদির পিণ্ড দ্বারা স্বেদ দেওয়াকে পিণ্ড-স্বেদ এবং ইষ্টকচূর্ণ উত্তপ্ত ও কাঞ্জিক সিক্ত করিয়া স্বেদ দেওয়াকে ইষ্টকাস্বেদ কহে, এই ত্রিবিধ স্বেদ গুল্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

উষ্ণ দুগ্ধ /০ ছটাক ১২ তোলা এরণ্ড তৈল (ক্যাষ্টার অয়েল) সহ পান করিলে বাতগুল্মে বিশেষ উপকার হয়।

শুষ্ক রশুন ত্বক্-বর্জ্জিত করিয়া অর্দ্ধসের গ্রহণ করিবে এবং চারি সের দুগ্ধ ও ষোল সের জল সহ পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ করিবে। এই ক্ষার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করিলে, বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও গৃধ্রসী প্রভৃতি বিবিধ বায়ু রোগ বিনষ্ট হয়।

বায়ু জনিত বেদনা উপস্থিত হইলে, কিঞ্চিৎ টাবা লেবুর রস, হিং, দাড়িম, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধবলবণ, এই সমুদায় একত্র এবং সুরামণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহাতে অতি সত্বর বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

রাই সর্ষপ প্রভৃতি উগ্র বস্তু সেবন জনিত পিত্ত গুল্মে মধুর সহিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কমলা গুড়ি অবলেহন করিবে

তুম্বী বীজ সদৃশ ক্রিমি উৎপাদন করে। এই জাতীয় ক্রিমিকে টানিলে অতিশয় দীর্ঘ হয়। ইহারা ক্রমশঃ অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ সকল উৎপাদন করে। এই শ্লেষ্মজ ক্রিমির মধ্যে কতকগুলি গোলাকার অথচ বিস্তৃত গণ্ডূপদ অর্থাৎ কেঁচোর ন্যায়। প্রায়শঃই এই ক্রিমি সমুদায় শ্বেতবর্ণ। কতকগুলি ঈষৎ তাম্রবর্ণ। কতকগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অথচ তন্তুর ন্যায় সুদীর্ঘ, ইহারাও শ্বেতবর্ণ। অন্ত্রাদ, হৃদয়াদ, উদরাদ, চুারব, দর্ভকুসুম, সৌগন্ধিক ও মহাগুদ এই সমুদায় নামে ইহারা অভিহিত হয়। অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই ইহারা কখন উর্দ্ধে, কখনও অধঃ, কখনও বা উর্দ্ধাধঃ উভয় দিকে গমনাগমন করে। শ্লেষ্মজ ক্রিমি হৃল্লাস (গা বমি বমি করা), আস্যস্রাব (মুখে জল উঠা, অরুচি, অবিপাক, জ্বর, মূর্চ্ছা, জৃম্ভা, ক্ষবথু, আনাহ, অঙ্গমর্দ্দ, ছর্দ্দি, কৃশতা ও পারুষ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত করে।

যেরূপ অবৈধ পানাহারে শ্লেষ্মজ ক্রিমি উৎপন্ন হয়, পুরীষজ ক্রিমিও ঐ সমুদায় কারণে জন্মিয়া থাকে। ফলতঃ অধিক মিষ্টরস, অম্লরস, পিষ্টকাদি, সংযোগবিরুদ্ধ ও শাক প্রভৃতি শ্লেষ্মবর্দ্ধক আহারেই এই ক্রিমির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহারা সঞ্জাত ও প্রবৃদ্ধ হইয়া অধোদিকে বিচরণ করিতে থাকে! যে সময় ইহারা আমাশয়ের দিকে উত্থানোম্মু হয়, তখন ক্রিমিকোষ্ঠীর উদ্গার ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হইতে থাকে। ইহাদের কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি সূক্ষ্ম, কতকগুলি শ্যামবর্ণ, কতকগুলি, পীতবর্ণ, কতকগুলি শ্বেতবর্ণ এবং কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূল ও লেলিহ এই কয়েকটী নামে অভিহিত হয়। বিপথগামী হইলে ইহারা মলভেদ, শূল, বিষ্টম্ভ, কৃশতা, পরুষতা, পাণ্ডুরতা, লোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্যদেশে কণ্ডূ প্রভৃতি উৎপাদন করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেশস্থ ক্রিমির হস্তাদি দ্বারা আকর্ষণ সহ্যায় কিন্তু যাহাদের মস্তকের কেশ ঘন বা সুদীর্ঘ, নিঃশেষরূপে আকর্ষণ তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। পরন্তু উৎকুণ, (ইকুণ) ও মৎকুণের (ছারপোকা) এতই বংশ-বিস্তৃতি শক্তি যে, দুই চারি দিনের মধ্যে দুই একটী হইতে বহুসংখ্যক উৎপন্ন হয়। সুতরাং অপকর্ষণ ও ঔষধ প্রয়োগ দুইটী উপায়ই এস্থলে অবলম্বনীয়।

নালিতা অর্থাৎ পাটবীজ কাঁজিতে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে ৩। ৪ দিনেই সমস্ত ইকুণ মরিয়া যায়। শয়নের পূর্ব্বে পদতলে পানের রস উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে ৪।৫ দিবসে সমস্ত ইকুণ মরিয়া যায়। নারিকেল তৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মাথায় মাখিলে ইকুণ মরিয়া যায়।

পালিধা পত্রের রস ১ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৵০ আনা মধুসহ প্রাতে অবলেহন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। আনারসের ভিতরের পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক ও ইক্ষু চিনি ।০ আনা। ক্রিমির পক্ষে ইহা মহৌষধ ও সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। ঘেঁটুপাতার (ভাঁটি) রস ২ তোলা অথবা অগ্রভাগ (কুঁড়ি) ৪।৫টা বিটলবণ ও চূণের জল সহ সেবনে ক্ষুদ্র ক্রিমি সমূলে

বাবর। *

বাবর হইতে মোগল সাম্রাজ্যের আরম্ভ, কিন্তু বাবর নিজে তৈমুর বংশীয় ছিলেন, এবং মোগলদিগকে সর্ব্বদা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। † তাঁহার মাতা মোগল বংশীয়া ছিলেন। এই কারণেই হউক বা ভারতবাসীরা আফগান ছাড়া উত্তরের মুসলমান মাত্রকেই মোগল বলে বলিয়াই হউক, বাবর-প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাম মোগল সাম্রাজ্য হইয়া গেল। বাবরের পিতামহ আবু সায়েদের রাজ্য বহু-বিস্তৃত,—তিনি তাহার অধিকাংশই পুত্রগণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আহমদ মির্জার ভাগে সমরকন্দ ও বোখারা পড়িয়াছিল, মাহমুদ মির্জা বালখ বা বাক্ত্রীয়া, আর উলেখবেগ কাবুল পাইয়াছিলেন। বাবরেব পিতা ওমর-সেখ মির্জার ভাগে প্রথমে কাবুল পড়ে, কিন্তু তিনি তাঁহার পিতা বর্ত্তমানেই তথা হইতে বদলী হইয়া ফরগানায় (আধুনিক কোকাণ্ড) প্রেরিত হন। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা বাবর বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই।

কিছুকাল পরে আবু সায়েদের রাজ্যে পাপ ঢুকিল, লোভে অন্ধ হইলে যাহা হয় তাহা আরম্ভ হইল। ভ্রাতার রক্ত ভ্রাতা চিনিল না, ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতার অসি উন্মুক্ত হইল, ভ্রাতার শোণিতে ভ্রাতার শোণিত মিলিল! বাবরের পিতা ওমরসেখ মির্জার সহিত তাঁহার ভ্রাতা সমরখন্দাধিপতি আহম্মদ মির্জ্জা ও শ্যালক মাহমুদ খাঁ মোগলের যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বেই ওমরসেখের মৃত্যু হইল, এবং আহম্মদ মির্জা ও মাহমুদ খাঁ একত্রে ফরগান আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না,—সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন। তাহার কিছু-কাল পরেই আহম্মদ মির্জার মৃত্যু হইল। বাক্ত্রীয়াধিপতি মাহমুদ মির্জা সমরখন্দ অধিকার করিলেন, কিন্তু তাঁহারও অল্পদিনের পরে মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র বাইসঙ্ঘর মির্জা পিতৃ-স্থান অধি-কার করিলেন। এইরূপে চারিদিকে একটা ঘোর অশান্তি জাগিয়া উঠিল—দয়া, মায়া, শাসন, বিচার সব লোপ পাইল! এই সময়ে বাবর সমরকন্দ আ[illegible] মনস্থ করিলেন। [illegible] সময়ে ১৫ বৎসর মাত্র। পনের বৎসরের ছেলে আমাদের দেশে রাত্রে পুকুর পাড়ে যাইতে ভয় পায়, আর সেই পনের বৎসরের বালক বাবর বার বার বিফলমনোরথ হইয়াও অবশেষে ১৪[illegible] খ্রীষ্টাব্দে সাহস ও

* বাবরের আসল নাম ছিল—সাহেব উদ্দীন আহম্মদ। বাবর বা সিংহ তাঁহার ভ্রাতার খেতাব ছিল।

† Under these circumstances, it may seem one of the strangest caprices of fortune; that the empire which he (Baber) founded in India sh[illegible] have been called, both in the c[illegible] and by foreigners, the empire of the Moghuls, thus taking its name from a race which he detested.—ERSKINE'S *Ba[illegible]*

প্রহরিগণকে সহসা আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সেই মুষ্টিমেয় সৈন্যের চীৎকার, হুহুঙ্কার ও বীরদর্প শুনিয়া সমরকন্দবাসিগণ ভাবিল বাবরের সৈন্য সংখ্যাতীত। তাহারা সকলেই বাবরের দিক্ হইয়া যেখানে যত উজ্‌বেগ দেখিল হত্যা করিল! ভীষণ হত্যাকাণ্ড বুকে করিয়া সমরকন্দ বাবরের হইল। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই শিবানী খাঁ প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু বাবর এত দৃঢ়তার সহিত নগর রক্ষা করিতেছিলেন যে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বোখারায় ফিরিতে হইল।

সমরকন্দ সম্পূর্ণরূপে বাবরের অধীন হইল। সমরকন্দবাসিগণ বহুদিন পরে শান্তির রাজ্য দেখিল। সম্বাদ আসিল শিবানী উজ্‌বেগ্‌দিগকে একত্রিত করিয়া সমরকন্দ আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন। বাবর চিন্তিত হইলেন। তাঁহার সৈন্য অল্প, ধন নাই যে অধিক সৈন্য রাখেন; আর কি উপায় আছে? তিনি তখন সমরকন্দী সর্দ্দারগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; উজ্‌বেগ্‌-শাসনে তাহাদিগকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে তাহাও স্পষ্টরূপে বুঝাইলেন—ছয়মাস ধরিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না! তখন তিনি একাকী দাঁড়াইলেন। একদিকে অসংখ্য উজ্‌বেগ্‌, অন্যদিকে তিনি ও তাঁহার কতিপয় অনুচর। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া তিনি শিবানীর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। তাঁহার ...ন কয়েকজন নীচ-মনা মোগল ছিল, ... 'লুট' করিবার বাসনায় যুদ্ধক্ষেত্র ...ন; ফলে—সৈন্যের বিশৃঙ্খলা ...র সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া সমরকন্দে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। এই স্থান হইতে তিনি আক্রমণকারী উজ্‌বেগ্‌দিগকে বার বার পরাস্ত, বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। শিবানী অন্য কোন উপায় না দেখিয়া নগর ঘেরাও করিলেন, রসদের পথ একেবারে বন্ধ হইল, নগর-মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল! নগরবাসিগণ দলে দলে অনাহারে মরিতে লাগিল, সৈনিকেরা প্রাচীর হইতে লাফাইয়া—কেহ মরিল, কেহ রহিল! আর রাখা অসম্ভব দেখিয়া বাবর সমরকন্দ ত্যাগ করিলেন। সমরকন্দ আবার শিবানীর করতলগত হইল।

ইহার পর বাবর দরিদ্রতার চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন; পাহাড়ে থাকিতেন, নদীতে জল খাইতেন; বন্য ফল মূলে উদরপূর্ত্তি করিতেন; মাঝে মাঝে কষ্ট অসহ্য হইলে মাতুলালয়ে আসিতেন। এই সময়ে তাঁহার একটীও ভৃত্য ছিল না, ভৃত্যের কার্য্য তিনি নিজ হস্তেই করিতেন। কিন্তু এত কষ্টেও তিনি উদ্যম ভুলিলেন না,—বাবর বাবরই রহিলেন। দুই বৎসর ধরিয়া নানা চেষ্টা করিলেন, কিছুই হইল না! মাঝে মাঝে অবসরও ঘটিত, কিন্তু সৈন্যাভাবে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেন না। এইরূপে কখনও কখনও এত নিরাশ হইতেন যে, চীনদেশে গিয়া সমস্ত জীবনটা তাঁহার অন্ধকারে কাটাইতে ইচ্ছা হইত। এই সময়ে ফরগানে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিল, এবং এই অবসরে বাবর—মাতুল ও সেই বিদ্রোহী ভ্রাতা জহাঙ্গীরের সাহায্যে—ফরগান অধিকার করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।